ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

দশটি কিশোর উপন্যাস

দশটি কিশোর উপন্যাস তো নয়, এ যেন থ্রিলারধর্মী দশটি অভিযান! প্রতিটি কাহিনিই রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা। পটভূমিও পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশ। অরণ্যের সবুজ শোভা, পাহাড়ের রুক্ষতা, গুহার আতঙ্ক ও সমুদ্রের লোনা স্বাদে পূর্ণ। অভিযানভিত্তিক এই উপন্যাসগুলি লেখকের প্রথম জীবনের সাড়া জাগানো গ্রন্থের একত্র সমাবেশ। এতে আছে দিঘা সৈকতে আতঙ্ক, কাকাহিগড় অভিযান, গিরিগুহার গুপ্তধন, হিন্দোল সর্দারের কেল্লা, অমরকণ্টক রহস্য ইত্যাদি কাহিনিগুলি আরও সুন্দর এবং পরিমার্জিত চেহারায়।
প্রতিটি অভিযানের সাফল্যের মূলে আছে কিশোর-কিশোরীদের মিলিত অভিযাত্রা। ঘটনাবহুল, চমকপ্রদ ও রহস্যময় এই কাহিনিগুলির পরতে পরতে শিহরন আর অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের অনুভূতি।

ISBN 81-7756-607-5

দশটি কিশোর উপন্যাস

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ

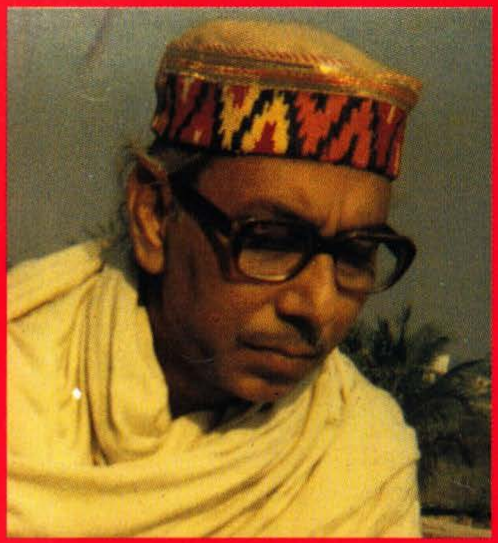

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৫ ফাল্গুন ১৩৪৭। ইংরেজি ১৯৪১। মধ্য হাওড়ার খুরুট ষষ্ঠীতলায়।
কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য সাধনার শুরু। ১৯৬১ সাল থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীর সঙ্গে লেখালেখিসূত্রে যুক্ত থাকলেও, ১৯৮১ সালে প্রকাশিত ছোটদের জন্য লেখা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'ই লেখককে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।
লেখক মূলত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাই দেশে-দেশে ঘুরে যে-সব দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর প্রতিটি রচনার কাহিনিনির্মাণে ও চরিত্রচিত্রণে।

প্রচ্ছদ অমিতাভ চন্দ্র

দশটি কিশোর উপন্যাস

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৭

অলংকরণ অমিতাভ চন্দ্র
© ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-607-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

৩০০.০০

সূচিপত্র

দিঘা সৈকতে আতঙ্ক ১
কাকাহিগড় অভিযান ৬৭
গিরিগুহার গুপ্তধন ১৪৩
হিন্দোলসর্দারের কেল্লা ২২৯
নয়নাগিরি অভিযান ৩৩৫
অমরকন্টক রহস্য ৪৩৯
সানঘাগরার আতঙ্ক ৫২৭
সব্যসাচীর গোয়েন্দাগিরি ৬০১
লালবাজারে রাহাজানি ৬৮৩
অভিশপ্ত তিড্ডিম ৭৬৩

গ্রন্থপরিচয় ৮৩৫

দিঘা সৈকতে আতঙ্ক

বাপ্পার চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে এইরকম একটা সুযোগ এসে যাবে, তা ও ভাবতেও পারেনি। অঘ্রাণের এই সোনাঝরা দিনে দিঘা সৈকতের হাতছানি ওকে যেন পাগল করে তুলল।

ওয়ারেন হেস্টিংস একদা যে দিঘাকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং আজও যে দিঘার আকর্ষণে শতসহস্র মানুষ ছুটে যায়, সেই স্বপ্নের দিঘায় বেড়াতে যাবার সাধ কি ওর একদিনের? ওরই স্কুলের রঞ্জন, পিনাকী, দেবাশিস ওদের বাবা-মায়ের সঙ্গে কতবার দিঘা গেছে। তাদের মুখে কত গল্প শুনেছে ও। তা ছাড়া ওদের এলাকা থেকে রিজার্ভ বাস তো বছর-বছরই ছাড়ে। বছরের প্রায় সব সময়ই একটা-না-একটা 'দীঘা স্পেশাল' ছেড়েই থাকে। দলে দলে লোক যায়। দিঘা সৈকতে ভ্রমণ করে অপার আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে। আর খবরের কাগজগুলো তো দিনের পর দিন লোভনীয় বিজ্ঞাপনে সুন্দরী দিঘায় আসার আমন্ত্রণ জানায় মানুষকে। সেই সব বিজ্ঞাপনের স্কেচ দেখে, এরওর মুখে গল্প শুনে, মনে মনে দিঘা সম্বন্ধে একটা ধারণাই করে ফেলেছে বাপ্পা। তাই মা'র মুখে দিঘার কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল সে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে মায়ের দু'হাত আঁকড়ে ধরে বলল, সত্যি! কবে যাবে মা?

বাপ্পার মা সুজাতাদেবী সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, বাপি সন্ধের পর বাড়ি আসুক। তারপর দিনটা ঠিক হবে। যদি ছুটি পান তো কালই।

মা! আবেগে বাপ্পার গলা দিয়ে যেন শব্দ বেরোতে চায় না। সত্যি বলছ বাপি যদি ছুটি পান তো কালই?

হ্যাঁ রে হ্যাঁ। যদি ছুটি পান তো কালই। না হলে যেদিন ছুটি পাবেন সেদিনই, মোটকথা তোর বাপি এতদিনে রাজি হয়েছেন দিঘায় যেতে।

আনন্দে অভিভূত বাপ্পা ঘরে বসেই যেন ওর মানসচোক্ষে সমুদ্রকে দেখতে পেল।

বাপ্পার বাবা কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের একজন পদস্থ অফিসার। নাম অসমঞ্জ রায়। এমনিতে পুলিশের লোক বলতে সাধারণত যেরকম হয়, উনি কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্যন্ত সাদামাটা সুদর্শন লোক। মুখে হাসিটি লেগেই

আছে সবসময়। স্ত্রী সুজাতাদেবী এবং বারো বছরের বাপ্পাকে নিয়ে সুখের সংসার। এই সৎ ও ভদ্র মানুষটি অঞ্চলের সকলের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয়।

যাই হোক! মা'র মুখে দিঘার কথা শোনার পর বাপ্পা যেন অস্থির হয়ে উঠল। বাপি যে কখন সন্ধের পর বাড়ি আসবেন, সেই আশাতেই অধীর হয়ে উঠল সে।

আনন্দের বন্যাটা মনের মধ্যে প্রবল বেগে আলোড়িত হলেও, সেটা অবশ্য ছড়িয়ে পড়তে পারল না। তার কারণ, ওই যে মা বললেন 'যদি ছুটি পান তো কালই।' কিন্তু যদি ছুটি না-পান? তা হলে? তা হলে কবে, কতদিনে? দিন স্থির করলেও কি যাওয়া হবে? হয়তো তখন এমন একটা জরুরি কাজ এসে পড়বে যে, যাত্রা স্থগিত রেখে বাপিকে তখন ছুটির দিনেও ছুটোছুটি করতে হবে।

তাই এক দারুণ উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল বাপ্পা। অথচ বাপিটা কী! আগে থেকে অফিসকে না-জানিয়ে কিছুতেই অফিস কামাই করবেন না। বাপি নিজেই তো বলেন, সারা বছরের কত ছুটিই তাঁর পচে যায়। বাপ্পা ভেবেই পায় না ছুটি কী করে পচে। ছুটি কি আলু, না বরফচাপা মাছ? ছুটি-ছুটিই। তবুও বাপির ছুটি নাকি পচে যায়। যাই হোক, বাপি আগে থেকে অফিসকে না-জানিয়ে ছুটি নেবেন না। এবং রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিন কোথাও বেড়াতে যাবেন না। বাপির ধারণা ছুটির দিনে নাকি কোনও বেড়ানোর জায়গায় যেতে নেই। তা হলে নাকি খুব একটা ভিড়ভাট্টার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। অনেক সময় পছন্দমতো ঘর পাওয়া যায় না। সত্যিই কি? হয়তো তাই। বাপি তো অনেক বোঝেন। বাপি বুদ্ধিমান লোক। তবে বাপ্পা যদি বাপির মতো হত, তা হলে যখন যেখানে মন চাইত, চলে যেত।

যাই হোক, সারাদিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল বিকেল চারটেয়। অসমঞ্জবাবু বাপ্পাকে চমকে দিয়ে হঠাৎই এসে পড়লেন বিকেলে। বাপ্পা বাপিকে দেখেই অবাক হয়ে বলল, কী হল বাপি! তুমি এত সকাল-সকাল ফিরলে যে?

অসমঞ্জবাবু সস্নেহে বাপ্পাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, রোজই তো দেরি করে আসি। তাই আজ একটু সকাল করেই, ফিরলাম। বলে বাপ্পার চিবুক ধরে একটু আদর করে বললেন, কেন, মামণি কিছু বলেননি তোমাকে?

হ্যাঁ। তুমি ছুটি পেয়েছ বাপি?

পেয়েছি।

তা হলে কালই যাচ্ছি আমরা?

কালই। খু-উ-ব সকালে। তুমি কিন্তু আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোবে এবং কাল খুব ভোরে উঠবে। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে রোদ উঠলে তারপর উঠবে, এইরকম যেন করবে না, বুঝলে?

না-না-না। তুমি দেখে রেখো, আনন্দে হয়তো আমার সারারাত ঘুমই হবে না।

আমি খু-উ-ব ভোরে উঠব। তোমরা ওঠার অনেক আগেই উঠে পড়ব আমি। আমিই তোমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলব।

অসমঞ্জবাবু ঘরে এসে মুখহাত ধুয়ে জামাপ্যান্ট ছেড়ে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিলেন। বাপ্পার মা সুজাতাদেবী কফি আর টোস্ট এনে বললেন, তা হলে কালই যাচ্ছ তো?

বাপ্পার বাবা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

এদিকে ছেলে তো শুনেই লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। না-গেলে দারুণ মন খারাপ হয়ে যেত ওর।

অসমঞ্জবাবু টোস্টে কামড় দিয়ে হাসিমুখে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার মন খারাপ হত না? তারপর বললেন, দিন চারেকের মতো ছুটি পেয়েছি। অনেকদিন ধরেই যাব যাব ভাবছি, অথচ যাওয়া আর হয়ে উঠছে না। তা ছাড়া বাপ্পাটা প্রায়ই দিঘা দিঘা করে। পুরী তো তিন-চার বার গেলাম। এবার দিঘাতেই যাই। পশ্চিম বাংলার উপকূলে এমন চমৎকার সমুদ্রসৈকত রয়েছে অথচ আমরা অবহেলা করে যাই না।

সুজাতাদেবী বললেন, আমরা অবহেলা করে যাই না বলতে যদি তুমি আমাদের পরিবারের কথা বলো, তা হলে অবশ্য আলাদা। না হলে আমরা সবাই দিঘায় যেতে চাই। দলে দলে মানুষ দিঘার হাতছানি পেয়ে দিঘার ছুটছে। তুমিই শুধু বলো পুরীর কাছে দিঘা! তুমিই তো বলো, কী আছে দিঘায়? গঙ্গার জলের মতো ঘোলা জল, ছোট ছোট ঢেউ, একেবারে বাজে জায়গা। ওতে সমুদ্র দেখার সাধ মেটে না। দিঘায় যাওয়া মানেই গঙ্গার বড় একটু আকার দেখতে যাওয়া।

বাপ্পা চোখদুটো বড় করে বলল, সেকথা ঠিক। শুধু বাপি কেন, অনেকেই সেকথা বলে। পুরীর কাছে দিঘা হয়তো কিছুই নয়। তবুও দিঘা দিঘাই। দিঘার কোনও বিকল্প নেই। জানো বাপি, আমি শুনেছি দিঘায় অনেক ঝাউবন আছে। খুব ঘন ঝাউবন। দিঘায় অনেক উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি আছে।

সুজাতাদেবী বললেন, এই তো সেদিন কীসে যেন পড়লাম, দিঘা উন্নয়ন পরিকল্পনা দিঘাকে আরও মনোরম, আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চারশো চুয়াল্লিশ একর জায়গা নিয়ে দিঘাকে সৌন্দর্যময়ী করে তুলছেন। এখানে তৈরি হবে ডিয়ার পার্ক। সুন্দর একটি মিনি বোটানিক্যাল গার্ডেন। একশো একর জায়গা নিয়ে তৈরি হবে একটি কৃষি গবেষণাগার। সে যাই হোক, দিঘার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল সমুদ্র এবং তার সুন্দর শক্ত ও মসৃণ সৈকত। হাঁটলে পায়ে কাদা লাগে না। সমুদ্রপ্রেমিক পর্যটকরা দিঘার সি বিচকে পৃথিবীর বিখ্যাত 'মিয়ামি সি বিচের' সঙ্গেও তুলনা করেন।

বাপ্পা তার ডাগর-ডাগর চোখ মেলে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল

এতক্ষণ, সব শুনে বলল, বলো কী! 'মিয়ামি সি বিচের' কথা বইতে পড়েছি। রেডিয়োতেও একদিন শুনছিলাম। তার সঙ্গে দিঘার তুলনা! আজকেই কাগজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিঘা সৈকতের একটা ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন ছেপেছে। দেখবে? বলেই ফুড়ুত করে ঘর থেকে উধাও হয়ে গেল বাপ্পা।

অসমঞ্জবাবু কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, পাগল ছেলে কোথাকার।

সুজাতাদেবী সস্নেহে বাপ্পার চলে যাওয়া দেখলেন। তাঁর বুকের গভীরে তখন অপূর্ব সুখের অনুভূতি। প্রাণোচ্ছল সন্তানের এই ভ্রমণের উন্মাদনা তাঁর মনকেও মাতিয়ে তুলেছে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলেন অসমঞ্জবাবু। পাছে ঘুম ভাঙতে দেরি হয় তাই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন।

সুজাতাদেবীরও ঘুম ভাঙল। আর বাপ্পা? তাকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ফিক করে হেসে ফেলল সে। বলল, আমি তোমাদের চেয়েও অনেক আগে উঠেছি। লেপের গরমে চুপচাপ শুয়েছিলাম শুধু। বুঝলে? কিন্তু বাপি, শীতটা তো বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। এত ভোরে গেলে তোমার কষ্ট হবে না? তুমি যে বেশি শীত একদম সহ্য করতে পার না।

অসমঞ্জবাবু বললেন, না। তবে তুমি কিন্তু চট করে দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও। হিরুদা এখুনি আসলেন বলে। এখন ঠিক চারটে। আর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন হিরুদা।

বাঁধা-ছাঁদা যা করবার, তা রাত্রেই করে রেখেছিলেন ওরা। এখন শুধু বাথরুমের কাজ সেরে তৈরি হয়ে নেওয়া। ওরা যখন তৈরি হচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ই বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

অসমঞ্জবাবু হেঁকে বললেন, এক মিনিট।

বাপ্পা দরজা খুলে বাইরে এল। হিরুকাকা মোটরের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কত দেরি?

বাপ্পা বলল, হয়ে গেছে।

অসমঞ্জবাবু ও সুজাতাদেবী ঘরের আলো নিভিয়ে বাইরে এসে দরজায় তালা দিলেন। তারপর মোটরে উঠে পিছনের সিটে বাপ্পাকে নিয়ে শালমুড়ি দিয়ে তিনজনে গুছিয়ে বসতেই, হিরুকাকা ঝড়ের গতিতে উড়িয়ে নিয়ে চললেন অ্যামবাস্যাডারটাকে।

কী প্রচণ্ড শীত আজ। রক্তমাংসের শরীরের ভেতর যে হাড়গুলো আছে, সেগুলো পর্যন্ত কনকনিয়ে উঠল ঠান্ডায়।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সল্টলেক থেকে হাওড়ায় এসে পড়লেন ওঁরা। এতে ভোরে রাস্তা-ঘাট সব ফাঁকা। কাজেই বিলম্ব হল না। বিনা বাধায়, বিনা ট্রাফিক জ্যামে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে গেলেন।

এবার ট্রেনের পথ। হাওড়া থেকে লোক্যাল ট্রেনে মেচেদা। ঝক্কি কী কম? এরপর আবার ট্রেন থেকে নেমে বাস। সেই বাসে চেপে চার পাঁচ ঘণ্টা হু হু করে ছোটার পর দিঘা।

মেচেদায় ওরা যখন ট্রেন থেকে নামল, তখন সকাল সাতটা। সারি সারি বাস এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। সোনারোদ্দুর ঝরে পড়ছে অকৃপণভাবে। শীতের সকালে এই রোদের ঝলমলানি খুবই ভাল লাগল বাপ্পার।

অসমঞ্জবাবুকে দেখেই কয়েকজন কন্ডাক্টর ছুটে এল, দিঘা যাবেন নাকি বাবু? এই যে দিঘার বাস দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এই বাসটা আগে ছাড়বে।

অসমঞ্জবাবু বললেন, কিন্তু ও-বাস তো ভরতি। আমরা একটু ভাল করে আরামে বসে যেতে চাই।

এতেও বসার জায়গা পাবেন বাবু। ড্রাইভারের পাশে সামনের দিকে ভাল বসার সিট আছে।

অসমঞ্জবাবু উঠলেন। উঠে ড্রাইভারের পাশে চারজনের বসার মতো লম্বা গদিওয়ালা সিট দেখে খুব খুশি হয়ে সুজাতাদেবীও বাপ্পাকে ডাক দিলেন। বেশ ভাল বাস। ঝকঝকে-তকতকে। পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। চমৎকার। বাপ্পা তো দারুণ খুশি।

সামনের কাচ দিয়ে চারদিক কী সুন্দর দেখা যাচ্ছে। প্রাইভেট বাস। অথচ লাক্সারি বাসের মতো। ক্যাসেটের গানও শোনা যাচ্ছে। হিন্দি গান অবশ্য, সময় কাটানোর পক্ষে এই-ই বা মন্দ কী?

ওরা বসার সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভারও উঠল। অসমঞ্জবাবু ড্রাইভারকে বললেন, বাস কখন ছাড়বে? একটু চা-টা খেয়ে আসা যাবে?

ড্রাইভার বলল, না না। এখনই ছাড়বে বাস। এখন চা খেতে যাবেন না। কাঁথির আগে বড় স্টপেজও কিছু নেই। কাঁথিতে বাস দশ মিনিট থামবে। ওইখানে যা ইচ্ছে খাবেন। সবকিছু পাওয়া যাবে ওখানে। বলতে বলতেই ছেড়ে দিল বাস।

তমলুকের ওপর দিয়ে গিয়ে নরঘাটের হলদি নদীতে মাতঙ্গিনী সেতু পেরিয়ে বাস উল্কার গতিতে ছুটে চলল। তারপর বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ পার হয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ বাস এসে পৌঁছুল কাঁথিতে।

বাপ্পা বলল, বাপি, কাঁথিকেই তো কন্টাই বলে, তাই না?

হ্যাঁ। এখানে কাজু বাদামের চাষ হয়। আর এই কাঁথি থেকেই ন'কিলোমিটার

দূরে জুনপুট। জুনপুটের নির্জন সমুদ্রতীরও ভারী মনোরম জায়গা।

শংকরপুর, খেজুরি, হিজলি সবই এখান থেকে কাছাকাছি। তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত কপালকুণ্ডলার মন্দির এইখান থেকেই দেখতে যায় লোকে।

আমরা যাব না বাপি?

ফেরার দিন যদি সময় পাই তো যাব।

সুজাতাদেবী বললেন, খুব চা-তেষ্টা পাচ্ছে বাপু আমার। একটু চায়ের ব্যবস্থা করো।

অসমঞ্জবাবু বললেন, অবশ্যই। যা ঠান্ডা, তাতে এবার একটু চা না-খেলেই নয়। তার ওপর এতখানি জার্নির পর খিদেও পেয়েছে। এবার পেটেও কিছু দিতে হবে।

ড্রাইভার বলল, যা করার তাড়াতাড়ি করুন।

অসমঞ্জবাবু আর বাপ্পা নীচে নামল। কাছেই চায়ের দোকান। গরম গরম কিছু শিঙারা আর জিলিপি ঠোঙাভরতি কিনে সুজাতাদেবীর হাতে দিয়ে, অসমঞ্জবাবু চায়ের অর্ডার দিলেন। চা তৈরি হলে এক কাপ চা সুজাতাদেবীকে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা দোকানে বসেই খেয়ে নিলেন।

ড্রাইভার তখন হর্ন বাজিয়ে বাস ছাড়বার উপক্রম করছে।

বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। অসমঞ্জবাবুও উঠলেন। বাস ছাড়ল।

এবার দ্রুতগামী বাসের ভেতরে বসে চারদিক দেখতে দেখতে শিঙারা-জিলিপি খাওয়া।

কাঁথি থেকে দিঘা ঘণ্টাখানেকের পথ। বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ ওরা যখন দিঘায় পৌঁছুল, তখন আনন্দে নেচে উঠল মন।

বাসে বসেই সমুদ্র দেখতে পেয়েছিল ওরা। বাস ওদের নামিয়ে দিয়ে আরও একটু দূরে কিয়াগেড়িয়ায় ওড়িশাসীমান্তে চলে গেল।

ওদের এখন সামনে সমুদ্র। সমুদ্রের নীল-নীল জলরাশি, সফেন জলোচ্ছ্বাস। দিঘার নির্জন সৈকতের ঝাউবনে সামুদ্রিক বাতাস লেগে সোঁ-সোঁ শব্দ হচ্ছে। দিঘার অথই নীল জলরাশি নিয়ে বঙ্গোপসাগর যেন ওদের সবাইকে সমুদ্রস্নানের জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কী সুন্দর—কী সুন্দর—কী আশ্চর্য সুন্দর তার রূপ।

দুই

সামনে সমুদ্র দেখে আনন্দের আতিশয্যে অধীর হয়ে উঠল বাপ্পা। বাস থেকে যেখানে ওরা নেমেছিল, তার পাশেই দিঘার প্রধান স্নানের ঘাট। আবেগের উচ্ছ্বাসে 'হুর্‌র্‌রে' বলে লাফিয়ে উঠেই বাপ্পা ছুটে গেল ঘাটের কিনারে। ঘাটের কিনারে বড় বড় বোল্ডারের ওপর সুনীল সাগর শ্বেত-শুভ্র ফেনার রাশি নিয়ে আছড়ে পড়ছে।

কত লোক তখন স্নান করছে সমুদ্রে। কেউ বা নুলিয়া নিয়ে, কেউ বা একা-একাই। কেউ সাঁতার কাটছে। কেউ বা ঢেউ খাচ্ছে। সাঁতার কাটতে কাটতে কেউ অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। যদিও সমুদ্রের বেশি দূরে কখনও যাওয়া উচিত নয়, তবুও সতর্কীকরণ না মেনেই বেপরোয়া মানুষেরা দলে দলে চলে যাচ্ছে গলাজল পেরিয়ে। বাপ্পার মনে হল, সেও ওদেরই মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রের বুকে। ভেসে বেড়ায় ঢেউয়ের দোলায় দোলায়।

অসমঞ্জবাবু ডাকলেন, বাপ্পা চলে এসো, সমুদ্রের কাছে যেয়ো না।

না না, কিছু হবে না। এই তো আমি। জলে তো নামিনি। তা ছাড়া ভয় কী বাপি, আমি তো পুরীর সমুদ্রেও ঢেউ খেয়েছি।

তা হোক। একেও বড় হেলাফেলা মনে কোরো না।

বাঃ রে। এত লোক যে ঢেউ খাচ্ছে?

তুমিও ঢেউ খাবে। তবে এখন নয়। এখন চলে এসো। আগে আমরা একটা হোটেল বা লজে গিয়ে উঠি, তারপর তো।

আমি আজই সমুদ্রে স্নান করব বাপি।

আজ নয়। আজ এই অবেলায় এত ঠান্ডায় কেউ স্নান করে? কাল করবে। এখন চলে এসো।

বাপ্পা চলে এল। না এসে উপায়ই বা কী? সত্যি, বেলা তো হয়েছে। তার ওপর মা-বাবা ডাকলে, তাঁরা গুরুজন, সর্বাগ্রে তাঁদের কথা শুনতে হয়। অসমঞ্জবাবু খোঁজখবর নিয়ে কাছেই প্রধান সড়কের ওপর নবনির্মিত একটি চমৎকার হোটেলে গিয়ে উঠলেন। নাম 'হোটেল সুন্দরম।'

কী সুন্দর হোটেল। মেন রোডের ওপর। ঠিক যেন একটা স্টুডিয়ো। বড় একটা ঘর। লাগোয়া আরও একটা ছোট ঘর। একটিতে খাট-বিছানা, ড্রেসিং টেবিল। অপরটিতে বিশ্রামের জন্য চেয়ার ও ইজিচেয়ার পাতা। অ্যাটাচড বাথ। গ্রাউন্ড ফ্লোরের ঘর। ভাড়া দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা। অসমঞ্জবাবু তাঁদের থাকার জন্য নীচের তলায় এই ঘরটিই বেছে নিলেন।

হোটেলের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে বিশ্রাম

নেওয়া হল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে চাবি দিয়ে অন্য একটা হোটেলে গিয়ে পেট ভরে মাছ-ভাত খেয়ে তিনজনে আবার সমুদ্রতীরে এলেন। কিন্তু এ কী! কী আশ্চর্য! কোথায় গেল সমুদ্র।

ওরা সবিস্ময়ে দেখল তীরভূমি থেকে বহুদূরে সমুদ্র সরে গেছে।

গঙ্গার ঢেউয়ের মতো ছোট ছোট ঢেউ কাদার ওপর ছলাৎ ছলাৎ করছে! অর্থাৎ এখন ভাটার সময়। বিস্তীর্ণ চরার ওপর বড় বড় ট্রাক, মোটর ছুটছে।

বাপ্পার সব আনন্দ জল হয়ে গেল। অসমঞ্জবাবু, সুজাতাদেবী এবং বাপ্পা তিনজনেই তখন চরায় নেমে সমুদ্রের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল। তখনও সেই দারুণ অবেলায় কত লোক সমুদ্রে স্নান করছে।

বাপ্পা চরায় নেমে বলল, দেখ বাপি, চরাটা কী বিচ্ছিরি। এই চরা পুরীর মতো বালির নয়। কাদা মাটির। তবে বেশ শক্ত। অর্থাৎ পা গেঁথে যায় না। আর সেইজন্যেই এই চরার ওপর দিয়ে মোটর, লরিগুলো অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। তাই না? এটাও কিন্তু দিঘার একটা আকর্ষণ। এরকম বোধহয় কোথাও নেই। যাক, আমার আশা তো মিটল।

অসমঞ্জবাবু অনেকটা নিজের মনেই বললেন, এই সেই দিঘা।

সুজাতাদেবী বললেন, কী সুন্দর না?

হ্যাঁ। সুন্দর তো বটেই। দিঘা আজ ছোটখাটো সুন্দর একটি শহর। অথচ একদিন এই দিঘা ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে বীরকূল পরগণার উল্লেখ আছে। আটটি গ্রাম নিয়ে তিনশো পঞ্চাশ বর্গ মাইল বিস্তৃত ছিল এই পরগণা। দিঘাও সেই পরগণার অন্তর্গত একটি গ্রাম ছিল। এখন অবশ্য যাকে আমরা দিঘা বলে জানি, এ কিন্তু সেই আসল দিঘা নয়। প্রাচীন দিঘা ছিল সমুদ্রের আড়াই মাইল দক্ষিণে।

বাপ্পা বলল, তা হলে সেই দিঘা এখন কোথায়?

অসমঞ্জবাবু হেসে বললেন, সেই দিঘাসহ সাতটি গ্রাম এখন তলিয়ে আছে সমুদ্রের জলের তলায়।

বলো কী!

বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস খুব সমুদ্রবিহার করতে এবং শিকার করতে ভালবাসতেন। সেজন্যে মাঝেমধ্যে তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে আসতেন বীরকূলে। এখানে তাঁর একটি সুন্দর বাংলোও ছিল। সেটিও এখন সমুদ্রগর্ভে।

কবেকার কথা বাপি?

সে প্রায় ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের কথা। তারও অন্তত পঞ্চাশ বছর পরে বেইলি সাহেব দিঘা বেড়াতে এসে মুগ্ধ হন। দিঘার অপার সৌন্দর্য দেখে মোহিত হন তিনি। দিঘার কথা তিনি কাগজে লিখতে থাকেন। এবং তাঁর সেই লেখা পড়ে

দিঘার ব্যাপারে মানুষের উৎসাহ বাড়তে থাকে। যাই হোক, এর পরেও বহুকাল কেটে যায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর চারজন ইংরেজ অনেক কষ্টস্বীকার করে দিঘায় বেড়াতে আসেন। এসে এঁরাও অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন মি. জে এফ স্নেইথ। তিনি প্রায় এক বছর পরে মেদিনীপুরের কালেক্টরের কাছ থেকে এক খণ্ড জমি কিনে বিরাট একটি বাংলো বানালেন। তারপর সকলকে উৎসাহ দিয়ে আরও অনেক বাংলো তিনি তৈরি করালেন এখানে। ধীরে ধীরে নতুন দিঘা গড়ে উঠতে লাগল। এরপর পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডা. বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৬ সালে দিঘা উন্নয়ন পরিকল্পনা করলেন।

অসমঞ্জবাবু কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। একটি মোটর আচমকা সজোরে এসে সামনে ব্রেক কষতেই সচকিত হলেন তিনি।

অসমঞ্জবাবু 'স্যরি' বলে পিছিয়ে এলেন একটু। মোটরটা আবার হু হু শব্দে উধাও হয়ে গেল। বাপ্পা অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, এগুলো কোথায় যাচ্ছে বাবা এদিকে?

ওখানকার স্থানীয় অধিবাসী একজন কাছেপিঠেই ছিলেন। বললেন, মোহনার দিকে।

মোহনা! কোথায়?

ওই যে ওইদিকে। ওই দেখা যায় লাইকানির চর। ওখানে মৎস্যজীবীদের বাস তো। জেলেরা গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে জড়ো করে। ওই মাছ ট্রাকবোঝাই চালান যায় নানা স্থানে।

বাপ্পা বলল, বাপি যাবে?

কোথায়?

মোহনার দিকে।

যাব। তবে আজ নয়। আজ ঘাটের ধারে বসি সবাই। কাল যাব। বেড়াতে যখন এসেছি, তখন নিশ্চয়ই যাব। একদিনে সব কিছু দেখে ফেললে দেখা শেষ হয়ে যাবে। এই ছোট্ট জায়গাটা তখন আর ভাল লাগবে না।

অসমঞ্জবাবু আবার ঘাটের দিকে ফিরে এলেন। ঘাটের ধারে তখন কত কী বিক্রি হচ্ছে। কত রঙিন মাদুর। সামুদ্রিক দ্রব্যাদির খেলা। শাঁখের মালা। আরও কত কী। সুজাতাদেবী ঘুরেফিরে সেইসব দেখতে লাগলেন। অসমঞ্জবাবু একটা বোল্ডারের ওপর রুমাল পেতে বসলেন। আর বাপ্পা? সে চুপচাপ বসে থাকবার ছেলেই নয়। চারদিকের সুন্দর সুন্দর বাংলোবাড়ি, কোয়ার্টার, লজ দেখতে লাগল ঘুরেফিরে। দেখতে দেখতে সি বিচ ধরে এক পা, এক পা করে এগিয়েই চলল সে। চলতে চলতে ওকে যেন ক্রমশ চলার নেশাতেই পেয়ে বসল। খানিক যাবার পর বাপ্পা দেখল দিঘা সৈকতের সৌন্দর্য যেন আরও প্রকটিত হচ্ছে। চারদিকে

শুধু ঝাউবন আর ঝাউবন। উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি। ঠিক যেন ছোটখাটো বালির পাহাড় সব। ও যেই বাঁধা রাস্তার শেষে বালিয়াড়িতে নামতে যাবে, অমনি একটা ঝুপড়ির আড়াল থেকে সরেঙ্গা লম্বা রোগামতো পাগল-পাগল চেহারার একটি লোক লাফিয়ে পড়ল ওর সামনে। লোকটির মাথায় একটি লাল ফিতের ফেট্টি বাঁধা। হাতে বল্লম। মাথার চুল রুক্ষ এবং ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। পাকানো গোঁফ। পরনে একটি জাঙ্গিয়া ও গেঞ্জিবিহীন হাতকাটা সোয়েটার। সেটি যেমনই ময়লা, তেমনি ছেঁড়া। লোকটি ওর পথ রোধ করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। তারপর কর্কশ গলায় বলল, এই তুম কৌন হ্যায় রে?

বাপ্পা তো আচমকা ওই মূর্তিমানকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। তবু নিজেকে সামলে অতি কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমি বাপ্পা।

তোর বাড়ি কোথায়?

আমার বাড়ি কলকাতায়। সল্টলেকে।

লোকটি হঠাৎ বল্লমটি বালিতে গিঁথে অনেকটা আর্চ করার ভঙ্গিতে একটা ডিগবাজি খেয়েই বলে উঠল—

আমার নাম অ্যান্টনি ধিড়িঙ্গি
নইকো ট্যাঁস, নই ফিরিঙ্গি
হ্যান করেঙ্গে ত্যান করেঙ্গে
পকেটকা পয়সা লুঠকে লেঙ্গে।

বাপ্পা সভয়ে একটু পিছিয়ে এল।

লোকটি বলল, কী আছে তোর কাছে বার কর।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল বাপ্পার। বলল, আমার কাছে অন্য কিছু তো নেই, সামান্য কিছু খুচরো পয়সা আছে।

অন্য কিছু চাইছে কে তোর কাছে? খুচরো পয়সাগুলোই দে। ডোন্ট ডিলে, একদম দেরি নয়—কুইক। বার কর শিগগির। জলদি কর।

বাপ্পা পকেট হাতড়ে ভয়ে ভয়ে যা ছিল, সব বার করে দিল।

লোকটি সেগুলো হাত পেতে নিয়ে আনন্দে চোখদুটো বড় বড় করে বলল, বাঃ! বাঃ! বেড়ে বেড়ে। এতে আমার এক কাপ চা হবে। একটা পাউরুটি হবে। উপরন্তু বিড়িও হয়ে যাবে গোটাকতক। ওঃ হো। কী মজা!

বাপ্পা পয়সাগুলো দিয়ে চলে আসছিল।

লোকটি বলল, হোয়াই আর ইউ রিটার্ন ব্যাক? আমি একটা ব্রেনলেস। আমাকে দেখে এত ভয় পাবার কী আছে? আমি যখন পয়সা পেয়ে গেছি, তখন আর কোনও ভয় নেই তোর।

বাপ্পা এবার একটু সাহস পেয়ে বলল, আমার কাছে যদি পয়সা না-থাকত?

তা হলেও ভয়ের কিছু ছিল না। কেন না আমি ছোট ছেলেদের কিছু বলি না। তবে তোকে দেখেই বুঝেছি তুই বেশ বড়লোকের ছেলে। তোর কাছে হাতপাতলে টু-পাইস পাওয়া যেতে পারে।

বাপ্পা এবার হেসে বলল, তা এই কি তোমার হাতপাতার নমুনা? তুমি বেশ মজার লোক তো?

লোকটি হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ করে হাসতে হাসতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলতে লাগল দিঘাবাজারের দিকে মুখ করে। আর বলতে লাগল, দুর্গা মায়ি বচাকে রাখখা—দুর্গা মায়ি বচাকে রাখখা। যো দেগা উসকা ভি ভালা হোগা, যো নেহি দেগা উসকা ভি ভালা হোগা। সীতারাম ঝটপট...।

বাপ্পা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। একটা বালির ঢিপির ওপর উঠতেই দূরের অনেক কিছু দেখতে পেল। কত ঝাউবন এখানে। ও সাহস করে সেই ঝাউবনের দৃশ্য দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। কী সুন্দর একটা জিনিস চক চক করছে সেখানে। সূর্যের আলো পড়ে চোখ যেন ঠিকরে পড়ছে। বাপ্পা কাছে গিয়ে সেটা হাতে নিয়েই অবাক হয়ে গেল। দেখল একটা রুপোর পদক। তাইতে ইংরেজিতে নাম লেখা আছে 'নীতা সিং', জিনিসটার মূল্য কতখানি, বাপ্পা তা জানে না। শুধু অনুমান করল, নিশ্চয়ই কোনও নীতা সিং তার মা-বাবার সঙ্গে দিঘা বেড়াতে এসে এই পদকটা এখানে হারিয়েছে এবং পরে মা-বাবার কাছে খুব বকুনিও খেয়েছে। যাক, এটা বাপির হাতে দিয়ে দিলে বাপি নিশ্চয়ই এটা ঠিক লোকের হাতে পৌঁছে দিতে পারবেন। কেন না বাপি তো পুলিশের লোক। এই ভেবে বাপ্পা পদকটা পকেটে নিয়ে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে হঠাৎ কী মনে হতেই ফিরে এল বাপ্পা। একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে যেখানে পদকটা পেয়েছিল সেইখানে একটি গাছের গায়ে নিজের নামটা লিখে রাখল। তারপর আবার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। এক জায়গায় দেখল ছোট ছোট হোগলার ঘরে সমুদ্রের মৎস্যসন্ধানীরা তাদের ছোটখাটো সংসার পেতে বসে আছে। এদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। কত মাছ কেনাবেচা হচ্ছে সেখানে। জেলেরা গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে ডাঁই করে রেখেছে। বাপ্পা জানে মরশুমে এখানে মাছের উৎপাদন হয় ষাট হাজার টন। কী দারুণ আঁশটে গন্ধ। গা যেন ঘুলিয়ে ওঠে। মাছের নামে যেন ঘেন্না ধরে যায়। বাপ্পা আরও এগিয়ে চলে। ওই তো মোহনা। সারি সারি নৌকা বাঁধা আছে সেখানে। লাইকানি নদী এসে মিলিত হয়েছে সমুদ্রে। মাঝিরা অনেকেই স্নান সেরে খেতে বসেছে। কেউ কেউ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবার জন্য তৈরিও হচ্ছে। আর সুবিস্তীর্ণ বালুচরে শয়ে শয়ে লোক বসে জাল বুনে চলেছে আপন মনে। বাপ্পা অনেকক্ষণ ধরে সেই জালবোনা

দেখতে লাগল। অদূরে দ্বীপের মতো একটা স্থানে ঘন ঝাউবনের শোভা দেখল। একজনকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ওই যে জায়গাটা, ওটার নাম কী গো?

ওর নাম শংকরপুর।

ওখানে লোক বাস করে?

নিশ্চয়ই। এখানে সর্বত্রই মানুষ বাস করে। বাঘভালুক এখানে নেই। কী নাম তোমার?

আমার নাম বাপ্পা রায়।

দিঘা বেড়াতে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ।

সঙ্গে কে আছেন?

মামণি, বাপি দু'জনেই আছেন।

না না, এখানে?

এখানে আমি একা।

ও সর্বনাশ। শিগগির পালাও এখান থেকে। সন্ধে হয়ে আসছে। এতখানি পথ চলে এসেছ, ফিরতে যে রাত্রি হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি যাও। আর একটু পরেই ফাঁকা হয়ে যাবে সব।

বাপ্পা গর্বের সঙ্গে বলল, হোক না ফাঁকা। আমি ফাঁকা জায়গাতেও ভয় পাই না।

ওঃ হোঃ। তুমি বুঝছ না কেন খোকা, ভয় না-পেলেও এসব জায়গা ভাল নয়। অনেক রকমের বদ লোক ঘোরাফেরা করে এখানে, তা ছাড়া এই দারুণ শীতে উঁচুনিচু রাস্তায় অন্ধকার হয়ে গেলে তুমি ফিরবে কী করে?

বাপ্পা বলল, বদ লোকই হোক, আর যেই হোক, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না। আমার বাবা কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের একজন নামকরা অফিসার। সবাই ভয় করে আমার বাবাকে।

তা হোক। তবু তুমি যাও। তবে সাবধানে! উঁচু বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে যাবে কিন্তু। কেন না এখন জোয়ার আসার সময় হয়ে গেছে। এ তো তোমাদের গঙ্গার জোয়ার নয়, সমুদ্রের। খুব তাড়াতাড়ি জল চলে আসে।

বাপ্পাও অবশ্য দেরি করল না আর। বিশেষত এই সব শোনার পর কে আর দেরি করে? মোহনা দেখবার শখ ছিল মিটে গেছে। তবে একটা ভুল সে করেছে। এখানে আসবার আগে বাপিকে বা মামণিকে একবার জানিয়ে আসাটা উচিত ছিল তার। এতক্ষণে তাঁরা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছেন। অবশ্য সত্যিকথা বলতে কী, ও যে এখানে আসবে তার তো কোনও ঠিক ছিল না। সে নিজের মনে ঘুরতে ঘুরতেই চলে এসেছে এখানে। বেশ খানিকটা চলে আসার

পর সমুদ্রের খুব সাংঘাতিক রকমের গর্জন শুনতে পেল বাপ্পা। সেই সঙ্গে দেখতে পেল বড় বড় ঢেউয়ের জলোচ্ছ্বাস। এক এক লহমায় সমুদ্র যেন দিঘা সৈকতকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে, এক সময় দিগন্তের বুক থেকে দিনান্তের শেষ রংটুকুও মুছে গেল। ধীরে ধীরে ঘন অন্ধকার গ্রাস করল সৈকত, বালিয়াড়ি ও ঝাউবনকে।

তিন

সেই অন্ধকারে বাপ্পা একাই সাহসে ভর করে এগিয়ে চলল। না-যাওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী? যেভাবেই হোক পৌঁছতে তো হবে? উঁচুনিচু বালিয়াড়িতে অনভ্যস্ত হাঁটাচলার পথ চলতে লাগল বাপ্পা।

একটা টর্চ নেই, কিছু নেই। আপন খেয়ালে চলে এসে এখন বুঝতে পারছে কী ভুলই না করেছে ও।

কনকনে ঠান্ডায় ওর হাত-পা জমে যাচ্ছে যেন।

হঠাৎ ও কী! কী ওটা!

বাপ্পা থমকে দাঁড়াল। দেখল আগুনের গোলার মতো দুটো চোখ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে কী ভীষণ চাহনি। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওর।

বাপ্পা তবু সাহসে ভর করে হাতে তালি দিল একবার। মুখে শব্দ করল 'হ্যাট-হ্যাট'। কিন্তু ফল হল উলটো। ততক্ষণে আরও কয়েকটি ওইরকম জ্বলন্ত চোখ ওর দিকে তাকাল ওই একই ভাবে।

বাপ্পা আর থাকতে পারল না। জোরে চেঁচিয়ে উঠল, কে আছও বাঁচাও।

সঙ্গে সঙ্গে একটা টর্চের আলো সেখানে এসে পড়ল। এবং সেই আলোর সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেল সেই জ্বলন্ত চোখগুলো।

টর্চের আলো ধীরে ধীরে চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে বাপ্পার মুখের ওপর এসে পড়ল। দু'জন লোক টর্চ হাতে কাছে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কে! কে তুমি?

আমি বাপ্পা।

বাপ্পা অন্ধকারে লোকদুটোকে ভাল করে দেখতে পেল না। শুধু বুঝল ওরা ফুলপ্যান্ট আর ফুল হাতা জামার উপর সোয়েটার পরে আছে। ওরা বলল, তোমার বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

কলকাতায়? এখানে এই অন্ধকারে একা তুমি কী করছ?

কিছু করিনি। আমি মোহনা দেখতে গিয়েছিলাম। ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল। এই অন্ধকারে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এমন সময় দেখলুম, আগুনের গোলার মতো কতকগুলো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার খুব ভয় পাচ্ছে এখন। আপনারা আমাকে একটু দিঘার দিকে এগিয়ে দেবেন?

লোকদুটো পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

একজন বলল, ও। তুমিই তা হলে সেই ছেলে! মা-বাবা যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি সেই ফাঁকে ডানা মেলে উড়ে পড়েছ। ওদিকে তোমার মা-বাবার কী অবস্থা তা জান?

কী হয়েছে তাদের?

কী হয়নি সেটাই বলো? অনুমান করো দিকিনি কারও ছেলে হারালে তার মা-বাবার অবস্থা কী হতে পারে? শোনো, তোমার মা ফিট হয়ে পড়ে আছেন। আর বাবা থানা-পুলিশ করে তোলপাড় করছেন চারিদিক। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই ভাবে কেউ আসে?

বাপ্পা করুণ স্বরে বলল, আর কখনও আমি মা-বাবাকে না-বলে কোথাও যাব না। আমাকে আপনারা একটু এগিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন।

লোক দু'জন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা এসো।

বাপ্পা ওদের সঙ্গে কিছুটা পথ এগোবার পর এক সময় ওরা দু'জনেই থামল।

বাপ্পা বলল, কী হল থামলেন যে?

একজন বলল, তোমার বাবা তো পুলিশে কাজ করেন, তাই না?

হ্যাঁ। আমার বাবা গোয়েন্দা পুলিশের একজন বড় অফিসার।

আমরা চিনি তোমার বাবাকে। তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের বিশেষ সদ্‌ভাব নেই। শুধু তোমার বাবার সঙ্গে কেন, কোনও পুলিশের সঙ্গেই সদ্‌ভাব নেই আমাদের।

বাপ্পা অবাক হয়ে বলল, কেন নেই?

সে তুমি বুঝবে না!

কেন বুঝব না? আমি কি বাচ্চা ছেলে? আমার বারো বছর বয়েস। আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি।

আমরা সমাজবিরোধী। তোমার বাবা আমাদের একবার জেলে পাঠিয়েছিলেন, আমরা বহু কষ্টে সেই জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছি।

বেশ করেছেন। আমার বাবার হাতে আইন ছিল, তাই জেলে পুরেছিলেন। আপনাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তাই জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু আমি তো কোনও দোষ করিনি। কাজেই আপনাদের সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। দয়া করে আপনারা আমাকে একটু এগিয়ে দিন।

লোকদুটো তখনও এক পাও না-এগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বাপ্পা বলল, কী হল? যাবেন না? আমার বাপি পুলিশ হতে পারেন। তবুও তিনি মানুষ। তাঁর পথহারানো ছেলেকে আপনারা যদি উদ্ধার করে তাঁর হাতে পৌঁছে দেন, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি সেই উপকারের বিনিময়ে আপনাদের হাতে হাতকড়া পরাবেন না। যদি পরান, তা হলে জেনে রাখবেন বাপির সঙ্গে আর কখনও কথা বলব না আমি। একদিন স্কুল যাবার নাম করে পালিয়ে গিয়ে এমন হারিয়ে যাব যে, আর কখনও বাড়ি ফিরব না।

তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ তাই এই সব কথা বলছ। তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দিলে হয়তো তিনি খুশিই হবেন খুব। কিন্তু তবুও উনি পুলিশ। আমাদের দেখলেই তাঁর মাথার ব্রহ্মতালুতে কর্তব্যবোধটা কড়াং করে উঠবে। পরক্ষণেই হাতে হাতকড়া পরিয়ে আবার শ্রীঘরে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের।

আমি আপনাদের কথা দিলাম যদি আপনারা আমাকে আমার বাপির কাছে পৌঁছে দেন, তবে আমি তাঁর পায়ে ধরে অনুরোধ করব তিনি যেন আপনাদের কিছু না বলেন।

তা না হয় করলে। কিন্তু তোমার ব্যাপার নিয়ে দিঘা এখন পুলিশেপুলিশে ছয়লাপ। এখানকার পুলিশ আমাদের দেখতে পেলে ছাড়বে কেন? আমরা খুব কুখ্যাত লোক। তা কি জান? তবে একটু অপেক্ষা করো, আমরা তোমার ব্যাপারটা নিজেদের ভেতরে একটু আলোচনা করে দেখি কী করা যায়, তোমাকে নিয়ে।

বাপ্পা বলল, যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন। আমার আর তর সইছে না।

লোক দু'জন টর্চ নিভিয়ে সেই অন্ধকারে সিগারেট ধরাল। তারপর বাপ্পার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে ফিস ফিস করে কী সব যেন বলতে লাগল। এত চাপা কথাবার্তা যে বাপ্পা কিছুই বুঝতে পারল না।

এই কনকনে ঠান্ডায় বাপ্পা তখন জমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ব্যাকুল সামুদ্রিক বাতাস জোরে বইতে থাকলে ঝাউবনে ঝাউয়ের ঝালরগুলি সর সর শব্দ করে মাথা দোলাচ্ছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ খুবই দ্রুতগতি। তার মানে জোয়ার আসছে—জোয়ার আসছে—জোয়ার আসছে। বাপ্পা এখন অবশ্য খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ির ওপর আছে। কাজেই সমুদ্রের জল সেখান পর্যন্ত যে এসে পৌঁছবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওই লোক দু'জনের মতলব তো ভাল বলে মনে হচ্ছে না। ওরা কেন ওকে নিয়ে অত আলোচনা করছে? ওরা না যাবে, সেকথা তো বলে দিতেই পারে। বাপ্পা কি একা যেতে পারবে না? এত কী ফিসফিস করার আছে?

বাপ্পা অনেকক্ষণ ধরে কান পাতার পর এবার একটু স্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেল ওদের।

একজন বলল, কী দরকার আবার ওই সব ঝামেলায় জড়াতে যাবার?

অপরজন বলল, এমন মওকা। হাতছাড়া করা উচিত হবে না। প্রতিশোধ নেবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

কিন্তু ছেলেটা তো কোনও দোষ করেনি।

আমার ছেলেটা কী দোষ করেছিল? সেদিন যদি ওই শয়তান আমাকে জেলে না ঢোকাত, তা হলে কি ভেবেছিস ওই ভাবে বেঘোরে মরত আমার ছেলেটা? আমার একমাত্র ছেলেকে আমি যার জন্যে হারিয়েছি, আমি চাই সেও তার ছেলেকে আমার জন্য হারাক। সেদিন যদি আমি জেলে না-যেতাম, তা হলে আমার বউ ছেলে আমার ঘরেই থাকত। না আমার বউ পেটের জ্বালায় ওর বাপের বাড়ি যেতে যাবে, না বাস চাপা পড়ে মরবে। আমি বলে তাই এখনও স্থির আছি। অন্য কেউ হলে হয়তো পাগল হয়ে যেত। পুত্রশোক কী তাই তুই কী বুঝবি? তুই তো বিয়েথা করিসনি, বেশ আছিস।

তাই বলে তুইও কি ওই ছেলেটাকে বিনা দোষে মেরে ফেলবি? ভেবে দেখ, আমাদের এখন সামনে কাঁটা, পিছনেও কাঁটা। একবার যখন দল ছেড়ে এসেছিস তখন আর সেখানে ফেরবার মুখ নেই। বরং ওরাই আমাদের মারবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। আর এদিকে রয়েছে পুলিশের তাড়া। এর ওপর একটা পুলিশের ছেলেকে মার্ডার করলে ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াবে তা বুঝতে পারছিস? তার চেয়ে বরং এইসব ছেড়ে দে। আমরা আসলে যে কাজের জন্যে এখানে ঘুর ঘুর করছি সেই কাজ আগে হাসিল করি। যে ভাবেই হোক আগে সর্দারকে দুনিয়া থেকে সরাই। তারপর অন্য কাজে হাত দেব। এখন এইসব বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে কোনওরকমে যদি আবার অ্যারেস্ট হয়ে যাই তো আমাদের শত্রুরই সুবিধে হবে। মাথায় উঠবে তখন হিস্যা নেওয়া।

বুঝলাম। কিন্তু এই ছেলেটাকে কোনওরকমেই ফিরতে দেওয়া হবে না।

বাপ্পার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম স্রোত নেমে এল। সে বুঝতে পারল এমন পাল্লায় এসে পড়েছে যে, এই মুহূর্তে তার জীবনই বিপন্ন। সে তখন উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে একটু একটু করে অনেকটা দূরে সরে গেল। তারপর ঝাউবনের বাইরে এসেই ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু সেই অন্ধকারে কি ছোটা যায়? পা চলছে না। তবু সে ছুটতে লাগল।

হঠাৎ কোথা থেকে ঘেউ ঘেউ করে কয়েকটা কুকুর তেড়ে এল ওর দিকে।

বাপ্পা ভয়ে চিৎকার করে আরও জোরে ছুটতে গিয়েই পা হড়কে সেই বালিয়াড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল একদম নীচে। কুকুরগুলো সমানে ঘেউ

ঘেউ করে চেঁচাতে লাগল। বালির ওপর থেকে সমস্বরে চিৎকার করতে করতে শয়তান কুকুরগুলোও নেমে আসতে লাগল। কী ভয়ংকর মূর্তিতে তাড়া করে আসছে ওরা। যেন ধরতে পারলে দলবদ্ধভাবে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে।

বালিয়াড়ির ওপর থেকে পড়ে গিয়েই বাপ্পা দেখতে পেল দুটো জোরালো টর্চের আলো চারদিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। অর্থাৎ লোকদুটো খুঁজছে ওকে।

বাপ্পা এখন নিজেকে লুকিয়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরগুলোর জন্যে পারল না। কুকুরগুলো ওকে ভয়ংকর রকমের তাড়া করছে। ওকে দেখেই চিৎকার আর লাফালাফি করছে। কামড়াচ্ছেও না। অথচ ভাবটা এমন যে, পেলে আস্ত গিলে খায়।

বাপ্পা এখান থেকেই আলোকমালায় সজ্জিত দিঘাকে দেখতে পেল। আর একটু ছুটে এগোতে পারলেই দিঘা সৈকতের বোল্ডার ধরে বাঁধানো রাস্তাটায় গিয়ে পৌঁছবে ও। কিন্তু ছুটতে গেলেই যদি কামড়ে দেয় কুকুরগুলো?

এদিকে ওই কুকুরগুলোকে ওইভাবে চেঁচাতে দেখে এদিকের আরও কিছু কুকুর তাদের ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর দিল। তারপর যেই-না ওই কুকুরগুলো ওর দিকে এগোতে যাবে, অমনি শুরু হল কুকুরে কুকুরে প্রচণ্ড খেয়োখেয়ি।

সেই টর্চের আলো তখনও চারদিকে প্রতিফলিত হচ্ছে! ঝাউবন, বালিয়াড়ি, সৈকত ও সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত ঘুরপাক খাচ্ছে আলো। তারপর একসময় ওর ওপরও এসে পড়ল। বাপ্পা বুঝল আর সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই দু'হাতে মুখঢেকে মৃগশিশুর মতো কাঁপতে লাগল সে।

বাপ্পা বুঝতে পারল ওর ওপর টর্চের আলো ফেলে বালিয়াড়ির ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসছে ওরা। এবং যেভাবে নেমে আসছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, এক সাংঘাতিক রকমের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং হত্যালীলা মাথায় খেলছে ওদের।

একথা মনে হতেই বাপ্পা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর মরিয়া হয়ে দৌড় লাগাল সে। দৌড় দৌড় দৌড়, জোরে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল বাপ্পা! অমনি সেই অন্ধকারে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তারপর রোমশ কঠিন একটি বাহু ওকে তুলে নিল অনায়াসে। সে তার হাতদুটো বাপ্পার মুখ এমন ভাবে টিপে রইল যে, ওর আর এতটুকু চিৎকার করবারও ক্ষমতা রইল না।

চার

একটা দোকানে শাঁখা, পুঁতি ইত্যাদির মালা এবং অন্যান্য কিছু জিনিসের দরদাম করছিলেন সুজাতাদেবী। অসমঞ্জবাবুও হাতির দাঁতের কাজ করা একটা ছুরি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল বাপ্পার কথা। তাই তো! ছেলেটা অনেকক্ষণ নেই। কোথায় গেল ছেলেটা? সুজাতাদেবী ডাকলেন, বাপ্পা!

কোথায় বাপ্পা!

অসমঞ্জবাবু বললেন, এদিক ওদিক কোথাও গেছে হয়তো।

সে কী! এমন তো কখনও করে না ও। যাও এগিয়ে গিয়ে একটু দ্যাখো।

অসমঞ্জবাবু সব দিকে নজর দিতে দিতে এগিয়ে গেলেন ঘাটের দিকে! সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলেন বাপ্পা নেই। ডানদিকে-বাঁদিকে সামনে-পিছনে, বাপ্পার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

ঘাটে অন্যান্য আরও অনেক লোক ছিল। সবাই সচকিত হয়ে উঠল এবার। যারা আগে বাপ্পাকে দেখেছিল তারা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তো একটু আগেই এখানে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা।

কেউ বলল, আমি একবার নীচে নামতে দেখলুম বটে। কিন্তু কোনদিকে গেল, তা বলতে পারছি না।

কেউ বলল, বাজারের দিকটা একবার দেখুন তো। ছেলেমানুষ, যদি কিছু মজার জিনিস দেখে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে।

শুরু হল তোলপাড়—তোলপাড়—তোলপাড়। সুজাতাদেবীকে ঘাটে বসিয়ে রেখে অসমঞ্জবাবু ছুটোছুটি করতে লাগলেন। যেদিকে বাপ্পা গিয়েছিল সেদিকেও খানিকটা পথ গিয়ে কোনও হদিস না-পেয়ে ফিরে এলেন। তারপর ডানদিকের পথ ধরে যেখানে ঝাউবন আরও গভীর—আলো ঘন, সেদিকেও কিছুটা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু না। ডানদিক-বাঁদিক চারদিকেই শূন্যতা। কোথাও নেই বাপ্পা।

অন্যান্য ট্যুরিস্টরা যারা বেড়াতে এসেছিল এখানে, তারাও তখন উৎকণ্ঠিত হল। তাদের মধ্য থেকেও কিছু উৎসাহী যুবক দিকে দিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করল।

কিন্তু যে যেদিকে গেল, সে সেদিক থেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। না। কোনওদিকেই বাপ্পা নেই। চোখের সামনে থেকে, এত মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে, ছেলেটা একেবারেই উবে গেল যেন।

ক্রমে দিনের আলো নিভে এল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সুজাতাদেবী ঘাটের সিঁড়িতেই 'উঃ মাগো' বলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন।

অসমঞ্জবাবু একা অসহায়ভাবে কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

স্ত্রীকে দেখবেন? ডাক্তার ডাকবেন? ছেলেকে খুঁজবেন? না, পুলিশে খবর দেবেন, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না তিনি।

চারদিকে ভিড়ে ভিড়।

এ রকম তো কখনও হয়নি। হাজার হাজার ট্যুরিস্ট সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে এখানে যাতায়াত করেন, কিন্তু এমন তো কখনও ঘটেনি। দিঘা অতি নিরুপদ্রব ভদ্র এবং শান্ত জায়গা। বরং এখানকার শান্ত সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে আচমকা ভাটার টানে অথবা হাঙরের আক্রমণে নিখোঁজ হয়েছে অনেকে। যারা শুধুই সমুদ্রের শিকার হয়েছে, পরে অবশ্য তাদের মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা গেছে। সমুদ্র শুধু প্রাণটুকু কেড়ে নিয়েই দেহটিকে পরিত্যক্ত আবর্জনার মতো কিনারে ফেলে দিয়েছে। আসলে দিঘা সৈকতের সৌন্দর্য এবং আতঙ্ক যা কিছুই বলো, তা এই সমুদ্র। কিন্তু তাই বলে সকলের জোড়া জোড়া চোখের সামনে এমন রহস্যময় ছেলে হারানো, সত্যি বলতে কী এই প্রথম।

যাই হোক, অসমঞ্জবাবুর এই অসহায় অবস্থায় কিছুই করতে হল না তাঁকে। দলে দলে কত যে মানুষ এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তাঁর দিকে তার ঠিক নেই।

সুজাতাদেবীর ওই রকম অবস্থা দেখে তারাই গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনল। কয়েকজন মহিলা সুজাতাদেবীর সেবাশুশ্রূষার কাজে লেগে গেলেন। এই ফাঁকা জায়গায় প্রচণ্ড শীত বলে কাছাকাছি একটি বাড়িতে নিয়ে আসা হল সুজাতাদেবীকে। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক অসমঞ্জবাবুকে নিয়ে থানায় গিয়ে রিপোর্টও করালেন।

এখানকার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অসমঞ্জবাবুর পরিচয় পেয়ে সসম্মানে তাঁকে বসতে বললেন। এবং সব কিছু ডায়েরিতে লিখে নিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। আপনার ছেলেকে আমরা খুঁজে বার করবই। অবশ্য সমুদ্রে যদি তলিয়ে গিয়ে না-থাকে এবং অন্য ক্ষতি না হয়ে থাকে, তা হলে ছেলে আপনি পাবেনই। তবে জেনে রাখুন, দিঘায় কোনও ক্রিমিন্যাল নেই। থাকলেও তারা সক্রিয় নয়। কারণ, সমুদ্রের ধারে এখন ট্যুরিস্টের মেলা। সেখানে অত লোকের চোখের সামনে একটা ছেলে সমুদ্রে নামবে, অথচ কেউ দেখবে না, বা একটা ছেলেকে চুরি করে নিয়ে পালাবে কেউ দেখতে পাবে না, তা হয় না। যাই হোক, আপনি হোটেলে যান। আমরা ব্যবস্থা করছি আপনার ছেলেকে উদ্ধার করবার।

অসমঞ্জবাবু বললেন, আমি কি আপনাদের সঙ্গে থাকব?

কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ছেলে নিশ্চয়ই দূরে কোথাও গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে লাইকানির চর, ওদিকে চন্দনেশ্বর

সব তোলপাড় করছি আমরা। এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় আপনি আমাদের অনুসন্ধানের খবর পাবেন।

অসমঞ্জবাবু তখন আর যেন নিজের মধ্যে নিজেই নেই। কেন কে জানে, বার বারই তাঁর মনের মধ্যে কু গাইতে লাগল। আসলে তিনি পুলিশের লোক তো। অভিজ্ঞতাও অনেক। কাজেই বিপদের সম্ভাবনাকে কোনও মতেই অন্যদের মতো উড়িয়ে দিতে পারলেন না।

অসমঞ্জবাবু সকলের সঙ্গে আবার ঘাটের কাছে ফিরে এলেন। তারপর যে বাড়িতে তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে স্ত্রীকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন হোটেলে। আপাতত সুজাতাদেবী একটু সুস্থ হোন। তারপর তিনি নিজেই অনুসন্ধান চালাবেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন একটা অশুভ মেঘের কালো ছায়া হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছে তাঁর ভাগ্যাকাশে।

পাঁচ

পরদিন খুব ভোরে দিঘা আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। রাতের অন্ধকার থেকেই দলে দলে লোক এল সি বিচে সূর্যোদয় দেখবে বলে। চারদিকে শাল, কোট ও সোয়েটারের মেলা। সর্বত্রই চা ও কফির লোভনীয় আয়োজন। সাগরসৈকতে নুলিয়াদের মাছধরা। সে দেখবার মতো দৃশ্য। কিন্তু তবুও গত সন্ধ্যায় এই মনোরম পর্যটনকেন্দ্রে বাপ্পার অন্তর্ধান রহস্য দিঘা সৈকতে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করল। তাই তো! কী হল! কোথায় গেল ছেলেটা? দুর্ঘটনা যে কোনও সময়ে ঘটতে পারে। তাই কিছু ঘটে গেলে মানুষ সন্ত্রস্ত হয় বইকী। সেই নিয়েই আলোচনা সবার মুখে।

নানা লোক নানা কথা বলাবলি করতে লাগল। কেউ বলল, ছেলেটাকে নিশ্চয়ই কেউ গুম করেছে। কেউ বা অন্যরকম আশঙ্কা করল। বলল, পুলিশের ছেলে তো। হয়তো কারও না কারও রাগ আছে ওর বাবার ওপর। তাই দিয়েছে ছেলেটাকে শেষ করে। কিন্তু তাই যদি হবে, অর্থাৎ গুমই যদি করে থাকে, ছেলেটা আস্ত আছে তো? আর মেরে যদি ফেলে তা হলে ডেড বডি কই? কেউ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে লুকিয়ে রাখলে এক্ষেত্রে যা হয় অর্থাৎ অসম্ভব একটা মুক্তিপণ চেয়ে নিশ্চয়ই কোনও চিঠি দিত। কিন্তু তাও কেউ করেনি। তবে কি একা একা সমুদ্রে নামতে গিয়ে হাঙড়ের পেটে গেছে? না হলে গেল কোথায়? কোথায় গেল ছেলেটা?

যাই হোক, অনেকে অনেক মন্তব্যই করল। কিন্তু আসল ঘটনা যে কী, তা কেউ কল্পনাও করতে পারল না।

দিঘার পুলিশ চেষ্টার কোনও কসুর করল না। চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজেও আবিষ্কার করতে পারল না বাপ্পাকে। যেখানে যত পোড়ো বাড়ি ছিল, অস্থান কুস্থান ছিল, সর্বত্র ঢুঁ মেরে দেখল। লঞ্চে করে সমুদ্র তোলপাড় করল। কিন্তু না। কোথাও নেই বাপ্পা।

অবশেষে সকলেই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ছেলেটাকে নিশ্চয়ই কেউ চুরি করে ভিন্ন রাজ্যে নিয়ে গেছে। তবুও বাপ্পার বাবা অসমঞ্জবাবু একজন ঝানু গোয়েন্দা। স্থির সিদ্ধান্তে এসেও তিনি হাল ছাড়লেন না। সূত্রসন্ধানের আশায় এখানকার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই তদন্ত শুরু করলেন।

প্রথমেই বাঁদিকের সি বিচ ধরে এগিয়ে চললেন মোহনার দিকে। ছেলেটা মোহনা দেখতে চেয়েছিল। একা একা সেখানে যেতে গিয়ে কোনও বিপদে পড়েনি তো? কে জানে? চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনি এগিয়ে চললেন।

সোজা রাস্তা ধরে বালিয়াড়ির কোল ঘেঁষে এগোতে গিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এই তো! এই তো পাওয়া গেছে বাপ্পার রিস্টওয়াচটা। তা হলে তো বাপ্পা সমুদ্রের শিকার হয়নি। বাপ্পা তা হলে এদিকে এসেছিল। এবং এদিকে এসেই সে বিপদে পড়েছে। অর্থাৎ সে যে কোনও দুষ্ট লোকের চক্রান্তের বলি হয়েছে, তা বুঝতে একটুও দেরি হল না তাঁর।

তিনি বার বার সন্ধানীদৃষ্টিতে চারদিকের পায়ের ছাপ লক্ষ করতে লাগলেন। আরও কিছু সূত্র পাবার আশায় উৎসুক হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু না। এখানে পায়ের ছাপ এত বেশি যে, সব গোলমাল হয়ে গেল।

এখানেই বালিয়াড়ির মধ্যে একটা ধসের চিহ্নও দেখলেন অসমঞ্জবাবু। আর ঠিক তার নীচেই ওই রিস্টওয়াচ। অর্থাৎ বোঝা গেল ওই বালিয়াড়ির ওপর থেকে যেভাবেই হোক হড়কে পড়ে গেছে ও।

অসমঞ্জবাবু ভাবলেন, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে বাপ্পা কোনও কারণে ওখান থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় কারও আশ্রয়ে আছে? অবশ্য একথা মনে এলেও এর স্বপক্ষে কোনও যুক্তি খুঁজে পেলেন না। কেন না তাই যদি হবে, তা হলে এতক্ষণে তারা তো নিশ্চয়ই জানাবে পুলিশকে। অথবা হাসপাতালে ভরতি করবে।

অসমঞ্জবাবুর মাথার ভেতর ঝিমঝিম করতে লাগল।

তা হলে সত্যিই কি তাঁর ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য কেউ নিয়ে গেছে ছেলেটাকে? তাঁর ওই একমাত্র সন্তান। কত আদরযত্নে তাকে তিনি বড় করে তুলছেন। কত স্বপ্ন ছিল ওই ছেলেটিকে ঘিরে। সব জাল যেন ছিঁড়ে গেল। এতটুকু আঘাত যে সহ্য করতে পারে না, দুর্বৃত্তরা হয়তো তার ওপর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। আহা রে। বাপ্পা কি পারবে অত নির্যাতন সহ্য করতে?

হয়তো মরেই যাবে ছেলেটা। অসমঞ্জবাবুর চোখদুটি জলে ভরে উঠল। রুমালের খুঁট দিয়ে সে জল মুছে নিলেন তিনি।

তবুও তিনি বালিয়াড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখলেন, এক জায়গায় কয়েকটি আধপোড়া সিগারেট পড়ে আছে। তার পাশেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আর একটি সূত্র। অর্থাৎ একটি রুমাল। মানে এটা পেতে কেউ এখানে বসেছিল। কিন্তু উঠে যাবার সময় নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। এ নিশ্চয়ই কোনও ভদ্রলোকের রুমাল নয়। না হলে এত জায়গা থাকতে এইখানে এসে কোন ভালমানুষ বসতে যাবে? যাই হোক, রুমালটা কাজে লাগবে।

তারপর আরও একটু এগোতেই দেখতে পেলেন একটি গাছের গায়ে আঁচড় কাটা বাপ্পার নাম।

অসমঞ্জবাবুর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল।

বাপ্পার এখানে আসার সবরকম অস্তিত্বই তো আছে। শুধু বাপ্পাই নেই। এখানকার আকাশ-বাতাস, ঝাউবন, সমুদ্র সবাই সব কিছুই দেখেছে, কিন্তু এরা তো মূক। তাই কিছু বলতে পারছে না। শুধু অসহায়ভাবে তার সেই পদচিহ্নের স্মৃতিটুকু বুকে করে ধরে রেখেছে! আর এঁকে রাখা স্বাক্ষরকে চোখের সামনে মেলে ধরেছে।

অসমঞ্জবাবু আরও এগিয়ে চললেন। ওই দেখা যায় মোহনা। বাপ্পা ওখানেও গিয়েছিল নিশ্চয়ই। লাইকানি নদী যেখানে সাগরের সঙ্গে মিশেছে, সেইখানে এসে থামলেন। মোহনায় তখন নুলিয়া ও জেলেদের ভিড়। তারা বলল, আমরা তো কিছুই বলতে পারব না বাবু। কাল সন্ধ্যায় যারা এখানে ছিল তারা এখন সাগরে। আর আমরা যারা সাগরে ছিলাম, আজ এই সকালে আমরা লাইকানির চরে।

অবশেষে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন বুড়ো মাঝি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল ঠিক ভর সন্ধেবেলায় একটি ছেলে এখানে এসেছিল। তবে কিনা তাকে তো এখানে বেশিক্ষণ থাকতে দেওয়া হয়নি। বুঝিয়েবাঝিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অসমঞ্জবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নাঃ। আর কোনও সূত্র নেই। এখান থেকে ফিরে যাবার সময়ই বাপ্পা দুর্বৃত্তদের নজরে পড়ে। তারপর ওর নিয়তি ওকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানেই গেছে ও।

ছয়

এদিকে স্থানীয় পুলিশ তো বিভিন্ন সূত্র ধরে চারদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত শুরু করল। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে চলল জোর তল্লাশি। অসমঞ্জবাবু নিজে একজন গোয়েন্দা হয়েও ঘটনাটা কীভাবে কী ঘটে গেল তার বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারলেন না। অবশ্য দোষও নেই। একদিকে স্ত্রীর ওই অবস্থা, অন্যদিকে নিজেও পুত্রশোকাতুর। যত বেশি ভাবেন, যত বেশি চিন্তা করেন, ততই হতাশ হন। সাধারণ বুদ্ধিমত্তাও যেন হারিয়ে ফেলেন মাঝে মাঝে।

বাপ্পার অন্তর্ধান রহস্য তাঁকে একদিকে যেমন ভাবিয়ে তুলল, অপরদিকে তেমনি বিস্মিতও করল। কেন না এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, বাপ্পার বেলায় তা হল না। ছেলেটাকে নিয়ে যাবার পর এতখানি সময় পার হয়ে গেল, অথচ ছেলেটার মুক্তিপণ দাবি করে কেউ কোনও চাপ সৃষ্টি করল না। বিশেষ করে ছেলেটা যখন টাকা-পয়সা বা সোনার গয়না নয় যে, একবার হারিয়ে গেলে আর ফেরত আসবে না। আসলে ছেলেটা তো ছেলেই। কাজেই ছেলেটাকে যদি কেউ অপহরণ করে থাকে, তা হলে তাকে আটকে রেখে অসম্ভব রকমের কোনও একটা প্রস্তাব নিয়ে কেউ-না-কেউ চিঠিপত্তর দেবেই। কিন্তু না। এক্ষেত্রে তা হল না। কোনও দাবিদারই এগিয়ে এল না তার সীমাহীন কোনও চাহিদা নিয়ে।

অসমঞ্জবাবুকে এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি পীড়া দিল। বাপ্পাকে কিডন্যাপ করে কেউ যদি তার কোনও দাবি পেশ না-করে, তা হলে কী উদ্দেশ্যে এবং কী কারণে নিয়ে গেল ছেলেটাকে? ওকে হত্যা করাও যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলেও তো এতক্ষণে ওর লাশ কোথাও-না-কোথাও পাওয়া যেত। এইসব নানারকম চিন্তা-ভাবনার ঢেউ মাথার মধ্যে খেলতে লাগল অসমঞ্জবাবুর। কিন্তু তবুও তিনি নিজে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না।

অসমঞ্জবাবু পুলিশের লোক হয়েও মনে মনে ঠিক করেছিলেন বাপ্পার মুক্তিপণ চেয়ে কেউ যদি কোনও অসম্ভব রকমের কিছু চেয়েও বসে, তবে তা দিতেও তিনি পিছপা হবেন না। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না-করে দুর্বৃত্তদের হাতে যথাসর্বস্ব তুলে দিতেও তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। কিন্তু কই? সেরকম সম্ভাবনা নিয়েও কেউ তো এল না? তবে কি ছেলেটা আদৌ অপহৃত হয়নি? তবে কি থানা-পুলিশ নিয়ে বড্ড বেশি ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেছে বলে কেউ আসতে চাইছে না? কিন্তু আসবে তো উড়োচিঠি। তাই বা আসছে না কেন?

ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হল।

অসমঞ্জবাবুর চোখদুটি ভরে উঠল জলে। কতরকম ভাবতে লাগলেন তিনি। মনে মনে ঠিক করলেন, একবার—শুধু একবার যদি বাপ্পাকে ফিরে পান, তা হলে

পুলিশের চাকরিতে আর নয়। তাঁর তো টাকা-পয়সার অভাব নেই। পৈত্রিক সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কের টাকা যা আছে, তাতে চাকরি না-করলেও চলে যাবে তাঁর। দেওঘর, গিরিডি কিংবা ঘাটশিলার কোনও নির্জন পরিবেশে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করবেন। কলকাতার ওই বিষাক্ত পরিবেশে আর নয়। তবে কিনা এ সবই অবাস্তব চিন্তা। আসলে যার জন্য এত চিন্তা-ভাবনা সে কই? কোথায় বাপ্পা? বাপ্পাকে কি আর কখনও ফিরে পাবেন? সে কি সত্যি বেঁচে আছে?

দূরাগত মোটর বাইকের শব্দে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল অসমঞ্জবাবুর।

এখানকার একজন দুঁদে পুলিশ অফিসার মি. কাঞ্জিলাল এসে হাজির হলেন। তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত মনে হল।

অসমঞ্জবাবু আশান্বিত হয়ে বললেন, কোনও খবর আছে?

আপনাকে এখনই একবার থানায় যেতে হবে স্যার।

কেন? কোনও হদিস-টদিস পাওয়া গেল?

একবার থানায় আসুন।

অসমঞ্জবাবু অশুভ চিন্তায় থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, কেন? ছেলেটার ডেড বডি দেখতে?

না না। সেসব কিছু নয়। তবে সন্দেহভাজন একজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এবং এ লোকটা এক দাগি আসামি।

অসমঞ্জবাবু হতাশ হয়ে বললেন, তাতে আর লাভ কী? ওকে মোচড় দিলে কি আমার ছেলের খোঁজ পাওয়া যাবে?

লাভ আছে বইকী। আমার মনে হয় একে মোচড় দিলেও কিছু বেরোবে। কেন না এ সেই রুমালের মালিক। ইতিপূর্বে দু'-একটা ছেলেচুরির কেসেও জড়িত ছিল। এবং ও একজন জেল পলাতক কয়েদি।

অসমঞ্জবাবু সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কী বললেন? এ সেই রুমালের মালিক? মানে, যে রুমালটা আমি সকালে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম?

হ্যাঁ।

কী করে ধরলেন ওকে?

ধরেছি। ওর এক সঙ্গীও আছে। তাকেও ধরবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না।

অসমঞ্জবাবুর একটু আগের স্নায়বিক দুর্বলতা কেটে গেল। এখন আবার উনি সেই পুলিশ। তাঁর পুলিশিরক্ত টগবগিয়ে উঠল। শিরদাঁড়া টান-টান করে বললেন, কান যখন হাতের মুঠোয়, মাথাও তখন নাগালের মধ্যে। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব ওর। চলুন তো। কিন্তু আমার ছেলের ব্যাপারে কিছু বলেছে কি?

ওই জন্যেই তো ছুটে এলাম আপনার কাছে। ও বলছে, যা বলবার তা নাকি আপনাকেই বলবে।

তার মানে ও কিছু জানে।

সুজাতাদেবী তখনও শয্যাশায়ী ছিলেন। বললেন, দ্যাখো ওকে যেন আগেই তোমরা মারধর করে বসো না। ও যদি আমার বাপ্পার কোনও খোঁজখবর দিতে পারে, তা হলে ওকে কিচ্ছু বলো না তুমি। লক্ষ্মীটি এবারের মতো ওকে ক্ষমা করো।

অসমঞ্জবাবু সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে মি. কাঞ্জিলালের বাইকেই থানায় এসে হাজির হলেন।

ধৃত বন্দি যুবকের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন অসমঞ্জবাবু। সর্বনাশ! ছেলেটা এদের খপ্পরে পড়েছে নাকি? বহুদিনের পুরনো এবং কুখ্যাত এক দাগি আসামি। কোনও এক কিশোরী হত্যা-মামলায় অ্যারেস্ট হয়েছিল লোকটা। বিচারে দশ বছরের জেল হয়। জেলে গিয়েও মাস ছয়েকের মধ্যে সেখানকার রক্ষীকে মেরে পলাতক হয় ও। ওর এক বন্ধুও আছে। তাকেও ধরেছিলেন। উপযুক্ত সবরকম প্রমাণ লোপ পাওয়ায় সে-যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল লোকটা, কিন্তু পরবর্তী সময়ে একটা রাহাজানি কেসে ধরা পড়ে ওই একই জেলে দু'জনে মিলিত হয়। এরপরই জেল পালানোর ওই ঘটনা ঘটে।

অসমঞ্জবাবু ধৃতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কীরে! চিনতে পারছিস?

ধৃত লোকটি কোনওরকমে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করল। তারপর বলল, পারছি বইকী।

শেষকালে আমার ঘরে হাত দিতে এসেছিস তোরা? সাহস তো কম নয়।

লোকটি নীরব।

তোর নামটা কিন্তু ভুলে গেছি।

আমার নাম রূপেন।

তোর সেই বন্ধুটা।

ওর নাম সুখেন।

হুঁ। তা ছেলেটাকে কোথায় রেখেছিস?

ভগবান যেখানে রেখেছেন। আমরা কোথাও রাখিনি তাকে।

অসমঞ্জবাবু জুতোসুদ্ধু পায়ে ওর পেটে সজোরে একটা লাথি মারলেন।

লোকটার হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল। তাই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

অসমঞ্জবাবু ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে দাঁড় করালেন ওকে, বল শিগগির। না হলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব একেবারে।

আপনি বিশ্বাস করুন স্যার। সত্যি বলছি। বাবা চন্দনেশ্বরের দিব্যি আমি কিছুই জানি না।

কিছুই জানিস না যদি তো আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিস কেন?

জানতিস না বুঝি আমরা দু'জনে মুখোমুখি হলে এইরকম ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটবে? বলেই শক্ত রুলের বাড়ি এক ঘা।

রূপেন যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বলল, আপনি বিশ্বাস করবেন না জানি, তবুও বলি আপনার ছেলেকে আমরা ধরিনি। কেনই বা ধরব? তার ওপরে তো আমাদের কোনও রাগ নেই।

নাই বা রইল। আমার ওপরে তো আছে?

তা আছে। তবে এই মুহূর্তে আর নেই।

এমন ঝাড় খাওয়ার পরেও না?

না। আসলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি অন্য কারণে। আপনার ছেলের ব্যাপারে একটু কথা বলতে এসেছিলাম।

আমার ছেলের ব্যাপারে! কী কথা?

আপনার ছেলেটাকে আমরা দেখেছিলাম।

কখন?

কাল সন্ধ্যায়। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন। সেই অন্ধকারে। ও মোহনার দিক থেকে আসছিল। এমন সময় আমাদের সঙ্গে দ্যাখা। আমরা দু'জনেই ছিলাম তখন। মানে আমার বন্ধু সুখেনও ছিল। ও-ই প্রস্তাব দিয়েছিল ছেলেটাকে গুম করবার। ও চেয়েছিল ওকে হত্যা করতে। এবং ওকে হত্যা করে আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে। যদিও আমি তাতে রাজি হইনি এবং সে কাজ ওকে করতেও দিতাম না। তবুও আমরা যখন এইসব আলোচনা করছি তেমন সময় হঠাৎ দেখি ছেলেটা নেই।

সে কী!

সম্ভবত আমাদের কথাবার্তা ও শুনতে পায় এবং তাতেই ভয় পেয়ে পালায়। ওকে পালাতে দেখে আমরাও ধরবার জন্য ছুটলাম। এমন সময় হঠাৎ কয়েকটা কুকুর ওকে তাড়া করে।

অসমঞ্জবাবু সশঙ্কিত হয়ে বললেন, সে কী! কুকুরগুলো ওকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়নি তো?

মনে হয় না। তা হলে ছেলেটা চেঁচাত। যাই হোক, আমরা যখন ছেলেটাকে কুকুরের হাত থেকে বাঁচাব বলে ছুটে গেলাম তখন দেখি, ছেলেটা ম্যাজিকের মতো হাওয়া হয়ে গেল। পরক্ষণেই একটা মোটর বাইকের শব্দ। আমরা বুঝলাম কেউ ওকে নিয়ে গেল।

অসমঞ্জবাবু বললেন, তা হলে কাল রাতেই তোরা এসে খবর দিসনি কেন আমাকে?

কেন দেব? আমরা যখন অপহরণ করিনি তখন কেন আমরা নিজেদের জড়াতে যাব? আমরা জেল পলাতক কয়েদি। দাগি আসামি। আমরা কিছু বললেও কি আপনারা বিশ্বাস করতেন? পরে অবশ্য ভেবে দেখলাম কাজটা আমরা ঠিক করিনি।

অসমঞ্জবাবু দু'হাতে নিজের মাথার চুলগুলো মুঠো করে বললেন, ওফ্। আজ যদি তুই ধরা না-পড়তিস, তা হলে এসব কথা তো জানতেই পারতাম না আমি।

ধরা আমি পড়িনি স্যার। কাল সারা রাত ধরে দু'বন্ধুতে যুক্তি করে আজ আমি নিজেই এসে ধরা দিয়েছি। না হলে আমাদের ধরবে কে? এইসব পুলিশ?

তুই নিজে এসে ধরা দিয়েছিস?

হ্যাঁ। আপনাদের কাছে ভাল প্রস্তাব নিয়ে আসারও পুরস্কার তো হাতেনাতে পেয়ে গেলাম। থানার কাছাকাছি যেই-না এসেছি, অমনি আপনাদের লোকেরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল। সবাই ধরে নিল, আমি বোধহয় ছেলেটাকে আটকে রেখে তার মুক্তিপণ চাইতে এসেছি। কিন্তু এটুকু বুদ্ধি কারও ঘটে নেই যে, মুক্তিপণ চাইতে আমি থানায় আসব কেন?

অসমঞ্জবাবু বললেন, তুই তা হলে কী জন্যে এসেছিস?

যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন তা হলে বলি। আপনার ছেলের চুরির ব্যাপারে আমি আপনাকে একটু সাহায্য করতে চাই। এবং সেই জন্যেই এখানে এসেছি। তবে একটু ভুল হল, এখানে না-এসে যদি আপনার হোটেলটা খোঁজ করে সেখানে দেখা করতাম তা হলে এইসব পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন হতাম না। যাক, যেজন্যে আসা সেই কথাই বলি। আমরা দু'বন্ধুই এখন খুব একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে আছি।

কেন, কী হল?

আমরা যে কোনওকারণেই হোক আমাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছি এবং দল থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের মতো ক্রিমিন্যাল দল থেকে বেরিয়ে এলে আমাদের পরিণাম কী হতে পারে, তা অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়ই?

ওরা তোদের মারবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এই তো?

হ্যাঁ! এবং আমরাও ওদের মারবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি। কাল রাতে ওই নির্জনে সেই ব্যাপারেই আলোচনা করছিলাম আমরা। এমন সময় আপনার ছেলের সঙ্গে আমাদের দ্যাখা হয়। স্যার, আমাদের চোখের সামনে থেকে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে এমন ক্রিমিন্যাল এ অঞ্চলে নেই। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের গতিবিধির ওপর কেউ নজর রাখছিল এবং আমাদের জালে জড়াবে বলে বা অন্য কোনও মতলবে ছেলেটাকে ওই নজরদাররাই চুরি করে। এটা আমাদের মূল কেন্দ্রের কাজ।

অসমঞ্জবাবু বললেন, যদি তাই হয়, তা হলে তোরা কি পারবি আমার ছেলেকে ওদের খপ্পর থেকে বার করে আনতে?

আপনার সাহায্য পেলে পারব। বিশ্বাস করুন, এই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ির খেলা আর ভাল লাগছে না। আমাদের হয়েছে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। একদিকে পুলিশের তাড়া, অন্যদিকে আততায়ীর বুলেট। এইভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ আছে কিছু? আমার বন্ধু সুখেন, সে তার একমাত্র পুত্রকে হারানোর জন্য আপনাকেই নিমিত্ত বলে মনে করে। কিন্তু পুত্রশোক যে কী জিনিস তা তো সে জানে। তাই অনেক বুঝিয়ে তারও মনের পরিবর্তন ঘটিয়েছি। সেও আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায় না। মোট কথা এখন আমরা দু'জনেই আইনের আওতায় আসতে চাই। আপনি আমাদের জেলে ঢোকান, প্রাণে মারুন, যা ইচ্ছে করুন, শুধু যারা আমাদের এই পথে নিয়ে এসেছে, দুনিয়া থেকে বরাবরের জন্যে চলে যাবার আগে তাদের সঙ্গে লড়বার একটা সুযোগ করে দিন। আশা করি আপনার ছেলে আমরাই উদ্ধার করতে পারব।

তোমাদের কি দৃঢ় বিশ্বাস ওরাই এ কাজ করেছে?

হ্যাঁ।

বেশ। আমি তোমাদের বিশ্বাস করলাম। বলে একজন সার্জেন্টকে বললেন, লোকটার হাতকড়া খুলে দিতে বলুন তো।

একজন এসে বন্ধনমুক্ত করল রূপেনকে।

রূপেন অসমঞ্জবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, একদিন আমরাও ভদ্রঘরের ছেলে ছিলাম স্যার। কর্মদোষে এবং ভাগ্যদোষে আজ ক্রিমিন্যাল হয়েছি। যাই হোক, আমরা কসম খেয়েছি আর কখনও খারাপ কাজ করব না। এতে অবশ্য আইনের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব না। তবুও ভাল হবার চেষ্টা করে আগেকার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করব। তবে আমাদের শত্রুদের বিনাশ ঘটাবই। ওদের মর্জিমাফিক আর কোনও খারাপ কাজ করতে আমরা চাইনি বলেই ওদের দলচ্যুত হয়েছি। খারাপ কাজ আর করব না বলেই দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেও পালটা দল আর গড়িনি। শুধু ওদের শেষ করে নিজেরাই গিয়ে জেলে ঢুকব এই প্রতিজ্ঞা করেছি।

অসমঞ্জবাবু একটা চেয়ারে বসে বারবার দু'হাতে মাথার চুলগুলো অকারণেই মুঠো করে ধরতে লাগলেন।

রূপেন বলল, অত ভেঙে পড়বেন না স্যার। আমরা আছি আপনার পিছনে। আমাদের আগেকার অপরাধের জন্য যা শাস্তি হয় দেবেন। মাথা পেতে নেব। এখন শুধু আপনার ছেলেকে উদ্ধার করে আনার মতো একটা ভাল কাজের সুযোগ করে দিন।

তোমার ওই একই কথা বারবার বলার আর দরকার নেই। এখন কীভাবে কী করতে চাও তাই বলো। কেন না আমার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তবে না-বুঝে তোমাকে মারধর করেছি বলে দুঃখিত।

হ্যাঁ। আমরা কী ভাবে কী করতে চাই তা সবই আপনাকে বলব। আমার বন্ধু রূপেন একটি গোপন স্থানে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আমি আগে একবার তার কাছে যাব। তারপর সন্ধের সময় চলে যাব আপনার হোটেলে। আপনি কোন হোটেলে আছেন স্যার?

হোটেল সুন্দরম।

ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে যোগাযোগগুলো আমরা খুবই গোপনে করতে চাই। যাতে ওরা বুঝতে না-পারে যে, আমরা আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করছি।

অসমঞ্জবাবু বললেন, যারা তোমাদের এত বেশি নজরে রাখছে তারা কি মনে করো এত কাঁচা লোক যে তুমি থানায় এসে নিজেই ধরা দিয়েছ, অথবা ধরা পড়েছ এ খবর তারা পায়নি? বিশেষ করে জেনে রেখো তুমি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সতর্ক হয়ে গেছে। কেন না ওরা জানে তোমরা দু'বন্ধুই এখন ওদের শত্রু। অর্থাৎ তোমরা ধরা পড়লে স্বেচ্ছাতেই ওদের সব কথা পুলিশকে বলে দেবে। তবু বলছ যখন তখন যতটা সাবধান হওয়া দরকার ততটা সাবধান হয়েই কাজ করে যাবে।

আমি এখন একবার সুখেনের কাছে যেতে চাই। ঠিক সন্ধের সময় দেখা করব আপনার সঙ্গে।

কোরো। ছেলে উদ্ধার হোক না-হোক ওদের গ্যাংটাকে তো ধরতে পারব। এটাও আমার কর্তব্য।

রূপেন চলে গেলে অন্যান্য পুলিশের লোকেরা বলল, এ কী করলেন স্যার! একটা বর্ন ক্রিমিন্যালকে আপনি এইভাবে ছেড়ে দিলেন? ও তো রীতিমতো নকশা মেরে বেরিয়ে গেল। ও কি সন্ধের পর আপনার সঙ্গে সত্যি সত্যিই দেখা করবে ভেবেছেন?

করতেও তো পারে। দেখাই যাক না একবার একটু সুযোগ দিয়ে। বিশেষ করে ও যখন এসেছিল দেখা করতে।

অসমঞ্জবাবু আর বসলেন না। থানা থেকে বেরিয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলেন। কিন্তু এ কী! দরজায় তালা দেওয়া কেন?

বেয়ারা বলল, মা তো একটু আগেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটরে চেপে চলে গেলেন।

কোথায়?

খোকাবাবুকে আনতে।

তার মানে?

কেন বাবু, শুনলাম যে খোকাবাবুকে পাওয়া গেছে। আপনিই তো থানা থেকে লোক দিয়ে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন!

সে কী!

হ্যাঁ। উনি তো তাই বললেন।

অসমঞ্জবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এই মুহূর্তে নিজেকে তাঁর অত্যন্ত বোকা এবং অসহায় বলে মনে হল।

সাত

'চিৎ ইয়া পৎ...হু র্ র্ র্ ইয়াঃ। খোদা যিসকো দেগা উসকো ছপ্পর ভরকে দেগা, যিসকো নেহি দেগা উসকো রোনা মাৎ। লা ইলাহা ইল্লিল্লা ইল্লা রসুল্লাহা।' বলেই আর্চ করার ভঙ্গিতে একটা ডিগবাজি খেয়ে শিরদাঁড়া টন করে বল্লমটা ওপরে তুলে আবার চিৎকার করে উঠল, আল্লা হো আকবর্ র্ র্। খোদা বড়ি মেহেরবান।

দিঘা সৈকতে ভ্রাম্যমাণ জনতার উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে আবার বলল, যো চলা যায়েগা, ও কভি নেহি আপস আয়েগা। যো আয়েগা ও জিয়েগা নেহি। জিয়েগা তো জিন্দগিভর জিয়েগা, নেহি জিয়েগা তো ক্যা কিয়েগা? দুর্গামায়ী বাচাকা রাখ্কা, দুর্গামায়ী বাচাকা রাখ্কা। সীতারাম ঝটপট। যার কাছে যা কিছু আছে চটপট দিয়ে দিন। সীতারাম ঝটপট কব্ তক্ খাড়া রহেগা? বলেই হাত পেতে ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল।

লোকটার যে কী জাত, তা কেউ জানে না। হিন্দু না মুসলিম না খ্রিস্টান, তাও জানে না কেউ। কী যে ওর ভাষা তাও তো রহস্যময়। মুখে বলবে সীতারাম ঝটপট। নাম জিজ্ঞেস করলে বলবে, আমার নাম অ্যান্টনি। শ্রীমান অ্যান্টনি ধিড়িঙ্গি। বোঝ। একটা আধবুড়ো লোক নামের আগে শ্রীমান বলবে, সারনেম বলবে ধিড়িঙ্গি। ধিড়িঙ্গি কি কারও পদবি হয়? কে জানে? কেউ বলে ছিটিয়াল, কেউ বলে পাগল, কেউ বলে বহুরূপী, কেউ বলে গুপ্তচর। আবার কেউ বা বলে বদের ধাড়ি। বেশটি করে ধরে চাব্কালে তবে গায়ের রাগ যায়। কিন্তু যে যাই বলুক ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এই লোকটি অত্যন্ত আদরের। ওকে আসতে দেখলে ছোটদের আনন্দের আর অবধি থাকে না। লোকটি হাত পেতে পয়সা নিতে নিতে ভিড় ঠেলে বাজারের দিকে এগিয়ে চলল।

এমন সময় কে যেন একজন ভিড়ের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, হেই

ব্রেনলেশ সীতারাম অ্যান্টনি! এই পাগলা! হোয়ার আর ইউ গোয়িং?

লোকটি ঘুরে তাকিয়েই রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল,

আমার নাম অ্যান্টনি ধিড়িঙ্গি
নইকো ট্যাঁস্ নই ফিরিঙ্গি,
যে আমায় পাগল বলবে—
তার কথায় কি দুনিয়া চলবে?
কিসিসে দোস্তি কভি তো নয়
ইউ আর অল শূকর-তনয়।

যে লোকটি ভিড়ের ভেতর থেকে অ্যান্টনিকে পাগলা বলে ডেকেছিল, এখন গালাগালি খেয়ে লোকটি ছুটে এসে আক্রমণ করল ওকে। অ্যান্টনির গালে একটা চড় মেরে বলল, তুই আমায় গালাগালি দিলি কেন?

অ্যান্টনিও আক্রমণের জবাবে লোকটিকে পালটা আক্রমণ করে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলল। এবার চলল দু'জনের ধুলোয় লুটোপুটি। লোকটির চোয়াল এক হাতে শক্ত করে টিপে অ্যান্টনি বলল, তোদের যার যা ইচ্ছে সে তাই বলে যাবি আর আমি মুখবুজে সহ্য করে যাব দিনের পর দিন তাই না?

গোলমাল আরও গড়াত। স্থানীয় কিছু লোকজন এসে ছাড়িয়ে দিল তাই রক্ষে। যে লোকটিকে অ্যান্টনি ধরাশায়ী করেছিল সে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে অ্যান্টনিকে গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল।

অ্যান্টনিও হাতের বল্লমটা একবার শূন্যে নিক্ষেপ করে পরক্ষণেই সেটাকে লুফে নিয়ে সুর করে বলল, ল্যাংড়া-খোঁড়া নাচার বাবা মুঝে এক পয়সা দো...।

অসমঞ্জবাবুর এমন দুঃখের দিনেও হাসি পেল। এতক্ষণ স্ত্রীর খোঁজে পথে বেরিয়ে লোকটির কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। এবার সঙ্গের সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসারকে বললেন, এ লোকটি কে বলুন তো?

তা জানি না। তবে লোকটি অনেকদিন ধরেই এখানে আছে।

কতদিন?

এই ধরুন বছর পনেরো।

থাকে কোথায়।

এর কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু সেখানে। ভিক্ষে করে যা পয়সা পায় তাতেই কোনওরকমে দিন কাটায়।

লোকটাকে একটু নজরে রাখবেন।

কেন স্যার, ও আমাদের পরিচিত। কোনও সন্দেহভাজন কেউ নয়। দিঘা ছেড়ে বড় একটা যায়ও না কোথাও।

ওই লোকটাকে চিৎ করে ফেলে ওর বুকে ওঠার টেকনিক দেখলেন? অসীম

শক্তি ওর দেহে। লক্ষণ ভাল বুঝছি না। এইসব পাগল-ছাগল মার্কা লোকেরাই অনেক সময় বিভিন্ন দলের হয়ে কাজ করে। তাই বলছি ওর গতিবিধির ওপর একটু নজর রাখবেন।

অসমঞ্জবাবু কথা বলতে বলতেই একটা সিগারেট ধরালেন। এমন সময় দু'জন সার্জেন্ট এসে নমস্কার জানিয়ে বলল, না স্যার। কোনও হদিসই পাওয়া গেল না। তবে আপনার হোটেলের বেয়ারা যে রকম গাড়ির কথা বলছে, ওই রকম একটি গাড়িকে অবশ্য কিয়াগেড়িয়া চেকপোস্টে দেখা গেছে। সেটি এখন সীমান্তের ওপারে। ওড়িশার পুলিশকে আমরা নজর রাখতে বলেছি। তবে ওরা যদি একটু তৎপর হয় তো একটা বিহিত হতে পারে।

অসমঞ্জবাবু বললেন, হুম। ওদের আর কখনও ফিরে পাব এমন আশা আমি মনের মধ্যে রাখি না, তবুও বলি এখানকার সমস্ত নামকরা ক্রিমিন্যালগুলোকে এক এক করে অ্যারেস্ট করুন এবং তাদের মুখ থেকে কথা বার করার চেষ্টা করুন।

সে কাজ অনেক আগেই শুরু করে দিয়েছি আমরা। এবং কয়েকজনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদও চলছে।

অসমঞ্জবাবুর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। একসঙ্গে স্ত্রী-পুত্র দু'জনকেই হারালেন তিনি। সুজাতাদেবী যে কার সঙ্গে কোথায় গেলেন, বা যেতে পারেন, তা কিছুতেই অনুমান করতে পারলেন না। এবং এখনও পর্যন্ত যখন তাঁর ফিরে আসার কোনও খবর নেই, তখন ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, তাঁকেও অপহরণ করা হয়েছে।

এ খবরও চাপা রইল না। বাতাসের আগে দিঘার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আবার হই হই পড়ে গেল চারদিকে।

এরই মধ্যে সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্ত হল। অসমঞ্জবাবু সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়েই আবার হোটেলে ফিরে এলেন। এখন বার বারই তাঁর মনে হতে লাগল সেই কুখ্যাত গুন্ডা রূপেনকে ছেড়ে দিয়ে সত্যিই তিনি কোনও ভুল করলেন কি না? এটা কি ওদের কোনও নাটকীয় চাল? দেখাই যাক। লোকটার তো সন্ধের পর আসবার কথা আছে। যদি না আসে তা হলে ধরে নিতে হবে এ ওদেরই কাজ। এবং তখন তাঁর নিজের ভুলের মাশুল নিজেকেই দিতে হবে।

রূপেন যেরকম কথা দিয়েছিল, ঠিক সেইরকম সময়েই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে এল। অবশ্য ও একা নয়। সঙ্গে সুখেনও।

অসমঞ্জবাবুর তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবস্থা। ওদের দু'জনকে দেখেই জলমগ্ন

ব্যক্তি যেমন হাতের কাছে কোনও কিছু পেলে তাই ধরে ওঠবার চেষ্টা করে, ঠিক সেইভাবেই ওদের দু'জনকে চেপে ধরলেন। দু'জনের দুটি হাত ধরে বললেন, আমি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। একমাত্র তোমরাই পারবে আমার স্ত্রী-পুত্রকে উদ্ধার করতে। কেন না তোমরা চিরকাল অসৎ পথে ছিলে। তাই খারাপ লোকেদের গোপন ঘাঁটিগুলো তোমাদের অজানা নয়। তোমরা চারদিক ঢুঁড়ে ফেলো। আমি আমার পুলিশবাহিনী দিয়ে যতদূর পারব সাহায্য করব। তা ছাড়া আমি নিজে তো চেষ্টা করবই। যেভাবেই হোক জীবিত অথবা মৃত ওদের উদ্ধার করতেই হবে।

রূপেন বলল, ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় স্যার। কেন না আমাদের ধারণা আপনার ছেলেকে অপহরণ করার উদ্দেশ্য ওদের ছিল না। যে পরিবেশে ছেলেটিকে আমরা দেখেছি বা তার সঙ্গে কথা বলেছি, সেই পরিবেশে কুকুরের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় হঠাৎ চোখের পলকে ছেলেটিকে গুম করাটা নেহাতই অঘটন ছাড়া কিছু নয়।

সুখেন বলল, বিশেষ করে ছেলেটি যে বালিয়াড়ির ওইখানেই আসবে, সেটা তো অপহরণকারীদের আগে থেকে জানবার কথা নয়।

তা ঠিক। কিন্তু টারগেট যদি না-থাকবে তা হলে ওরা কীসের স্বার্থে আমার স্ত্রী-পুত্রকে অপহরণ করল? সবচেয়ে আশ্চর্য এই, অপহরণের আগে বা পরে কোনও ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার ঘটেনি। কোনও ব্ল্যাকমেলের হুমকি আসেনি। কেউ কোনও টাকাকড়ি বা সোনাদানাও চায়নি। তবে কেন? কেন ওরা এইভাবে লুকিয়ে রাখল ওদের?

রূপেন ও সুখেন বলল, আপনি অত বেশি ভাববেন না। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন আমরা দু'জনে যখন ফিল্ডে নেমেছি তখন আমাদের কিছু করতে দিন। রীতিমতো শেরিফ বদমাস ছাড়া আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে আসবার মতো দুঃসাহস কারও হবে না। আমরা বুঝতে পারছি, এ আমাদেরই প্রধান শত্রু মি. জ্যাঙ্গোর কাজ।

কী বললে? কী নাম? জ্যাঙ্গো!

হ্যাঁ। জগজিৎ সিং জ্যাঙ্গো। একজন ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। এবং এদেশের বহু নারী-শিশুর হত্যাকারী ও একাধিক ব্যাঙ্ক ডাকাতির নায়ক। আমরা জ্যাঙ্গোরই দলের লোক। আজ রাতেই আমরা ওর ঘাঁটি আক্রমণ করব। অবশ্য এর জন্য যা দরকার তা আপনাকে দিতে হবে।

কী চাও তোমরা?

দল থেকে বেরিয়ে আসার সময় যা আমরা খুইয়েছি। অর্থাৎ দুটো প্রচণ্ড শক্তিশালী রিভলভার।

বেশ, পাবে। তোমরা বোসো! আমি ব্যবস্থা করছি।

অসমঞ্জবাবু ওদের বসিয়ে বাথরুমসংলগ্ন পাশের ঘরে এলেন। সেখানে দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা আদেশের অপেক্ষায় অসমঞ্জবাবুর চোখের দিকে তাকাতেই উনি বললেন, লোকদুটোকে দেখে তো মনে হচ্ছে, ওরা সত্যি সত্যিই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়। কিন্তু তবুও এটা ওদের একটা ছল হতে পারে। এই টোপ ফেলেই ওরা হয়তো আমাকে ওদের ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে চায়। কাজেই আমি ওদের সঙ্গে এগোতে থাকলে তোমরা দূর থেকে নিঃশব্দে আমাকে অনুসরণ করবে। আপাতত দুটো রিভলভার চাই।

ওরা বলল, পাবেন। আমরা জানতাম এগুলো লাগবে। শুধু রিভলভার কেন, অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রও আমাদের হাতের কাছেই মজুত রেখেছি। মি. কাঞ্জিলালও দশ-বারো জন সাদা পোশাকের পুলিশ নিয়ে বাইরে লুকিয়ে আছেন। আপনারা বাইরে বেরোলেই ওঁরা আপনাদের ফলো করবেন।

থ্যাঙ্কস। বলে দুটো রিভলভার নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে রূপেন-সুখেনের হাতে তুলে দিলেন।

রূপেন ও সুখেন সে দুটি হাতে নিয়ে বলল, ভগবানের কসম। ওই শয়তান জ্যাঙ্গোকে আমরা এইবার দেখে নেব। আশা করি আপনার স্ত্রী-পুত্রকে ওদের ঘাঁটি থেকে উদ্ধার করে আনতে পারব আমরা।

বেশ, যদি পারো তা হলে আমিও কথা দিলাম, তোমাদের পূর্বকৃত অপরাধের বোঝা আইনের চোখে যতটা হালকা করানো যায় তার চেষ্টা করব।

রূপেন ও সুখেন রিভলভারদুটোকে একবার চুমু খেয়ে বলল, ঠিক আছে। তা হলে আমরা চলি স্যার।

অসমঞ্জবাবু বললেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

শুধু শুধু কেন বিপদ বাড়াতে যাচ্ছেন? আগে আমাদের যেতে দিন। আমরা গোপন পথ ধরে অতি সন্তর্পণে যাব। সহসা কোনও বিপদে পড়লে পালাবার রাস্তা জানি। কিন্তু আপনি থাকলে আমাদেরও অসুবিধে হতে পারে।

আমি যাব।

রূপেন ও সুখেন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার! তারপর বলল, আপনি কি আমাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না?

পারছি বইকী। না-পারলে কী ও-দুটো তোমাদের হাতে তুলে দিতাম?

পনি আসতে চাইলে আমদের আপত্তির কিছু নেই। তবে এখনও বলছি, যে শত্রুর মোকাবিলা আমরা করতে চলেছি, তাতে আপনার অন্তত না-আসাই উচিত।

বুঝলাম, কিন্তু তোমরা যদি ওই শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে কোনও বিপদে পড়, তখন তোমাদের রক্ষা করার জন্যও আমার থাকার দরকার নয় কি?

অসমঞ্জবাবু তৈরি হয়েই ছিলেন। তবুও যাবার আগে একবার বাথরুম যাবার অছিলায় পাশের ঘরে গিয়ে সেই দুই পুলিশকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেই-না রাস্তায় পা দিতে যাবেন, অমনি এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন একদিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ। চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই এবং ধোঁয়াটা হালকা হতেই দেখতে পেলেন রূপেন পনেরো-ষোলো বছরের একটি ছেলের জামার কলার টিপে ধরেছে। ছেলেটির নিতান্তই দৈন্য দশা।

রূপেন ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মারল।

ছেলেটি মার খাওয়া রুগ্ন কুকুরের মতো তাকিয়ে রইল ওর দিকে। মুখে একটু গোঁ গোঁ শব্দ করল শুধু। বোঝাই গেল ছেলেটি বোবা।

রূপেন বলল, কাকে মারবার জন্যে ওটা ছুড়েছিলি? আমাকে, না ওই বাবুকে?

ছেলেটি কথা বলল না। ভয়ে কাঁপতে লাগল।

বল শিগগির?

আবার সেই গোঁ গোঁ শব্দ।

রূপেন অসমঞ্জবাবুকে বলল, আমরা যে এখানে আছি ওরা তা হলে টের পেয়েছে। বেশ রীতিমতো নজরদারি করছে আমাদের ওপর। এবং সেই জন্যেই নিজেরা না-এসে এই নির্বোধ বোবাটাকে পাঠিয়েছে আমাদের ওপর বোম চার্জ করবার জন্য। ভাগ্যে ওটা ফসকে অন্যদিকের দেওয়ালে লেগেছে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

অসমঞ্জবাবুর কপালের একটা পাশ কেটে গল গল করে রক্ত ঝরছে। অসমঞ্জবাবু রুমাল দিয়ে সেটাকে চেপে ধরলেন।

সুখেন বললেন, আপনার এই অবস্থার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি ওকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে ঠেলে না-দিলে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারত।

অসমঞ্জবাবু হেসে বললেন, তোমার উপস্থিত বুদ্ধির জন্য ধন্যবাদ।

রূপেন বলল, এখনও ভেবে দেখুন কী করবেন?

আমি যাব। কারণ ওরা শুধু তোমাদের শত্রু নয়! আমারও। আমার স্ত্রী-পুত্রকে ওরা চুরি করে থাকুক, বা না-থাকুক, ওরা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা তো করেছিল।

তা হলেই বুঝছেন, ওদের ঘাঁটিতে পৌঁছতে হলে আমাদের একটু অন্যভাবে যেতে হবে।

হ্যাঁ। তোমরা যে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ এবং আমরা যে, ওদের

আক্রমণ করব এটা ওরা জেনেই গেছে। তাই আমরা দলবল নিয়ে হই হই করে ওখানে যাব না। কারণ যদি ওরা সত্য সত্যই আমার স্ত্রী-পুত্রকে লুকিয়ে রেখে থাকে তা হলে ওরা ওদের ক্ষতি করে ফেলবে।

অসমঞ্জবাবু হঠাৎ রূপেনের পেটের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে বললেন, তা হলে ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

রূপেন এবং সুখেন দু'জনেই ঘাবড়ে গেল।

অসমঞ্জবাবু চাপা গলায় বললেন, সুখেন, এই সুযোগ। তুমি দৌড়ে পালাও এখান থেকে। যেভাবেই হোক আবার ওদের ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে দোস্তি করার চেষ্টা করো ওদের সঙ্গে। যাতে ওরা ধারণা করে আমরা তোমাদের অবিশ্বাস করে গ্রেপ্তার করেছি এবং তুমি পালিয়ে বেঁচেছ। ওরা অবশ্য এত সহজে তোমাকে বিশ্বাস করছে চাইবে না বা দলে নেবে না। তবুও তুমি ফিরে গিয়ে এমন নাটক করো, যাতে ওরা আপাতত আমাদের এখান থেকে নজর উঠিয়ে নেয়।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুখেন ছুটে গিয়ে রাস্তার এক পাশে রাখা নিজের মোটর বাইকটায় চেপে বসল এবং পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে।

অসমঞ্জবাবু তখনও সেই একই ভাবে রিভলভারের নলটা রূপেনের পেটের কাছে ধরে রইলেন। তারপর এক চোখ টিপে তাকে আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন এ সবই নক্সা। যদি নজর দেবার আরও কোনও লোক নিযুক্ত থাকে তো সে দেখুক রূপেন অ্যারেস্ট হয়েছে।

অসমঞ্জবাবু বললেন, এই কে আছ হাতকড়া লাগাও।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে শক্ত করে ধরে ফেলল রূপেনকে এবং একজন সেই হাবাটাকে।

একটু পরেই ফোনে খবর পেয়ে পুলিশের গাড়ি এল।

ওঁরা সকলেই সেই গাড়িতে চেপে থানাতে চললেন।

রূপেনকে এবং সেই হাবা ছেলেটিকে লকআপেই রাখা হল।

অসমঞ্জবাবু রূপেনকে বললেন, এই রকম একটু অভিনয় করা ছাড়া আপাতত আর কোনও উপায় দেখলাম না।

ভাল করেছেন। কিন্তু বেচারা সুখেন, ও যদি কোনও বিপদে পড়ে? একা গেল বেচারা।

মনে হয় বিপদে পড়বে না। কেন না আমি যা বুঝেছি তা হল, ও অত্যন্ত চতুর এবং সতর্ক। ও জানত আমরা যে কোনও সময় আক্রান্ত হতে পারি। এবং জানত বলেই একটা অঘটন ঘটে যাবার আগেই আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। যাক, এবার দেখি এই ছেলেটার কাছ থেকে কোনও কিছু জানতে পারি কি না।

সুখেন বলল, বৃথা চেষ্টা করবেন না স্যার। আমি ওকে জানি। মেরে ফেললেও ও একটি কথাও বলবে না আপনাকে।

ওদের কোনও গোপন তথ্য আমি তো জানতে চাই না। সেজন্য তোমরা আছ। আমি শুধু জানতে চাইব আমার স্ত্রী-পুত্র ওদের হেফাজতে আছে কি না।

দেখুন চেষ্টা করে।

প্রয়োজন হলে ইলেকট্রিকের শক খাওয়াব ব্যাটাকে।

অসমঞ্জবাবু ধীর ধীরে ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বেশ তৈরি হয়ে একটি আলাদা ঘরে নিয়ে গেলেন তাকে। ছেলেটিকে বললেন, তুই বোবা?

ছেলেটি হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল শুধু। অসমঞ্জবাবু জানেন হাবা-বোবারা কানেও শুনতে পায় না।

তবু বললেন, কতদিন আছিস এ-লাইনে?

এবারও কিছু বলল না ছেলেটি। মানে বলবার চেষ্টা করল না। অর্থাৎ কথা তো বলতে পারে না, একটু ঘাড়ও নাড়ল না।

অসমঞ্জবাবু এবার আদর করার ছলে ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তুই যদি আমায় সাহায্য করিস তা হলে আমি তোকে কিচ্ছুটি বলব না। আমি পুলিশের লোক। আমাকে সাহায্য করলে তোর ভাল হবে। করবি তো?

ছেলেটি নীরব।

আমার মনে হচ্ছে তুই অসহায় একটি ছেলে। জন্মবোবা নোস। তোর মা-বাবা কে তাও বোধহয় তুই জানিস না। ওরা তোকে নিশ্চয়ই খুব ছোটবেলায় কোথাও থেকে চুরি করে এনেছিল। এবং নিশ্চয়ই কোনও ওষুধের দ্বারা অথবা ইঞ্জেকশান দিয়ে তোকে বোবা করে রেখেছে। তুই যদি আমার কথার উত্তর দিস তা হলে, আমি বড় ডাক্তার দেখিয়ে তোকে ভাল করে তুলব। আমার কথার উত্তর দিবি তো?

ছেলেটি এবার হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল।

আমার ছেলে, আমার বউ কোথায় আছে তুই জানিস?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

তুই তাদের দেখেছিস?

ছেলেটি আবার ঘাড় নাড়ল।

অসমঞ্জবাবু বললেন, আমি যদি চাই তুই আমাকে সাবধানে নিয়ে যেতে পারবি সেখানে?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমি এখনই যাব।

অসমঞ্জবাবু আসবার আগে আর একবার রূপেনের সঙ্গে দেখা করলেন।

বললেন, আমি ছেলেটির সঙ্গে যাচ্ছি। তুমিও মেকআপ নিয়ে ছদ্মবেশে সুখেনের খোঁজে যাও। চুপচাপ বসে থাকার একদম সময় নেই।

রূপেন বলল, সে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তবে আপনি কিন্তু ওই বিচ্ছুটার সঙ্গে খুব সাবধানে যাবেন। ওকে একদম বিশ্বাস করবেন না।

বলো কী?

হ্যাঁ। হয়তো আগাগোড়া ঘাড় নেড়ে সবই আপনাকে মিথ্যে বলেছে।

অসমঞ্জবাবু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকারে ওরই নির্দেশিত পথে বালিয়াড়িতে এসে নামলেন। তারপর সমুদ্রসৈকত ধরে এগিয়ে চললেন চন্দনেশ্বরের দিকে। বেশ খানিকটা যাবার পর একসময় অনুভব করলেন কে বা কারা যেন অনুসরণ করছে তাঁকে! হয়তো দিঘা-পুলিশ নিরাপত্তার জন্য পিছু নিয়েছে তাঁর। কিন্তু না। সে ভুল ভাঙল যখন জোড়া জোড়া টর্চের আলো তাঁর সর্বাঙ্গে এসে পড়ল। অসমঞ্জবাবু থমকে দাঁড়ালেন! আর সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল গুড়ুম।

বোবা ছেলেটি রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়ল বালুচরে।

অমনি অন্ধকার বিদীর্ণ করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল আততায়ীদের। সম্ভবত এগুলো পুলিশের গুলি। অসমঞ্জবাবু নিজেও গুলি চালাতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। ততক্ষণে আততায়ীদের একটি বুলেট এসে বিদ্ধ করেছে তাঁকে। তাঁর হাতের রিভলভার ছিটকে পড়ল সমুদ্রের জলে। তিনিও বালুচরে লুটিয়ে পড়লেন। সাদা পোশাকের পুলিশরা হই হই করে ছুটে এল তাঁর দিকে।

আট

বাপ্পার যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল একটি অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে শুয়ে আছে সে। ঘরের ওপর দিক থেকে ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু রোদের ছটা দেখা যাচ্ছে। এই দেখে মনে হয় ও কোনও আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে। ওর মাথার কাছে বসে বসে বিড়ি টানছে ওরই মতো দুটো ছেলে। বাপ্পা ক্ষীণস্বরে বলল, আমি কোথায়?

ছেলে দুটি খিল খিল করে হেসে উঠল একবার। তারপর ওর দিকে মিটিমিটি চোখে তাকিয়ে একজন অপরজনকে বলল, চালু পুরিয়া রে। এতক্ষণ কেমন চুপচাপ শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। এখন ন্যাকার মতো জিজ্ঞেস করছে, আমি কোথায়? কী বলি বল তো?

অপরজন বলল, বল, মেট্রো সিনেমার লবিতে।

বাপ্পা উঠে বসে দু'হাতে চোখ রগড়ে বলল, তোমরা কারা?

আরে! তাও জান না? আমার নাম ধর্মেন্দর, ওর নাম অমিতাভ বচ্চন।

বাপ্পা বুঝল দু' দুটো সিনেমাখোর বখাটের পাল্লায় এসে পড়েছে ও। তবু ওদের কথায় রাগ না-করে বলল, সত্যি বলছি, আমি জানি না আমি কোথায়।

সে কী! তুমি আঁতুড়ের ছেলে নাকি যে কোথায় ভূমিষ্ঠ হয়েছ তা জান না!

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্পার সবুট লাথি ছেলেটির মুখে এসে পড়ল।

অপর ছেলেটি তারই মোকাবিলা করবার জন্য যেই-না বাপ্পাকে আক্রমণ করতে যাবে অমনি আর এক লাথি এসে পড়ল তার মুখে।

ছেলেদুটি ছিটকে পড়ল দু'দিকে। তারপর মুখে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, কামাল কর দিয়া গুরু। আমরা যদি ধর্মেন্দর-অমিতাভ হই, তুমি তো তা হলে ড্যানি।

বাপ্পা বলল, শোনো, তোমরা কে তা জানি না। যদি আমাকে এখান থেকে পালাবার সুযোগ করে দিতে না-পার তা হলে তোমরা খুব ভুল কাজ করবে।

কী আবোল-তাবোল বকছ তুমি গুরু? আমরা তোমাকে ধরে এনেছি, না বেঁধে রেখেছি? একটা বিড়ি খাবে।

বাপ্পা বলল, না, ওসব তোমরা খাও। আর অযথা বখাটের মতো আমাকে গুরু গুরু কোরো না।

আমরা বখাটেই তো।

হতে পারো। কিন্তু আমার নাম বাপ্পা। তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে পাহারা দেবার জন্য রয়েছ?

কামাল কর দিয়া গুরু। কী যা তা বলছ?

আবার 'গুরু!'

ওঃ হো, তোমায় গুরু বললে তুমি তো আবার রেগে যাও। তা কী তুমি বলছ, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি আমাদের মতো নও? মানে নিজের থেকে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে থাকনি?

না আমাকে চুরি করে নিয়ে এসে রাখা হয়েছে।

ছেলেদুটি বিস্মিত হয়ে বলল, তাই নাকি? তবে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আমরা কিন্তু তা নই। আমাদের মা নেই, বাবা নেই। তারা কেউ কোনও কালে ছিলেন কি না তাও জানি না। হয়তো আমরা আকাশ থেকে টিপ্ করে পড়েছি। নয়তো এমনিই গজিয়েছি মাটিতে। অর্থাৎ ধরে নিতে পারো একেবারেই রাস্তার ছেলে আমরা। চুরিচামারি করে, ছিনতাই করে, এরওর পকেট মেরে যা পাই তা সমান ভাগে-ভাগ করে নিই দু'জনে। আমাদের মধ্যে হিসাব নিয়ে কোনও

গোলমাল হয় না কখনও। আমাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, ফুটপাথই আমাদের ঠিকানা। আমরা বেশির ভাগ সময় বজবজে থাকি। একবার মেট্রোয় সিনেমা দেখতে গিয়ে ভুল করে পকেট মেরে বসে আছি এক দারোগাবাবুর। তারপর যখনই বুঝতে পেরেছি হাতটা একটু অন্য জায়গায় পড়ে গেছে আর পুলিশ হন্যে হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের অমনি 'মার খিঁচ'। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পালিয়ে এসে একেবারে ওড়িশায়। কিছুদিন বালেশ্বরে থেকে, এখন এই পোড়ো বাড়িটাতে আশ্রয় নিয়েছি। এটা মাটির নীচের ঘর। এর একপাশের মাটি সরে যাওয়ায় সেখানকার ইটের ফাঁক দিয়ে একটা গর্ত করে নিয়েছি আমরা। তাই দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকি। কেউ টের পায় না। আমরা প্রায়ই রাত্রিবেলা এখানে আশ্রয় নিই এবং দিনের বেলা কাজকর্ম করতে যাই। তা থেকে ভেবেছিলাম তুমিও বুঝি আমাদের মতোই 'এগারো নম্বরি।' কিন্তু তুমি এসব কী বলছ?

যা বলছি ঠিকই বলছি। বিশ্বাস করো ভাই। আমার বড় বিপদ। তোমরা কি পারবে আমাকে উদ্ধার করতে?

ছেলেদুটি এবার অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল বাপ্পার মুখের দিকে। তারপর বলল, তুমি আমাদের ভাই বলে ডাকলে? আমাদের এক বন্ধু ছিল তার নাম স্যান্ডুইচ। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে। একমাত্র সে-ই আমাদের ভাই বলে ডাকত। সেই আমাদের 'গুরু' বলতে শিখিয়েছে। চুরি-ছিনতাই শিখিয়েছে। দু'-একটা ইংরেজি নাম শিখিয়েছে। তা সে এখন নেই। খারাপ অসুখ করে মরে গেছে ছেলেটা। কিন্তু আমরা দু'জনে প্রথম শ্রেণির বিশ্ববখাটে এবং রাস্তার ছেলে জেনেও তুমি যখন আমাদের ভাই বলে ডেকেছে, তখন তোমার এই ভাই ডাকের মর্যাদা আমরা দেবই। তোমার জন্যে জান দিয়ে দেব আমরা।

বাপ্পা বলল, ঠিক আছে। যদি তোমরা কোনওরকমে আমাকে মুক্তি দিতে পারো এদের খপ্পর থেকে, তা হলে আমিও তোমাদের জন্যে যথাসাধ্য করব। যাতে তোমরা ভাল ছেলে হতে পারো, ভাল খেতে পরতে পাও, ভাল একটা আশ্রয় পাও, সব ব্যবস্থা করে দেব। তোমরা স্কুলে পড়বে, লেখাপড়া শিখবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। তোমাদের দু'জনের আমি নতুন নাম দেব। অনেক কিছু করব।

সত্যি বলছ, তুমি আমাদের জন্যে এত সব করবে?

সত্যি বলছি। কেন না তোমরা যে আমার ভাই। তা ছাড়া তোমরা তো জান না আমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে। আমার বাবার ক্ষমতা অনেক।

পুলিশের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল ছেলেদুটি। বলল, ও। তাই বলো। সেইজন্যেই ওরা তোমাকে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে। শোনো ভাই, পুলিশের সঙ্গে কিন্তু আমাদের অত্যন্ত দুশমনি। পুলিশ আমাদের ধরতে পারলে পিটিয়ে ছাল তুলে দেবে।

না। তোমরা আমার উপকার করলে পুলিশ তোমাদের কিচ্ছু বলবে না। আমি বাপিকে বলে দেব তোমাদের কিছু না-বলতে। আর তা ছাড়া তোমরা তো এরপর খারাপ ছেলে থাকছ না। কিন্তু তোমাদের কি সত্যিই ফিল্মস্টারের নাম ছাড়া আর কোনও নাম নেই?

আছে। ও নামও অবশ্য আমাদের নিজেদের দেওয়া না। অর্থাৎ আমাদের সেই বন্ধু স্যান্ডুইচ, সে-ই নাম রেখেছে আমাদের। আমার নাম অ্যাটম, ওর নাম পেটো।

এমন সময় ঘরের এক কোণে ছাদের দিকে একটু ঘরঘর শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল ঘরে নামা-ওঠার জন্যে একটা চৌকো মুখ আছে, তার মুখটা ঢাকা দেওয়া ছিল, সেটা সরে গেল। অমনি দেখা গেল একটা দড়ির মই নেমে আসছে।

অ্যাটম আর পেটো লাফিয়ে উঠে বলল, মনে হচ্ছে যারা তোমাকে এখানে রেখেছিল তারা আসছে। যদি ওরা তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যায়, তা হলে আমরা ওদের ফলো করব। আর না হলে পরে এসে উদ্ধার করব তোমাকে। এখন আমরা পালাই। বলেই গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে বাইরের একটি মানুষপ্রমাণ বড় ড্রেনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল ওরা। ড্রেনটি শুকনো। শহরের ময়লা জল নিষ্কাশন হয় এর ভেতর দিয়ে। ড্রেনের মুখের কাছেই সমুদ্রের জল চলে এসেছে এখন। কেন না এটা জোয়ারের সময়। ওরা সেই জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগল।

বাপ্পা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওপর দিকে। দড়ির মই বেয়ে বলিষ্ঠ চেহারার এক ন্যাড়া মাথা বেঁটে মস্তানকে নেমে আসতে দেখা গেল। তার হাতে কলা, পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ ইত্যাদি। লোকটা নেমে এসে দাঁত বার করে বাপ্পার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

বাপ্পার গা যেন জ্বলে গেল। ভাল করে তাকিয়ে সেই দেঁতোহাসির ছিরি দেখেও সে বুঝতে পারল না এগুলো দাঁত না, অন্য কিছু।

লোকটি তেমনই হাসতে হাসতে বলল, দেখছ কী? কী এত দেখার আছে?

তোমার দাঁতের ছিরি দেখছি।

ও আর অত করে দেখার কী আছে? এখন খেয়ে নাও। আমার এই দাঁতগুলো একটা সোনা, একটা রুপো, একটা লোহা, একটা পেতল আর তামা দিয়ে বাঁধানো।

বাপ্পা হঠাৎ ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে উঠে ওর মাথা দিয়ে লোকটার পেটে একটা গোত্তা মেরে বলল, এটা তো বেশ নরম দেখছি। এর ভেতরের নাড়ি-ভুঁড়িগুলো নিশ্চয়ই তার দিয়ে পাকানো নয়।

লোকটার হাত থেকে খাবারগুলো পড়ে গেল। সে দু'হাতে পেট-চেপে বসে

পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। বাপ্পা একটা ডিম সেদ্ধ কুড়িয়ে নিয়ে লোকটার মুখে গুঁজে দিয়ে বলল, এটা খেয়ে নাও। খুব পুষ্টিকর খাদ্য এটা। খেলে শরীরে বল পাবে। উঠে দাঁড়াতে পারবে। বলেই ঝুলন্ত দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে পড়ল। তারপর মইটা তুলে নিয়ে মুখটা আবার ঢাকা দিয়ে চারদিক বেশ ভাল করে দেখে নিল।

আসলে এটা একটা পোড়ো বাড়ি। এর নীচে আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর। হয়তো কোনও জমিদার কোনও সময়ে তৈরি করিয়ে ছিলেন এটা। এখন শয়তানরা তাদের খারাপ কাজের জন্য ব্যবহার করছে। একেবারে ঘন ঝাউবন, বালিয়াড়ি আর সমুদ্রতীরে এই ভাঙা পোড়ো বাড়ি। সমুদ্র হয়তো অচিরেই গ্রাস করবে এটিকে। যাই হোক এর ভেতর থেকে একবার বেরোতে পারলে আর ওকে পায় কে? বাপ্পা ধীরেধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়েই উঁচু একটি বালিয়াড়িতে এসে পৌঁছুল।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ষণ্ডামার্কা জোয়ান লোক ছুটে এল ওর দিকে, আরে! এ ছেলেটা এখানে বেরিয়ে এল কী করে?

বাপ্পা চকিতে দু' মুঠো বালি তুলে ছুড়ে দিল দু'জনের চোখে। একজন তো 'গেলুম রে বাবা রে' বলে বসে পড়লেও অপরজন শক্ত হাতে ধরে ফেলল বাপ্পাকে। তারপর বেশ কঠিন হাতে ওকে ধরে টানতে টানতে আবার সেই ঘরের ভেতর নিয়ে এল। তারপর সিঁড়ির মুখের ডালা সরিয়ে দড়ির মইটা নামিয়ে দিতেই নীচের লোকটি উঠে এল ওপরে। উঠে এসেই বাপ্পার গালে মারল এক চড়। তারপর ওর হাতদুটো শক্ত করে বেঁধে আবার ওকে নামিয়ে আনল নীচের ঘরে।

যে লোকটার পেটে আঘাত করে বাপ্পা পালিয়েছিল সে লোকটি বাপ্পার চুলের মুঠি ধরে বলল, বড্ড বেশি মস্তান হয়েছিস না? পুলিশের বাচ্চা এর মধ্যেই মারপিটের অনেক রকম কায়দা রপ্ত করেছিস দেখছি। এবার কী করবি? বেশ ছাড়া ছিলি, এবার বাঁধা থাক। এরপরও যদি বেশি বেয়াদপি করিস তো গলাটিপে মেরে ফেলব। তারপর বস্তায় পুরে ফেলে দেব সমুদ্রের জলে। কেউ টেরও পাবে না।

বাপ্পা ক্ষোভে-দুঃখে কেঁদে ফেলল এবার।

ওর কান্না দেখেও মন ভিজল না ওদের। বলল, কোনওরকমেই এখান থেকে পালাবার চেষ্টা কোরো না বুঝলে? আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধ হলেই তোমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাপ্পা বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার মায়ের কাছে যাব। আমার বাপির কাছে যাব আমি, আমাকে ছেড়ে দাও।

লোকটি বলল, কেন, তোমার বাবা তো মস্ত গোয়েন্দা। পরের ছেলে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করেন। এখন নিজের ছেলেকে খুঁজে বার করুন। এ এমন জায়গায় নিয়ে এসে ফেলেছি যে তোমার ঠাকুর্দা এসেও উদ্ধার করতে পারবেন না তোমাকে।

বাপ্পা বলল, আমি কোথায়?

আমাদের খপ্পরে, আবার কোথায়? তা যাক। শোনো, তুমি এখন আমাদের ছেলে। যা বলি মন দিয়ে শোনো। এখানে ঘরের মেঝেয় যে খাবারগুলো পড়ে আছে, ওগুলোই আপাতত কুড়িয়ে খেয়ে নাও। আমরা হয়তো সারাদিনে আর নাও আসতে পারি। যদিও হাত বাঁধা আছে, তবুও খেতে অসুবিধে হবে না। কেন না সামনের দিক থেকে বাঁধা। ঘরের কোণে একটা কুঁজোয় জল আছে। কষ্ট করে গড়িয়ে খেয়ো। কোনও গ্লাস নেই কিন্তু। পারি তো আমরা রাত্রিবেলা আসব। বলেই চলে গেল ওরা।

ওরা চলে গেলে অসহায় বাপ্পা অনেকক্ষণ গুমরে গুমরে কাঁদল। তারপর মেঝে থেকে সেই ছড়িয়ে থাকা খাবারগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেল। এছাড়া উপায়ই বা কী? অ্যাটম আর পেটো কি ওকে উদ্ধার করতে সত্যিই আসবে? যদি আসে তো কখন আসবে ওরা? কিন্তু যদি না-আসে? তা হলে বাপ্পার জীবনের অন্তিম পরিণতি কী হতে পারে, তা ওর অজানা নয়। খবরের কাগজে এইরকম ছেলে চুরির ঘটনা ও অনেক পড়েছে। কাজেই সেরকম একটা মর্মান্তিক পরিণতির কথা মনে হতেই সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ওর।

না। সারাদিনে আর কেউ এল না। খিদের জ্বালায় ছটফট করে ওই বদ্ধ ঘরে বাপ্পার সারাটা দিন যে কীভাবে কাটল, তা বলার নয়। সন্ধের পর টর্চ হাতে গোপন পথে চুপিসারে অ্যাটম আর পেটো এসে হাজির হল।

ওরা এসে বলল, কী গো, এখনও রেখেছে ওরা তোমাকে? আমরা তো ভাবলাম নিয়েই গেছে বোধহয়। সকালে অনেকক্ষণ বাড়িটার দিকে নজর রেখেছিলাম আমরা। কিন্তু তোমাকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে এমন দৃশ্য দেখিনি। দুপুরবেলা আমরা খেতে গিয়েছিলাম। ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তোমার জন্যে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। ভাবলাম তোমাকে কথা দিয়েও আমরা হয়তো আমাদের কথা রক্ষা করতে পারলাম না। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এখান থেকে। তবে এখনও যখন তুমি আছ, তখন আর তোমার ভয় নেই।

বাপ্পা বলল, ভগবান তোমাদের ভাল করুন ভাই। আগে তোমরা আমার বাঁধন খুলে দাও।

ওরা ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে বাপ্পাকে বাঁধনমুক্ত করল।

বাপ্পা বলল, ওঃ বাঁচালে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। তোমরা এখনই আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলো এখান থেকে। সকালে আমি পালাতে গিয়েও ধরা পড়ে গেলাম।

ঠিক আছে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বলে ব্যাগের ভেতর থেকে কিছু খাবার বার করে বলল, আগে এগুলো খেয়ে নাও দেখি।

কী আছে ওতে?

আরে খাও না। কয়েকটা কচুরি, ছানার গজা, অমৃতি এইসব আছে। না-খেলে পালাবে কী করে?

দেরি হয়ে যায় যদি?

যায় যাবে। তবে জেনে রেখো এখন যখন আমরা দু'জনে এখানে এসে গেছি, তখন কারও সাধ্য নেই যে আমাদের কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নেয়। মনে রেখো তুমি এখন ওদের খপ্পরে নয়। ওরা এখন আমাদের খপ্পরে।

কী যে বলো। ওরা অত্যন্ত সাংঘাতিক।

আমরা ওদের চেয়েও সাংঘাতিক। বিশেষ করে রাত্রিবেলা আমাদের দু'জনকে যেন ভূতে এসে ভর করে। আমরা পারি না এমন কোনও কাজ থাকে না। যাক গে। এখন ধীরেসুস্থে খেয়ে তো নাও।

বাপ্পা গোগ্রাসে খেতে লাগল।

অ্যাটম বলল, আমরা একবার দিঘায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটা দুঃসংবাদ পেলাম।

কী দুঃসংবাদ?

তোমার মাকেও ওরা নিয়ে গেছে।

সে কী ! আমার মামণিকে...!

হ্যাঁ। আমার যতদূর ধারণা ওরা তোমাদের পরিবারের সবাইকে এক এক করে শেষ করে দেবে। দিঘায় গিয়ে একবার তোমার মায়ের ঘটনাটা শুনে মনে হল, পুলিশ তোমাকে উদ্ধার করলে ওরা যদি তোমার মাকে মেরে ফেলে? তা ছাড়া ধরো পুলিশ আসার আগেই তুমি যদি এখান থেকে পাচার হয়ে যাও, তা হলে আমরা দু'জনে ফলস পজিশনে পড়ে যাব। এবং মিথ্যে কথা বলার দায়ে মারধোর খেয়ে মরব। বিশেষ করে পুলিশের খাতায় আমাদের রেকর্ড ভাল নয়।

বাপ্পা ডুকরে কেঁদে উঠল একবার। তারপর বলল, ওঃ হো। তোমরা কি ভুল করলে ভাই। কেন একবার পুলিশকে বললে না। আমার মা, মামণি— আর কি মাকে আমি কখনও দেখতে পাব? ওরা কোথায় নিয়ে গেল আমার মাকে?

যেখানেই নিয়ে যাক। আমরা তাঁকে ফিরিয়ে আনবই। অত ভেঙে পড়লে

চলবে কেন? থাকলে কাছেপিঠেই থাকবেন উনি। চারদিকে যে রকম পুলিশের টহলদারি তাতে পালাতে বেশি দূর হবে না।

বাপ্পার খাওয়া শেষ হতেই ওরা বলল, এবার পালানো যাক। আগে আমরা তোমাকে আমাদের গোপন ডেরায় লুকিয়ে রাখি, তারপর আসল ঘাঁটির খোঁজ নিচ্ছি ওদের। জেনে রেখো, এটা ওদের আসল ঘাঁটি নয়। ওরা ভীষণ চালাক। তাই তোমাকে অপহরণ করে নিজেদের ডেরায় না-রেখে এইখানে লুকিয়ে রেখেছে। তা যাক। তুমি এখন মুক্তি পেলেও তোমার বাবার কাছে যাবে না, বা পুলিশকে ধরা দেবে না। ওরা তা হলে অঞ্চল ছেড়ে পালাবে। হয়তো তোমার মায়েরও ক্ষতি হবে তাতে। তোমার অন্তর্ধান রহস্য যেমন পুলিশের কাছে, তেমনই ওদের কাছেও রহস্যময় হয়ে উঠুক। পরে অবস্থা বুঝে আমরা ব্যবস্থা করব।

বাপ্পা খুব তাড়াতাড়ি ওদের সবকিছু বুঝে নিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে বলল, চলো, আর দেরি নয়।

ওরা তিনজনে সেই গুপ্তস্থানে এল। তারপর গর্তের মধ্যে দেহটাকে গলিয়ে দিয়ে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল সেই অন্ধকার ড্রেনের ভেতর। অ্যাটম টর্চ জ্বেলে অন্ধকার পার হয়ে সমুদ্রতটে পৌঁছল। তারপর বাইরেটা খুব ভাল করে একবার দেখে নিয়ে ইশারা করল ওদের। পেটো বাপ্পাকে নিয়ে বাইরে এল।

সমুদ্রে তখন ভাটার টান। সমুদ্র তাই অনেক দূরে সরে গেছে। ওরা সেই কনকনে ঠান্ডায় বেলাভূমি ধরে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল।

অনেকদূর যাবার পর এক গভীর বনের মধ্যে ঢুকল ওরা। এইখানে একটি সুবৃহৎ গাছের গুঁড়ির কাছে এসে অ্যাটম বলল, আমরা এখন কোথায় আছি জানো তো? ওড়িশায়। তুমি যেখানে ছিলে সেটাও ওড়িশা। তবে বর্ডারে। ওই দেখা যায় দূরে চন্দনেশ্বরের মন্দির। খুব জাগ্রত দেবতা। এক মন হয়ে বাবাকে ডাকলে বাবা ডাক শোনেন। আমরা কাজুবাদামের বনে এসে ঢুকেছি। এই বনে একটা বাদাম গাছের মগডালে আমাদের ঘাঁটি। তোমাকে এখানে লুকিয়ে রেখে আমরা ওদের আসল ঘাঁটির খোঁজ নিতে যাব। এবং চেষ্টা করব তোমার মায়েরও খোঁজখবর নেবার।

কিন্তু ভাই, আমি তো গাছে উঠতে পারি না।

সে জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। গাছে ওঠার উপায় আমাদের করাই আছে। বলেই এক পাশের একটি ডাল থেকে একটি শক্ত মোটা লতাকে টেনে আনল। বলল, এইটা ধরে উঠতে হবে। পারবে তো?

হ্যাঁ পারব।

সেই লতা ধরে ওরা তিনজনেই উঠে পড়ল ওপরে। গাছের অনেকটা ওপরে

প্রায় মগডালের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি ডালের সঙ্গে বাঁশ-বাখারি দিয়ে চমৎকার একটি মজবুত মাচা করা আছে দেখতে পেল বাপ্পা। অন্তত দু'-তিনজন সেখানে অনায়াসে শুয়ে-বসে থাকতে পারে। ঘন পাতার আড়ালে সে-এক এমনই নিরাপদ আশ্রয় যে সেখানে লুকিয়ে থাকলে দিনমানেও কেউ কিছু টের পাবে না।

অ্যাটম বলল, তুমি এইখানে সারারাত শুয়ে থাকো। হয়তো একটু ঠান্ডা লাগবে। তা কী আর করা যাবে। চটপট যা কিছু আছে এখানে, সব গায়ে চাপা দিয়ে নাও। আর এই নাও দড়ি। নিজেকে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখো এর সঙ্গে। যাতে ঘুমিয়ে পড়লে পাশ ফিরতে গিয়ে পড়ে না যাও।

বাপ্পা বলল, কিন্তু আমার এখানে লুকিয়ে থেকে লাভ?

লাভ আছে বইকী ভাই। তুমিই তো এখন সোনার হরিণ। তোমার এখন কোনওমতেই আত্মপ্রকাশ করা চলবে না। আমরা দু'জনে যখন ফিল্ডে নেমেছি, তখন তুমি একদম নিশ্চিন্ত থাকো। আমরা কাগজ-পেনসিল নিয়ে আসব। প্রয়োজন বুঝলে কাল তুমি একটা চিঠি লিখে দেবে। সেটা তোমার বাবাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। তারপর তিনি নিজে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন তোমাকে। না হলে আমাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে যদি আবার ধরা পড়ে যাও তো, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তোমরা এখন কোথায় যাচ্ছ তা হলে?

সেই ভাঙা বাড়ির কাছে, যেখানে তুমি ছিলে। সেখানে সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই তার পিছু নেব আমরা। তারপর ঘাঁটিটা চিনে আসতে পারলে হইচই পাকিয়ে কেলেঙ্কারির চরম করে তুলব। তবে খুব সাবধান। আমরা না-আসা পর্যন্ত তুমি যেন গাছ থেকে নেম না।

বাপ্পা বলল,ঠিক আছে ভাই। যা তোমরা ভাল বোঝ তাই কোরো।

অ্যাটম আর পেটো চলে গেল।

ওরা চলে যেতেই সেই ঘন অন্ধকার বাদাম বনের একটি গাছের আড়াল থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে মৃদু একটু হেসে দেশলাই জ্বেলে একটা বিড়ি ধরাল।

নয়

আবার সেই ভাঙা বাড়িতে। তবে এবারে ওরা কিন্তু গোপন সুড়ঙ্গপথে নয়, একেবারে উঁচু বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে গিয়ে সেই পোড়ো বাড়ির ভেতরে ঢুকতে গেল। কিন্তু ঢোকার আগেই এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়ল মুখে। ওরা দেখল দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক ওদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। লোক দু'জনের একজন বাজখাঁই গলায় বলল, এই। কী চাই এখানে?

অ্যাটম বলল, কী আবার চাইব। আমরা শোব এখানে।

অপরজন বলল, কোথায় থাকিস তোরা?

আমরা দাগি আসামি। রাজভবনে থাকি না। ফুটপাথে থাকি। কিন্তু এত জমা খরচ তোমাদের দিতে যাব কেন হে? যাও, ভাগো হিঁয়াসে।

রুখে উঠল অন্যজন, স্পর্ধা তো কম নয়। এক ফোঁটা ছেলে 'হে' বলে কথা বলছে আমাদের সঙ্গে? তুই-তোকারি করছে! মেরে মুখ ভেঙে দেব এখুনি।

অ্যাটম বলল, এঃ। তাই নাকি? আমরাই বলে মানুষ চেলিয়ে বেড়াই। আর উনি কিনা এসেছেন আমাদের কাছে রোয়াব নিতে। দেখছ তো হাতে কী? বলেই একটা নেপালা বার করে সেটা উঁচিয়ে অ্যাটম বলল, দেব এটা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে?

লোক দু'জন এতটা বাড়াবাড়ি হবে ভাবতে পারেনি। তাই সভয়ে একটু পিছিয়ে এসে বলল, বড্ড যে? দেখবি মজাটা?

অ্যাটম বলল, পেটোরে, একটা ইঁদুরের গর্ত দ্যাখ। এরা রাতের অন্ধকারে কার তাড়া খেয়ে পোড়ো বাড়িতে ঘুর ঘুর করছে, আবার আমাদের মতো নিশাচরকে এসেছে চোখ রাঙাতে। বলেই বলল, দ্যাখো সারাদিন অনেক অপকর্ম করে রাত্রিবেলা এখানে এসে ঢুকেছি। এখন মানে-মানে ফুটে পড় দেখি বাবা। ঘুম পেয়েছে। একটু শান্তিতে ঘুমোতে দাও। তোমরা থাকলে আমাদের অসুবিধা হবে।

লোকদুটি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ইশারায় কী যেন বলাবলি করল। তারপর বলল, কী নাম বল তো তোদের?

কী নাম বলব বলো গুরু। আমাদের নাম অ্যাটম আর পেটো। আমাদের মাটির নীচে পুঁতলে আমরা পাহাড়ের মাথায় গাছ হয়ে ফুটি।

অ। তোরাই সেই মাল, পুলিশ যাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে।

ইয়েস। ওই জন্যেই তো এত জায়গা থাকতে ভরদুপুরে এই সার্কিট হাউসে এসে জুটেছি।

তোরা তো সাংঘাতিক চিজ রে! কাজ করবি আমাদের দলের হয়ে?

অ্যাটম বলল, নগদে না বাকিতে?

নগদেরে বাবা। আমাদের বস তোদের মতো ছেলেকে পেলে বুকে করে রাখবে। আমরাও চাই তোদের মতো দু'-চারটে ছেলে অপাত্রে পড়ে যেন নষ্ট না হয়ে যায়। আসলে আমরা দু'জন লোককে সরাতে চাই। সে কাজ তোদেরই করতে হবে।

গুরু গুরু। এ পর্যন্ত আমরা তেইশজনকে সরিয়ে দিয়েছি। আর দু'জনকে দিতে পারলেই পঁচিশ হয়ে যাবে। মানে রজত জয়ন্তী না কী যেন বলে?

ওসব বাজে কথা রাখ। আগে আমাদের কথা শোন। আমরা এই বাড়ির ভেতর একটা ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু ছেলেটা দেখছি কীভাবে দড়ি কেটে হাপিশ হয়ে গেছে। ঘরের পেছনে এক জায়গায় একটা গর্ত ছিল আগে আমরা দেখিনি। হয়তো সেখান দিয়ে পালিয়েছে সে।

অ্যাটম-পেটো উৎসাহিত হয়ে বলল, কতক্ষণ আগে বলো তো?

তা তো বলতে পারব না। দিনের বেলাও হতে পারে, সন্ধের সময়ও হতে পারে।

আমরা কিন্তু সন্ধেবেলা একটা ছেলেকে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে দেখেছিলাম। ছেলেটা আমাদের দেখে আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। আমরা ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছেও দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যেই না বলেছে ও একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে, অমনি বলব কী গুরু মাথাটা উঠল চড়াত করে। দিলাম এই যন্তরটা ব্যাটার পেটের ভেতর ফকাত করে ঢুকিয়ে। ছেলেটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। তারপর যখন দেখলাম ছেলেটা মরেই যাবে, তখন খুব ভয় হল। হাজার হলেও পুলিশের ছেলে তো। দু'জনে মিলে টেনে হিঁচড়ে ছেলেটাকে দিলাম ছুড়ে সমুদ্রের জলে। অমনি গুডলাক কীরকম দ্যাখো, কোথা থেকে একটা হাঙড় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। তারপর আলুভাতের মতো করে মুখে নিয়ে উধাও হল গভীর সমুদ্রে।

বলিস কীরে! একেবারে মেরেই ফেললি?

হ্যাঁ, ওই কাজটা আমরা খুব চটপট করে ফেলতে পারি।

যাক। যা হবার হয়েছে। আপদ গেছে। এখন চল দেখি আমাদের বসের কাছে নিয়ে যাই তোদের। বস খুব রেগে যাবে আমাদের ওপর। তবু ভাল যে, বুদ্ধি করে ছেলেটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিস এবং হাঙরটা সময়মতো এসে খুনের প্রমাণ লোপ করে দিয়েছে। সবই দৈবের যোগাযোগ।

হ্যাঁ। দৈব যে কবে এইরকম যোগাযোগ ঘটিয়ে তোমাদেরও ওই ছেলেটার

মতো দশা করবে তাই ভাবছি। চলো, ঘুম তো মাথায় উঠল। এখন তোমাদের বস কীরকম একবার দেখে আসি।

ওরা সেই অন্ধকারে লোকদুটির পিছু নিল।

ওদের সঙ্গে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে যেতে যেতে অ্যাটম আর পেটো খুব সতর্কভাবে চারদিকে নজর রেখে পথঘাট চিনে নিতে লাগল। দরকার হলে এই পথেই আবার হয়তো আসতে হবে ওদের।

লোক দু'জন বলল, দ্যাখ ভাই তোরা খুব খতরনক ছেলে আমরা জানি। কিন্তু আমাদের দলের সঙ্গে যদি বেইমানি করিস তা হলে কিন্তু সর্দার তোদের আস্ত রাখবে না। আর এমনিতেই তোরা হচ্ছিস দাগি ছেলে। পুলিশের খাতায় রেকর্ড তোদের অত্যন্ত খারাপ। কাজেই পুলিশের চোখরাঙানির হাত থেকে যদি বাঁচতে চাস তো আমাদের দলে আয়। কিন্তু আমরা ভেবে পাচ্ছি না, এইটুকু বয়সে তোরা এত শয়তান কী করে হলি?

অ্যাটম বলল, আরে গুরু, আমরাও তো ভেবে পাচ্ছি না তোমাদের এতখানি বয়েস হয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে তবুও তোমরা এরকম শয়তানের ধাড়ি হয়ে এইসব বদ কর্ম করে বেড়াচ্ছ কেন? আমরা না হয় অকালে পেকেছি। তোমরা? তোমরা কোন সকালে পেকেছ বাবা?

নাঃ। তোরা বড্ড ডেপো হয়েছিস দেখছি। তোদের সঙ্গে কথায় আমরা পেরে উঠব না। তবে ওই ছেলেটাকে মেরে দিয়ে তোরা কিন্তু ঠিক কাজ করিসনি।

পেটো বলল, ঠিক বলেছ গুরু। আমাদেরও মনে হচ্ছে কাজটা ভাল হয়নি। এখন তোমাদের দুটোকে মেরে পঁচিশ পূর্ণ করতে পারলেই মনে হয় কাজটা ভাল হবে।

লোকদুটি শিউরে উঠল, বলিস কী রে!

হ্যাঁ। কেন না তোমরা ছেলেটাকে চুরি করে আটকে রাখলে বলেই ও আমাদের পাল্লায় পড়ল। আর আমাদের পাল্লায় পড়ল বলেই মরল। ওর মৃত্যুর জন্যে আমরা নয়, তোমরাই দায়ী।

ওরা বলল, আসলে ওই ছেলেটা যে পুলিশের ছেলে তা আমরাও জানতাম না। আমাদের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রূপেন ও সুখেন নামে দু'জন লোক পালিয়েছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেও লোকদুটোকে ধরতে পারছিলাম না। ওরা যেন ফাঁকা মাঠের বেড়াল। যাই হোক, ওদের দু'জনকে নজরে রাখতে গিয়েই ছেলেটা হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ে যায়। আমরাই চালাকি করে কৌশলে ছেলেটাকে অপহরণ করে ওই ভাঙা বাড়িতে আটকে রাখি। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম রূপেন ও সুখেন ওই ছেলেটাকে গুম করতে অথবা মারতে চেয়েছিল। তাই ভেবেছিলাম ছেলেটিকে আমরা ওর অপহরণকারী নয়,

উদ্ধারকারী হিসেবেই পরিচয় দেব এবং ছেলেটির মা-বাবা যখন খবরের কাগজে মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেবেন তখনই নিয়ে যাব ওকে। তারপর রূপেন ও সুখেনের বর্ণনা দিয়ে ওদের অ্যারেস্ট করিয়ে দেব। এতে আমরা প্রতিশোধও নিতে পারব এবং দাঁও-ও মারতে পারব। এ কাজটা কিন্তু আমরা আমাদের সর্দারের সম্পূর্ণ অমতেই করেছি। তবে যেই না বুঝেছি হাতটা আমাদের একেবারে উলটো জায়গায় পড়েছে, মানে আমরা নিজেদের অজান্তে একজন পুলিশ অফিসারের ছেলেকে চুরি করে বসে আছি, তখন কিন্তু খুবই বিব্রত বোধ করেছি আমরা।

অ্যাটম আর পেটো বলল, আহা। নেকু রে আমার, ছেলেটাকে ছেড়ে দিলেই তো পারতে?

ছেলেটাকে ছেড়েই দিতাম। যদি না ওই শয়তানদুটো গিয়ে পুলিশের সঙ্গে হাত মেলাত। ওরা আমাদের অনেকগুলো গোপন ঘাঁটির সন্ধান জানে। ওরা আমাদের দলকে ধরিয়ে দিতে চাইছে। তাই পুলিশের চোখে ওদেরকেই সন্দেহভাজন করবার জন্যে ছেলেটার মাকেও নিয়ে পালিয়ে আসি আমরা। চালে আবার ভুল হয়। ভেবেছিলাম পুলিশ ওই মা এবং ছেলের জন্যে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে আমরা সেই সুযোগে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পার পেয়ে যাব। কিন্তু না! রূপেন ও সুখেন কী জাদুতে পুলিশের বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল তা কে জানে? ওরা দিব্যি পুলিশ নিয়ে আমাদের ঘাঁটি আক্রমণ করতে আসছিল। আমাদের দলে একটা হাবা ছেলে ছিল। আমরা তাকে পাঠিয়েছিলাম ওই শয়তানদুটোকে শেষ করে দেবার জন্য। কিন্তু তার একটু ভুলের জন্য সব বানচাল হয়ে গেল।

তা না হয় গেল। কিন্তু ছেলেটার মা কোথায়? সেও কি ওই ভাঙা বাড়িতেই আছে?

আরে না না। এক জায়গায় কখনও দু'জনকে রাখে? তাঁকে আমরা অন্য জায়গায় রেখেছি। মানে আমাদের মূল ঘাঁটিতে।

বেশ। এখন তা হলে আমাদের কী করতে হবে?

কিছুই না। যেভাবেই হোক, ওই রূপেন আর সুখেনের মুণ্ডুদুটো নিয়ে এসে আমাদের সর্দারকে উপহার দিতে হবে। পারবি না?

এই তুচ্ছ কাজটুকু করতে যদি না পারি, তো মানুষ খুনের খেলা ছেড়েই দেব আমরা।

এইভাবে কথা বলতে বলতে এক জায়গায় গভীর বনের ভেতর এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। একজন লোক মুখ দিয়ে কুকুরের ডাক ডাকল। অমনই দূর থেকে শেয়ালের ডাক শোনা গেল হুয়া-হুয়া-হুয়া। লোকদুটো এবার টর্চ জ্বেলে এগিয়ে

চলল। দু'-এক পা যাবার পরই দেখল কতকগুলো বড় বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে একটি ছোট্ট চালা ঘর। তারই পেছন দিকে এক জায়গায় খড়চাপা দেওয়া একটা কাঠের পাটাতন। সেটা টেনে তুলতেই নীচে নামার সিঁড়ি দেখতে পাওয়া গেল। ওরা ধীরে ধীরে সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই আলো-অন্ধকারে ভরা কতকগুলো খুপরি ঘরে এসে পড়ল। একটি ঘরে এক মহিলা বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। দুটি অল্পবয়সি মেয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

অ্যাটম আর পেটো বলল, ইনিই কি?

হ্যাঁ। ছেলেটির মা। তবে সাবধান। ওঁর ছেলেকে যে তোমরা মেরে ফেলেছ একথা উনি যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারেন। উঃ কী কুক্ষণেই যে এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম।

অ্যাটম বলল, এই তা হলে তোমাদের ঘাঁটি? তা এখন পুলিশ এসে যদি ঘাঁটি আক্রমণ করে তা হলে পালাবে কোথায়?

সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সমুদ্র-মুখ পর্যন্ত একটা মানুষপ্রমাণ বড় ড্রেনের সঙ্গে এই সুড়ঙ্গের যোগাযোগ আছে। এটা ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে সেখান দিয়ে আমরা পালাব।

অ। রূপেন আর সুখেন বুঝি সেই সমুদ্র-মুখেও পুলিশ পাঠাবে না।

ঠিকই বলেছ তোমরা। সেইজন্যে আমাদের কিছু লোক ইতিমধ্যেই আরও একটি পালাবার পথ তৈরি করতে লেগে গেছে।

কিন্তু তোমরা পুলিশ আসবার আগেই এখান থেকে পালাচ্ছ না কেন?

অসুবিধে আছে। নেহাত বেকায়দায় না পড়লে এই ঘাঁটি থেকে বেরোব না আমরা। কেন না এই ঘটনার পর পুলিশ এখন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কড়া নজর রেখেছে। আমরা এখান থেকেই চেষ্টা করছি পুলিশকে ঘাঁটির ধারেকাছে আসতে না দেবার। যাক। কথায় কথায় রাত হয়ে যাচ্ছে। এখন তোমরা একটু অপেক্ষা করো। সর্দারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। এই বলে লোক দু'জন চলে গেল।

অ্যাটম আর পেটো তখন চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ভেতরে লোকজন কাউকেই তেমন দেখা গেল না। এক জায়গায় একটি বন্ধ দরজার সামনে টুল পেতে এক প্রহরী বন্দুক হাতে ঘর পাহারা দিচ্ছে। অ্যাটম আর পেটো সেই ঘরের কাছে গিয়ে বলল, এই ঘরের ভেতরে কী আছে গো?

প্রহরী রক্তচক্ষুতে চেঁচিয়ে উঠে, ভাগো হিঁয়াসে।

অ্যাটম বলল, আমাদের সঙ্গে এইভাবে কথা বোলো না বাবা। মেরে মুখ ফাটিয়ে দেব এখুনি। আমরা তেইশটা মার্ডার করেছি। তুমি ক'টা করেছ?

প্রহরীটা লাফিয়ে উঠে বলল, এক ফোঁটা ছেলে। কথা বলতে শিখিসনি? কী করে এর ভেতর ঢুকলি তোরা?

পেটো বলল, কী করে আবার? তোমার বাবারা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে।

প্রহরীটা পেটোর চুলের মুঠি ধরে চিৎকার করে ডাকল, জানকিপোরসাদ! এ জানকিপোরসাদ! ইধার আও তো।

অ্যাটম প্রহরীটার পেটে সজোরে একটা ঘুসি মেরে বলল, জানকিপ্রসাদ ক্যা কিয়েগা হামারা? তুমহারা হিম্মত নেহি? উল্লু কাঁহাকা?

প্রহরীটা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে পেটোর চুলের মুঠি ছেড়ে অ্যাটমকে মারবার জন্য যেই না হাত ওঠাল অমনি এক বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর গমগমিয়ে উঠল সেখানে, রুখ যাও।

প্রহরী সচকিত হয়ে হাত নামিয়ে সরে দাঁড়াল। অ্যাটম ও পেটো সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই মূর্তিমান বিভীষিকার দিকে। দেখল দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার এক চাপদাড়ি সর্দারজি, কালো চশমায় চোখ ঢেকে, মাথায় পাগড়ি এঁটে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

যে লোক দু'জন অ্যাটম ও পেটোকে এখানে নিয়ে এসেছিল তারাও যেন কীরকম কেঁচোর মতো দাঁড়িয়ে আছে সর্দারজির পাশে।

সর্দারজি তাদের বললেন, শোনো, তোমাদের এখানে থাকবার আর দরকার নেই। তোমরা বরং বাইরে পাহারা দাও। যদি বিপদ বোঝো আমাকে খবর দেবে। আমি এদের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। বলে অ্যাটম ও পেটোকে বললেন, আমার সঙ্গে এসো।

অ্যাটম ও পেটো সর্দারজির সঙ্গে একটি সুসজ্জিত ছোট্ট ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের দেওয়ালে একটি মাত্র কালীর ছবি ছাড়া আর কোনও ছবি নেই। সর্দারজি ওদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদের মতো মারাত্মক কাউকেই খুঁজছিলাম। তোমরা যদি আমার হুকুমমতো চলতে পারো বা যদি দল ছেড়ে পালিয়ে না যাও, তা হলে আখেরে উন্নতি করবে। তা সে যাই হোক, আপাতত আমার দলে নাম লিখিয়ে দুটো মার্ডার করে তোমাদের হাতেখড়ি দিতে হবে আজ।

অ্যাটম বলল, কাকে মার্ডার করতে হবে বলুন?

সর্দারজি দুটো ছবি বার করে ওদের হাতে দিয়ে বললেন, এই মুখদুটো চিনে রাখো। এদেরই মারতে হবে।

পেটো মিথ্যে করে বলল, আরে! এ মুখ তো আমরা চিনি। একদিন আমাদের

দু'জনকে এরা আচ্ছা করে এমন ধোলাই লাগিয়েছিল যে কী বলব। কিন্তু কী দিয়ে মারব সর্দার?

কী দিয়ে মারতে তোমাদের সুবিধে হয়?

যদি দু'জনে দুটো ডিস্যুম-ডুস্যুম পাই।

ওসব চালাতে পারো?

অ্যাটম বলল, আগে দিন না। তারপর আপনারই পেটটা ফুটো করে দেখিয়ে দিচ্ছি পারি কি না।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সর্দারের একটি থাপ্পর খেয়ে ঘরের মেঝেয় ছিটকে পড়ল অ্যাটম। সর্দার নির্বিকার ভাবে বললেন, নাও। গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে বসো। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সমীহ করে কথা বলবে।

এমন সময় দরজার কাছে দু'জন লোক এসে দাঁড়াতেই সর্দারজি বললেন, বলো।

অল ক্লিয়ার সর্দারজি।

কোথাও কিছু পড়ে নেই তো?

না। পুলিশ এর ভেতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোনও কিছু পাবে না। সব পলিথিনের প্যাকেট মুড়ে বালিতে পুঁতে রেখেছি।

মেসিনটা কোথায় রাখলে?

সোনার পাতগুলোর সঙ্গে বেঁধে।

পরে জায়গাটা ঠিক চিনে নিতে পারবে?

হ্যাঁ সর্দারজি।

জাল নোট কতগুলো আছে এখানে?

তা প্রায় দু'-তিন বস্তার মতো।

বিপদ বুঝলে ওগুলো পুড়িয়ে দিয়ো।

আচ্ছা। বলে চলে গেল ওরা।

এমন সময় আরও একজনের আর্বিভাব হল সেখানে। এই লোকটি বলল, সর্দারজি! সুখেন আয়া।

সর্দারজি একটুও বিস্মিত না-হয়ে বললেন, আনে দো।

লোকটি চলে গেল এবং একটু পরেই সুখেনকে নিয়ে এসে হাজির করল সেখানে। সর্দারজি হেসে বললেন, বসো সুখেন। এই ছেলেদুটিকে চেনো?

অ্যাটম ও পেটোর দিকে তাকিয়ে সুখেন বলল, না। চেনা দূরের কথা ওদের দেখিওনি কখনও।

সে কী! তুমি নাকি ওদের বেধড়ক পিটিয়েছিলে একবার?

হবে। হয়তো খেয়াল নেই।

তা যাক গে। এখন বলো, তোমার ওই পুলিশবন্ধুদের ছেড়ে হঠাৎ এই গরিবের পর্ণকুটিরে এসে হাজির হলে কেন?

সুখেন কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, সর্দার! আমাকে মাফ করুন সর্দার। আমি ওই ব্যাটা রূপেনের কথায় দলছুট হয়ে খুব ভুল করেছি। আসলে ওই ছেলেচুরির ব্যাপারে আমরা পুলিশের সন্দেহের চোখে পড়ে গেছি জেনে পুলিশকে বলতে গিয়েছিলাম যে, ও-চুরি আমরা করিনি। তারপর—।

আর কিছু বলার আছে তোমার?

আমি আবার আপনার দলে ফিরে আসতে চাই সর্দার।

সর্দার হেসে বললেন, তা কী করে হয়? তুমি তো জানো, দলত্যাগীদের আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া রূপেন ধরা পড়ে পুলিশের হেফাজতে আছে। এসব যদি তোমাদের অভিনয় না-হয়, তা হলে এতক্ষণে তো মারের চোটে সব কথা সে কবুল করে ফেলেছে। তুমি এখন যেতে পারো।

সর্দার!

ইউ মে গো। তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে আমার দলের বহু লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। আজই সন্ধ্যায় দিঘার সৈকতে সাত-সাতজন প্রাণ হারিয়েছে। ওই হাবা ছেলেটা যখন অসমঞ্জবাবুকে আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসছিল তখন।

অ। তা হলে আমি আপনাদের দলে ফিরে আসতে পারছি না?

না।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে সুখেন সর্দারের দিকে তাক করে বলল, এই অস্ত্রটা কতখানি পাওয়ারফুল তা নিশ্চয়ই জানা আছে?

জানি।

তা হলে শিগগির বলো, অসমঞ্জবাবুর ছেলে আর বউকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

আমার পাগড়িটা খুলে দেখো। হয়তো এর ভেতরে থাকতে পারে।

রসিকতা রাখো। এই রিভলভার আমি তোমার কপালে ঠেকিয়ে রাখলাম। তোমার দলের লোকেদের এখনই বলো তাদের ছেড়ে দিতে! না হলে তুমি এখনই মরবে।

সুখেন, তুমি বড় বোকা। তুমি কি জান, তোমার পেছনে আমার কত লোক দাঁড়িয়ে আছে? রিভলভারটা এখান থেকে না-সরালে ওরাই তোমাকে বরাবরের জন্য সরিয়ে দেবে।

জানি। আমি মরবার জন্য তৈরি হয়েই এখানে এসেছি, আমাকে কেউ এতটুকু আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে আমি তোমার খুলি ফুটো করে দেব।

হায় হায় রে!

বলে একটু নড়বার চেষ্টা করতেই সুখেন বলল, খবরদার হাত ওঠাবে না। আগে যা বলি তাই করো। এখনই ওদের মুক্তি দাও, এক, দুই, তিন।

রুখ গয়া কিঁউ? চালাও গোলি। ম্যায় মরনেকে লিয়ে তৈয়ার হুঁ।

অ্যাটম আর পেটো এই সব দেখে খুবই হকচকিয়ে গেল। ওরা ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখল অন্তত দশজন ভয়ংকর চেহারার সশস্ত্র লোক নিঃশব্দে কখন যেন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

সর্দার একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন।

সুখেন বললল, উঁহু। আগে ওদের মুক্তি দাও, তারপর ওইসব করবে। আমি নিজে বাঁচব না জানি। তবুও তোমাকে আমি মারব।

চোখের পলকে অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। তারপরই 'গুড়ুম' করে একটা শব্দ। এবং পরক্ষণেই একটি চাপা আর্তনাদ।

আলো জ্বলে উঠল আবার। ঘরের মেঝেয় রক্তাপ্লুত অবস্থায় সুখেনকে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে একবার শুধু বললেন, বদতমিজ কাঁহাকা। তাঁর হাতে একটি ঝকঝকে রিভলভার শোভা পাচ্ছে।

কয়েকজন লোক সুখেনকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

সর্দার অ্যাটম ও পেটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে দুশমনি করার পরিণাম তো দেখলে? আশা করি আমার কাজ একটু যত্ন নিয়েই করবে।

অ্যাটম আর পেটো বলল, সর্দারজি, আমরা ওই হাবা ছেলেটার মতো বোকামি করব না। আর বেইমানি করার তো প্রশ্নই ওঠে না! আমরা লিডার খুঁজছিলাম। পেয়ে গেছি। এখন যন্তর দিন। বাকি একটাকে শেষ করে আসছি।

সর্দার সুখেনের হাত থেকে খসে পড়া পুলিশের রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন এটাই নিয়ে যাও। খুব সাবধানে কাজ করবে। মনে রেখো, একটু অসাবধান হলেই মরবে তোমরা। পুলিশেরাই মারবে তোমাদের।

অ্যাটম আর পেটো যেই বেরোতে যাবে, তখনই সেই লোকদুটো, মানে যারা ওদের নিয়ে এসেছিল তারা এসে বলল, বাইরে খুব গোলমাল শুরু হয়ে গেছে সর্দার।

কীরকম!

জঙ্গলের ভেতর দলে-দলে পুলিশ এসে ঢুকছে।

মাত ডরো।

আর সেই পুলিশ অফিসার। মানে মি. অসমঞ্জ রায়। যিনি দিঘা সৈকতে আমাদের গুলিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি হাসপাতালে মারা গেছেন।

আপশোশ কী বাত। তা কী আর করা যাবে? ছেলেটা তো আগেই মরেছে। এখন বাকি রইল মা-টা।

আমাদের মনে হয় ওঁকে আর অযথা আটকে না-রেখে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক।

সর্দার তেমনই শান্তভাবে মৃদু হেসে বললেন, নেহি। জগজিৎ সিং জ্যাঙ্গোর থাবা থেকে কারও মুক্তি নেই বন্ধু। ওঁকেও মরতে হবে! আপনা থেকেই যখন ক্রাইমটা তৈরি হয়ে গেছে, তখন এই তো ভাল। জ্যাঙ্গোর ক্যারেকটার বুঝতে এই রহস্যটা আরও রহস্যময় হয়ে উঠুক। পুলিশ-গোয়েন্দারা ভাবুক। ভেবে ভেবে কূলকিনারা হারাক। কিন্তু ক্রাইমের জগতে এই হত্যাকাণ্ডের কোনওরকম সমাধান যেন কখনও না হয়। আমরা টাকা চাইলাম না, পয়সা চাইলাম না, কোনও শর্ত রাখলাম না, শুধু অকারণে একটা ফ্যামিলিকে স্রেফ পুলিশে চাকরি করার অপরাধে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু কেন? কেউ জানবে না। এরই নাম প্যানিক। এইরকম মাঝে মধ্যে অপ্রয়োজনে দু'-একটা খুনখারাপি না-করলে ওরা কী করে বুঝবে মি. জ্যাঙ্গো কীরকম ডেঞ্জারাস?

তা হলে বলুন, কী ভাবে কী করব?

যা করবে তা হল স্রেফ ঠান্ডা মাথায় খুন। তোমরা নতুন রাস্তা দিয়ে চলে যাও। আমাদের এলাকার বাইরে গিয়ে ওই মহিলাকে বলবে 'মুক্তি দিলাম'। এই ছেলেদুটি ওই মহিলাকে সমুদ্রতীর ধরে দিঘার দিকে নিয়ে যাবে।

তারপর?

তার আর পর নেই। দূর থেকে ওই মহিলার জন্যে তোমরা একটি মাত্র বুলেট খরচা করবে। কেমন?

অ্যাটম বলল, ওই লোকটাকে মারবার কী হবে তা হলে? যাকে মারবার জন্যে আমরা যাচ্ছিলাম?

দরকার নেই। সে এখন লকআপে কড়া পাহারায় আছে। নয়তো সে নিজেই এইসব পুলিশদের পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে। ওকে আমরা এ যাত্রা নয়, অন্য সময় সরিয়ে দেব।

এমন সময় বুম বুম করে কয়েকটা শব্দ।

সর্দার হেসে বললেন, যাক। এইদিক দিয়ে পুলিশের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে আমরা বেঁচে গেলাম। এদিকের মুখ ডিনামাইট চার্জ করে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বাকি রইল শুধু সমুদ্র-মুখটা।

অ্যাটম বলল, আমরা যদি ওই মহিলাকে নিয়ে সমুদ্র-মুখ দিয়েই বার হই তো ক্ষতি কি?

সর্দার এক মিনিট কী যেন ভেবে বললেন, না। না। না। রূপেন কি এদিকের কথা পুলিশকে না-জানিয়েছে ভেবেছ? তোমরা নতুন পথ দিয়ে যাও। আর

শোনো, আমাদের দলের মেয়েদুটোকেও বাইরে বার করে দাও। ওদের বলে দাও ওরা যেন কাছাকাছিই থাকে। পরে আমরা ওদের খুঁজে নেব।

সর্দারের কথামতো তাই করা হল। সর্দার নিজে এসে সুজাতাদেবীকে মুক্তি দিলেন। বললেন, আপনাকে আমরা ছেড়ে দিলাম মিসেস রায়। আপনি এদের সঙ্গে যেতে পারেন।

সুজাতাদেবী আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, কিন্তু আমার ছেলে? সে কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

এখন আপনি তার কাছেই যাবেন। তাকে অন্য এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। সেখানে খুব কান্নাকাটি করছে সে। তার জন্যেই আপনাকে নিয়ে আসা হয়েছে। যান।

সত্যি বলছেন, আমাকে আমার ছেলের কাছে নিয়ে যাবেন?

মিথ্যে বলে লাভ কী? যান দেরি করবেন না। আপনার ছেলের কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।

সুজাতাদেবী আশান্বিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সর্দার অন্য মেয়েদুটোকে বললেন, তোমরাও যাও, তোমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে এখনকার মতো।

এমন সময় সমুদ্র-মুখের সুড়ঙ্গর দিক থেকে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল দু'জন লোক, সর্দার! এই দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি। এই শয়তানটা ছদ্মবেশে এর ভেতরে দু'জন পুলিশকে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল।

আরে! এ কী! রূপেনবাবু! এ কী চেহারা তোমার! একেবারে যোগীরাজ হয়ে গেলে রাতারাতি? বাঃ ভাই। তা জেনেশুনে সাপের গর্তে আঙুল ঢোকাতে এসেছিলে কেন?

ছদ্মবেশী রূপেন রক্তচক্ষুতে সর্দারের দিকে তাকিয়ে থুঃ করে থুতু ফেলল। সর্দার বললেন, এর সঙ্গের পুলিশদুটো কোথায়?

সাদা পোশাকের পুলিশ? তাদের দুটোকেই আমরা শেষ করে দিয়েছি।

ভেরি গুড। বলেই রূপেনের নকল জটা ও দাড়ি ধরে টেনে দিলেন সর্দার। টানা মাত্রই খুলে এল সেটা।

রূপেন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার, কিন্তু পারল না।

সর্দার ওর অবস্থা দেখে হেসে বললেন, ইঁদুর জাঁতাকলে পড়লে ঠিক তোমার মতন করে। তোমার বন্ধু সুখেনের সঙ্গে দেখা করবার নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমার? এখন আমরা তোমার জন্যে সেই ব্যবস্থাই করব। তোমরা দু' বন্ধুতে পাশাপাশি শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে এবার। বলেই অ্যাটমকে বললেন, এই

ছোকরা! তুমি তো কথায় কথায় মানুষ খুন করতে পারো শুনেছি। পারবে খুব সামনে দাঁড়িয়ে এই ভণ্ড সাধুটার ভণ্ডামি দূর করে দিতে?

অ্যাটম বলল, কেন পারব না? বলে একবার পেটোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

পেটো বলল, আমি।

অ্যাটম বলল, না, আমি।

সর্দার বললেন, ঠিক আছে। তোমরা দু'জনেই মারো। একসঙ্গে। এই নাও আমারটাও নাও। বলে নিজের রিভলভারটাও বার করে পেটোর হাতে দিলেন।

অ্যাটম আর পেটো দু'পা পিছিয়ে এল।

সর্দার কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, রেডি? ওয়ান, টু, থ্রি।

অ্যাটম ও পেটোর রিভালভার গর্জে উঠল 'গুডুম, গুডুম, গুডুম।'

একটা পেটে, একটা বুকে, একটা কপালে।

রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন জগজিৎ সিং জ্যাঙ্গো। অভাবনীয় ব্যাপার। চ্যাংড়া ছোঁড়াদুটো করল কী!

অ্যাটম তবুও শান্ত না। রূপেনকে যারা ধরে এনেছিল তাদের বলল, শিগগির ছেড়ে দাও ওঁকে। ছাড়ো।

তারা হতভম্ব হয়ে রূপেনকে ছেড়ে দিতেই পেটো ওর রিভলভারটা রূপেনের হাতে দিয়ে বলল, দাদা! এবার আপনার কাজ আপনি করুন। আমরা এঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুজাতাদেবী অ্যাটমকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কে বাবা তুমি। এই বিপদে এমন করে আমাদের সাহায্য করলে?

আমরা আপনার ছেলে মা। আমাদের তো মা নেই। এখন থেকে আপনাকেই আমরা মা বলে ডাকব।

বেশ। তাই ডাকবে।

তা হলে চলুন। আর এখানে একটুও থাকা উচিত নয়। কখন কী বিপদ ঘটে কে জানে?

রূপেন ততোক্ষণে সব ক'টাকে শুইয়ে দিয়েছে মাটিতে।

অ্যাটম বলল, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলে আসুন দাদা। এখানে একা না থাকাই ভাল। আপনার বন্ধু সুখেনবাবু একটু আগেই সর্দারের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

রূপেন বলল, তোমরা এক কাজ করো। ওঁকে থানায় পৌঁছে দিয়ে পুলিশ নিয়ে এদিকে চলে এসো। আমি ততক্ষণ আড়ালে কোথাও লুকিয়ে থেকে ঘাঁটি পাহারা দিই। যাতে ওরা এখান থেকে পালাতে না পারে।

অ্যাটম ও পেটো সুজাতাদেবীকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে ঘাঁটির বাইরে সমুদ্র-মুখে এসে পড়ল।

সুজাতাদেবী বললেন, আমার ছেলের কোনও খবর জান? আমার বাপ্পা! সে কি বেঁচে আছে?

তার জন্যে চিন্তা করবেন না মা। সে আমাদের জিম্মায় নিরাপদ আশ্রয়েই আছে। আগে আমরা আপনাকে থানায় পৌঁছে দেব। তারপর তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব আপনাদের কাছে।

ওরা সমুদ্রতীরে ধরে খুব জোরে পা চালিয়ে দিঘার দিকে রওনা দিল। অ্যাটম আর পেটো অসমঞ্জবাবুর মৃত্যু সংবাদটা বেমালুম চেপে গেল সুজাতাদেবীর কাছে। কী জানি যদি উনি এ সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েন, তা হলে তো ওঁকে নিয়ে পথ চলাই দায় হবে।

যাই হোক। বেশি দূর যেতে হল না। এক বিরাট পুলিশবাহিনী টহল দিচ্ছিল এক জায়গায়। ওরা সেখানে গিয়ে সুজাতাদেবীকে তাদের হাতে তুলে দিয়েই রূপেনের কথা মতো এক ঝাঁক পুলিশ নিয়ে চলে এল সমুদ্র-মুখে। কিন্তু এ কী! কোথায় কী? সমুদ্র-মুখের সেই সুড়ঙ্গপথ তখন ধস নেমে রুদ্ধ হয়ে গেছে। রূপেন কেন, কারও অস্তিত্বই আর সেখানে নেই।

না থাক। ওরা আবার সেই অন্ধকারে পথ চিনে বালিয়াড়ি আর জঙ্গল পার হয়ে চন্দনেশ্বরের দিকে চলল। রাত শেষ হয়ে এসেছে তখন। ভোরের পাখিরা কলরব শুরু করে দিয়েছে। আকাশের তারাগুলি তখনও জ্বলছে মিটিমিটি। অনেক পথ পার হয়ে ওরা যথাস্থানে এসে পৌঁছল।

অ্যাটম আর পেটো সেই গাছতলায় পৌঁছে চেঁচিয়ে ডাকল, বাপ্পা। বাপ্পাভাই নেমে এসো। আমরা এসে গেছি।

কিন্তু না। ওদের অনেক ডাকাডাকিতেও নেমে এল না বাপ্পা। অ্যাটম আর পেটো সেই শক্ত লতা ধরে চড় চড় করে ওপরে উঠে দেখল কেউ কোথাও নেই। আবার রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেছে ছেলেটা।

দশ

না। দীঘা সৈকতে আর কোনও আতঙ্ক নেই। আজকের এই সূর্যকরোজ্জ্বল সুন্দর সকালে সবার মুখে তাই হাসি। অঞ্চলের সন্ত্রাস কুখ্যাত দস্যু জ্যাঙ্গোর মৃত্যু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়েছে সকলকে। ওদের দলের কাউকেই ধরা যায়নি যদিও, তবুও নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই ধস চাপা পড়ে মরেছে বলে পুলিশ-প্রশাসন, জনসাধারণ সবাই খুশি।

খুশির আরও একটা কারণ আছে।

কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে অসমঞ্জবাবুর মৃত্যুসংবাদটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও, আজ সকালে জানা গেছে তিনি বেঁচেই আছেন। এবং সুস্থ শরীরে এখানকার হাসপাতালে বিশ্রাম করছেন। জ্যাঙ্গোর দলের আততায়ীরা তাঁকে গুলি করলেও সেটি তাঁর বাঁ কাঁধের ওপর দিকে লাগে। সাময়িকভাবে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন যদিও, এখন তিনি অপারেশনের পর সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে যেতে যেটুকু সময় লাগে।

কিন্তু তবুও এই খুশির শেষেও একটু অখুশির রেশ আছে। দিঘা সৈকতে আতঙ্ক না থাকলেও এখন যা আছে তা শুধুই রহস্য। অর্থাৎ যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই বাপ্পাই তো নেই।

সুজাতাদেবী পাষাণপ্রতিমার মতো বসে আছেন।

অসমঞ্জবাবু উদাস চোখে বসে আছেন জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে। এছাড়া উপায়ই বা কী? আর কিছুই তো ভাবতে পারছেন না তিনি। অ্যাটম আর পেটোর কথা সুজাতাদেবীর মুখ থেকে শুনেছেন। এই দুই অসম সাহসী ভুঁইফোঁড় হঠাৎ না গজালে বাপ্পা বা সুজাতাদেবী কারও হদিসই পাওয়া যেত না। সুজাতাদেবী ফিরে এসেছেন। কিন্তু বাপ্পা? বাপ্পা কই? কোথায় গেল ছেলেটা? অ্যাটম আর পেটোও নেই। তাদের নামই শুনেছেন শুধু, কিন্তু তাদের চেহারা দেখেননি। কাল রাত থেকে এরাও নিখোঁজ। যেমন ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছিল তেমনই কর্পূরের মতো উবে গেছে।

অসমঞ্জবাবু এবং সুজাতাদেবী যখন চুপচাপ বসে বসে বাপ্পার কথা ভাবছিলেন সেই সময় হঠাৎ বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল।

একজন লোককে ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পুলিশের লোকেরা। এটা হাসপাতাল হলেও আলাদা একটা কেবিন, তাই রক্ষে। অসমঞ্জবাবু লোকটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। এ তো সেই লোক যাকে তিনি মনে মনে সন্দেহ করেছিলেন। লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘরের মেঝেয়। ওর হাতের বল্লমটি ছিটকে পড়ল এক কোণে! লোকটি মেঝে ধরে কোনওরকমে উঠে বসল। তারপর বল্লমটি টেনে নিল ধীরে ধীরে। বল্লমের ডগায় জমাট লাল রক্ত।

এ কী! রক্ত! রক্ত কেন?

ওকেই জিজ্ঞেস করুন স্যার। এই বল্লমটা দিয়ে একজন লোককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে তাকে টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসছিল। লোকটা যে এরকম শয়তান তা আমরা এর আগে বুঝতে পারিনি। উঃ কী সংঘাতিক!

অসমঞ্জবাবু বললেন, তাই যদি হয় তা হলে ওকে আমার কাছে নিয়ে এলে

কেন? থানায় নিয়ে যাও।

থানাতেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগে ও একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

আমার সঙ্গে? কেন, কী ব্যাপার!

লোকটি আস্তে করে বলল, বাবু! বাবুমশায় গো! আমার অপরাধ লিবেন না,

আমার নাম অ্যান্টনি ধিড়িঙ্গি
নইকো ট্যাঁস নই ফিরিঙ্গি
নই হিন্দু নই মুসলমান
নই পার্শি নই কেরেস্তান।

কিন্তু বাবু আমি এক মনিষ্যি বটে। এই যে বল্লমের ডগায় লাল অক্তটা দেখতেছেন এই অক্ত আমার শরীলেও বইছে। সবাই বলে আমি নাকি 'ব্রেনলেস'। বাট আয়্যাম নাউ সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড। আই নোজ, টু প্লাস টু ইজিকল্টু ফোর। থ্রি ইনটু থ্রি ইজিকল্টু নাইন, অ্যান্ড ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইজিকল্টু জিরো। আমি দীর্ঘদিন ধরে একটা লোককে খুন করব ভাবছিলাম। আজ করেছি। সে আমার একমাত্র সন্তানকে বিপথগামী করেছে। অনেক সময় হাতের মুঠোয় লোকটাকে পেয়েও কিছু করতে পারিনি। কারণ ওকে খুন করে আমি জেলে গেলে আমার ছেলেকে রক্ষা করত কে? এখন আমার ছেলে নেই। কিন্তু আমি আছি। আমার জেল হলে আমি সুখে থাকব। ফাঁসি হলেও দুঃখ নাই।

অসমঞ্জবাবু বললেন, বেশ তো। কিন্তু এই ব্যাপারে তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?

দুর্গা মায়ি বাচাকা রাখ্খা। শুধু আমার একটা প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে। খুনিরা তো খুন করে পালায়। ধরা পড়লে তাদের ফাঁসি হয়। কিন্তু আমি যে খুন করে খুনের লাশ নিয়ে শহরময় ঘোরালাম আমার কী শাস্তি হবে? আমি নিজে ধরা না-দিলে আপনাদের পুলিশ আমাকে ধরতে পারত না। তা যদি পারত তা হলে বাবু, যে ছেলেটা আপনাদের চোখের সামনেই 'গুম' হয়ে ছিল তাকে আপনারা ঠিকই খুঁজে বার করতে পারতেন।

কার কথা বলছ তুমি?

আপনি একজন ঝানু গোয়েন্দা। বুঝতে এত দেরি করলেন বাবু? আমি আপনার ছেলের কথাই বলছি। আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আমার ছেলেটাই তো ফিরল না। তা বাবু আমার ছেলের রক্তের দামটা আপনারা কীভাবে দেবেন? খারাপ কাজ করলে তো আপনাদের আইনে শাস্তি মেলে। কিন্তু ভাল কাজ করলে তার জন্যে কিছু ইনাম তো মেলা উচিত?

আমার ছেলে ডাকু ছিল, লুটেরা ছিল, আইনের চোখে দাগি ছিল। কিন্তু বাবু আপনার বউ-বাচ্ছার জান বাঁচাতে সে তার জীবন দিয়েছে। আমার ছেলের নামে হুলিয়া ছিল বাবু। তাই আপনার কাছে আমার একটাই আর্জি স্রেফ ইনাম হিসেবে ওর নামের পাশে একটু কিছু ভাল কথা লিখে দেবেন।

অসমঞ্জবাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি কার কথা বলছ বলো তো? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

লোকটি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল, আমি ওই হতভাগা সুখেনটার বাবা বটে।

অসমঞ্জবাবু এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি সুখেনের বাবা?

হ্যাঁ। আমি ওর বাবা। তবে বাবু, আমি তো শ্রীমান অ্যান্টনি ধিড়িঙ্গি। আমি একটা খুনী। আমি নেউল দাসকে মার্ডার করে রাস্তায় ঘোরাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না। ওই ব্যাটা নেউল দাস আপনার ছেলেটাকে নিয়ে ভাগছিল। ভাগ্যিস চোখে পড়ল আমার। রাগের মাথায় দিলাম বল্লমটা ওর পেটের ভেতর ঢুকিয়ে।

আমার ছেলেটা? তার কোন ক্ষতি হয়নি তো?

না! বহুকষ্টে ছেলেটাকে উদ্ধার করে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তা ব্যাটা ঠিক টের পেয়ে সেখান থেকে নিয়ে পালাবার তাল করছিল। এখন বাবু আপনি আমাকে ডবল ফাঁসির আসামি সাজিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। তবে কিছু মনে করবেন না বাবু, আপনারা পুলিশরা কোনও কাজের নন। সেই জন্যেই ছেলেটা ক'দিন এত কষ্ট পেল। আপনারা শুধু পেটাতেই জানেন। কাজ জানেন না।

অসমঞ্জবাবু আর সুজাতাদেবী হাঁ হাঁ করে উঠলেন, কোথায়? কোথায় আমার ছেলে? কোনখানে কীভাবে আছে সে?

ছেলেটা আমার কাছেই আছে বাবু। কাল সারারাত সে একটা গাছের ডালে ছিল। এখন বোধহয় ঘুমুচ্ছে। বাবু, আপনারা যখন শহর তোলপাড় করতেন, বন-জঙ্গল ঢুড়ে ফেলতেন, আমি তখন সি আই ডি বনে গিয়েছিলাম। ছেলে হারানোর ব্যথা আমার চেয়ে বেশি আর কে বোঝে বাবু? তবে এই কাজের জন্যে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব যারা দাবি করতে পারে তারা হল অ্যাটম আর পেটো নামে দুটি ছেলে। ওই দুই খুদে বিচ্ছু যেমনই বদ, তেমনই বিশ্বাসী। একটি পোড়ো বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ডে আপনার ছেলেকে আবিষ্কার করার পর যখন তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে ওরা, তখন থেকেই আমি ওদের নজরে রাখছিলাম। ওরা আপনার ছেলেকে উদ্ধার করে চন্দনেশ্বরের বাদামবনে একটি গাছের মগডালে মাচায় শুইয়ে রেখে শয়তানের ঘাঁটি আবিষ্কারে যাচ্ছিল যখন,

আমি তখন সেই নির্জনে বল্লম হাতে একাই ওকে পাহারা দিচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম ওরা ফিরে এলে সবাই একসঙ্গে ছেলেটাকে আপনার হাতে তুলে দেব। কিন্তু তার আগেই দেখি নেউল দাস ছেলেটাকে গাছ থেকে নামিয়ে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ভাগবার তাল করছে। গেল মাথাটা গরম হয়ে...। বাবু, জগজিৎ সিং জ্যাঙ্গোর সব লোকই মরেছে। শুধু বাকি ছিল ওই নেউল দাসটা। ওটাকে আমিই শেষ করে দিলাম।

আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ ধিড়িঙ্গিবাবু। আপনি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন। আই মাস্ট ডু ফর ইউ।

লোকটি বলল, আসুন তা হলে আমার সঙ্গে।

সুজাতাদেবী অসমঞ্জবাবুকে বললেন, তুমি না। এখন তোমার কোথাও না-যাওয়া উচিত। আমি যাই। আমি বাপ্পাকে নিয়ে এসে তোমার কোলে তুলে দেব।

অসমঞ্জবাবু বললেন, না না। আমিও যাব। তা ছাড়া ও একটু আধটু ব্যাথায় আমার কিচ্ছু হবে না। আমার বাপ্পাকে ফিরে পাব শুনে আমি আমার পূর্ব শক্তি আবার ফিরে পেয়েছি তা কী জানো?

অসমঞ্জবাবু ও সুজাতাদেবী দু'জনেই চললেন লোকটির সঙ্গে বাপ্পাকে ফিরিয়ে আনতে। সঙ্গে চলল দু'তিন গাড়ি পুলিশ।

চন্দনেশ্বরের মন্দিরের সামনে গাড়ি থামতেই দলেদলে লোক এসে ভিড় করল সেখানে। দু'জন পাণ্ডা গলায় ফুলের মালা পরানো বাপ্পাকে নিয়ে এসে সমর্পণ করল অসমঞ্জবাবু ও সুজাতাদেবীর হাতে।

বাপ্পা তো মা-বাবাকে পেয়ে খুশির জোয়ারে উপচে উঠে জড়িয়ে ধরল দু'জনকে।

সুজাতাদেবী ও অসমঞ্জবাবুও বাপ্পাকে বুকে জড়িয়ে স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁদের দু'জনেরই চোখে তখন আনন্দের অশ্রু।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে বাপ্পা 'নীতা সিং'-এর নাম লেখা সেই রুপোর পদকটিকে বার করে অসমঞ্জবাবুর হাতে দিয়ে বলল, বাপি এটা তোমার কাছে রেখে দাও। সেদিন বালিয়াড়িতে এই পদকটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমার কী মনে হচ্ছে জান বাপি, এই 'নীতা সিং'কেও বোধহয় আমার মতো জোর করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল কেউ। তুমি তো অনেক কিছুই জান, একটু খোঁজ নিয়ে দেখবে এই 'নীতা সিং' কখনও তার মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে পেরেছিল কি না?

অসমঞ্জবাবু পদকটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, নিশ্চয়ই দেখব বাবা। এখন থেকে এই কাজের দিকেই আমি বেশি করে জোর দেব।

সুজাতাদেবী বললেন, আর দেরি নয়। এখন চলো যাঁর কৃপায় আমরা আমাদের হারানিধিকে ফিরে পেয়েছি সর্বাগ্রে তাঁর পুজোর কাজটা সেরে আসি।

পাগলা অ্যান্টনি মন্দিরের চাতালে বসে ছেলের শোকে মাথা খুঁড়ে বিলাপ করতে লাগল।

অসমঞ্জবাবু ও সুজাতাদেবী বাপ্পাকে সঙ্গে নিয়ে পূজার ডালি হাতে মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

কাকাহিগড় অভিযান

অবশেষে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর দেওঘরেই যাবার ঠিক হল। চন্দনের খুশির আর অন্ত নেই তাই। পুরী অনেকবার গেছে। দিঘাও ফাঁক পেলেই যাওয়া হয়। রাজগির খুবই ভাল জায়গা। বেনারসও বার পাঁচেক যাওয়া হল। অথচ দেওঘর কত কাছে। কিন্তু যাচ্ছি যাব করে, যাওয়া আর হয় না। ওর ছোট মাসি দেওঘরে বিলাসী টাউনে থাকেন। অনেকবার যেতে বলে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু বাবা না-গেলে?

চন্দন একাও যেতে পারে। আজকালকার দিনে পনেরো বছর বয়সের একটি ছেলে সুযোগ পেলে দুনিয়া চষে ফেলতে পারে। কিন্তু এমনই এক পরিবারে মানুষ হচ্ছে চন্দন যে, ওর মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্য দক্ষিণেশ্বরেও বেড়াতে যাবার উপায় নেই ওর। চন্দন ওর স্কুলের লাইব্রেরি থেকে পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযানমূলক বইগুলো এনে পড়ে। মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, জেঠুমণি সবাই পড়েন। চন্দন বলে, ওই সব একরত্তি ছেলেমেয়েগুলো যদি দেশ-দেশান্তরে গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে আসতে পারে, তা হলে আমি একলা কোথাও বেড়াতে যেতে পারব না কেন?

বাবা সুনন্দ চৌধুরী অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। বলেন, ওসব গল্পের বইতেই সম্ভব। বাস্তবে নয়। বুঝলি? যত্ত সব গাঁজাখুরি লেখা। তবে পড়তে কিন্তু ভাল লাগে।

মা বলেন, সে তুমি যাই বলো, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মতো ছেলেমেয়ে হয় না। আর ওদের ওই কুকুর পঞ্চু....।

সুনন্দবাবু হোঃ হোঃ করে হাসিতে ফেটে পড়েন।

চন্দন বলে, বাবা, তোমরা আমাকে কাছ ছাড়া করতে চাও না জানি। কিন্তু জেনে রেখো আমি স্কুলে প্রথম ছেড়ে দ্বিতীয় হইনি কখনও। সামনের বছর ফাইনাল দেব। সেখানে কী হব তা জানি না। তবে এটুকু জেনে রেখো আমার মন কল্পনার জগতে ওড়ে। আমি ঘাটশিলার ফুলডুংরি পাহাড়ে উঠে পূর্ণিমার রাতে চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখতে চাই। আমি বেলপাহাড়ির ডাকবাংলোয় বসে অরণ্যের শোভা দেখে চোখ জুড়াতে চাই। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ঝরনা-জলপ্রপাত এইসব দেখতে আমি খুব ভালবাসি। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সময় পেলেই ওই সব জায়গায় ঘুরতে, তা হলে কত খুশি

হতাম। তোমাদের শুধু পুরী, বেনারস আর দিঘায় পেয়েছে। একবার কীরকম ভুল করে রাজগির চলে গিয়েছিলে। তোমরা মধুপুর গেছ, অথচ দেওঘর যাওনি। দেওঘরে গেলে থাকার অসুবিধে নেই। ছোট মাসি তো প্রায়ই চিঠি লেখেন। এবার হয় সবাই মিলে চলো, নয়তো আমাকে যেতে দাও! আমি ঘরকুনো একটা জড়ভরত হয়ে থাকতে চাই না।

সুনন্দবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের একজন পদস্থ অফিসার। অত্যন্ত দাম্ভিক লোক তিনি। আর দারুণ কড়া মেজাজের মানুষ। দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রং ফর্সা। যেমন-তেমন ফর্সা নয়, একেবারে ধপধপে ফর্সা। সবসময় একটা লাল আভা ফুটে বেরোয় গা থেকে। ঘনঘন চুরুট খান। চায়ের বদলে কফি। চন্দনের কথা শুনে হেসে বলেন, উঁহু। ও তুমি যাই বলো, একা যাওয়া তোমার হচ্ছে না।

স্ত্রী দেবযানীও যেন সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমাটি।

আর চন্দন? শুভ্র সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক কিশোর। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখদুটো ভ্রমরের মতো। মাথায় ঘন চুল। লাল টুকটুকে গায়ের রং। যেন সোনা কুঁদে তৈরি। স্কুলে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে এন্তার গল্পের বই পড়ে। আর কল্পনায় দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখে। কেউ কোথাও থেকে ঘুরে এলে ও অবাক দুটি চোখে তার ভ্রমণের বৃত্তান্ত শোনে। শুনতে শুনতে ওর মনও সেই শোনার মাঝে হারিয়ে যায়।

বাবার কথা শুনে চন্দন বলে, বেশ, একা আমি কখনও যাব না, একা গেলে আমারও কষ্ট হবে বইকী খুব। তোমাকে, মাকে ছেড়ে আমি কখনও কোথাও থাকিনি তো। তবে দেওঘরে যাবার শখ আমার বহুদিনের। তোমরা আমাকে একবার দেওঘরে নিয়ে চলো। যদি যাও ভাল। না-গেলে কিন্তু...।

পালাবে। এই তো? বলে সুনন্দবাবু একটু হেসে বললেন, আসলে ব্যাপার কী জানিস, কোথাও গিয়ে কারও বাড়িতে থাকাটা আমার ঠিক পোষায় না। মনে হয় যেন, সব সময় পরাধীন। দিঘা, পুরী যেখানেই যাই সেখানেই আমি হলিডে হোম পাই। কেমন স্বাধীন ভাবে ঘুরিফিরি। কিন্তু দেওঘরে গেলে তো সেটা পারব না। তোর ছোট মাসি দুঃখ করবে তা হলে। অতএব ওখানে গেলে সেই পরের বাড়িতেই উঠতে হবে।

দেবযানী বললেন, পরের বাড়ি বলছ কেন? আমার বোন। সে যদি তোমার পর হয় তো আপনার জনটা কে শুনি? বেশ, তুমি না যাও না যাবে। চন্দনকে নিয়ে তা হলে এ বছর আমিই যাব দেওঘরে। তুমি তোমার হলিডে হোম খুঁজে যেখানে হোক চলে যেয়ো।

চন্দন আনন্দে লাফিয়ে উঠল, হু-র র-রে।

এমন সময় হঠাৎই একদিন ছোট মাসির চিঠি এল, এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ

নিয়ে। মাত্র কয়েকদিন আগে ওদের বাড়িতে এক বড় ধরনের ডাকাতি হয়েছে। তাইতে ওরা প্রাণে বাঁচলেও, ওদের একজন সাঁওতাল মুনিষকে ডাকাতদলের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে। সেই ডাকাতিতে ওর ছোট মাসির সমস্ত গয়নাগাটি, সিন্দুকের টাকা-পয়সা এবং তার চেয়েও বড় জিনিস ওদের সাতপুরুষের প্রতিষ্ঠা করা অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণ মূর্তিটি খোয়া গেছে! ওই মূর্তির বর্তমান মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা। ওরা এই ব্যাপারে যথারীতি থানা-পুলিশ করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। চারদিক তোলপাড় করেও পুলিশ সন্ধান পায়নি সেই অষ্টধাতু বিগ্রহের। ছোট মাসির অনুরোধ এই দুঃসময়ে ওরা যেন একবার এসে ওদের পাশে দাঁড়ায়। কেন না ওর শাশুড়ি ব্লাড প্রেশারের রুগি। তিনি শয্যাশায়ী এবং স্বামী নিরুপম মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কেমন যেন অপ্রকৃতস্থের মতো হয়ে গেছে।

এই চিঠির পর আর না-যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দিঘা, পুরী, রাজগির সবকিছু নাকচ করে সুনন্দবাবু দেওঘর যাওয়াই ঠিক করলেন।

দেওঘরে যাবার ঠিক তো হল। কিন্তু যাওয়াটা হবে কী ভাবে সেই নিয়ে জোর আলোচনা বসল। ছোট মাসির চিঠি শুধু যে এ বাড়িতেই এসেছিল তা নয়, দেবযানীর বাপের বাড়িতেও গিয়েছিল। দেবযানীর দুই ভাই, অর্থাৎ চন্দনের দুই মামা বীরেন ও ভাস্কর ছুটে এল তাই। বীরেন বলল, রূপার চিঠি পেয়েছিস বড়দি?

রূপা হল ছোট মাসির নাম।

বীরেন বলল, আমার তো জানিস যাওয়ার কত অসুবিধে। তাই ভাবছি ভাস্করটাই যাক। তোরা যদি যাস তো খুবই ভাল হয়। রূপার চিঠি পড়ে যা বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে ওখানকার পুলিশ ঠিক গা করছে না। শুধুই লোকদেখানো তল্লাসি চালাচ্ছে। না হলে এত বড় ডাকাতি, একটা খুন, অথচ একজনও অ্যারেস্ট হল না?

সুনন্দবাবু বললেন, আমরা তো যাচ্ছি। দেখি না ওখানকার ব্যাপারস্যাপার কীরকম। না হলে প্রয়োজনে কলকাতা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ নিয়ে গিয়ে তদন্ত করাব।

বীরেন বলল, চিঠি পড়ে জানা যাচ্ছে এটা মাত্র দিন পনেরোর ব্যাপার। কিন্তু ওই রকম একটি মাল হাপিস করার পক্ষে পনেরোটা দিন বড় কম নয়। এই পনেরো দিনে অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণমূর্তি হয়তো এখন সিঙ্গাপুরে পৌঁছে গেছে। সে মাল কি এখনও ধারেকাছে আছে ভেবেছেন? পুলিশও প্রাথমিক তদন্ত করে কিছু না-পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কাজেই অযথা এক কাঁড়ি টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ করে ওসব গোয়েন্দা পুলিশ করতে না যাওয়াই ভাল।

দেবযানী বললেন, বাঃ! তা হলে লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি একদল ডাকাত এসে লুটে নিয়ে যাবে, আর আমরা তা চুপচাপ মেনে নিয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা না করে বসে বসে কপাল চাপড়াব। এ কী রকম কথা?

বীরেন বলল, ওঃ বড়দি তোদের বোঝাতে পারব না। কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তির চেয়ে কয়েকটা জীবন খুব বড় নয় কি? তোরা তো গেলি না কখনও দেওঘরে। গেলে বুঝতিস কী ভয়ংকর নির্জনে ওরা থাকে। অত টাকাকড়ি গয়নাগাটি, ওই রকম একটা দুষ্প্রাপ্য বিগ্রহ নিয়ে বাস করতে গেলে কয়েক ব্যাটেলিয়ান মিলিটারি সবসময় বাড়ির দোর গোড়ায় রাখতে হয়। না হলে যে কোনও মুহূর্তে জীবন তো বিপন্ন হবেই। ওরা যে বাড়িশুদ্ধ লোককে প্রাণে মারেনি এই ঢের। সাঁওতাল মুনিষটা বোকার মতো প্রভুভক্তি দেখাতে গিয়েই মরেছে। ওই অবস্থায় সশস্ত্র কিছু ডাকাতদলের পিছু নিতে আছে কখনও।

সুনন্দবাবু বললেন, এটা অবশ্য একটা যুক্তিপূর্ণ কথা, আর আমারও মনে হয় এই ধরনের বহুমূল্য কোনও জিনিস ব্যক্তিগত জিম্বায় না রেখে সরকারের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত।

দেবযানী রেগে বললেন, কী যে আবোল-তাবোল কথা বলছ তোমরা। সন্ন্যাসীর দেওয়া প্রতিষ্ঠা করা গৃহদেবতা কাউকে দিতে আছে নাকি?

বীরেন বলল, না দেওয়ার ফলটা দেখতে পেলি তো? যখন যেমন যুগ তখন তেমন ব্যবস্থা নিতে হবে। তুই নিজে তোর গায়ের গয়নাগুলো ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছিস কেন বল? কেন কোথাও বেড়াতে গেলে ওগুলো পরে যাস না? কেন মাসে-মাসে গোছা গোছা টাকা ঘরের সুটকেসে না রেখে ব্যাঙ্কে দিয়ে আসিস?

দেবযানী আর কোনও কথা না বলে গজ গজ করতে লাগলেন।

সুনন্দবাবু বললেন, তবে হ্যাঁ, এই চুরিডাকাতি একেবারে যেমন মেনে নেওয়া যায় না, তেমনি ওদের দিক থেকে কিন্তু ভাল হয়েছে। আর কেউ কোনও কিছুর লোভেই ওদের বাড়ি চড়াও হতে আসবে না। ওই রকম পরিবেশে নিঃস্ব হয়ে থাকাটাই শান্তির থাকা।

বীরেন বলল, যাক। এখন ওসব কথা বাদ দাও। তোমরা কি তা হলে সত্যিই যাচ্ছ?

সুনন্দবাবু বললেন, হ্যাঁ যাচ্ছি।

রূপা খুব খুশি হবে তা হলে, কিন্তু কীভাবে কোন গাড়িতে যাবে ঠিক করেছ কিছু?

ভাস্করমামা বলল, জামাইবাবু, আমি বলছিলাম কী দেওঘরে যাওয়ার পক্ষে তুফানই বেস্ট ট্রেন। সকাল দশটা দশে হাওড়া থেকে ছাড়ে। বিকেল তিন, সাড়ে তিনটে নাগাদ জসিডিতে পৌঁছে দেয়। ওখান থেকে বাস, টাঙ্গা, অটো যা মন চাই

তাই নেবে। চাই কী ট্রেনেও যেতে পারো। লাগোয়া ট্রেনও আছে।

দেবযানী বললেন, সবই তো শুনলাম। কিন্তু তুফানে উঠবে কী করে। ওই হিন্দুস্থানিদের ভিড়ে মারামারি করে গোরু-ছাগলের মতো বোঝাই হতে আমি কিন্তু রাজি নই।

বীরেন বলল, তা হলে বম্বে জনতায় যা।

সুনন্দবাবু সঙ্গে সঙ্গে টাইম টেবল খুলে গাড়ির সময়টা দেখে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এটাও ভাল গাড়ি। আর এ গাড়িটা একেবারে ফাঁকা যায় শুনেছি। আগে সপ্তাহে তিন দিন ছিল। সোম, বুধ, শুক্র। এখন তো দেখছি এটা বাই উইকলি হয়ে গেছে। বুধ আর শুক্র। তা চলো সপ্তমীর দিন বেরিয়ে পড়া যাক।

ভাস্করমামা বলল, আমার কোনও আপত্তি নেই। গোছগাছ করে ফেলো তা হলে।

চন্দন এতক্ষণ চুপ করে সকলের কথা শুনছিল। এবার বলল, তোমরা বেশ তো। সপ্তমীর দিন কোন দুঃখে যাব। আমাদের এত বড় একটা জাতীয় উৎসব। এই সময় কখনও দুর্গাপ্রতিমার মুখ না-দেখে ট্রেন জার্নি করে কেউ? পুজোর ক'দিন আমি কলকাতা ছাড়ছি না। এই সময় গেলে আমারও কিন্তু খুব মন খারাপ হয়ে যাবে।

সুনন্দবাবু বললেন, অবাক কাণ্ড। দেওঘরে যাবার জন্যে এতদিন কী কান্নাকাটি। আর যেই যাবার ঠিক হল অমনি আজ নয়, কাল।

চন্দন বলল, তুমিই বলো না বাবা, পুজোর ক'দিন কী কোথাও যেতে মন চায়? সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখব। চুটিয়ে খাব। দশমীর দিন গুরুজনদের পায়ের ধুলো মাথায় নেব। তারপর একাদশীর দিন যাওয়া।

ভাস্করমামা বলল, তা হলে তো বম্বে-জনতা পাব না। সেই তুফানেই যেতে হবে।

দেবযানী বললেন, কী যে তোমরা তুফান তুফান করো। কেন রাত্তিরে কি কোনও গাড়ি নেই? রিজার্ভেশান করে নিশ্চিন্তে চলো। কোন-থ্রি টায়ার পাও কি না দেখো।

সুনন্দবাবু বললেন, রাতের গাড়িতে থ্রি টায়ারে গেলে আরামে যাওয়া যায় তবে কী জান, ঠিক সকাল বেলায় তো পৌঁছয় না। শেষ রাতে নামিয়ে দেয় সব।

সেই রকমই একটা গাড়ি দ্যাখো যেটা হাওড়া থেকে সবার শেষে ছাড়ে আর জসিডিতে ভোরবেলা পৌঁছয়।

ভাস্করমামা বলল, রেলের ব্যাপার স্যাপারগুলোই যেন আলাদা। এদিকে দেখুন গিরিডির জন্যে কী চমৎকার দিল্লি এক্সপ্রেসে একটা প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয়

শ্রেণীর থ্রি টায়ার বগি লাগিয়ে দেয়। বগিটা মধুপুরে কেটে রেখে দিল্লি এক্সপ্রেস চলে যায়। তারপর গিরিডির লোক্যাল সেই কাটা বগি জুড়ে নিয়ে ভোরবেলা পৌঁছে দেয় গিরিডিতে। সেই রকম কোনও একটা ট্রেনেও যদি দেওঘরের ওই রকম একটা থ্রি টায়ার বগি লাগিয়ে দিত তা হলে কী ভালই না হত। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে যদিও বা একটা বৈদ্যনাথ ধামের বগি দেয় তাও সেটা সাধারণ বগি। থ্রি টায়ার নয়। কাজেই সেই ভিড়ের গুঁতোগুঁতি। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েবসে যাওয়া যাবে না। অথচ দেওঘরের ট্যুরিস্ট কি কম? গিরিডির চেয়েও হাজার গুণ বেশি।

সুনন্দবাবু বললেন, আমার মনে হয় এই ব্যাপারে রেলের নিশ্চয়ই কোনও দূরত্বের ব্যাপার আছে। না হলে দিচ্ছে নাই বা কেন?

দেবযানী বললেন, ওসব কথা থাক। এখন যাবার একটা উপায় করো। মোট কথা রাতের গাড়িতেই যাব আমি।

চন্দন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভাল। রাতের গাড়িতেই যাব আমরা, রাতের গাড়িতে যেতে আমার খুব ভাল লাগে। যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

ভাস্করমামা বলল, দিদি তোর এ ছেলেটা কিন্তু কবি হবে দেখিস।

সুনন্দবাবু মানিব্যাগ থেকে একগোছা নোট বার করে ভাস্করমামার হাতে দিয়ে বললেন, তবে তাই হোক। যাও, গিয়ে চারটে বার্থ রিজার্ভ করে এসো। যে গাড়িতে পাও।

চন্দন বলল, আমি যাব বাবা, ভাস্করমামার সঙ্গে?

যাও। তবে সাবধানে পথঘাট চলবে। মামার হাত ধরে থাকবে সবসময়। বোকার মতো হাঁ করে তাকাবে না কারও দিকে। বুঝলে?

চন্দন 'আচ্ছা' বলে ভাস্করমামার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ওর মন আনন্দে ভরে উঠেছে।

কলকাতা। কথায় বলে এ এক বিচিত্র শহর। সত্যিই তাই। রূপে-রসে-গন্ধে আর বৈচিত্র্যে অনুপম এই শহরের জুড়ি মেলা ভার। সারা ভারতে এমন ব্যস্ত শহর আর কি কোথাও আছে? চন্দনের অন্তত তাই মনে হল। ভাস্করমামার সঙ্গে ফেয়ারলি প্লেসে রেলের বুকিং কাউন্টারের কাছে আসতেই ও দেখল, নানা জাতের নানা ভাষার নানান রঙের মানুষ টিকিটের জন্য মারামারি করছে সেখানে। চন্দন বলল, এরা সব এখানে কী করছে মামা?

ওরা সবাই টিকিট কাটতে এসেছে।

সে কী! এত লোক টিকিট কাটতে চায়? তবে যে শুনি লোকে টিকিট কাটে না।

ভাস্করমামা বলল, আমি খেয়ে যদি বলি খাইনি তো কার কী বলার আছে? তা ছাড়া মিথ্যে কথা বলতে তো ট্যাক্সো লাগে না। ওটা হচ্ছে ভাড়া বাড়ানোর একটা অজুহাত।

ও।

তবে সবাই যে টিকিট কাটে এমন নয়। কিছু কিছু লোক তো আছেই যারা সব সময় ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। বিশেষ করে লোক্যাল ট্রেন গুলোয় চেকিং-এর ব্যবস্থা ভাল থাকে না বলে চ্যাংড়া ছেলেপুলের দল অথবা গরিব দুঃখী লোকেরা ভাড়া বাঁচানোর সুযোগ নিয়েই থাকে। তবে ধরা যখন পড়ে তখন মোটা টাকা ফাইন দেয়, নয়তো জেল খেটে প্রায়শ্চিত্ত করে। দুশো লোক যদি বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপে, সেখানে তিরিশ জন ধরা পড়লেও সাতশো জনের ভাড়া দিতে বাধ্য হয়। কাজেই বিনা টিকিটের যাত্রীরা বরং রেলের আয়ের একটা উৎস বলতে পারিস। সেইজন্যে ইচ্ছে করেই রেল কর্তৃপক্ষ চেকিং ব্যবস্থা জোরদার না করে সাধারণ যাত্রীদের বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপার প্রবণতা বাড়িয়ে দেন এবং লক্ষ লক্ষ লোক টিকিট কাটা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কয়েকটা বিনা টিকিটের যাত্রী ধরে 'লোকসান হচ্ছে' 'লোকসান হচ্ছে' করে চেঁচিয়ে বছর বছর ভাড়া বাড়ান।

চন্দন বলল, তবে যে খবরের কাগজে লেখে রেলের ঘাটতি মেটাতে ভাড়া বাড়ে।

সেটাও আর এক কারণ বইকী। রেলের সম্পদ চুরি যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে সারা ভারতবর্ষের লোক যদি মাত্র একটি স্টেশন যাবার জন্যে একশো টাকা ভাড়া দিয়েও টিকিট কাটে তবুও আমার মনে হয় রেল একদিন উঠে যাবে।

সে কী।

হ্যাঁ।

এই চুরি কারা করে মামা?

সর্ষের ভেতর যে সব ভূতেরা বাস করে তারাই।

এর কি কোনও ওষুধ নেই?

কেন থাকবে না? এর পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে কোনও বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিলেই ঠান্ডা হয়ে যাবে। আসলে আমাদের দেশের সরকার সেরকম কঠোর নন বলেই আশকারা পেয়ে এরা এত মাথায় উঠেছে।

যাই হোক, ভাস্করমামা চন্দনকে একপাশে দাঁড় করিয়ে নিজে টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়াতেই কয়েকজন লোক এসে ছেঁকে ধরল ওদের। একজন জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন দাদা?

মিনিম্যাকাও।

সে আবার কোথায়?

ইমবুমপিপে জানো?

না।

হিক্কাহিয়াও?

না।

তা হলে ফুটে পড়ো।

লোকগুলো একটু সরে গেল। তারপর তাদেরই ভেতর থেকে আবার দু'-একজন এগিয়ে এসে বলল, বলুন না দাদা কোন গাড়ি, কোথায় যাবেন?

ভাস্করমামা এবার আর ফাজলামি না করে বলল, যাব তো দেওঘর। দেখি কোন গাড়ি পাই।

দেওঘর। দেওঘর নামে কোনও স্টেশন নেই। আপনাকে বৈদ্যনাথধামের টিকিট কাটতে হবে। কবে। কবে যাবেন বলুন?

একাদশীর দিন। মানে সাত তারিখে।

লোকগুলো হোঃ হোঃ করে হেসে বলল, সাতাশ তারিখ পর্যন্ত কোনও ট্রেনে একটু বসবার জায়গাও নেই তো, সাত তারিখে কী করে যাবেন দাদা? ক'টা টিকিট?

এই ধরুণ চারটে।

হয়ে যাবে, বেরিয়ে আসুন। টিকিট পিছু এক্সট্রা পঁচিশ টাকা লাগবে।

ভাস্করমামা বলল, আমার কাছে পকেটমারা টাকা নেই বাবা, বুঝলে? ওসব ধান্দাবাজি এখানে না করে কেটে পড়ো দেখি সব।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভাস্করমামার জামার কলারটা ধরে টেনে আনল লাইন থেকে। বলল, কী বললি?

ভাস্করমামাও জেদি খুব। হঠাৎ লোকটার পেটে সজোরে একটা ঘুসি মেরেই চন্দনের হাত ধরে টান দিল, চন্দন! কুইক। কেটে পড়ি আয়। আর টিকিটের দরকার নেই।

কিন্তু হলে কী হয়। ততক্ষণে ওদেরই দলের দু'-তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভাস্করমামার ওপর। একজনের হাতে ধারালো ছুরি।

চন্দন চিৎকার করে উঠল ভয়ে।

বিচিত্র কলকাতা। এত লোক, কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না সাহায্য করতে। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। উলটে একজন কিনা বলল, ঠিক হয়েছে। যেমন ঘাঁটাতে যায় এদের।

কিন্তু কেউ এগিয়ে না এলেও চন্দনের মাথায় তখন 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' চেপে গেছে। সে নিজেই হঠাৎ এক দুর্জয় সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ছুরিধরা লোকটার ওপর। তারপর যে হাতে লোকটা ছুরি ধরেছিল, সেই হাতটা ধরে

এমনভাবে পাকিয়ে দিল যে চিৎকার করে উঠল লোকটা। ততক্ষণে কয়েকজন আর পি এফ মানে রেলের পুলিশ ছুটে এসেছে। তাদের একজন চন্দনের গালে এক থাপ্পর কষিয়ে বলল, এই তুম কাহে কো ঝামেলা লাগা দিয়া। হঠো হিঁয়াসে।

ভাস্করমামা বলল, বাঃ রে। ওর দোষটা কোথায়? ওই লোকটা যে আমাকে ছুরি মারতে এসেছিল তার বেলা?

আর একজন আর পি এফ এসে ভাস্করমামার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল, যাও হঠো। ভাগো হিঁয়াসে।

হাতে মোচড় খাওয়া লোকটার দলের লোকেরা তখন হাসতে হাসতে চলে গেল সেখান থেকে।

এদের এত হাসির কারণটা যে কী চন্দন তা বুঝতে পারল না প্রথমে। পরে যখন রাস্তায় এসে পকেটে হাত দিয়েই শিউরে উঠল ভাস্করমামা 'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে', তখনই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

চন্দন বলল, কত টাকা ছিল মামা?

সে অনেক টাকা। কিন্তু তোর বাবার কাছে কী করে মুখ দেখাব রে? আমি একটা বেকার ছেলে।

চন্দন বলল, তবু শুনি না কত টাকা?

তোর বাবা আমাকে চারশো টাকা দিয়েছিল।

তাতে কী হয়েছে? আমি বাবাকে সব বলব। যাক চারশো টাকা। তবু তুমি তো প্রাণে বেঁচেছ।

তুই কিন্তু বাঁচিয়েছিস আমাকে। যেভাবে হাতটাকে তুই পাকিয়ে দিয়েছিস তাতে ওই হাতে আর কোনদিনও হয়তো ছুরি ধরতে হবে না ওকে। তুই না-আটকালে ও ছুরিটা আমার পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিত।

চন্দন শিউরে উঠে বলল, ওঃ। কী সর্বনাশ যে হত তা হলে। জানো মামা, পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু-না এই রকম সাহসী। আচমকা ভয় না পেয়ে সেটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। প্রতিরোধ করে। বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে না। আমিও বাবলুর মতো ছেলে হবার স্বপ্ন দেখি। মৃত্যু তো একদিন হবেই। তাই মরব বীরের মতোই মরব। কাপুরুষের মতো কেন?

চন্দনের বড় মামা ডালহৌসি পাড়াতেই একটি অফিসে কাজ করতেন। ওরা সেখানে গিয়ে সব কথা খুলে বলতেই ভাস্করমামাকে খুব বকাবকি করলেন বড় মামা। তারপর কিছু নিজের কাছ থেকে, কিছু সহকর্মীদের কাছ থেকে চেয়ে ভাড়ার টাকার হিসেব করে শ'দুই টাকা দিয়ে দিলেন।

সেই টাকা নিয়ে ওরা আর ফেয়ারলিতে নয়, সোজা চলে গেল অন্য একটি সিটি বুকিং-এ। এখানে আবার অন্য ছবি। ভিড় প্রায় নেই বললেই হয়।

যাই হোক, একটা ফর্মে সবকিছু লিখে চন্দনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ভাস্করমামা এনকোয়্যারিতে কী যেন জিজ্ঞেস করতে গেল। একটু পরেই ঘুরে এসে ফর্মে ট্রেনের নম্বরটা বসিয়ে দিয়ে বলল, একটা খুব ভাল গাড়ির সন্ধান পেয়ে গেছিরে। ১০৫ আপ নর্থ বিহার এক্সপ্রেস। গাড়িটা নতুন। সপ্তাহে একদিন মাত্র ছাড়ে। রাত এগারোটায়। হাওড়া থেকে।

তা হলে নিশ্চয়ই গাড়িটা দেরি করে পৌঁছবে। অর্থাৎ আমরা রাতের অন্ধকারে নয়, সকালেই নামতে পারব।

সেই রকম তো আশা করছি।

দু'-একজন লোকের পরই ভাস্করমামা কাউন্টারে পৌঁছতে পারল।

কাউন্টারে পৌঁছেই ফর্মটা এবং দুটো একশো টাকার নোট বুকিং ক্লার্কের হাতে ধরিয়ে দিল মামা।

বুকিং ক্লার্ক ভদ্রলোক চার্টটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, আপনি যে গাড়ি চাইছেন ওটা তো সাত তারিখে নেই। ওটা আছে আট তারিখে। শুক্রবার। তাও তিনটের বেশি বার্থ হয় না।

কেন হয় না?

কেন আবার, কোটা নেই।

চন্দন আর ভাস্করমামা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন, শুনুন এক কাজ করুন। আমি এখানে তিনটে বার্থ দিয়ে দিচ্ছি। বাকি একটা বার্থ বরং অন্য কোথাও থেকে করিয়ে নিন।

ভাস্করমামা বলল, বেশ ঠিক আছে। তাই দিন।

ভদ্রলোক ফর্মটা ফেরত দিয়ে বললেন, তারিখটা বসিয়ে দিন তা হলে। আর যে নামটা কাটা যাবে সেটাও কেটে দিন।

ভাস্করমামা তো আনন্দে ডগমগ। ঘ্যাঁচ করে আগে নিজের নামটাই কেটে দিয়ে তারিখটা আট তারিখ করে ফর্মটা আবার জমা দিল। বুকিং-ক্লার্ক ভদ্রলোক প্রশান্ত বদনে খুব যত্নের সঙ্গে তিনখানি টিকিট নামটাম লিখে ফেরত দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে তাঁর এক সহকর্মীর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে গেলেন।

ভাস্করমামা বলল, কী হল মশাই, আমার ব্যালেন্সটা?

ভদ্রলোক যেন শুনতেই পেলেন না। ভাস্করমামা চেঁচাতে লাগল, ও মশাই শুনছেন? এই যে, এই যে দাদা আমার ব্যালেন্সটা?

ভদ্রলোক এবার এগিয়ে এসে বললেন, কেন আপনাকে ফেরত দিইনি?

না।

এবার নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এবং বিরক্তিভরে বললেন, কত টাকা দিয়েছিলেন যেন?

দুশো টাকা।

একশো টাকার দুটো নোট দিয়েছিলেন না? কেন যে আপনারা ভাঙিয়ে দেন না। এখন ভাঙানি কোথায় পাই বলুন তো? সব পঞ্চাশ, একশো টাকার নোট। বলে হাতড়ে হাতড়ে যা ফেরত দেবার কথা তার চেয়ে দশ টাকা কম দিলেন।

ভাস্করমামা বলল, আর দশ টাকা?

আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই। আপনাদের কাজ করে আমরা কিছু পেয়ে থাকি। পুজোর সময় সামান্য দশটা টাকা দিতে পারছেন না।

ভাস্করমামা বলল, কোথায় পাব দাদা? বেকার ছেলে! আমাকে দশটা টাকা ফেরত দিন। আপনাকে বরং একটা টাকা দিচ্ছি চা খাবেন। বলে একটা টাকা কাউন্টারে গলিয়ে দিতেই একটা দশ টাকার নোট হাতে এল। টিকিট ও টাকা পকেটে নিয়ে কাউন্টার থেকে সরে আসতেই চন্দন বলল, আচ্ছা মামা, এটা তো ঘুষ দেওয়া হল তাই না?

হ্যাঁ।

কিন্তু এক টাকা কেউ ঘুষ খায়?

কেন খাবে না? যাক গে একটা টাকা। তিন-তিনটে টিকিট তো পেয়ে গেলাম।

তবু তোমারটা তো হল না।

না হোক। ও আমি অন্য কোথাও থেকে ম্যানেজ করে নেব। অনেক বুকিং অফিস আছে। না হয় বিনা রিজার্ভেশনেই চলে যাব।

কথা বলতে বলতে ওরা রাস্তায় বেরিয়ে এল। চন্দন বলল, আচ্ছা মামা, ওই লোকটা তো কেমন ভাল জামা-প্যান্ট পরে আছে। চোখে চশমা। কী রকম ভদ্রলোকের মতো দেখতে। সামান্য ওই একটা টাকা নিতে ওর প্রেস্টিজে বাধল না?

ভাস্করমামা দুঃখ করে বলল, নারে। আমাদের দেশে দারিদ্রতাটা এখন এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে, যেখানে পাবলিকের কাছ থেকে টাকা-পয়সা খাবার সুযোগ পেলে কেউই ছেড়ে দেয় না। ওই যে লোকটাকে দেখলি ও মোটা টাকা মাইনে পায়, বোনাস পায়, সপরিবারে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবার পাস পায়। তবুও ওর স্বভাব।

তবে মামা, আমি কিন্তু ও রকম হব না। আমি যদি কখনও বড় হয়ে চাকরি করি তো, জেনে রেখো ভগবানের দিব্যি আমি কখনও ঘুষ খাব না।

চন্দন তুই ভাল ছেলে হ! আমি জানি তুই জীবনে অনেক উন্নতি করবি। তবুও জেনে রাখ ওই যে ভদ্রলোক নির্লজ্জের মতো একটা টাকা ঘুষ খেল। হয়তো ওর সাত-আটটি ছেলেমেয়ে। হয়তো তারা যখনতখন অসুখে ভোগে। হয়তো ওর ঘরে বুড়ো মা-বাবা আছে। এবং দু'-তিনটি আইবুড়ো বোনের বিয়ে দিতে হবে।

হয়তো ওর স্ত্রীর কোনও বড় ধরনের অপারেশন হয়েছে। তাই ওই বাইরের চেহারায় ভদ্রলোকের খোলটাই রয়েছে ওর, কিন্তু ভেতরের ভদ্রসন্তান অনেক আগেই মরে গেছে।

তার মানে তুমি এটাকে সমর্থন করছ মামা? তবে জেনে রেখো, আমি কখনও ওই অবস্থায় পড়লে ঘুষ খাব না, ফলিডল খাব।

তা তুই পারিস চন্দন। তবে সবাই কী তুই? রামকৃষ্ণও নরদেহ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল, পেশাদার খুনিরাও এসেছিল। সবাই কি এক? রাস্তার মাইল পোস্টটাও পাথর আবার কাশীর বিশ্বনাথও পাথর! তফাত আছে বইকী। তবে ওই একটি লোককে দেখেই তুই সকলের বিচার করিস না। কিছু সৎ লোক নিশ্চয়ই আছেন, না হলে দেশটা যেটুকু চলছে এটুকুও চলত না।

ওরা কথা বলতে বলতে কলেজ স্ট্রিটের দিকে এগোল।

ভাস্করমামা বলল, তুই কখনও কফি হাউসে গেছিস?

না মামা। কার সঙ্গে যাব?

চল তোকে নিয়ে কফি হাউসে যাই।

চন্দনের আনন্দের আর শেষ নেই। এমন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো ওর জীবনে এই প্রথম।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই যাবার দিনটি এগিয়ে এল। চন্দনের আনন্দের আর অবধি নেই। ইতিমধ্যে লুকিয়ে সে বাজার থেকে একটা বড় ছোরা কিনে এনেছে। একটা লোক রাস্তার ধারে বসে ছুরি-কাঁচি এবং অন্যান্য জিনিসপত্তর বিক্রি করছিল। চন্দন তার কাছ থেকেই কিনল ছোরাটা এবং সেটা নিজের কাছে সযত্নে লুকিয়ে রাখল। কাউকে বলল না সে কথাটা। সঙ্গে রাখল একটা হুকে বাঁধা নাইলনের দড়ি। কোথায় কী কাজে লাগে তা কে জানে? পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইগুলো সবসময় কাছে রাখে বলেই অনেক ক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্নকে জয় করে ফেলে। পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুর হাতে অবশ্য পিস্তল থাকে। ওর তো সেরকম কিছু নেই। তবে বিপদকালে একটি ছোরার শক্তিও বড় কম নয়।

যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে রাত এগারোটার অনেক আগেই ওরা স্টেশনে এসে পৌঁছল। সুনন্দবাবু বললেন, আজকাল রাত দশটায় ট্রেন ধরতে গেলে কলকাতার লোকেদের বিকেল চারটেয় ঘর থেকে বেরনো উচিত। কিন্তু একথা তিনি মুখে বললেও নিজের বেলায় তা করে উঠতে পারেননি। যাচ্ছি-যাব করেও ঘর থেকে বেরোলেন রাত আটটায়। ভবানীপুর থেকে হাওড়া আসতে সময় লাগল পাক্কা দু'ঘণ্টা। আজ দ্বাদশী হলেও প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা ছিল অনেক। গতকাল বৃহস্পতিবার থাকায় আজই ঠাকুর বিসর্জনের হিড়িক যেন বেশি করে লেগে

গেছে। কিন্তু ট্রেনে ওঠার মুখেই সেএক দারুণ ঝামেলা। কেন না কোনও চার্টেই নাম ছিল না ওদের।

সুনন্দবাবু তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, এরকম তো সাধারণত হয় না। তারিখ ভুল হয়নি তো?

ভাস্করমামা বলল, না। তারিখ, ট্রেন নম্বর সবই তো ঠিক আছে। দেবযানী বলল, আর দরকার নেই আমাদের দেওঘর গিয়ে। চলো ফিরে যাই। খুব হয়েছে। এত নাম রয়েছে অথচ আমাদের নেই?

অবশেষে দু'-একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাদেরই একজন খুঁজে পেতে বার করলেন নামগুলো। আসলে একটু এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দবাবু টিকিট নম্বর মিলিয়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ, এই তো। তাই তো বলি এমন তো কখনও হয় না।

ভাস্করমামার টিকিটটা অন্য বুকিং অফিস থেকে করা হয়েছিল বলে বগিটা আলাদা হয়েছিল। অবশ্য চার্টে নাম খুঁজতে কোনও অসুবিধা হয়নি। যাই হোক। এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সকলে।

চন্দনের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল এতক্ষণ। তীরে এসে তরি ডুববে নাকি রে বাবা?

কিন্তু না। শেষপর্যন্ত সব দিক রক্ষা হল। ওরা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ঢুকে বার্থে বসে জানালার শার্সিটা তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভাস্করমামার অন্য কোচে পড়ায় চন্দনের মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। এমন চমৎকার রাতভ্রমণে একসঙ্গে এসেও ভাস্করমামার অন্যত্র থাকাটা ঠিক যেন মেনে নেওয়া যায় না।

ভাস্করমামা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই বলল, একটা রাত তো। তাও সারা রাত নয়। শেষরাতে মানে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমরা নেমে পড়ব জসিডিতে। ওর জন্য মন খারাপ করিস না চন্দন।

সুনন্দবাবু বললেন, আচ্ছা দাঁড়াও। দেখি একবার আমাদের অ্যাটেনডেন্টকে বলে কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কি না। বলে সহাস্য বদনে এগিয়ে গেলেন অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোকের কাছে। ভদ্রলোক বাঙালি। কী সাম রায় যেন। সুনন্দবাবু তাঁকে সব কথা খুলে বলতেই উনি বললেন, না না। কোনও অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া ওনারাও যখন থ্রি টায়ারে রিজার্ভেশান রয়েছে, তখন অসুবিধা কোথায়? এমনিতেই দশ বারোটা বার্থ ফাঁকা আছে। ওনাকে ওই এগারো নম্বর সাইড লোয়ারে চলে যেতে বলুন।

হু-র-র-র-রে। চন্দন প্রায় আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

ভাস্করমামাও উঠে পড়ল ওই ট্রেনে।

যাক। ভাস্করমামাকে তা হলে আলাদা থাকতে হচ্ছে না। অর্থাৎ চন্দন সব সময়ই ভাস্করমামাকে কাছে পাবে। ওঃ কী মজা। সেই স্বপ্নের দেওঘর। সেই ত্রিকূটের চূড়া। নন্দন পাহাড়। তপোবন।

এসবের কত গল্পই না শুনেছে এতকাল। এখন স্বচক্ষে সব দেখবে, আর সেই দেখার সময় ওর পাশে থাকবে তার অতি প্রিয় ভাস্করমামা। সত্যি, ভাস্করমামাকে যে কী ভাল লাগে ওর, তা কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না। এত ভাল কাউকে লাগে না। ঠিক যেন বন্ধুর মতো। ভাস্করমামা সঙ্গে থাকলে কোনও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশতেও ইচ্ছে করে না ওর। হঠাৎ মা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন, জয় বাবা বৈদ্যনাথ।

কী হল মা?

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে বাবা। তাই বৈদ্যনাথের উদ্দেশে একটা প্রণাম।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আরে সত্যিই তো। এই তো। এই তো চলেছে ধীরে শ্লথ গতিতে। একটু একটু করে আলো ঝলমল জনমানবহীন স্টেশনের প্লাটফর্মের সামান্য পেরিয়ে ট্রেন এখন লিলুয়ামুখো। এ ট্রেন অবশ্য লিলুয়ায় থামবে না। একেবারে বর্ধমানে।

চন্দনরা বাড়িতে অল্প স্বল্প খেয়ে এসেছিল। এখানে আর একটু জলযোগ সেরে নিল। বড় বড় লাড্ডু আর ক্ষীরকদম টপা টপ গালে ফেলে ঢক ঢক করে জল খেয়ে নিল সবাই।

ভাস্করমামা লাড্ডু খেতে খেতে বলল, ট্রেনজার্নিতে সব চেয়ে আমোদের ব্যাপার হল এই খাওয়াটা। আর খেতে গেলেই মনে পড়ে যায় শ্রীমন্তদার মেয়ে সোমার কথা। কী দারুণ মিষ্টিখোর ওইটুকু মেয়ে। মুখে বলবে একদম মিষ্টি খাব না। মিষ্টি খেলে গা গুলোয়। আর মিষ্টি একবার হাতে পেলে রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে গপা গপ। তার ওপর পুরী কিংবা বেনারস বেড়াতে গেলে তো কথাই নেই। ট্রেনে উঠেও মিষ্টি। সেখানে গিয়েও মিষ্টি।

ট্রেন তখন হুড় হুড় করে ছুটেছে। পাশের সিটে পা গুটিয়ে বসে এক বুড়ো আপন মনেই বলল, লেলুয়া গেল।

চন্দন ফিক করে হেসে ভাস্করমামার দিকে তাকাল, লেলুয়া আবার কী গো মামা। লিলুয়া তো।

ভাস্করমামা বলল, চুপ। শুনতে পেলে রেগে যাবে।

ট্রেন ছুটছে তো ছুটছেই। দারুণ স্পিডে ছুটছে। ট্রেনের যাত্রীরা বার্থের ওপর শয্যা পেতে শুয়ে পড়ল সব।

ভাস্করমামা বলল, নে শুয়ে পড়। ভোরবেলা নামতে হবে। চন্দনও শুয়ে পড়ল।

ওর মাথার কাছে ঝোলাব্যাগে সেই ছোরা নাইলন দড়ি সব রেডি। কেন না ও জানে আজকাল ট্রেনজার্নিতে মানুষের নিরাপত্তা নেই, যে কোনও মুহূর্তে চোর-ডাকাতের আবির্ভাব হতে পারে। ও শুয়ে শুয়ে পিট পিট করে দেখতে লাগল সেরকম কেউ ওঠে কি না। উঠলেই দড়িটাকে ল্যাসোর মতো করে চোরের গলায় আটকে মারবে অ্যায়শা টান যে ঘুঘুমশাই ফাঁদে আটকে ছটফটাং। কিন্তু না। অনেকক্ষণ জেগে থেকেও সে রকম কারও অস্তিত্ব টের পেল না ও। অবশেষে ট্রেনের দুলুনিতে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল ওর, ঘুম আর ঘুম।

ঘুম ভাঙল ভাস্করমামার ডাকে, এই ওঠ ওঠ। জসিডি এসে গেছে। এই চন্দন।

চন্দন ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

কীরে। কখন থেকে ডাকছি। উঠবি তো।

চন্দন বলল, যাঃ। এই তো ডাকলে তুমি।

তোকে দু'-তিনবার ডেকেছি। খুব ঘুমিয়েছিস তুই। বাবা-মা সবাই তখন উঠে দাঁড়িয়ে মালপত্তর হাতে নিয়েছেন।

চন্দনও ভাস্করমামার পিছু পিছু ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

শেষ শরতের রাত্রিশেষের এই জসিডিতে এখন রীতিমতো ঠান্ডার ভাব। আর কী সুন্দর মুক্ত বাতাস। চন্দন বুকভরে নিশ্বাস নিল। ওরা ট্রেন থেকে নামার একটু পরেই ছেড়ে দিল ট্রেন। খুব অল্প সময় স্টপেজ। চলে যাওয়া ট্রেনের লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে চন্দন আপন মনেই একবার টা-টা করল।

টিকিটটা ওদের বৈদ্যনাথধাম পর্যন্তই ছিল। তাই ওভার ব্রিজ পেরিয়ে ওপাশের প্ল্যাটফর্মে ওরা গেল ওরা। বৈদ্যনাথধামের ট্রেনও তখন দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সে কী অপূর্ব পরিবেশ।

এরই মধ্যে কম্বল সোয়েটার সব বেরিয়ে পড়েছে এখানে। কিছু বাঙালি যাত্রী থাকলেও বেশির ভাগ যাত্রীই হিন্দুস্থানি। কিছু প্লাটফর্মে কিছু ট্রেনের কামরায় উঠে বসে আছে। কেউ কেউ ট্রেনের কামরায় বাঙ্কে উঠে শুয়ে আছে। চন্দনরাও একটা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন বগি দেখে উঠে বসল। এখন শেষরাতের ট্রেনে যাত্রী খুব বেশি নেই। কাজেই বেশ আরাম করে গুছিয়ে বসা গেল।

সুনন্দবাবু বললেন, বাবাঃ। বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে তো এখানে?

চন্দন আর ভাস্করমামা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। ওদেরও শীত করছিল। তবে গায়ে মাখছিল না।

দেবযানী বললেন, এই তোমরা উঠে এসো ভেতরে। না হলে ঠান্ডা লাগবে।

চন্দন বলল, না। আমি এখুনি ভেতরে ঢুকব না। আমার একটুও শীত করছে না। তা ছাড়া ট্রেন ছাড়তেও দেরি আছে। এই অন্ধকারে কী চুপচাপ ভূতের মতো বসে থাকা যায়?

সত্যিই বগিতে আলো ছিল না। ছিল না মানে, জ্বলছিল না। সব বগিই অন্ধকার। ইঞ্জিন না লাগা পর্যন্ত জ্বলবে না।

ভাস্করমামা বলল, এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট চুপচাপ বসতে হবে।

সুনন্দবাবু বললেন, ততক্ষণে একটু করে চা খেয়ে নিতে পারলে হত। একটা ভাল দেখে চা-ওয়ালা ডাকো তো দেখি?

ভাস্করমামা বলল, না না। এখানে চাওয়ালাকে ডেকে চা খাবার দরকার নেই, রেলের স্টলে যে চা তৈরি হয়, তা খুব ভাল। ওই চা-ই নিয়ে আসছি আমি। বলে স্টলে গিয়ে চার কাপ চায়ের অর্ডার দিল ভাস্করমামা।

সুনন্দবাবু নিজেও ট্রেন থেকে নেমে এলেন এবার। তারপর ওদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

স্টলওয়ালা চা দিলে, এক কাপ চা জানালা গলিয়ে দেবযানীর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েই চা খেতে লাগলেন।

ভাস্করমামা আর চন্দনও চায়ের পেয়ালা নিয়ে পায়চারি করতে করতে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। ভাস্করমামা চা খেতে খেতেই বলল, জানিস চন্দন, যে বাঙালি এই শেষরাতে জসিডি স্টেশনে চা খেতে খেতে একটু পায়চারি না-করল তার জীবনই বৃথা।

চন্দন বলল, সত্যি মামা, চা যে কতখানি এনার্জিদায়ক, তা আজই প্রথম অনুভব করলাম। সত্যি, কী ভাল যে লাগছে।

চা খাওয়া শেষ হলে কাপ জমা দিয়ে ভাস্করমামা বলল, চল, একটু ওদিক করে এগিয়ে চল। একটা জিনিস দেখাব তোকে।

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। মস্ত প্লাটফর্ম। তাই ধরে বেশ খানিকটা এগোবার পর এক জায়গায় ওরা অনেক পাখির কলরব শুনতে পেল। আকাশ তখনও অন্ধকার। তবে সামান্য ফিকে হয়ে আসছে। কিন্তু তারায়-তারায় ভরে আছে আকাশ।

ভাস্করমামা ডানদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে দূরের দিকে অন্ধকারে সব ঢাকা রয়েছে দেখছিস, ওই দিকে হল ত্রিকূট পাহাড়। আর এ পাশেও আছে অনেক পাহাড়ের সারি। এগুলোর নাম জানি না। আমাদের এই ট্রেনটা নন্দন পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবে।

'নন্দন পাহাড়' নামটা খুব মিষ্টি, না? ওই পাহাড়ে ওঠা যায়?

ভাস্করমামা বলল, কেন যাবে না? আসলে ওটা একটা ঢিবি। আমার মতে

ওটাকে কখনওই পাহাড় বলা উচিত নয়। টিলা অবশ্য বলা যেতে পারে।

হঠাৎ পি-ই-প করে একটা ইঞ্জিন ভকস ভক ভকস ভক করতে করতে পাশ দিয়ে চলে গেল।

ভাস্করমামা বলল, চল, আর ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। এই ইঞ্জিনটাই আমাদের গাড়ির সঙ্গে লাগবে। সময়ও বেশি নেই।

ওরা ধীরে ধীরে ওদের বগিটার দিকে এগিয়ে চলল।

এমন সময় যমদূতের মতো একটা লোক এগিয়ে এল ওদের দিকে। লোকটা ভাস্করমামার দিকে তাকিয়ে বলল, কোথায় যাবেন বাবুরা, দেওঘর?

হ্যাঁ।

উঠবেন কোথায়?

বিলাসী টাউন।

কে পাণ্ডা আছে?

শংকর।

শংকর। কোন শংকর?

বিলাসী শংকর। তবলা বাজায়। কেরামৎ খাঁ সাহেবের ছাত্র।

অ। তা ওখানেই উঠবেন, না অন্য কারও বাড়ি যাবেন?

আমরা যাব একেবারে শেষমাথায়। নিরুপম বসুর বাড়ি।

অ। সমঝ গিয়া। তো তুম চারুভিলা যাওগে?

হ্যাঁ। চারুভিলাতেই যাব।

কুছ দিন পহলে বহত বঢ়িয়া ডাকাইতি হো গিয়া হুঁয়া পর।

তুমি তো সবই জান দেখছি। তা ওই চুরি যাওয়া মূর্তিটার কোনও হদিস পাওয়া গেছে?

লোকটি আর সে কথার কোনও উত্তর না দিয়েই চলে গেল।

ভাস্করমামা আর চন্দনও এল ওদের বগিটার কাছে।

একটু পরেই, ইঞ্জিন জোড়া লাগল ট্রেনে। সব কম্পার্টমেন্টে আলো জ্বলে উঠল। যথাসময়ে ছাড়ল ট্রেন। শেষরাতের আবছা আঁধারে সে এক অপূর্ব অভিযান।

বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে ট্রেন যখন থামল, আকাশের ঘোর তখনও কাটেনি, জসিডি থেকে বৈদ্যনাথধাম মাত্র একটিই স্টেশন। এর মাঝে আর কোনও স্টেশন নেই। ওরা সকলে স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে রইল।

কয়েকজন পাণ্ডাও ওদের তীর্থযাত্রী ভেবে শুরু করল নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু শংকর পাণ্ডার নাম শুনে বেশি বিরক্ত না করে সরে পড়ল যে যার।

এখানকার পাণ্ডাদের ভেতর এই একটা ভাল নিয়ম রয়েছে, যে এরা যেমন নতুন যাত্রীদের নিজের করে পাবার জন্য ঝুলোঝুলি করে, তেমনি অপর কোনও পাণ্ডার যাত্রী পরিচয় পেলে আর তাকে জ্বালাতন করে না।

ভাস্করমামা বলল, শংকর আমাদের বহু দিনের পুরনো পাণ্ডা। আসলে ওর বাবাই পাণ্ডা ছিল আমাদের। এখন বাবা তো নেই। শংকর আছে। তবে শংকর এইসব যাত্রীধরা ব্যবসা করে না। কেন না ও এখন এই অঞ্চলের এক বিখ্যাত তবলিয়া। ওর ছেলেরাই এ সব কাজ করে।

দেবযানী বললেন, আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগে এই সব ব্যাপারগুলো, তীর্থস্থানে আসব, ঠাকুর দর্শন করব, আমার যা মন চায় তাই দিয়ে পুজো দেব এই তো জানি। পাণ্ডার খপ্পরে পড়ব কেন?

ভাস্করমামা বলল, তুই বুঝিস না দিদি। আসলে যে কোনও তীর্থে পাণ্ডারা যেমনই বিরক্তিকর, তেমনি আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে এদের যে কোনও একজনকে মেনে নেওয়া তেমনি বুদ্ধিমানের কাজ। বাইরে গেলে দু'দশ টাকা খরচা করতেই হয়। কাজেই এদের মারফত ঠাকুরের পূজা-পাঠ করলে এরাও ঠান্ডা হয়, অন্যেও বিরক্ত করে না। এক সময় অবশ্য ছিল যখন ওদের উপদ্রবে মানুষের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হত। এখন আর সেদিন নেই।

ওরা যখন বসে বসে নিজেদের ভেতর এইসব আলোচনা করছে, তেমন সময় একজন টাঙ্গাওয়ালা এসে বলল, টাঙ্গা লাগবে নাকি বাবুসাব?

সুনন্দবাবু বললেন, হ্যাঁ লাগবে।

আকাশ তখন ফর্সা হয়ে গেছে। চারদিকের গাছপালা, ঘরবাড়ি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যদিও সকাল নয়, ভোর। তবুও এখন যাওয়া যেতে পারে। রাস্তায় লোকজনও চলাচল করছে।

কাঁহা যায়েঙ্গে?

বিলাসী টাউন।

বিলাসী টাউন? কাঁহা পর।

একেবারে শেষমাথায়। চারুভিলা জানো তো?

হাঁ হাঁ। ঠাকুরবাড়ি।

ওইখানে যাব।

চলিয়ে।

ভাড়া কত নেবে?

ও লোক যিতনা বোলে গা।

দেবযানী বললেন, কে কী বলবে না-বলবে সে কথা রাখো। তুমি কী নেবে তাই বলো দেখি?

আমি জায়দা ভাড়া নেব না মাজি। দশ রুপিয়া লাগে গা।

ভাস্করমামা দেবযানীকে ইঙ্গিত করে বলল, ঠিক আছে।

ওরা সবাই টাঙ্গায় চেপে বসল।

চন্দন তো খুব খুশি। আসলে বিদেশে এসে টাঙ্গা চাপবার একটা আনন্দ আছে। বিশেষ করে দেওঘর, রাজগির এবং বুদ্ধগয়ায় টাঙ্গা না চাপলে সত্যিকারের ভ্রমণ-রসই পাওয়া যায় না। এখানকার পরিবেশ, বাতাসে নতুন জায়গায় আসার গন্ধ, সব কিছু চন্দনের মনকে পরিপূর্ণ করে তুলল। স্টেশন এলাকা ছেড়ে আসতেই এক জায়গায় একটা ঘড়ির টাওয়ার চোখে পড়ল।

ভাস্করমামা বলল, আমরা এবার বাজারের পাশ দিয়ে মন্দির বাঁয়ে রেখে এগোতে থাকব।

চন্দন বলল, আচ্ছা মামা, তুমি কতবার দেওঘরে এসেছ?

সে কী মনে আছে? তবে অনেকবার। আসলে ছোড়দির কাছে আসা-যাওয়া তো আমিই করি। এখানকার সব আমি চিনিয়ে দেব তোকে। প্যাঁড়াগলি থেকে প্যাঁড়া কিনে খাওয়াব।

টাঙ্গা তখন জনবহুল দেওঘর শহরের ওপর দিয়ে টুংটাং শব্দ করতে করতে বিলাসী টাউনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শিব-গঙ্গা বাঁয়ে রেখে সোজা বিলাসী টাউন ধরে যাবার সময় ডানদিকে একটি কালভার্টের পাশে বড় একটি অশ্বত্থ গাছের পিছনে 'অর্জুন নিবাস' নামে একটি বাড়ি দেখিয়ে ভাস্করমামা বলল, ওই আমাদের পাণ্ডার বাড়ি।

বাড়ির ভেতর থেকে তখন 'তুং তাং' করে তবলার আওয়াজ আসছে।

যাই হোক। টাঙ্গাটা এই পথ ধরে আরও কিছু দূরে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। সেইখানে রাস্তার ধারে বারো বিঘে জমির ওপর পাঁচিলঘেরা বাগানের মধ্যে বহুদিনের পুরনো একটি বাড়ি। আগেকার দিনের চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ইটের গাঁথনি দেওয়া। পাঁচিলের মরচে ধরা লোহার গেট খোলাই ছিল। সেটা পেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে একটু এগোতেই বাড়িটা। গেটের দু'পাশে বড় বড় ইউক্যালিপ্টাস গাছ। তাদের ধপধপে সাদা বিশাল গুঁড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল চন্দন। কী সুন্দর। দূরে বহু দূরে পাহাড়ের রেখা। আর খুব সামনেই এক বিশাল পাহাড়। চন্দন অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই পাহাড়টার দিকে, ভাস্করমামা বলল, কী দেখছিস? ওই হচ্ছে ত্রিকূট।

চন্দন বলল, দুপুরে খেয়েদেয়ে যাবে মামা?

দূর বোকা। ও কি এত কাছে নাকি যে যাব? ও এখান থেকে অনেক দূর। ওখানে যেতে হলে ভোর ভোর বেরোতে হয়! তারপর গাইড নিয়ে পাহাড়ে উঠে, নেমে ফিরতে সেই বেলা একটা।

টাঙ্গাওয়ালা ওদের নামিয়ে দিয়ে ভাড়া পেয়ে চলে যেতেই ওরা হাতাহাতি করে মালপত্তর নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকেই হাঁক দিল ভাস্করমামা, ছোড়দি! এই ছোড়দি! কে এসেছে দেখ।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই রূপামাসি ছুটে এল, ওমা বড়দি! জামাইবাবু! আসুন আসুন। কী ভাগ্যি। চন্দন তুই কত বড় হয়ে গেছিসরে!

দেবযানী আবেগে জড়িয়ে ধরলেন রূপাকে। তারপর বললেন, তোর চিঠি পেয়ে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। এতদিনের ঠাকুর তোদের।

আর বলিস না দিদি। ঠাকুর চলে যাবার পর থেকে কী দুর্যোগ যে যাচ্ছে আমাদের। আজ এর অসুখ, কাল ওর অসুখ। তা ছাড়া তোর ভগ্নিপতিরও মন মেজাজ ভাল যাচ্ছে না। মানসিক ভারসাম্য একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। এক এক সময় ভাবি কী যে হবে।

নিরুপম কোথায়?

এই একটু বেরিয়েছে। এসো এসো, ভেতরে এসো।

ওরা পায়ে পায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

রূপামাসির একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম বুবাই। মেয়েটির নাম বুবুন। খুবই ছোট। একটির বয়স পাঁচ, অপরটির তিন।

চন্দনের সব কিছু দেখে শুনে মনে হল, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এইখানেই। এটা বাড়ি না তপোবন? না কোনও আশ্রম? মাসির অনেক ভাগ্য তাই এইরকম একটি পরিবেশে রয়েছে। তবে হ্যাঁ, এ যা জায়গা তাতে এখানে ধন-সম্পত্তি নিয়ে বাস করা যায় না। এই রকম নিরালা প্রান্তরে এত বড় একটা বাড়িতে কেনই বা ডাকাতি হবে না! একপাশে শূন্য মন্দির। ঠাকুর দালান। বাড়িটা বেশ অভিনব। চারদিকে ঘর, মাঝখানে উঠোন। পিছনের দিকে জলকল বাথরুমের ব্যবস্থা।

ভেতরে যেতেই একজন বর্ষীয়সী মহিলা এগিয়ে এলেন। মুখে তাঁর বিষাদের ছায়া। বললেন, এসেছ মা? আমরা তো সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছি। আমাদের সাত পুরুষের ঠাকুর। এক সন্ন্যাসীর দেওয়া। এই ঠাকুর চুরি যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। সন্ন্যাসী, ঠাকুর দেবার সময় বলেছিলেন 'একে যত্ন করবি। নিত্য ভোগ দিবি। তবে মনে রাখিস এই ঠাকুর যেদিন চলে যাবে সেদিনই জানবি তোদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে।' তাই কী যে ভয়ে ভয়ে আছি বাবা, তা তোমাদের কী বলব। আমরা তো কখনও কোনও অনাচার করিনি। তবে কেন এমন হল?

দেবযানী, সুনন্দবাবু ভাস্করমামা ও চন্দন সকলেই প্রণাম করল তাঁকে। ইনি রূপামাসির শাশুড়ি। খুব ভাল মানুষ।

দেবযানীর হাত ধরে তিনি সস্নেহে সকলকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

রূপামাসির বাড়িতে একটা চাকর ছিল। নাম বনমালী। সে কোথায় গিয়েছিল কে জানে। এখন পরিচয় পেয়ে সকলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম শুরু করল। বনমালীর বয়স সাতাশ-আঠাশ। বেশ করিতকর্মা লোক। ভাস্করমামার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যে তাতেই বোঝা গেল ভাস্করমামার সঙ্গে দারুণ ভাব। ভাস্করমামাকে বনমালী 'মামাবাবু, মামাবাবু' করতে লাগল।

ভাস্করমামা বলল, তা হলে বনমালী, আমাকে আমার ঘরটা খুলে দাও। ওই ঘরে আমরা দু' মামা-ভাগ্নায় থাকব। চন্দন তুই আমার কাছেই থাকবি তো?

চন্দন বলল, নিশ্চয়ই। মা রূপামাসির কাছে থাকুক। বাবা যেখানে হোক। আমি তোমার কাছ ছাড়া থাকছি না।

বনমালী সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘরের চাবি খুলে ঝাড়মোছ করে সব পরিষ্কার করে তক্তাপোশের ওপর বিছানা পেতে বেড কভার বিছিয়ে মনোরম করে তুলল। তারপর বলল, যান বাবুরা, মুখহাত ধুয়ে আসুন আগে, জামাপ্যান্ট ছেড়ে ফেলুন। এখুনি হয়তো আপনাদের চা জলখাবারের ডাক পড়বে।

ভাস্করমামা ও চন্দন তাই করল। বাথরুমে মুখহাত ধুয়ে দাঁত মেজে একেবারে ঝকঝকে হয়ে নিল দু'জনে।

দেবযানী একটু ক্রিম মাখিয়ে দিলেন চন্দনকে। তারপর রূপামাসির সঙ্গে খোসগল্পে মেতে উঠলেন।

সুনন্দবাবুও এবার পোশাক পালটে তাঁর অতি সাধারণ লুঙ্গিটি পরে বাথরুমে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

রূপামাসির রান্নাঘরে তখন জনতা স্টোভে চায়ের জল ফুটছে।

রূপামাসি বলল, জামাইবাবু এসেছেন এতে যে আমার কী আনন্দ তা কী বলব। ওঃ কতবার যে বলেছি আসতে তার ঠিক নেই। তবে আসবার আগে একটা চিঠি দিতে পারতেন তো?

দেবযানী বললেন, কেন চিঠি পাসনি? আমরা তো রিজার্ভেশন করেই চিঠি দিয়েছিলাম। আমি নিজে লিখেছি চিঠি। তোর জামাইবাবুর ভুলো মন, পাছে ভুলে যায় তাই নিজে চিঠি পোস্ট করেছি।

ওমা, সে কী! কই চিঠি পাইনি তো?

এমন সময় বিদ্যুতের মতো ঝলক লাগানো ফ্রকপরা একটি কিশোরী মেয়ে বেণী দুলিয়ে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে পাশের ঘরে ঢুকল। তারপর একটা মোটা বই বগলদাবা করে রান্নাঘরে এসে ঢুকল।

রূপার মাসির শাশুড়ি বললেন, কীরে, কোথায় ছিলি তুই?

আমি তো ছাদে পড়ছিলাম।

অ। তাই ভাল, আমি ভাবছিলুম সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যখন, তখন নিশ্চয়ই

কোথাও গেছিস তুই। যা তোকে পাহাড়ে পেয়েছে।

মেয়েটি বলল, এনারা কে দিদা?

তোর কাকিমার বড়দি-জামাইবাবু। নে পেন্নাম কর।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে দেবযানী ও সুনন্দবাবুর পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ভাস্করমামা তখন নিজের ঘরে ছিল তাই প্রণামটা পেল না। থাকলে পেত নিশ্চয়ই।

দেবযানী বললেন, বাঃ বেশ মেয়েটি তো। একেবারে ফুলের মতো। এটি কে মা?

রূপামাসির শাশুড়িকে দেবযানী 'মা' বলেন।

রূপামাসি বলল, ও হচ্ছে মালা। আমার বড়জায়ের মেয়ে।

ও তাই নাকি?

সুনন্দবাবু বললেন, খুব ফর্সা তো! এত ফর্সা সচরাচর দেখা যায় না।

ওর মা খুব ফর্সা।

দেবযানী বললেন, ওরা তো ধানবাদে থাকে শুনেছি। কবে এসেছে ওরা?

রূপামাসির শাশুড়ি বললেন, ওরা মানে ও একাই এসেছে। ওর বাবা এসেছিল। কালীপুজোর পর আমি যাব। তখন আমার সঙ্গে চলে যাবে। ওই একটিই মেয়ে। দিনরাত শুধু বই মুখে দিয়ে বসে আছে। আর ফাঁক পেলেই উধাও হয়ে যাচ্ছে। কী ঘোরান ঘুরতে পারে মেয়েটা। একদণ্ড ঘরের কোনায় থাকে না।

দেবযানী বললেন, চমৎকার মেয়ে।

মালা আর বসল না প্রণাম করেই ওপরে চলে গেল।

রূপামাসি বলল, চন্দন, তোর মামা কি করছে রে?

মামা ওঘরে শুয়ে আছে। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।

চন্দন জানে, মামা এখন মোটেই শুয়ে নেই এবং মাথার যন্ত্রণাও হচ্ছে না। আসলে মামা ঘরের দরজা বন্ধ করে বিড়ি খাচ্ছে। কিন্তু একথা তো গুরুজনদের সামনে বলা যায় না। তাই ওই কথা বলল।

একবার ডাক তো! বল, চা হয়ে গেছে।

চন্দন গিয়ে ডাকতেই আধ খাওয়া বিড়িটা ভাস্করমামা জানালা গলিয়ে পিছনে বাগানের দিকে ফেলে দিল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই চন্দন বলল, মাসি ডাকছে। চা খাবে এসো।

যাচ্ছি, তুই যা।

চন্দন চলে আসার একটু পরেই ভাস্করমামা এল। রূপামাসি বলল, এই শোন, চা খেয়ে তুই একবার তোর জামাইবাবুর খোঁজে যা দিকিনি। বনমালীই যেত। ওকে পাঠিয়েছি বাজারে।

রূপামাসি চা আর টোস্ট প্রত্যেককে ভাগ করে দিলেন। তারপর নীচের থেকেই ডাকলেন, মালা।

ওপর থেকে সাড়া এল, কেন?

চা খাবি?

না।

সুনন্দবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, আমি আসলে খুব নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করি। কিন্তু তোমাদের এখানটা যে এত নিরিবিলি, এত মনোরম তা জানতাম না। এলাকাটাও তো শহরের শেষপ্রান্তে। দূরে পাহাড়।

তবু তো ছাদে ওঠেননি। ছাদে উঠলে শুধু পাহাড় আর বনভূমি দেখবেন। তা ছাড়া আমাদের নিজেদের বাগানের গাছপালাই একটা ছোটখাটো বনভূমি।

চন্দন ছাদে ওঠবার জন্য উশখুশ করছিল। তাই চা-টোস্ট খেয়েই বলল, মা, একবার ছাদে যাবে?

রূপামাসি বলল, তুই যা না!

ভাস্করমামা বলল, চন্দন, আমার সঙ্গেও যেতে পারিস।

সুনন্দবাবু বললেন, না না ওকে এখন কোথাও নিয়ে যেয়ো না। একটু রেস্ট নিক। বিকেলে বরং যেখানে যাবার যাবে। সারারাতের ট্রেন জার্নি। এখন স্নান করে খেয়েদেয়ে আগে একটু ঘুমোক।

চন্দন বলল, আমি তা হলে ছাদে যাই? বলেই সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে ছাদে উঠে এলো চন্দন।

প্রকাণ্ড ছাদ। হবে নাই বা কেন? এই বাড়ির চৌহদ্দিটাই কী কম। ছাদে উঠেই দেখল চারদিকে শুধু পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়। আসলে ঘেরা ছাদ। তাই ছাদের বাহার আছে। এক পাশের বাগানে কত ফুল গাছ। আর সেই দিকেই আলসের কোণে সতরঞ্জি বিছিয়ে সেই লাল টুকটুকে কিশোরী মালা একমনে কী একটা বই যেন মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

চন্দন পাহাড়, বনভূমি ও মালভূমির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পায়ে পায়ে সেই দিকে এগিয়ে এল। ওর খুব ইচ্ছে হল এই ফুটফুটে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমাতে। কিন্তু মুশকিল হল ও তো ওর সমবয়সি কোনও মেয়ের সঙ্গে কখনও কথা বলেনি। তাই দূরের ত্রিকূট পাহাড়টার দিকে আঙুল দেখিয়ে আলাপের ভঙ্গিতে সলজ্জভাবে বলল, আচ্ছা, ওই পাহাড়টার নাম কী?

মালা ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, নেকু, সব জানে। বলে আর একটুও না বসে শতরঞ্জি গুটিয়ে নেমে এল নীচে।

অপমানে চন্দনের মুখটা লাল হয়ে উঠল। একে ও অভিমানী ছেলে। তার ওপর এই অবহেলা। বেদনায় দুটিচোখ জলে ভরে উঠল। তারপর মনে মনে

প্রতিজ্ঞা করল একবার যদি সুযোগ ও পায়, তা হলে এই অপমানের চরম প্রতিশোধ ও নেবেই নেবে। গায়ের রং ফর্সা বলে এত অহংকার। সেও কি ফর্সা কম? কী স্পর্ধা, একেবারে মুখের ওপর বলে গেল 'নেকু'। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

চন্দন আহতও হল। আবার মনে মনে নিজেকে ধিক্কারও দিল। সত্যিই তো 'নেকু'। কেন সে নিজের থেকে যেচে কথা বলতে গেল? না-গাল বাড়ালে এমন চড় তো সে খেত না। সে তো জানতই ওটা ত্রিকূট পাহাড়। তবু কেন গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করতে গেল?

এমন সময় ভাস্করমামার গলা শোনা গেল, চন্দন! চন্দন!

আমি এখানে।

ভাস্করমামা উঠে এসে বলল, কীরে, কী হয়েছে তোর? মুখখানা এমন করে আছিস কেন?

ও কিছু না। তুমি কই গেলে না মেসোমশাইকে খুঁজতে?

জামাইবাবু এসে গেছেন। বনমালী বাজার যাচ্ছিল। যাবার পথে রাস্তায় দেখা পেয়ে খবর দিয়েছে।

চলো তবে নীচে যাই। মেসোমশাইকে পেন্নাম করে আসি।

চল। তারপর তোকে বাগানটা ঘুরিয়ে দেখাব।

চন্দন ও ভাস্করমামা নীচে এসে নিরুপমকে প্রণাম করল।

নিরুপম জড়িয়ে ধরল চন্দনকে, থাক থাক বাবা।

চন্দন অবাক হয়ে গেল নিরুপমকে দেখে। এ কী হয়েছে মেসোর। সেই দীপ্ত চেহারার জৌলুস কোথায় গেল? এক মুখ দাড়ি। কেমন যেন পাগল পাগল ভাব। ঠিক যেন গাছের ডালেই বোঁটায় আটকে শুকিয়ে আছে একটি ফুল।

ভাস্করমামার সঙ্গে চন্দন একাত্ম হয়ে শুরু করল ঘুরে বেড়ানোর কাজ। এখন অখণ্ড অবসর। খাওদাও ঘুমোও গল্পের বই পড়ো আর ঘুরে ঘুরে বেড়াও। ভাস্করমামা চন্দনকে নিয়ে এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে যে বিশাল বাগানটা আছে তাই ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল।

সত্যি, কী মনোরম। এত বড় বাগান চন্দন এর আগে আর কখনও দেখেনি। কত যে জানা অজানা গাছ রয়েছে সেখানে তার যেন হিসেব নেই। ভাস্করমামা আর চন্দন যখন বাগানে ঘুরছে, তখন হঠাৎ দেখতে পেল একটি কাঁঠাল গাছের নিচু ডালে দোলনা খাটিয়ে এক মনে দোল খেয়ে যাচ্ছে কিশোরী মালা। ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে যেন একটি বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে।

চন্দন সেদিকে তাকিয়েই এমনভাবে চোখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল যেন সে ভ্রূক্ষেপই করছে না ওকে।

মালাই ভাস্করমামাকে দেখে দোল খাওয়া থামিয়ে বলল, কী মামা ভাল আছেন?

ভাস্করমামা হেসে বলল, হ্যাঁ, তোমার খবর কী?

ভাল, কখন এলেন?

সকালেই এসেছি। তুমি এসেছ জানতাম না তো!

আমিও জানতাম না আপনি এসেছেন। ছাদে পড়ছিলাম কিনা।

তোমার মা-বাবার খবর ভাল?

হ্যাঁ। বাবা তো পুজোর আগে এসেছিলেন।

ভাস্করমামা আর চন্দন ঘুরে ঘুরে বাগানের গাছপালা দেখতে লাগল।

লাল মাটির কাঁকর-পাথর মেশানো পথ। তারই দু'পাশে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, লেবু, পেয়ারা আরও কত কী গাছ। একপাশে ফুলের, এক পাশে ফলের।

একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে চন্দন বলল, মামা, এটা কী গাছ গো?

এটা তো ইউক্যালিপ্টাস।

ও। আর ওই যে ফুলের গাছ ওগুলো? ওগুলোর নাম কি? একটার নাম অবশ্য আমি জানি, মাধবীলতা।

তার পাশে মালতী, কুঞ্জলতা, অ্যান্টিগোনান আরও কত আছে।

আর ওই যে ওই গাছগুলো?

ওগুলো অবশ্য ফুল গাছ নয়। তবে নাম জানি না।

অমনি পিছন থেকে কে যেন সুরেলা গলায় বলে উঠল, ওগুলো জলপাই গাছ। আর ওই হল পিচ, ফসলা, চালতা, আতা।

ওরা দু'জনেই চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সেই কিশোরী মালা সামান্য একটু দূরত্ব বজায় রেখে কেমন নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করেছে।

ভাস্করমামা বলল, আরে মালা।

মালা হেসে বলল, হেন গাছ নেই যা আমাদের বাগানে নেই। সেইজন্যেই তো কত লোকের হিংসে। আগে দাদুর আমলে আরও কত গাছ ছিল। এই দিকটায় ছিল ইউক্যালিপ্টাসের সারি। বর্ষায় বৃষ্টি পড়লে ইউক্যালিপ্টাসের তীব্র গন্ধ যখন ছাপিয়ে উঠত চারদিকে, আর টুপটাপ করে ঝরে পড়ত ইউক্যালিপ্টাসের ফুল তখন আনন্দে ভরে উঠত মন।

চন্দন বিস্ময়ের সঙ্গে সবকিছু দেখতে লাগল। তবে মালার কথাগুলো শুনেও না-শোনার ভান করতে লাগল ও। এমনকী ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। ভাবটা এই, ও যেন নেই।

ভাস্করমামা কথা বলতে বলতে আরও একটু এগিয়ে বলল, আচ্ছা ওগুলো কী গাছ বল তো?

ও গাছ চেনেন না? ওটা তো বকুল গাছ। ওই বকুল, কামিনী, গন্ধরাজ, রক্তকরবী, ডলচি, মটুকঝাড়, হ্যামিলটোনিয়া, ম্যাগনোলিয়া, চাঁপা আর গ্রান্ডিফ্লোরা। ওদিকের গাছগুলোর পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে হবে না—জুঁই, চামেলি, বেলি, গোলাপ।

ভাস্করমামা বলল, থাক থাক। আর বলতে হবে না। মাথা এমনিতেই ঘুরে যাচ্ছে, আরও ঘুরবে। এত নাম মনে থাকে? কিন্তু এইসব গাছের যত্ন নেয় কে?

আগে তো মালী ছিল। এখন বনমালীদাই দেখাশোনা করে। তা ছাড়া আমি যখন আসি তখন আমিও দেখি।

তুমি তো আসো ন'মাসে ছ'মাসে।

হ্যাঁ, তবু দেখি। আসলে বিশ্বাস করুন ধানবাদে আমার একটুও ভাল লাগে না। কী বাজে জায়গা। শুধু বাবা-মাকে ছেড়ে বেশিদিন কোথাও থাকতে পারি না-তাই থাকি। পুজো হয়ে গেছে। এবার কালীপুজোটা হয়ে গেলেই চলে যাব ভাইফোঁটার দিন।

ভাইফোঁটার দিন?

হ্যাঁ, আমার তো ভাই নেই। তাই থেকে আর কী করব! ওইদিনই চলে যাব।

চন্দনের হঠাৎ অভিমানটা চাড়া দিয়ে উঠল। কেন না বাগান যখন এদের এবং এই মেয়েটি যখন ওকে 'নেকু' বলে অপমান করেছে তখন এইভাবে এদেরই বাগানে লোভীর মতো ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কী? বরং মালা যখন থাকবে না-মানে দুপুরে ঘুমোবে তখন বরং চুপি চুপি ও একা এসে এই বাগানের সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে এবং গাছপালার সঙ্গে মিতালি পাতাবে। তাই যেতে যেতে হঠাৎ বলল, আমার আর ভাল লাগছে না মামা, আমি যাই।

সে কীরে! তোর বাগানে বেড়াতে ভাল লাগছে না, এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

আসলে ট্রেন জার্নি করে না, ঘুমে আমার দু'চোখ জুড়ে আসছে।

মালা যেন কতকটা নিজের মনেই বলল, আহারে, দুধের বাছারে। ইচ্ছে করছে মুখে একটা পুপসি এনে ধরি।

চন্দন নীরবে আর একবার সহ্য করল এই মেয়েটির ঔদ্ধত্য। হাজার হলেও বাড়িটা এদের। তাই চোটপাট এখনি কিছু করা যাবে না। তবে আর একটা কোনওরকম বাজে কথা বললে, ও বাবাকে বলবে সোজা হোটেল উঠতে। বাবা ঠিকই বলেন, কোথাও বেড়াতে গিয়ে কারও বাড়িতে উঠতে নেই। তাতে স্বাধীনতা থাকে না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তেড়ে ঘুম। ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। চন্দন আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে উঠে বসল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘর

থেকে যেই বেরোতে যাবে অমনি বড় আয়নার নিজের মুখটা দেখে চমকে উঠল। এ কী! ওর কপালের ওপর এ কীসের ললাট লিখন। চন্দন কাছে গিয়ে ভাল করে লিখনটা পড়ে বুঝল এতে যা লেখা আছে তা হল 'নেকু'। এ নিশ্চয়ই ওই দুর্বিনীত মেয়েটার কাজ।

চন্দন তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে ভাল করে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলল। তারপর রান্নাঘরে ওর মা, রূপামাসি যেখানে বসে গল্প করছিল সেখানে এল।

মাসি বলল, বাবা! তুই খুব ঘুমিয়েছিস তো? গাড়িতে ঘুম ঠিকমতো হয়নি বুঝি?

দেবযানী বললেন, না না। গাড়িতে বেশ ঘুমিয়েছে ও।

চন্দন বলল, মা, বাবা কোথায়?

তোর মেসোর সঙ্গে বেরিয়েছে।

ভাস্করমামা?

মাসি বলল, ওর কথা আর বলিস না। পাক্কা সিনেমাখোর একটা। ঠিক সিনেমায় গেছে।

এমন সময় দেবযানী বললেন, আচ্ছা, মালাকে দেখছি না তো?

ওর দেখা এখন পাবি। ও রকম ধিঙ্গি মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। দিনরাত শুধু টো-টো করে ঘুরছে। আগে এ রকম ছিল না। এই বারেই এরকম করছে। বড় হচ্ছে। কিন্তু কোনও ভয় ডর নেই। যা দিনকাল পড়েছে তাতে একা একা অত বড় মেয়ের ঘোরা কি ঠিক?

কেন, কোথায় যায় ও?

সে ও-ই জানে। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে মাকে একটু চা করে দেয়—।

তোর শাশুড়িকে?

হ্যাঁ। মা খুব ভোরে চা খান তো? তারপর সেই অন্ধকারেই ধিঙ্গি মেয়ে সাইকেলে চেপে মর্নিংওয়াক করতে যান। ফেরেন বেলা সাতটা-আটটা, কোনওদিন ন'টায়।

সে কী!

তবে আর বলছি কী। তারপর খেয়েদেয়ে দুপুরে ছাদে বসে বই পড়ে, বিকেলে আবার বেরোয়। ফেরে সন্ধের পর। কোথায় যে যায় ভগবান জানে। বাবা নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছে, তাই নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চষে বেড়াচ্ছে। মা-ও কিছু বলেন না। আসলে বাপের এক মেয়ে তো, আদর পেয়ে মাথায় উঠেছে।

রূপামাসি একটা ডিশে করে দুটো নিমকি আর দুটো প্যাঁড়া খেতে দিলেন চন্দনকে। চন্দন তাই খেয়ে নিজের ঘরে চলে এল। মানে এখানে যে ঘরে ও আছে। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে পেরেকে ঝোলানো ওর ব্যাগটা নিয়ে এসে

তক্তাপোশের বিছানায় গুছিয়ে বসল। ওর একমাত্র প্রিয় সঙ্গী বইগুলো খুলে ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে দেবে ও। কিন্তু এ কী! ব্যাগের ভেতর থেকে এসব কী বেরোচ্ছে? কোথায় গেল পাণ্ডব গোয়েন্দা, কোথায় গেল ভূতের গল্প ভয়ংকর। নকুড়মামা, দুরন্ত তপাই, দিঘা সৈকতে আতঙ্ক, ভাঙা দেউলের ইতিকথা, কিশোর গল্প সংকলন একটা বই-ও নেই। তার জায়গায় বেরোতে লাগল পাতা ছেঁড়া ব্যাকরণ কৌমুদী, ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিসন, ভূগোল ও বিজ্ঞানের বই। তার সঙ্গে বেরোল একটা চিঠি 'প্রিয় নেকু, তোমার এখন লেখাপড়া করবার সময়। এই বয়সে এইসব বই না-পড়ে এই বইগুলো পড়ো। আখেরে কাজ দেবে। আপাতত বইগুলো আমার জিম্বায় রেখে দিলাম। বাড়ি যাবার আগে চেয়ে নিয়ো কেমন?'

চন্দন 'ওফ' করে একবার লাফিয়ে উঠল। নাঃ এক্ষুনি এর একটা প্রতিকারের দরকার হয়ে পড়েছে। একবার ভাবল ও ছোটমাসিকে গিয়ে সব কথা খুলে বলে, আবার ভাবল বলেই বা লাভ কী? ছোট মাসির কথায় তো বোঝাই গেছে বাপের আদুরে মেয়েটি আউট অব কন্ট্রোল। ওকে অন্য উপায়ে জব্দ করতে হবে। কেন না ও বড়ই দুর্বিনীত।

চন্দন আর না-দাঁড়িয়ে সোজা মালার ঘরের দিকে চলে গেল। ধিঙ্গি মেয়ে তো এখনও ফেরেনি। ও ব্যাকরণ, গ্রামার, ভূগোল ইত্যাদি বইগুলো ঘরের শিকল খুলে মালার বিছানায় রেখে একপাশে পড়ে থাকা একটি বাক্সর ডালা তুলে দেখল ওর বইগুলো সেখানে আছে কিনা। কিন্তু তুলেই দেখল সব ভোঁ ভোঁ। পাতা ছেঁড়া দু'-একটা পত্রপত্রিকা ছাড়া আর কিছু নেই। তবে একটা চিঠি ছিল। তাতে লেখা ছিল 'হায় হায় নেকুরে, কী বুদ্ধু তুমিরে, কী দারুণ বোকারাম, তুমি একটি হাঁদারাম। আমি তোমার মতো অত বোকা নই যে বইগুলো তোমার হাতের কাছে রেখে যাব। যাও ঘরে যাও।'

চিঠি পড়ে চন্দন প্রায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। কী ফাজিল মেয়েরে বাবা। এমন মেয়ে তো দেখা যায় না। এ যেন ধানবাদের ধানি লঙ্কা। কিন্তু একবার রেগে উঠলেও পরক্ষণেই নরম হয়ে গেল চন্দন। কেন না ও বুঝল এর ওপর রাগ করে কোনও লাভ নেই। এই মেয়ের প্রকৃতিই এইরকম। তবে হ্যাঁ, পাণ্ডব গোয়েন্দার বাচ্চু-বিচ্ছুকেও এ মেয়ে ছাপিয়ে যায়।

চন্দন যখন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না কীভাবে ও মালাকে জব্দ করবে, তেমন সময় ওর বাবার গলা শুনতে পেল। সঙ্গে মেসোরও।

চন্দন ঘর থেকে বেরিয়ে ওর মা-বাবার কাছে এল।

সুনন্দবাবু বললেন, আমরা একবার থানায় গিয়েছিলাম বুঝলে?

রূপামাসি বলল, কী বলল ওরা?

পুলিশ বলল, দেখুন সুরাহা আমরা কিছুই করতে পারিনি। তবু এটুকু বলতে পারি আপনারা অযথা আমাদের যেন ভুল বুঝবেন না। আসলে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি আমরা। কেন না আমরা আশা করছি ওই মূর্তিটা এই অঞ্চলের আশেপাশেই কোথাও আছে। এই এলাকার বাইরে মূর্তি পাচার হবার সবরকম রাস্তা এমনিতেই বন্ধ। তাই ওত পেতে বসে আছি ওদের ধরবার জন্য। আমরা যদি তৎপর হই তা হলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে। আর আমরা যদি অলসতার ভান দেখাই, তা হলে আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি ভেবে এক সময় নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা মাল পাচার করতে যাবে এবং ধরা পড়বে। আমরা দেখেছি এই পরিকল্পনায় অনেক সময় ক্রিমিন্যাল ধরা পড়েছে।

নিরুপমবাবু বললেন, ওরা বলল আমরা শুনে গেলাম, তবে ওসব লালমাখানো কথায় কি চিড়ে ভিজবে? সব ব্যাটাদের বদমায়েশি। এদেরও ষড়যন্ত্র আছে।

সুনন্দবাবু বললেন, না না। আমার কিন্তু এদের কথা শুনে তা বলে মনে হল না। সব সময় সবাইকে সন্দেহ করা উচিত নয়।

রূপামাসি বলল, আসলে ব্যাপার কী জানেন জামাইবাবু, আমরা এখানে এই এতখানি সম্পত্তি ভোগ করছি তো, তাই এখানকার লোকেদের হিংসে খুব। এরা চাইছে আমাদের জ্বালাতন করে এখান থেকে তাড়াতে।

সুনন্দবাবু বললেন, সে তো তোমরা মনে করছ। আসলে তা না ও তো হতে পারে?

নিরুপমবাবু বললেন, তোমরা এখানকার লোককে চেনো না ভায়া, বড় স্বার্থপর এরা।

দেবযানী বললেন, সে কোন জায়গায় নয়?

এমন সময় দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল।

রূপামাসির শাশুড়ি একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে বললেন, তাই তো, মেয়েটা এখনও এল না, গেল কোথায়?

রূপামাসি বলল, মা, আপনি একটু শক্ত হন এবার। দিনকাল এখন খুব খারাপ পড়েছে। তার ওপর এইরকম একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, এরপরেও কখনও রিস্ক নেয় কেউ? কী আছে কপালে তা কে জানে?

নিরুপমবাবু বললেন, না না এ তো ভাল কথা নয়, ওর মা-বাবা যখন থাকে তখন যা করে করুক। এখন কিছু হলে সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপবে। ও ফিরে এলে বেশ কড়া কথায় বারণ করে দাও ওকে। এসব এখানে চলবে না।

বলতে বলতেই সাইকেল নিয়ে লম্বা বেণী দুলিয়ে ফ্রকপরা কিশোরী মালা গটগটিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিরুপমবাবু বললেন, এত সন্ধে অব্দি রোজ রোজ বাইরে থাকিস কেন রে? বাড়িসুদ্ধু লোক ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি আমরা।

রূপামাসির শাশুড়ি বললেন, বড্ড বাড় বেড়েছ তুমি, দাঁড়াও। কী দস্যি মেয়েরে বাবা। এমন আমি বাপের কালে দেখিনি।

মালা কারও কথায় ভ্রূক্ষেপও না করে সোজা কলতলায় গিয়ে মুখহাত-পা ধুয়ে এসে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এঘর ওঘর করল। তারপর এক সময় বলল, আচ্ছা কাকু! আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন কাকাহিগড় কোথায়?

নিরুপমবাবু বললেন, কাকাহিগড়? কী জানি নাম শুনিনি কখনও।

আছে আছে। একটা জায়গা আছে। কিন্তু কোনদিকে?

যেদিকেই হোক। তোকে অত খোঁজ নিতে হবে না। কাল থেকে একদম ঘর থেকে বেরোবি না। কী ভেবেছিস কী? কিছু একটা হয়ে গেলে তোর বাবাকে কী কৈফিয়ত দেব বল তো?

মালা সঙ্গে সঙ্গে রূপামাসির শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওঃ দিদা! তোমার ছোট ছেলেকে একটু চুপ করতে বলবে? কেবল শাসন আর শাসন। ভাল লাগে না বাবা। দু'দিন এলাম কোথায় বেড়াতে।

রূপামাসি বলল, অন্য কিছু নয় মা। দিনকাল কীরকম খারাপ পড়েছে দেখছিস তো। কেউ যদি ধরে নিয়ে চলে যায় তখন কী করবি? আর কি কচিখুকিটি আছিস?

মালা বলল, না গো না। দেওঘর এখনও অত খারাপ জায়গা হয়নি। এই বাড়িতে একবার একটা ডাকাতি হয়ে গেছে বলে তোমরা সব সময় আতঙ্কে আছ। না হলে এই দেওঘরে সারা বছর ধরে হাজার হাজার মানুষ তীর্থ করতে, বেড়াতে, হাওয়া বদল করতে আসছে। তা হলে সবার সব ছেলেমেয়েই চুরি হয়ে যেত।

নিরুপমবাবু বললেন, দিনমানে হলে তো ভয় কিছু ছিল না। তুই তো অসময়ে যাস। রাস্তায় যখন কোনও লোক থাকে না। হয় ভর সন্ধেবেলা, নয় তো ভোরের অন্ধকার এই তো তোর বেড়াবার সময়।

রূপামাসির শাশুড়ি বললেন, কাল থেকে একদম বাইরে বেরোবে না। ওই তো একটা ছেলে এসেছে বাড়িতে। ওর সঙ্গে গল্প কর, বাগানে ঘোর। এত বড় বাগান রয়েছে তা নয়, কেবল বাইরে ঘোরা। ছেলেটার সঙ্গে একবারও কথা বলেছিস তুই?

মালা সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে

বলল, বড্ড খিদে পাচ্ছে। কাকিমা প্লিজ আমি ঘরে গিয়ে একটু শুচ্ছি, তুমি আমাকে একটু হালুয়া করে খাওয়াও। বলেই চলে গেল মালা। গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল।

রূপামাসির শাশুড়ি বললেন, চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনি। কী মেয়েই হয়েছ মা।

চন্দনও মালার বকুনি শুনে ওর ঘরে ঢুকে দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে বিছানায় শুয়ে রইল চুপচাপ। ভাস্করমামা কখন আসবে কে জানে? যদি সত্যিই সিনেমায় গিয়ে থাকে তা হলে তো আসতে রাত হবে।

বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর হঠাৎ কী ভেবে যেন উঠে দাঁড়াল চন্দন। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির পাশে কোণের ঘরের দরজাটা একটু ঠেলে ফাঁক করতেই দেখল এ বাড়ির চাকর বনমালী হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে কী যেন একটা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছে।

চন্দন ভেতরে ঢুকতেই বনমালী বলল, আরে চন্দনবাবু, এসো এসো। সারাদিন তো কাজ কাজ করে তোমার সঙ্গে আলাপই করা হয়নি। এসো, ভেতরে এসো।

চন্দন বলল, এই তোমার ঘর? খুব ছোট্ট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার তো।

বনমালী বলল, পরিষ্কার না হয়ে উপায় আছে? এতটুকু নোংরা দেখলে ঠাকুমা বকুনির চোটে ভুবন অন্ধকার করিয়ে দেবেন?

ঠাকুমা অর্থে রূপামাসির শাশুড়ি।

চন্দন বলল, উনি খুব বকেন বুঝি?

না না। শুধু শুধু বকেন না। তবে এতটুকু নোংরাও যেমন উনি দেখতে পারেন না, তেমনি কোনও অন্যায়ও সহ্য করতে পারেন না। আর কথা না শুনলে খুব রেগে যান।

কে বললে? আমি তো দেখছি ওনার নাতনির একটার পর একটা অন্যায় উনি সহ্য করে যাচ্ছেন। কই কিছু তো বলছেন না?

ওই একটি জায়গাতেই উনি খুব নরম। আসলে মালা দিদিমণি তো বাপের এক মেয়ে। আর খুব অভিমানী। সেইজন্যে কেউ কিছুই বলে না ওকে।

তা হলে তো মাথায় চেপে বসবে।

আরে বসবে কী! বসেছে তো। তা যাক। ঠাকুমা বকাঝকা করলেও ঠাকুমার মতো মানুষ হয় না। আমার যখন আট বছর বয়স তখন উনি পুরী বেড়াতে গিয়ে আনন্দবাজার থেকে আমাকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেন। আমার তো কেউ কোথাও ছিল না। তাই ওনার শিক্ষায় মানুষ হয়েছি আমি। রোজ ভোরে উঠে স্নান করি। ঠাকুরের ফুল তুলি। ঘরের কাজ করি।

ঠাকুরের ফুল? ঠাকুর তো এখন নেই।

নাই বা রইল। ঠাকুমা যে ওই বেদিকেই ফুল দিয়ে সাজান। কত কাঁদেন ঠাকুরের জন্যে। ঠাকুমার বিশ্বাস তাঁর রাধাকৃষ্ণ আবার ফিরে আসবে ওই সিংহাসন আলো করে।

চন্দন বলল, ঠাকুমার বিশ্বাস হলেও আমার তো মনে হয় না আসবে। অত দামি জিনিস, আজ কতদিন হল খোয়া গেছে। আর কখনও ফেরত পাওয়া যায়?

বনমালী বলল, চন্দনবাবু, একটা কথা আছে জানো তো, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর', ঠাকুমার বিশ্বাস সন্ন্যাসীপ্রদত্ত এই ঠাকুর কখনওই চুরি যাবার নয়। কেন না এখনও তাঁরা এমন কোনও অনিয়ম বা অনাচার করেননি যাতে বিগ্রহ কুপিত হয়ে চলে যেতে পারেন। তবু চলে যখন গেছেন তখন ধরে নিতে হবে তাঁর প্রতি গৃহেস্থের আন্তরিকতা কতখানি তা পরীক্ষা করবার জন্যই হয়তো তিনি ছলনা করেছেন। কাজেই একান্তভাবে তাঁকে ডাকলে মনে হয় আবার তিনি ফিরে আসবেন।

চন্দন সব শুনল। তারপর একসময় বলল, আচ্ছা বনমালীদা, বলতে পারো কাকাহিগড় কোথায়?

কাকাহিগড়!

হ্যাঁ, কাকাহিগড়।

ও নাম তুমি কোত্থেকে শুনলে?

যেখান থেকেই হোক শুনেছি। জায়গাটা কোথায়?

কাছাকাছিই আছে। দেওঘর শহরের পশ্চিমদিকে। কিন্তু ওই জায়গার ওপর তোমার এত কৌতূহল কেন?

এমনি। নামটা খুব পছন্দসই কিনা, তাই।

ওটা বুনো জায়গা। ঝোপঝাড়, টিলা আর মস্ত একটা ঢিপি আছে। তার আশেপাশে আছে কিছু খেতি জমি। ইদানীং এক সাধুবাবা এসেছেন ওখানে। কিন্তু তুমি কার মুখে শুনলে?

মালা জানতে চাইছিল কিনা, তাই!

অ। মালাদিদিমণি। তাই বলো। ভারী দুষ্টু মেয়ে। তবে মন ওর খুব ভাল।

চন্দন মনে মনে বলল 'ছাই', মুখে বলল, আমাকে একদিন নিয়ে যাবে সেখানে?

বনমালী কীরকম যেন করুণ চোখে একবার তাকাল চন্দনের দিকে। তারপর বলল, চন্দনবাবু, তুমি আর যেখানে যেতে চাও আমি তোমাকে নিয়ে যাব। শুধু কাকাহিগড়ে যেয়ো না। দু'দিনের জন্য এসেছ। ভাল ভাল জায়গায় ঘুরে বেড়াও। খাও দাও। মন্দির দেখো, পাহাড় দেখো কিন্তু কাকাহিগড়। না না না।

আমার মনে হচ্ছে ওটা খুব রহস্যময় জায়গা, তাই না?

ঠিক তাই। আর তা ছাড়া ওখানকার যিনি সাধুবাবা তিনি খুব একটা সুবিধের লোক নন। শুনেছি ওখানে উনি চামুণ্ডাদেবীর কাছে নরবলি দেন।

সে কী! এই সভ্য যুগে নরবলি! এত কড়া প্রশাসন সত্ত্বেও।

বাবু, যারা ক্রিমিনাল তারা কি আইনকানুন মানে? না ভয় করে। তা যাক গে, ওসব কথা থাক। চলো কাল ভোরবেলা স্নান করে ঠাকুরের ফুলটুল তুলে দিয়ে তোমাকে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাই।

কোথায় বনমালীদা?

নন্দন পাহাড়ে। ভোরের আবছায়ায় পায়ে হেঁটে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে যেতে কী ভাল যে লাগে তা কী বলব!

ঠিক আছে যাব। যদি ঘুমিয়ে পড়ি তো আমাকে ডেকে নিয়ো কেমন? পারি তো ভাস্করমামাকেও সঙ্গে নেব।

মামাবাবুকে? তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ চন্দনবাবু। তোমার মামাবাবুকে যদি বেলা আটটার আগে ঘুম থেকে তুলতে পারো তো তোমাকে চারটে পাকা পেয়ারা খাইয়ে দেব আমি।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে রূপামাসি হাঁক দিলেন, চন্দন একবার এদিকে আয়।

যাই মাসিমা। বলে চন্দন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যাবার আগে বলল, তা হলে ওই কথাই রইল, কেমন?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

চন্দন রান্নাঘরে ঢুকতেই দেখল সেই দুর্বিনীত মেয়ে মালা বসে মনের আনন্দে হালুয়া খাচ্ছে। রূপামাসি চন্দনের দিকেও এক প্লেট হালুয়া এগিয়ে দিলেন। চন্দন সবে হালুয়াটা খেতে যাবে এমনসময় বাইরে ভাস্করমামার চেঁচামেচি শোনা গেল, চোর— চোর—পাকড়ো— পাকড়ো— জামাইবাবু!

নিরুপমবাবু এবং সুনন্দবাবু দালানে বসে গল্প করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন একটি লোহার রড এবং অন্যজন একটি দরজার খিল নিয়ে ছুটে বাইরে এলেন, কই, কোথায় চোর!

খাবার ফেলে চন্দন, রূপামাসি, মা সবাই ছুটে এলেন বাইরে।

ভাস্করমামা বলল, আমি পাঁচিলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছি, হঠাৎ দেখি তিন চারজন লোক দৌড়ে পালাল।

নিরুপমবাবু বললেন, কোনদিকে গেল?

বাগানের দিকে।

তা হলে বেরোতে পারবে না। দুটো টর্চ নিয়ে এসো তো দেখি?

মালা সঙ্গে সঙ্গে টর্চ আনতে ঢুকল।

রূপামাসি বলল, না না। বাগানে যেতে হবে না, এত রাতে অন্ধকারে। যদি পিছন থেকে লোহার রড-ফড মারে তখন? তা ছাড়া আজকাল ওদের কাছে বোমাও থাকে।

তাই বলে চুপচাপ বসে থাকব? একটু তাড়াতুড়ি না করলে হয়? আর এখন তো আমি একা নই।

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে মালা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর টর্চ হাতে ছুটে এসে বলল, ও কাকা গো, আমার সাইকেলটা দেখতে পাচ্ছি না।

রূপামাসি বলল, সে কী! কোথায় ছিল সাইকেল?

দালানে, দরজার পাশে।

সুনন্দবাবু এবং নিরুপমবাবু দু'জনে অবাক, দালানে! আমরা তো ঠায় বসে আছি। আমাদের নজর এড়িয়ে কখন কোন ফাঁকে নিয়ে পালাল?

রূপামাসি বলল, চাবি দিসনি সাইকেলে?

না।

নিরুপমবাবু বললেন, তা হলে তো দেখতেই হচ্ছে। বাগানের দিকে যদি ওরা গিয়ে থাকে তো সাইকেল নিয়ে পালাতে পারবে না।

অতএব দলবদ্ধ হয়ে ওরা বাগানের দিকে এগোতে থাকল। চন্দন আর মালাও সঙ্গ নিতে ছাড়ল না। শুধু রূপামাসি ও দেবযানী রইলেন সদরের দিকে প্রহরায়।

কিন্তু না, বাগানের একদম ভেতর পর্যন্ত ঢুকেও কারও পাত্তা পাওয়া গেল না। সেই সঙ্গে সাইকেলটারও কোনও হদিস মিলল না। অতএব ফিরে এল সকলে। মালার চোখ দিয়ে সমানে জল ঝরছে। মালার অবস্থা দেখে ওর প্রতি আর কোনও রাগ বা ক্ষোভ রইল না চন্দনের।

একটু সান্ত্বনার সুরে বলল চন্দন, কী হবে কেঁদে? তোমার বাবাকে বোলো আবার নতুন সাইকেল কিনে দিতে।

মালা ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, বাবা আর দেবেন না। তা ছাড়া এরকম সাইকেলও হবে না আর। একেবারে আমার মনের মতনটি ছিল। তা ছাড়া সাইকেলটা চুরি গিয়ে এই মুহূর্তে আমার যে কী ক্ষতি হয়ে গেল, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

একটা সাইকেলের জন্য তোমার এমন কী ক্ষতি হল যে, তুমি এত ভেঙে পড়ছ?

সে তুমি বুঝবে না। কেউ বুঝবে না। কাউকে বলা যাবে না সে কথা। সাইকেল যদিও বাবা আবার কিনে দেন তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মালার বক্তব্য ক্রমশই যেন রহস্যময় হয়ে উঠল চন্দনের কাছে। তবে ও বুঝতে পারল এই ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটি আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়।

যাই হোক। ওরা সকলে ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া করে যখন শুতে গেল রাত তখন এগারোটা।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ দরজায় টক-টক শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠে বসল চন্দন। ভাস্করমামা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। উঃ সে কী দারুণ নাক ডাকার শব্দ। এমন ঘুম কেউ ঘুমোতে পারে।

চন্দন পা টিপেটিপে দরজার কাছে এসে সাড়া দিল, কে?

একবার দরজাটা খুলবে?

এ তো মালার গলা। এত রাতে মালা ওকে দরজা খুলতে বলছে কেন? তবে কি আবার নতুন করে কোনও বিপদ হয়েছে? কিন্তু তা যদি হত, তা হলে তো ভাস্করমামাকে ডাকত। যাই হোক, চন্দন এক মুহূর্ত দেরি না করে খুলে ফেলল দরজাটা।

কী ব্যাপার!

মালা ঠোঁটে তর্জনী রেখে চাপা গলায় বলল, চুপ, তারপর বলল, একবার এদিকে এসো তো।

চন্দন দরজার কাছ থেকে একটু সরে এল। মালা ওর হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে সিঁড়িভেঙে ওকে টেনে নিয়ে গেল ছাদে। তারপর ছাদের আলশের ধারে দাঁড়িয়ে বলল, ওই দেখো।

চন্দন তাকিয়ে দেখল বহু দূরে বাগানের ঘন গাছপালার আড়ালে ছায়া ছায়া কালো কালো কারা যেন ঘোরাফেরা করছে। সামনেই কোজাগরি পূর্ণিমা। তাই জ্যোৎস্নায় ফুল ফুটে যাচ্ছে চারদিকে।

চন্দন বলল, বেশ রহস্যময় ব্যাপার তো।

মালা বলল, আমি ওদের অনুসরণ করতে চাই।

চন্দন বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ মালা? ওরা কারা? দলে ওরা কতজন তা কি জানো?

চন্দন, তুমি যদি আমার পাশে থাক, তা হলে আমি কাউকে ভয় পাব না। তুমি না এলে আমি একাই যাব। এতদিন তো একা একাই সবকিছু করছিলাম আমি। কিন্তু তুমি যখন রয়েছ তখন...।

একা একা কী করছিলে তুমি?

সে অনেক কিছু। পরে সব বলব তোমাকে।

তোমার সঙ্গে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি জেনে রেখো যে আশায় তুমি যাচ্ছ, তা কিন্তু সফল হবে না। অর্থাৎ ওই সাইকেল তুমি আর ফিরে পাচ্ছ না।

আরে না-না সাইকেলের জন্যে নয়। তা হলে তোমাকে সব কথা খুলে বলি শোনো। আমাদের বাড়ির এই মূর্তিচুরি এবং ডাকাতির ব্যাপারে আমি ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে, অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দুষ্কৃতকারীরা পাচার করতে পারেনি। ওই সাইকেল নিয়ে আমি যে দিনরাত টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম, তা ছেলেখেলা করতে নয়। আসলে আমি ওই মূর্তি উদ্ধারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যাক, এখন এসব কথা বলার মতো সময় নেই। পরে সব বলব। এখন বলো যাবে কি না?

যাব। নিশ্চয়ই যাব! কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, এত রাতে তুমি টের পেলে কী করে, যে ওরা ওখানে ঘোরাঘুরি করছে?

ওরা প্রায়ই আসে, তবে কখন আসে তা জানতাম না। কারণ বাগানের ভেতরে যেখানে সেখানে সিগারেটের খোল, দেশলাই বাক্স ইত্যাদি দেখতে পাই আমি। তাতেই বুঝতে পারি এক বা একাধিক ব্যক্তির আসা যাওয়া আছে এখানে। আজ তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি ছাদে উঠে যখন বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম আমার সাইকেলটা কেউ লুকিয়ে রাখার পর নিয়ে পালাচ্ছে কি না, তখনই ওই আলো আমি দেখতে পাই। আমি একাই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। মনে হল তুমি তো আছ। তোমাকে ডাকলে নিশ্চয়ই তুমি ডাকে সাড়া দেবে এবং আমার সঙ্গে যাবে।

আমি যাব। চলো আর একটুও দেরি কোরো না। এক্ষুনি চলো।

ওরা তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।

বাইরে বেরনোর দরজার পাশে ওর মেসোর রেখে যাওয়া সেই লোহার ডান্ডাটা ছিল দেখে চন্দন সেটা হাতে নিল। তারপর দরজার খিল খুলে দু'জনে মিলে শুরু করল ওদের নৈশ অভিযান। খুব সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে চলল ওরা। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে এই ফুট ফুটে কিশোর কিশোরীকে যেন আলোকের দূত বলে মনে হল।

যেতে যেতে মালা বলল, চন্দনদা তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছিলে, না?

কেন?

বাঃ রে। আমি যে তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতাম না। তোমাকে 'নেকু নেকু' বলে রাগাতাম। তোমার বই চুরি করে এনে আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

চন্দন হেসে বলল, প্রথমে সত্যিই খুব রেগে গিয়েছিলাম। পরে যখন বুঝলাম তোমার ওপর রাগ করা উচিত নয়, তুমি এমন এক মেয়ে যে, তোমার প্রকৃতিই এইরকম, তখন থেকে আর রাগ করিনি।

আসলে তোমাকে না আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম তোমার মতো সহজ সরল ভাল ছেলে আর হয় না। তুমি এখনকার ছেলেদের মতো নও। তোমাকে রাগালে তুমি রাগবে। কিন্তু কিছু বলবে না। তাই তোমাকে একটু রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখছিলাম।

চন্দন বলল, ওরে দুষ্টু মেয়ে, তুমি তা হলে মজা করবার জন্যে এই সব করেছিলে?

হ্যাঁ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি চন্দনদা।

ক্ষমা করলাম। তবে জেনে রেখো, আমারও তোমার সঙ্গে ভাব জমাবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। আর খুব ইচ্ছে করত তোমার সঙ্গে চারদিকে বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে।

বেশ তো এবার ঘোরো না কত ঘুরবে। আমি তোমাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।

ঠিক আছে, আর কোনও কথা নয়। এবার মুখবুজে চুপচাপ চলো। বলে বড় বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে ছায়ায় ছায়ায় সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ওরা এগিয়ে চলল।

ওরা যখন সেই ঘন গাছপালার আড়ালে বাগানের অর্ধপথে, তখন হঠাৎই একটা টর্চের আলো ওদের ওপর পড়েই নিভে গেল। আর তারপরেই মনে হল কেউ বা কারা যেন ছুটে পালাল সেখান থেকে।

চন্দন ও মালাও ছুটল।

মালা চেঁচাতে লাগল, চোর চোর! জেঠু তাড়াতাড়ি এসো। ভাস্করমামা, তুমি ওই পাশ দিয়ে যাও। চন্দনদা, দারোগাবাবুকে বলো গেটের দিকে তাড়া করতে। যাও শিগগির যাও।

চন্দন তো হতচকিত। কোথায় মেসো, কোথায় ভাস্করমামা আর কোথায়ই বা দারোগাবাবু! মালার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? একটুক্ষণ ছুটে ছোটা থামিয়ে মালা মিষ্টি করে তাকাল চন্দনের দিকে। তারপর এক চোখ টিপে হেসে বলল, ঢপ দিলাম! না হলে আমাদের দু'জনকে ছোট দেখে যদি ওরা তাড়া করে?

চন্দন বলল, তোমার এত বুদ্ধি মালা?

এরকম না হলে গোয়েন্দাগিরি করব কী করে? ঠিক আছে, কোনও চিন্তা নেই। দ্যাখো না দু'দিনে তোমাকেও আমি তৈরি করে নেব!

এখানে বাগানটা খুবই ঘন! তবুও মালা আর চন্দন দু'জনে মিলে চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল কোথাও কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে। না, কেউ কোথাও নেই। কোথাও কিছু নেই। আশ্চর্য।

চন্দন বলল, পালিয়েছে ব্যাটারা।

মালা বলল, পালাবে কোথায়? চারদিকে পাঁচিল আর পাঁচিলের গায়েগায়ে কাঁটাঝোপ। ওরা ঠিক এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। দারোগাবাবু তো বলেইছেন কাউকে দেখতে পেলেই শিস দিতে। তা হলেই উনি ছুটে আসবেন।

ওরা এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। দেখল সেখানে পাঁচিলের একাংশ সামান্য ধসে গেছে। খুবই সম্প্রতি বলে মনে হল। অর্থাৎ বদমাইশ লোকগুলো এইখান দিয়েই ওদের পালাবার পথ তৈরি করে রেখেছে।

মালা বলল, বুঝেছি। এই তোমাদের পালাবার পথ।

চন্দন বলল, কিন্তু মালা, এখান দিয়ে সাইকেল পাচার করবে কী করে?

ওরা তবুও পাঁচিলের কাছে এসে দেখল এখান দিয়ে পালানোও খুব একটা সহজসাধ্য নয়। তবুও শয়তানের অসাধ্য কিছু তো নেই।

চন্দন বলল, লোকগুলো সত্যিই পালিয়েছে, নাকি গাছে উঠে লুকিয়ে বসে আছে?

কে জানে? নেই যখন, তখন চলে যাই চলো।

ওরা বাগানের সোজা পথ ধরে বেশ কিছুটা ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে এল। তারপর এক জায়গায় ঘন ঘাসের গালিচার ওপর বসে পড়ল।

মালা বলল, কী চমৎকার পরিবেশ এখানকার, না?

চন্দন বলল, সত্যি, তোমাদের এই বাগানটা দেখার পর মনে হয় না স্বর্গেও কখনও বেড়াতে যাই। ফুলের গন্ধে বুক যেন ভরে উঠেছে। আর এই অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত। মনে হয় এখানকার এই ফুলবনে যেন সারারাত ঘুরে বেড়াই।

আমারও খুব ইচ্ছে করে, তবে কী জানো চন্দনদা, সাহস আমার অফুরন্ত হলেও আমি একা তো। এখন না হয় তুমি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু এতদিন তো একাই ছিলাম। মাঝে-মধ্যে রাত্রিবেলাও এই বাগানে আমি একা এসেছি। তবে খুব ভয় করত।

রাত্রে একা এসেছ? কেন?

বললাম না, আমাদের বাড়িতে যে সেই ভয়াবহ ডাকাতিটা হয়ে গেল, তারপর যখন আমি মা-বাবার সঙ্গে এখানে আসি, তখন আমি নিজেই চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি কোথাও কোন সূত্র পাই কি না। একদিন হঠাৎ বাগানে ঘাসের ওপর ঠাকুরের মোহন বাঁশিটি আমি কুড়িয়ে পাই...।

তারপর?

কেউ জানে না। কাউকে বলিনি। ওটা এখনও আমার জিম্মাতেই আছে।

ভুল করলে মালা, এই কথাটা তোমার মেসোকে জানানো উচিত ছিল। উনি তা হলে পুলিশকে জানাতে পারতেন ব্যাপারটা।

মালা এবার একটু রাগতসুরে বলল, কিচ্ছু হবে না তোমার দ্বারা। এই তা হলে তুমি 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' পড়? চন্দনদা, আমি ধাপে ধাপে অনেক এগিয়ে গেছি। ওই মূর্তিকে উদ্ধার পুলিশে নয়, আমিই করব।

সে কী! এত তোমার মনের জোর?

হ্যাঁ।

তা হলে মালা, আমিও তোমার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। কেন না এই রকম একটা কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, এ আমার বহুদিনের শখ। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র বাবলুর মতো আমিও একজন হতে চাই।

আমি জানি। তোমার মা, কাকিমার কাছ গল্প করছিলেন আমি শুনেছি। তুমি নাকি বাইরে বেরোলে ছুরি, নাইলনের দড়ি, টর্চ এইসব সঙ্গে রাখ? ভাস্করমামা বলছিলেন তুমি নাকি ফেয়ারলি প্লেসের বুকিং অফিসে একজনের হাত মুচড়ে দিয়েছিলে?

ও বাবা, আমার সম্বন্ধে এত খবরও তুমি রেখেছ? অথচ এমন ভান দেখাতে যেন আমাকে দেখলে তুমি জ্বলে যাও?

এমন সময় হঠাৎ কর্কশ চিৎকারে চমকে উঠল দু'জনেই।

চন্দন ভয়ে নীল হয়ে গেল। মালা সস্নেহে ওর বুকে হাত বুলিয়ে বলল, ভয় নেই। ওটা প্যাঁচা। হয়তো কালপ্যাঁচা হবে।

একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মালা আবার বলল, সাইকেলটা হারিয়ে আমার কত ক্ষতি হল তা জানো? নন্দন পাহাড়ের পথে একদিন পাহাড়ে ওঠার মুখে পথের ধারে কুড়িয়ে পাই ঠাকুমার গোপালকে। পা-ভাঙা অবস্থায়। তারপর থেকে রোজ দু'বেলা যাই। পাহাড়টাকে চষে ফেলি।

সে কী!

সাইকেলটা ছিল বলেই সম্ভব হয়েছিল। দিদা বেনারস থেকে পাথরের ওই নাড়ুগোপাল কিনে এনেছিলেন। একটা পেতলের গণেশ, লক্ষ্মীঠাকুর আর নাড়ুগোপাল ছোট একটি সিংহাসনে বসানো থাকত। ওরা ঝোঁকের মাথায় সেগুলোকেও নিয়ে পালাবার সময় অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে যেখানেসেখানে ফেলতে ফেলতে যায়।

রুপোর বাঁশিটা তো অপ্রয়োজনীয় নয়। ওটার তো দাম আছে?

ওটা আসলে পড়ে যায়। অন্ধকারে ছুটে পালাবার সময় পড়ে যায় ওটা। ওরা সোজা পথে না-গিয়ে বাগানের পাঁচিল টপকে উলটো পথে চলে যায়।

পাঁচিল কী করে টপকাল?

আগে থেকে ব্যবস্থা করে রেখেছিল নিশ্চয়ই। একদল পাঁচিল টপকে যায়। অন্য দল সামনের গেট দিয়ে। অর্থাৎ দু'ভাগ হয়ে। তা হলে পুলিশের হাতে এক

দল ধরা পড়লে অন্য দল বেঁচে যাবে। প্রথমেই ওরা চলে যায় নন্দন পাহাড়ের নির্জনতায়। তারপর... তারপর যে কোথায় যায় সেটাই খুঁজে বার করতে হবে আমাদের।

তোমার কী মনে হয় কাছাকাছিই কোথাও আছে মূর্তিটা?

হতে পারে। একদিন ত্রিকূট বেড়াতে গেছি, ওখানে কাকাহিগড়ের সাধুর সঙ্গে দেখা। কী ভীষণদর্শন চেহারা। আমাকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে একজনকে ফিস ফিস করে কী যেন বললেন।

যাকে বলল সে কে?

সে ওইখানেই আশ্রমে থাকে।

তুমি কী করে জানলে যে ওই সাধুই কাকাহিগড়ের সাধুবাবা?

পরে একদিন সাধুবাবা নন্দন পাহাড়ে গিয়েছিলেন। ওইখানে কমলু নামে আমার এক বান্ধবী আছে। সে বলল। সে-ই বলেছে ওই সাধুবাবার কথা। কমলু মেয়েটা-না খুব ভাল। আমি ওর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। ওর মুখে আমি অনেক কথা শুনেছি। ও আমায় কয়েকটা লোককে চিনিয়ে দিয়েছে। ও বলেছে আমাদের বাড়িতে যারা ডাকাতি করেছে, তাদের কয়েকজনকে ও নাকি চেনে।

বলো কী?

ওই জন্যেই তো সকাল-সন্ধে সব সময় আমি ওর কাছে যাই। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব বলে কেউ আমাকে সন্দেহও করে না। ওকে আমি তোমার কথাও বলেছি।

চন্দন উৎসাহ নিয়ে বলল, কী বলেছ আমার কথা?

বলেছি আমার এক দাদা এসেছে কলকাতা থেকে। একদিন দাদাকে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

সত্যি?

সত্যি। চলো না ভোরবেলা তোমাকে নিয়ে যাই কমলুর কাছে। ও-ই বলবে সত্যি কি না।

চন্দন হেসে বলল, আচ্ছা মালা, আমি যদি তোমার ওপর রাগ করতাম। তোমার সঙ্গে না যেতাম?

এঃ, তা তুমি পারতেই না। তোমার চোখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাও। তা ছাড়া আমাকে এড়ানো বড় কঠিন। বুঝলে তো? শুধু তুমি কেন, আমার সুন্দর চেহারার জন্য সবাই আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

চন্দন অবাক। নিজের চেহারা সুন্দর সেটাও কোনও মেয়ে নিজে থেকে বলে?

পাগলি নাকি? বলল, তোমার মতো মেয়ে সত্যিই হয় না মালা। কিন্তু তুমি অত ভোরে অন্ধকার থাকতে যাও কেন? সকালে দিনের আলোয় যেতে পার না?

না। অত ভোরে কেন যাই জানো? ওখানে ভোরে মঙ্গলারতির সময় আমি আর কমলু ঘণ্টা বাজাই। আবার সন্ধেবেলাও যখন আরতি হয়, তখনও ঘণ্টা বাজাই আমরা। ওখানকার পাণ্ডাঠাকুর কমলুর বাবা হন। আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন। আর কমলু? সে আমার বান্ধবী হলেও ঠিক যেন মা'র পেটের বোন।

ওরা বাগানে নির্জনে ঘাসের ওপর বসে যখন সেই অপূর্ব জোছনালোকে কথাবার্তা বলছিল, তখন হঠাৎই চন্দনের নজর পড়ল দুটো কালো ছায়া যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

মালা অন্যমনস্ক ছিল। তাই সে ঠিক বুঝতে পারেনি। কিন্তু চন্দন বুঝল পিছন দিক থেকে কেউ যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

মালা বলল, কী হল চুপ করে গেলে কেন চন্দনদা?

চন্দন চোখের ইশারায় সেই ছায়াদুটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওই দেখো।

মালা দেখল।

চাঁদ পিছনের দিকে বলেই লোকদুটির ছায়া এত বড় আকারে পড়েছে। ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে থাবা বাড়িয়ে এই দুই কিশোরকিশোরীকে গ্রাস করবার জন্য। হঠাৎ মালা চেঁচিয়ে উঠল, চন্দনদা।

চন্দন দেখল একটি ছায়ামূর্তি মালার ওর ঝাঁপিয়ে পড়ে মালাকে তুলে নিয়েছে। আর একটি যেই-না ওর দিকে এগোতে যাবে ও অমনি ওর হাতে রাখা সেই লোহার রড দিয়ে সজোরে মারল লোকটার পায়ে।

লোকটা মুখ থুবড়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। আর একজন যে মালাকে শূন্যে তুলে নিয়েছিল, এক সময় সেও বিকট একটা চিৎকার করে উঠল। মালা দু'হাতের নখ দিয়ে তার চোখদুটো কানা করে দিয়েছে একেবারে।

চন্দন তখন বেপরোয়া। দুটো লোককেই ধরে তখন সে কী দারুণ ডান্ডাপেটা। রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন, রামে চার। কী মার! কী মার। মারের চোটে ভুবন অন্ধকার করে দিল তখন। কিন্তু ওরা ভেবে পেল না নিশিরাতের এই আগন্তুকরা ওদের দু'জনকে অপহরণ বা আক্রমণ করতে এল কেন?

ইতিমধ্যে ওদের চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এসেছে। সুনন্দবাবু, নিরুপমবাবু, ভাস্করমামা, বনমালী সবাই। তারপর এসে দেখেন এই রক্তারক্তি কাণ্ড!

সবাই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী?

মালা আর চন্দন সব কথা খুলে বলল।

নিরুপমবাবু বললেন, কিন্তু তোমরা যে একেবারে শেষ করে ফেলেছ

লোকদুটোকে। এখন থানা-পুলিশ করতে গেলে ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়িয়ে যাবে। একেবারে হাফ মার্ডার।

মালা বলল, তা বললে হয়? পুলিশে খবর তো দিতেই হবে। আমাদের বাড়ির মূর্তি চুরি এবং ডাকাতির ব্যাপারে এরা নিশ্চয়ই ছিল। না হলে আমাদের আক্রমণ করল কেন? পুলিশের রুলের গুঁতো খেলে বাপ বাপ করে বলতে পথ পাবে না।

সুনন্দবাবু লোকদুটোকে জেরা করলেন, কী নাম তোমাদের?

লোকদুটি কোনও উত্তর দিল না!

তোমাদের যা জিজ্ঞেস করব যদি সঠিক বল তো পুলিশে দেব না।

লোকদুটি নিরুত্তর।

মালা বলল, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ধরে বেধড়ক মার দিতে পারলে ঠিক বলবে। বলেই লোহার রডটা নিয়ে একজনের পায়ের গাঁটে দড়াম করে মারতেই চিৎকার করে উঠল লোকটা।

মালা বলল, বল এবার, আমাদের নিয়ে পালাবার মতলব করেছিলি কেন?

লোকটি বলল, নেহি। লে যানে কা মতলব নেহি থা।

তবে? কোন মতলব ছিল? তোদের সঙ্গে তো আরও লোকজন ছিল। তারা কোথায়?

ও লোক নিকাল গয়া।

তোরা এখানে কী করছিলি?

ভাঙ্ খানেকে লিয়ে আয়া থা।

ভাঙ্ খেতে এসেছিলি? এই কথাটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আমাদের বাড়িতে তোরাই ডাকাতি করতে এসেছিলি।

হাম লোক নেহি থে।

ভাস্করমামা এতক্ষণে একজনের পেটে লাথি কষিয়ে বলল, তো কোন লোক ছিল বল! চোরে-চোরে তোরা সব মাসতুতো ভাই।

মালা বলল, তা হলে তোরা নিশ্চয়ই আমার সাইকেল চুরি করতে এসেছিলি?

নেহি। হামলোক চোর নেহি।

তা হলে এত রাতে বাগানে কী করতে এসেছিলি বল? কেন আমাদের আক্রমণ করেছিলি?

এ কথার আর কোনও উত্তর নেই।

হঠাৎ বাগানের ভেতর থেকে দুম দাম বোমা ফাটার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

নিরুপমবাবু বললেন, আর এখানে থাকা ঠিক নয়। চলো পালাই। ওদের লোককে ওরা তুলে নিয়ে যাক।

ওরা সবাই তখন প্রায় ছুটে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সুনন্দবাবু ও

নিরুপমবাবু ছাদে উঠে লুকিয়ে দেখতে লাগলেন মালার সাইকেলে চেপে একজন লোক চলে গেল বাগানের বাইরে। জনা চারেক লোক আহত লোক দু'জনকে তুলে নিয়ে গেল! আর শেষজন করল কী সবাই চলে গেলে সদর দরজার ওপর একটি বোমা ছুড়ে ছুটে পালাল সেখানে থেকে।

প্রথমে 'বুম' করে একটা শব্দ। তারপর সব যেন ঝনঝনিয়ে কেঁপে উঠল একবার। সুনন্দবাবু ও নিরুপম নেমে এলেন ছাদ থেকে। রূপামাসি বলল, মৌচাকে ঢিল পড়েছে এবার। কী যে হবে ভগবান জানেন। তবে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে এখন থেকে।

নিরুপমবাবু বললেন, এবার তো দেখছি রাস্তায় ঘাটে বেরুনো দায় হয়ে উঠবে।

সুনন্দবাবু বললেন, কাজটা খুবই খারাপ করে ফেলল ছেলেমেয়ে দুটো। এখন যত রাগ না এদের ওপর পড়ে।

দেবযানী বললেন, আমার বাবা ভয় করছে। তুমি কালই সকালে চলে চলো, পালাই এখান থেকে। আর দরকার নেই দেওঘর বেড়িয়ে। খুব হয়েছে।

মালা আর চন্দন চুপ। কাজটা যদিও ভাল হয়নি, তবুও লোকদুটোকে ওইরকম ঘায়েল করতে না পারলে তো ওদের দু'জনকে চুরি করে নিয়েই পালাত ওরা।

ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে। পাখির কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে চারদিক।

গত রাত্রের ওই ঘটনার পর আর ভোরে বেরনো যায় না। তাই মালা ও চন্দন যে যার ঘরে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠল। সকালে জলযোগের পর মালা রূপামাসিকে বলল, চন্দনদাকে নিয়ে একটু মন্দির থেকে ঘুরে আসব কাকিমা?

নিরুপমবাবু বললেন, না। একদম ঘর থেকে বেরোবে না। আজ থেকে বেরিয়েছ কী মরেছ। তোমরা কী ভেবেছ ওরা ওই মারের বদলা নেবে না?

সুনন্দবাবু বললেন, কথাটা তুমি যা বলেছ তা ঠিক। তবে সে ভয় করলে তো এখুনি আমাদের সবাইকে এখানকার পাট তুলে দিতে হয়। তা যখন সম্ভব নয় তখন কী হবে অযথা ভয় পেয়ে?

চন্দন বলল, ঠিক! তুমি ঠিক কথাই বলেছ বাবা। ওরা আমাদের অপহরণ করবার ধান্দায় ছিল, তাই মোক্ষম দাওয়াই দিয়েছি ওদের। আবার এলে পেটাব।

দেবযানী বললেন, ভারী তো বীরপুরুষ!

মালা বলল, বীরপুরুষই তো। ওই রকম নৃসিংহঅবতারের মতো চেহারা যে লোকদুটোর তাদের আমরা কী অবস্থা করে ছেড়েছি বলুন তো!

চন্দন বলল, আমি যাব মা, মালার সঙ্গে?

দেবযানী বললেন, চল তবে আমিও যাই।

রূপামাসি বললেন, সেই ভাল। তুইও যা দিদি। ছোড়দাকেও সঙ্গে নিয়ে যা।

মালা বলল, কে ভাস্করমামা। উনি অনেক আগেই বেরিয়ে গেছেন।

যাই হোক! দেবযানী মালা ও চন্দন মন্দির দেখতে চলল। বাড়ি থেকে বেরোতেই একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে গেল ওরা। সেই রিকশায় চেপে একেবারে শিবগঙ্গার সামনে এসে নামল। তারপর পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল মন্দিরের দিকে।

আবার সেই পাণ্ডার উপদ্রব।

দু'-একজনকে শংকর পাণ্ডার নাম বলতেই সরে পড়ল তারা। কিন্তু শেষকালে এমন একজন এসে হাজির হল যাকে আর এড়ানো গেল না। বলল, আমি শংকর পাণ্ডারই লোক মা! শংকর এখন এখানে নেই। ও গেছে বেণ্ডসরাইতে গানবাজনা করতে। আপনাদের পূজাপাঠ আমিই করিয়ে দেব।

দেবযানী বললেন, কিন্তু বাবা আমি তো এখন স্নানটান কিছু করিনি।

তাতে কী হয়েছে? এই শিবগঙ্গার জল মাথায় নিন। তা হলেই হবে। বলুন কত টাকার পুজো দেব?

দশটা টাকা আছে। এতেই যা হয় করে দাও।

পাণ্ডা তাতেই খুশি। বলল, এতেই হবে। যান শিবগঙ্গার জল মাথায় নিয়ে আসুন। তারপর চলুন আমার সঙ্গে।

দেবযানী তাই করলেন। মালা-চন্দনও জলস্পর্শ করল। তারপর চলল পাণ্ডার পিছু পিছু।

পাণ্ডাটি বয়সে প্রবীণ। এবং জানেও অনেক কিছু। যেতে যেতে বলল, মা, এই দেওঘরের বাবা বৈদ্যনাথ বড় যা তা দেবতা নন। বাবার অনুগ্রহে এই মহাতীর্থে কারও মৃত্যু হলে যদি সে মহাপাপীও হয়, তবু তাকে এই সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না। এবং দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েও যদি কেউ এই তীর্থে না আসে, তবে তার জন্মই বৃথা। মানুষের জীবনের সর্বপাপ তীর্থদর্শনে ক্ষয় হয়। তীর্থের পাপ নষ্ট হয় কাশীদর্শনে। কিন্তু কাশীতে বসে কোনও পাপ করলে সেই পাপ সদ্য বিনাশিত হয় বৈদ্যনাথদর্শন করলে।

দেবযানী বললেন, বলেন কী?

হ্যাঁ মা, এসব আমার কথা নয়। শাস্ত্রের কথা।

চন্দন বলল, আপনি খুব ভাল বাংলা বলতে পারেন তো?

কেন পরব না? এক সময় এ দেশ তো বাংলাতেই ছিল। তা ছাড়া আমি মিথিলার লোক। আর এখানে বাঙালি যাত্রীরও অভাব নেই। কাজেই ভাল বাংলা শিখে গেছি। তবে লিখতে বা পড়তে ভাল পারি না। আরও শুনুন, এখানকার জল

গঙ্গাজলের মতো পবিত্র এবং মাটি কাঞ্চনের মতো মূল্যবান। আর এর মাহাত্ম্য শুনবেন? পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে আছে—

ত্রেতাযুগে লঙ্কাপতি রাবণ একবার চিন্তা করেছিলেন স্বর্ণলঙ্কার পূর্ণ উন্নতি করতে হলে কৈলাসপতি মহাদেবের চির প্রসন্নতার একান্ত প্রয়োজন। এই ভেবে তিনি কৈলাস পর্বতে গমন করলেন। কৈলাসে হরপার্বতীর মধ্যে তখন কী নিয়ে যেন মনোমালিন্য হয়েছিল। পার্বতী তাই অভিমান করে বসেছিলেন। এমন সময় রাবণ কৈলাসে উপস্থিত হলে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান নন্দী বাধা দিল রাবণকে। এবং ভেতরে যেতে নিষেধ করল। কিন্তু লঙ্কাধিপতি কখনও কারও নিষেধ শোনেন না। তাই ক্রোধে কম্পিত হয়ে নন্দীকে আক্রমণ করলেন তিনি। এবং ছুড়ে ফেলে দিলেন নন্দন কাননে। রাবণের ভয়ে কৈলাস তখন কেঁপে উঠল। আর কৈলাশ কেঁপে ওঠায় পার্বতীও ভয়ে অভিমান ভুলে মহাদেবের পায়ের কাছে সরে এলেন। মহাদেব তাড়াতাড়ি এক হাতে পার্বতীকে ধরে, অপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কৈলাসকে টিপে ধরে তার কাঁপুনি থামালেন। এবং নন্দীকে আহ্বান করলেন। ততক্ষণে রাবণ শিবসমীপে উপস্থিত হয়েছেন। নন্দীও এসে দাঁড়াল একটু পরে। রাবণ বললেন, হে, দেবাদিদেব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি জগৎপিতা। আপনার কাছে প্রয়োজনে আমি যখন খুশি আসব। সেখানে নন্দী আমাকে বাধা দেবার কে? তাই রাগে আমি নন্দীকে নন্দন কাননে নিক্ষেপ করেছি। এই বলে রাবণ মহাদেবের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। অল্প স্তবেই সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, তোমার স্তুতিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি রাবণ। কী বর চাও তুমি বল? রাবণ বললেন, আমি আপনাকে চাই প্রভু! আমি চাই আপনি চিরকাল আমার স্বর্ণলঙ্কায় বিরাজ করুন। মহাদেব বললেন, তা তো হতে পারে না রাবণ। তবে আমি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের রূপে দ্বাদশ ক্ষেত্রে বিরাজ করতে চাই। এই বলে একটি জ্যোতির্লিঙ্গ রাবণের হাতে দিয়ে বললেন, এটি তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু সাবধান। পথে কোথাও যেন এই লিঙ্গকে তুমি নামাবে না। যদি নামাও তবে এই লিঙ্গ কিন্তু সেখানেই বরাবরের জন্য রয়ে যাবে। আর তাকে নড়াতে পারবে না। রাবণ তাতেই সম্মত হয়ে জ্যোতির্লিঙ্গ উত্তোলন করতে গেলেন। তাই দেখে পার্বতী বললেন, হে রাবণ! আপনি একজন নিষ্টাবান ব্রাহ্মণ, আপনি আচমন না করে প্রভুর লিঙ্গ উত্তোলন করতে যাচ্ছেন কীরকম? পার্বতীর কথায় লজ্জিত হয়ে রাবণ বললেন, অপরাধ ক্ষমা করুন দেবী। আমাকে আচমনের জন্য জল দিন। পার্বতী তখন ছল করে রাবণকে মেঘমিশ্রিত জল দিলেন। রাবণ বুঝতে না পেয়ে সেই জলেই আচমন করে জ্যোতির্লিঙ্গ কাঁধে নিয়ে রওনা হলেন লঙ্কার পথে।

দেবযানী বললেন, এগুলো মনে রাখ চন্দন। শুধু তীর্থস্থানে এলেই হয় না।

সব কিছু জানতে শিখতে হয়। পুরাণের অনেক কিছুই অবাস্তব হলেও পুরাণ মিথ্যে না বুঝলি?

মালা বলল, আমি অবশ্য এই কাহিনিটা কিছু কিছু শুনেছিলাম তবে এত ভাল করে নয়।

কাহিনি আবার শুরু হল—

এদিকে প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসরাজ রাবণ জ্যোতির্লিঙ্গ নিয়ে যাচ্ছেন দেখে দেবগণ প্রমাদ গণলেন। তাঁরা সকলে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন বিষ্ণুর চরণ। তাঁদের সঙ্গে পার্বতীও ছিলেন। বললেন, সর্বনাশ হয়েছে প্রভু। রাবণ শিবকে সন্তুষ্ট করে জোতির্লিঙ্গ নিয়ে লঙ্কায় যাচ্ছে। শিবশক্তি লঙ্কায় অধিষ্ঠিত হলে লঙ্কাপুরী কখনওই ধ্বংস হবে না এবং রাবণ অপরাজেয় থেকে যাবে। আপনি এক্ষুনি এর একটা বিহিত করুন। বিষ্ণু বললেন, কী বিহিত করব? পার্বতী বললেন, যে করেই হোক রাবণের কাঁধ থেকে জোতির্লিঙ্গ নামাতে হবে। বিষ্ণু বললেন, হ্যাঁ। এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না। বলেই বরুণকে ঢেকে বললেন, তুমি রাবণের উদরে প্রবেশ করতে পারবে? বরুণ বললেন, পার্বতী রাবণকে মেঘমিশ্রিত জল পান করিয়েছেন। আমি তখন থেকেই ওর পেটের ভেতর ঢুকে বসে আছি প্রভু। বিষ্ণু বললেন, ভালই করেছ। রাবণ এখন হার্দপীঠ (দেওঘর) অতিক্রম করছে। ওই পবিত্র ভূমিই জ্যোতির্লিঙ্গ নামাবার উপযুক্ত স্থান। তুমি এক্ষুনি রাবণের পেটের ভেতর তোলপাড় শুরু করে দাও। তারপর আমি দেখছি। এই বলে বিষ্ণু এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে হার্দপীঠে উপস্থিত হলেন এবং রাবণের কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধের জ্যোতির্লিঙ্গটির বিষয়ে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। এদিকে বরুণও তাঁর খেলা শুরু করে দিয়েছেন তখন। বরুণের প্রচণ্ড প্রভাবে রাবণের প্রবল প্রস্রাবের বেগ এল। তিনি ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণুকে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তা হলে আমার এই জ্যোতির্লিঙ্গটি আপনি কি একদণ্ড একটু ধরবেন? আমি তা হলে একটু প্রস্রাব করে আসি। ব্রাহ্মণ বললেন, নিশ্চয়ই ধরব। দেবাদিদেব মহাদেবকে কাঁধে নেব এ তো আমার পরম সৌভাগ্যে। তবে এ অতি পবিত্র ভূমি। আপনি এখানে প্রস্রাব না করে একটু দূরে গিয়ে করবেন কিন্তু। রাবণ বললেন, ঠিক আছে। তবে আপনি কিন্তু ভুলেও যেন এটি মাটিতে নামাবেন না। তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই বলে রাবণ সেখান থেকে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে প্রস্রাব করতে লাগলেন। বরুণের প্রবল প্রভাবে সেই প্রস্রাব কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। প্রস্রাব তখন নদী হয়ে ছুটতে লাগল। এই নদীই বর্তমানে কর্মনাশা। এর জলে কোনও পবিত্র কর্ম হয় না। এদিকে রাবণ সরে যেতেই ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু করলেন কী, সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্লিঙ্গটি নামিয়ে সেই খানেই মন্ত্রপূত করে স্থাপন করলেন। বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করা মাত্রই সেই

জ্যোতির্লিঙ্গ মাত্র আট আঙ্গুল প্রমাণ বাইরে থেকে সপ্তপাতাল ভেদ করল।

এই পর্যন্ত শুনেই দেবযানী দু'হাত জোড় করে বৈদ্যনাথের উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

আবার শুরু হল কাহিনি—

এদিকে প্রস্রাবের বেগ তিরোহিত হলে রাবণ ফিরে এসে যখন দেখলেন ব্রাহ্মণ নেই, তখন ভয়ে বুক কেঁপে উঠল তাঁর। দেখলেন জ্যোতির্লিঙ্গ সেইখানে স্থাপিত হয়েছে। এবং ব্রাহ্মণের বদলে একজন ভিল দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। রাবণ গায়ের জোরে তখন সেই জ্যোতির্লিঙ্গটিকে উৎপাটন করতে গেলেন। এমন সময় দৈববাণী হল, যে এই শিবলিঙ্গকে উৎখাত করবে তার বংশ ক্ষয় হবে। দৈববাণী শুনে রাবণ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে জ্যোতির্লিঙ্গের মাথায় এমন মুষ্ঠাঘাত করলেন যে মাথার খানিকটা ভেঙেই গেল। বর্তমানে বৈদ্যনাথের ভাঙা মূর্তিই দেখা যায়। যাই হোক, রাবণ সেই ভিলকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করে কী হল? ভিল সবই দেখেছিল। তাই বলল, এই জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ং বিষ্ণু স্থাপন করেছেন। এর পুজো করলে সর্বকাম সিদ্ধ হবে। রাবণ তাই শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তারপর ক্ষোভে নিজের দশমুণ্ড কেটে ফেলতে উদ্যত হলে রাবণকে দেখা দিয়ে শিব বললেন, হে রাবণ! আমি তো আর এখান থেকে উঠব না। তবে তুমি অকারণে কেন বিলাপ করছ? তুমি এখানেই আমার যথাযোগ্য পূজা করো। এবং হরিদ্বার থেকে গঙ্গাজল এনে আমাকে স্নান করাও। রাবণ তাই করলেন এবং সেইখানেই তিরনিক্ষেপ করে একটি কূপ খনন করে তাইতে সর্বতীর্থের জল এনে রাখলেন। এই কূপের নাম চন্দ্রকূপ। ওই দেখুন, ওই সেই চন্দ্রকূপ।

কথা বলতে বলতে কখন যে ওরা মন্দিরের দরজার কাছে এসে পড়েছে তা কারও খেয়াল ছিল না। সেখানে জুতো জমা দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকে চন্দ্রকূপের জল নিয়ে পূজার প্রস্তুতি করতে লাগল। শংকর পাণ্ডার লোক একটি দোকান থেকে ফুলমালার ডালা নিয়ে এল। তারপর চলল মূল মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করতে।

ওঃ সে কী প্রচণ্ড ভিড়। দেবযানী, মালা ও চন্দনের হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে চললেন। বহু কষ্টে দর্শন হল। পূজাও হল কষ্ট করেই।

দেবযানী ওই দশটাকা ছাড়াও লোকটির হাতে দক্ষিণাস্বরূপ আরও পাঁচটি টাকা দিতে সে তো আরও খুশি। বলল, আপনার মতো মানুষ হয় না মা। তবে আমি এতক্ষণ যা বললাম তা আপনার শুনতে ভাল লাগল কী না জানি না। তবু আমার কর্তব্য বলা তাই বললাম।

দেবযানী বললেন, আমার খুব ভাল লেগেছে বাবা। আপনি না বললে এসব মহিমা জানতামই না।

লোকটি বলল, ধৈর্য ধরে তা হলে আর একটু শুনুন। পুরাকালে এই পবিত্র ক্ষেত্রের কাছে একটি হ্রদের ধারে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আর এখানকার জঙ্গলে বাস করত ভিলেরা। ব্রাহ্মণেরা চাষ-আবাদ করতেন এবং ভিলেরা গোরু-মোষ চরাত ও শিকার করত। ব্রাহ্মণরা চাষ-আবাদ ছাড়াও রাবণেশ্বর (বৈদ্যনাথ) শিবের পূজা করতেন। আর ভিলরা পূজা করত তিনটি পাথরকে। কালক্রমে ব্রাহ্মণরা অলস হয়ে পড়লেন। তাঁরা মিথ্যাবাদী ও ব্যাভিচারী হলেন। সেই সময় ভিলদের দলপতি বিজু নামে এক যুবক, ব্রাহ্মণদের এই অনাচারে দারুণ কুপিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে, প্রতিদিন সে ব্রাহ্মণদের উপাস্য দেবতা রাবণেশ্বরের মাথায় লাঠির ঘা না-মেরে জলগ্রহণ করবে না।

মালা বলল, বলেন কী । ভারী সাংঘাতিক তো?

হ্যাঁ। প্রতিজ্ঞা করার পর সে তাই করত। একদিন সে কোনও কারণে ভুলে খেতে বসে গিয়েছিল। কিন্তু যেই তার সেই কথা মনে পড়ে গেল অমনি সে খাওয়া ফেলে রেখে ছুটল লাঠি নিয়ে। যখন সে ছুটতে ছুটতে হ্রদের কাছে এসে পৌঁছেচে, তখন হ্রদের ভেতর থেকে হঠাৎ এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হয়ে কতকটা স্বগতোক্তির মতই বললেন, কী আশ্চর্য! একজন আমাকে মনে রেখেছে বলে ক্ষুধাতৃষ্ণা ফেলেও আমাকে মারতে আসছে আর আমার পূজারি ব্রাহ্মণরা আমাকে ভুলে গিয়ে এমন ব্যাভিচারী হয়েছে যে, দিনান্তে একটি ফুল-বেলপাতাও আমাকে দেয় না। বিজু সেই কথা শুনতে পেয়েই সেই দিব্যপুরুষকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কে তুমি? দিব্যপুরুষ বললেন, আমি সেই, যাকে তুমি লাঠি দিয়ে মারতে যাচ্ছ। বিজু তৎক্ষণাৎ লাঠি ফেলে দিয়ে সেই দিব্যপুরুষকে প্রণাম করে বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। আমি ব্রাহ্মণদের প্রতি ক্রোধবশত এই কাজ করছিলাম। না হলে আপনার প্রতি আমার কোনও ক্ষোভ নেই। দিব্যপুরুষ বললেন, ওরা আমার পূজারি হলেও তুমিই আমার প্রধান ভক্ত। আমি তোমাকে বর দিতে চাই। কী বর চাও তুমি বলো? বিজু বলল, আমি অন্য কিছুই চাই না প্রভু, শুধু আমার নামে আপনার নাম হোক এই আমি চাই। আমার নাম বিজু। আর আপনি জগতের নাথ। দুয়ে মিলে আপনার নাম হোক বিজুনাথ। দিব্যপুরুষ তথাস্তু বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই থেকে রাবণেশ্বর বিজুনাথ নামে খ্যাত হলেন। তারপর বিজুনাথ থেকে হল বৈজুনাথ। এবং বৈজুনাথ থেকে বৈদ্যনাথ।

গল্প শুনে দেবযানী অভিভূত হয়ে পড়লেন।

মালা আর চন্দনও খুশিতে ভরে উঠল। বৈদ্যনাথের এত মাহাত্ম্য তা কে জানত!

মন্দিরের পরিবেশ অতি মনোরম। চারদিকে মন্দির। এইসব ঘুরে দেখতে দেখতে একসময় মালা প্রশ্ন করল, আচ্ছা এই মন্দির কে তৈরি করেছিলেন?

পাণ্ডা ঠাকুর বলল, আগে তো শ্রীবিষ্ণু বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এটি তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর কালক্রমে সেটি ধ্বংস হয়। তবে প্রাচীন মন্দিরের শিলালিপি দেখে জানা যায় যে ১৫৯৬ সালে পুরণমল্ল এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। উচ্চতা ৭২ ফুট।

চন্দন বলল, পুরণমল্ল কে?

পুরণমল্ল ছিলেন গিরিধিরাজ (গিরিডিহি) বীর বিক্রম সিংহের ৯ম বংশধর। বিক্রম সিংহ ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দে গিরিডি রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। পুরণের পঞ্চম বংশধর ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাজাহানের কাছে থেকে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে মন্দিরএলাকা ঘুরে ফিরে ওরা আবার বাইরে এল। বাইরে কত রকমের দোকানপাট। সবকিছু দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে চলল ঘরির মোড়ের দিকে।

দেবযানী একটা দোকান থেকে লোহালক্কড়ের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জিনিসপত্তর কিনলেন।

চন্দন বলল, মা, তোমাকে একটা রিকশায় উঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি তাইতে চেপে সোজা বাড়ি চলে যাও। মালা আর আমি চারদিকে একটু ঘুরেবেড়িয়ে তারপর যাব। কেমন?

দেবযানী বললেন, বেশ তাই হোক। তোরা দু'জনে ঘুরে বেড়া। তবে খুব বেশি দেরি করিস না যেন। আমি তা হলে ভাবব।

মালা-চন্দন দু'জনেই বলল, আচ্ছা।

এরপর একটা রিকশা ডেকে দেবযানীকে বিদায় দিল ওরা।

মালা বলল, চন্দনদা, এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে একবার থানায় যাওয়া।

থানায়! কেন?

কাল রাতের ঘটনাটা আমার মতে একবার পুলিশকে জানানো উচিত।

তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো। কিন্তু এ জন্য পুলিশ আবার আমাদের কিছু বলবে না তো? কারণ আমরাই তো প্রায় হাফ মার্ডার করে বসে আছি।

যা বলে বলবে। তবু চলো যাই।

ওরা আবার একটি রিকশা চেপে থানায় এসে হাজির হল। মালা এখানকার মেয়ে। কাজেই সব কিছুই ও চেনে। থানার দারোগাবাবুও চেনেন ওকে। তাই ওরা যেতেই হেসে বললেন, কী খবর মালাজি।

মালা বলল, আপনার কাছে আমরা অভিযোগ জানাতে এসেছি একটা ব্যাপারে!

কী ব্যাপার বলো?

আপনি তো জানেন আমাদের বাড়ির বিগ্রহ চুরির ব্যাপারটা। এবার আমার সাইকেল চুরি গেছে।

সে কী! কখন?

মালা তখন সব কথা সবিস্তারে খুলে বলল। এমনকী ওই লোকদুটোকে বেদম পেটানোর কথা পর্যন্তও।

দারোগাবাবু বললেন, ব্যস। ও আসামি পাকড় যায়ে গা। আমি সব হসপিটালে খবর নিচ্ছি আর ডাক্তারদেরকেও ফোনে জানাচ্ছি। তুম দোনোনে আচ্ছা কাম কিয়া। আভি ঘর চলা যাও। বাহার মাত ঘুমো। যাও। বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

ওরা কিন্তু দারোগাবাবুর কথামতো ঘরে ফিরল না। কেনই বা ফিরবে? সবে তো সকাল ন'টা। এখনই কী কেউ ঘরে ফেরে? ওরা দু'জনে পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এগিয়ে চলল।

মালা বলল, চন্দনদা, আজ দুপুরে কিন্তু তুমি ঘুমিয়ো না। আমি তোমাকে নিয়ে নন্দন পাহাড়ে যাব। তুমি খেয়েদেয়ে বাগানে চলে আসবে। আমিও তাই। তারপর সবাই শুয়ে পড়লেই পালাব আমরা। কেমন? কমলুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। তারপর ওর কাছ থেকে আরও কিছু বিশদ জেনে নিয়ে আজকালের ভেতরেই শুরু করব আমরা কাকাহিগড় অভিযান।

এমন সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল ভাস্করমামার সঙ্গে। ভাস্করমামা তখন একটা দোকানে বসে গোগ্রাসে কচুরি খেয়ে চলেছে। এদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেই তো কচুরি গলায় আটকাবার উপক্রম হল।

মালা বলল, ভয় নেই আমরা ভাগ বসাব না।

চন্দন বলল, কেন বসাব না? চলো তো, আমরাও খেতে বসি। তবে ভাস্করমামার পয়সায় খাব না। আমার কাছে গোটা কুড়ি টাকা আছে। তাতেই চালাব।

মালা চন্দনকে অনুসরণ করল।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর মালা আর চন্দন বাগানে এল। পূর্ব পরিকল্পনা মতো ওরা এসে প্রথমে একটি গাছতলায় বসল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বাগানের গাছের ডালে বেঁধে রাখা দোলনায় দোল খেল দু'জনে।

হেমন্তের দুপুর। মিষ্টি রোদের হাসি ছড়িয়ে দুপুর গড়াতে লাগল। একসময় মালা বলল, এবার নিশ্চয়ই সবাই বিশ্রাম করছে। চলো আমরা পালাই।

চন্দন বলল, চলো।

ওরা চুপিসারে বাগান থেকে বেরিয়েই আবার মন্দিরমুখো হল। খানিক যাবার

পরে একটা রিকশা ডেকে তাতেই চাপল দু'জনে। না হলে হাঁটাপথে নন্দন পাহাড় অনেক দূর।

দেওঘর শহর এখন পুজোর ছুটির যাত্রীতে ভরে আছে। চেঞ্জারদেরও আমদানি মন্দ হয়নি। তাই শহরের একপ্রান্তে নন্দন পাহাড়ের যাত্রী সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

ওরা বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হল নন্দন পাহাড়ের পাদদেশে। চন্দনের মন কিন্তু ভরল না পাহাড় দেখে। এটা কী! পাহাড়, না টিলা? মালভূমির মতো খানিকটা জায়গা ছাড়া কী এটা? ভাস্করমামা ঠিকই বলেছিল, এটা আসলে উঁচু একটা মাটি ও পাথরের ঢিপি ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক। তবু এমন সুন্দর পরিবেশ তো কলকাতায় নেই। তাই এই উন্মুক্ত পরিবেশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ওরা দু'জনে নানা কথায় কল কল করতে করতে এগিয়ে চলল।

একেবারে শেষধাপে পৌঁছে ওরা ছোট-ছোট কয়েকটি মন্দির দেখতে পেল।

মালা চেঁচিয়ে ডাকল, কমলু! এ কমলু বহিন?

একটি ঘরের ভেতর থেকে উত্তর এল, যাচ্ছি।

তারপরই মালার বয়সি ফ্রকপরা একটি গোলগাল চেহারার কিশোরী মেয়ে ছুটে এল সেখানে।

এই কমলু।

চন্দন অবাকচোখে দেখল কমলুকে।

মালা বলল, আমার চন্দনদা।

কমলু হেসে বলল, সমঝ গিয়া। তুমনে তো মুঝে সব কুছ বাতায়া। বলে চন্দনকে বলল, আপনি মালার দাদা, তা হলে আমারও দাদা।

এমন সময় খড়মপায়ে এক বৃদ্ধ মৈথিলী ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন সেখানে, এ লেড়কা কৌন হ্যায়রে কমলু?

মালার দাদা।

জিতে রহো বেটা। কাঁহা মকান তুমহারা?

চন্দন মালার দিকে তাকাল।

কমলু বলল, বাবা আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনার বাড়ি কোথায়?

চন্দন বৃদ্ধকে প্রণাম করে বলল, কলকাতায়।

বৃদ্ধ কমলুকে বলল, ইয়ে দোনোকো থোড়া পরসাদ তো দে দো কমলু বিটিয়া।

কমলু মালা ও চন্দনকে ডেকে নিয়ে গেল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে। তারপর একবার এদিকে সেদিক দেখে নিয়ে বলল, তুমহারা সাইকিল কাঁহা?

মালা বলল, কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে।

কমলু বলল, আমি জানি।

তুমি কী করে জানলে?

আমি সব কিছু জানি। তুমহারা সাইকিল কাল্লু নে চুরায়া।

মালা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, ও। এটা তা হলে ওই বদমাশটার কাজ?

হ্যাঁ। আজ সবেরে ও আয়া থা। ওই সাইকিল লে কর। তোমার সাইকিল তো আমি চিনি। যেই-না বলেছি এই সাইকিল তুম কাঁহাসে চুরায়া কাল্লু? ও হাস হাস কর ভাগ গিয়া।

চন্দন ও মালাকে কমলু তখন প্রসাদ খেতে দিয়েছে। খেতে খেতে চন্দন বলল, তুমি কাল্লুকে চেনো মালা?

হ্যাঁ চিনি। গুন্ডা-বদমাশ একটা।

কমলু বলল, এইখানকার মানুষ যত ভাল ও তত খারাপ। বুঝলেন তো চন্দনদাদা, এই মালাদের বাড়িতে যে বড় একটা ডাকাইতি হয়ে গেল তার মধ্যে ওই কাল্লু ভি ছিল। ওই দিন রাতে আমার বাবুজির কাছে ও এসেছিল চুরি করে আনা রাধাকিষণজির ওই মূর্তি রাখনে কে লিয়ে। লেকিন আমার বাবুজি বহুত গোঁস্‌সা কিয়া। উসকো মার মারকে হটা দিয়া।

চন্দন বলল, তোমার বাবুজি তো ভুল করলেন কমলু। মূর্তিটা রেখে তো মালাদের খবর দিতে পারতেন।

কমলু বলল, না। দলে তো কাল্লু একা ছিল না। বিরজু, শ্যাম এরাও সব ছিল। এরা তো ভাল লোক নয়। যদি ওরা বাবুজিকে মেরে ফেলত?

চন্দন বলল, আচ্ছা মালা, এই কাল্লু, বিরজু, শ্যাম এদের তুমি চেনো?

সবাইকে চিনি, বদের ধাড়ি এক একটা।

কমলুর কথামতো এরাই যদি তোমাদের মূর্তি চুরির সঙ্গে জড়িত থাকে তা হলে ওই যে লোকদুটো কাল রাতে আমাদের দু'জনকে চুরি করতে আসছিল ওরা কারা? তুমি ওদের চেনো?

না।

এরা কি কাকাহিগড়ের সাধুর লোক?

তাও জানি না।

চন্দন এবার কমলুকে বলল, কমলু বহিন, ওই কাকাহিগড়ের সাধুবাবা কেমন লোক?

কী করে জানব? তবে মূর্তিচুরির পর থেকেই তো ওই সাধুবাবাকে এখানে আসা যাওয়া করতে দেখেছি। আর কাল্লু, বিরজু, শ্যাম এরা হয়ে উঠেছে ওর আসল চ্যালা।

মালা বলল, ঠিক আছে। চন্দনদা, আর এখানে গল্প করে লাভ নেই। এখন দেখি সাইকেলটার কোনও গতি করতে পারি কী না। কাল্লুর ডেরায় একবার আমি হানা দেব।

কাল্লুর ডেরা কোথায়?

কমলু জানে।

কমলু বলল, ও তো হিঁয়াসে বহুত দূর পড় যায়ে গা। তুমকো হারলাঝুরি যানা পড়েগা।

হারলাঝুরি?

হাঁ। করমনাশা নদী কে কিনার মে।

তুমি আমাদের নিয়ে যাবে কমলু?

কমলু যেন শিউরে উঠল, নেহি। নেহি। ও সমঝ যায়ে গা। তুম দোনো যাও।

চন্দন বলল, তা হলেও তো সেই একই ব্যাপার হবে। আজ হঠাৎ আমাদের দু'জনকে হারলাঝুরিতে দেখলে ও তো বুঝেই নেবে কমলুর মুখে শুনেই আমরা এসেছি।

মালা বলল, তাও তো বটে। তবে এক কাজ করা যাক। যেন আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি এইভাবে দু'জনে একটা রিকশায় চেপে হারলাঝুরিতে গিয়ে পড়তে পারি।

সেই ভাল।

এই বলে ওরা দু'জনে নেমে এল পাহাড় থেকে। পাহাড়ের নীচে দু'-তিনটি রিকশা যাত্রী পাবার আশায় অপেক্ষা করছিল। ওরা গিয়ে তাদেরই একজনকে ঠিক করল হারলাঝুরি দেখিয়ে আনবার জন্য। কথা হল হারলাঝুরি দেখিয়ে রিকশা ওদের শিবগঙ্গার কাছে ছেড়ে দেবে।

ওরা সেই রিকশায় চেপে প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে হারলাঝুরিতে গিয়ে পৌঁছুল। ভারী চমৎকার জায়গা। কর্মনাশা নদীর ধারে এখানকার শিবমন্দিরের তুলনা নেই। কিন্তু মুশকিল হল এখানে কোথায় কাল্লুর বাড়ি? ওরা সন্ধানী দৃষ্টিতে এদিকসেদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।

ওই তো। ওই তো মালার সাইকেলটা। একটি গাছতলায় নিতান্ত খেলো জিনিসের মতো পড়ে আছে। কোনও লোক নেই, জন নেই। শুধু মাটিতে কাত হয়ে শোয়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু কেন? কাল্লু যখন চুরি করেছে তখন হয় এটাকে ব্যবহার করবে নয় তো বেচে দেবে। কিন্তু এ কী রহস্য?

যাই হোক। মালা আর চন্দন টেনে আনল সাইকেলটাকে। তারপর যেই না মালা তাইতে চেপে বসতে যাবে, অমনি আশপাশের পাথরের আড়াল থেকে তিন-চারজন ছিপছিপে চেহারার বড় বড় ছেলে বেরিয়ে এল। তাদের সকলকেই

মালা চিনল। তারা হল কাল্লু ও তার তিন সঙ্গী।

কাল্লু বলল, আরে মালা! আমি তোমারই জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম তুমি আজ আসবে। ওই জন্যেই তো সাইকেলটা নিয়ে ওই কমলু ছুঁড়িটাকে দেখিয়ে এনেছিলাম। যা ভেবেছি তাই। ও তোমাকে বলল, আর তুমি অমনি ছুটে এলে। কিন্তু তোমার সঙ্গে এই লালটু ছেলেটাকে কখনও ঘুরতে দেখিনি তো? ও চিড়িয়াটি কে?

মালা রুখে দাঁড়িয়ে বলল, মুখ সামলে কথা বলবি কাল্লু। নেহি তো চপ্পল মারকে মুখ তোড় দুঙ্গা। এ মেরা দাদা। বলেই সাইকেলটা ঠেলে দিল কাল্লুর দিকে।

আচমকা সাইকেলের ধাক্কায় কাল্লু ছিটকে পড়ল।

ওর সঙ্গে আরও যে তিন সঙ্গী ছিল তারা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল মালার ওপর। তারপর শুরু হল ধস্তাধস্তি। চন্দনও মালাকে মুক্ত করবার জন্য লাফিয়ে পড়ল তাদের ঘাড়ে। তারপর আঁচড়ে কামড়ে কিল-চড়-ঘুসি মেরে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল সকলকে। ইতিমধ্যে কাল্লুও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা শক্ত মোটা লাঠি। সেই লাঠির বাড়ি চন্দনের মাথায় এক ঘা দিতেই মাথাটা কী রকম যেন ঘুরে উঠল চন্দনের। ও চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে লাগল। ও বেশ বুঝতে পারল কারা যেন পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল নদীর খাদে। উঃ। সে কী অসহ্য যন্ত্রণা। ধীরেধীরে চোখেমুখে জাল পড়ে এল। সব কিছু কেমন যেন অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনে।

এদিকে মালাও শরীরের যথাশক্তি প্রয়োগ করে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু চারজনের সঙ্গে একা ও পেরে উঠবে কেন? তার ওপর চোখের সামনে চন্দনের ওই মর্মান্তিক পরিণতি ওকে দারুণ নার্ভাস করে দিল। মনে মনে ভয়ও পেল যথেষ্ট। যদি কোনওরকমে নিজেকে অক্ষত শরীরে বাঁচিয়ে নিয়ে ও ফিরতে পারে তা হলেই বা হবেটা কী? চন্দন কী বাঁচবে? তা ছাড়া ওর মা-বাবার কাছে গিয়ে কোন মুখে ও এই নিদারুণ সংবাদটা পৌঁছে দেবে? ওর চোখফেটে যেন জল এল।

ততক্ষণে ওর অসর্তকতার সুযোগ নিয়ে কাল্লু আর ওর তিন সঙ্গী ওকে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এই সব কাজে ওরা দারুণ অভ্যস্ত। তাই এমন কায়দা করে মালাকে বাঁধল ওরা, যে একটু শব্দ পর্যন্ত বের করতে পারল না।

এই অঞ্চলটা অত্যন্ত নির্জন। তাই কোনও লোকজনই এগিয়ে এল না ওদের সাহায্য করতে। অসহায় চন্দন আহত ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রইল কর্মনাশার খাদে। কে বলতে পারে না যে, গভীর রাতে ত্রিকূটের কোনও বাঘ জল খেতে এসে ওর নরম নধর শরীরটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে যাবে না? মালাও অসহায়

ভাবে ভগবানকে ডাকতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, হে ভগবান। আর যেন ওকে ঘরে ফিরতে না হয়, কারণ চন্দনের এই অবস্থার জন্য ও-ই তো দায়ী। ওর এই রকম ক্ষতি করে চন্দনের মা-বাবার সামনে ও কী করে দাঁড়াবে?

কাল্লুর দল এবার বন্দিনী মালাকে কাঁধে নিয়ে নদী পার হল। তারপর ঘন বনের ভেতর দিয়ে নিয়ে চলল চুপিসাড়ে। ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে। আঁধারের ধূসর যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে আসছে প্রকৃতির বুকে। ওরা মালার হাত-পা-মুখ সবই বেঁধেছে। বাঁধেনি শুধু চোখদুটো। মালা এখন স্থির হয়ে আছে। কেন না ও বুঝেছে এখন আর অস্থির হয়ে কোনও উপায় নেই। ধীরে ধীরে দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের কাছে ওকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

যাই হোক। ওরা এক সময় একটু উচ্চস্থানে উঠতে লাগল। মালা বুঝল এ জায়গাটা পাহাড়ি এলাকা। চারদিকে পাহাড়। এই পাহাড়ের একটু উচ্চস্থানে একটি পুরনো মন্দিরের ভেতর ওরা আটকে রাখল মালাকে।

মন্দিরের জানালাদরজা সবই পুরনো। কিন্তু মজবুত। সেই ঘরে ওকে রেখে কাল্লু বলল, আজকের মতো থাকো তুমি এই ঘরে। ওই কমলু ছুঁড়ির সঙ্গে একবার মুলাকাত করে আসি। ওকে আমি এমন শিক্ষা দেব যে বুঝবে ও। তারপর ওই ছেলেটার মতো তোমারও অবস্থা আমি খারাপ করে দেব।

কাল্লু চলে গেল ওর তিন সঙ্গীকে নিয়ে।

হাত-পা-মুখ বাঁধা মালা একাকী সেই অন্ধকার ঘরে পড়ে রইল চুপ চাপ। জলপিপাসায় জিভ যেন শুকিয়ে আসতে লাগল। তার ওপর মশার কামড়। কী যে আছে কপালে তা কে জানে?

ওরা চলে যাবার অনেক পরে মালা অনুভব করল কারা যেন আশপাশে ঘোরাফেরা করছে! তবে কী ওরা ফিরে এসেছে এতক্ষণে? কিন্তু না। এরই মধ্যে ওদের ফিরে আসা তো সম্ভব নয়! তা হলে!

একটু পরেই যমদূতের মতো চেহারার দু'জন লোক আলোহাতে ওই ঘরে ঢুকল। তারা ওইভাবে মালাকে পড়ে থাকতে দেখেই চমকে উঠল, এই কৌন হো তুম?

মালার তো মুখবাঁধা।

একজন এসে ওকে বাঁধন মুক্ত করল।

মালা বলল, থোড়া পানি পিয়েগি।

পানি পিয়োগি? হিঁয়া তো পানি উনি কুছ নেহি হ্যায়। ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা? মকান কাঁহা।

আমার নাম মালা। মকান দেওঘর।

হিঁয়া কৌন লে আয়া?

দো-তিন বদমাশ লে আয়া হামকো।

সমঝ গিয়া।

মালা বলল, শুনুন, আপনারা কে তা জানি না। দয়া করে আমাকে বাঁচান। আমার এক দাদাকে ওরা মেরে কর্মনাশার খালে ফেলে দিয়ে এসেছে। তাকে উদ্ধার করুন।

ওদের একজন বলল, যারা তোমাকে নিয়ে এসেছে তাদের কাউকে তুমি পয়ছানবে?

হ্যাঁ। হারলাঝুরির কাল্লু আর ওর দোস্তরা নিয়ে এসেছে আমাকে।

আচ্ছা, কাল্লুনে লে আয়া তুমকো? তো ইয়ে বাত পহলে বতায়া নেহি কিঁউ? ঠিক হ্যায়। তুম ভাগো। হাম সমঝেগা উসকা সাথ।

আর একজন বলল, তুমকো হিঁয়া রাখকে ও কাঁহা গয়া?

মালা বলল, নন্দন পাহাড়ে যে পূজারি ব্রাহ্মণ আছেন, ওনার লেড়কি কমলুকে ও জোর করে নিয়ে আসতে গেছে। ও হয়তো কমলুকে মেরেই ফেলবে। নয়তো আমাদের দু'জনকেই পাচার করে দেবে অন্য কোথাও।

লোকদুটো হো হো করে হেসে উঠল। বলল, তো তুম এক কাম করো। আভি মাত যাও হিঁয়াসে। চুপ চাপ বৈঠা রহো। যব ও আদমি আয়েগা তব মার মারকে হাড্ডি তোড় দুঙ্গা উসকো। আউর কমলুকো ভাগাকে লে আয়াগা তো উসকো লে কর তুম দোনোনে এক সাথ চলি যাওগি।

মালা বলল, তার আগে একটু জল খেতে পারলে হত।

লোক দু'জনের একজন বলল, ঠিক আছে। বইঠো তুম। ডরো মাত। আমি জল আনছি। বলে চলে গেল।

আর একজন যে বসেছিল, মালা তাকে বলল, আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না-এসে পড়লে আমার খুব বিপদ হয়ে যেত।

লোকটি বলল, খোকি, আমরা ভাল লোক না আছি। আমরা ডাকাইতি করে খাই। ও কাল্লু বদমাশ ভি হামারা সাথ থা লেকিন—

এখন আর নেই। এই তো?

হাঁ। এক রাত হামলোক বহুত বড়িয়া ডাকাইতি কিয়া। কমসে কম পাঁচ সাত লাখ রুপিয়াকা এক মূর্তি চুরায়া থা। তো ও মুরত কাকাহিগড় ভেজনা থা উসকো। লেকিন ও কাঁহা-হাপিস কর দিয়া কৌন জানে। ওইদিন সে ও স্রেফ ভাগতা।

মালা অবাক হয়ে বলল, বলেন কী! মূর্তিটা একেবারে লোপাট করে দিল?

হাঁ। আজ আমরা একটা খারাপ কাম করবার জন্যে ইখানে এসে পড়েছিলাম। তা ভালই হল, কাল্লুকা সাথ মোকাবিলা হো যায়েগা।

মালা বলল, আচ্ছা কাকাহিগড়ে কী আছে?

ও সাধুবাবা আছে না? ওই সাধুবাবা ফরেন কানট্রিতে মূর্তি সাপ্লাই করে ফরেন মানি কামাই করেন। হামারা হিঁয়া পর যো চিজ কা দো-দশ লাখ রুপিয়া দাম হোগা, ওই চিজ ফরেন ভেজলে সাধুবাবা পঁচাশ লাখ কামিয়ে নেবেন।

মালা বলল, তা ওই মূর্তিটা যে কাল্লু আপনাদের ফাঁকি দিয়ে কাকাহিগড়ের সাধুকে দেননি, তার কী প্রমাণ আছে?

কাকাহিগড়ের সাধুর হাতে ওই মূর্তিটা গেলে ও তো আমাদের দু'জনের হাতেই পাচার হবে। ওই সাধুবাবা ভি তাজ্জব বনে গেছেন। কাল্লু বলেছে মূর্তিটা নন্দন পাহাড়েই হাপিস হয়ে গেছে।

কিন্তু কী করে? কমলুর বাবা অত্যন্ত ভালমানুষ।

জানি। ঝাজি আচ্ছা আদমি। উয়ো অ্যায়শা কাম নেহি কিয়েগা। মালুম হোতা হ্যায় কাল্লু অকেলে কাম করনে মাংতা।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে আপনাদের কোনও পালটি দল তৈরি হয়েছে?

উঁহু। ও নেহি হো সক্‌তা।

তা হলে! কাল্লুকে ঘা কতক দিয়ে কথাটা আদায় করতে পারছেন না আপনারা?

আরে! ও সাধুবাবা বহুত মার মারা উসকো।

ওকে জানে মারছেন না কেন আপনারা?

জানে মারলে ফায়দা কী? আমরা চারদিকে নজর রাখছি। ও মাল এইখান থেকে বাইরে যাবে তো হাতে হাতে ধরব। উসকে বাদ মজা দেখায়গা বদমাশ কো।

মালা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনারা কোথায় থাকেন?

আমরা জঙ্গলে থাকি। পাহাড়ে থাকি। তা কাল্লু তোমাকে কীভাবে এখানে নিয়ে এল? আনলই বা কেন?

আমি কমলুর দোস্ত ছিলাম। আমার একটা সাইকেল ওই কাল্লু শয়তানটা চুরি করে এনেছিল। সেই খবর পেয়ে ওর ডেরাতে আমি আমার দাদা যাই। সেই সময় কাল্লু আমার দাদাকে মেরে নদীতে ফেলে দেয়। আর আমাকে হাত-পা-মুখ বেঁধে এখানে নিয়ে আসে।

আরে বাঃ। কাল্লুনে তুমহারা সাইকিল চুরায়া? অ্যায়শা ছোট কাম কব সে শুরু কিয়া ও? হামলোক অ্যায়শা কাম তো কভি নেহি কিয়েগা। ঘড়ি, আংটি, রেডিয়ো; সাইকিল এ সব কভু নেহি চুরায়াগা। হামারা বিজনেস লাখ লাখ রুপিয়া কা।

এই সমস্ত আলোচনার পর মালার মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। যা কিছু সূত্র ও অনুসন্ধান করেছে সবই যেন কীরকম পরস্পরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল। যেমন, কমলুর মুখে ও শুনেছে ওদের মূর্তি চুরি যাওয়ার পর কাকাহিগড়ের সাধুবাবা নন্দন পাহাড়ে বেশি করে যাতায়াত করছেন। কিন্তু কেন? ও আরও শুনেছে কাল্লু এবং তার দলবল সাধুবাবার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। যদি তাই হয় তা হলে কাল্লু মূর্তিটাকে হাপিস করার পরও সাধুবাবার প্রিয় পাত্র কী ভাবে হতে পারে? এবার প্রশ্ন, এত জায়গা থাকতে কাল্লু মূর্তিটা ওই নন্দন পাহাড়েই বা নিয়ে গেল কেন? মূর্তিটা তো সরাসরি কাকাহিগড়েই নিয়ে যেতে পারত। এর পরের প্রশ্ন ওইটুকু সময়ের মধ্যে মূর্তিটাকে পাহাড় থেকে হাপিস করল কে? এবার যেটা মনে আসে সেটা হল ওই অসময়ে মালা ও চন্দন হারলাঝুরিতে যাওয়া মাত্রই যেখানে কাল্লুর দেখা পেয়ে গেল সেখানে এই লোকদুটো কাল্লুকে খুঁজে পায় না কেন? সর্বোপরি লোকদুটো মালার কাছেই বা গড় গড় করে তাদের প্রকৃত পরিচয় দিতে গেল কেন? এবং গতরাতে ওদের যে লোকদুটো খুন করতে আসছিল তারাই বা কারা, কীসের জন্যই বা ওই বাগানে ঘোরাফেরা করে? মালার চিন্তার গ্রন্থিগুলো সব যেন জট পাকিয়ে যেতে লাগল। ওর বার বারই মনে হতে লাগল এই লোকদুটো ওকে আগাগোড়া সব বানিয়ে বলছে না তো?

ইতিমধ্যে অপর লোকটি একটি বোতলে করে জল নিয়ে এল।

তৃষ্ণার্ত মালা সেই জল ঢক ঢক করে খেয়ে নিল এক নিশ্বাসে। তারপর বলল, আমার দাদাকে ওরা মেরে নদীর খাদে ফেলে দিয়েছে। আপনারা একটু আসবেন আমার সঙ্গে? ধরাধরি করে তুলে আনতাম দাদাকে।

লোক দু'জন একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, জরুর যায়েঙ্গে। লেকিন ইস মওকে মে কাল্লু আ যায়েগা তো?

এত তাড়াতাড়ি ও কী করে আসবে? নন্দন পাহাড় কী এখানে?

হুঁ। ঠিক হ্যায় চলো। বলে লোক দু'জন মালাকে নিয়ে সেই উচ্চস্থান থেকে ধীরে ধীরে জঙ্গলের পথ ধরে কর্মনাশা নদীর দিকে এগোতে লাগল। সামনেই কোজাগরি পূর্ণিমা বলে নির্মল আকাশে জ্যোৎস্নার প্রভাব খুব। কাজেই চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল প্রকৃতির বুকে কোনও অন্ধকার নেই। তাই পথ চলতেও অসুবিধা নেই।

ওরা ধীরে ধীরে কর্মনাশার খাদে এসে নামল। কিন্তু কই? কোথায় কে? এক জায়গায় একটু রক্তের দাগ রয়েছে। এবং এক পাটি চটি জুতো পড়ে আছে। এ ছাড়া আর কোনও অস্তিত্বই কোথাও নেই। রক্তের দাগটা নদীর জলের কাছ পর্যন্ত এসেছে। অর্থাৎ এদিক থেকেই কোনও বন্য জন্তু এসে নিয়ে গেছে চন্দনকে। চলে

গেছে অরণ্যের বক্ষভেদ করে ভয়ংকর ত্রিকূটের দিকে। মালা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে লুটিয়ে পড়ল পাথরের বুকে।

ওর কান্না দেখে সঙ্গের লোক দু'জনেই কী রকম হয়ে গেল যেন। ওদের মনটা খুব নরম হয়ে গেল। বলল, কাঁদছ কেন খুকি? মাত রোনা। চলো আমরা তোমাকে দেওঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। যদিও অনেক দূর তবু ভয় নেই। এসো।

মালা কাঁদতে কাঁদতে বলল, না না না, আমি এই মুখ বাড়িতে গিয়ে কাউকে দেখাতে পারব না। তোমরা আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো। না হলে মেরে ফেলো। ওর মা-বাবার ওই একটিই মাত্র ছেলে। ওকে না নিয়ে আমি কিছুতেই বাড়ি ফিরতে পারব না।

লোক দু'জন মালার হাত ধরে তুলে দাঁড় করাল। তারপর বলল, ঠিক আছে। আও মেরা সাথ। বলে পাথরের খাঁজ ধরে ওপরে উঠে অন্ধকারে বেশ খানিকটা যাবার পর ছোট্ট একটি গ্রামে এসে পৌঁছুল ওরা।

ওদের একজন একটি বাড়ি থেকে একটি মোটর বাইক নিয়ে এসে মালাকে তাইতে বসাল। তারপর বাইকটাকে ঝড়ের গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলল দূরের পাহাড়ের দিকে।

মালা বলল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

কাকাহিগড়।

কাকাহিগড়!

হ্যাঁ। হামারা সাধুবাবাকা পাস।

ও আদমি তো আচ্ছা নেহি। মুঝে ডর লাগতা।

তা হলে চলো। তোমার ঘরেই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি?

মালা বলল, না।

তব চুপ চাপ রহো।

একটা বুলেট যেন রাতের বিভীষিকার মতো ভটভট শব্দে ছুটে চলল। এত জোরে যে তা বলবার নয়। এক এক সময় মালার মনে হল ওটা এখুনি বুঝি দুর্ঘটনায় পতিত হবে। কিন্তু না! এই সময় সাহসী শক্তিমান লোকটা নির্বিঘ্নেই ওকে নিয়ে পথ চলতে লাগল। এক জায়গায় এসে বাইক থামাল।

এখানে চারদিকে শুধু পাহাড়-পাহাড় আর পাহাড়। আর কী দারুণ নির্জনতা। একসময় একটি ছোট পাহাড়ের একেবারে উচ্চস্থানে একটি গুহার কাছে এসে লোকটি বলল, শোনো, আজ রাতটার মতো তুমি এখানে থাকো, কেমন? তারপর কাল সকালে এসে তোমার ব্যবস্থা করছি।

মালা বলল, সাধুবাবা কোথায়?

উনি আছেন। এখন দেখছি তোমাকে কিছু খাবার দিতে পারি কি না। ভুগ লাগ গিয়া না? বলে সে চলে গেল।

পাহাড়ের এই ছোট্ট গুহায় অন্ধকারে একাকী মালার খুব ভয় করতে লাগল এবার। এই কি কাকাহিগড়? কিন্তু এখানে আশ্রয় কই? সাধুবাবা থাকেন কোথায়? এখানে কোনও আলোও তো নেই। এই গুহায় সাপ থাকতে পারে। বাঘভাল্লুক আসতে পারে।

একটু পরেই অবশ্য আলো হাতে একজন লোক এল। লোকটিকে মালা চিনতে পারল না। তার হাতে একটি খাবারের থালা। তাইতে দু'খানা রুটি আর সামান্য ডাল ছিল। লোকটি বলল, খা লেও।

মালা বলল, না। আমার খিদে নেই।

আরে মা ভবানী কী পরসাদ। জলদি খা-লো।

মালা আর দ্বিরুক্তি না করে খেয়ে নিল। তারপর বলল, জল।

লোকটি বলল, আতে হেঁ। বলে চলে গিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই এক লোটা জল নিয়ে এল।

মালা ঢকঢক করে সেটা খেয়ে নিল। তারপর লোকটা চলে যেতেই গুহা থেকে নামা শুরু করল সে। কিন্তু নীচে নেমেই অবাক। আরে এ তো ওর অতি পরিচিত জায়গা। এই কাকাহিগড়! এখানে তো ও বহুবার এসেছে। কিন্তু না। মালা বুঝতে পারল লোক দু'জন ওকে বোকা বানিয়েছে। আসলে ওরা চুরিডাকাতি যাই করুক। মালাকে অপহরণ করার ঝুঁকিটা নিতে চায়নি। তাই কাকাহিগড়ে না-নিয়ে গিয়ে ওকে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে তপোবন পাহাড়ের এক গুহায়।

মালা তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ঘরে ফেরাই ঠিক বলে মনে করল। তাই প্রাণপণে দৌড় লাগাল সে। দেওঘর অনেক দূর। তবু ছুটল।

হঠাৎ ওর মুখের ওপর একটা জিপের জোরালো আলো এসে পড়ল। মালা চোখ আড়াল করে দাঁড়াতেই কে যেন খপ করে ধরে ফেলল ওকে।

তারপর বলে উঠল, এই তো পেয়েছি। একা একা এখানে কী করছিলে তুমি?

মালা বলল, কে আপনি?

তার আগে বলো সেই ছোকরা কোথায়?

মালা কেঁদে বলল, জানি না।

জানবার দরকার নেই। একটাকে যখন পেয়েছি, তখন আর একটাকেও খুঁজে বার করব। উঃ। রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিলে তোমরা? কোনও বদলোকের পাল্লায় পড়েছিলে নিশ্চয়ই?

মালা অতিকষ্টে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

ওঠো গাড়িতে ওঠো।

পুলিশের জিপ মালাকে নিয়ে দেওঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

পুলিশের গাড়ি এসে যখন মালাকে ওর বাসায় পৌঁছে দিল তখন মধ্যরাত। বাড়িতে এতক্ষণ কান্নার রোল উঠেছিল। এবার মালাকে ফিরে আসতে দেখে মুখে হাসি ফুটল সকলের। কিন্তু চন্দন? চন্দন কই? সে নেই কেন?

দিদা ছুটে এসে মালাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমি তোকে কালই রেখে আসব তোর বাবার কাছে।

দেবযানী ছুটে এসে বললেন, আমার চন্দন! তাকে কোথায় রেখে এলি মা? বল সে কোথায়?

মালা ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল।

কী হল? কিছু বল? চুপ করে আছিস কেন?

সুনন্দবাবু নির্বাক ভাবে বললেন, তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে আমাকে সব কিছু খুলে বলো তো মা! তোমরা কোথায় গিয়েছিলে, কী করছিলে বা কী হয়েছিল?

মালা সব বলল।

শোনা মাত্রই দেবযানী সংজ্ঞাহীন হলেন।

রূপামাসী বললেন, সন্ধে হয়ে গেল তবু তোদের পাত্তা নেই দেখে জামাইবাবু আর তোর কাকু থানায় গিয়েছিলেন। গিয়েই শুনলেন তোরা নাকি কাল রাতের ঘটনা থানাতে জানিয়ে এসেছিলি। তোদের কথার ভিত্তিতে পুলিশ ওই লোকদুটোকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু সেই যে ভরদুপুরে ছেলেটাকে নিয়ে উধাও হলি তুই। সেটা কি না-করলেই চলছিল না? এখন কোথায় খুঁজব ছেলেটাকে?

নিরুপমবাবু বললেন, সে আর নেই। মালার কথা যদি সঠিক হয় তা হলে বাঘের পেটেই গেছে সে।

এমন সময় ভাস্করমামা এসে হাজির হল। বলল, নাঃ। অনেক খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না ওদের। তবে এখানকার পুলিশ সম্বন্ধে আমার যা ধারণা ছিল তা পালটে গেল। তারপর হঠাৎ মালাকে দেখে বলল, আরে মালা! কখন ফিরলে তোমরা?

দিদা বললেন, তোমরা নয়, ও কালামুখী একা ফিরেছে। সে ছেলে ফেরেনি। এই পোড়া মুখ নিয়ে ও যে কেন ফিরল তা বুঝতে পারছি না। অজানা অচেনা জায়গায় শান্তশিষ্ট ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে বেঘোরে মারলে গো মেয়েটা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ভাস্করমামা বলল, চন্দন ফেরেনি?

না।

মালা একবার ভাস্করমামার মুখের দিকে তাকাল। তারপর কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

নিরুপমবাবু দরজা খুলে দিতে দু'-তিনজন কনস্টেবলসহ পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকলেন। তারপর সরাসরি মালার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মালা ঠিক করে বলো তো, তোমরা হারলাঝুরিতে কীজন্য গিয়েছিলে?

মালা বলল, আমার সাইকেল উদ্ধার করতে।

বেশ। তুমি কী করে জানলে যে তোমার সাইকেল ওইখানে আছে?

আমার এক বান্ধবী কমলু ওটা দেখেছে! কাল্লু নামে এক বদমাইশ ওটা চুরি করে। ওর বাড়ি হারলাঝুরিতে।

কমলু কোথায় থাকে।

নন্দন পাহাড়ে।

বুঝেছি। গুণধর ঝাজির মেয়ে, তাই না?

হ্যাঁ। কাল্লু আমার দাদাকে নদীর খাদে ফেলে দিয়ে আমাকে জঙ্গলের পুরনো মন্দিরে আটকে রাখে। পরে ও কমলুকে ধরে আনতে যায়। ওকে বোধহয় ওই মন্দিরেই নিয়ে যাবে ওরা।

সে কী! কই এসব কথা তো তুমি গাড়িতে বললে না আমাদের? চলো চলো শিগগির চলো। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দিদা বললেন, ওকেও আবার যেতে হবে বাবা?

হ্যাঁ মা, ও সঙ্গে থাকলে আমাদের সুবিধে হবে। কারণ ক্রিমিন্যাল ধরার চেয়েও এখন ওই ছেলেটার ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত হতে হবে। ব্যাপারটা তো রহস্যজনক। কারণ এখনও পর্যন্ত এখানে নরখাদক জন্তুজানোয়ারের অস্তিত্বের কোনও খবর আমরা পাইনি। কাজেই ছেলেটা যে বাঘের পেটে গেছে, এ আমরা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমরা কথা দিচ্ছি ছেলেটাকে যে ভাবেই হোক ফিরিয়ে আনবই। আর ওই লোকদুটোকে গ্রেফতারের পর আপনাদের মূর্তি চুরির রহস্যও অনেকটা ফাঁস হয়ে এসেছে।

রূপামাসি বলল, আর আমাদের মূর্তির দরকার নেই। দয়া করে ছেলেটাকে উদ্ধার করে ওর মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিন।

পুলিশের গাড়ি মালাকে নিয়ে ঝড়ের বেগে নন্দন পাহাড়ের দিকে ছুটল। যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাবার পরই জিপ থামিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল ওরা। কিন্তু ওপরে উঠেই যে দৃশ্য ওরা দেখল তা রীতিমতো রোমাঞ্চকর।

মন্দিরপ্রাঙ্গনে ঝাজির রক্তাক্ত মৃতদেহটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে

রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধের পর মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন প্রবীণ পূজারি।

মালা জোরে ডাক দিল, কমলু! এ কমলু! কমলু বহিন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। সাড়া দেবে কে?

পুলিশ অফিসার বললেন, ওরা তা হলে ঝাজিকে মেরেই কমলুকে নিয়ে গেছে। মেয়েটার এখন কী হাল তা কে জানে? এদের বিরাট একটা চক্র তো।

মালা বলল, শুনুন, আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, ওই কাকাহিগড়ের সাধুও এই পাপচক্রের সঙ্গে জড়িত।

কাকাহিগড়ের সাধুবাবা!

হ্যাঁ।

তুমে ক্যাওসে মালুম হুয়া?

আমি জানি। জানতে পেরেছি।

এমন সময় আরও এক ঝাঁক পুলিশ এবং একজন পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলেন সেখানে। বললেন, কিঁউ স্যার কুছ মিলা?

প্রথম অফিসার ইঙ্গিতে পড়ে থাকা ঝাজির মৃতদেহটা দেখিয়ে দিলেন।

আরে! মার্ডার! একদম মর চুকা?

ওদিককার খবর কী?

আপনার কথামতো ওই লোকদুটোকে বেদম পিটিয়েছি। ওরা সব কথা কবুল করেছে।

কী বলছে ওরা?

এর উত্তরে দ্বিতীয় অফিসার যা বললেন তা হল এই, এখানে এদের তিনটি দল। এর মধ্যে কাকাহিগড়ের সাধুবাবাও আছেন। আসলে নিরুপমবাবুদের ওই রাধাকৃষ্ণমূর্তি এই তিন দলের কারও কাছেই নেই। এই নিয়েই এদের মধ্যে বিরোধ। তিন দলের মধ্যে কাল্লু এবং ওর তিন সঙ্গীকে নিয়ে একটি দল। একটি দলে আছে হীরুক ও ভীরুক নামে দুই শয়তান। আর একটি দল হল শোভরাজ সিং আর জগমোহনের। অর্থাৎ যে লোকদুটোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওরা বলছে নিরুপমবাবুদের ওই অগাধ সম্পত্তি এবং বহুমূল্য ওই রাধাকৃষ্ণমূর্তির প্রতি লোভ ওদের অনেকদিনই ছিল। তাই ওরা সকলেই মূর্তিটি অপহরণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল অনেকদিন থেকে। কিন্তু অপহরণ করলেই তো হল না। এ মূর্তি বেচবে কার কাছে ? তা ছাড়া উপযুক্ত দাম না পেলে অযথা চুরিডাকাতি করেও তো লাভ নেই। এই সময় মুঙ্গেরের ভগবানদাস জেঠিয়া এগিয়ে এলেন। ইনি একজন ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। এরই মাধ্যমে কাজ করবার কথা ওরা স্থির করল। ভগবানদাসের নামে ওয়ারেন্ট আছে। লোকটা তাই সাধুর ছদ্মবেশ নিয়ে কাকাহিগড়ে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। অনেক উঁচু মহলের লোকের সঙ্গে তাঁর দহরম

মহরম। তাই মুঙ্গের-পুলিশ সব জেনেশুনেই আর ওকে ঘাঁটায়নি। বিশেষ করে তিনি যখন এলাকার বাইরের চলে গেছেন তখন আর তাঁকে নিয়ে মাথাব্যাথা কেন?

কাকাহিগড়ের এই সাধুর প্রতি এখানকার পুলিশেরও যে সন্দেহ ছিল না তা নয়। এই মূর্তিটাকে চারদিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও ওই সাধুর আস্তানার দিকে দৃষ্টি পুলিশ ঠিক রেখেছিল।

কিন্তু মুশকিল যেটা হল সেটা হচ্ছে, মূর্তিটা তা হলে গেল কোথায়? কাকাহিগড়ের ধারেকাছেও মূর্তির অস্তিত্ব পুলিশ পায়নি।

শোভরাজ সিং ও জগমোহনের মুখ থেকে পুলিশ যে তথ্য আবিষ্কার করেছে তা হল, ওই দিনের ডাকাতির পর ওই মূর্তিটা সাধুবাবা নিজের কাছে রাখতে চাননি। কারণ উনি জানতেন মূর্তি নিজের কাছে রাখা মানেই পুলিশের খপ্পরে পড়া। তাই কাল্লুকে দিয়ে নন্দন পাহাড়ে ঝাজির কাছে পাঠিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। ঝাজি মূর্তিটা ঠাকুরের আলমারিতে লুকিয়ে রাখলে কেউই টের পেত না। এবং পরে সময়মতো পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে মূর্তিটা ওখান থেকে সরিয়ে দুমকায় নিয়ে গিয়ে রাখা হত। তারপর চলে যেত যথাস্থানে। কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঝাজি কোনও প্রলোভনেই রাজি হননি ও কাজ করতে। এই নিয়ে কাল্লুর সঙ্গে সে-রাতে দারুণ বচসা হয়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য সেই বচসার ফাঁকে মূর্তিটা যেন কর্পূরের মতো উধাও হয়ে যায় সেখানে থেকে। তা হলে কী তৃতীয় কোনও ব্যক্তি সেখানে ছিল? যদি থাকে, সে কে?

এরপর দলের লোকেদের মধ্যে শুরু হয় পরস্পরের পরস্পরকে সন্দেহ করার পালা। কেউ কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারে না। এবং সবার রাগ গিয়ে পড়ে ওই কাল্লুরই ওপর। কেন না মূর্তিটা তো ওর হাত দিয়েই গিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে চারুভিলার বাগানবাড়িটাও হয়ে ওঠে ওদের একটা ঘাঁটি। কারণ ওদের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল মূর্তিটা কাল্লু আদৌ বেশি দূরে নিয়ে যায়নি। হয়তো এই চারুভিলার বাগানেই কোনও গোপনস্থানে লুকিয়ে রেখেছে। নন্দন পাহাড়ে মূর্তি নিয়ে যাওয়ার পর ঝাজি ওই মূর্তি রাখতে রাজি না হওয়ায় সে-রাতে ওরা ওই বাগানেই কোথাও এসে মূর্তিটা লুকিয়ে রাখে অথবা হারলাঝুরিতে কাল্লুর নিজের এলাকায় বাড়ির কাছাকাছি রাখে কোথাও। তবে ওই মূর্তি হারলাঝুলিতে নিয়ে যাওয়ার চেয়েও এই বাগানে নিয়ে আসার সুবিধেটাই বেশি।

শোভরাজ সিং এও বলেছে ওইদিন রাতে মালা ও চন্দনকে বাগানে ঘুরতে দেখে ও অনুমান করেছে মূর্তি বাগানেই আছে। এবং ওই মেয়েটি এবং ছেলেটি নিশ্চয়ই সে খবর জানে। তাই ওরা ওদের তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরা যে এমন মারাত্মক, তা ওরা জানত না।

যাই হোক, এখানকার সব কিছু তদারকির পর দু'জন কনস্টেবলকে ঝাজির

মৃতদেহ পাহারা দিতে বলে পুলিশ মালাকে নিয়ে চলল হারলাঝুরির দিকে। যেখানে কর্মনাশা নদীর খাদে চন্দনকে ওরা ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়েই আর এক বিস্ময়। ওরা দেখল নদীর বালিতে পর পর তিনটি মৃতদেহ লাইন দিয়ে সাজানো আছে। তাদের সর্বাঙ্গে নিদারুণ ক্ষতচিহ্ন। এই মৃতদেহগুলি আর কারও নয়। কাল্লুর তিনসঙ্গীর। কাল্লু হয়তো ওই তিনসঙ্গীকে মেরে কামলুকে নিয়ে পালিয়েছে। যাই হোক, কাল্লুকে এখন ধরতেই হবে। না হলে কমলু উদ্ধার হবে না।

মালা সকলকে নিয়ে এরপর জঙ্গল পার হয়ে সেই পাহাড়ে পুরনো মন্দিরে গেল। কিন্তু কোথায় কে? না কমলু, না কাল্লু, কারও সন্ধান পাওয়া গেল না সেখানে।

এইবার চন্দনের কথায় আসা যাক।

জীবনে যে ছেলে কখনও বাবা-মা'র কাছে সামান্য একটা চড়ও খায়নি তার মাথায় লাঠির ঘা পড়লে সে সহ্য করতে পারবে কেন? তাই ওই দারুণ আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল সে। মাথার একটা পাশ সামান্য কেটে অথবা ফেটে রক্তও ঝরছিল চুঁয়ে চুঁয়ে। সেই সঙ্গে রক্ত ঝরছিল নাক দিয়ে। এর ওপর ওকে নদীর বালিতে খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়ায় গা-গতরও যথেষ্ট ব্যথা হয়ে ওঠে। ওর যখন ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল তখন প্রথমটা খুব হকচকিয়ে গেল ও। তারপর নিজেকে বালির মধ্যে আবিষ্কার করে শঙ্কিতও হল। এরপর সামনেই জল দেখে বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে। তারপর জলে মুখ দিয়ে একটু একটু করে জল খেল। নদী বা ঝরনার জল কখনও এভাবে খেতে নেই জেনেও খেল। না-খেয়ে উপায় নেই। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল খেয়ে মুখহাত ধুয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসে হাঁফ ছাড়ল ও। সর্বাঙ্গে ব্যথা। কেন না পাহাড়িয়া নদী তো, চারদিকে বালির সঙ্গে পাথর নুড়ির ছড়াছড়ি। তাই ছুড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য সর্বত্র আঘাত।

প্রথমেই ওর মালার কথা মনে পড়ল। কোথায় গেল মালা। দুর্বৃত্তরা কি মালাকে নিয়ে চলে গেছে? না মালা পালাতে পেরেছে আত্মরক্ষা করে? চন্দন তখন ধীরে ধীরে ডাঙার ওপর উঠে এল। উঠে দেখল এ তো সেই জায়গা। যেখানে ওরা ওর মাথায় আঘাত করেছিল। মালার সাইকেলটা তখনও পড়েছিল সেইখানে ঝোপঝাড়ের পাশে।

চন্দন সেটা টেনে আনল। যাক। আর কিছু হোক-না-হোক এখন পালিয়ে তো বাঁচা যাবে। আর মালাকে উদ্ধারের জন্য পুলিশ-প্রশাসন, বাড়ির লোকেরা সকলেই আছে। এমন সময়—

এ কী? এ কার গলা? কমলুর না? ও দেখল হারলাঝুরির ডাঙা থেকে কাল্লু

ও তার সঙ্গীরা প্রায় টানতে টানতে নিয়ে আসছে কমলুকে।

কমলু চিৎকার করছে, ছোড় দো। মুঝে ছোড় দো।

ছেড়ে তো দেব। তার আগে বল ওই মূর্তিটাকে কোথায় হাপিস করিয়ে দিল তোর বাবা?

ম্যায় কুছ নেহি জানতা।

সব কিছু জানিস তুই। আসলে তোর বাবা আর তুই হলি পাক্কা শয়তান। না হলে চোখের পলকে ওই মূর্তিটা হাওয়া হল কী করে? আর ওই মালা। ও লেড়কি ভি সব জানে। মূর্তিটা হাপিস হল, আর ও লেড়কির সঙ্গে তোর দোস্তি বাড়ল? বল শিগগির?

আমি জানি না।

এমন সময় নদীর ওপারের জঙ্গলের ভেতর থেকে একজন ভয়ংকরদর্শন লোককে ছোরা হাতে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

তাকে দেখা মাত্রই কী রকম যেন হয়ে গেল কাল্লুর দলবল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই ওর সঙ্গীরা হুপহাপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই লোকটির ওপর। শুরু হল খণ্ড যুদ্ধ। কিন্তু সেই ভয়ংকর শক্তির সঙ্গে ওরা পারবে কেন? তাই চুনোপুঁটির মতো মরতে লাগল। এলোপাথারি ছোরা চালিয়ে তিনজনকে ঘায়েল করতেই কাল্লু পিছন দিকে দৌড় লাগাল।

কিন্তু পালাবি কোথায় বাছাধন? চন্দন তখন পাণ্ডব গোয়েন্দা। একটি মাঝারি সাইজের পাথর কুড়িয়ে সজোরে ছুড়ে মারল কাল্লুর মাথাটা লক্ষ্য করে। অব্যর্থ টিপ। বেলের মতো ফেটে গেল মাথাটা। কাল্লু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পথের ওপর।

চন্দন ছুটে গেল কাছে। গিয়ে সমবেদনার সুরে বলল, লেগেছে ভাই? আহা! আমারও তখন এমনিই লেগেছিল। এখন বল তো আমার বোন কোথায়?

জানি না।

ততক্ষণে কমলু ছুটে এসেছে, আরে! চন্দনদাদা? মেরা বহিন কাঁহা? মালা!

সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি ওকে। ও বলছে, জানে না।

কমলু সঙ্গে সঙ্গে ওর চুলের বেণী থেকে একটা কাঁটা বার করে কাল্লুর একটা চোখে সজোরে গেঁথে দিল। বলল, শয়তান। তুই আমার পিতাজিকে খুন করেছিস। এখন বল মালা কোথায়?

কাল্লু আর্তনাদ করে উঠল, আ-আ-আ।

এখনও বল। একটা চোখ গেলে দিয়েছি। আর একটা দেব। বল শিগগির।

পুরানা মন্দির মে পাহাড় পর।

নদীর গর্ভে যে ভয়ংকর লোকটি এতক্ষণ হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল সে

লোকটি এবার ধীরে ধীরে উঠে এল ওপরে। তারপর কাল্লুকে ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে বলল, তোকে আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম রে কাল্লু। সামান্য একটা সাইকেল চুরি করতে গিয়ে কেমন ফেঁসে গেলি দেখ। আয় আমার সঙ্গে। মা কালীর কাছে তোকে বলি দেব আজ। জয় মা কালী কী।

কমলু বলল, হীরুকভাইয়া। কাল্লুনে হামারা পিতাজিকো মারডালা।

ক্যা বোলা! ঝাজিকো মারডালা ইয়ে কুত্তা?

হ্যাঁ।

ঠিক হ্যায়। তুম রোও মাত, যাও, ঘর চলা যাও।

লেকিন ও মালা বহিন?

তুমহারা মালা বহিন তো কাকাহিগড় চলি গয়ী ভীরুকভাইয়া কা সাথ। যাও, তুম ঘর চলা যাও। বলে আবার নদীর জলে নেমে গেল লোকটি। অবশ্যই কাল্লুকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে।

চন্দন আর কমলু অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে।

চন্দন সাইকেলটা টেনে নিয়ে কমলুকে বলল, চাপো তুমি সামনের দিকে। আমি ডবল ক্যারি করছি। তোমার বাবা যখন নেই, তখন আজ রাত্রিটার মতো আমাদের ঘরেই চলো তুমি। তারপর মেসোকে দিয়ে পুলিশে খবর দেওয়াব।

কমলু বলল, চন্দনদা! আমি কাকাহিগড়ের পথ চিনি। আগে চলো আমরা সেখানেই যাই। মালাকে উদ্ধার করি। না হলে ও তো ভাববে। আর থানা-পুলিশ করেই বা কী হবে? কাল্লু আমার পিতাজিকে খুন করেছে। কিন্তু তুমি ওর মাথা ফাটিয়েছ, আমি চোখ কানা করেছি, আর হীরুকভাই ওকে জ্যান্ত কবর দেবে। এখানেই তো বদলা নেওয়া হয়ে গেল আমাদের।

ওই হীরুকভাইটা কে?

ও ভি ডাকু হ্যায়।

বলো কী?

হ্যাঁ, ওরাই তো সবাই মিলে ডাকাতি করেছে মালাদের বাড়িতে। ওরা যখন নন্দন পাহাড়ে আমাদের মন্দিরের পিছনদিকে বসে সব কিছুর আলোচনা করত, আমি তখন লুকিয়ে-লুকিয়ে শুনতাম। হীরুক আর ভীরুকভাইয়া আমাকে খুব ভালবাসে। বাবাকেও খাতির করত।

কমলুর নির্দেশিত পথ ধরে চন্দন দ্রুত সাইকেল চালনা করতে লাগল। সারাগায়ে এত ব্যথা। তবু এক অপূর্ব মনোবলে এগিয়ে চলল ওরা।

কাকাহিগড়। চারদিকে ছোট বড় পাহাড়ের সমাবেশ। ওই তো ত্রিকূট পাহাড়ের চুড়ো দেখা যায়। কত ছোট-ছোট টিলা। টিলাগুলোর অবস্থা দেখে মনে

হচ্ছে বড়জোর দু'বছর এগুলোর মেয়াদ। কেন না এখানে পাথর কাটার কাজ দ্রুত চলছে। চারদিকে নুড়িপাথর জড়ো করা। অরণ্যনিধনের তোড়জোড়ও চলছে পুরো দমে। বড় বড় গাছের কাটা ডাল পড়ে আছে যেখানে সেখানে।

ওরা এক পাশে সাইকেলটা লুকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগল, জঙ্গল আর টিলার মাধখানে দিয়ে! পথ চলার সময় চন্দন বুঝল কমলু কাঁদছে। বলল, কেঁদে কী করবি রে? যা তোর কপালে ছিল, তা হয়েই গেছে। চন্দন বড়দাদার মতো তুমির বদলে তুই বলতে লাগল কমলুকে।

এখন আমি কী করব দাদা? আমার যে কেউ নেই।

চন্দন বলল, কে বললে তোর কেউ নেই? আমি তো আছি। আমি তোর দাদা। আমার কত বোনের শখ ছিল। তা এমন একটি বোন পেলাম, সে কী ছেড়ে দেব বলে? কী সুন্দর দেখতে তোকে। লোককে দেখিয়ে আমার বোন বলে গর্ব করব। আমাকে রাখি পরিয়ে দিবি, ভাইফোঁটা দিবি। আর আমি বড় হয়ে চাকরি করলে রাজপুত্তুর ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।

কমলু বললে, আচ্ছা দাদা, তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছ, কিন্তু তোমার মা-বাবা আমাকে রাখবেন?

সে দায়িত্ব আমার।

কিন্তু আমার বাবুজি। বাবুজির দেহান্ত হয়ে গেল তাঁর সৎকারের কী হবে?

সব ঠিক হয়ে যাবে। আগে মালাকে উদ্ধার করি আয়। তারপর ব্যবস্থা করব। আর আমি কথা দিলাম আজ থেকে তুই আমার কাছেই থাকবি।

এইভাবে যেতে যেতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল সামনেরই একটি পাহাড়ের উচ্চস্থানে এক রুদ্র-মূর্তি সন্ন্যাসী ওদের দিকে তাকিয়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ন্যাসীর চোখের যেন পাতা পড়ছে না।

চন্দন ও কমলুকে দেখেই তিনি আকাশ ফাটিয়ে হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, আরে কমলু বিটিয়া, তুম হিঁয়া পর ক্যায়সে আ গয়ি, তুমহারা পিতাজি কাঁহা?

কমলু বলল, পিতাজিকা নিধন হো গিয়া।

আ-হা-হা-হা-। হায় রে।

চন্দন বলল, সাধুবাবু! আমার বোন মালা আপনার এখানে আছে। ওকে ফিরিয়ে দিন। আমরা ওকে নিতে এসেছি।

আরে বাঙ্গালি বাচ্ছা। তুম কৌন?

ওই যে মালা, যাকে ভীরুকভাই নিয়ে এসেছে আমি তার দাদা।

ও। তব তুম চারুভিলা কা লেড়কা?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। তোমার বোন মালা আমার কাছেই আছে। এসো এখানে এসো। ওই দিকের রাস্তাটা দিয়ে এসো।

ওরা সাধুর নির্দেশিত রাস্তাটা ধরে নেমে আসতে গিয়েই দেখল, এক জায়গায় কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক ওদের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের দেখেই শিউরে উঠল কমলু। ভয়জড়ানো কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, চন্দনদা! পালিয়ে চলো এখান থেকে। এদের মতলব ভাল নয়। আমি এদের সবাইকে চিনি। এরা বড় সাংঘাতিক।

চন্দন বলল, তবে তাই চল। কিন্তু আমরা কি পারব এদের খপ্পর থেকে পালাতে। আর পালিয়েই বা লাভ কী? মালাকে তো উদ্ধার করতে হবে।

আমরা এখুনি গিয়ে পুলিশে খবর দেব। না হলে শুধু হাতে দু'জনে আমরা কী করে কী করব বল? আমার বাবুজি মরে গেল। এখন যদি ওরা তোমাকেও মেরে ফেলে তো আমার কে থাকবে?

চন্দন বলল, তবে আয়। খুব জোরে ছুটতে হবে কিন্তু।

এই বলে ওরা দ্রুত ছুটতে লাগল।

কাকাহিগড়ের সেই সাধু চিৎকার করে উঠলেন, পাকড়ো, পাকড়ো, জলদি পাকড়ো উয়ো দোনোকো।

ওরা তখন তিরবেগে ছুটছে জ্যোৎস্নালোকিত কাকাহিগড়ের বন্ধুর প্রান্তরে। খানিক ছুটে যাওয়ার পরই দেখল মূর্তিমান যমের মতো দু'জন লোক ওদের সামনে ছোরা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখেই থেমে পড়ল ওরা।

পাশেই একটি পাহাড়ের ঢাল ছিল। সেটা দিয়ে গড় গড় করে খানিকটা গড়িয়ে নেমে এল ওরা। একটু সমতল প্রান্তরে। তারপর আবার ছুট। ছুট-ছুট-ছুট। কিন্তু আবার খানিক আসার পর দেখল, এখানেও ওদের পালাবার পথ রুদ্ধ। এদিকেও দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে ছোরা হাতে।

ইতিমধ্যে ওরা ভয়ে এমনই হতচকিত হয়ে গিয়েছিল যে সাইকেলটা কোন পথে কোনখানে রেখে এসেছিল, তাও আর মনে করতে পারল না।

হঠাৎ একসময় দু'-তিনজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের দু'জনকেই পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

চন্দন ও কমলু আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

ওরা ওদের নিয়ে এল একটু সমতলে। সেখানে একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে চন্দনকে বাঁধল। তারপর কমলুকে ছাড়া অবস্থাতে রেখেই ওরা একটু দূরে সরে গিয়ে পাহারা দিতে লাগল ওদের।

কমলু চিৎকার করতে লাগল, ছোড় দো, ছোড় দো মেরা ভাইয়া কো। এমন

সময় কাকাহিগড়ের সেই সাধু এসে এসে দাঁড়ালেন সেখানে। বললেন, আরে! কমলু বিটিয়া! তু ইতনা ডরতি হ্যায় কিঁউ মুঝে দেখ কর?

কমলু সন্ন্যাসীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল, আমার দাদাকে ছেড়ে দিন সাধুবাবা।

দেগা। জরুর দেগা। তবে তুই আমাকে ঠিক করে বলত মা ওইদিন রাতে মূর্তিটা তোর পিতাজি কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিল?

সাধুবাবা। আপনার কসম খেয়ে বলছি, ওই দিন রাতে মূর্তিটা আমার বাবা থানা-পুলিশের ভয়ে রাখতে না চাইলে ওই কাল্লু শয়তানটা ওটা নিয়ে পালিয়ে যায়।

তারপর!

তার পরের ব্যাপার আমি কিছুই জানি না।

সাচ।

হ্যাঁ সাধুবাবা।

না। তুই ঠিক বলছিস না। সাচ বাত কী আছে ঠিক করে বল দেখি? বলে চন্দনের দিকে এগিয়ে গেলেন সাধুবাবা। তারপর ওর চুলের মুঠি ধরে বললেন, এই তুই কিছু জানিস? জেনে থাকিস তো বল।

চন্দন বলল, জানি। কমলুও জানে, আমিও জানি। আর আমার বোন মালাও জানে। আগে ওকে মুক্তি দিন। তারপর সব বলব।

তোর বোন এখানে তো নেই। তপোবন পাহাড়ের গুহায় তাকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু পরে তাকে আর দেখছি না। হয়তো সে এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছেই গেছে।

চন্দন বলল, তা হলে জেনে রাখুন এখুনি পুলিশও আসছে।

পুলিশ। আসুক না। আমার কাছে মন্ত্রী-কমিশনার সবাই তো আসে। বুরবাক লেড়কা। আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিস তুই? তা হলে জেনে রাখ, অনেক বড় নৌকোয় আমার দড়ি বাঁধা। পুলিশ আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। যদি পারত, তা হলে এতদিনে আমার অনেক কিছুই করত। এখন যদি বাঁচতে চাস তো ঠিক করে বল, ওই মূর্তিটা কোথায়?

ওই মূর্তিটা আমাদের বাগানেই এক জায়গায় পুঁতে রেখেছি আমরা।

কোনখানে?

আমাদের নিয়ে চলো দেখিয়ে দিচ্ছি।

সাধুবাবা বললেন, ঠিক বলছিস?

হ্যাঁ, আমার হাত-পা খুলে দাও এবার। বড্ড লাগছে আমার।

সাধুবাবা বললেন, বেশ খুলে দিচ্ছি। তবে আজ রাতের মতো আমাদের

এখানে থাকতে হবে তোদের দু'জনকে। যদি ওটা পাই তা হলে কাল এমনিই ছাড়া পাবি। না হলে কিন্তু মা কালীর কাছে বলি দেব তোদের দু'জনকেই।

বেশ তাই দেবেন। এখন ছাড়ুন তো।

সাধুবাবা ওর বাঁধন মুক্ত করে বললেন, ঠিক কোনখানে আছে বল তো ওটা।

বাগানের পিছনে পাঁচিলের গায়ে যে শিরীষ গাছটা আছে সেইখানে।

সাধুবাবা দলের লোকদের বললেন, যাও! তুমসব জলদি চলা যাও হুঁয়া পর।

সাধুর লোকেরা তখনি ছুটল।

সাধু ওদের দু'জনকে নিয়ে তাঁর আশ্রমের দিকে এগোতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কমলু ও চন্দন ইশারা করে নিল। তারপর চোখে চোখে কথা বলে যেই-না একটা পাথর কুড়িয়ে মারতে যাবে, অমনি সাধুবাবা খপ করে এক হাতে ধরে নিলেন কমলুকে, কিন্তু চন্দন ততক্ষণে সাধুর জটা ধরে ঝুলে পড়তেই নকল জটা খুলে এল খস করে।

এ কী! এ তো ছদ্মবেশী। এ তো সাধু নয়।

চন্দন বলল, কে আপনি? আপনি তো কাকাহিগড়ের সাধু নন।

সাধুবাবা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বললেন, কে আমি একটু পরে বুঝবি। শয়তান ছেলে, যদি তোর কথা মিথ্যে হয়, ওরা মূর্তি না-পেয়ে ফিরে আসে তা হলে আজই শেষরাতে তোদের বলি দেব মায়ের কাছে। এখন চল তোদের দু'জনকে মায়ের মন্দিরে রেখে আসি।

এই বলে দু'জনের হাতের নড়া ধরে টানতে টানতে সাধুবাবা ওদের নিয়ে একটা টালির চালা দেওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে শিকল তুলে নিল।

আসলে হারলাঝুরিতে মাথায় ঘা খেয়ে নদীর খাদে পড়ে গিয়ে চন্দনের শরীরে শক্তি বলে আর কিছুই ছিল না। তাই সে আর বেশিরকম বাধা দিতে পারল না। তবু ওরা দু'জনে সেই বন্ধ দরজায় লাথির পর লাথি মেরেই চলল।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামল দু'জনে। যে ঘরে ওরা ছিল সেই ঘরে মিট মিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। সেই প্রদীপের আলোয় ওরা দেখল, এইটাই মায়ের মন্দির। এক পাশে কয়েকটি নরমুণ্ডের করোটি রাখা আছে। তারই মাঝখানে মা-কালীর মূর্তি।

কমলু বলল, আচ্ছা চন্দনদা।

বল।

তুমি যে ওদের মিথ্যে করে বললে মালাদের বাগানে শিরীষ গাছের নীচে মূর্তিটা পোঁতা আছে। কিন্তু একথা তো ঠিক নয়, কাজেই ওরা যখন মূর্তি না পেয়ে ফিরে আসবে, তখন কী হবে?

আরে বুঝলি না কেন, এই অছিলায় ওদের একটু দূরে সরিয়ে দিলাম। এর

ফলে হল কী ওরা মূর্তি উদ্ধার করতে গিয়ে নির্ঘাত ধরা পড়বে। কেন না মালা কি এতক্ষণে বাড়ি গিয়ে হই-চই পাকিয়ে থানা-পুলিশ করেনি ভেবেছিস? আর এই সময়ের মধ্যে আমরাও এখান থেকে পালাবার কোনও মতলব বার করতে পারব।

কী করে পালাবে?

শোন, তুই এক কাজ কর। দুটোহাত পিছনে রেখে আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে জুড়ে শক্ত করে দাঁড়া। আমি তোর হাতে পা দিয়ে কাঁধে উঠে ওপরের টালি ফাঁক করে পালাই। তারপর ওদিকে নেমে দরজার শিকল খুলে তোকে নিয়ে পালাব।

কমলু বলল, বাঃ। তোমার বেশ বুদ্ধি তো।

এ ছাড়া উপায় নেই রে।

চন্দনের কথা মতো কমলু তাই করল। এবং এই উপায়ে চন্দনও অনায়াসে ওর হাতে পা রেখে কাঁধে উঠল। তারপর টালি সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা খুলে দিতেই মুক্তি পেল কমলু।

এবার আর কোনওদিকে না গিয়ে সোজা পাহাড়ি পথে দৌড়তে লাগল ওরা। চন্দন কমলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে ছুটতে লাগল।

ইতিমধ্যে কী করে যেন টের পেয়ে সাধুবাবাও ছুটে এসেছেন তখন, রুখ যা! এ বাঙ্গালি রুখ যা। নেহি তো মার ডালুঙ্গা।

চন্দন ঘুরে তাকিয়ে দেখল কাকাহিগড়ের সাধুবাবা আবার সেই আগের মতো জটাজুটধারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে 'চন্দনদা' বলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মালা। তারপর বাচ্চা মেয়ের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, তুমি বেঁচে আছ চন্দনদা! আমি তো ভেবেছিলাম মরেই গেছ। আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ না? সামান্য একটা সাইকেলের জন্য কী কাণ্ড।

চন্দন মালাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তোমার সাইকেল আমি উদ্ধার করেছি মালা। কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে।

আমি এসেছি পথ খুঁজে। তবে একা নয়। সঙ্গে এক গাড়ি পুলিশ নিয়ে। একটু আগেই একটা দলকে রাস্তায় ধরে ফেলেছে পুলিশ। এখন বাকি শুধু ওই যত নষ্টের গোড়া সাধুটা। ব্যাটা ভণ্ড।

কোন সাধু! ওটা তো ছদ্মবেশী, ওই জটা ওর পরচুলা।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

হতে পারে। তবে কাকাহিগড়ের সাধু উনিই।

মালার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গুড়ুম করে একটা শব্দ। আর সেই শব্দের

সঙ্গে আর্ত চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল কমলু। চন্দন মালাকে টেনে নিয়ে বড় একটা পাথরের খাঁজে গা আড়াল করল।

আবার একটা গুলি এসে লাগল পাথরের গায়ে।

কাকাহিগড়ের সাধু ক্ষিপ্ত হয়ে গুলি চালাচ্ছেন।

ততক্ষণে দলে দলে পুলিশ ছুটে এসেছে সেখানে।

মালা ও চন্দন আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল কমলুর কাছে। কমলু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওরা দু'জনে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল কমলুকে।

এদিকে পুলিশের লোকেরা হিড়-হিড় করে টেনে আনল সাধুবাবাকে।

একজন অফিসার হাতে হাতকড়া পরিয়ে বলল, তারপর ভগবানদাসজি। আপনি এতদিন অনেক খেল দেখিয়েছেন। এইবার আপনার পালা শেষ।

সাধুবাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন, ম্যায় সর্বানন্দ গিরি হুঁ। ভগবানদাস নেহি।

চন্দন ছুটে গিয়ে সাধুর জটাটা টেনে খুলে দিয়ে বলল, এইবার বলুন আপনি কে?

সাধুবাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন, মেরা ক্যা কসুর?

আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। শুধু প্রমাণের অভাবে এতদিন আপনাকে গ্রেফতার করতে পারছিলাম না আমরা, আপাতত অন্য কোনও প্রমাণ না-থাকলেও ছেলেমেয়ে ধরে আটক করা এবং খুনের অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা হল। নাউ ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট ফর কিডন্যাপিং অ্যান্ড মার্ডার।

মালা ততক্ষণে একটা টুকরো পাথর তুলে নিয়ে সাধুর নাকে ছুড়ে মেরেছে।

সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠল, এ ক্যা হ্যায়। তুমনে হাত মাত লাগাও।

মালা বলল, ও আজ জেলে ঢুকলে কাল ঠিক বেরিয়ে যাবে। কিন্তু আমার দেওয়া এই স্মৃতিচিহ্নটুকু যাতে চিরকাল আঁকা থাকে সেই ব্যবস্থাই করলাম।

এরপর যন্ত্রণাকাতর কমলুকে ধরাধরি করে জিপে ওঠানো হল। তারপর ওর চিকিৎসার জন্য পুলিশের জিপ দ্রুত ওকে নিয়ে এগিয়ে চলল দেওঘরের হাসপাতালের দিকে। সঙ্গে মালা, চন্দনও চলল।

এর দিন তিনেক পরের কথা। চারুভিলায় সেদিন দারুণ উৎসব। সেই রাধাকৃষ্ণমূর্তি আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠার দিন আজ। বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন। আর তো কোনও ভয় নেই। দলের সবাই ধরা পড়েছে। হীরুক ও ভীরুক মরেছে পুলিশের গুলিতে। কাল্লুর মৃতদেহটা নদীর চরায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাদবাকির সবাই লকআপে। কমলুর কথানুসারে নন্দন পাহাড়ের পানি ট্যাঙ্কির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রাধাকৃষ্ণমূর্তিকে। শেষ নিশ্বাস

ফেলার আগে কমলুই বলে গেছে, ওর বাবার সঙ্গে কাল্লুর কথা কাটাকাটির সময় মূর্তিটা ও লুকিয়ে ট্যাঙ্কের মধ্যে ফেলে দেয়। সেই সূত্রেই পাওয়া গেছে মূর্তিটা।

কিন্তু এত আনন্দর মধ্যে কমলুই নেই, এটা যেন দুঃস্বপ্নের মতো। এ যেন ভাবাই যায় না। তাই চারুভিলার ছাদে আলশের ধারে হাতে হাত রেখে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা মালা ও চন্দনের চোখ বেয়ে টপ টপ করে অশ্রুর ধারা মুক্তোর মতো ঝরে পড়তে লাগল। দূরের পাহাড়, সবুজ অরণ্যানি এবং মেঘমুক্ত আকাশ কমলুর অভাব কতখানি বোধ করবে জানি না। তবে এই দুই কিশোরকিশোরীর হৃদয়ে কমলুর স্মৃতি হয়তো বরাবরের জন্য আঁকা হয়ে থাকবে।

গিরিগুহার গুপ্তধন

এক

চারদিকে পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড় যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। ওই পাহাড়ের কোল বেয়ে বয়ে চলেছে সোনার নদী। বিস্তৃত শালবন, গভীর অরণ্যানি শ্যামল উপত্যকা, আর সব কিছুর শেষে যে বড় পাহাড়, সেই পাহাড়ের এক সুবিশাল গুহার ভেতরে...।

এই পর্যন্ত পড়ে থেমে যেতে হল দীপংকরকে। কেন না বাকিটা কীভাবে যেন অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। কিন্তু থেমে গেলেও এক অদম্য কৌতূহল ওর কিশোরমনকে তোলপাড় করতে লাগল। কী ছিল সেই গুহার ভেতরে? গুপ্তধন? নাকি অন্য কিছু? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর যিনি দেবেন তিনি আজ আর ইহলোকে নেই। দীপংকর তবুও বার বার সেই পুড়ে যাওয়া ডায়েরির পাতার ওপর চোখ বোলাতে লাগল।

ঘড়ির কাঁটায় রাত দশটা।

মা এসে বললেন, কীরে, এখনও জেগে আছিস তুই? এবার শুয়ে পড়।

দীপংকর মা'র দিকে ওর ডাগর ডাগর চোখদুটি তুলে বলল, মা বাপি কখন আসবে?

ওর আসতে দেরি হবে বাবা। হয়তো রাত বারোটাও হতে পারে। কিন্তু উনি এসে যদি দেখেন, তুই এখনও জেগে বসে ওইসব পড়ছিস তা হলে কিন্তু খুব রেগে যাবেন।

আচ্ছা মা, জেঠুর কাগজপত্তরে হাত দিলে তোমরা এত রেগে যাও কেন?

তোমার বাপি পছন্দ করেন না বলে। চিরকাল বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর ডায়েরির পর ডায়েরি লিখে গেছেন। তাঁর মতন লোকের যে এমন পরিণতি হবে তা কি কেউ জানত?

দীপংকর বলল, এই ডায়েরিটা লেখার সময়েই জেঠু খুন হয়েছিলেন তাই না মা।

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? কেন ওরা আমার জেঠুকে খুন করল? উনি তো অত্যন্ত পরোপকারী লোক ছিলেন। কী চমৎকার কথাবার্তা বলতেন। আর কী দারুণ

রসিক। প্রত্যেকটি কথায় রসিকতা মাখানো ছিল তাঁর। এমন মানুষকে কেউ খুন করে?

যারা খুনি তাদের ছুরিকাঘাতে কেউই বাদ যায় না বাবা।

আমার মনে হয় এই ডায়েরিটা লেখার সময় নিশ্চয়ই জেঠুর টেবিলে কোনও মোমবাতি ছিল। খুনের সময় সেটি উলটে যায়, আর তাতেই বাকি অংশটা পুড়ে যায়।

অনেক রাত হয়েছে দীপু। এসো শোবে এসো। যতক্ষণ না তোমার বাপি আসেন, আমি ততক্ষণ তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব। ওটা রেখে দাও তুমি। ওখানে অনেক দরকারি কাগজপত্তর আছে।

অতএব ডায়েরিটা মুড়ে যথাস্থানে রেখে দিল দীপংকর। তারপর বিছানায় এসে শুতে মা ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

দীপংকর বলল, মা, তুমি দেখে রেখো, আমি বড় হয়ে যে ভাবেই হোক আমার জেঠুর হত্যাকারীকে ধরবই। যারা আমার জেঠুকে হত্যা করেছে ভগবান ক্ষমা করলেও, আমি তাদের ক্ষমা করব না।

মা বললেন, ভগবানও কাউকে ক্ষমা করেন না বাবা। তাঁর হিসাবের খাতায় সব কিছু জমা হয়ে থাকে। সময় মতো তিনি যার যা পাওনা তাকে তা কড়ায়গণ্ডায় পাইয়ে দেন। তোমার জেঠু দেবতার মতো লোক ছিলেন। কাজেই তাঁকে যারা হত্যা করেছে তারা কিছুতেই রেহাই পাবে না।

দীপংকর একবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বারবার ডায়েরির পাতার ওই কয়েক ছত্র লেখাটার কথা মনে পড়তে লাগল তার। কী আছে ওই গুহায়? গুপ্তধন? যদি থাকে তবে লোকজন নিয়ে তিনি তা উদ্ধার করবার চেষ্টা না করে ডায়েরির পাতায় লিখতে গেলেন কেন? কেন তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন?

দীপংকর একটুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে একসময় বলল, আচ্ছা মা, সোনার নদী কোথায়? সোনার নদী কি সত্যিই আছে?

কী জানি বাবা।

জেঠু ডায়েরিতে লিখেছেন কিনা!

লিখেছেন নাকি? হয়তো সেরকম কোনও নদীর সন্ধান তিনি কোথাও পেয়েছিলেন। তাই হয়তো দুর্বৃত্তেরা হত্যা করেছে তাঁকে।

আচ্ছা মা, জেঠুর অনেক টাকা ছিল তাই না?

হ্যাঁ। জেঠুর সব টাকার মালিক এখন তুই। ব্রিটিশ আমলের লোক উনি। জাহাজে চাকরি করতেন। কত দেশ-বিদেশ যে ঘুরেছেন তার ঠিক কী? সাহেবরা খুশি হয়ে তোর জেঠুকে গিনি উপহার দিতেন আর সেগুলো তিনি নিয়ে এসে

জমা করতেন ঘরের সিন্দুকে। সেদিন চাবি খুলে দেখি প্রায় একশোটারও বেশি গিনি আছে তার ভেতরে। ব্যাঙ্ক ভরতি জেঠুর টাকা। তবে খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তো উনি, তাই সবকিছুর উইল করে গেছেন তোর নামে। মাসে মাসে মোটা টাকা ব্যাঙ্ক থেকে সুদ পেতেন, আর সেই টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। অরণ্য ছিল তাঁর প্রাণ। তিনিই ছিলেন যেন বনের রাজা।

দীপংকর এবার একটু উঠে বসে বলল, মা, জেঠু ঠিক কোন জায়গায় খুন হয়েছিলেন তুমি জানো? আমার মনে হয় সোনার নদী সেখানেই কাছেপিঠে কোথাও আছে।

জায়গাটার কথা আমি ঠিক বলতে পারব না! তবে সিংভূমের অরণ্যে এইটুকু জানি।

এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। নিশ্চয়ই বাপি এসেছেন। দীপংকর চোখ বুজল। মা উঠে গেলেন দরজা খুলতে।

দরজা খুলতেই বাপির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দীপুটা ঘুমিয়েছে?

শুয়েছে অনেকক্ষণ।

আজও কাজের কাজ কিছু হল না। তা ছাড়া মনে হচ্ছে আমার পিছনেও লোক লেগেছে।

মা শিউরে উঠলেন, সে কী!

দীপংকরের বুকটাও ভয়ে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। বাপির পিছনেও লোক লেগেছে! কিন্তু কেন? বাপি তো কোনও ঝামেলায় থাকেন না। তবে কি ওরা বাপিকেও খুন করবে? কী এমন অপরাধ করেছেন জেঠু, যে তার ফল বাপিকেও ভোগ করতে হবে?

মা বললেন, তুমি কী করে বুঝলে যে তোমার পিছনেও লোক লেগেছে?

সাকচি বাজারের কাছে একজন লোক এমনভাবে মোটর বাইক নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল যে আর একটু হলেই চাপা দিত আমাকে!

তুমি রক্ষা পেলে কীভাবে?

হঠাৎ একটি মিলিটারি ট্রাক এসে পড়ায় কেটে পড়ল লোকটা। তারপর স্টেশনে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, তেমন সময় একজন বিচ্ছিরি চেহারার লোক, গালের একটা পাশ আগুনে পোড়া। আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, বাবু ম্যাচিস। আমি তাকে দেশলাইটা দিতেই একটা বিড়ি ধরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে খিক খিক করে হাসল লোকটা। তারপর কী বলল জানো?

কী বলল?

বলল, আপনি তো মানিকবাবুর ভাই, তাই না? আমি বললাম, তুমি কে? তার উত্তরে লোকটি বলল, সময় হলেই আমাকে চিনতে পারবেন বাবু। আচ্ছা চলি।

বলে আমাকে এক চোখ বুজে এক চোখ দেখিয়ে চলে গেল।

দীপংকরের শরীরের ওপর দিয়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

মা বললেন, তুমি আর ওখানে যেয়ো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ওনার যা হবার তা হয়েছে। এখন পুলিশের কাজ পুলিশ করুক।

আমিও তাই ভাবছি। শুধু ভেবে পাচ্ছি না ওরা কী চায়? দাদাকে ওরা খুনই বা করল কেন, আর আমার ওপরই বা ওদের রাগের কারণ কী?

ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দীপংকর পড়তে বসেও পড়ায় মন বসাতে পারল না। বারবার বাপির কথাটা ওর কানে ঘুরেফিরে বাজতে লাগল। একটা টেপ যেন অনবরত বেজে চলেছে 'মনে হচ্ছে আমার পিছনেও লোক লেগেছে।' তবে কি বাপিকেও ওরা মেরে ফেলবে? না না এ হতে পারে না। দীপংকর দু' হাতে ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে একবার ঝাঁকিয়ে নিল। না। মানসিক উত্তেজনা তাতেও কমল না।

ও উঠে গিয়ে দেখল রান্নাঘরে মা উনুনে হাওয়া করছেন। মা'র চোখে জল।

বাপি খবরের কাগজ পড়ছেন। দৃষ্টি কাগজের পাতায়। কিন্তু কী যেন ভাবছেন উনি।

দীপংকর আস্তে করে ডাকল, বাপি?

উঁ?

তুমি আর টাটানগরে যেয়ো না। কী হবে গিয়ে? জেঠু খুন হয়েছেন। যদি তোমারও কিছু একটা হয়ে যায়? টাটানগরের ওই বাড়ি তুমি বিক্রি করে দাও।

ও বাড়ির মালিক এখন তুমি। আমি কি বেচতে পারি?

তা হলে আমিই বেচে দেব।

আগে তুমি বড় হও। তারপর তোমার সম্পত্তি নিয়ে তুমি যা খুশি করো। এখন তুমি নাবালক। এখন কোনও কিছুই করা চলবে না।

তা হলে যেভাবে যে অবস্থায় পড়ে আছে বাড়িটা তেমনি থাক।

আপাতত তাই থাকবে।

দীপংকর অত্যন্ত আদরের সঙ্গে ওর বাপিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আচ্ছা বাপি, জেঠু ওনার ডায়েরিতে যেসব জায়গার কথা লিখে গেছেন সেগুলো কি সত্যিই আছে?

আছে বইকী। না থাকলে কি এমনি লিখেছেন?

তা হলে সোনার নদীর কথা নিশ্চয়ই মিথ্যে নয়?

সোনার নদী! জেঠু লিখেছেন নাকি?

হ্যাঁ। আচ্ছা বাপি সিংভূমের কোথায় খুন হয়েছিলেন জেঠু? সিংভূম কোথায়?

ছোটনাগপুরের একটা জায়গার নাম। ধারাগিরি ঝরনার ধারে তোমার জেঠু রাতের অন্ধকারে খুন হয়েছিলেন গুপ্তঘাতকের হাতে। ওনার একজন 'হো' চাকর ছিল। তাকেও অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পাওয়া যায়নি শুধু ভেলুকে। অর্থাৎ তোমার জেঠুর শিকারি কুকুরকে। কুকুরটা টাটানগরে তোমার জেঠুর বাড়ি পাহারা দিত। আর জেঠুর সঙ্গে জঙ্গলে যেত। একবার দলমা পাহাড়ে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী তোমার জেঠুকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভেলু তাদের এমন শিক্ষা দিয়েছিল যে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল বাছাধনরা।

সেই রাতে ভেলু তা হলে কোথায় ছিল?

সেটাই তো রহস্যময়। ওরা হয়তো জেঠুকে খুন করার আগে তাকেও মেরে ফেলেছিল।

তা হলে তো ভেলুর মৃতদেহ সেখানেই পড়ে থাকত বাপি?

বাপি হেসে বললেন, তোমার বুদ্ধিমত্তায় আমি খুব খুশি হয়েছি। বড় হয়ে তুমি ভাল গোয়েন্দা হতে পারবে। তবে এখন তোমার লেখাপড়ার সময়। জেঠুর খুনের ব্যাপারটা নিয়ে এখন তোমার মাথা না-ঘামালেও চলবে। আর শোনো, জেঠুর কাগজপত্তর বেশি ঘেঁটো না। তুমি যখন বড় হবে, তখন হয়তো ওগুলো তোমার কাজে লাগবে। শুধু তোমার আর তোমার মায়ের মুখ চেয়ে আমি এখুনি কিছু করব না। আমাকে সাবধান হতেই হবে। তুমি নির্ভাবনায় থাকো। কেমন?

দীপংকর 'হ্যাঁ' বলে তখনকার মতো চলে গেল।

দুপুরে বাপি যখন অফিসে, আর মা যখন ঘুমোতে গেছেন, তেমন সময় দীপংকর আবার শুরু করল তার কাজ। চুপি চুপি জেঠুর ঘরে ঢুকে সব কিছু উলটেপালটে দেখতে লাগল।

ইদানীং জেঠু বেশির ভাগ সময় সাকচিতে থাকতেন। মাঝেমধ্যে যখন আসতেন, তখন অনেক কিছুই রেখে যেতেন। তার মধ্যে সারা বছরের লেখা ডায়েরিটাই খুব যত্নের সঙ্গে রাখতেন তিনি। অথচ আশ্চর্য! ডায়েরিতে তিনি কত কী লিখেছেন, কিন্তু ভুলেও কোনও শত্রুর কথা লেখেননি। তা হলে কি জেঠু হঠাৎই খুন হয়েছেন? ভুলবশত? তবু সেই যে কথায় আছে, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই', দীপংকরও তাই করতে লাগল। একটার পর একটা ডায়েরির পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় একটু রহস্যের গন্ধ পেল ও। জেঠু লিখেছেন, 'অনেকদিনের পর কুন্দনলালের সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল গোলবাজারে। লোকটা একটি পাক্কা শয়তান। ভিক্টোরিয়া জাহাজে মিলারসাহেবকে ওই লোকটাই খুন করে। ওই জাহাজে প্রচুর সোনা ছিল। সেগুলো নিয়ে ভাগবার তালে ছিল ও। কিন্তু আমি হাতেনাতে ধরে ফেলি ওকে।

গভীর রাতে আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবার সময় জাহাজের ডেক থেকে জলে পড়ে যায় ও। সেই সময় গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসে। তারপর ওর আর কোনও হদিস পাওয়া যায় না। ভেবেছিলাম লোকটা মরে গেছে। কিন্তু না! এতদিনে এই পরিণত বয়সে বুঝলাম শয়তানের মৃত্যু নেই। ওর হাতে হয়তো আরও অনেকের মৃত্যু আছে।'

এরপর কুন্দনলাল প্রসঙ্গে আর কিছুই লেখেননি জেঠু। ডায়েরির পাতায় সাল তারিখ সহ লেখা 'খড়্গপুর'। তার মানে গোলবাজারটা খড়্গপুরেই।

আর একদিনের ডায়েরিতে জেঠু লিখেছেন— 'জানি না কাজটা ভাল করলাম কি না। লুটের ধন। তার ওপর শুধুই সোনা। পুলিশকে জানালে হইচই হবে। আমাকেই হয়তো জড়িয়ে দেবে জালে। আর ওরাও যখন টের পাবে তখন পুলিশে খবর দেওয়ার জন্যে আমাকেই দেবে ডিস্যুম করে। তার চেয়ে ও জিনিস লুকনো থাক। সোনার নদীর দেশে এই গভীর অরণ্যে গহন গিরিকন্দরেই লুকানো থাক মাটির তলায়।'

এই পর্যন্ত পড়ে যা যেখানে ছিল সব ঠিকঠাক সেইখানে রেখে জেঠুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল দীপংকর। এইবার বুঝতে পেরেছে জেঠুর মৃত্যুর রহস্যটা কী। ওই লুকানো সোনার সন্ধানেই কোনও দুষ্কৃতকারীর দল জেঠুকে বিরক্ত করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত না-পেয়ে তাঁকে হত্যা করে। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে ওরা পিছন থেকে মারবে কেন জেঠুকে? ওরা তো জেঠুকে ধরে নিয়ে যাবে, ভয় দেখাবে, তারপর নানারকম অত্যাচারের শেষে নৃশংসভাবে হত্যা করবে ওরা।

যাই হোক। জেঠুর ডায়েরি পড়ে দীপংকর এই সত্যে উপনীত হল যে, নিজের অজান্তেই জেঠু কিছু ক্রিমিন্যালের চক্রে পড়ে যান এবং তার পিছনেও রয়েছে ওই লুকানো সোনা আর সেই ক্রিমিন্যালদের নায়ক হয়তো কুন্দনলাল। কিন্তু এই কুন্দনলালকে চেনা যাবে কী করে? জেঠু তো তার চেহারার কোনও বর্ণনা দেননি।

ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পেল না দীপংকর। ওর বাবার কাছে টাটানগর স্টেশনে যে বিকৃত চেহারার লোকটা দেশলাই চেয়েছিল, সে-লোকটাও তো কুন্দনলাল হতে পারে?

জেঠু মারা গেছেন প্রায় এক মাস হয়ে গেল। বিহার-পুলিশ এখনও তাঁর খুনের কোনও কিনারা করতে পারল না। জেঠুর 'হো' চাকরটাকে অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু এই লোকটার নাম কী? এই লোকটা নিশ্চয়ই পুলিশের হেফাজতে হাসপাতালে আছে। আচ্ছা কোনওরকমে এই লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ করলে জেঠুর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না? কারা কী কারণে জেঠুর পিছনে লেগেছিল সেকথা ওর চেয়ে ভাল আর কে বলতে পারবে? ওই লুঠের

মাল জেঠুর নেবারই বা দরকার কী ছিল? বাপির মুখে শুনেছে জেঠুর নাকি অনেক—অনেক টাকা। কিন্তু এত টাকা জেঠু পেতেন কোথায়? ব্রিটিশরাজ তো কবেই শেষ হয়ে গেছে। এখন তো সাহেবরা আর জেঠুকে ডেকে আদর করে গিনি উপহার দেন না। তা ছাড়া যে জিনিস গহন গিরিকন্দরে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছেন জেঠু, সে জিনিসের সন্ধান তিনি পেলেন কী করে? আর পেলেন যখন তখন সেইসব তিনি ঘরেই বা নিয়ে এলেন না কেন? তার মানে জেঠু ভালমানুষ হলেও খুব রহস্যময় লোক ছিলেন। অত সোনা উনি লুকিয়ে রাখলেন মাটির তলায়— আবার বনের রাজা হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, সব যেন কীরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর।

বিকেলবেলা নিজের অভ্যাসবশে দীপংকর একা একাই বেড়াতে চলল। এমনিতে ছেলে হিসাবে সে খুব মেধাবী। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর বাসনা প্রবল। খুব চাপা আর জেদি প্রকৃতির। তবে খুব ঠান্ডা মাথার।

রামকৃষ্ণপুর ঘাটে ক্রেনজেটির সামনে এসে দীপংকর বসল ট্রেলপারের ওপর। গঙ্গায় এখন জোয়ার ভরতি। বড় বড় গাদা বোটগুলো মাল বোঝাই হচ্ছে। মাথার ওপর ঘর ঘর শব্দে ক্রেনে করে মাল আসা-যাওয়া চলছে। দূরে খিদিরপুরের ডকে সারি সারি জাহাজ মাস্তুল খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে ও দেখতে পেল। এইরকমই কোনও একটি জাহাজে মিলারসাহেবের আন্ডারে কাজ করতেন জেঠু। আজ সেই মিলারসাহেবও নেই, জেঠুও নেই। দুর্ভাগ্য দু'জনেরই। দু'জনেই নিহত হলেন গুপ্তঘাতকের হাতে।

দীপংকর ট্রেলপারে বসে গঙ্গায় ঢেউ গুনতে লাগল। ওর মনের ভেতরে এখনও এক অস্থির উত্তেজনা। সেই সঙ্গে অনেক কিছু হারাবার ভয়। যদি কোনওদিন দুষ্কৃতকারীরা অফিস থেকে ফেরার পথে ওর বাপিকে কলকাতার রাজপথেই গাড়ি চাপা দেয়? ও যখন স্কুলে থাকবে এবং ওর বাপি যখন অফিসে সেইসময় ওরা এসে যদি ওর মাকেই কোনওদিন খুন করে রেখে যায় তা হলে? তা হলে কী হবে? উঃ ভগবান, কেন যে জেঠু বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, কেন যে সোনা সোনা করে পাগলা হতেন, তা কে জানে?

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে না-আসা পর্যন্ত দীপংকর ট্রেলপারে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে ফিরে আসবার সময়ই দেখল বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার একটি বখাটে ছেলে শিস দিতে দিতে কেমন যেন নাচের ভঙ্গিমায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা ওর চেয়েও দু'-এক বছরের বড়ই হবে। তবে তার পোশাকপরিচ্ছদ দেখলে মনে হবে বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, কিন্তু বখাটে।

লঞ্চঘাটের দিক থেকে দুটি ফ্রকপরা কিশোরী মেয়ে সেই পথে আসছিল তখন।

তাদের দেখেই বখাটে ছেলেটার শিস দেবার ধুম বেড়ে গেল।

পথে লোকজন তখন ছিল না বললেই হয়। ফলে ছেলেটির সাহস বেড়ে গেল খুব।

মেয়েদুটিও তখন বিব্রত বোধ করতে লাগল নিজেদের। দু'-একবার আড়চোখে দেখল দীপংকরকে! তারপর আরও জোরে যাবার জন্য পা চালাল।

বখাটে ছেলেটিও এবার একটি হিন্দি গানের সুর ভেঁজে ওদের পিছু নিল।

মেয়েদুটি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে তাকিয়ে বলল, এ কী, আপনি সেই থেকে আমাদের পিছু পিছু আসছেন কেন?

ছেলেটি দু'হাত কোমড়ে রেখে কঠিন গলায় বলল, পিছু পিছু কেন যাব? সরকারি রাস্তায় পথ চলছি। তোমাদের গায়ে লাগছে কেন?

দীপংকর আর থাকতে পারল না। ছেলেটির মুখোমুখি হয়ে বলল, চেহারাটি তো বেশ ভদ্রলোকের মতো। তা আমার বোনেদের বিরক্ত করতে এসেছ কেন বাবা? এখানে যে আমিও আছি তা দেখনি বুঝি?

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে দীপংকরের জামার কলারটি ধরে কাছে টেনে আনল একবার। তারপর এক ঝটকায় ছুড়ে ফেলে দিল রাস্তার ওপর।

মেয়েদুটি ছুটে গিয়ে হাত ধরে তুলে দাঁড় করাল দীপংকরকে।

বখাটে ছেলেটি তখন হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল। বলল, এক ফোঁটা ছেলে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিস ব্যাটা। ফোট এখান থেকে।

দীপংকর তখন চোট খাওয়া বাঘের মতো রুখে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ উত্তেজনায় হাতের ঘুসি পাকিয়ে যথাশক্তি দিয়ে ছেলেটার তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত করল। একবার শুধু 'ওক' করে একটা শব্দ। তারপরই গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল ছেলেটির মুখ দিয়ে।

মেয়েদুটি সভয়ে পিছিয়ে এসে বলল, এ কী? এ কী করলে ভাই? ও যে মরে যাবে। এ তো খুন!

কিন্তু আমি তো তোমাদেরই মর্যাদা রক্ষা করতে...।

ওই দেখো ওর জিভটা কীরকম বেরিয়ে আসছে। পালাও পালাও, তুমি এখান থেকে। এখুনি পালাও। আমরা কাউকে কিছু বলব না। তুমি শিগগির পালাও। নইলে তোমাকে পুলিশে ধরবে।

দীপংকর হতচকিত। কী যে করবে তা সে ভেবে পেল না। এমনটি হবে তা ভাবতেও পারেনি ও। কী করতে গিয়ে কী হয়ে গেল। দীপংকর খুন করল! তার মানে এবার পুলিশ ওকে খুঁজবে। ধরা পড়লে বিচার হবে। ফাঁসি হবে কি? যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো হবেই। শিশু অপরাধীদের জেলে ওকে রাখা হবে। উঃ। সে কী ভয়ংকর ব্যাপার। খাঁচার পাখির মতো বন্দি হয়ে থাকতে হবে সারা

জীবন। ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকে বলবে 'ওই যে দেখছ ছেলেটা, ও খুনি।' তার মানে আজ থেকে দীপংকর ও কুন্দনলাল এক।

দীপংকর দেখল সেই বখাটে ছেলেটা দু'হাতে পেট চেপে লুটিয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

মেয়েদুটি এক ফাঁকে কখন সরে পড়েছে।

ওই তো দূরে একটা কীসের যেন হেড লাইট এগিয়ে আসছে না? নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি। না-হলে এমন সময় আলো জ্বেলে ওই গাড়িটা এদিকেই বা আসবে কেন? দীপংকর আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। যেদিকে এসেছিল সেইদিকেই ছুটল। ছুট—ছুট—ছুট।

ফরসোর রোড পার হয়ে আবার সেই ট্রেলপারে এসে হাঁসফাঁস করে হাঁপাতে লাগল। এ কী! পুলিশ কেন? খইনি টিপতে টিপতে দুটো পুলিশ যে এদিকেই আসছে। ওরা কি ওয়ারলেসে খবর পেয়ে গেছে! নিশ্চয়ই পেয়েছে এবং সেই খবর পেয়েই ওকে ধরবে বলে আসছে ওরা।

দীপংকর আবার ছুটল।

ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় এসে পড়তেই...

ক্যাঁক ক্যাঁচ। খুব জোরে ব্রেক কষল গাড়িটা। আর একটু হলেই থেঁতলে যেত দীপংকর। তবু যেটুকু ধাক্কা ও পেয়েছে তাতেই একটু একটু করে সবকিছু ঘোলাটে হয়ে গেল।

লরির ড্রাইভার বলল, খুব বেঁচে গেছে এ যাত্রা।

আর একজন কে বলল, ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ হয়ে যেতে পারে। কী করব ওস্তাদ, এখানেই ফেলে রেখে যাব, না তুলে নেব গাড়িতে?

দীপংকর চোখ না-মেলেই বুঝল একজন লোক পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে। ওর মাথাটা আরও ঝিম ঝিম করতে লাগল। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই।

দুই

জ্ঞান যখন ফিরল তখন ভোরের আভাস অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। দূর আকাশে তারার দীপগুলি নিভু নিভু। দ্রুতগামী ট্রাকের ওপর শুয়ে অসহায় দীপংকর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। এ কোন দেশ? এ কোন রাজ্যে ও এসে পড়েছে? কী চমৎকার বাতাসের ঘ্রাণ এখানকার। নিশ্বাস নিতে বুক যেন ভরে উঠল।

ট্রাক প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। কখনও উঁচুতে কখনও ঢালু পথে। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের ডালপালা ট্রাকের মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে। সর সর করে আওয়াজ হচ্ছে।

দীপংকর ধীরে ধীরে মাথাটা তুলে বসল। নাঃ, মাথাটা ঠিকই আছে। শুধু সর্বাঙ্গে ব্যথা। উঠে বসতেই অবাক হয়ে গেল। এ কোথায় এসেছে ও! কী বিশাল বনভূমি। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। ওদের ট্রাকটা সেই পাহাড়ের ওপর দিয়ে পাকদণ্ডি পথ বেয়ে চলেছে। কিন্তু পাহাড়ের ওপরও এত জোরে ছুটছে কেন ট্রাক?

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ যাবার পর একসময় ট্রাকটা এক জায়গায় এসে থামল।

লুঙ্গিপরা দু'জন লোক এসে উঁকি মেরে দেখল ওকে। তারপর বলল, আরে তুমি বসে আছ? আমরা তো ভাবলাম মরেই গেছ তুমি।

দীপংকর লোকদুটোকে ভাল করে দেখে বুঝল বর্ন ক্রিমিন্যাল বলতে যা বোঝায়, এরা ঠিক তাই। কিন্তু এরা কারা? ওকে ট্রাকে করে এখানে নিয়ে এল কেন? কী ওদের অভিপ্রায়?

দীপংকর বলল, আমি কোথায়?

তুমি এখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে। তা কাল হঠাৎ কী হয়েছিল? পকেট মেরেছিলে কারও? না হলে, সন্ধেরাতে অমন করে ছুটছিলে কেন? সময়মতো ব্রেক না কষলে যে গাড়ির চাকায় চেপটে যেতে বাবা। অযথা আমরা খুনের দায়ে দায়ী হতাম। আমি বাইশ বছর স্টিয়ারিং ধরছি, এখনও পর্যন্ত চাপা দিইনি কাউকে। শুধু তুমিই আমার বদনাম করে দিচ্ছিলে। বেশ ছেলে যা হোক।

দীপংকর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল লোকটির মুখের দিকে।

আর একজন বলল, চেয়ে দেখছ কী? এবার নেমে পড়ো। এখানে ঝরনার জলে মুখহাত ধুয়ে যা হোক কিছু খেয়ে নাও। আমরা তো ভেবেছিলাম লরির ধাক্কায় শেষই হয়ে গেছ। ওই জন্যে তুলে নিয়ে চলে এলাম। ভেবেছিলাম ডেড বডিটা পাহাড়ের জঙ্গলে যেখানে হোক ছুড়ে ফেলে দেব। তা যখন বেঁচেই গেছ তখন এসো। এসে কিছু মুখে দাও।

ওরা দীপংকরকে ট্রাক থেকে নেমে আসতে সাহায্য করল।

একজন বলল, তোমার নাম কী?

দীপংকর বলল, নাম কী? কী জানি। নাম কী আবার?

সে কী! নাম কী জান না? রাম, শ্যাম, যদু, মধু— এই হচ্ছে নাম। যেমন আমার নাম কালনেমি, ওর নাম ময়নিহান। তেমনি তোমার নাম?

আমার কোনও নাম নেই।

ময়নিহান হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, বল না ব্যাটা তোর নাম রাজকাপুর।

কালনেমি বলল, সত্যিই তোর কোনও নাম নেই? নাকি নকশা করছিস?

সত্যি বলছি আমার কোনও নাম নেই।

তোর বাবার নাম? বাবার নাম খগেন, না অন্য কিছু? মনে পড়ছে?

কে আমার বাবা?

আরে যে তোকে জন্ম দিয়েছে। তোর মা আছে? না কি মাও নেই। বল এবার আপনা থেকে কুমড়োর মতো খেত-এ গজিয়েছিস?

দীপংকর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমার কিছু মনে নেই। আমি কিছু মনে করতে পারছি না। তোমরা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

কালনেমি বলল, হুঁ। বুঝেছি। কাল রাতের কথা তোর কিছু মনে পড়ে?

না আমার কিছু মনে পড়ছে না। কিছু মনে নেই আমার। আমি কোথায় ছিলাম, আমার কে কে ছিল, কিছুই মনে নেই।

অ। তা এবার একটু মনে কর দিকিনি এই ট্রাকে তুই এলি কী করে? মনে কর।

তাও মনে নেই।

সে কী রে! আমরা কে বল তো?

জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।

কালনেমি আর ময়নিহান একটু সরে গিয়ে বলাবলি করতে লাগল, মনে হচ্ছে ছেলেটার স্মৃতি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ওর তো কারও কথাই মনে নেই।

ময়নিহান বলল, বাঁচা গেছে। আমাদের ট্রাকেই যে ও ধাক্কা খেয়েছে এটা তা হলে ও জানবে না। ও শুধু আমাদের দু'জনকে ওর উদ্ধারকারী বলেই ভাববে।

ভুল হল। যেখানকার জিনিস সেখানে ফেলে রেখে এলেই হত। কোনও ঝামেলাই থাকত না তা হলে।

ঝামেলা থাকত না মানে? রাস্তায় এ অবস্থায় ছেলেটাকে ফেলে রাখলে দারুণ হইচই হত। কাছেপিঠে কোনও পুলিশের গাড়ি থাকলে তাড়া লাগাত আমাদের।

এখন তা হলে কী করবি ছেলেটাকে নিয়ে?

কী আবার করব? কাছাকাছি কোথাও লোকালয় দেখে ছেড়ে দেব। না হলে কে হুজ্জোতি পোহাবে? ওর বাবা-মা কি এতক্ষণে থানা-পুলিশ করেনি ভেবেছিস? চারদিকে খবর চলে গেছে হয়তো।

দীপংকর তখন পাশেই একটি ঝরনার জলে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে নিল।

এইখানে এক জায়গায় পাহাড়ের কোলে ঘন জঙ্গলের ধারে ছোট্ট একটি চায়ের দোকান ছিল! ছিটে বেড়ার ঘর। দোকানে নেড়ো বিস্কুট, আর চা ছাড়া কিছুই নেই। মুড়ি হয়তো আছে। দোকানের লোকটি বেসন ফ্যানাচ্ছে, গরম কিছু ভাজি তৈরি করবার জন্য।

কালনেমি আর ময়নিহান কাঁধে গামছা নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। দোকানিকে বলে গেল দীপংকরের দিকে নজর রাখতে এবং একটু কিছু দিতে।

দীপংকর চা-দোকানের বেঞ্চিতে বসে এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। কী সুন্দর সকাল। বুনো গাছ-গাছালির সবুজ পাতার কী চমৎকার গন্ধ। আর কত যে পাখি ডাকছে গাছে। ওটা কী পাখি, ঠিক টিয়ার মতো দেখতে, লম্বা লেজ আর ঘন নীল গায়ের রং। মাথার কাছটা বাদামি।

দোকানদার বলল, কী খোকাবাবু। মুলুক কাঁহা? কাঁহা সে ভাগাকে লে আয়া এ লোক?

দীপংকর বলল, জানি না। আমার কিচ্ছু মনে নেই। আমি কিছু মনে করতে পারছি না।

এ কেয়া বাত! কুছ ইয়াদ নেহি?

না। আমার বাবা-মা কাউকে মনে পড়ছে না। কোথায় ছিলাম তাও মনে নেই।

হুঁ। তো এ দোনো বদমাশ কো কাঁহা মিলা?

তাও মনে নেই।

কুছ ইয়াদ নেহি আয়েগা তো ক্যা কিয়েগা? ক্যায়সে ঘর যাওগে তুম?

দীপংকর বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দেবে?

হাঁ হাঁ জরুর দেগা। বইঠো। চা পিয়োগে?

হ্যাঁ।

লোকটি তাড়াতাড়ি টিনের বাক্স থেকে মুড়ি বার করে, একটু চানাচুর মিশিয়ে ওকে খেতে দিল। ততক্ষণে পিঁয়াজি ভাজা শুরু হয়ে গেছে। পিঁয়াজি ভাজা হলে তাও দিল শালপাতার ঠোঙায় করে।

দীপংকর খেতে খেতে বলল, আচ্ছা আমি এখন কোথায়?

তুমি এখন ছোটনাগপুরের জঙ্গলে।

ছোটনাগপুর! সেটা কোথায়?

সেটা এইখানে। তুম পড়িলিখি লেড়কা। ছোটনাগপুর মালুম নেহি? সিংভূম জিলা। ঘাটশিলা হিঁয়াসে দু' মিল।

ঘাটশিলা দু' মাইল!

হাঁ।

এমন সময় কালনেমি আর ময়নিহান ফিরে এল। এসে বলল, কীরে ছেলে, ঘরবাড়ির কথা কিছু মনে পড়ছে?

না।

তোকে আমাদের ট্রাকে কে উঠিয়েছিল?

বলছি তো আমার কিচ্ছু মনে নেই।

ঠিক আছে। ওসব কথা মনে না-থাকাই ভাল। তা এখন কী করবি ঠিক করেছিস? আমরা তোকে এইখানেই ছেড়ে দেব। দিনের আলোয় তোকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেব না আমরা।

আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।

আমাদের সঙ্গে তো অনেকদূর এসেছ বাবা। এবার এখানেই থেমে থাকো, আর বেশি এগিয়ো না। আমরা ভাল লোক নই। বুঝলে?

দীপংকর চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে বলল, কে বলে তোমরা ভাল লোক নও? তোমরা খারাপ লোক হলে তো আমাকে মেরেই ফেলতে!

ময়নিহান বলল, অ্যা-অ্যা-অ্যাই দেখো। এসব কী উলটোপালটা বলে রে পাখি। ওরে আমরা হলুম জেল-ভাঙা কয়েদি। আমাদের কাজ হল লুটমার করা, মানুষের বুকে ছুরি মারা, আর চোরাই মাল পাচার করা। এখন আমরা অনেক দূর যাব। চক্রধরপুর থেকে মাল নিয়ে চাঁইবাসা। তারপর সেখান থেকে চলে যাব রাঁচিতে।

বলো কী! আবার কবে ফিরবে?

আমাদের ফেরার কোনও দিনক্ষণ নেই। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যদি ধরা না-পড়ি তা হলে তিনদিন পর। আর ধরা পড়লে দশ বছর জেলের ঘানি টেনে তারপর।

দোকানদার কালনেমি ও ময়নিহানকে গরম গরম পিঁয়াজি দিয়ে চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিল।

ময়নিহান বলল, ঠাকুর সিং?

দোকানদার বলল, বোলিয়ে।

ছেলেটাকে রাখবে তোমার কাছে?

জরুর। লেকিন কুছ ঝামেলা হো যায়েগা তো?

কুছ নেহি হোগা বাবা। কিছু হলে বলবে কোথা থেকে কীভাবে এসেছে তুমি কিছুই জান না। তুমি শুধু ওর আশ্রয়দাদা।

কালনেমি ও ময়নিহান চা খেয়ে গাড়িতে উঠে বসল। তারপর গাড়ি স্টার্ট করার আগে দশটা টাকা বার করে দীপংকরের হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখো তোমার কাছে। কিছু কিনে খাবে। সব যখন ভুলে মেরে দিয়েছ তখন তোমার দুর্গতি দূর করে কে? ছিলে আদরের দুলাল। এখন রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষে করো। বলে চলে গেল ওরা।

দীপংকরের ইচ্ছে ছিল না টাকা নেবার। তবু ও নিল, না-নিলে চলবে কেন? ওর পকেটে তো মাত্র দুটো টাকা পড়ে আছে। এতে কী হবে? কাল রাত থেকে খাওয়া নেই। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে একেবারে। এখন দু'মাইল হেঁটে

ঘাটশিলায় পৌঁছোতে পারলে নিশ্চয়ই কোনও খাবার হোটেল পাওয়া যাবে।

ওকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ঠাকুর সিং বলল, আভি তুম ক্যা করোগে কুছ সোচা?

কী আর করব?

যাও দিন ভর ঘুমো। লেকিন স্যামকো হিঁয়া চলি আনা, সমঝা?

দীপংকর বলল, হ্যাঁ। তা আমি একবার ঘাটশিলায় যেতে চাই। কোনদিক দিয়ে যাব?

ইয়ে রাস্তা চলা গিয়া।

দীপংকর বলল, ঠিক আছে ঠাকুর সিং। আমি যাচ্ছি। সন্ধেবেলা যদি কোথাও থাকার জায়গা না পাই তো, আপনার এখানেই চলে আসব।

এমন সময় হঠাৎ একটা মারুতি গাড়ি উলটো দিক থেকে এসে ব্রেক কষল দোকানের সামনে। ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে বললেন, কুছ খবর আয়া ঠাকুর সাব?

নেহি আয়া।

গাড়িটা স্টার্ট দিতে যাবে এমন সময় ঠাকুর সিং বলল, এ লেড়কা কো ঘাটশিলা পর ছোড় দেনা লালজি, থোড়া সা মেহেরবানি।

আরে মেহেরবানিকা কোই বাত নেহি। আও বাচ্চে।

দীপংকর বেশ প্রফুল্ল চিত্তে মারুতির ভেতরে ঢুকে বসল। ঠাকুর সিং হাত নেড়ে বিদায় জানাল দীপংকরকে।

মিনিট দশেকেরও কম সময়ের মধ্যে মারুতি গাড়িখানা ঘাটশিলায় এসে পৌঁছল। একেবারে স্টেশনের সামনে নামিয়ে দিয়ে আবার হুশ করে চলে গেল মোটরখানা।

দীপংকর প্রথমেই একটা বাঙালির খাবারের দোকানে গিয়ে ঢুকল। এখানে নিশ্চয়ই খবরের কাগজ থাকবে। আর সেই খবরের কাগজের প্রথম পাতাতে নিশ্চয়ই থাকবে গত সন্ধ্যার ওর ওই কু-কীর্তির কথা।

কিন্তু যা ভাবল তা হল না। পেট ভরে কচুরি-মিষ্টি খেয়ে যখন খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাল, তখন দেখল এর সবক'টি খবরই ওর পড়া। অর্থাৎ এ কাগজ কালকের। আজকের কাগজ আসতে সেই বেলা দশটা। হাওড়া থেকে ইস্পাত এক্সপ্রেস এসে না-পৌঁছুনো পর্যন্ত কাগজ পাওয়া যাবে না।

যাক এখনও কিছু সময়ের জন্য নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। কেন না ওর ওই হত্যাকাণ্ডের কথা এখানকার লোকদের জেনে ফেলার এখনও অনেক দেরি আছে।

খুব চালাকি করে হাবাগোবা সেজে অভিনয় করে পার পেয়েছে ও কালনেমি

আর ময়নিহানের হাত থেকে। এমনকী ঠাকুর সিংকেও জানতে দেয়নি ওর আসল পরিচয়। কী দরকার। অচেনা পরিবেশে ছদ্মবেশই ভাল। না হলে কে কখন গিয়ে টুক করে পুলিশের কানে খবরটা তুলে দেয় তার ঠিক কী? এখন সমস্যা যেটা দাঁড়াল সেটা হল ও তো এখানে মানিলেস। সামান্য এই ক'টা টাকায় ও কী করবে। এ যা টাকা এতে ওর একটা দিন চলবে খুব জোর, কিন্তু তারপর? তারপর কোথা যাবে? কী খাবে? কী করবে? ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারাই পেল না ও। পুলিশের ভয়ে একবস্ত্রে পালিয়ে এসেছে।

যাই হোক। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে একটা নদী দেখতে পেল ও। কী চমৎকার সব পাথর, যেন বাসুকি নাগের মতো ফণা উঁচিয়ে আছে নদীর গর্ভে। এমন ও কখনও দেখেনি। কাচের মতো স্বচ্ছ নদীর জলধারা। বালিতে অভ্রেণু চিকচিক করছে। একজনকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, এই নদীর নাম সুবর্ণরেখা। ছোটনাগপুরের পাহাড়মালা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই নদী। এই নদীর বালিতে সোনার রেণু আছে।

হঠাৎ ও দেখল দু'জন লোক ছোট কুলোয় করে বালি ছেঁকে ছেঁকে কী যেন তুলছে।

ও কাছে গিয়ে বলল, বালিতে তোমরা কী খুঁজছ গো?

আমরা সোনা খুঁজছি।

সোনা খুঁজছ!

হ্যাঁ গো। আমরা হলুম সোনাখোঁচা। এই থেকেই ছেঁকেছুঁকে আমরা সোনার রেণু বার করব। তারপর সেগুলো জমিয়ে বিক্রি করব বাজারে।

দীপংকর বলল, সব নদীতেই কি সোনা পাওয়া যায়? আমাদের দেশেও তো নদী আছে। কই সেখানে তো কেউ সোনা খোঁজে না।

একজন হেসে বলল, সব নদীতে যে সোনা মেলে না বাবা। এ যে সোনার নদী। তাই এখানে মেলে।

দীপংকরের বুকের ভেতরটা যেন কীরকম করে উঠল। বলল, সোনার নদী! এই তা হলে সেই কল্পনার সোনার নদী। অর্থাৎ যে নদীতে সোনা পাওয়া যায়?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সোনার নদী সুবর্ণরেখা।

দীপংকর অবাক হয়ে গেল। ওর জেঠু তা হলে মিথ্যে কিছু লেখেননি। বাড়িয়েও কিছু না। সোনার নদী তা হলে সত্যিই আছে।

লোকটি বলল, কী নাম তোমার খোকাবাবু?

আমার নাম? আমার নাম সোনাচাঁদ।

সুনাচাঁদ? বাঃ বেশ নাম তো?

তোমার নাম কী?

আমার নাম হাঁসুলি।

কোথায় ঘর তোমার?

আমার ঘর নদীর ওপারে! ওই যে দেখছ পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের ভেতরে ছোট্ট গ্রামখানা ওই গ্রামেই আমার বাড়ি।

আমাকে নিয়ে যাবে তোমার বাড়িতে?

কেন গো বাবু? আমার বাড়ি গিয়ে কী করবে? গরিব লোক আমি। মাটির ঘরে থাকি। তোমাকে বসতে দেব কোথায়?

যেখানে হোক দিয়ো। তবু আমি তোমার সঙ্গে যাব।

তোমার মা-বাবা বকবেন না?

তাঁরা কেউ নেই এখানে। আমি একা।

সে কী! বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ নাকি তুমি?

দীপংকরের চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল একবার। বলল, হ্যাঁ। পালিয়েই এসেছি।

কেন পরীক্ষায় পাস করতে পারনি?

তা নয়, আসলে আমার সৎ মা তো। মারধোর করেন খুব।

তা বেশ করেছ। সৎ মায়ের মার খাওয়ার চেয়ে ঘর থেকে পালিয়ে আসা বরং ভাল। জীবনে দাঁড়াতে পারবে। বাড়ি কোথায় তোমার?

বর্ধমানে।

বর্ধমানের কোন জায়গায়?

বসিরহাটে।

বসিরহাটে? বর্ধমানে আবার বসিরহাট কোথায় পেলে গো? বসিরহাট তো চব্বিশ পরগনায়।

আছে আছে। বর্ধমানেও আছে। যেমন ধর্মতলা কি শুধু কলকাতায়? ধর্মতলা সব জায়গাতেই আছে।

লোকটি বলল, তুমি তা হলে সত্যিই আমার বাড়িতে যাবে খোকাবাবু?

হ্যাঁ যাব।

চলো তবে।

কী বিচ্ছিরি কালো ভূতের মতো চেহারা লোকটার। অথচ কী চমৎকার কথাবার্তা। একটা যাত্রীবাহী নৌকোয় দীপংকরকে উঠিয়ে নিজে ছাঁকনি জাল আর মাটির হাঁড়ি নিয়ে অদ্ভুত কায়দায় সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে উঠল। এ নদীতে জল খুব কম। কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক কোমর, কোথাও বা এক বুক জল। ...তার বেশি নেই। তবুও পারাপারের জন্য নৌকা বাওয়া।

নৌকা ওপারে ভিড়তেই মাঝির হাতে দশটা পয়সা দিয়ে দিল দীপংকর।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল, না না। পয়সা দিয়ো না। এ নৌকা আমার, আর ওই মাঝি আমার ছেলে।

দীপংকর অবাক। এই বাপ আর ওই ছেল! ছেলের হাতে দামি রিস্টওয়াচ। নৌকার খোলের মধ্যে ট্রানজিস্টার বাজছে। টেরিকটের পায়াগুটোনো প্যান্ট পরে আছে। আর পরে আছে নাইলনের গেঞ্জি। বেশ নধর গড়নের সুঠাম দেহ। কত তফাত।

ওপারে নেমে বড় বড় ঘাসের বন, নল খাগড়া, কাশ ইত্যাদি ঠেলে উঁচু ডাঙায় উঠল ওরা। পাহাড়ি গাছপালা, বুড়ো মহুয়া, বেঁটে পলাশ সবই আছে ওখানে। ছোট ছোট টিলা দু'-একটা পেরিয়ে একটি ছোট্ট গ্রামে গিয়ে ওরা পৌঁছুল। গ্রামটি আদিবাসীপ্রধান। নিকানো মুছানো একটি উঠোনে দাঁড়িয়ে এক বুড়ি অপলকে তাকিয়ে রইল দীপংকরের দিকে। মাঠের রাখালরা লাঠির ওপর ভর দিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। চাইবে নাই বা কেন? ওই কালো কুচ্ছিত সোনাখোঁচাটার সঙ্গে এমন টুকটুকেপানা ছেলেকে দেখলে বিস্ময় না-হবেই বা কার? শুধু মানুষ কেন, গোরুগুলো পর্যন্ত এই পাথর-কাঁকরের দেশে খুঁজে পেতে যে দু'-এক কল ঘাস মুখে পুরেছিল, তারাও এই অচেনা কিশোরকে দেখে ঘাস চিবোতে ভুলে গেল যেন। মুখের ঘাস মুখেই রইল তাদের।

দীপংকর যে সোনাখোঁচাটার সঙ্গে গিয়েছিল, আগেই বলেছি তার নাম হাঁসুলি। রাঙা মাটির নিকোনো মুছানো উঠোনের এক প্রান্তে খড়ের ছাউনি দেওয়া হাঁসুলির ঘর।

হাঁসুলির বউ দাওয়ায় বসে রান্না করছিল। অবাক হয়ে বলল, ই ছেইলেটো কে বটেক?

হাঁসুলি বলল, একটা ছেইলে বটেক। বাপ-মায়ের ওপর রাগ করে পালিয়ে এসেছে। দুটি ভাত খাবে। দু'-একদিন থাকবে। তারপর চলে যাবে।

হাঁসুলির বউ বলল, কী নাম গো তোমার?

আমার নাম সোনাচাঁদ।

তা সুনাচাঁদের মতোই দেখতে বটে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ? মা-বাবা কাঁদবে না?

দীপংকর বলল, না! আমার তো সৎ মা। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে।

ও বুঝেছি। তা দেখো আমাদের এখানে দু'দিন থেকে। থাকতে পারো কি না।

দীপংকর বলল, হ্যাঁ পারব।

হাঁসুলির বউ তখনই ওকে মুখহাত ধোবার জল দিল। তারপর মুড়ি আর পিঁয়াজকুঁচো একটা বাটিতে করে খেতে দিল।

দীপংকর সেই খেয়ে, এক গেলাস জল খেতেই তৃপ্তিতে ভরে উঠল ও। কী সুন্দর জলের স্বাদ এখানকার! এমন জল তো হাওড়ায় নেই।

দীপংকর দেখল হাঁসুলি যে সোনামাখা বালি কুড়িয়ে এনেছিল সেগুলি খুব যত্ন করে একটি বাঁশের চোঙায় ভরে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল।

হাঁসুলির বউ বলল, তা সুনাচাঁদ। তোমরা কী জাত গো বাবা?

আমরা বামুন।

ও মা গো। তা আমাদের রাঁধা ভাত তুমি খাবে?

কেন খাব না?

আমরা যে জাতিতে ঝোরা। ওই ও বাড়ির ওরা হচ্ছে গণ্ড। আমরা হলুম সবচেয়ে ছোট জাত।

দীপংকর বলল, কে বলল? মানুষের একটাই জাত। সে জাত হল মানুষ।

হাঁসুলির বউ গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল দীপংকরকে। দীপংকর লাফিয়ে উঠল, এ কী করছেন! আমি আপনার ছেলের মতো।

তা হোক বাবা। তুমি বামুনের ছেলে। দেবতা। আমাদের কত ভাগ্য যে, আজ তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছ। তা বাবা একটা কথা বলি। ডিম খাও তুমি?

আমি সব কিছুই খাই।

হাঁসুলিও তখন পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে দু' পা ছড়িয়ে মুড়ি খেতে বসেছে।

দীপংকর বলল, আচ্ছা ওই সোনা তোমরা বালি থেকে ছেঁকে বার করবে কী করে?

সে অনেক হেফাজত গো। ছোট ছেলে তুমি। ওসব বুঝবে না। তবু লেখাপড়া জানা ভাল ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে তো, তাই বলছি তোমাকে। বিশেষ করে তোমার যখন জানবার এত ইচ্ছে, তখন শোনো। প্রথমে আমরা সোনার রেণু মাখা বালি নদী থেকে অথবা পাথরের গা থেকে চেঁচে নিয়ে কুলোর মতো একটা পাত্রে রেখে বড় বড় পাথর ঢ্যালা কাঁকর বেছে ফেলে দিই। তারপর সেই কুলোটা নেড়ে চেড়ে ছোট কাঁকর ও অন্য পদার্থগুলো ফেলে দিই! এরপরে যে বালিটা পড়ে থাকে তাকে বেশ ভাল করে ধুয়ে নিই। এইভাবে বার বার ধুতে ধুতে কাদা-কাঁকর সব যখন ধুয়ে যায়, তখন কালো কালো বালি সামান্য কিছু পড়ে থাকে। তারই মাঝে মাঝে সোনার রেণুগুলো আমরা আলাদা করে নিই।

হাঁসুলির বউ বলল, তবে কী জানো বাবা, এতে আমাদের মজুরি পোষায় না। এই মানভূম সিংভূম অঞ্চলের সোনাখোঁচাদের তাই দুঃখের শেষ নেই। কাজেই তিনশো বছর আগেও আমাদের যে অবস্থা ছিল। আজও তাই আছে।

হাঁসুলি বলল, শুধু উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে কত সোনা নষ্ট হয় এখানে। অথচ এই নদী সোনার নদী। এত সোনা এখানে আর কোথাও নেই। আর আছে

আসামে। তবে ওখানকার ব্যবস্থাও ভাল। সেখানে যে নদীতে সোনা আছে, তার ধারে ধারে গড়ে উঠেছে সোনাখোঁচাদের বাস।

দীপংকর বলল, আচ্ছা, কোথায় সোনা আছে ওরা খোঁজ পায় কী করে?

এমন কিছু শক্ত নয়। সোনাখোঁচারা ঘুরে বেড়ায়। নদী যেখানে হঠাৎ বেঁকে গেছে, বা স্রোত খুব দ্রুত এবং পাড় উঁচু ও ভাঙা ভাঙা, তার অপর পাড়ে প্রচুর সোনা পাওয়া যায়। অবশ্য প্রথমে বাঁশে করে নদী থেকে কতকটা বালি তুলে তাইতে সোনা আছে কি না দেখতে হয়। সেই বালিতে দশ বারোটা সোনার রেণু চিক চিক করলেই বুঝে নিতে হবে এতে সোনা আছে। এরপর নদীর ওপর একটা বাঁধ দেওয়া হয়। এবং মনোনীত জায়গাটির ওপর দিয়ে বয়ে যেতে দেওয়া হয় স্রোতকে। এইভাবে স্রোতে কাদা প্রভৃতি ময়লা পদার্থগুলি ধুয়ে গেলে দেখা যাবে, সোনার রেণু মাখা বালি তলায় চিক চিক করছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানকার নিয়মের চেয়ে ওখানকার ওই নিয়মে অল্প মেহনতে ওইরকম পরিষ্কার সোনামাখা বালি পেয়ে যাচ্ছে ওখানকার লোকেরা।

দীপংকর বলল, ওই নিয়ম এখানে খাটে না?

না। এখানে সে সুবিধে নেই।

তারপর?

তারপর ওরা করে কী সেই বালি চেঁচে একটা বাঁশের চালুনির ওপর জমা করে। এবং লাউয়ের খোলায় করে তার ওপর ধীরে ধীরে জল ঢালতে শুরু করে, আর নাড়তে থাকে চালুনিটাকে। তার ফলে সোনামাখা বালি ধুয়ে নীচের একটি পাত্রে পড়ে। অবশ্য অল্প কাঁকর-পাথর যা থাকে সেগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়। এইভাবে এক এক খেপে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ঝুড়ি বালি ধোয়া হয়। এইবার এই ছাঁকা বালিতে পারা মিশিয়ে দেওয়া হয়। পারা দিলেই সোনার রেণুগুলো জড়িয়ে যায় পারার গায়ে। তখন এতে অল্প অল্প ঢাললেই সেই বালি ধুয়ে যায় এবং পারামাখা সোনা আলাদা হয়ে যায়।

দীপংকর বলল, বাঃ বেশ মজা তো। কিন্তু পারা থেকে সোনাগুলোকে বার করে কী করে?

আর কোনও অসুবিধে নেই। সেই পারামাখা স্বর্ণখণ্ড এক-একটা শামুকের ভেতরে রেখে সেগুলো আগুনে পোড়ালেই শামুক পুড়ে চুন হয়ে যায়, আর পারা উঠে গিয়ে সোনাটা বিশুদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে।

দীপংকর বলল, ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। না হলে এসবের কিছুই তো জানতাম না আমি।

হাঁসুলি বলল, আজকাল লোকজন বড় খারাপ হয়ে গেছে বাবা। তাই এ কাজে

আর আনন্দ নেই। এই সোনা সোনা করে কত যে মারপিট, দাঙ্গা, খুন-খারাপি হয়ে চলেছে তা কী বলব।

দীপংকরের চোখদুটো যেন কীসের আশায় চকচকিয়ে উঠল! ওর তিমিরাবৃত মনে সামান্য একটু আলোকপাত হল যেন। ওর জেঠুও তো খুন হয়েছেন এই সোনা সোনা করেই। এই সোনার জন্যই তো গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে। দীপংকর তাই অবাক হয়ে বলল, এই সামান্য একটু সোনার জন্য খুন!

সামান্য সোনা নয় খোকাবাবু। এই নদী, ওই দূরের পাহাড় এসব হল স্বর্ণ-প্রসবিনী। ওই যে দেখছ পাহাড়গুলো, ওই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সোনা। ওইসব সোনাই তো বৃষ্টির জলে ধুয়ে বয়ে আসে নদীর স্রোতে।

ওই পাহাড়ে যদি অত সোনা তো তোমরা এত কষ্ট করে নদীর বালি ঘেঁটে সোনা বার করো কেন?

এই দেখো। আমরা যে হলাম সোনাখোঁচার জাত। গণ্ড, ঝোরা। আর ওই পাহাড়ে সোনা নিতে গেলে পাহাড়িরা তা নিতে দেবে কেন?

ওই পাহাড়ে অনেক সোনা!

অনেক! সোনার গুহা পর্যন্ত আছে।

বলো কী। সোনার গুহা! তা যদি সত্যি হয় তা হলে গভর্নমেন্টের লোকেরা এসে ওইসব সোনা নিয়ে যায়নি কেন?

আরে সবাই কি সন্ধান জানে? ওই সন্ধান জানতে গিয়েই তো সেবার এক বাঙালিবাবু গভীর রাতে খুন হয়ে গেল। সোনার সন্ধান কেউ পেলে তার আর রক্ষে নেই। ওখানকার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে ফেলবে।

দীপংকর বললে, উঃ কী ভয়ানক।

হাঁসুলি বলল, সোনা যদি লোহার মতো সস্তা হত, তা হলে খুনখারাপি কিছুই হত না। ওই বাঙালিবাবু ছিলেন স্বর্ণ-সন্ধানী। পাহাড়ে-জঙ্গলে শুধু ঘুরতেন, আর সোনা খুঁজে বেড়াতেন।

দীপংকর বলল, আচ্ছা ওই পাহাড়ে আমি যেতে পারি না?

কেন পারবে না? তবে ওই পাহাড়গুলো এখান থেকে কাছে মনে হলেও ওগুলো কিন্তু অনেক দূরে। তা ছাড়া ওই পাহাড়ে গেলেই যে তুমি সোনা দেখতে পাবে তা তো নয়! কোথায় সোনা লুকিয়ে আছে খুঁজে বার করতে হবে। দুই পাহাড়ের মাঝের খাঁজে পাথরের মধ্যে সোনা থাকে। কালক্রমে যে পাথরে সোনা থাকে সেই পাথর পচে বর্ষার জলে নদীতে গিয়ে পড়ে। কোয়ার্টজ নামে এক ধরনের পাথরের মধ্যেই শুধু সোনা দেখতে পাওয়া যায়। এই পাথরের খাঁজে খাঁজে যেখানে সোনা থাকে তাকে স্বর্ণশিরা বলে। যে কোয়ার্টজ পাথরের

খাঁজে সোনা থাকে, সেখানে শুধু কোদাল দিয়ে খুঁড়েই কত লোক বড়লোক হয়ে গেছে। ওই পাহাড়ে কখনও গেলে দেখবে কূপের মতো বড় বড় গর্ত। তা প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাতের মতো গর্ত অনেক আছে। বহুকাল থেকেই মানুষ ওইখান থেকে সোনা সংগ্রহ করছে। এক এক জায়গায় সেই গর্ত এত বেশি যে, সেখানে বড় বড় গুহার সৃষ্টি হয়ে গেছে।

দীপংকর বলল, আমি যাব।

হাঁসুলি বলল, খবরদার খোকাবাবু! ওই কাজটি কোরো না।

কেন করব না?

ওখানকার লোকজন ভাল নয়। তা ছাড়া বড় বড় ডাকাতের ঘাঁটি ওখানে। কাজেই সোনার সন্ধানে ওখানে গেলে কেউ ফেরে না।

দীপংকর বলল, আচ্ছা সেই যে বাঙালিবাবু খুন হয়েছেন বললে, ওই বাঙালিবাবুর নাম কী জান?

না বাবু। নাম জানি না। ওই বাঙালিবাবুর একটা এদেশি চাকর ছিল। সেও আধা খুন হয়ে গেল। তবে প্রাণে বেঁচেছে সে লোকটা।

লোকটা কোথায় থাকে।

ও থাকে বাসাডেরা গ্রামে। ওর নাম ইকলু।

এমন সময় খাবারের ডাক পড়ল। হাঁসুলির বউ দাওয়ায় চাটাইয়ের আসন পেতে কলাইয়ের থালায় লাল মোটা চালের ভাত, ডাল, পোস্ত আর ডিমের ঝোল খেতে দিল দু'জনকে।

দীপংকরের দারুণ খিদে পেয়েছিল। তাই সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিল সেই ভাত, তরকারি। এরপর বিশ্রাম। একটি ছোট্ট টিলার গায়ে গাছের ছায়ায় শুয়ে শুয়ে দীপংকর ঠিক করে নিল আর এখানে নয়। বেলা পড়ে আসছে। ওকে যেভাবেই হোক ঠাকুর সিং-এর আস্তানায় গিয়ে পৌঁছতেই হবে। কেন না ওই পাহাড় জঙ্গল ওইখান থেকেই তো শুরু। ওখানে থাকলে ওর অভিযান খুবই সহজ হয়ে উঠবে। ওই জঙ্গল ভেদ করে পাহাড় টপকে ও যেভাবেই হোক পৌঁছে যাবে বাসাডেরায়। ইকলুদের গ্রামে। আর সেখানে গিয়ে ইকলুকে খুঁজে বার করতে পারলেই ও অনেক কথা জানতে পেরে যাবে।

একটা খুন তো নিজের অজান্তেই হয়ে গেছে। পুলিশের খাতায় ওর নাম নিশ্চয়ই জ্বলজ্বল করছে এতক্ষণে। আর কয়েকটা খুন ওকে করতে হবে। ওর প্রথম টার্গেট কুন্দনলাল। যে ওর বাবাকে ভয় দেখিয়েছিল, যার জন্য টাটানগরের ওই বাড়িতে ওরা যেতে পারছে না। যে ওর বাবাকে সাকচি বাজারে মোটর বাইক চাপা দিতে গিয়েছিল। যদিও এ কাজ যে কুন্দনলালেরই তার কোনও প্রমাণ নেই, তবুও ওর মন বলছে এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। কেন না জেঠু

তো লিখেইছেন, 'শয়তানের মৃত্যু নেই। ওর হাতে হয়তো আরও অনেকের মৃত্যু আছে।' দীপংকরের স্থির বিশ্বাস ওর জেঠুর হত্যাকারীও কুন্দনলাল ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু কীভাবে ধরা যায় লোকটাকে? এবং কী কৌশলে ওকে বধ করা যায়? ও তো নিরস্ত্র। আর যা কিছুই করুক না কেন, সবকিছুই করতে হবে ওকে খুব তাড়াতাড়ি। কারণ হত্যাকারীকে না-পেলে ওয়ারেন্ট বেরোবেই এবং যেখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকুক না ও, পুলিশ ওকে ধরবেই। তবে ভগবান সহায় তাই ও এইখানে অর্থাৎ এই সোনার নদীর দেশেই এসে পৌঁছেছিল। এই কথাটা মনে হতেই কেমন যেন শিহরিত হয়ে উঠল দীপংকর। তবে কি সত্যি সত্যিই ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখানে এসেছে? না হলে ওর হাতে একটা মানুষ খুনই বা হল কেন? কেনই বা পালাতে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটল? আর ঘটল যখন, তখন ওরা ওকে ট্রাকে না-তুলে রাস্তাতেই বা ফেলে দিয়ে এল না কেন? এবং এল যখন এই সোনার নদীর দেশে কেন? আসানসোল, দেওঘর অথবা বালেশ্বর, খুরদার দিকেও তো যেতে পারত? কিন্তু তা যখন হয়নি এবং ওর নিয়তিই যখন ওকে এই সোনার নদীর দেশে নিয়ে এসেছে, তখন তাঁর অভিপ্রায় কিছু একটা আছেই। অতএব হার ও মানবে না। 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'র মতন ও-ই হয়তো ওর জেঠুর হত্যাকারীদের ব্রহ্মাস্ত্র।

দীপংকর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর এইসব ভাবনাচিন্তা করে হাঁসুলির কাছ থেকে বিদায় নেবে বলে আবার ওদের ঘরে এল।

হাঁসুলির ছেলে, মানে সুবর্ণরেখার সেই মাঝি তখন খেতে বসেছে। খেতে খেতেই সে বলছে, আমি বলি কী, চুপি চুপি ওকে পুলিশের হাতে তুলে দাও। না হলে পরে ঝামেলা হলে আমাদেরই কোমরে দড়ি পড়বে।

হাঁসুলি দাওয়ায় শুয়ে বলছে, তাই কী হয়? তার চেয়ে পরশু তো আমি কলকেতা যাব। তখনই না-হয় ওর বাড়িতে একটা খবর দেব?

আরে এটা বুঝছ না কেন? ওর বাড়ির লোকে কি থানা-পুলিশ করেনি? তার ওপর এখানে চারদিকে টি টি পড়ে গেছে, একটি ভদ্দর লোকের ছেলে আমাদের বাড়ি এসে উঠেছে বলে। এখন পুলিশের কানে গেলে কী অবস্থা হবে? তার চেয়ে এখনও সময় আছে। যদি বাঁচতে চাও তো পুলিশে খবর দাও। না হলে ছেলে চুরির দায়ে ফাঁসবে একথা কিন্তু বলে দিলাম।

পুলিশের নাম শুনেই ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল দীপংকরের। সর্বনাশ! এরা যদি পুলিশ ডাকে এবং ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, তা হলে তো সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কেন না এখানকার পুলিশ ওকে আটক করেই খবর দেবে বেঙ্গল পুলিশকে। আর তারপরই জেল, হাজত, ফাঁসি।

দীপংকর এক মুহূর্তও আর রইল না সেখানে। সামান্য একটু পিছু হটে এসে

নদীর পথ ধরল। ওর ইচ্ছে হল পালাতে। কিন্তু তা সে করল না। কেন না ছুটতে গেলেই ও পালাচ্ছে বলে জেনে যাবে সকলে। এবং তখন ধরেবেঁধে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে ওরা। ওর জেঠুর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করবার আর কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না তখন।

তিন

গ্রাম থেকে বের হয়ে উঁচুনিচু জমি পার হয়ে টিলা পাহাড়ের পরিবেশ ছেড়ে নদীর ঘাটে এসে পড়ল দীপংকর।

সুবর্ণরেখার মাঝি এখন অন্য লোক।

যাত্রী বোঝাই নৌকোটা ছাড়বার অপেক্ষায় ছিল। দীপংকর যেতেই ওকে তুলে নিয়ে তির তির করে ওপারের দিকে এগিয়ে চলল নৌকোটা। দু' মিনিটও সময় লাগল না। নদীর গর্ভে একটি বড় পাথরের গায়ে এসে ঠেকল।

দীপংকর নৌকো থেকে নেমেই ঠিক করে নিল আর কোনও দিকে নয়, একেবারে সোজা গিয়ে উঠবে ঠাকুর সিং-এর ডেরায়। কেন না ওই গভীর অরণ্যে ও পর্বতে অভিযান চালাতে গেলে ঠাকুর সিং-এর আশ্রয়টাই ঠিক। ঠাকুর সিং-এর মন জুগিয়ে দু'-চারটে দিন থেকে বাসাডেরায় গিয়ে ইকলুর সঙ্গে দেখা করবে ও। তারপর ইকলুর মুখ থেকে সেদিনের ঘটনার কথা কিছু শুনে খোঁজখবর করবে ওর জেঠুর হত্যাকারীর। এবং যে মুহূর্তে ও সব জেনে ফেলবে সেই মুহূর্তে যেভাবেই হোক জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে গিয়েও আঘাত হানবে হত্যাকারীকে। অর্থাৎ বদলা ও নেবেই। এবং বদলা নেবার পর নিজেই গিয়ে ধরা দেবে পুলিশকে। তখন আর লুকিয়ে থাকবার কোনও দরকারই হবে না।

সুবর্ণরেখার পাড় থেকে উঠে এসে একটু উঁচুনিচু পথে চলার পর ঘাটশিলা শহরে ঢুকল।

দীপংকরের মনে হল এখান থেকেই ওকে আবার অভিনয় শুরু করতে হবে। অর্থাৎ কিনা ওকে দেখাতে হবে ও একজন স্মৃতিহারা কিশোর। দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পাবার পর থেকে ওর পূর্ব-স্মৃতি লোপ পেয়েছে। ওর কোনও নাম নেই, ঠিকানা নেই, এই ওর পরিচয়।

দীপংকর একবার ভাবল একটা দোকানে বসে ও আজকের কাগজটা দেখে। আজকের কাগজে নিশ্চয়ই ছবিসহ গতকালের খুনের ঘটনাটা ফলাও করে ছাপা হবে। আর তাই থেকেই জানতে পারবে ওকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশ কীভাবে চারদিকে তোলপাড় করছে। কিন্তু মনে হলেও সাহস হল না! যদি ওই

গুরুত্বপূর্ণ খবরটা দেখবার সময় কেউ ওকে চিনে ফেলে? তা হলে? তা হলে কী হবে?

না। তার চেয়ে ওসব কৌতূহল মনের মধ্যে চেপে রেখেই ঠাকুর সিং-এর ডেরায় চলে যাওয়া ভাল।

দীপংকর আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না-করে ধীরে ধীরে পাহাড় ও জঙ্গলের পথ ধরল। দিনের আলো নিভে আসছে একটু একটু করে। পাখিরা কলরব করে ঘরে ফিরছে। হঠাৎই কেমন যেন বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ওর। একটা চাপা কান্না যেন বুক থেকে হাহাকার করে বেরিয়ে আসতে চাইল। মা'র কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বাবার কথা। মা-বাবাকে ছেড়ে ও যে কখনও একা থাকেনি। কোথাও যায়নি। ওর অভাবে ওর মা-বাবার অবস্থাই বা কেমন? দীপংকরকে না পেলে তাঁরা কি বাঁচবেন? ওর কত ইচ্ছে হল এখুনি বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু কী করে যাবে ও? যেতে পারলে মা-বাবাকে সব কথা খুলে বললে তাঁরা হয়তো সবই বুঝবেন। কিন্তু পুলিশ তো বুঝবে না। তারা ঠিক এসে ওকে ওর মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরবে। তারপর...।

আরে! তুম আ গিয়া?

দীপংকর চেয়ে দেখল পশ্চিমদেশীয় একজন দেহাতি লোক, হাঁটুর ওপরে কাপড়পরা, ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটাকে ও চেনে না। বলল, কে তুমি?

তুম ওহি লেড়কা যো নাম বতানে নেহি সক্‌তা? ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা?

জানি না।

সমঝ গিয়া। হাম তো তুমকো দিন ভর ঢুঁড়নে লাগা। ঠাকুর সিং নে ভেজা হামকো।

দীপংকর বলল, তুমি ঠাকুর সিং-এর লোক? ভালই হয়েছে জায়গাটা আমি ঠিক মনে করতে পারছিলাম না। আমি ঠাকুর সিং-এর কাছেই যাচ্ছিলাম। চলো তোমার সঙ্গেই যাই।

দীপংকর লোকটির সঙ্গে কিছুটা পথ যেতেই চিনতে পারল সকালবেলার সেই জায়গাটিকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার বিভীষিকার মতো ঢেকে গেছে চারদিকে। অরণ্যের জন্য অন্ধকার আরও ঘন। আরও জটিল।

ঠাকুর সিং-এর দোকানে টিম টিম করে আলো জ্বলছে।

ওকে দেখেই ঠাকুর সিং পরমাদরে ডাকল, আও মুন্নে। কাঁহা গয়ে থে? খানা পিনা কুছু হুয়া?

দীপংকর বলল, হ্যাঁ।

লেকিন ঠারনে কা জায়গা নেহি মিলা। এহি তো—

আমি আপনার এখানেই থাকব।

আভি তক্ কুছ ইয়াদ আয়া?

না। আমি কোনও কিচ্ছু মনে করতে পারছি না।

ঠাকুর সিং বলল, ঠিক হ্যায়! তুম হিঁয়া ঠার যাও। বলেই ডাকল, চম্পা! এ চম্পা!

কিঁউ?

ও লেড়কা আ গয়া। উসকো লে কর ঘর চলা যা তু।

দীপংকর দেখল ছোট একটি লণ্ঠন হাতে নিয়ে দোকানের ভেতর থেকে এক কিশোরী বেরিয়ে এল। চম্পা তো চম্পা। যেন সত্যিকারের চাঁপাফুল একটি। নামের সঙ্গে রূপের এমন সামঞ্জস্য সচরাচর দেখা যায় না। কথায় বলে দুধে আলতায় গোলা রং। ঠিক তাই। চাঁপার পাপড়ির মতো। ওর কালো কালো ভাসা ভাসা চোখদুটো কই মাছের মতো ছটফট করছে যেন।

দীপংকরকে ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে ঠাকুর সিং বলল, আমার লেড়কি। যাও, উসিকি সাথ মেরা ঘর চলা যাও। হিঁয়া রহনা ঠিক নেহি।

চম্পা ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল, আও মেরা সাথ।

কী চমৎকার ডাক। যেন কত পরিচিত। কত দিনের ভাব ভালবাসা। কত আপনজন।

দীপংকর চম্পার সঙ্গ নিল।

অন্ধকার বনপথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ওরা। যেতে যেতে চম্পা বলল, ক্যা নাম তুমহারা।

জানি না।

আরে নাম ইয়াদ নেহি?

না।

চম্পা এবার থেমে দাঁড়াল একবার। তারপর ভাল করে দীপংকরকে দেখে বলল, বেচারা। পরে বলল, ঠিক আছে। হাম তুমহারা নয়া নাম দে দেগা।

বেশ তো দাও। কী নাম দেবে?

আমি তোমার নাম দেব বন্ধু।

এ কী! তুমি বাংলা বলছ?

আমি বাংলা বলতে পারি। থোড়া থোড়া।

থোড়া থোড়া কেন, বেশ ভালই তো বলছ তুমি।

আমি তোমার কাছে আরও ভাল বাংলা শিখে নেব।

সেই অন্ধকারে ওরা যে কোনদিকে যাচ্ছিল তার কিছুই বুঝতে পারছিল না

দীপংকর। তবে আলো হাতে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক দেশে চম্পার সঙ্গে পথ চলতে খুব ভাল লাগছিল ওর। কতই বা বয়স চম্পার? খুব জোর তেরো কি চোদ্দো। দীপংকরের সমবয়সি। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।

এক জায়গায় এসে থামল চম্পা। তারপর বলল, মেরা হাত পাকড়িয়ে।

দীপংকর বলল, আবার হিন্দি বলে ফেললে তো?

চম্পা হেসে বলল, স্যরি মিস্টার, স্যরি। আমার হাত ধরো।

দীপংকর বলল, বাঃ। তুমি ইংরেজিও জান দেখছি। এই বনবাসে থেকে এত স্মার্ট কী করে হলে তুমি?

তুমি কি মনে করো আমি একটা জংলি মেয়ে। জঙ্গলে থাকলেও পড়া-লিখা করি আমি। এই বছর আমি ক্লাস সেভেনে উঠেছি। তুমি?

দীপংকর চুপ করে রইল।

চম্পা করুণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কী, মনে করতে পারছ না?

দীপংকর ঘাড় নাড়ল।

ঠিক আছে। দু'-চারদিন কে বাদ সব ইয়াদ আ যায় গা। এখন আমার হাতটা ধরে নেমে এসো একটু।

দীপংকর চম্পার হাত ধরে একটু গড়ানে জায়গা থেকে নেমে চলে এল। তারপর ওরা দু'জনে আর একটু পথ এক সঙ্গে চলে একটি ছোট কুটিরে এসে হাজির হল।

চম্পা বলল, হামারা মকান। তুমি হয়তো বড় লোকের ছেলে। পাক্কা মকানে থাক। গদি বিস্তারায় শোও। লেকিন হাম গরিব আদমি--

দীপংকর সঙ্গে সঙ্গে চম্পার মুখে হাত রাখল। বলল, আর একবার ওই কথা বললে আমি কিন্তু রাগ করব খুব। চলে যাব এখান থেকে। গরিব আবার কী?

চম্পা তেমনি মধুর করে হেসে বলল, তোমার কষ্ট হোবে না তো এখানে?

দীপংকর বলল, হোবে নয়, হবে।

চম্পা ফিক করে হেসে বলল, কষ্ট হলই বা করব কী? আমাদের আর কিছু নেই।

তোমার মা নেই চম্পা?

না। বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই।

তোমার বাবা খুব ভাল। উনি যদি আমাকে আশ্রয় না-দিতেন তো আমি কোথায় যেতাম বলো তো? তার চেয়েও বড় কথা সকালে এখান থেকে চলে গিয়ে আর যদি ফিরে না আসতাম, তা হলে তোমাকে পেতাম না। চম্পা, আমার বোন নেই। অথচ আমার বোনের খুব শখ। আমার একটি বোন থাকবে। সে আমাকে দাদা বলে ডাকবে। তুমি আমার সেই অপূর্ণ সাধ পূরণ করো চম্পা!

তবে যে তুমি বললে তুমি কিছু ইয়াদ করতে পারছ না? এই তো, এই তো ইয়াদ হচ্ছে তোমার।

আর একটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কী। দীপংকর হঠাৎ দু'হাতে কপালটাকে টিপে ধরে বলল, না না না। কিছু মনে পড়ছে না আমার। সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। চম্পা! আমাকে ধরো। একটু জল দাও আমাকে। উঃ। কী দারুণ ঘুরছে মাথাটা।

চম্পা ওকে ধরে দাওয়ার ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, তুমকো কুছ ইয়াদ করনে নেহি হোগা। চুপচাপ বসো তুমি। ইয়াদ করতে গেলেই মাথার কষ্ট হবে। তবে আমার মনে হচ্ছে একটু একটু করে সবই মনে পড়বে তোমার। এই বলে এক গেলাস জল এনে দিল ওকে।

দীপংকর এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে নিল। আঃ। কী অপূর্ব স্বাদ এখানকার জলের।

চম্পা বলল, তুমি শোবে? যদি শুতে চাও তো বলো। দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে দিই। তারপর রাতের খানা বানাই।

দীপংকর বলল, না। এখনই শোব না। তুমি খাবার তৈরি করো। আমি তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করি।

দীপংকর দাওয়ায় বসে ফুরফুরে হাওয়ায় দেহটাকে চাঙ্গা করে তুলল। কিন্তু ওর এখানে সবচেয়ে অসুবিধে যেটা হল সেটা হচ্ছে এই, পরে থাকা জামা আর প্যান্ট ছাড়া একটা কিছু তো নেই। টাকা-পয়সা বলতে ওর নিজের দু' টাকা, এবং সকালে পাওয়া সেই দশটি টাকা আছে। এতে কী হবে? চম্পা যদি ছেলে হত তা হলে ওর কাছ থেকে একটা প্যান্টসার্ট চেয়ে নিয়ে পরতে পারত। কিন্তু ও তো মেয়ে।

দীপংকর বসে বসে চম্পার কাজ দেখতে লাগল। কত কম বয়স। অথচ কী কাজের। আসলে মা নেই তো। তাই সব কাজই ওকে করতে হয়।

একটু পরেই একটি আট-ন' বছরের ছেলেকে একটা ঘটিতে করে দুধ নিয়ে আসতে দেখা গেল। ছেলেটি বাইরের গেটের কাছ থেকে ডাকল, চম্পাদিদি।

আ যাও বাবুয়া।

দুধের ঘটিটা নিয়ে ছেলেটি ঢুকতেই ইয়া কেঁদো বাঘের মতো একটা কুকুরও এসে ঢুকল। কুকুরটা দীপংকরকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, ভৌ-উ-উ-উ-উ।

চম্পা বলল, চেল্লাও মাৎ। দেখা নেহি মেহমান আয়া। যাও, উধার যাও। খানা খা লো!

বলতেই কুকুরটা সরে গেল একপাশে। তারপর একটি মাটির গামলায় রাখা এঁটো ভাত-ডাল ইত্যাদি খেতে লাগল।

ছেলেটি দুধের ঘটিটা দাওয়ায় রেখে চলে গেল আবার।

দীপংকর বলল, ছেলেটি কে গো?

বাবুয়া। উধারবালা গাঁও কা এক গোয়ালাকি লেড়কা। খুব ভাল ছেলে।

এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চম্পা কিছু কাঠকুটো জোগাড় করে দাওয়ায় পাতা উনুনে কাঠের জ্বাল দিয়ে চায়ের জল বসাল।

তুমি চা খাও?

দীপংকর বলল, হ্যাঁ খাই।

আমি চা না-খেয়ে একদম কাজ করতে পারি না।

চা তৈরি হলে, উনুনে ডাল বসিয়ে রুটির ময়দা মাখতে লাগল চম্পা। আর সেই কুকুরটা হঠাৎ ওপরে উঠে এসে দীপংকরের গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

দীপংকর চা খেতে খেতে বলল, তোমার মা কতদিন মারা গেছেন চম্পা?

মালুম নেহি।

সে কী! তুমি তখন খুব ছোট বুঝি? মায়ের কথা মনে পড়ে না তোমার?

মনে পড়ে লাভ কী বলো? ও জিন্দা তো নেহি হোগা।

তোমার বাবুজি কখন আসবেন?

বাবুজি? বাবুজি আসবেন কেন? দোকান ফেলে কী আসতে পারেন বাবুজি।

তা হলে তুমি একা থাকবে?

চম্পা হেসে বলল, একা থাকব কেন? তুমি তো আছ।

সে না হয় আজ। কিন্তু এর আগে কী করে থাকতে? পরে কী করবে?

চম্পা মুখ তুলে দেখিয়ে দিল কুকুরটাকে। বলল, ও থাকত আমার কাছে। এখন তুমিও থাকবে। আমরা তিনজন হয়ে গেলাম। এখন থেকে তুমি, আমি আর ভেলুয়া।

ভেলুয়া!

হ্যাঁ। কুকুরটার নাম। এক বাঙালিবাবুর কুকুর ছিল ও। কুকুরটা আমাকে খুব ভালবাসত। তা সেই বাঙালিবাবু মরে গেলে ও আমার কাছেই রয়ে গেল।

এই ঘন অন্ধকারে যেন একটা আলোর শিখা দেখতে পেল দীপংকর। এই ভেলুয়াকে দিয়েই কাজ হবে। চম্পাকে দিয়েও হবে। একটু একটু করে কুরে কুরে সব কিছু জেনে নেবে ও।

দীপংকর বলল, বাঙালিবাবু কী করে মরল? অসুখ করেছিল বুঝি?

উঁহু। কুছ বুরা আদমি অচানক মার ডালা উনকো।

সে কী! খুন!

চম্পা ঠোঁটে তর্জনী রেখে বলল, চুপ। অ্যায়শা বাত মাৎ বোল না।

দীপংকর চুপ করল।

রান্না শেষ করে দীপংকরকে খেতে দিল চম্পা। তারপর ভেলুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাবার কাছে খাবার পৌঁছে দিতে চলে গেল। যাবার সময় দীপংকরকে বলে গেল ঘুম পেলে দাওয়াতেই শুয়ে পড়তে।

দীপংকর ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

খুব ভোরে যখন ঘুম ভাঙল দীপংকরের, তখন পাখিদের কলরবে চারদিক মুখ হয়ে উঠেছে। মাটির ঘরের মাটির দাওয়ায় শুয়ে পাহাড় আর জঙ্গলের পরিবেশে ভোরের গন্ধ শুঁকে ওর মনে হল সারাজীবন ও এই অরণ্যেই কাটাবে। দরকার নেই শহরের ইট, চুন, সুড়কির বিলাসবাহুল্যে। এই মন ভরানো, প্রাণ মাতানো প্রকৃতির কোলে উদ্দাম শিশুর মতো ছুটোছুটি করবে। আজ ও বুঝতে পারল কেন ওর জেঠু অত টাকার মালিক হয়েও অমন সোনার সম্পদ মাটিতে পুঁতে রেখে চির বনবাস যাপন করতেন। টাটানগরের সাকচিতে মস্ত দোতলা হাঁকালেও জেঠুর প্রাণ ছিল এই পাহাড়, নদী, ঝরনা ও গভীর বন। না হলে ভোগবিলাসী মানুষ হলেও কিছুতেই উনি তাঁবু খাটিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতেন না।

দীপংকর ঘুম ভেঙে আড়মোড়া ভাঙতেই ওর মাথার নীচে বালিশ এবং গায়ে চাদর অনুভব করল। আসলে ও ঘুমিয়ে পড়বার পর, যখন বাবুজিকে খাবার দিয়ে ফিরে আসে চম্পা, তখনই এই ব্যবস্থা ও করে। কিন্তু কোথায় চম্পা! চম্পা কই?

ঘরের দরজায় তো শিকল দেওয়া। তার মানে ঘরেই ছিল। বাইরে কোথাও যাবার আগে শিকল দিয়ে গেছে।

দীপংকর দাওয়া থেকে নেমে বাইরে এল। রাতের আঁধার সবে কেটেছে। এখানে চারদিকে শুধু টিলার পর টিলা আর কত মহুয়া গাছ। দীপংকর ধীরে ধীরে একটি টিলার কাছে এগিয়ে এল! কী নির্জন চারদিক। পাঁচ ছ' ঘর মানুষের বসতি এখানে। তারপর শুধুই জঙ্গল। শুধুই পাহাড়। আহা! কী অপূর্ব পরিবেশ। দীপংকরের জীবনে এই প্রথম পাহাড় দেখা। এর আগে ছবিতেই যা পাহাড় দেখেছে। সেই পাহাড় এখন জীবন্ত।

দীপংকর ধীরে ধীরে একটি টিলার ওপর উঠল। টিলা মানে ন্যাড়াটিলা নয়। গাছ-গাছালিতে ভরতি। টিলার ওপরে উঠেই দেখল দূরে একটি ছোট ঝরনার পাশ দিয়ে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে চম্পা ঘরের দিকে আসছে। ওকে দেখে যেন বুকে বল এল দীপংকরের। সে দূর থেকেই ডাকল, চম্পা! এই চম্পাকলি! আমি যাব?

চম্পা থমকে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, কিঁউ?

তোমার কাঠের বোঝাটা আমি মাথায় নিয়ে আসব?

চম্পা দূর থেকেই বলল, নেহি। তুম নেহি সকোগে। তুমি পারবে না। আমাদের ঘাড় শক্ত। তুমি এখনও কচি নরম আছ। বাচ্চা ছেলে।

দীপংকর তখন দ্রুত পায়ে ছুটে টিলার ওপর থেকে নামতে লাগল নীচে। তাই দেখে চিৎকার করতে লাগল চম্পা, রুখ যাও। রুখ যাও। এ কী করছ। থামো!

দীপংকর থেমে পড়ল।

চম্পা বলল, এইবার আস্তে আস্তে নেমে এসো। পাহাড় থেকে, টিলা থেকে বা কোনও গড়ানো জায়গা থেকে কখনও অমন ছুটে নামতে যাবে না। তা হলেই পড়বে।

দীপংকর চম্পার কথা মতো তাই করল। তারপর টিলা থেকে নেমে যখন ওর কাছে গেল তখন কী আনন্দ দু'জনের।

চম্পা বলল, আমাকে ঘরে না দেখে তুমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে না?

খুব ভয় করছিল আমার!

কেন, ভয় করছিল কেন? তুমি না ব্যাটাছেলে?

বাঃ রে। আমি তোমাদের অতিথি। এখানে তুমি ছাড়া আমার আপনজন কেউ নেই। আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কে, কিছুই আমার মনে নেই। কাজেই ভয় করবে না? তোমাকে হারালে এই বনে-জঙ্গলে আমি কোথায় যাব? কার কাছে থাকব?

চম্পা ওর উজ্জ্বল ঝকঝকে দাঁতের সারিতে ঝিলিক দিয়ে হাসল এবার। তারপর বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। এই ডাকাতের আস্তানায়—। বলেই থেমে গেল চম্পা।

দীপংকর অভিনয় করে বলল, ডাকাতের আস্তানা? ডাকাত কী গো চম্পা? ডাকাত কাকে বলে?

সে তুমি বুঝবে না। বোঝবার চেষ্টা করো না। যাক। মুখহাত ধুয়েছ?

না।

চলো ঝরনার কাছে। মুখ ধোবে। এখানেই আমি সব কিছু করি। বেলায় এখানে আমরা দু'জনে এসে চান করব।

দীপংকর একটা আশ শ্যাওড়ার ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে চলল। চম্পা ওর মাথার কাঠের বোঝাটা মাটিতে নামিয়ে দীপংকরের হাত ধরে উঁচুনিচু পাথরে পা রেখে ঝরনার কাছে এগিয়ে গেল। পাহাড়িয়া ঝরনা ঝিরিঝিরি বইছে। কী স্নিগ্ধ শীতল জল।

দীপংকর সেই ঝরনার জলে বেশটি করে মুখ ধুয়ে কুলকুচি করে নিল।

চম্পা বলল, চলো। ঘরে চলো। তোমাকে কিছু খেতে দিই গে। বাবুজির

দোকান থেকে মুড়ি আর পিঁয়াজি আনতে হবে। চা খাবে তো?

দীপংকর বলল, হ্যাঁ। আমার মা রোজ সকালে আমাকে চা করে খাওয়াতেন। এখন তুমি খাওয়াও।

তোমার মায়ের কথা মনে পড়ছে এবার?

উঁহু। শুধু চা খেতাম, রুটি খেতাম, ভাত খেতাম এই সব মনে পড়ছে। এ ছাড়া আর কিচ্ছু না।

চম্পা বলল, জানো, তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি এক ভিনদেশি রাজপুত্তুর। আমাকে পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে বলে এসেছ।

আমারও কী মনে হচ্ছে জানো, তুমি এক বন্দিনী রাজকন্যা। আমি যুদ্ধ করে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তবে পাতালপুরী থেকে নয়। দুর্গম গিরিকান্তার থেকে।

চম্পা হোঃ হোঃ করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। সেই হাসিতে দীপংকরও যোগ দিল।

এমন সময় দূর থেকে ঠাকুর সিংকে আসতে দেখা গেল সেখানে।

চম্পা তাড়াতাড়ি কাঠের বোঝাটা মাথায় তুলে নিয়ে বলল, বাবুজি আ রহা হ্যায়।

ঠাকুর সিং কাছে এসে বলল, আরে চম্পা! তু হিঁয়া ক্যা করতে হো?

জঙ্গলমে গিয়া থা বাবুজি! লকড়ি লেনে কে লিয়ে।

ঠাকুর সিং এবার দীপংকরকে সস্নেহে বলল, হিঁয়া কুছ তকলিফ নেহি হোতি তো বেটা? হামারা চম্পা বিটিয়াকা সাথ রহো। আপনা বহিন সমঝো। উঁ? হামকো গ্যালুডি যা না হ্যায়। সামকো আপস আউঙ্গা।

দীপংকর বলল, আপনি নিশ্চিন্তে যান বাবুজি।

ক্যা কহা তুমনে? বাবুজি?

হ্যাঁ। আপনি চম্পারও বাবুজি। আমারও। তা আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকে আমার জন্যে একটা প্যান্ট আর গেঞ্জি নিয়ে আসবেন? কেন না এই যা পরে আছি এর বেশি আমার কিচ্ছু নেই।

ঠাকুর সিং বলল, জরুর লে আয়েঙ্গে।

চম্পা বলল, বাবুজি আমার জন্যে কাচের চুড়ি আর রঙিন ফিতে আনবে কেমন?

ঠাকুর সিং 'আচ্ছা, সব কুছ লেকে আয়েঙ্গে হাম' বলে চলে গেল।

দীপংকর আর চম্পা অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুর সিং-এর চলে যাওয়া দেখল। তারপর দু'জনে গুন গুন ভোমরার মতো গান গাইতে গাইতে ফিরে এল ওদের

পর্ণকুটিরে। কুটির অবশ্য ফাঁকা ছিল না। দাওয়ার ওপর থাবা গেড়ে বাঘের মতো বসেছিল ভেলুয়া। ওরা যেতেই দাওয়া থেকে নেমে এসে ওদের পায়ের কছে শুয়ে কুঁই কুঁই করে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

চার

এই সুন্দর সকালে দীপংকর ও চম্পা যেন আনন্দের আতিশয্যে ভরে উঠল। ঠাকুর সিং-এর এই পর্ণকুটিরের পিছন দিকে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত অনেকটা জায়গা বাঁশ-কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেইখানে নানা রকম সবজির ব্যবস্থা আছে। আলু কপি রাঙালু টমেটো শাক সব রকমই হয়। আশপাশে কোনও ঘরবাড়ি নেই। যা আছে তা বেশ দূরে দূরে।

চম্পা বলল, আগে এখানে অনেক লোকের বাস ছিল। এখন মৌভাণ্ডারে চাকরি পেয়ে সবাই শহরের দিকে চলে গেছে। আমরাই শুধু পড়ে আছি এখানে। এখন এখানে মোট দশ ঘর লোকের বাস। তাও দূরে দূরে। পাহাড়ের কোলে যে যার সুবিধেমতো জায়গায় ঘর করে নিয়েছে।

চম্পা কথা বলতে বলতেই ওর কাজ করতে লাগল। এরই ফাঁকে একবার দীপংকর একটা বালতি করে জল নিয়ে এল ঝরনা থেকে। অবশ্য ভেলুয়াও ওর পিছু পিছু গেল। আর চম্পা? সে সরু সরু লকড়ির জ্বালানিতে তেলচিটে ময়লা কড়ায় তেজপাতা আর গুড় দিয়ে হালুয়া বানাতে বসল।

গরম গরম সেই হালুয়ার স্বাদ অমৃতের মতো লাগল দীপংকরের।

হালুয়া খেতে খেতে দীপংকর বলল, আচ্ছা চম্পা, তোমার বাবা তোমাকে একা রেখে দোকানে থাকেন কেন? তুমি বড় হয়েছ, তোমাকে এমন চমৎকার দেখতে, যদি কেউ তোমাকে চুরি করে নিয়ে যায়?

কে আমাকে চুরি করবে? কার এমন সাধ্যি আছে যে ঠাকুর সিং-এর লেড়কির গায়ে হাত দেয়?

কিন্তু একা থাকতে তোমার ভয় করে না?

আমি তো একাই। ভয় করবে কেন? তা ছাড়া আমি ডাকাতের মেয়ে। আমার কী ভয় ডর আছে।

তুমি ডাকাতের মেয়ে?

চম্পা এবার হাঁটুতে মুখগুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর বলল, তুমি আমাকে ঘৃণা করছ না তো? আমি তোমাকে ঠকাব না। আমার সব কথা তোমাকে বলব। শুধু একটা অনুরোধ, তুমি আমাকে ভুলে যেয়ো না।

দীপংকর বলল, চম্পা, তুমি আমার কাছে বড় রহস্যময় হয়ে উঠছ। তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলো।

চম্পা বলল, বাবুজি তো আজ গালুডি চলে গেছেন সন্ধের আগে ফিরবেন না। আমি তোমাকে নিয়ে এক দূর গাঁওতে চলে যাব। সেখানে আজ হাট বসবে। আর ওখানে এক ঠাকুরমন্দির আছে। সেইখানে আমি তোমার জন্যে মানত করব।

কী মানত করবে তুমি?

তা তো বলব না। যদি তোমার স্মৃতি ফিরে আসে তা হলে তোমাকে নিয়ে সোজা তোমাদের বাড়িতে চলে যাব। আর ফিরব না। আশা করি তোমার মা-বাবা আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

সে কী! বাবুজির জন্য মন কেমন করবে না তোমার?

করবে। কেন না ছোটবেলা থেকে ওকেই তো আমার বাবুজি বলে জেনে এসেছি। কিন্তু আমি জানি, ঠাকুর সিং আমার কেউ না।

দীপংকর অবাক হয়ে বলল, ঠাকুর সিং তোমার বাবুজি নয়?

না। অনেকদিন আগে গালুডির কাছে একবার এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা হয়। সেই সময় আমার মা-বাবা নাকি মারা যান। আমি লাইনের ধারে ছিটকে পড়ে কাঁদছিলাম। তখন ঠাকুর সিং আমাকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেন। আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। আমার মা-বাবাকে আমি মনে করতে পারি না। তবে ঠাকুর সিং ও তার বউকে আমি 'আম্মা-বাবুজি' বললেও আমি জানি ওরা আমার কেউ নয়।

কাঠের জ্বাল দিতে দিতে উনুনে ভাত বসাল চম্পা। গোটা চারেক মুরগির ডিমও ফেলে দিল ভাতের মধ্যে। জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় কিশোরী চম্পাকে সোনা দিয়ে তৈরি একটি মেয়ের মতো মনে হল।

চম্পা বলল, আমি স্কুলে যাই। ডাকাতের মেয়ে বলে অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করে। এখন গরমের জন্যে এক মাস স্কুল বন্ধ। কিন্তু আমার স্কুলে যেতে একটুও ভাল লাগে না। আমি কী বাড়ির মেয়ে ছিলাম তা জানি না। কিন্তু এখন তো আমি ডাকাতের মেয়ে।

তোমার বাবা, মানে ঠাকুর সিং ডাকাত?

হ্যাঁ, এই জঙ্গলে আরও যারা আছে, তারা সবাই ডাকাত। এরা চোরা কাটরা করে জঙ্গলের কাঠ পাচার করে। স্মাগলিং জিনিস জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে রাখে। ট্রেনে ডাকাতি করে। তবে আমার বাবুজি, ঠাকুর সিং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসেন। তাই তোমাকে এখানে নিয়ে এসে রেখেছেন। তুমি তো তোমার কোনও কথা ইয়াদ করতে পারছ না। যদি পারতে তা হলে এখনি আমি তোমাকে নিয়ে তোমার মা-বাবার কাছে চলে যেতাম। এইভাবে বনে-জঙ্গলে পড়ে থাকতাম না। যদিও এই পাহাড়, এই বন, এই ঝরনা, আমার

কাছে স্বর্গ, তবুও আমার বাবুজি মরে গেলে এই জঙ্গলে আমি কী করব? একদিন আমি বড় হব তো! তখন?

দীপংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি তোমাকে আমার মা-বাবার কাছে নিয়ে গেলে তারা তোমাকে আদর করে রাখবেন, এই আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি চম্পা। তবে—

তবে কিনা তুমি কোনও কিছুই মনে করতে পারছ না এই তো?

হ্যাঁ।

আচ্ছা আমি যদি তোমাকে কিছু কিছু মনে করিয়ে দিই? তা হলে? তা হলে তোমার মনে পড়বে না বাড়ির কথা?

দীপংকর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল চম্পার দিকে। বলল, তুমি! তুমি কি মনে করিয়ে দেবে আমাকে? আমার সম্বন্ধে কতটুকু তুমি জান?

তোমার সম্বন্ধে আমি যা জানি, তুমি নিজেই তা জান না।

তার মানে?

তুমি কি জান, তুমি এখানে নজরবন্দি হয়ে আছ? আর আমি তোমার পাহারাদার।

চম্পা!

তুমি কি জান, দুটি মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচাতে তুমি একজনকে খুন করেছ? তুমি কি জান, তারপর এক লরি দুর্ঘটনা হয়েছিল তোমার এবং তাইতেই স্মৃতিভ্রংশ হয়েছ তুমি? তুমি কি জান, তোমাকে খুঁজে বার করবার জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে?

দীপংকরের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বলল, এসব কী বলছ তুমি? আমি— আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।

কাল রাতে আমি সব শুনেছি দীপংকর।

দীপংকর! কে দীপংকর!

তুমি। কাল সকালে কালনেমি আর ময়নিহান যখন তোমাকে আমার বাবার কাছে দিয়ে চলে যায় তখনও কেউ জানত না তোমার পরিচয়। এখানকার নামকরা ডাকাত, অবশ্য সবাই জানে উনি একজন মান্যগণ্য শেঠজি কুন্দনলাল, তোমাকে মোটরে করে ঘাটশিলায় পৌঁছে দেয়। এখন তুমি তারই নজরবন্দি। কাল বিকেলে সমস্ত কাগজে তোমার ছবি ছাপা হয়েছে, ওই ঘটনার বিবরণ সহ। তারপর থেকেই তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে কুন্দনলালের লোকেরা। কেন না তোমার জেঠু যিনি এই অরণ্যে কুন্দনলালের লোকদের হাতে খুন হয়েছেন তিনি ছিলেন, কুন্দনলালের চিরশত্রু। তাঁর জীবিত বংশধরদের মধ্যে তোমার বাবা আর তুমি। এখন ওরা তোমাকে গুম করে, তোমার বাবার মুখ থেকে কিছু কথা আদায়

করতে চাইবে। তারপর তোমার বাবাকে এবং তোমাকেও হত্যা করবে ওরা। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না। আমি আজই তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেব দীপংকর।

দীপংকর বলল, তোমার কথা শুনে আমার সব কেমন ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে।

আমার বাবুজি, ঠাকুর সিং কিন্তু তোমার ভাল চান। উনি এখন চুরিডাকাতি ছেড়ে দিয়েছেন। আমি জ্ঞানে ওঁকে কোনও ডাকাতি করতে দেখিনি। তবুও ডাকাত নাম তো রটে গেছে। তাই আমার কোনও মর্যাদা নেই ডাকাতের মেয়ে বলে। বাবুজি আজ গালুডিতে গেছেন কুন্দনলাল শয়তানের সঙ্গে দেখা করতে। উনি তোমাকে অন্য কোথাও না-সরিয়ে, আমাদের কাছেই যদি তুমি থাক সেই অনুমতি নিতে গেছেন।

কিন্তু কেন? এতে ওঁর লাভ?

আমার অনুরোধে। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, বাবুজি এক সময় ডাকাত থাকলেও এখন ওঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একটু আধটু খারাপ কাজ যে এখনও করেন না তা নয়। তবে তোমার ওপর বাবুজির একটু দুর্বলতা এসে গেছে। কিন্তু তবুও কুন্দনলাল যদি রাজি না-হন, তা হলে বাবুজি তোমাকে কুন্দনলালের হাতে তুলে দেবেন, কিন্তু ভুলেও তোমাকে তোমার বাবা-মা'র কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবেন না। এখানেই বাবুজির সঙ্গে আমার অমিল। তাই বাবুজিকে আমি ভালবেসেও ভালবাসতে পারিনি। আর সেজন্যই বাবুজিকে ছেড়ে কোথাও চলে যেতেও আমার মন কাঁদবে না।

তোমার কি মনে হয় চম্পা, কুন্দনলাল আমাকে তোমাদের এখানে থাকতে দেবে?

জানি না। তবে বাবুজি তোমাকে রাখবার চেষ্টা করবেন। কেন না তুমি তো আগেকার কথা কিছুই মনে করতে পারছ না। এইটেই যা রক্ষে।

দীপংকর বলল, কিন্তু কুন্দনলাল যদি আমাকে তোমাদের এখানে থাকতে না দেয়?

না দিতেও পারে। তাই আমি আজই তোমাকে সরিয়ে দেব এখান থেকে।

কোথায়?

সে এক জায়গায়।

তাতে যদি কুন্দনলাল তোমার বাবাকে সন্দেহ করে?

করবে না। আমরা রটিয়ে দেব তুমি নিজের খেয়ালেই কোথাও চলে গেছ।

দীপংকরের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে ভেবে পেল না এখনও সে চম্পার কাছে আত্মপ্রকাশ করবে কি না। একবার মনে হল তার সব

কথা সে খুলে বলে চম্পাকে। আবার ভাবল, না। ওকে স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করবার সময় এখনও হয়নি। শুধু দুঃখ হল এই ভেবে কেন যে সেদিন গঙ্গার ধারে ও বেড়াতে গিয়েছিল। কেন যে রাগের মাথায় ওই রকম অস্থানে মেরে দিল ছেলেটাকে। ওই কাজ না-করলে তো আজ ওকে এইভাবে চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াতে হত না। ওর মা, ওর বাবা কত আদরযত্নে মানুষ করেছেন ওকে। ওর জন্যে তাঁরা কতই না দুঃখ পাচ্ছেন। দুঃখ কি ও-ই পাচ্ছে কম? মাকে বাবাকে একবার দু'চোখ ভরে দেখবার কত ইচ্ছে হচ্ছে ওর। কিন্তু না, আর কোনওদিনই ও বাবা-মায়ের কাছে ফিরতে পারবে না। কেন না ফিরলেই থানা-পুলিশ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ফাঁসি। এইসব ভাবতে ভাবতে প্রচণ্ড উত্তেজনায় দীপংকর চিৎকার করে উঠল না—না—না—না।

চম্পা ছুটে এসে ধরল দীপংকরকে। পরম স্নেহে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, কী হল? এমন করে চেঁচিয়ে উঠলে যে? হল কী তোমার?

দীপংকর ওর চেঁচিয়ে ওঠার আসল কারণ না জানিয়ে বলল, চম্পা, তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে কোথায় রেখে আসবে বলো? যদি তারা আমাকে ওই শয়তান কুন্দনলালের হাতে তুলে দেয়?

চম্পা বলল, না। সে ভয় নেই তোমার। আমি তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব যেখানে কুন্দনলালের ছায়াও প্রবেশ করতে পারবে না।

দীপংকরের চোখে এবার সত্যিই জল এসে গেল। আসবে না-ই বা কেন? এক সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এই পাহাড়িয়া ললনার বুকে তার মতো এক অপরিচিত কিশোরের জন্য এই মধুর মমত্ববোধ কোথা থেকে এল? কেন এল? এ কথা কিছুতেই সে ভেবে পেল না। তবে কি জন্মান্তর বলে সত্যিই কিছু আছে? এই চম্পা কি ওর কেউ ছিল? কোনও সহোদরা? হয়তো হবে। তবে দীপংকর ওকে ছাড়বে না। ওর এখানকার কাজ শেষ হলে, ও নিজেই হাওড়ায় ফিরে ধরা দেবে পুলিশকে। তারপর যা ওর কপালে আছে তাই হবে। শুধু চম্পাকে তুলে দেবে ওর মা-বাবার হাতে এবং ওর শূন্যস্থান চম্পাকে দিয়ে পূর্ণ করিয়ে যে মায়া মমতায় দীপংকরকে মানুষ করেছেন ওর বাবা-মা সেই মধুর অপত্যস্নেহে চম্পাকেও মানুষ করবার অনুরোধ জানাবে। তারপর চম্পা বড় হবে। ওর বাবা-মা চম্পার বিয়ে দেবে। জীবিত থাকলে জেলে বসেও ওর শুভ কামনা করবে দীপংকর। আর যদি ফাঁসির দড়ি গলায় পরে মৃত্যু হয়, তা হলে মরণের ওপার থেকে ওকে ওর শুভেচ্ছা জানাবে। আশীর্বাদ করবে।

হঠাৎ ভেলুয়ার চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। নিশ্চয়ই কেউ আসছে। কোনও আগন্তুককে না-দেখলে তো এইভাবে চেঁচাবে না ভেলুয়া।

চম্পা ইশারায় দীপংকরকে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে পড়তে বলে নিজে দাওয়ার

কাছে এসে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, কৌন হ্যায়রে?

ওদিক থেকে উত্তর এল, কুত্তা সামালো।

চম্পা ধমক দিল ভেলুয়াকে, চল হ্যাট। চুপ রহো। আঃ আঃ আযা হিঁয়া পর। চ চ চ।

ভেলুয়া লেজ নেড়ে নেড়ে পথ ছেড়ে পিছিয়ে এল দাওয়ার কাছে।

একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠের আওয়াজ এবার শুনতে পেল দীপংকর, ও লেড়কা কাঁহা হ্যায়?

চম্পা বলল, ও তো সবেরেই ঘাটশিলা চলা গিয়া।

কাহেকো ছোড়া উসকো? তেরা বাবুজি কাঁহা?

আপকা সাথ মুলাকাত করনেকে লিয়ে গালুডি চলা গিয়া।

কব?

সবেরে।

আউর ও লেড়কা?

বাবুজি যানে কা বাদ ও ভি কাঁহা চলা গিয়া।

ঠিক হ্যায়। ও ফিন আ যায়ে গা তো উসকো জেরা খেয়াল রাখ না। উঁ?

কী খেয়াল রাখবে চম্পা? তবু হ্যাঁ বলতে হয় হ্যাঁ বলল। এখন মরো তোমরা খুঁজে। চম্পা ওর কাজ ঠিকই করে যাবে। কুন্দনলাল চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ওই রকম একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা। কেন না যদি আবার কোনও নতুন কথা বলতে ফিরে আসে? কিন্তু না। কুন্দনলাল যখন আর ফিরে এল না, তখন চম্পা ডাকল দীপংকরকে, দীপ! বাইরে এসো।

দীপংকর ধীরে ধীরে বাইরে এসে বলল, কুন্দনলাল চলে গেছে?

হ্যাঁ। আমিও এখুনি তোমাকে সরিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে।

তা না হয় দিলে, কিন্তু কতক্ষণ এবং কতদিন তুমি আমাকে ওইভাবে লুকিয়ে রাখবে চম্পা। ওরা কি ভাবছ বন-জঙ্গল তোলপাড় করবে না?

করবে। তবু তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। যাও এখন চট করে ঝরনায় গিয়ে চানটা করে এসো। তারপর পেট ভরে খেয়ে নাও দু'মুঠো। আচ্ছা থাক। একা যেতে হবে না। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। চলো।

দীপংকর একবার ইতস্তত করল। তারপর চম্পা ওকে ছেঁড়া ময়লা দুটো তেলচিটে গামছা বার করে দিতেই জামাপ্যান্ট ছেড়ে ওর সঙ্গে স্নান করতে চলল সে। দেখা যাক ওর ভাগ্য এবার ওকে কোন পথে নিয়ে যায়।

পাঁচ

খুব তাড়াতাড়ি দু'জনে দু'মুঠো খেয়ে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল। একটা নতুন গামছায় ছাতু চিঁড়ে আর ভেলি গুড় বেঁধে নিল চম্পা। তারপর পরিপাটি চুল আঁচড়ে বিনুনি করে সাপের মতো বেণীটা ঝুলিয়ে দিল পিছন দিকে। ভাঙা আয়নায় মুখ দেখল। দীপংকরের চুলগুলোও যত্ন করে আঁচড়ে দিয়ে দরজায় শিকল তুলে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে।

কিছুদূর আসার পরই ওদের পিছনে আরও একজনের অস্তিত্ব অনুভব করল ওরা। সে হল ভেলুয়া।

চম্পা বলল, যা। ঘর যা ভেলুয়া। উধার যা কে সব কুছ দেখভাল কর।

দীপংকর বলল, কেন, আসুক না ও। দূর পথ যাত্রায় ও যদি আমাদের সঙ্গী হয় তো মন্দ কী? বলেই ডাক দিল সে, আয়রে ভেলুয়া।

কিন্তু।

কোনও কিন্তু নয় চম্পা। তুমি আমাকে কোথায় কোনখানে লুকিয়ে রাখবে তা তো জানি না। তবু আমার নিরাপত্তার জন্যে ভেলুয়ার কাছে থাকাটা খুবই দরকার। তা ছাড়া তুমি তো একা ফিরবে। এই জঙ্গলে যদি তোমার কোনও বিপদ হয়? ভেলুয়া থাকলে কেউ তোমার দিকে এগোতে সাহস করবে না।

তা হলে আসুক।

ভেলুয়া তখন ছুটে এসে ওদের পায়ের কাছে লুটোপুটি খেতে লাগল। তারপর ওদের পথপ্রদর্শক হয়ে চলতে লাগল ও।

দীপংকর বলল, কী আশ্চর্য! ও কী করে জানল আমরা কোথায় যাব?

ও সব জানে। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাবার এই একটিই মাত্র পথ।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

গেলেই দেখতে পাবে।

ওরা ঝরনার পাশ দিয়ে কিছু পথ এসে একটি ছোট্ট টিলার ওপর উঠল। তারপর সেটা অতিক্রম করে প্রবেশ করল এক গভীর বনে। শাল আর সেগুনের ঘন অরণ্যানির মাঝে সুঁড়ি পথ ধরে ওরা এগোতে লাগল। এখানে চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে একটা শীর্ণা নদী পড়ল। চম্পার কোমল হাতখানি ধরে সে নদীও পার হল দীপংকর। এবার পাহাড়ে ওঠা। একটি বড় পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। এ পথে জঙ্গলে কাঠ আনতে লরি যাতায়াত করে। সেই নির্জন প্রান্তরে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে দীপংকর অভিভূত হয়ে গেল। ওর মনে হল, এই তো, বেশ তো। আর কেন ঘরে ফেরা? কেনই বা অনুসন্ধান? এই অরণ্যে চম্পা ও ভেলুয়াকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে যাক ও। আর শহর

সভ্যতায় কাজ নেই। চির বনবাসেই এ জীবনটা কাটিয়ে দিক ওরা।

ওরা যে পাহাড়ে উঠেছিল সেই পাহাড় অতিক্রম করার পর নামার মুখে দেখল আরও মনোহারী শোভা। এই কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের পটভূমিতে রঙিন ফুলের শোভায় এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই খররৌদ্র মধ্যাহ্নে মায়াময় হয়ে উঠেছে। ওরা যত এগোয় অরণ্যের সৌন্দর্য ততই প্রকট হয়। কাছে দূরের শৈলমালা, দু'-একটি বন্যগ্রাম, শ্বেতশুভ্র ইউক্যালিপ্টাসের কণ্ঠ জড়ানো ঘন পত্রের চিহড় লতা সবই আকর্ষণীয়।

দীপংকর অভিভূত হয়ে বলল, কী সুন্দর।

চম্পা রসিকতা করে বলল, কোনটা? এই বনভূমি? না আমি?

দুটোই। আমার কী মনে হচ্ছে জান?

কী মনে হচ্ছে?

আর কোথাও না গিয়ে এইখানেই আমরা থেকে যাই।

তারপর?

তারপর আবার কী? এই অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের মতো আমরা গাছের বাকল পরে ঘুরে বেড়াব।

ওমা! সে কী? খাব কী আমরা?

বনের ফলমূল।

এটা রামায়ণের যুগ নয় গো মশাই। এ বনে শাল, সেগুন, পলাশ, শিমুলই আছে। প্রাণধারণ করে বেঁচে থাকার মতো কোনও ফলের গাছ নেই।

আমার কিন্তু ইচ্ছে করছে এইখানে এই পাহাড়ের কোলে ওই যে ঝিরিঝিরি ঝরনাটা ঝরে পড়ছে, ওর ঠিক পাশটিতে একটি ঘর করি।

বেশ তো করো না। এই বনডুংরির শৈলমালায় তরুণ যোগী হয়ে তুমি মহাদেবের মতো তপস্যা করো আর আমি তোমার সেবাযত্ন করি।

আবার পথ চলা।

যেতে যেতে চম্পা বলল, ওই দেখো দীপ। ওগুলো কী বলো তো?

কী জানি। এ তো দেখছি গাছের ওপর ঘর।

হ্যাঁ। বুনো হাতি, ভালুক, শুয়োরের পাল এসে খেতের ফসল নষ্ট করে। তাই গাছের ওপর ঘর করে মানুষ পাহারা দেয়। জন্তুজানোয়ারেরা দলবদ্ধ হয়ে এসে পড়লেই ক্যানেস্তারা বাজিয়ে ওরা মুখে বিকট শব্দ করে তাড়া দেয়।

কাছেপিঠে গ্রাম আছে বুঝি?

হ্যাঁ। এসে গেছি আমরা। ওই যে দেখছ দূরের গ্রামখানা। আমি ওখানেই তোমাকে রেখে যাব।

তুমি চলে যাবে চম্পা?

যেতে তো হবেই। না হলে তোমারই বিপদ হবে। ওরা যখনই জেনে যাবে আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে গেছি তখনই চারদিক তোলপাড় করতে থাকবে। তার চেয়ে আমি ফিরে গেলে ওদের গতিবিধির দিকে নজর রাখতে পারব। মাঝেমধ্যে তোমাকে এসে দেখে যাব। আর যদি কোনওরকমে তোমার বাড়ির ঠিকানা পাই তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে যাব তোমার মা-বাবার কাছে।

কী করে যাবে?

কেন? ট্রেনে করে। ওখানে গিয়ে চারদিক ঢুঁড়ে তোমার ঠিকানা খুঁজে বার করব।

খুব ভাল হয় তা হলে।

যাই হোক, ওরা পাহাড় থেকে নেমে এক জায়গায় মালভূমির মতো অংশে এসে একটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করল। পাহাড়িয়া ছোট্ট গাঁও। কী সুন্দর!

চম্পা বলল, এই গাঁওয়ের শেষ সীমানায় মা রংকিনীর মন্দির আছে। আসল মন্দির অবশ্য যদুগোড়ার পথে। ঘাটশিলা থানার পাশে মায়ের আসল মূর্তিটা আছে। তবে এখানেও মা খুব জাগ্রত। শনি-মঙ্গলবারে বলি হয়। হাট বসে। আজ হাটবার।

ওরা যখন মন্দিরের কাছে গেল তখন কেউ নেই সেখানে। সকালে বারোটার মধ্যে পুজো হয়ে গেছে। এখন সবাই অদূরে হাট নিয়ে ব্যস্ত।

চম্পা মন্দিরের ঘণ্টায় ঢং করে একটা শব্দ করল। তারপর এক ভয়ংকরী দেবীমূর্তির সামনে স্থির হয়ে বসল। চাঁপাফুলের পাপড়ির মতো গায়ের রং যার, এমন একটি চোদ্দো-পনেরো বছরের সুন্দর মুখ স্কার্টপরা মেয়েকে এই পরিবেশে এক নবীনা যোগিনী বলে মনে হল।

দু'চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে চম্পা কী যেন প্রার্থনা করল দেবীর কাছে, তারপর দীপংকরকে বসতে বলে কোথায় যেন চলে গেল। একটু পরেই আবার যখন ফিরে এল তখন ওর দু'হাত ভরতি অজস্র বনফুল। সেই ফুল দেবীর চরণে অঞ্জলি দিয়ে বলল, দেবীকে প্রণাম করো।

চম্পা দীপংকর দু'জনেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল দেবীকে।

তারপর উঠে দাঁড়াল দু'জনে।

চম্পা বলল, এসো, তোমাকে ভিলসর্দারের কাছে নিয়ে যাই। এই সর্দার আমাকে নিজের লেড়কির মতো পেয়ার করেন। লালজির সঙ্গে ওর একদম দোস্তি নেই। তাই লালজির লোকেরা এই গাঁওতে ঢোকে না।

সর্দার যদি আমাকে রাখতে না চান?

চাইবেন। শুধু একটা কথা।

কী?

মাটির নীচে একটা সুড়ঙ্গ ঘরে তোমাকে থাকতে হবে। দিনের বেলা সেখানে লুকিয়ে থাকবে! রাত্রে বাইরে আসবে। সর্দারের কথার কখনও অবাধ্য হবে না। তারপর দেখছি দু'-চারদিন পরে তোমাকে নিয়ে কী করা যায়। তোমার দেখভাল তো আমাকেই করতে হবে।

কিন্তু আমাকে সেখানে একা রেখে তুমি যদি চলে যাও, আমি তো পাগল হয়ে যাব চম্পা।

তবু যেতে আমাকে হবেই।

না। তোমাকে আমি ছাড়ব না।

বোকামি কোরো না ছাড়ো।

এখন বেলা কত জানো? ওই দেখো বিকেল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশের রং লাল। এই দূর বনপথে একা তুমি কী করে যাবে? ভেলুয়া সঙ্গে গেলেও অত বড় একটা পাহাড় তোমাকে ডিঙোতে হবে। জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে আসে তাদের ভয়, অন্ধকারে বাঘের ভয়, তা ছাড়া কত ভালুকও এখন রাতের আঁধারে ঝরনায় নদীতে জল খেতে আসবে। এইসব জেনেশুনে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি? কাজেই তুমি যাচ্ছ না। আজও না। কালও না।

কিন্তু...।

কোনও কিন্তু নয়। তুমি এখন থেকে আমার কাছেই থাকবে। আমার কাজ শেষ হলেই এখান থেকে চলে যাব আমরা।

কোথায়?

আমাদের বাড়ি। যেখানে আমার মা আছেন, বাবা আছেন।

চম্পা সবিস্ময়ে বলল, কী বলছ তুমি দীপ? তুমি বড় রহস্যময় হয়ে উঠছ। এখানে তোমার কীসের কাজ? তা ছাড়া তুমি তো সবই ভুলে গেছ। কী করে নিয়ে যাবে আমাকে তোমার মা-বাবার কাছে?

দীপংকর চম্পার দুটি হাত মুঠোর মধ্যে ধরে সস্নেহে বলল, ওগো বনবালা আমি কিছুই ভুলিনি। আমার সব কিছুই মনে আছে। শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্য তোমাদের কাছে অভিনয় করেছিলাম এতক্ষণ। তোমার সরল অন্তঃকরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি যখন বুঝলাম তুমি সত্যই আমার হিতৈষী তখন আর তোমার কাছে সত্য গোপন করে লাভ কী? আমার জেঠুর হত্যাকারীকে আমি খুঁজে বার করব, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এখানে এসেছি। না-হলে ঘাটশিলা থেকেই বিদায় নিতাম! তুমি আমাকে সাহায্য করবে চম্পা। কেন না আমার জেঠুর সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল। তুমি বাসডেরা গ্রাম চিনিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে। সেখানে আমার জেঠুর বিশ্বস্ত ভৃত্য ইকলু আছে। আর ওই ভেলুয়া! ও তো আমার জেঠুরই পোষা কুকুর। আমি জেঠুর লেখা ডায়েরি পড়েছি। তাই তো জেনেছি

আমার জেঠু প্রচুর সোনাদানা এই অরণ্যে পাহাড়ে কোথায় যেন লুকিয়ে রেখেছেন। সেগুলো খুঁজে বার করতে হবে। কাজেই এখন তুমি যাবে কি? তুমি আমার পাশে না থাকলে আমি যে কিছুই করতে পারব না।

দীপংকরের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল চম্পা। অবাক বিস্ময়ে বলল, দীপ তুমি এত বুদ্ধিমান? সত্যিই যদি তুমি আত্মবিস্মৃত হওয়ার এই অভিনয় না-করতে, তা হলে খুবই বিপদে পড়ে যেতে। কালনেমি বা ময়নিহানই হয়তো শেষ করে ফেলত তোমাকে। না হলে তুলে দিত লালজির হাতে। লালজি ভারী নৃশংস লোক। ওর মনে কোনও মায়াদয়া নেই।

এখন বলো সব কথা আগে থেকে তোমাকে খুলে না বলে তোমাকে এবং ভেলুয়াকে নিয়ে এই দূর অঞ্চলে চলে এসে ভাল কাজ করেছি কি না?

খুব ভাল কাজ করেছ দীপ। তোমার জেঠুকে আমিও জেঠু বলতাম। মানিকজেঠু। তিনি আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসতেন। এই ভেলুয়া ছিল তাঁর প্রাণ। সেদিন যদি ভেলুয়া ওঁর কাছে থাকত তা হলে কখনওই দুর্বৃত্তরা ওঁকে হত্যা করতে পারত না। আমি মাঝেমধ্যে ওনার কাছে যেতাম। সেদিনও গিয়েছিলাম। আমার ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে উনি ভেলুয়াকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। ভেলুয়া সে রাতে আমার কাছেই ছিল। আর সেই সুযোগে ওরা শেষ করে দিল ওনাকে।

ওরা কারা?

কারা আবার! লালজির লোকেরা। এই অঞ্চলের অনেক গাঁওবালে তো লালজির লোক। আসলে তোমার জেঠু অনেক সোনা ওদের খপ্পর থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তো, তাই এত রাগ। এখানে রংকিনীর সেবাইত যে ভিলসর্দার আছে, সেও তোমার জেঠুরই লোক। তোমার জেঠুর জন্যেই এখানে গুপ্তকক্ষ তৈরি করা হয়েছিল। মানে উনি নিজেই করিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে থাকতেন সেখানে। তোমার জেঠুর সমাধিও দেখিয়ে আনব! আমি মাঝে মাঝে সেখানে ফুল দিয়ে আসি। তুমিও দেবে।

দীপংকর বিস্মিত হয়ে বলল, জেঠুর সমাধি? আমার জেঠুকে দাহ করা হয়নি?

না। ওনার যেসব লোকেরা সোনা সংগ্রহের কাজ করত তাদের বেশিরভাগই ছিল খ্রিস্টান। তারা সবাই সিংভূমের আদিবাসী 'হো'।

হো?

হ্যাঁ। 'হো' মানে মানুষ। ওদের ধারণা ওরাই পৃথিবীতে প্রথম মানুষ জাতি।

আমার জেঠুর চাকর ইকলুও তো হো ছিল।

এখনও আছে। সেও খ্রিস্টান। চলো না তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

দীপংকর বলল, তা হলে তুমি ঘরে ফিরছ না। এখন থেকে আমার কাছেই

থাকছ। অতএব ভিলসর্দারের ওখানে আমরা দু'জনেই থেকে যাই এসো।

চম্পা বলল, না। ভিলসর্দারের ওখানে আর আমাদের থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই। ওদের সঙ্গে আর দেখা না-হওয়াটাই ভাল। কেন না তোমাকে রেখে দিয়ে চলে যেতাম সে কথা আলাদা। আমিও যদি থাকি তা হলে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। কেন না আমার বাবুজি গালুডি থেকে ফিরে যখন আমাদের দু'জনকে দেখবেন না, তখন চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকবেন। যদি এখানে এসে হাজির হন তা হলেই ধরা পড়ে যাব। উনি কিছুতেই তোমার সঙ্গে আমাকে চলে যেতে দেবেন না। আমাকে উনি দারুণ ভালবাসেন।

তা হলে বেলা থাকতে থাকতে চলো কোথাও কোনও গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই।

চলো।

চম্পা ডাকল, আয় ভেলুয়া। আ যা মেরা সাথ।

ভেলুয়া এতক্ষণ কাছে-পিঠেই ঘুর ঘুর করছিল। এবার চম্পার ডাকে লেজ নেড়ে নেড়ে ছুটে এল। তারপর এগিয়ে চলল ওরা দূরের পাহাড়ের দিকে।

দীপংকর বলল, চম্পা, তোমাকে আমার একটা কথা বলা হয়নি। তুমি তো এত কিছু জেনেছ, কিন্তু জান কি কেন আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি?

কেন?

আমি একজনকে খুন করেছি।

জানি।

অবশ্য খুন করব বলে নয়। দুটি মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে একজনকে অস্থানে মেরে বসি। আর সেই আঘাতেই সে মারা যায়। আমি তখন ভয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ি। ময়নিহান ও কালনেমি আমাকে তখনই লরি করে এখানে নিয়ে আসে। তারপর তো সবই জান। এখন প্রশ্ন হল এইভাবে কদ্দিন আমি লুকিয়ে বেড়াব? লোকালয়ে একদিন তো আমাকে যেতেই হবে। তখন? তখন তো হাতে হাতকড়া পড়বে আমার। তারপর জেল, হাজত, ফাঁসি কিংবা দ্বীপান্তর। তবে তোমার ভয় নেই চম্পা। তোমাকে আমি ঠিক আমার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব।

চম্পা বলল, যদি তাই হয় তা হলে কী দরকার ফেরবার? এই অরণ্যেই দিন কাটিয়ে দেব আমরা। তোমার জেঠুর অনেক সোনা লুকনো আছে। তার কিছু আছে আমার জন্যে। সেগুলো আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তাতেই আমাদের দিন চলে যাবে।

তোমার জন্য! আমার জেঠু তোমাকে দিয়ে গেছেন?

হ্যাঁ। আমি বড় হলে আমার বিয়ের খরচের জন্য। আমার বাবুজিও তা জানেন

না। আমি শুধু আমার অংশটার কথা জানি। বাকি কোথায় লুকনো আছে তা জানি না।

সেগুলোর জন্যই সম্ভবত জেঠু খুন হয়েছেন। কুন্দনলালজি আমাকে আটকে রেখে আমার বাবাকে মোচড় দিয়ে জানতে চাইবেন, সেগুলোর সন্ধান আমাদের জানা আছে কি না। কিন্তু বিশ্বাস করো আমার বাপি এসবের কিছু জানেন না।

তবে দীপংকর, আমার মনে হয় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে তুমি বোধহয় ভুলই করেছ।

ভুল করেছি।

হ্যাঁ। কেন না তুমি তো নির্দোষ। তুমি তো খুনি নও। তা ছাড়া এখনও নাবালক তুমি। দুটি মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে কাউকে আক্রমণ করতে গিয়ে যদি কোনও অঘটন ঘটে যায় তার জন্যে তো তুমি দায়ী নও। সেটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। ওই মেয়েদুটিও তো তোমার হয়ে সাক্ষী দিত। তারা যখন বলত তাদের জন্যই এ কাজ তুমি করেছ, তখনই তো সত্যাসত্য প্রমাণ হয়ে যেত।

তুমি ঠিক বলেছ চম্পা। এই কথাটা তো আমার একবারও মনে হয়নি। চলো আগে গুপ্তধনের ব্যবস্থা করি। লালজি শয়তানের বারোটা বাজাই। তারপর নিজেই গিয়ে ধরা দেব। দেখি কী হয়।

ওরা যখন চলা শুরু করল বেলা তখন গড়িয়ে আসছে। কাছে দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে তখন অস্তরাগের সিঁদুর খেলা।

ওরা পায়ে পায়ে হাটের দিকে এগোল। ছদ্মবেশ ত্যাগ করে দীপংকরকে যেমন সুখী লাগছে, সুন্দরী চম্পাও তেমনি কলকে ফুলের মালা গলায় এই অরণ্যভূমে অপরূপা।

দীপংকর বলল, বড্ড খিদে লাগছে। চলো কোথাও কিছু খাওয়া যাক।

কী খাবে? পয়সা আছে তোমার কাছে? আমার তো কিচ্ছু নেই।

আছে। যা আছে তাতে দু'জনের হয়ে যাবে।

ওরা কথা বলতে বলতে হাটে এল। আদিবাসী হাট। বেতের জিনিস, কাঁচা তরিতরকারি, চুনো পুঁটি মাছ, শাড়িকাপড়, কাচের চুড়ি, খেলনা পুতুল সব কিছুই আছে। ওরই মধ্যে এক জায়গায় গরম জিলিপি ভাজছে একজন। আর একজন নিয়ে বসেছে মুড়ি আর তেলেভাজা।

ওরা দু'জনে একটি গাছতলায় বসে গরম জিপিলি খেল এক ঠোঙা করে। তারপর একটা নতুন গামছা কিনে তাইতে কিছু মুড়ি আর তেলেভাজা বেঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। একটা প্লাস্টিক বোতল চেয়ে নিল একজনের কাছ থেকে। তাই তে খানিক জল ভরে নিল। না হলে রাতবিরেতে জলতেষ্টা পেলে যাবে কোথায়? পথের সম্বল এটুকু থাক। সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই ওদের যে

কোনও একটা আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে হবে। না হলে এই বাঘ ভালুকের দেশে প্রাণটা খোয়াতে হবে বেঘোরেই।

ছয়

হাট থেকে বেরিয়ে ওরা দুই পাহাড়ের মাঝের বনপথ ধরে গভীর জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগল। ভেলুয়াও ওদের সঙ্গে সমানে চলেছে। পথ চলায় ওর যেন ক্লান্তি নেই। ভেলুয়া আগে আগেই চলছিল। যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও।

কী হল! কী হল রে ভেলুয়া?

ওরা দেখল পথের মাঝখানে কিছু ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। নিশ্চয়ই কাউকে বাঘে খেয়েছে। এই দেখে ওরা আর এগোতে সাহস করল না। কিন্তু না-এগোলেও থাকবে কোথায়?

হঠাৎ দীপংকরের নজরে পড়ল কিছু দূরে একটা কুড়ুল পড়ে আছে।

ও কাছে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিল। আর তখনই দেখতে পেল সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা। একটা লোক অদূরে জঙ্গলের ভেতর বড়সড় একটা পাথরে শুয়ে আছে। লোকটার বুক পেট ফালা ফালা। প্রাণটুকু অবশিষ্ট আছে। সেটুকুও আর থাকবে না হয়তো।

চম্পা বলল, নিশ্চয়ই ভালুকের হাতে পড়েছিল লোকটা। চলো ওর মুখে একটু জল দিয়ে আসি। এই বলে ওরা দু'জনে লোকটার কাছে গেল। কিন্তু জল দেবার আগেই একবার শেষবারের মতো কেঁপে উঠে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল সে।

চম্পা বলল, আর এক মুহূর্ত নয়। যেভাবেই হোক কোনও পাহাড়ি গাঁওয়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে আমাদের। চলো, চলো, পা চালাও।

এমন সময় কয়েকজন হাট ফেরতা বুনো লোক এসে পড়ল সেখানে। যাক বাবা বাঁচা গেল। ওরা কুসুমডি গ্রামে যাচ্ছিল। চম্পা ওদের চিনত। তাই দলে ভিড়ে গেল।

কুসুমডি বেশি দূরে নয়। মিনিট দশেকের পথ। ওরা ওদের পিছু পিছু দশ মিনিট হেঁটে সেই গ্রামে এসে পৌঁছুল। শুধু পাহাড় আর পাহাড় এখানে।

এখানে পাহাড়ের কালো বুনোদের ঘরবাড়ি কয়েকটি থাকলেও, ওরা ওদের বলেকয়ে একটি সুউচ্চ গাছের মাথায় জঙ্গল পাহারা দেবার জন্য যে ঘর, সেই ঘরই একটি এক রাতের জন্য চেয়ে নিল। আর বলে দিল কেউ এসে ওদের খোঁজ করলে ওরা যে এখানে আছে সে কথা যেন না বলে।

ভেলুয়া বুনোদের বসতির কাছেই রইল।

আর ওরা দু'জনে দড়ির মই বেয়ে একটি ঘনপত্র বিশিষ্ট গাছের মাথায় যে ঘর, সেই ঘরে গিয়ে জুটল। কী ছোট ঘর। কাঠের তৈরি। ডালপালা দিয়ে। তাইতে খড় বিছানো। এক পাশে একটি ক্যানেস্তারা। আসলে ফসলের সময় ফসল পাহারা দেবার জন্যে যখন এই ঘরে থাকা হয় তখন এটা কাজে লাগে।

চম্পা বলল, শোনো ঘুম পেলে দু'জনেরই এখানে ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। যখন তুমি ঘুমোবে তখন আমি জাগব, যখন আমি ঘুমোব তখন তুমি জাগবে। কেমন?

দীপংকর বলল, সে তো বটেই।

দীপংকরের বুক তখন ভয়ে ঢিপ ঢিপ করছে। কেন না বাতাসের আন্দোলনে ডালগুলো যখন দুলে উঠছে, তখন বার বারই মনে হচ্ছে এই বুঝি ঘরটা ভেঙে পড়বে মাটিতে। না হলে চারপাশের বন্য প্রকৃতির শোভা এখানে অপরূপ। এমন পরিবেশে তো জীবনে থাকেনি কখনও, এই বনবাসর তাই ওর কাছে স্বর্গীয়। চম্পা বনবালা। এরকম অঢেল সৌন্দর্য ওর দেখা আছে। কিন্তু ও তো এই প্রথম দেখছে। একটু পরেই আকাশের সুগোল চাঁদ পরিষ্কার দেখা গেল। জোছনায় ফুল ফুটছে যেন চারদিকে। পূর্ণিমা এগিয়ে আসছে হয়তো। তাই এত আলো।

দীপংকর চম্পার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ! তারপর এক সময় বলল, আমার জেঠুর ব্যাপারে তুমি কি কিছু আমাকে বলবে?

চম্পা বলল, নিশ্চয়ই বলব। তোমার জেঠু ছিলেন এই পাহাড়-বনের দেবতা। এখানকার বন্যেরা সকলেই তাঁর কাছে উপকৃত। উনি প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলের সুখ দুঃখের খোঁজ নিতেন। মানুষের আপদেবিপদে অসুখেবিসুখে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। সাইকেলে চেপে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে গিয়েও বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন রোগীদের। ওনার ওষুধের এমনই গুণ ছিল যে এক ফোঁটা ওষুধ খেলেই রোগ সেরে যেত। একবার হল কী আমার খুব অসুখ হল। রাত্রিবেলা। কোথাও ডাক্তার পাওয়া যায় না। বাবুজি ছুটলেন তোমার জেঠুর কাছে। সে সময় উনি কাছাকাছিই ছিলেন তাই রক্ষে। খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে এলেন আমাদের ঘরে। তারপর এমন ওষুধ দিলেন যে খাওয়া মাত্রই ভাল হয়ে গেলাম। সেদিন থেকে যতদিন পর্যন্ত না আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম ততদিন উনি রোজ এসে আমাকে ওষুধ দিয়ে যেতেন।

তারপর?

তারপর আর কী? ভাল হবার পর আমিও যখনতখন যেতাম তোমার জেঠুর কাছে। তোমার জেঠু খুব ভোজনরসিক লোক ছিলেন। অনেক টাকার মালিক তো। প্রতিদিন একটা দুটো করে মুরগির মাংস উনি রান্না করে খেতেন। ওনার

ইকলু চাকরটা আদিবাসী হলে কী হয় রান্নার ব্যাপারে খুব পটু ও। ভাল সাইকেল চালাতে পারত। ঘাটশিলা থেকে জেঠুর জন্যে ভাল ভাল সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে আসত। তবে জেঠু কিন্তু সবই একা খেতেন না। পঁচিশ-ত্রিশ টাকার মিষ্টি কিনে এনে নিজে সামান্য কিছু খেয়ে, বাকি সব ইকলুকে দিয়ে বিলিয়ে দিতেন। আমি আসলে ওই সব ভাল ভাল জিনিস খাবার লোভেই এখানে আসতাম। মাঝে মাঝে তোমার জেঠুকে বলতাম, আচ্ছা জেঠুমণি! তুমি চাকরি করো না, চুরিডাকাতি করো না। তবু তুমি এত টাকা পাও কোথা থেকে? জেঠু হেসে বলতেন, ভগবান দেয়। ওরে বেটি! আমি যা কখনও চিন্তাও করিনি ওই ওপরতলা ভগবান না চাইতেই আমাকে তাই দিয়েছেন। আমার অনেক— অনেক টাকা। আমার যা টাকা আছে তাতে আমি এই শহরটাকেই কিনে ফেলতে পারি। তাই শুনে আমি বলতাম, তা হলে তুমি এই বনেজঙ্গলে তাঁবুতে রাত কাটাও কেন? গাছের ওপর ঘর করে থাক কেন? ভিলসর্দারের ওখানে মাটির নীচে ঘরের ভেতর লুকাও কেন?

তা জেঠু বলতেন, জানিস বেটি, টাকা-পয়সা বিষয়সম্পত্তি এসব হচ্ছে মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকবার একটা অবলম্বন। বহু কষ্ট করে এসব অর্জন করতে হয়। কিন্তু আমি যখন কষ্ট না করেই এইসব পেয়ে গেছি তখন কেন ছুটব আলেয়ার পিছনে? এই যে অরণ্য এর রূপ, রস, গন্ধ যে মানুষ ভোগ না করল, তার জীবনই বৃথা। গভীর নিশীথে এই ঝরনা বা নদীতীরে হরিণের জল খেতে আসা যে দেখল না তার কীসের জনম? এই গাছের ওপর ঘরে শুয়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বনভূমির সৌন্দর্য যে উপভোগ করতে না এল তার কি জন্য পৃথিবীতে আসা? অবশ্য ইচ্ছে থাকলেও অনেকের জীবনে তা ঘটে ওঠে না। কেন না তাদের ঘর আছে, সংসার আছে, তাদের রুজি রোজগারের জন্যে ছুটতে হয়। আমার তো তা নেই। এই অরণ্য তার যে সম্পদ আমার হাতে তুলে দিয়েছে তাতে আমি রাজার ঐশ্বর্য পেয়ে গেছি।

দীপংকর অবাক বিস্ময়ে চম্পার মুখের দিকে চেয়ে সব কথা শুনে যেতে লাগল। যদিও এই ছোট ডালপাতার ঘরে কোনও আলো না থাকায়, ওর মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না, তবুও ওব ভ্রমরকালো চোখদুটো যেন কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কই মাছের মতো ছটফট করছিল। দীপংকর বলল, বলে যাও। বলে যাও চম্পা। তারপর?

তারপর আমি জেঠুর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম এই অরণ্য তোমার হাতে কী সম্পদ তুলে দিয়েছে জেঠু! জেঠু বললেন, অমূল্য সম্পদ। এক সময় আমি জাহাজে চাকরি করতাম। সাহেবদের কাছ থেকে অনেক গিনি মোহর উপহার পেতাম। এরকম অনেক আমার ভাইয়ের কাছে গচ্ছিত আছে। আমার

ভাই, বউমা এবং তোর বয়সি ওদের একটি ফুটফুটে ছেলেও আছে। ওই গিনি আমি তাদের ভোগ করবার জন্যে দিয়েছি। তাদের বলেই রেখেছি আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কেউ ওতে হাত দেবে না। আমি মরে গেলে যদি কখনও খুব বিপদে পড়, তখনই শুধু খরচা করবে ওগুলো। কারণ অযথা বড়লোক হবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ করতে নেই, বা পুঁজি নষ্ট করতে নেই। এতে মানুষ নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে। যাই হোক, ওদের কাছে গিনিগুলো গচ্ছিত রাখলেও নিজের জন্য উপার্জিত অর্থ কিছু রেখেছিলাম। তাই দিয়ে টাটানগরে একটা বাড়ি করেছি। ব্যাঙ্কেও রেখেছি প্রচুর টাকা। এ টাকা অবশ্য জাহাজে কাজ করে উপার্জন করিনি। এটা সোনা কেনাবেচার দালালি করে উপার্জন করেছি। এই সোনার নদীর দেশের রেণু থেকে সোনাখোঁচারা স্বর্ণসন্ধান করলে তা আমার মধ্যস্থতায় বিক্রি হত। এইভাবেই যখন অল্প পরিশ্রমে আমি প্রচুর টাকার মালিক হলাম, তখন এই অরণ্যমায়ায় পড়ে গেছি। ভাবলাম আর কী হবে অর্থ? অনেক—অনেক তো হয়েছে। এত যে তা সারাজীবনে দু'হাতে খরচ করেও শেষ করতে পারব না। অতএব পেটের চিন্তা যখন নেই তখন পরম নিশ্চিন্তে জীবনের বাকি দিনগুলো প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ উপভোগ করে যাই। মানুষের সেবা করি। এইভাবেই আমার অরণ্যজীবন শুরু হল।

দীপংকর বলল, আমার কী মনে হচ্ছে জানো চম্পা, তুমি যেন রূপকথার কোনও গল্প আমাকে শোনাতে বসেছ। সবচেয়ে আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরে বাংলায় কথা বলছ তুমি, অথচ তোমার জিভের কোনও জড়তা নেই। কী পরিষ্কার বাংলা, আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই তোমার মা-বাবা বাঙালি ছিলেন।

হয়তো। তবে বাংলায় কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগে। আর অনর্গল যখন বলতে থাকি তখন বলার মধ্যে বেশ সরলতা এসে যায়। কিন্তু পরে আবার যে কে সেই। ঠিক দু'-এক কথার মাঝে হিন্দি বলে ফেলি। রোজ যদি তোমার সঙ্গে কথা বলি তা হলে দেখবে আর আমার কথায় হিন্দির টান আসবে না।

দীপংকর বলল, রাত এখন কত তা কে জানে? সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি আবার শুরু করো আমার জেঠুর কথা।

হ্যাঁ। তোমার জেঠু বলেছিলেন, এইভাবে অরণ্যবাস করতে করতে একদিন তিনি ভেলুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ধারাগিরি পার হয়ে আরও গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে চলে যান। এমন সময় হঠাৎ দেখলেন কয়েকজন লোক ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠে মালপত্তর চাপিয়ে কোথায় যেন চলেছে। তাদের একজনের হাতে বন্দুকও ছিল। জেঠু সহসা আক্রমণ না-করে, সাহসে ভর করে ওদের অনুসরণ করেন। ওরা একটি গুহার মধ্যে সেই সব মাল খালাস করে চলে যায়। ওরা চলে যাবার

পর, জেঠু ওদের লুকিয়ে রাখা মালপত্তরগুলো পরীক্ষা করতে গিয়েই অবাক হয়ে যান। দেখেন কিনা তাল তাল সোনা। আর সেই সোনার সঙ্গে কিছু অলংকার দেখেই জেঠুর মনের কোণে কীসের একটা সন্দেহ যেন ঝিলিক মেরে ওঠে। জেঠু বার বার সেগুলো দেখতে থাকেন। এ যে তাঁর অতি পরিচিত। এই অলংকার মিলারসাহেবের মেম হেনরিয়েটার। আর ওই মুদ্রাও তো মিলারসাহেবেরই চুরি করা। অর্থাৎ এত সব চুরি করেও আশ মেটেনি। তাই আরও অধিক কিছু পাবার লোভে খুন করে মিলারসাহেবকে। কিন্তু খুন যে করে সে তো কুন্দনলাল। তবে কী...।

জেঠুর ডায়েরির সেই অংশটার কথা মনে পড়ল দীপংকরের। চম্পা আর কিছু বলার আগেই দীপংকর বলল, জেঠুর ডায়েরি আমি পড়েছি! কুন্দনলাল মিলারসাহেবকে খুন করে প্রচুর সোনা নিয়ে পালাতে যাবার সময় আমার জেঠু ওকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। সেই সময় দু'জনের ধস্তাধস্তিতে কুন্দনলাল ভিক্টোরিয়া জাহাজ থেকে গঙ্গার জলে পড়ে যায়। গঙ্গায় তখন ষাঁড়াষাঁড়ির বান! সেই বানের তোড়ে কোথায় ভেসে যায় কুন্দনলাল তা কে জানে? তারপর হঠাৎ একদিন তার সাথে অনেক— অনেকদিন পরে দেখা হয় খড়্গপুরের গোলবাজারে। সে যাই হোক, কুন্দনলালের লুট করা ওই সোনার ব্যাপারে আর কিছু জানা যায় না। সেগুলো কি জাহাজেই পড়ে থাকে? না জেঠু নিজেই সেগুলো নিজের কাছে রেখে দেন? না হলে এত অর্থ ওই জাহাজের চাকরি ছাড়ার পরই কী করে উপার্জন করেন জেঠু?

চম্পা বলল, সে ব্যাপারটা আমাদের অবশ্য না-জানলেও চলবে। তা ওই সম্পত্তি মানে ওই গুহার ভেতর থেকে সোনার তাল, অলংকার, গিনিগুলো জেঠু উদ্ধার করে আনেন। তারপর সেগুলো এমন এক জায়গায় উনি লুকিয়ে রাখেন যে তা কেউ জানে না। একমাত্র আমি ছাড়া।

সে কী!

হ্যাঁ। তুমি কি বিশ্বাস করবে দীপংকর! উনি আমাকে এত ভালবেসে ফেলেছিলেন যে, বলে গেছেন, হঠাৎ যদি কখনও আমি মারা যাই তা হলে ওগুলো তোর হবে। তোর বিয়ের জন্য যৌতুক হিসেবে আমি ওগুলো রেখে গেলাম। দেখিস, যেন ভুলেও এ কথা কাউকে বলিস না। তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুই-ই বঞ্চিত হবি তোর প্রাপ্তি থেকে।

তুমি জানো সেগুলো কোথায় আছে?

জানি। তোমাকেও দেখাব। কাল সকালে আমরা সেখানে গিয়ে উদ্ধার করব সেগুলো। সব হয়তো পারব না। করব কিছু কিছু। তারপর তোমাকে নিয়ে চলে যাব তোমাদের বাড়িতে।

কিন্তু জেঠুর খুনের ব্যাপারটা?

হ্যাঁ। ওই সোনার তাল, মুদ্রা এবং অলংকার সেই গুহা থেকে সরিয়ে আনার পর হঠাৎ কিছু লোক ওই জেঠুকে সন্দেহ করে পিছনে লাগে। তাদের মধ্যমণি ছিলেন লালজি। অর্থাৎ ওই কুন্দনলাল। তবে এখানকার বুনোরা বা মা রংকিনীর সেবায়েত ওই ভিলরা জেঠুর সহায় ছিলেন বলে লালজি খুব একটা সুবিধে করতে পারছিলেন না। আমার মনে হয় সেইজন্যে লালজিই জেঠুকে খুন করেছেন। যে রাতে জেঠুকে খুন করা হয়, ভেলুয়া সে রাতে আমার কাছে ছিল। সেদিন ছিল শনিবার। আমি কুসুমডির হাটে ঘুরে বেড়িয়ে তোমার জেঠুর দেওয়া কাচের চুড়িতে দু'হাত ভরিয়ে যখন বাড়ি ফিরতে গেলাম, তখন বেলা গড়িয়েছে। তাই জেঠু ভেলুয়াকে আমার সঙ্গে দিলেন। ব্যস। সেই সুযোগে সেই রাতেই খুন হয়ে গেলেন জেঠু।

হঠাৎ ভয়ংকর একটা নিনাদে সেই অরণ্যভূমি থর থর করে কেঁপে উঠল। দীপংকর ভয়ে চিৎকার করে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল চম্পাকে। ওর মধ্যে ও যেন আর নেই তখন।

চম্পাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তারপর বলল, ও কিছু না। বাঘের ডাক।

পরক্ষণেই চারদিক থেকে ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। শুরু হল কুকুরের ক্রুদ্ধ চিৎকার। বনের পাখিরা ভয় পেয়ে আকাশময় উড়ে এলোমেলো ভাবে পাক খেতে লাগল। কী বিপর্যয়। ওরা ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখল, একটা বিশাল দেহ বাঘ ওদেরই গাছের নীচে বসে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ছে। দীপংকর ভয়ে কানে আঙুল দিয়ে চোখ বুজল। বাঘটা চলে গেল একটু পরেই। কেন না ক্যানেস্তারা বেজে উঠলে মানুষ জেগে উঠেছে বুঝলে বাঘ আর থাকে না। একটু পরে দীপংকর ঘুমিয়ে পড়ল।

বনমোরগের ডাকে যখন ঘুম ভাঙল দীপংকরের, তখন দেখল অল্প অল্প করে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে এই মৌনীস্তব্ধ গিরিঅরণ্যে।

এক সময় চম্পাও উঠে বসল। তারপর দু'হাত টান করে হাই তুলে বলল, স্যরি। জেগে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চলো চলো, আর দেরি নয়। দিনের আলোতেই যত ভয়। ইকলুদের গ্রামে না-পৌঁছনো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। কেন না আমার মন বলছে বাবুজির লোকজন সকাল হলেই এইদিকে আমাদের খোঁজে আসবে। বলেই দড়ির মইটা ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিল চম্পা। তারপর সেই মই বেয়ে দু'জনেই নামল গাছ থেকে। কুড়িয়ে পাওয়া সেই কুড়ুলটা দীপংকর কিন্তু সঙ্গে রাখতে ভুলল না।

ভেলুয়া কাছেপিঠেই ছিল। ওদের নামতে দেখেই লেজনেড়ে ছুটে এল সেখানে। তারপর আবার চরৈবেতি। অর্থাৎ চলা শুরু হল।

পাহাড়ের পথে একটা উতরাই পেরোতেই ওরা একটা ঝরনার ধারে এসে পৌঁছুল। সেখানে ঝরনার জলে মুখহাত ধুয়ে বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে নিল ওরা।

দীপংকর বলল, আমার খুব খিদে পাচ্ছে। কী করি বলো তো?

কী আর করবে? আমারও খিদে পাচ্ছে খুব। কিন্তু এখানে এই অরণ্যে কোথাও কিছু নেই। কাল থেকে পথ হাঁটা কী কম হল? ভেলুয়াটাও খায়নি কিছু। এই সময় একটু কিছু পেটে না-দিলে যে আর পথ চলতে পাচ্ছি না।

এমন সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে দু'জন সশস্ত্র যুবক কালো প্যান্টি আর ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে ওদের সামনে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল। দু'জনেরই চেহারা দানবাকৃতি। চোখেমুখে নৃশংসতার ছাপ। ওদের হাতে উদ্ধত ছোরা। ওদের একজন বলল, আরে চম্পা! তু হিঁয়াতক ক্যায়সে আ গিয়া? ও লেড়কা কৌন হ্যায়?

চম্পা রেগে বলল, তু পুছনেয়ালা কৌন?

আর একজন বলল, তুই লালজির সাথে টক্কর মারতে যাচ্ছিস চম্পা! তুই কি ভেবেছিস এই লেড়কাকে নিয়ে ভাগবি, আর মানিকবাবুর লুটেরা মাল হাপিস করবি, তা আমরা বসে বসে দেখব? কাল রাত থেকে তোদের দু'জনকে খুঁজছি আমরা। কোথায় যাচ্ছিস তোরা? গুপ্তধন নিতে?

চম্পা বলল, পথ ছোড়ো। বদমাশ কাঁহাকা। হট যাও।

আমরা হটে যাবার জন্যে আসিনি চম্পা। তোদের দু'জনকে লালজির কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমরা এসেছি। বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল চম্পার ওপর।

চম্পা চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও বাঁচাও।

ভেলুয়া তখন বাঘের মতো লাফ দিয়ে লোকটার ঘাড়ে পড়েছে। তারপর আঁচড়েকামড়ে একশা করতেই, চম্পাকে নামিয়ে দিয়ে পালাতে গেল।

ভেলুয়া খ্যাপার মতো তাড়া করল তাকে।

আর একজন হতভম্ব হয়ে যেই-না ছোরা উঁচিয়ে আক্রমণ করতে আসবে দীপংকরকে, সেও অমনি কুড়ল উচিয়ে আক্রমণ করল তাকে।

মুহূর্তের ব্যাপার। দেখা গেল সেই ভয়াবহ আক্রমণকারীর ছোরাধরা কাটা হাতটা পড়ে আছে পাথরের ওপর। আর সে থরথর করে কাঁপছে, এ ক্যা কর দিয়া তুমনে? মেরা হাত দে দো।

দীপংকর বলল, এই হাত দিয়েই তোরা আমার জেঠুকে খুন করেছিলি। তোকে দিয়েই আমার বদলা নেবার পালা শুরু। শেষ হবে কুন্দনলালকে দিয়ে। যদি আর একটা হাত খোয়াতে না-চাস তো ভাগ এখান থেকে।

লোকটা পালাল।

আগের লোকটাকে তাড়িয়ে ভেলুয়া তখন ছুটতে ছুটতে আসছে। ভেলুয়া এলে চম্পা, দীপংকরও ছুট লাগাল। আর কেউ থাকে এখানে?

সাত

ওরা দু'জনে এবং ভেলুয়া একটি সংকীর্ণ বনপথ ধরে ছোটা শুরু করল। একটু ছুটে আসার পরই পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল দীপংকর, উ হু হু। বাবারে, মরে গেলুম।

কী হল! কী হল দীপ।

দীপংকরের পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথাটা কেটে গিয়ে তখন গল গল করে রক্ত ঝরছে।

চম্পা বলল, লেগেছে খুব?

হ্যাঁ। ভীষণ জ্বালা করছে।

ওতে কিছু হবে না। পাথুরে জায়গা। আমার অমন কত লাগে। দাঁড়াও এক্ষুনি রক্ত বন্ধ করে দিচ্ছি। বলে ছুটে গিয়ে তিন রকম গাছের পাতা হাতের তালুতে কচলে লাগিয়ে দিল দীপংকরের পায়ে। এরপর ওর পায়ের দু'-এক জায়গায় অতি চমৎকারভাবে ম্যাসেজ করে ওর হাতধরে টেনে তুলল ওকে।

দীপংকর বলল, খুল লেগেছে। আর একদম ছুটতে পারব না।

আর ছুটতে হবেও না। আমার হাত ধরো। ধরে একটু একটু করে পা ফেলে এগিয়ে এসো।

দীপংকর তাই করল। চম্পার হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে ভর করে একটু একটু চলা শুরু করল। এইভাবে কিছু পথ আসতেই এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে চম্পা বলল, আরে এসে গেছি। ওই দেখা যায় বাসাডেরা গ্রাম। ওখানেই আমাদের ইকলু থাকে। তবে কী জানো দীপ, এখানেও আমরা বিপদমুক্ত নই। তার কারণ লালজির লোকেরা জেনে গেছে আমরা পালিয়ে এসেছি এখানে। হয়তো আমার বাবুজিও জেনে যাবে। কাজেই ওই পাহাড়ে তোমার জেঠুর সম্পত্তি যেখানে আছে, সেখানে যাওয়াটা হয়তো আমাদের উচিত হবে না।

সে কী! তা হলে এত কষ্ট করে এখানে আসাটাই তো বৃথা।

যেতে পারি। কিন্তু প্রচণ্ড লড়াই বেধে যাবে। হয়তো সেই যুদ্ধে তোমাকে আমাকে দু'জনকেই মরতে হতে পারে। রাজি?

রাজি। আমি মরতে চাই। তবে ওই ধনরত্নের সন্ধান লুঠেরাদের হাতে তুলে

দিয়ে নয়। ওদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে। তোমাকে জেঠু নিজে হাতে যা দিয়ে গেছেন তা উদ্ধার না করে আমি যাব না। আমার হয়তো ফাঁসি হবে, কিন্তু তোমার তো দীর্ঘ জীবন আছে।

চম্পা দীপংকরের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, বার বার তুমি ওকথা বলো না দীপ। তা হলে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে যাবে। মা রংকিনীর ওপর ভরসা রাখো। মা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন। হয়তো শেষ পর্যন্ত তোমার কিছুই হবে না।

এই বলে কথা বলতে বলতে ওরা বাসাডেরা গ্রামে পৌঁছুল। ওই তো ইকলুর কাঠের ঘরের দোতলায় ইকলু বসে বসে কী যেন খাচ্ছে। জেঠুর পয়সায় ইকলুও তো এখন বড়লোক।

চম্পা দূর থেকেই ডাকল, ই-ক-লু...উ...।

ভেলুয়া ইকলুকে দেখেই ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে মনের আনন্দে ছুটল ইকলুর বাড়ির দিকে।

ইকলুও তখন বারান্দা থেকে ওদের দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে। কী আনন্দ! কী আনন্দ!

ওরা ইকলুদের বাড়িতে যেতেই কোনও আত্মীয়কুটুম্ব সব এলে যে রকম হয়, সেই রকম হইচই পড়ে গেল। ইকলু দোতলা থেকে নেমে এসে চম্পাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল।

আর ভেলুয়া করল কী, ইকলুকে আঁকড়ে ধরে অনবরত কেঁউ কেঁউ করতে লাগল। ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল! ইকলু পরমাদরে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তখন।

চম্পা বলল, আমাদের খুব বিপদ। এই বিপদে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে ইকলুভাই।

বলুন দিদিভাই কী করতে হবে?

তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই এই ছেলেটির সঙ্গে। এই যে ছেলেটি দেখছ, এ হচ্ছে তোমার মনিব সেই মানিকজেঠুর ভাইপো।

হ্যাঁ হ্যাঁ। দীপংকর। ডাক নাম দীপু। বাবুর কাছে অনেকবার শুনেছি ওর কথা। ছোটবেলায় ওকে তো দেখেওছি। বাবু টাটানগরে বাড়ি করবার পর তো ও এসেছিল। তখন অবশ্য ও ছোট ছিল খুব। তা ও এখানে কী করে এল?

সেই কথাই তো বলব তোমায়। এখন আমরা কয়েকটা দিন থাকব তোমাদের এখানে। আমাদের দু'জনকে এখানে একটু আশ্রয় দিতে হবে। আর খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমাদের। এখুনি তুমি আমাদের দু'জনকে কিছু খেতে দাও। কাল থেকে প্রায় না-খেয়েই আছি আমরা। খেতে খেতে সব বলব।

ইকলু অবাক চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দীপংকরের দিকে। তারপর

বলল, বসো। বসো তোমরা। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি তোমাদের জলখাবারের। বলেই ভেতর বাড়িতে ঢুকে গিয়ে সম্ভবত ওর বউকে কোনও কিছু করবার নির্দেশ দিয়ে এল।

একটু পরেই ওপরের ঘরে ইকলুর বউ ও মেয়েরা দু'থালাভর্তি মুড়ি, রাঙালু সিদ্ধ আর আলু-মরিচ দিয়ে গেল।

ইকলুর বউ বলল, চা খাও তো তোমরা? চা আনছি আমি।

দীপংকর ও চম্পা হাসি মুখে বলল, হ্যাঁ খাই। বলে খুব তৃপ্তি করে সেই সব খেতে লাগল। খেতে খেতেই সব কথা খুলে বলল ইকলুকে।

সব কিছু শোনার পর রাগে লাল হয়ে উঠল ইকলুর মুখ। ওর দু'চোখে যেন আগুন ছুটতে লাগল। বেশ বজ্রকঠিন গলায় বলল, তোমাদের কোনও ভয় নেই ভাই। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ এই গ্রামে ঢুকে ওরা তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। বাবুজিকে খুন করার অপরাধে এখানকার বুনোরা এখন এমন খেপে আছে যে লালজির লোকদের দেখলেই মেরে ফেলবে ওরা।

কিন্তু তবুও ওরা তো আমাদের খোঁজে না-এসে পারবে না।

শুধু তোমাদের খোঁজে কেন, ওদের মুখের গ্রাস বাবুজি যেভাবে ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাতে সেই সবের খোঁজেও ওদের আসতে হবে! চোরাগোপ্তাভাবে রাতের অন্ধকারে আসেও ওরা এখানে। তবে এ গ্রামে নয়। ওই ওধারে যে পাহাড়গুলো রয়েছে দেখছ ওইখানে।

চম্পা বলল, জানি আমি। ওই গহন গিরিকন্দরে গুহায় গুহায় কেন ওরা কীসের আসায় ছুটে বেড়ায় জানি। আজ এখনই ওইখানে আমাদের যেতে হবে। তাই—।

না দিদিভাই। ওখানে পাহাড়ের ফাটলের গায়ে যে স্বর্ণশিরা আছে, তাই থেকে সোনার সন্ধানে এখনও ওই পাহাড়মালার অধিবাসীরা রুজি-রোজগারের ধান্দা দেখছে। ওদের সঙ্গেও লালজির লোকদের যোগাযোগ। কাজেই ওখানে তোমাদের যাওয়া ঠিক হবে না।

তা হলে জেঠু নিজে হাতে আমাকে যা দিয়ে গেছেন, তা তো চিরকাল ওইখানে লুকানো থাকবে।

তা কেন? খুব সাবধানে এবং কৌশলে ওগুলো আনতে হবে। কিন্তু সে কাজ এখনই না। আরও দু'-চার দিন যাক। তার আগে ওদের গতিবিধি আমি লক্ষ করি।

চম্পা বলল, আচ্ছা ইকলুভাই, ওখানকার পাহাড়িরা তো আমাকে চেনে। আমি যদি ঘুরে বেড়ানোর ছলে ওখানে যাই?

না যেয়ো না। তার কারণ তখন তুমি এমনই যেতে। তোমার জেঠুকে সবাই মানত, ভয়ও করত। এখন তিনি নেই এবং তুমি ছেলেমানুষ, কাজেই ওইসব মালপত্তর নিয়ে আসতে গেলেই বিপদে পড়বে তুমি। ওরা ঠিক তোমার পিছু নেবে এবং ছিনতাই করবে। তা ছাড়া তোমায় তো বলেইছি ওই লালজির অনেক লোক ওখানে আছে। বিশেষ করে লালজির গোপনীয় অনেক কিছুই লুকানো আছে ওই সব গুহায়। কাজেই ওখানে গেলে তোমাদের দু'জনকে আলুভাতের মতো মুখে পুরে নেবে ওরা। এক, যেতে পারো রাত্রিবেলা। কিন্তু তখন হিংস্র জানোয়ারগুলোর উপদ্রবে পথ চলতে পারবে না। কাজেই ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে একটা মতলব বার করতে হবে।

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল ওরা, ইকলু! এ ইকলু ভেইয়া? জেরা শুনো তো?

ইকলু সেই ডাক শুনে বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে বলল, আরে ঠাকুর সিং? কী ব্যাপার!

থোড়া সা গড়বড়। আমার চম্পা বিটিয়া তুমহারা পাশ আয়া কি নেহি?

চম্পা! কই না তো!

আয়া নেহি?

না। তবে বাবুজির কুকুর ভেলুকে আজ সকাল থেকে এখানে দেখছি! একথা না-বলা ছাড়া অবশ্য আর কোনও উপায় ছিল না। তার কারণ ভেলুয়া অদূরেই উঠোনে শুয়ে শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছিল। ইকলু বলল, চম্পাদিদি এখানেই বা আসবে কেন? আপনি কি বকাঝকা করেছেন কিছু?

ওসব কোনও ব্যাপারই নয়। তো ঠিক আছে, ও যদি এখানে আসে তা হলে যেভাবেই হোক ওকে এখানে আটকে রাখবে। ওর সঙ্গে একটা ছেলেও থাকবে হয়তো। আমি বিকেলের দিকে আর একবার এখানে খোঁজ নিতে আসব। ভেলুয়া যখন এখানে এসেছে তখন ওরা খুব কাছাকাছিই আছে।

ইকলু বলল, ঠাকুর সিং? আপনি আর কোনও সময়েই এখানে আসবেন না। কারণ আমাদের এখানকার লোকেরা আপনার ওপরেও খুব একটা সন্তুষ্ট নয়। চম্পা আমার কাছে কোনওরকমে এসে পড়লে আপনি জানবেন ও খুব নিরাপদেই থাকবে। কিন্তু আপনার লালজির নজর নেই তো ওর ওপর?

আছে ইকলু ভাই। ওর সঙ্গে একটা লেড়কাও আছে। ওই লেড়কা মানিকবাবুর ভাই কা লেড়কা! মাথার একটু গোলমাল আছে। বাড়ির কথা মনে করতে পারছে না। কাউকে চিনতে পারছে না। তা ওই লেড়কাটাকে বাড়িতে রেখেই আমি ভুল করেছি। চম্পা বিটিয়াকে সাথে নিয়ে ও ভেগেছে। ওর জন্যে আমার লেড়কি বিপদে পড়ে যাবে।

ইকলু সব শুনে বলল, বাবুর ভাইয়ের লেড়কাকে তুমি ঘরে রেখেছ। লালজির সঙ্গে ওদের দুশমনি, আর তুমি বলছ ও তোমার বিটিকে নিয়ে ভেগেছে। ঠাকুর সিং! তোমার উমর কত হল? তুমি কি এই কথাটা একবারও মনে করতে পারছ না যে, ওই লালজিই ওদের দু'জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও?

ঠাকুর সিং প্রায় চিৎকার করে উঠল, ইকলু! তুমি— তুমি ঠিকই বলেছ ইকলু। এই কথাটা তো আমার একবারও মনে হয়নি। লালজির লোকেরাও ওদের সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই ভেলুয়াটা ওরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এইখানে এসে জুটল কী করে?

ইকলু বলল, আমি এদিকটা দেখছি। তুমি লালজির দিকে নজর রাখো ঠাকুর সিং। যাও দেরি কোরো না।

ঠাকুর সিং দেরি করল না। অদূরে গাছের ডালে বেঁধে রাখা একটা দেশি ঘোড়ার পিঠে চেপে পাহাড়ি পথের বাঁকে উধাও হয়ে গেল।

ঠাকুর সিং চলে যাবার অনেক পরে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। পেট ভরে জল খাবার খেয়ে, চা খেয়ে ওরা এখন তৃপ্ত।

ইকলু বলল, আর তোমাদের ভয় নেই। আমি এখুনি লোক লাগিয়ে দিচ্ছি। তারা চারদিকে নজর রাখবে। এই এলাকার ভেতরে কেউ ঢুকলেই তির-কাঁড় দিয়ে শেষ করে দেবে তাকে। বলেই ইকলু হন হন করে কোথায় যেন চলে গেল।

চম্পা ও দীপংকর দেখল একজন আদিবাসী লোক উঠোনের প্রান্তে বসে মুরগি কাটছে। তার মানে দুপুরে মাংস-ভাত ভালই জমবে।

চম্পা বলল, চলো দীপ, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।

কোথায়?

যেখানে আমাদের জেঠুর সমাধি সেইখানে।

একথা শুনেই দীপংকরের মন উতলা হয়ে উঠল। বলল, চলো চলো। আগে সেখানে যাই।

চম্পা ডাকল, আয় ভেলুয়া। আ যা মেরা সাথ।

দীপংকর বলল, আবার হিন্দি!

স্যরি!

ওরা দু'জনে ইকলুদের গ্রাম ছেড়ে কোথায় যেন এগিয়ে চলল। সঙ্গে চলল ভেলুয়া।

বেশ কিছু পথ আসার পর ঝর ঝর করে একটা জল পড়ার শব্দ শোনা গেল। দীপংকর কানখাড়া করে সেই শব্দ শোনার পর বলল, ও কীসের শব্দ! মনে হচ্ছে যেন, কাছেই কোনও জলপ্রপাত আছে।

হ্যাঁ। ওই সেই বিখ্যাত ঝরনা ধারাগিরি। ওই—ওই দেখো। আর ওইখানে ওই যে যিশু ক্রশ দেখছ, ওটাই হচ্ছে জেঠুর সমাধি।

ভেলুয়া এতক্ষণ মন্থর গতিতে ওদের সঙ্গে আসছিল। এবার তিরবেগে ছুটে সেই সমাধির ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল।

দীপংকর ও চম্পাও ছুটল।

চম্পা বলল, এই এখানে তোমার জেঠু তাঁবু খাঁটিয়ে থাকতেন।

কিন্তু এ তো দেখছি গভীর জঙ্গল চারদিকে। এখানে বাঘ আসত না?

বাব্বাঃ। তা আবার আসত না? তবে উনি খুব সাহসী লোক ছিলেন। তার ওপর জাল দিয়ে চারদিক ঘেরা থাকত। তাই বাঘ-ভালুকে কোনও ক্ষতিই করতে পারত না জেঠুর।

কথা বলতে বলতেই ওরা এখান-সেখান থেকে কিছু বনফুল তুলে ফেলল। তারপর সেগুলো এপিটাফের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে প্রণাম জানাল জেঠুর স্মৃতির উদ্দেশে।

আর ভেলুয়া? সে সমানে গড়াগড়ি খেতে লাগল সেখানে। মুখ দিয়ে 'আঁউ আঁউ' শব্দ করে কী করুণভাবে কাঁদতে লাগল।

চম্পা বলল, আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা আবার আসব এই পথে।

তারপর?

তারপর আজই যাব ওই দূরের পাহাড়ে। সেখানে ছোট্ট একটি গুহার ভেতরে এক গোপন স্থানে আমার সম্পত্তি লুকানো আছে। যা তোমারও।

কিন্তু আমার যে খুব ভয় করছে।

কীসের ভয়?

যদি বাঘ-ভালুকের হাতে পড়ি?

সে ভয় যে নেই তা নয়। তবু সাবধানে সাহসে ভর করে যেতে হবে। ইকলুকে জানাব না। ওর ওখান থেকে গোটা দুই ছোরা নিয়ে লুকিয়ে পালাব। একটা দড়ি জোগাড় করতে হবে।

ওসব কী হবে?

পাহাড়ে উঠতে গেলে এগুলো চাই।

আমি বলছিলাম কী, আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে যদি খুব ভোর ভোর যেতে?

তা গেলেও হয়। তবে সকালের দিকে লোকজন এসে পড়ার সম্ভাবনাটা খুব। কারণ মাঝেমাঝে অনেকে ওইখানে পাথর কাটতে আসে। ওরা থাকলে কিন্তু আমাদের জিনিসপত্তর ওদের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে আসা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে আমি চাই কী, ওগুলো সংগ্রহ করে রাতটা ওই

গুহায় কাটিয়ে কাল খুব ভোর ভোর উঠে রওনা দেব। তারপর যেখানেই হোক পালাব এখান থেকে।

তা না হয় হল। কিন্তু ওই রত্নসামগ্রী নিয়ে দিনমানেও কি পালাতে পারব আমরা? যদি কেউ কেড়ে নেয়?

সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। এখন চলো ঘরে ফেরা যাক।

এমন সময় ইকলুর গলা শোনা গেল, চম্পা দিদিভাই! ও চম্পা দিদিভাই! বলি এখানে কী করছ?

চম্পা হাসি মুখ করে বলল, দীপংকরকে দেখাচ্ছিলাম, ওর জেঠুর সমাধি।

আমাকে বলে আসা উচিত ছিল তো? আমি কত ভাবছি তোমাদের কথা। তোমরা এখন এমন একজনের নজরে রয়েছ, যার চোখ থেকে তোমাদের আড়াল করা অসম্ভব। অথচ রক্ষা তোমাদের করতেই হবে।

চম্পা বলল, ইকলুভাই, আমি কালই দীপুকে নিয়ে পালাতে চাই কলকাতায়। তুমি কি একটু ব্যবস্থা করে দেবে?

কালই চলে যাবে?

হ্যাঁ।

তোমার জিনিসগুলো নেবার তা হলে কী হবে?

ভাবছি লোভ করব না। যেখানকার জিনিস সেখানেই থাক। আমরা আপাতত পালিয়ে বাঁচি।

ইকলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, না না। তা ঠিক নয়। জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে কিছু কিছু জিনিসের খুবই প্রয়োজন আছে। তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যেয়ো। ওর মূল্য অনেক। আমি তো বাবুজির সামান্য ভৃত্য ছিলাম একজন। উনি আমাকেও বঞ্চিত করেননি। আমাকে উনি যা দিয়ে গেছেন তাতে এই গ্রামটাকে এখন আমি কিনতে পারি। এখনও অনেক— অনেক ধন রত্ন আমার ঘরের ভেতর মেঝের নীচে পোঁতা আছে। যা পেয়েছি তার দশভাগের এক ভাগেই আমি বড়লোক। বাকি ন'ভাগ এ জীবনে হয়তো খরচই করতে পারব না।

চম্পা বলল, আমি কিন্তু তোমার ওপর ভরসা রাখছি।

ইকলু বলল, বেশ। আজই আমি একটা খড়বোঝাই গোরুর গাড়ি ঠিক করে রাখব। তোমরা ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে এলেই ওই খড় চাপা দিয়ে আমি তোমাদের ঘাটশিলায় পৌঁছে দেব, কেমন?

এই চমৎকার প্রস্তাবে ওরা দু'জনেই আনন্দে নেচে উঠল। দীপংকর ঠিক করল ভেলুয়াকেও ওদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। এখন পেটভরে খেয়েদেয়ে ইকলুর ঘরে তেড়ে একটা ঘুম দিলেই সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে দু'জনের। ওরা পায়ে পায়ে ঘরের দিকে এগোল।

আট

ইকলুর বাড়িতে পেটভরে ভাত খেয়ে চম্পা ও দীপংকর যখন ওপরের ঘরে শুতে গেল তখন ভরতি দুপুর। ইকলুও ওদের সঙ্গে এল।

একটা চাটাই বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে নানা রকম গল্প করতে লাগল ওরা।

ইকলু বলল, আমাদের চম্পাদিদিভাইকে বাবুজি একেবারে মেয়ের মতন ভালবাসতেন। তা দীপংকরভাই, তুমি ওকে এখান থেকে নিয়ে গেলে ভালই করবে। বাবুজি ওর জন্যে যা রেখে গেছেন, তাতে তোমার মা-বাবাকে কষ্ট করে ওর বিয়ে দিতে হবে না। অবশ্য বাবুজি তো তোমাকেও অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। টাটানগরের বাড়িটা তুমি পেয়েছ। ব্যাঙ্কের প্রচুর টাকা। সবই তোমার।

দীপংকর বলল, আচ্ছা ইকলুভাই, বাবুজি খুন হলেন কেন? কে বা কারা করল এ কাজ? তোমাকেই বা মারধর করল কারা।

ওই ব্যাটা কুন্দনলালের লোকেরা। শেঠজি হয়ে ঘুরে বেড়ালে কী হবে। ওই লালজি হচ্ছে পাক্কা শয়তান একটা। এই সোনার নদীর দেশে সোনার লোভে ব্যাটা রক্তের স্রোত বহাতে এসেছিল। ওই পাহাড়ে গুহার ভেতরে ওরা ঘাঁটি গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু বাবুজির জন্য তা পারেনি। ও এইখানকার পাহাড়-জঙ্গল থেকে সোনা খুঁজে বের করত। আর সেই সোনা বিদেশে পাচার করত। কিন্তু বাবুজি তা হতে দেননি। ও বাবুজিকে বখরা দেবে বলে হাতে হাত মেলাতে এসেছিল। কিন্তু বাবুজি ঘৃণা ভরে ওকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেই ওর রাগ।

বাবুজি মারা যাবার পরও কি একাজ ও করছে?

জোর কদমে। এতেই তো ফুলে লাল হয়ে গেল। আমাকে কী কম মেরেছিল ওরা? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তবু আমি মুখ খুলিনি। ওরা আমায় অনেক— অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছিল। কিন্তু বাবুজির কসম, ওদের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সেই সব ধনরত্নের হদিস আমি দিইনি। যখন কিছুতেই ওরা আমার মুখ থেকে কথা আদায় করতে পারল না, তখন প্রায় শেষ করে দিয়ে গেল আমাকে। সাত আট জায়গায় ছোরা মারল। আসলে সেদিন আমরা কেউই তৈরি ছিলাম না। সবচেয়ে বড় কথা ভেলুও কাছে ছিল না সেদিন।

দীপংকর বলল, তুমি ওদের মুখ চিনতে পারবে?

ইকলু বলল, মুখে ওদের কালো কাপড় ঢাকা ছিল। কিন্তু থাকলে কী হবে? ওদের প্রত্যেকের গলার স্বর আমার চেনা। তবে সুযোগ পেলে ওদের আমি বদলা নিতে ছাড়ব না।

চম্পা বলল, আমার বাবুজি! বাবুজিও ছিল নাকি দলে?

না দিদিভাই। তোমার বাবুজির একটাই দোষ ও লালজির টাকা খেয়ে কাজ

করে। ইনফরমার! অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। অথচ নিজে কিছু করে না। তবে এককালে কিন্তু তোমার বাবুজির নামের ডাকে পাহাড়-পর্বত কাঁপত। তখনকার যত ট্রেনডাকাতি ও ট্রেনদুর্ঘটনা ঘটানোর নায়ক ছিল তোমার বাবুজি।

দীপংকর হঠাৎ বলল, আচ্ছা ইকলুভাই আমার জেঠু তো ডায়েরি লিখতেন। তোমার কাছে সে রকম লেখা টেখা কিছু নেই?

ইকলু লাফিয়ে উঠল, আছে বইকী! কত চাই? সব এই মাচার ওপর তোলা আছে। ঘরের কোণ থেকে ওই টুলটা নিয়ে এসে তার ওপর দাঁড়িয়ে পেড়ে নাও। বলেই বলল, আচ্ছা দাঁড়াও আমিই পেড়ে দিচ্ছি। বলে ইকলু নিজেই টুলে উঠে দশ-বারোখানা মলাট দেওয়া খাতা পেড়ে দিল।

দীপংকর সেগুলো সযতনে কুড়িয়ে নিতেই ইকলু বলল, ওগুলো তুমি ইচ্ছে করলে নিয়েও যেতে পারো। কেন না আমার কাছে থাকলে এগুলো উইয়ে কেটে নষ্ট করবে। আমি তো ওর মর্ম বুঝব না। আমি বাংলা বলতে পারি, বুঝতে পারি। কিন্তু লিখতে বা পড়তে পারি না।

দীপংকর বলল, সত্যি! তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব ইকলুভাই।

ইকলু বলল, যাক। এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম, যাদের জিনিস তাদের হাতেই তুলে দিতে পারলাম বলে।

দীপংকর ডায়েরির পাতাগুলো মেলে ধরে তার ওপর দু'চোখ স্থির করে যেন গ্রোগ্রাসে গিলতে লাগল লেখাগুলো। ওর একাগ্রতা দেখে ইকলু বলল, তুমি ততক্ষণ এগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নাও। আমি বরং নীচের ঘরে গিয়ে শুই।

দীপংকর বলল, তাই যাও। তারপর চম্পার ঢুলু ঢুলু চোখ দেখে বলল, তুমিও পারো তো একটু ঘুমিয়ে নাও। কেমন! আমি একবার পড়ে দেখি এর ভেতর কোথায় কী আছে।

চম্পা ঘাড় নেড়ে পাশ ফিরে শুল।

আর দীপংকর গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল ডায়েরির লেখাগুলো—

না। আমি কোনও ভুল করিনি। আজ এখানকার গভীর বন প্রদেশে গিরিগুহার আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে দেখি জনাচারেক লোক ছোট ছোট ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে কী যেন বয়ে আনছে। তাই না দেখেই আমার সন্দেহ ও কৌতূহল বেড়ে গেল। দেখলাম ওরা একটা গুহার ভেতরে ঢুকল।

ইকলুকে এক জায়গায় পাহারায় রেখে ভেলুকে নিয়ে আমি চুপিসাড়ে ওদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম ওরা গুহার একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে, একপাশ থেকে একটি লোহার সরু মই টেনে নিয়ে এসে তাতে ভর করে বেশ একটু উচ্চস্থানে উঠে সেগুলো কোথায় যেন রেখে এল। তারপর নীচে নেমে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা হুকে মইটা আটকে রেখে চলে গেল।

ওরা চলে যাবার অনেক পরে আমি গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কাজেই না-চলে আসা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

সেইরাত্রেই আমরা দু'জনে সশস্ত্র হয়ে আবার এলাম সেই গুহাতে। জানতেই হবে এর রহস্য। দেখতেই হবে ওর ভেতরে কী আছে। দেখলাম, শুধু গিনি আর অলংকার। এ তো সবই আমার পরিচিত। মনে পড়ল সেই ভিক্টোরিয়া জাহাজের কথা। মিলারসাহেব ও তার মেম হেনরিয়েটার কথা। মনে পড়ল কয়েক মাস আগে গোলবাজারে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া কুন্দনলালের কথা। এসব তা হলে ওই শয়তানটারই কাজ। কিন্তু এগুলো ও নিজের জিম্মায় না-রেখে এখানেই বা লুকিয়ে রেখেছে কেন? পুলিশের ভয়ে? হয়তো তাই। যাই হোক, শুধু গিনি আর অলংকারই যে ছিল ওর ভেতরে তা নয়। ড্যালা ড্যালা সোনাও ছিল। যা এখানকার পাহাড়-পর্বতের নিজস্ব সম্পদ। আমরা আসবার সময় দুটি ঘোড়া সঙ্গে এনেছিলাম। সেগুলো তাদের পিঠে চাপিয়ে চলে এলাম আমাদের জায়গায়। ধারাগিরি ঝরনার পাশে একটা জায়গায় গর্ত করে সেই সোনার ড্যালাগুলো পুঁতে রাখলাম। গিনিগুলো লুকিয়ে রাখলাম ইকলুর বাড়িতে। কিছু ওকে দেব এবং বাদবাকি পাঠিয়ে দেব ভাইয়ের কাছে। কাজে লাগবে ওর। তবু এই দুর্বৃত্তদের এইসব আমি কিছুতেই ভোগ করতে দেব না।

...জিনিসগুলো হাতছাড়া হওয়ায় কুন্দনলাল খ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে উঠল। একদিন সরাসরি আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে। তখন সন্ধে হয় হয়। ওর সঙ্গে দু'জন নৃশংস চেহারার লোক। কুন্দনলাল বলল, আমাকে চিনতে পারছ মানিকবাবু?

আমি তখন গভীর মনোযোগে টলস্টয়ের একটা বই পড়ছিলাম। মুখ না-তুলেই বললাম, কেমন আছ কুন্দনলাল?

এটা কিন্তু আমার জবাব হল না।

সে কী? তোমার নাম ধরে কুশল প্রশ্ন করলাম। তারপরেও কী বলতে হবে, হ্যাঁ চিনতে পারছি?

তুমি আমার দীর্ঘ দিনের শত্রু মানিকবাবু। ভিক্টোরিয়া জাহাজ থেকে তুমি আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিলে মনে আছে?

আমি ফেলে দিইনি। তুমি নিজেই অসাবধানে পড়ে গিয়েছিলে।

মিলারসাহেবের সমস্ত মালপত্তর হাপিস করে আজ তুমি প্রচুর টাকার মালিক হয়েছ।

হয়েছি। তবে মিলারসাহেবের জীবিত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমি কোনওরকম তঞ্চকতা করিনি কুন্দনলাল। যা তুমি দিনের পর দিন করেছিলে। কিন্তু তাতেও তুমি সন্তুষ্ট হওনি। মিলারসাহেব এবং হেনরিয়েটাকে খুন করে

সব নিয়ে তুমি পালাতে চেয়েছিলে। তাই বাধা দিয়েছিলাম।

তুমি যদি এতই মহৎ তো ওই জিনিস তুমি নিয়েছিলে কেন? বিবেকে বাধল না?

না। তার কারণ মিলারসাহেবের উত্তরাধিকারী আর কেউ ছিল না। অতএব তাঁর সবচেয়ে কাছের লোক হিসেবে আমি এগুলো আমার কাছে রেখেছি। এতে দোষ কোথায়?

কুন্দনলাল জ্বলে উঠল এবার। বলল, দোষ কোথায়? ওই জাহাজে কি একা তুমি ছিলে? আর কেউ ছিল না?

নিশ্চয়ই ছিল। ছিল বলেই আমি তোমার রাখা মালগুলোই শুধু হাপিস করে কেটে পড়েছিলাম। জাহাজটাকে তো নিয়ে পালাইনি। ওই জাহাজে অন্যান্য যারা ছিল তাদের জন্য তো গোটা জাহাজটাই রেখে এসেছি।

বটে! তা যাক। কিন্তু ওই গুহার ভেতর থেকে যে মাল তুমি সরিয়েছ তা যদি আমাকে ফেরত না-দাও তা হলে...।

তোমার স্মাগলিং বিজনেস কেমন চলছে কুন্দনলাল?

তার আগে বলো এগুলো তুমি ফেরত দেবে কি না?

ও মালগুলো আমিই নিয়েছি এমন ধারণা হল কেন তোমার? ওগুলো তো অন্য কেউও নিতে পারে?

ও। তুমি তা হলে স্বীকার করবে না। আমার দু'পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখছ তো? ওরা শুধু হাতে আসেনি।

আমি হেসে বললাম, তা হলে তুমিও পিছনে ফিরে চেয়ে দেখতে পারো আমার লোকেরাও কিন্তু শুধু হাতে দাঁড়িয়ে নেই।

আমার কথা শুনে পিছন ফিরে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল কুন্দনলাল। দেখল তির-কাঁড় নিয়ে সারি সারি বেশ কয়েকজন আদিবাসী ওদের ফেরার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার একান্ত অনুগত ভৃত্য পিকলুও রিভলভার নিয়ে তৈরি। আদরের কুকুর ভেলুও আমাকে কেউ আক্রমণ করলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে।

কুন্দনলাল বলল, বেশ আমি চলে যাচ্ছি। তবে এও জেনে রেখো আমার পথের কাঁটা আমি ওপড়াবই। যদি ভাল চাও তা হলে সাত দিনের মধ্যে এই এলাকা ছেড়ে তুমি চলে যাবে।

আমারও ওই একই দাবি। আমি চাই না তুমি এই শান্তির রাজত্বে বিঘ্ন ঘটিয়ে বেড়াও। তোমার স্মাগলিং বিজনেস নিয়ে যেমন তুমি মেতে আছ তেমনি থাকো। কিন্তু একান্ত এখানকার সোনার সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে দিনের পর দিন তুমি দেশের সর্বনাশ ঘটাবে এ আমি হতে দেব না।

মানিকবাবু! জেনেশুনে গোখরা সাপের গর্তে হাত দিয়ো না। তুমি তো জান আমি অত্যন্ত বিষখোবরা লোক।

তুমি নিশ্চয়ই ভুলে গেছ কুন্দনলাল, যে আমি বিষাক্ত সাপের বিষদাঁত ওপড়াতে ভালবাসি।

ও। তুমি তা হলে এই পাহাড় ও অরণ্যের অধিকার আমাকে দেবে না?

না। তার কারণ তুমি দিনের পর দিন সরকারি কনট্রাকটার এই মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এখানকার সরল আদিবাসীদের ঠকাচ্ছ। আমি তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জেনেছি সামান্য পয়সা দিয়ে এখানকার মূল্যবান পাথরগুলো তুমি কাটিয়ে নিয়ে, অন্যত্র গিয়ে ওর ভেতর থেকে আসল মালটি বার করে নিচ্ছ। পুলিশ তোমাকে চোখেচোখে রাখছে। কিন্তু তুমি বড় চতুর, তাই তোমাকে হাতেনাতে ধরতে পারছে না। আমি যদি এখানকার আদিবাসীদের একথা বলে দিই, তা হলে কি পারবে আর ওদের দিয়ে কাজ করাতে? তার চেয়ে যা করছ তাই করো, আর এ পথে এসো না। যাও।

কুন্দনলাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, বেশ। ঠিক আছে। মনে থাকবে তোমার কথা, এই বলে ও চলে গেল।

এরপর একদিন পুলিশ এসে গভীর রাতে হামলা করল আমার ওপর। কিন্তু করলে কী হবে? নিজের কাছে তো আমি কিছুই রাখতাম না। কাজেই কুন্দনলালের চুকলিতে পুলিশ বৃথাই এসে আমাকে বিরক্ত করে হায়রান হয়ে ফিরে গেল।

আর একদিনের ডায়েরিতে লেখা আছে—

কুন্দনলালের ব্যবসা বন্ধ করেছি। কিন্তু কী করে কে জানে এই পাহাড়ের শিরায় শিরায় যে সোনার অস্তিত্ব আছে তা বুঝি টের পেয়েছে আদিবাসীরা। ওরা আমাকে দেবতার মতো মান্য করে। কিন্তু যে কারণেই হোক ওই পাহাড়ে বিশেষ করে যে সব অংশে সোনা আছে সেখানে আমার যাতায়াত ওরা পছন্দ করে না। এদের মধ্যেও কি কুন্দনলালের কোনও স্পাই আছে? হয়তো তারা আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছে ওদের, হয়তো বুঝিয়েছে আমার এই অরণ্যপ্রেম, প্রেম নয়। আসলে আমিও স্বর্ণসন্ধানী। কথাটা তো একদিক থেকে ঠিক। সোনার সন্ধান তো আমিও করছি। সেই সঙ্গে বাধা দিচ্ছি সোনা লুঠেরাদের। পুলিশকে জানাইনি তার কারণ তাতে এখানকার শান্তি বিঘ্নিত হবে। কুন্দনলাল পিছু হটলেও আমি মাঝেমধ্যে বুঝতে পারি ও আমাকে চোখেচোখে রাখছে। এবং চেষ্টা করছে ও আমার দ্বারা অপহৃত সেই লুঠের মালকে উদ্ধার করবার। আজকাল আমি তাঁবুতে থাকি না। কুসুমডিতে ভিলসর্দারের বাড়ির নীচে আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকি। কেন না আমি বেশ বুঝতে পারছি ও আমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে এবং

আমাকে মারবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার জেদ চেপে গেছে এই যে ও যাই করুক না কেন, আমার জীবিত অবস্থায় ওকে আমি এখানকার সম্পদে হাত দিতে দেব না।

...হ্যাঁ! আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। চম্পা মেয়েটি বড় ভাল। কেন জানি না ওকে দেখলে আমার খুব মায়া হয়। তাই হেনরিয়েটার অপহৃত অলংকারগুলি এবং কিছু গিনি ও মোহর চম্পার জন্য লুকিয়ে রাখলাম এই পাহাড়েরই এক সংকীর্ণ গুহায়। মেয়েটাকেও দেখিয়ে রাখলাম। এরপরে ওর কপাল।

...কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম আর বনবাস নয়। এবার ঘরে ফিরি। কিন্তু পারলাম না। হঠাৎই একদিন ওইসব পাহাড়ে এবং গিরিগুহায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক গোপন রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেলাম। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি। এও কি সম্ভব। ভাগ্যে কুন্দনলালরা সন্ধান পায়নি। তা হলে সবই উধাও হয়ে যেত। যাক। আমার এই ডায়েরিতেই সেই গুপ্তধনের পথের সন্ধান দিয়ে রাখি। আমার দীপু বড় হয়ে যদি কখনও এখানে আসে বা ওর হাতে এই ডায়েরি পড়ে, তা হলে ও নিশ্চয়ই ওগুলো উদ্ধার করতে পারবে। আমি পারতাম, কিন্তু আমি তো নজরবন্দি। ও মাল বার করতে গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে। তার চেয়ে যেখানকার জিনিস সেখানেই থাক। বরং এই নক্সাটা ভাইয়ের কাছে দিয়ে রাখব ভবিষ্যতে দীপংকরের সুবিধের জন্যে।

এই পর্যন্ত পড়ে আর পড়ল না দীপংকর। সে বেশ গভীর মনোযোগে সেই নক্সাটার খুঁটিনাটি লক্ষ করতে লাগল। তারপর ঘরের কুলঙ্গি থেকে একটা পেন নিয়ে এসে আলাদা একটা কাগজে সেটা এঁকে নিল।

এই নক্সাটার কথা কি ইকলু জানে? বোধহয় জানে না। এসব কথা ওকে না-বলাই ভাল।

চম্পা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। ওকেও বলব না। বরং যথাস্থানে গিয়ে ওকে চমকে দেব।

এমন সময় ইকলু চা নিয়ে ওপরে এল চম্পা ও দীপংকরের জন্য। চম্পা তো ঘুমোচ্ছে। অতএব একটা দীপংকরকে দিয়ে বাকিটা নিজে খেল।

দীপংকর বলল, আচ্ছা ইকলুভাই, কাল যদি খুব ভোর ভোর আমরা ওখানে যাই তা হলে ওখানকার আদিবাসীরা আমাদের সন্দেহ করবে না তো?

না। তা কেন করবে? তোমরা ছেলেমানুষ। তা ছাড়া চম্পাদিদিভাইকে ওরা সবাই চেনে। আর লোক যে ওখানে সব সময়েই থাকে তা তো নয়। পাহাড় কাটার কাজ এখন বন্ধ। তার কারণ সোনার খনি তো নেই এখানে। মাঝেমাঝে ফাটলের গায়ে যা দেখা যেত তার সবই তো কুন্দনলাল শেষ করে দিয়েছে। তবে কী জানো, এই পাহাড়ের অনেক গুহার কোনও একটির ভেতরে নাকি শুনেছি

একসময় রাক্ষসেরা বাস করত। তারা নাকি দেশ-বিদেশের রাজা-মহারাজাকে বধ করে তাদের মূল্যবান সম্পদগুলো লুকিয়ে রাখত। অবশ্য সে যে কোন যুগের কথা তা কেউ জানে না। সত্য কী তাও জানে না কেউ। তবু সেই অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভর করে এখানকার আদিবাসীরা এসব এলাকায় কাউকে ঢুকতে দেখলেই রেগে যায়। কুন্দনলালের ধারণা, বাবুজি এই গুপ্তধনের সন্ধান জানত বলেই এখানকার মায়া কাটাতে পারত না। তাই সে শেষদিন পর্যন্ত বাবুজির পিছনে ছায়ার মতো লেগে ছিল। তারপর মওকা বুঝে একদিন আচমকা ছোবলটা মারল সে। এই গুহাগুলোর দিকে কুন্দনলালের নজর আছে। ওরাই যা চোরের মতো সন্ধান রাখে ওখানে। ওখানকার আদিবাসীরাও কুন্দনলালের ওপর সন্তুষ্ট নয়। কারণ তারা বেশ বুঝেছে যে পাথর কাটানোর নাম করে কুন্দনলাল দিনের পর দিন তাদের ঠকিয়েছে। এখন তারা হুঁশিয়ার। তাই বাইরের কাউকে এই এলাকায় ওরা আর যেতে দেয় না। তা ছাড়া ওরাও জানে এই পাহাড়ের কোনও এক গুহায় রাক্ষসদের রাখা গুপ্তধন আছে। কিন্তু সেটা যে কোথায় বা সত্যিই আছে কি না তা কেউ জানে না। এই আদিবাসীরাও যেমন খ্যাপার মতো খুঁজে বেড়ায় এই রত্নভাণ্ডারকে, তেমনি কুন্দনলালও গোপন অভিযান চালায় এই রত্নভাণ্ডার আবিষ্কারের।

দীপংকর তো জেঠুর ডায়েরি পড়ে সব কিছুই জেনেছে। তবু ও ইকলুকে পরীক্ষা করবার জন্য একবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ইকলুভাই তোমার কী মনে হয়? ওই রকম রত্নভাণ্ডার সত্যিই কোথাও আছে? না থাকতে পারে?

তা বলা মুশকিল। কেন না রাক্ষস দৈত্য এসব আমার মনে হয় কল্পনা।

আমি কিন্তু তা মনে করি না ইকলুভাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুজানোয়ার, বর্তমানে যাদের কোনওরকম অস্তিত্ব নেই তারাও যেমন সত্য, তেমনি এই সব রাক্ষস-দৈত্যরাও মিথ্যা নয়। আসলে এরা ছিল নররূপী বিশাল দেহ, বীভৎস চেহারা এবং নরখাদক ও বিকৃত রুচি। মানুষের সঙ্গে তফাত তো শুধু এইটুকুই।

হতে পারে। তা ছাড়া আমরা তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি এখানকার সোনার সনদ। ব্রিটিশ আমলেও ওই সব পাহাড় কেটে সোনার আকরিক বের করে নেওয়ার অনেক নজির রয়েছে দেখতে পাবে। সোনার সন্ধানে এসে মানুষই পাহাড় কাটতে কাটতে কত যে গুহার সৃষ্টি করে রেখেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এক একটা বড় বড় খাদ দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। এইসব সোনা সংগ্রহ একদিন দু'দিন ধরে হয়নি। বহু বছর ধরে হয়েছে। আমার মনে আছে একবার ওই পাহাড়ের ফাটলের গায়ে কিছু না-হলেও আধমন ওজনের একটা সোনার চাঁই পেয়েছিলাম আমরা। ভেবেছিলাম কপাল ফিরে গেল। কিন্তু বাবুজি, তোমার জেঠু বললেন, না। যা আমরা পেয়েছি তা যথেষ্ট। আর সোনাতে কাজ নেই। বলে

সেই সোনার চাঁই এমনভাবে পাহাড়ের একটি খাঁজের ভেতর ফেলে দিলেন যে, ওই পাহাড়টাকে গোটাটা কেটে না-ফেললে ওই সোনাকে উদ্ধার করা কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। বাবুজির সোনা অভিযানের নেশাও যেমন প্রবল ছিল, তেমনি সোনার সনদ প্রয়োজনের বাইরে তিনি ব্যবহারও করতেন না। শুধু কুন্দনলালের লুঠের মালই যা আমাদের কাছে আছে তাই আমরা সারাজীবনে খরচ করতে পারব না। এখনও ধারাগিরি ঝরনাধারার পাশে তাল তাল সোনা বিশ ফুট মাটির নীচে পোঁতা আছে। তোমরা যদি কাল ভোরে ওই পাহাড়ে যাও, তা হলে দেখবে চম্পাদিদিভাইয়ের জন্যেই তোমার জেঠু যে সোনার অলংকার বা সোনা রেখে গেছেন তা আজকের দিনে কারও বাড়িতে নেই। তবু ওগুলো তোমরা খুব সাবধানে আনবে। এবং দিনমানে নয়, সন্ধের মুখে। সারাদিন সব কিছু ঠিকঠাক করে রাখবে, নিয়ে আসবে সুবিধেমতো। খুব সাবধানে। কুন্দনলালের বেশি নজর এখন গুহার দিকে! কারণ ওরা জানে চম্পাদিদিভাই এবং তুমি গোপন কিছুর সন্ধান নিশ্চয়ই জানবে তাই অলক্ষ্যে থেকে ওরা তোমাদের পিছু নেবেই। অতএব সাবধান।

যদি আমরা রাতের অন্ধকারে যাই?

সেটা আরও বিপজ্জনক। এক হিংস্র জন্তুজানোয়ারের ভয়। আর এক ভয় আদিবাসীদের। দিনের বেলা পাহাড় দেখার ছলে গেলে ওরা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওদের চোখে পড়লে রক্ষে নেই।

আচ্ছা ইকলুভাই, তুমি কী পারো না এই অভিযানে আমাদের সঙ্গে থাকতে?

না। আমি তো আগেই বলেছি ও জায়গা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। তার চেয়েও সাংঘাতিক যেটা তোমাদের সঙ্গে আমাকে দেখলে সবাই বুঝে যাবে আমরা কোনও কিছুর সন্ধানে চলেছি। তখন হবে কী, তোমাদেরও যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আমিও বিপদে পড়ব। তাই বলি কী, তোমরা দু'জনেই যাও। বরং ফিরে এসো সন্ধেবেলা। আমি কাছাকাছিই থাকব।

দীপংকর বলল, বেশ তাই হবে। কাল খুব ভোরেই আমরা রওনা দেব।

এমন সময় হঠাৎ একটা ঠান্ডাস্রোত ওদের গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। দীপংকর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল কী প্রচণ্ড মেঘ করেছে আকাশে।

সেই মেঘ ছড়িয়ে গেল আকাশময়। তারপর শুরু হল ঝড়জলের উন্মত্ত তাণ্ডব। সে কী ভয়ংকর দুর্যোগ। গাছপালা ভেঙে পড়ছে যেন। পাহাড় ধসে যাচ্ছে। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার।

জানলা-দরজা খোলবার উপায় নেই। ঝোড়ো বাতাস উন্মত্ত উল্লাসে গর্জন করতে করতে ঢুকে পড়ছে ঘরের ভেতর।

ইকলু দুটো লোমওয়ালা ভালুকের ছাল দিয়ে গেল ওদের। বলল,

রাতবিরেতে একা কেউ বাইরে বেরিয়ো না, তবুও কারও যদি একান্তই বেরোবার দরকার হয়, তা হলে এগুলো পরে নিয়ে বেরিয়ো। ছাতার কাজ করবে।

ওরা ভালুকের ছালগুলো দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে চুপচাপ শুয়ে রইল খাটিয়ায়। দু'জনের জন্য দুটো খাটিয়াও দিয়ে গেছে ইকলু। একটা টর্চও দিয়েছে। ঘরের কোণে একটা বল্লমও রয়েছে। অর্থাৎ আচমকা কোনও বিপদআপদ ঘটলে ওটার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

ভেল্যুয়া শুয়ে আছে চম্পার খাটিয়ার নীচে।

দীপংকরের মনে ভয়। এই রকম দুর্যোগ চলতে থাকলে কাল কি যাওয়া সম্ভব হবে? অথচ যেভাবেই হোক চম্পার ওই অলংকার এবং গুপ্তধনের খোঁজ নিতেই হবে ওদের। কিন্তু দুর্যোগ যেভাবে চলছে তাতে তো কমবার কোনও আশাই নেই। এখন সবে সন্ধেরাত। দেখা যাক সারারাতে কী হয়।

দুর্যোগ বেড়েই চলল। রাতও হল। সামান্য কিছু গুড়মুড়ি আর কলা খেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। এর বেশি এই দুর্যোগের রাতে আর কী-ই বা আশা করা যায়?

অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে জল্পনাকল্পনা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

রাত তখন কত তা কে জানে?

চম্পার করস্পর্শে চোখমেলে তাকাল দীপংকর। ছোট চিমনি লণ্ঠনটা তখনও টিম টিম করে জ্বলছে। চম্পা সেটা অল্প একটু উসকে দিয়ে চাপা গলায় ডাকল, দীপ! এই দীপ! দীপংকর!

চোখমেলে দীপংকর দেখল চম্পা ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ওর মুখের দিকে ঝুঁকে আছে। ওর ঘন নিশ্বাস পড়ছে গায়ের ওপর।

দীপংকর বলল, কী!

ওঠো।

কেন?

ওঠো না একবার।

দুর্যোগ কমেছে?

না আরও বেড়েছে।

তবে? বাইরে যাবে?

হ্যাঁ।

দীপংকর উঠল। তারপর দু'জনে ঘরের দেওয়ালে পেরেকে ঝোলানো সেই ভালুকের মোটা লোমওয়ালা ছালদুটো পেড়ে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই, দমকা বাতাসে ঘরের সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেল। লণ্ঠনটাও নিভে গেল ধুপ করে। সে কী কাণ্ড। ওরা জালঘেরা বারান্দা থেকে নীচের দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেল। আশপাশের বড় বড় গাছগুলো ডালপালা

ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে উঠোনের ওপর। উঠোনের মাঝখানে কিছু না হলেও এক হাঁটু জল। একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপ রান্নাঘরের চালার ওপর থেকে পাশের একটি গাছের ডালে উঠতে যাচ্ছে। উঠানের শেষে পাঁচিলের গায়ে লাগানো দরজাটা পাঁচিল সমেত ভেঙে পড়ে আছে। এ যেন প্রলয়নাচন নাচছে প্রকৃতি।

ওরা টর্চের আলো ফেলে নীচে নামার সময় ইকলুর ঘরের দরজাটা একটু ঠেলে দেখল। ও এখন বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় হঠাৎই দীপংকরের হাত ধরে টান দিল চম্পা। বলল, দীপ! ওই দেখো।

ওরা সবিস্ময়ে দেখল বাইরে ধসে যাওয়া পাঁচিল ও ভেঙে পড়া দরজার কাছে কালো বর্ষাতিপরা চারজন আগন্তুক এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে জোরালো টর্চ ও একটি করে রিভলবার। ওরা সেই টর্চের আলোয় পথ দেখে উঠোন পার হয়ে ঘরের দিকে এগোচ্ছে।

কিন্তু ঘরের দিকে এগোলে কী হবে? দালানে ঢোকার মুখে যে দরজা সেটাও তো বন্ধ। ওরা এসে একবার একটু ঠেলে দেখল। তারপর ইশারায় কী যেন কথা হল ওদের নিজেদের মধ্যে। একজন পকেট থেকে একটি আংটা লাগানো দড়ি নিয়ে লটকে দিল বারান্দার কাঠের রেলিংয়ে। তারপর চুপিসাড়ে দড়ি বেয়ে একটু একটু করে উঠতে লাগল ওপরে।

চম্পা চাপা গলায় বলল, নিশ্চয়ই লালজির লোক এরা। আমাদের খোঁজে এসেছে।

আমারও তাই মনে হয়। দুর্যোগের রাতে বাধা পাবার ভয় নেই বুঝেই এসেছে ওরা।

আমাদের এখুনি ইকলুভাইকে ডাকা উচিত।

না। ডাকাডাকি করবার আর সময় নেই। ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। পালাবে ওরা। তার চেয়ে চলো আমরাই ওদের উচিত শিক্ষা দিই।

কী করে কী করবে?

তুমি চুপিসাড়ে চট করে ঘরে ঢুকে বল্লমটা বার করে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ এই ডান্ডাটা নিয়ে এগোচ্ছি। বলেই দরজার কাছে ঠেস দিয়ে রাখা দু'-চারটে লোহার রডের ভেতর থেকে একটা বেছে নিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

আগন্তুক ততক্ষণে দড়ি বেয়ে বারান্দার ওপরের রেলিংয়ে পা রেখেছে। কিন্তু বাধা দিল লোহার জাল। মানুষের অসাধ্য তো কিছুই নেই। তাই সেই লোহার জালকেও কেটে ফেলল একসময়। এবার অল্প একটু একটু করে মাথাটা গলিয়ে ভেতরে ঢুকতে যেতেই দীপংকর সেই লোহার রডের বাড়ি সজোরে এক ঘা

মেরে দিল লোকটার মাথায়। লোকটা চেঁচাতেও পারল না। একবার শুধু 'ওঁক' করে একটা শব্দ করেই স্থির হয়ে গেল।

নীচে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা কিছুই বুঝতে না-পেরে বার বার টর্চের আলো ফেলতে লাগল ওপর দিকে। দীপংকর তখন বুকে হেঁটে লোকটার কাছে গিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে একটু ঠেলা দিতেই ধুপ করে নীচে পড়ে গেল লোকটা।

ব্যাপারটা কী এরা ঠিক বুঝতে পারল না বোধহয়। কেন না ঝড় এবং জল এমনভাবে একটানা হচ্ছে যে কারও কিছু বোঝবার উপায় নেই। ওরা ভাবল নীচে পড়ে গিয়েই বুঝি মাথাটা ফেটে গেল লোকটার।

তাই আর একজন ওঠার চেষ্টা করল।

এর জন্যে বল্লম রেডি ছিল। ওপরে উঠে জালের ফাঁক দিয়ে মাথাটা গলাতেই, দীপংকর ওর চোয়ালের নীচ থেকে মুখের ওপর পর্যন্ত এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল বল্লমটা। লোকটা অসহায় ভাবে ছটফট করতে লাগল দেখে নীচের লোক দু'জন এবার একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর বেকায়দা বুঝেই এদের ফেলে রেখে পালাল ওরা।

দীপংকর এ লোকটাকেও বল্লমমুক্ত করে ফেলে দিল নীচে। উঠোনে একহাঁটু জল। লোকটা তাতেই পড়ে দু'-একবার শূন্যে পা ছুড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরল। আগের লোকটা ততক্ষণে জলের ওপর কাছিমের মতো আধডোবা হয়ে ভাসছে।

দীপংকর বলল, এইবার ইকলুভাইকে ডাকা যাক।

চম্পা বলল, উঁহু। ওকে আরও ঘুমোতে দাও। এমন চমৎকার সুযোগ আর আসবে না দীপ।

কীসের?

পালাবার।

পালাবে? কোন দুঃখে! কাল সকালে যাবে না ওই পাহাড়ে?

না। আজই, এখনই যাব।

চম্পা তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ?

না দীপ। এই ভয়ংকর দুর্যোগে কেউ কোথাও নেই। হিংস্র শ্বাপদরা পর্যন্ত তাদের ডেরা ছেড়ে বেরোয়নি। আদিবাসীগুলোও বাধা দিতে আসবে না। এই সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে? চলো এই মুহূর্তে আমরা বেরিয়ে পড়ি। আর কী, সর্বাঙ্গ তো ভিজে গেছে। দু'-দুটো খুনও হয়ে গেল। তবে কেন দেরি? ওই দেখো দূরের পাহাড়গুলো আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চলো। বেরিয়ে পড়ি।

দীপংকর কিছুক্ষণ বিস্ময়ভরা চোখে চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। খুনের উত্তেজনায় এবং অভিযানের উন্মাদনায় শিরদাঁড়া টান করে বলল, চলো।

ঝড়ের দাপট একটু কম হয়েছে তখন। কিন্তু বৃষ্টির বেগ আরও প্রবল।

চারদিকে শুধু জল জল আর জল। এই জল হয়তো বেশিক্ষণ থাকবে না। এখন পাহাড়ধোয়া জলের ঢলে ঢেউ খেলে যায় চারদিকে।

চম্পা এই দুর্যোগে ভেলুয়াকেও টেনে আনল। জেঠুর আদরের কুকুর ভেলু। চম্পার ভেলুয়া। শুরু হল অভিযান।

ওরা নীচের দরজাটা খুলল না। ওপরের বারান্দা থেকেই সেই ছেঁড়া জালের ফাঁক দিয়ে দড়ি বেয়ে নামল। আগে দীপংকর। তারপর ভেলুয়াকে নিয়ে চম্পা। ওদের একজনের হাতে টর্চ! একজনের হাতে বল্লম।

সেই হাঁটুজল পার হয়ে বাইরে এল ওরা। যেখানটা একটু ঢালু সেখান দিয়ে কী অসম্ভব বেগে জলের স্রোত যে ছুটছে তা না-দেখলে কল্পনা করা যাবে না!

ওরা তবু দ্রুত পা চালিয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে ধারাগিরি বাঁদিকে রেখে জঙ্গলের পথ ধরল। ওদের হাতে আংটাওয়ালা সেই দড়িটাও আছে। পাহাড়ে ওঠার সময় হয়তো এটা খুবই কাজে লাগবে ওদের। ভাগ্যে এটা এনেছিল লোকগুলো।

ক্রমশ ওরা উঁচুতে উঠতে লাগল। ওদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ভেলুয়াও জলের বাধা অতিক্রম করে উপরে উঠল।

কিন্তু উঠলে কী হবে? জলের হাত থেকে তো পরিত্রাণ নেই। পাহাড়ে ওঠার মুখে জল যেন আরও বেশি। ওপরের জল হুড় হুড় করে ওদের গায়ে এসে পড়তে লাগল। এখানে ওদের এমনই অবস্থা যে কী করবে ভালুকের ছাল?

এইভাবে বেশ খানিকটা যাবার পর পাহাড় আরও খাড়াই হতে লাগল। সেই খাড়াই পাহাড়ে কাজে লাগল ওই দড়ির আংটা। আংটাটা দূরে নিক্ষেপ করে যে কোনও ঝোপেঝাড়ে আটকে দড়ি বেয়ে ওরা উঠতে লাগল ওপরে। কেন না জলস্রোত এখন এত বেশি যে পথঘাট কিছুই চেনা যাচ্ছে না। দেখাও যাচ্ছে না।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ওপরে ওঠার পর হাঁপিয়ে পড়ল দু'জনেই। ভেলুয়াও হাঁপাচ্ছে। এমনি ওঠা আর জলের বেগ ঠেলে ওঠায় তফাত আছে বইকী।

দীপংকর বলল, আমরা ঠিক পথেই চলেছি তো?

হ্যাঁ। কিন্তু আর যে পারি না। শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে।

আর কত দূর!

ওই তো। ওই পাহাড়টায়।

তা হলে এসো,

তুমি আমার হাত ধরো।

দীপংকর চম্পার কোমল হাতখানি শক্ত করে ধরল। কী দারুণ ঠান্ডা। বরফের মতো শীতল।

চম্পা বলল, পাদুটো জড়িয়ে পড়ছে যেন।

ওরা তখন অনেকটা ওপর-ধাপে উঠে গেছে। বৃষ্টিতে সপ সপ করছে সর্বাঙ্গ। ভেলুয়া থর থর করে কাঁপছে।

চম্পা দীপংকরের কাঁধে ভর দিয়ে একটু একটু করে চলতে লাগল।

দীপংকর বলল, তোমার যদি খুব বেশি কষ্ট হয়, তুমি তা হলে আমার পিঠে উঠতে পারো।

চম্পা হেসে বলল, ভারী বাহাদুর ছেলে তুমি। এই পাহাড়ি রাস্তায় আমাকে পিঠে নিয়ে কখনও উঠতে পারো?

এসোই না, দেখি পারি কি না।

দীপংকরের এখন দারুণ উৎসাহ। চম্পাকে পিঠে নিয়েই বল্লমে ভর করে, সে একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। যতটা সহজ ভেবেছিল দীপংকর ততটা নয়। খানিক ওঠার পরই মুখ লাল হয়ে উঠল ওর। অবশেষে একসময় ওপরে উঠে এল।

চম্পা বলল, এবার আমায় নামিয়ে দাও। যেতে পারব।

ওরা পা টিপে টিপে পাহাড়ের এক প্রান্তে এসে হঠাৎ এক জায়গায় জলের তোড়ের সঙ্গে একটি বড় সাপ দেখে থমকে দাঁড়াল। কী সাপ এটা। ময়াল? হয়তো তাই। কী প্রকাণ্ড তার চেহারা। আর কী দারুণ লম্বা।

ভালুকের ছাল পরে থাকা সত্ত্বেও ওরা প্রবল বর্ষণে ভিজে কাকের মতো হয়ে গেছে।

দীপংকর বলল, ভিজেই যখন গেলাম তখন আর এটাকে বয়ে লাভ কী?

তা হোক। তবু তো কিছুটা বাঁচছে। পাহাড়ি ঢলে ভিজে গেলেও বৃষ্টির জল তো ততটা লাগছে না।

ওরা কথা বলতে বলতে একটা বাঁকের মাথায় এসে থেমে পড়ল।

চম্পা বলল, ওই যে দেখছ গ্রামখানা, ওটাই এখানকার আদিবাসীদের গ্রাম। আর এই দেখো পাহাড়ের চেহারা। সোনার লোভে পাহাড়কে কেটে কেটে কেমন শ্রীহীন করেছে। ওপাশের ওইসব গর্তগুলো দেখো। ওগুলো কিন্তু গুহা নয়। সবই পাথরকাটার ফল।

এখন ওখানে সোনা নেই?

আছে। যেসব পাথরে আছে, তাই থেকে সোনা বার করা খুব ব্যয়সাপেক্ষ।

ও। তা আমাদের যেখানে প্রয়োজন সেই গুহাটা কোথায়?

চলো, সেখানেই আগে যাই। বলে একধাপ নীচে নেমে একটি ছোট্ট গুহার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

গুহামুখের সামনে বড় বড় কয়েকটি পাথর আড়াল করা। সামনেটা ঝোপঝাড়ে ভরতি। জানা না থাকলে বোঝার উপায় নেই যে এটা গুহা।

ওরা প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে বল্লম দিয়ে নাড়া দিল সেখানটা, তারপর যখন বুঝল সাপখোপ কিছু নেই সেখানে, তখন পাথরগুলো একটু একটু করে সরিয়ে ফাঁক করল। এবার ভেতরটা টর্চের আলোয় বেশ ভাল করে দেখে, এক এক করে ঢুকে পড়ল ওরা। ভেলুয়া ঢুকল সর্বপ্রথম। তারপর ওরা।

এ জায়গাটা খুব গড়ানো। যারা কখনও ঢোকেনি এর ভেতর, তারা ভাববে এই ঢাল বোধহয় পাতাল পর্যন্ত। কিন্তু না। বেশ কিছুক্ষণ হড় হড় করে নেমে আসার পরই ওরা পায়ের তলায় শক্ত পাথর পেল। এবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল ওরা। উঃ সে কী দারুণ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে টর্চের আলোয় পথ দেখে ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

বেশ কয়েক পা যাবার পর দেখা গেল গুহামুখ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ওরা সেখানেও টর্চের আলো ফেলে ঘাড় নুইয়ে এগিয়ে চলল। তারপর আরও ঝুঁকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। এক জায়গায় বেশ কিছু নুড়িপাথর জমা করা ছিল। চম্পা দু'হাতে সরাতে লাগল সেগুলো। হঠাৎ একসময় কী দেখে যেন চিৎকার করে উঠল চম্পা। কী দেখল ও? দীপংকর টর্চের আলোয় দেখল সেই নুড়ি পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কিলবিল করছে অজস্র কাঁকড়াবিছে।

ওরা একটু পিছিয়ে এসে বল্লমের ডগায় করে সেই নুড়িপাথর সরাতে লাগল।

দীপংকর জিজ্ঞেস করল, কামড়ে দেয়নি তো?

চম্পা বলল, না।

নুড়িপাথর সরাতে সরাতে হঠাৎ একটা লোহার চেন নজরে এল ওদের।

চম্পা বলল, ওটা ধরে জোরে টান দাও।

দীপংকর তাই করল। আর করার সঙ্গে সঙ্গেই মস্ত একটা গোসাপ উঠে এল তার ভেতর থেকে। অবশ্য সেটা সত্যিকারের নয়। রবারের। চম্পা সেটাকে ওপরে তুলেই তার বুকের চেন ধরে টানল। দেখল যেখানকার যা সেখানে তা ঠিকই আছে। কিন্তু সেটা এত ভারী যে, তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। হবে নাই বা কেন? দীপংকর নিজে হাতে এক এক করে গুণে দেখল মোট সাতশো চল্লিশটা গিনি, একুশটা দুষ্প্রাপ্য মোহর এবং সোনা ও হিরের নেকলেশ পঁচিশটা। তা ছাড়া আরও অনেক—অনেক অলংকার। দীর্ঘ দিনের লুটের মাল দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জেঠু সঞ্চয় করে রেখে গেছেন এই বনবালার জন্যে।

ওরা ওগুলো আবার যথাস্থানে রেখে, মানে সেই গোসাপের ভেতরে পুরে শক্ত করে যখন চেন আঁটল তখন বন্যার স্রোতের মতো জল ছুটে আসছে গুহার ভেতর। গুহামুখের পাথরগুলো সরে যাওয়ায় জল আসার সুবিধে হয়েছে। তাই ওরা আর একটুও বিলম্ব না করে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করল। অনেক চেষ্টার পর ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল ওরা। বহু কষ্টে বুকে হেঁটে যখন ওপরে উঠল

ওরা, তখন সেই ভালুকের ছালগুলো যেন লোহার মতো ভারী ঠেকছে।

দীপংকর বলল, আর এগুলোর মায়া নয়। এগুলোকে আর বয়ে বেড়াতে পারছি না। ভিজি ভিজব। পড়ে থাক ওগুলো। বলে গা থেকে খুলে ফেলে দিল।

চম্পা বলল, হ্যাঁ আমারও অসহ্য লাগছে। উঃ কী ভারী। তার ওপর এই গোসাপটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

ওরা ওপরে জলস্রোতের ঢাল বহু কষ্টে পেরিয়ে যখন গুহামুখে এল, তখন আনন্দের আর অবধি রইল না ওদের।

চম্পা নেচে উঠল, বলল হুর র রে। বৃষ্টি থেমে গেছে। দুর্যোগ কেটে গেছে আজকের মতো।

দীপংকরও বেরিয়ে এল তখন সেই গোসাপটাকে টানতে টানতে। বেরিয়ে এসে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সেও লাফিয়ে উঠল। আনন্দের আবেগে দীপংকর তো চম্পাকে জড়িয়ে ধরে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লেগে গেল।

চম্পা বলল, আরে! আরে! এ কী করছ! ছাড়ো শিগগির। এখন এসবের সময় নয়। তা ছাড়া এইভাবে ঘোরালে মাথা ঘুরে যাবে যে।

দীপংকর চম্পাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, আমার মনে হচ্ছে তোমাকে এখুনি কাঁধে নিয়ে নাচি।

চম্পা বলল, দীপ! ওই দেখো আকাশে চাঁদ।

আরে তাই তো! দুর্যোগ যে একেবারেই কেটে গেছে।

ওরা একটা বড় পাথরের ওপর বসে বর্ষণসিক্ত পাহাড় ও বনতলের অবস্থা দেখতে লাগল। বৃষ্টি থেমে গেলেও পাহাড়ধোয়া ঢল কিন্তু হদ হদ করে সামনে নামছে। তা নামুক। একটু একটু করে সব মেঘ কেটে যাচ্ছে। একটি দুটি করে তারাও ফুটে উঠছে আকাশে।

চম্পা বলল, জানি দুর্যোগের শেষ হবেই।

দীপংকর বলল, শুনেছি দুর্দিনও বেশিদিন থাকে না। কিন্তু আমার জীবনের মেঘ কি কাটবে চম্পা? তোমাকে পেলাম। তোমার গোপন সম্পত্তিও উদ্ধার হল। কিন্তু আমার কী হল? শহরে গেলেই তো পুলিশ আমার হাতে হাতকড়া পরাবে খুনের অপরাধে।

চম্পা বলল, আমি বলি কী দীপ, এক কাজ করো। আমরা বরং এখানেই থেকে যাই। তুমি ইকলুর বাড়িতে কিছুদিন থাকো। আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে চুপি চুপি তোমার মা-বাবাকে সব কথা জানাই। তারপর ওদের এখানে নিয়ে এসে এই জঙ্গলে ইকলুদের গ্রামেই একটা ছোট্ট ঘর করে দু'জনে থেকে যাই। তোমার মা-বাবাও যদি থাকতে চান তো থাকবেন। জেঠুর কৃপায় আমরা তো এখন কুবেরের ঐশ্বর্য পেয়ে গেছি।

ঠিক বলেছ। আমি এখানেই থাকি। তুমি কালই গিয়ে বরং আমার বাবা-মাকে খবরটা দিয়ে এসো। কেমন?

চলো তা হলে, আর দেরি করে কাজ নেই। আয় ভেলুয়া।

দীপংকর বলল, না। এখুনি নয়। আমাদের এখন আরও একটা কাজ বাকি আছে।

কী কাজ?

সেই গুপ্তধনের গুহাটা আবিষ্কার করা।

তুমি কি পাগল? এই গিরিগুহার গুপ্তধনের গল্প স্রেফ রূপকথা ছাড়া কিছু নয়।

না না চম্পা। রূপকথা নয়। গুপ্তধন আছে। এই দেখো তার নকশা। জেঠুর ডায়েরি থেকে আমি পেয়েছি।

তাই নাকি? কোথায় কোন গুহায়?

এখানে যে গুহার মাথার ওপর শিবের ত্রিশূল আঁকা আছে সেই গুহায়।

শিবের ত্রিশূল! ওই—ওই দেখো, ওই গুহাটার মাথার ওপর বড় পাথরের বুকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা খোদাই করে রেখেছে শিবের ত্রিশূল।

দীপংকর অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে বলল, কী আশ্চর্য! ওই এত উঁচুতে ও ত্রিশূল খোদাই করল কী করে? এই তা হলে সেই যথার্থ রাক্ষসগুহা! চলো খুব সাবধানে আমরা ওর ভেতর ঢুকে দেখে আসি সেই গুপ্তধনের ভাণ্ডার। যদি পারি তো দু'হাত ভরে মুঠো মুঠো নিয়েও আসব।

তাতে লাভ? এই গোসাপটার শরীরের ভেতর যা লুকনো আছে তাই কি পারব সারা জীবনে খরচ করতে? এর ওপর আবার লোভ? না না, এ ঠিক নয়। তা ছাড়া এই গুহায় আমি তো বহুবার এসেছি। কই এর ভেতরে গুপ্তধনের কোনও নমুনাও তো কখনও পাইনি।

ঠিক জায়গায় হয়তো যেতে পারনি তাই।

ওরা ভেলুয়াকে সেই সুবিশাল গুহার বাইরে পাহারায় রেখে গোসাপটাকে ধরে টানতে টানতে ভেতরে ঢুকল। উঃ সে কী দারুণ অন্ধকার। টর্চের আলোতেও কাজ হচ্ছে না। চারদিকে শুধু কালো— কালো আর কালো পাথরের গোলকধাঁধা।

চম্পা বলল, আর বেশি ভেতরে ঢুকো না দীপ। এই গুহার একদম ভেতর পর্যন্ত কেউ যায় না। এর শেষ নেই।

দীপংকর বলল, আছে আছে। শেষ আছে। বলে অনেকদূর গিয়ে ওরা আর যাবার পথ পেল না-গুহা শেষ।

চম্পা বলল, এই তো শেষপ্রান্তে চলে এলাম। কিন্তু কোথায় তোমার গুপ্তধন?

দীপংকর কোনও কথা না-বলে টর্চের আলো ফেলে সেই গুহার গায়ে কী যেন

খুঁজতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় আলোটা পড়তেই চিৎকার করে উঠল চম্পা, দীপু! আর নয়। চলো, চলো। এখান থেকে। ও দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি না।

ওরা দেখল এক ভীষণাকৃতি রাক্ষসীর মুখ ওদের যেন হাঁ করে গিলে খেতে আসছে। সত্যিই সে ভয়াবহ হাঁ করা মুখ দেখা যায় না। দীপংকর সেই হাঁ করা মুখের একটি দাঁতের সঙ্গে গোসাপের চেনটা বেঁধে চম্পার হাত ধরে টানতে টানতে সেই মুখের ভেতর ঢুকে পড়ল।

মুখগহ্বর পার হয়ে আর একটি গুহায় এসে পড়ল ওরা। এখানে এসেই চম্পাকে নিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল দীপংকর। জেঠুর নির্দেশমতো এখানে চলা নিষেধ। ওরা তাই বসে বসে পা ঘষে ঘষে খানিক এগোতেই বুঝতে পারল একটা বিশাল গাড্ডা রয়েছে সেখানে। অর্থাৎ না-জেনে হেঁটে এলেই যে কেউ পড়ে যাবে এই গাড্ডার ভেতরে। গাড্ডাটা নেহাত কম নয়। দুশো ফুটেরও কিছু বেশি। এর চারদিকে চারটি পাথরের আংটা। আর সেই আংটার লাগোয়া শক্ত কাছির মতো কী যেন ঝুলছে। ওরা ওইরকম দুটো কাছি ধরে ঝুলে ঝুলে নামতে লাগল নীচের দিকে। নীচে নেমেই একটি হলঘরের মতো বড় ঘর দেখতে পেল ওরা। সেই ঘরে কী না নেই? একটা প্রকাণ্ড সোনার সিংহাসনে অন্তত চারফুট লম্বা এক জোড়া রত্নপাদুকা রয়েছে! কার তা কে জানে? এ ছাড়া কত রকমের মূল্যবান রত্ন ও পাথর আছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এক জায়গায় একটি পাথরের মূর্তির গলায় হিরের একটি নেকলেশ রয়েছে। অত বড় হিরে সচরাচর দেখা যায় না। চম্পা ছুটে গিয়ে সর্বাগ্রে সেটাকে গলায় পরে নিল। আর এক জায়গায় হয়তো কোনও রাজপুত্রের গলার মণিমুক্তার মালা রয়েছে। দীপংকরও সেটাকে পরে নিল। তারপর দু'জনেই জোড় হাতে সেই অতুল ধনরাশিকে প্রণাম জানিয়ে উঠে এল ওপরে। ওপরে উঠে সেই রাক্ষসীর মুখ থেকে বেরিয়ে হার ও মালাগুলো গলা থেকে খুলে গোসাপের পেটের ভেতর ঢোকাল। তারপর সেটাকে টানতে টানতে গুহামুখের কাছাকাছি এসে চম্পা ডাকল, ভেলুয়া...!

কিন্তু কোথায় ভেলুয়া? কেউ কোথাও নেই। ওদের কেমন ভয় হল। ওরা গোসাপটাকে এক কোণে সরিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল ব্যাপারটাকে কী দেখতে। কিন্তু দেখতে এসেই যা দেখল তাতে ওদের বুক শুকিয়ে গেল!

ওরা দেখল একটা তেজি ঘোড়ার পিঠে চেপে ওদের দিকে রিভলভার তাক করে দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ংকর চেহারার লোক। লোকটি বলল, কাল থেকে তোমাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। আর তোমরা এইখানে এসে লুকিয়ে আছ?

চম্পা ভয়ে ভয়ে বলল, কে তুমি?

এখানে কী করতে এসেছিলে? গুপ্তধন নিতে? ওই যেটাকে টেনে আনছিলে কী আছে ওটার ভেতর?

দীপংকর বলল, তোমার মুণ্ডু আছে।

লোকটি বলল, ঠিক করে বলো, কী আছে ওর ভেতর? না হলে কিন্তু আমি তোমাদের গুলি করব।

চম্পা বলল, কিছুই নেই ওতে।

তা হলে ওটা দিয়ে দাও আমাকে।

দীপংকর বলল, না। প্রাণ থাকতে নয়।

বেশ এবার তা হলে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও। প্রথমে একজনকে মারব। তারপরও যদি কবুল না করো তা হলে দু'জনকেই মেরে ফেলব। রেডি— এক— দুই— তিন।

তিন বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল পাহাড়ের এক উচ্চস্থান থেকে হঠাৎ বাঘের মতো লোকটির ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেলুয়া। এই আকস্মিক আক্রমণে টাল সামলাতে না পেরে ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। রিভলভারটাও খসে পড়ল হাত থেকে।

দীপংকর ছুটে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল পাহাড়ের ঢালে।

ঘোড়াটাও ভয় পেয়ে চিঁ হি-হি করে দৌড়ে পালাল।

আর এদিকে কুকুরে-মানুষে চলল তুমুল লড়াই। ভেলুয়া আঁচড়েকামড়ে অস্থির করে তুলল লোকটাকে। যেখানে কামড়ায় সেখান থেকেই এক খাবলা করে মাংস তুলে নেয়।

চম্পা বলল, চলো দীপ! এই সুযোগ। ভেলুয়া ওকে রাখুক। আমরা পালাই। বলে আবার গুহায় ঢুকে গোসাপটাকে বার করতে যাবে যেই, অমনি ঘটে গেল এক মারাত্মক দুর্ঘটনা।

যে গুহার ভেতর ওরা ঢুকেছিল হঠাৎ এক ভয়ংকর ধসে সেই গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

অসহায় দীপংকর ও চম্পা প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু না। কোনও লাভই হল না তাতে।

দীপংকর বলল, কী হবে চম্পা। আমরা যে অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। এই ভয়ংকর ধস বাইরে থেকে কেউ না সরালে আমরা তো মুক্তি পাব না।

চম্পা বলল, ভবিতব্য তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। তাই হয়তো আমাদের দু'জনকেই এই গিরিগুহার বদ্ধ জঠরে যক্ষ হয়ে পাহারা দিতে হবে।

দীপংকর বলল, আমার তো এখুনি দম বন্ধ হয়ে আসছে।

চম্পা বলল, এক কাজ করি এসো। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে যাই। শেষ চেষ্টা একবার করে দেখি।

কী করবে?

ভেতরের দিক থেকে যতটা পারি পাথর সরাতে থাকি। এইভাবে যদি কোনওরকমে একটু ফাঁক হয় তা হলে হয়তো মুক্তি পেতেও পারি। আর দেরি কোরো না। এসো।

দীপংকর ও চম্পা দু'জনেই তখন যথাশক্তিতে কাজ শুরু করল। উঃ কী ভয়ংকর পরিণতি। আলো নেই, বাতাস নেই, জল নেই, খাদ্য নেই। তবুও বাঁচার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওরা দু'জনে একটির পর একটি পাথর সরিয়ে চলল। এক অসহ্য গুমোটে দর দর করে ঘাম ছুটতে লাগল। তবু চেষ্টা করতে লাগল। শুধু মাটি আর পাথর। বড় বড় পাথরের চাঁই। এক একটা এত বড় যে বহু চেষ্টা করেও তাকে এতটুকু নড়াতে পারল না ওরা। বল্লমের খোঁচায় ছোট পাথরগুলোকে একটু আধটু ধসিয়ে ওরা পরিষ্কার করতে লাগল। কিন্তু যে ভয়াবহ ধস নেমেছে এই গুহামুখে, তা তো ওরা জানে না। তাই অযথা পরিশ্রম করতে লাগল দু'জনে। অল্প সময়ের মধ্যেই আলোবাতাসের অভাবে নেতিয়ে পড়ল ওরা। ধসের কাদামাটি সর্বাঙ্গে মেখে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হয়ে গেল ওদের! কিন্তু না। বৃথা চেষ্টা। কোনও লাভই হল না এতে।

চম্পা বলল, আর কেন? এসো আমরা দু'জনে হাতে হাত রেখে মৃত্যুর উপাসনা করি।

এমন সময় হঠাৎ একটা হিস হিস শব্দে সচকিত হল দু'জনে। টর্চের আলোয় ওরা দেখল গুহার একটি ফাটলের ভেতর থেকে এক অতিকায় ময়াল তার বিশাল দেহ নিয়ে পাথরে ছোবল মারতে মারতে আসছে। ওরা ভয়ে সরে গেল এক পাশে।

ময়ালটা বার বার সেই ধস চাপা গুহামুখে ছোবল মারতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে করে তার মুখটা পাথর ও মাটির বুকে গুঁজে দিয়ে একটু একটু করে বাইরে বেরোতে লাগল।

সাপটা লম্বায় প্রায় কুড়ি ফুটেরও বেশি। ওর অর্ধেকেরও বেশি শরীরটা যখন বাইরে চলে গেছে তখন চম্পা বলল, এই আমাদের শেষ চেষ্টা। ধরো, ধরো, সাপটাকে। শক্ত করে টিপে ধরো ওর লেজের দিকটা।

ওরা ছুটে গিয়ে সাপটাকে ধরতে যেতেই কী যেন মনে হল দীপংকরের। বলল, না। কোনও দরকার নেই। বুঝেছি তুমি কী বলতে চাও। ওটাকে না ধরে কেমন কাজ হবে দেখো। বলেই বল্লমটা উঁচিয়ে সাপটার লেজের দিকে প্রায় একহাত গেঁথে দিল! এইবার শুরু হল খেলা। সাপটা তার শেষাংশ বার করতে

না পেরে ওই বিশাল শরীর দিয়ে অসম্ভব রকমের ছটফটানি শুরু করল। পাক দিয়ে মোচড় দিয়ে, এমন কাণ্ড আরম্ভ করল যে ঝর ঝর করে মাটি-পাথর ঝরে একটা জায়গা সামান্য একটু ফাঁক হয়ে গেল।

দীপংকর বলল, আর দরকার নেই। এবার স্বস্থানে প্রস্থান করো তুমি। বলে বল্লমটা খুলে নিতেই সর সর করে পালিয়ে বাঁচল সাপটা।

সামান্য একটু ছোট্ট ফাঁক, এত সংকীর্ণ যে সেখান দিয়ে অল্প একটু আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু একটা মানুষ গলে বেরোতে পারে না।

চম্পা বলল, এতেই হবে। অন্তত দম আটকে মরতে হবে না।

এই বলে ওরা দু'জনে কিছু পাথর সাজিয়ে সেই গর্তের মুখ পর্যন্ত উঁচু করে তার ওপর বসে রইল। জল না থাক। খাদ্য না থাক। আলো আর অক্সিজেন তো আছে। আরও দু'-একটা দিন জীবনধারণ করা যাবে। যদিও জীবনের কোনও আশা নেই তবুও দু'জনে মুখোমুখি বসে ধসের গায়ে ঠেস দিয়ে সেই ফোকরের দিকে তাকিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে লাগল।

এইভাবে কেটে গেল সারাবেলা। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল দু'জনে। জোর করে শ্বাস টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভাল করে কথাও বলতে পারছে না কেউ। চম্পা কেমন অবসন্ন হয়ে চুপ হয়ে গেছে। দীপংকরও নেতিয়ে পড়েছে। এই অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না ভাল করে। এভাবে আর কতক্ষণ?

মৃত্যুর প্রহর গোনা বুঝি শেষ আর হয় না। সময়েরও কোনও হিসেব নেই। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল বলে মনে হল। কোথায় ঘটল! গুহার একেবারে শেষপ্রান্তে। অর্থাৎ আবার একটা ধস নামল।

হঠাৎ এক সময় চম্পা বলল, কিছু বুঝতে পারছ দীপ!

কীসের কী?

আমরা কী মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। আমাদের অন্তিমসময় এগিয়ে এসেছে এবার। আবার— আবার— ধস নামছে। এবার গোটা গুহাটা ভেঙে পড়বে আমাদের ওপর। দেখছ আমরা কেমন নীচে নেমে যাচ্ছি?

সত্যিই তো, ওরা সেই মাটিপাথরের স্তূপ সমেত ক্রমশ ধসে যেতে লাগল। ওরা একটু একটু করে ধসে নেমে যাচ্ছে— উঃ— ভগবান! রক্ষা করো। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে জ্ঞান হারাল ওরা।

দশ

জ্ঞান যখন ফিরল তখন রাত গভীর। চম্পা ও দীপংকর ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখল, চারদিকে শুধু মশালের আলো। ওরা দু'জনে মাটিকাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। যেমনি চম্পা, তেমনি ও।

ওদের মাথার শিয়রে ওরা কারা! দলে দলে আদিবাসীরা সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছে। আর অসংখ্য পুলিশ। ওই তো ইকলুভাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

দীপংকর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, মা! মাগো।

দীপংকরের মা জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে।

বাপিও এসে ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ওদিক থেকে ঠাকুর সিংও ছুটে এসে বুকে টেনে নিল চম্পাকে, চম্পা? চম্পা মা আমার।

সবই যেন অকল্পনীয় ব্যাপার বলে মনে হল। এও কি সম্ভব! এই গভীর রাতে গিরিগুহার সামনে বাপি, মা, ঠাকুর সিং। না না। এ সত্যি নয়। ওরা হয়তো মরেই গেছে। তাই প্রেত হয়ে এইসব অবাস্তব দৃশ্য দেখছে ওরা, অথবা এ সবই স্বপ্ন।

কিন্তু না। এই জগতে মৃত্যু যেমন অমোঘ, স্বপ্ন যেমন সত্যি, তেমনি অবাস্তবও বাস্তব।

মা দীপংকরকে বুকে নিয়ে বললেন, কোথায় লেগেছে বাবা? কী কষ্ট হচ্ছে তোর? তোকে কে এখানে নিয়ে এল?

ওদিকে চম্পা বলল, বাবুজি। মুঝে মাপ কর দো বাবুজি।

ঠাকুর সিং চম্পাকে বুকে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলেন।

আর ভেলু? সে এসে দীপংকর ও চম্পার পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

ইকলু বলল, এই ভেলুয়ার জন্যেই আজ তোমরা রক্ষা পেলে ভাই। ও গিয়ে খবর না দিলে আমরা জানতেই পারতাম না তোমরা কে কোথায় আছ।

দীপংকর বলল, আমি ভেবে পাচ্ছি না তোমরা কীভাবে আমাদের উদ্ধার করলে?

পুলিশ অফিসার মি. লালচাঁদ শর্মা হাসতে হাসতে এসে বললেন, শুনবে শুনবে। সব কিছুই শুনবে। আগে সব স্নান করে পরিষ্কার হও। কিছু খাও-টাও তারপর সব শুনবে। একদিন একরাত পড়েছিল তো গুহাবন্দি হয়ে। যে ভাবে তোমাদের উদ্ধার করেছি তা আর শুনে কাজ নেই, বরাত জোর যে দু'জনেই বেঁচে গেছ এ যাত্রায়।

অতএব তাই হল।

চম্পা ও দীপংকরকে স্ট্রেচারে শুইয়ে সবাই মিলে সেই অন্ধকারেই ধরে নিয়ে চলল ইকলুদের গ্রামে। পথে ধারাগিরির ঝরনার জলে বেশ ভাল করে স্নান করতেই ধুলোকাদা ধুয়ে গিয়ে দু'জনের তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ আবার ফুটে উঠল। আগের মতো।

এরপর ইকলুর বাসায় গিয়ে ইকলুর একটা ধুতি পরে ফেলল দীপংকর এবং চম্পাকেও পরানো হল ইকলুর বউয়ের একটা শাড়ি। এক গেলাস করে গরম দুধও খাওয়ানো হল দু'জনকে।

দলে দলে লোক এসে জুটল তখন সেখানে। পুলিশও এল।

তারপর কথা প্রসঙ্গে সব কিছু যখন শুনল ওরা তখন বুঝতে পারল ঠাকুর সিং, ইকলু এবং ভেলুয়া না-থাকলে কোনও কিছুই হত না। ওই গুহার ভেতর দমবন্ধ হয়ে পচে মরতে হত ওদের।

ঘটনাটা এই রকম—

সেদিন ইকলুদের গ্রাম থেকে ফিরে এসেই ঠাকুর সিং কুন্দনলালের মুখোমুখি হয়। ঠাকুর সিং-এর স্থির বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে কুন্দনলালই গোপনে কিছু জানার জন্য চম্পাকে এবং হত্যার অথবা ব্ল্যাকমেলের জন্য দীপংকরকে গুম করেছে।

এই নিয়ে তুমুল কলহ দু'জনের।

ঠাকুর সিং কুন্দনলালকে শাঁসিয়ে এল, যদি সে তার লেড়কিকে ফেরত না দেয় তা হলে সমুচিত শিক্ষা দেবে তাকে। এই কথা বলেও কিন্তু ঠাকুর সিং চুপ থাকেনি। সোজা ট্রেনে চেপে হাওড়া স্টেশনে এসে ওখানকার পুলিশকে দীপংকরের বৃত্তান্ত জানায়। দীপংকরের অন্তর্ধানরহস্য নিয়ে চারদিকে তখন হইচই হচ্ছিল খুব। কাজেই ওর ঠিকানা খুঁজে বার করতে দেরি হল না। দীপংকরের মা-বাবা দু'জনেই নিকটবর্তী থানায় ঠাকুর সিং-এর বক্তব্য পেশ করিয়ে সোজা চলে আসেন ঘাটশিলায়। তারপর সব কথা খুলে বলেন এখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার লালচাঁদ শর্মাকে।

এদিকে ইকলুও ছুটে আসে থানায়। কেন না ওই ভয়ংকর দুর্যোগের রাতেই বাড়িতে দু'দুটো খুন এবং সেই সঙ্গে চম্পা ও দীপংকরের উধাও হয়ে যাওয়াটা ওকে সাংঘাতিক রকমের ভাবিয়ে তুলল। সেদিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা। হঠাৎ ভেলুয়ার চিৎকারে ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে উঠেই বাইরের দৃশ্য দেখে ছুটে ওপরে যায়। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। তার ওপর ভেলুয়া বার বার কাপড়ের খুট ধরে ওকে টানাটানি করতে থাকে বলে ভেলুয়ার পিছু নেয় ও। ওর পিছু পিছু সেই গুহামুখের কাছে এসে যে ভয়াবহ ধস দেখে তাতে ওর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। এদিকে গুহার সামনেই ভেলুয়ার আক্রমণে বীভৎস চেহারা

নিয়ে একজন পাক্কা শয়তানকেও মৃতঅবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তখন ও বুঝতে পারে চম্পা ও দীপংকর ধস চাপা পড়েছে। তাই আর কাল বিলম্ব না করে ছুটে আসে থানায়। এখানেই দীপংকরের বাবা-মা এবং ঠাকুর সিং-এর সাথে দেখা হয়।

এরপর চলে আদিবাসীদের এবং সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় ধস মুক্তির অভিযান।

ভগবান সহায়। তাই দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় ধসমুক্ত করে ওদের উদ্ধার করা হয়।

লালচাঁদের বক্তব্য, কুন্দনলালকে তার দলবল সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু দীপংকর ও চম্পা যে সে রাতে ওই গুহায় কী কারণে গিয়েছিল সেকথা পুলিশকে কিছুতেই বলল না। শুধু বলল লালজির ভয়ে ঠাকুর সিং-এর বাসা থেকে পালিয়ে আসে ওরা এবং ইকলুর বাসায় ওই লোকরা ওদের গুম করতে এসেছিল দেখে ওদের দু'জনকে শেষ করে ওরাও নিরাপদ হবার জন্য ওই গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এই রকম ভয়াবহ ধসের মুখে যে ওরা পড়বে তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি।

ইকলু বলল, ধস তো হবেই। সোনার লোভে পাহাড় কেটে চারদিক তো ফোঁপড়া করে দিয়েছে। তার ওপরে এই প্রবল বর্ষণ। কাজেই ওপরের ভারী পাথরের চাপ নীচের শূন্যস্থান সহ্য করতে পারবে কেন? অতএব অনিবার্যভাবে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।

ওরা যখন কথা বলছে তখন ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। আদিবাসীদের জ্বলন্ত মশালও তখন নিভু নিভু।

মা বললেন, কিন্তু তুই এখানে কী করে এলি দীপু? তোর জন্য আমরা যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

দীপংকর তখন সব কথা খুলে বলল সকলকে।

শুনে মা-বাপি দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে বললেন, হায় কপাল! এই জন্যে তুই পালিয়ে এসেছিলি? কেন আমরা কি কেউ নই? একবার এসে আমাদের ওকথা বলতে পারিসনি? মা-বাবাকে না-জানিয়ে পালানোর ফলটা টের পেলি তো? তোকে কোথাও লুকিয়ে রাখবার প্রয়োজন হলে সে ব্যবস্থা তো আমরাই করতাম। তোর জেঠুর কৃপায় আমাদের কী কোনও অভাব আছে রে?

সত্যি মা খুব ভুল হয়ে গেছে। আসলে আমি তখন এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে কী বলব। তার ওপর ওই দুর্ঘটনা।

তা হলে শোন বোকা ছেলে, তুই যাকে ঘুসি মেরে পালিয়েছিলি সে আসলে মরেইনি। দিব্যি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। ওর বাবা-মা অনেক টাকা-পয়সা

খরচ করে সারিয়ে তুলেছেন ওকে। আর ওই মেয়েদুটো, যাদের জন্যে তুই ওই কাজ করেছিলি তারা তোর ব্যাপারে সব কথা বলেছে পুলিশকে। কাজেই ভুল বুঝে বৃথাই কষ্ট পেলি তুই।

বৃথা নয় মা। ভাগ্যিস এসেছিলাম তাই তো তোমাদের চিরশত্রু কুন্দনলালকে দলবল সমেত ধরাতে পারলাম। আমার বদলে আমার জেঠুর হত্যাকারীই এখন ফাঁসির মঞ্চে উঠবে আশা করি। আর এখানে ওইভাবে না এলে চম্পাকেও তো পেতাম না। মা, মাগো! আমি চম্পাকে কথা দিয়েছি মা, ও এখন থেকে আমাদের কাছেই থাকবে।

মা সঙ্গে সঙ্গে চম্পাকে বুকে টেনে নিয়ে ওর ডালিমের মতো লাল টুক টুক গালে চুমু খেয়ে বললেন, সে কথা তুই কী বলবি। আমিই তো বলব। এখন ওর বাবা যদি দয়া করে মেয়েটাকে আমায় দেন তবেই—।

ঠাকুর সিং আনন্দের আবেগে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল এবার। তারপর মায়ের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল, আমি এখুনি ওকে তোমার পায়ে অর্ঘ্য দিলাম মা। এ সংসারে ওর কেউ নেই। আমার তো উমর জায়দা হয়ে গেছে। কবে আছি, কবে নেই। তাই ওকে তোমরা তোমাদের সাথে নিয়ে যাও। আমার জীবনের শেষ ক'টা দিন আমি একটু শান্তিতে থাকি। বলে পুলিশ অফিসার লালচাঁদের দিকে নিজের হাতদুটি এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করুন হুজুর! জীবনে আমি অনেক খারাপ কাজ করেছি। আমায় জেলে রাখুন, ফাঁসি দিন, যা ইচ্ছা করুন।

লালচাঁদ হেসে বললেন, পুলিশের কাছে গ্রেফতার হতে চাইলেই গ্রেফতার হওয়া যায় না ঠাকুর সিং। তুমি ভাল লোক ছিলে না এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সবই তো শোনা কথা। তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কই? তা ছাড়া আমাদের খাতায় তোমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও নেই, পরোয়ানাও নেই। অতএব কোন আইনে আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করব? তাই তুমি যেমন ছিলে তেমনই থাকবে।

মা বললেন, হ্যাঁ। তেমনই থাকবে। তবে এখানে নয় তোমার মেয়ের কাছে। আমাদের বাড়িতে।

ঠাকুর সিং হতবাক।

লালচাঁদ বললেন, চলুন, আপনাদের সবাইকে আমার জিপে করে ঘাটশিলায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

অতএব ইকলুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিপে উঠল ওরা। বাপি, মা, দীপংকর, চম্পা, ঠাকুর সিং সবাই উঠল।

ওরা যখন জিপে উঠেছে তেমন সময় সেই রবারের গোসাপটাকে ইকলুভাই টানতে টানতে নিয়ে এসে চম্পার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই নাও চম্পাদিদি। আমি আমার ভালবাসার দান হিসেবে এটা তোমাকে উপহার দিলাম।

চম্পা ও দীপংকর এটার কথা ভুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। ইকলু যে কখন কোন ফাঁকে দেখতে পেয়ে এটাকে সরিয়ে ফেলেছিল তা কে জানে? তাই আবেগের উচ্ছ্বাসে গোসাপটাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল ওরা।

লালচাঁদ বললেন, কী ওটা?

ঠাকুর সিং ইকলুর দিকে এক নজর তাকিয়েই হেসে বলল, বাচ্চো কা খিলোনা।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল।

এবার প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু এই বিদায় মুহূর্তে ভেলুয়া! ভেলুয়া কই? ওকে তো রেখে যাওয়া হবে না। কোথায় গেল সে? খোঁজ খোঁজ শুরু হল চারদিকে। কোথায় গেল ভেলুয়া?

ভেলুয়াকে পাওয়া গেল না। কোথায় যে গেল সে, কে জানে? কিন্তু কেউ না-জানলেও আমি জানি। আমি জানি সে তখন কোথায় ছিল। ধারাগিরি ঝরনার কাছে ওর মনিবের সমাধির উপর শুয়ে সে তখন নীরবে নিভৃতে কাঁদছিল। ওর দু'চোখের জল যখন টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল সমাধির ওপর, তখন বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে এই পাহাড় ও বনতল ভরে উঠছিল বুঝি!

হিন্দোলসর্দারের কেল্লা

এক

কোনও কিছু টের পাবার আগেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল। সে রাতে জ্যোৎস্না ছিল অঢেল। আকাশের গোল চাঁদটাও যেন ট্রেনের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছুটেছিল। ছায়া ছায়া কালো কালো দূরের পাহাড়গুলো স্বপ্নের দেশের মতো মনে হচ্ছিল তখন। রঞ্জন অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল তাই। দ্রুতগামী ট্রেনের চলার ছন্দে হঠাৎই যতিভঙ্গ হল। অনেকটা হোঁচট খাওয়ার মতোই একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠল ট্রেনটা। তারপর সব স্থির। সব অন্ধকার।

অনেক পরে যখন জ্ঞান ফিরল, তখনও উদ্ধারকার্য শুরু হয়নি। চারদিকে হতাহত মানুষের দেহ খেলাঘরের পুতুলের মতো ছড়ানো। যন্ত্রণাকাতর মানুষগুলোর সে কী করুণ আর্তনাদ।

রঞ্জন ধীরে ধীরে উঠে বসল। সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করল সে। মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে। আঘাত কি খুবই গুরুতর? না। হাত, পা, ধড়, মুণ্ডু সবই যথাস্থানে ঠিকঠাক আছে। মাথার কাছে সুটকেসটা রাখা ছিল। হাত বাড়িয়ে নিতে গেল সেটা। কিন্তু পেল না। কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে?

ওর সামনের বার্থে মি. গোমেশ নামে এক ভদ্রলোক শুয়েছিলেন। বার্থের নীচে ভারী ভারী ট্রাঙ্কগুলো রাখা ছিল তাঁর। সেগুলো যে কোনদিকে কোনটা ছিটকে পড়েছে তা বোঝা গেল না। শুধু মি. গোমেশ তাঁর প্রাণহীন দেহটা নিয়ে বার্থের লোহার চেনে ঝুলছেন। কী ভয়াবহ পরিণতি। আর এক ভদ্রলোক, সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মুখে গোঁ গোঁ শব্দ। মাথার খুলি ফেটে—।

এ দৃশ্য দেখা যায় না।

রঞ্জন কোনওরকমে এর ওর গায়ে পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎই জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল বাইরেটা। একদল লোক মশাল আর টর্চ নিয়ে ছুটোছুটি করছে। নিশ্চয়ই খবর পেয়ে রিলিফ ভ্যান নিয়ে উদ্ধারকারীরা এসে গেছে। কিন্তু এ কী! ওদের হাতে স্ট্রেচারে শোয়ানো হতাহত মানুষের বদলে মালপত্তর কেন? তবে কি ডাকাতির জন্যই এই দুর্ঘটনা? কালো কালো বলিষ্ঠ চেহারার মানুষগুলোর মাথায় নীল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। হাতে রক্ত মাখা ধারালো অস্ত্র। উঃ কী ভয়ংকর। রঞ্জন একবার হিপ পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল

ওর ওগুলো যথাস্থানেই আছে কি না, দেখে আশ্বস্ত হল। একশো টাকার দশখানি নোট খুবই যত্ন সহকারে গোঁজা ছিল সেখানে। সেগুলো যথাস্থানেই আছে। আসলে দুষ্কৃতীরা ছেলেমানুষ ভেবেই হয়তো হাত দিয়ে দেখেনি ওখানে। অথবা বুঝে উঠতে পারিনি এই ধ্বংসস্তূপের এক কোণে একটি তাজা প্রাণ এখনও অবশিষ্ট আছে বলে।

ভোরের আলো ফোটেনি এখনও। শুরু হয়নি পাখিদের কলরব। শুধু চারদিক থেকেই শোনা যাচ্ছে মানুষের অন্তিম আর্তনাদের সুর। আবছা অন্ধকারে ভরে আছে ভেতরটা। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। বন-পাহাড় চারদিকে। তবু এই মৃত্যুপুরীর ভেতর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রঞ্জন। ভেতরে কত যাত্রী যে হতাহত হয়ে রয়েছে তার হিসেব কে রাখে? হাতড়ে হুতড়ে কোনওরকমে দরজার কাছে যেতে গিয়েই হঠাৎ ওর কানে এল, পানি—পানি—থোড়া পানি দিজিয়ে।

মেয়েলি গলার করুণ প্রার্থনা।

এই সময় শত বিপদেও, অসুবিধা সত্ত্বেও এই অন্তিম প্রার্থনাকে উপেক্ষা করে কি চলে যাওয়া যায়? কিন্তু জল এখানে পাবে কোথায়? তা ছাড়া চারদিক থেকেই তো ওই একই প্রার্থনা, জল দাও—পানি দাও—প্লিজ গিভ মি এ ড্রপ অফ ওয়াটার। কত লোকের মুখে জল দেবে ও? হঠাৎ একটা কীসের ওপর যেন পা পড়ল। দেখল একটা টর্চ গড়াগড়ি খাচ্ছে সেখানে। এই চরম বিপদের মুহূর্তে এই টর্চটা খুবই কাজে লাগবে।

রঞ্জন ঝুঁকে পড়ে টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ফেলতে লাগল। হঠাৎই নজরে পড়ল কম্পার্টমেন্টের ভেতরে জানালার পাশের হুকে ঝোলানো ওয়াটার বটলগুলোর দিকে। তারই একটা নিয়ে এসে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ও।

কাছে গিয়ে দেখল একটি ওরই বয়সি মেয়ে এক পাশে মেঝেয় পড়ে কাতরাচ্ছে, পানি—থোড়া পানি দিজিয়ে।

রঞ্জন টর্চ রেখে ওয়াটার বটল থেকে জল নিয়ে মেয়েটির চোখেমুখে ঝাপটা দিল প্রথমে। ওর নাক দিয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মূল্যবান চুড়িদারটা রক্তে ভিজে সপ সপ করছে। দু'-একবার ঝাপটা দেবার পর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল মেয়েটি। তারপর বলল, ম্যায় কাঁহা হুঁ? থোড়া পানি—।

রঞ্জন কোনও উত্তর না দিয়ে মেয়েটির ঘাড়ের কাছে হাত রেখে মাথাটা একটু তুলে ওয়াটার বটলটা ওর মুখের কাছে ধরল। এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটুকু পান করে মেয়েটি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর রঞ্জনের একটা হাত ধরে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, তুম কৌন হো?

রঞ্জন বলল, আমিও তোমারই মতো এই ট্রেনের একজন যাত্রী ছিলাম।

মাঝরাত্তিরে ট্রেনটি ভয়ংকর এক দুর্ঘটনায় পড়ে। নেহাত মিডল বার্থে শুয়েছিলাম, তাই প্রাণে মরিনি। লোহার চেনে আটকে বেঁচে গেছি।

আমি লোয়ার বার্থে ছিলাম।

তার ওপর বিপরীতমুখী হওয়ায় ছিটকে পড়েছ তুমি। নিশ্চয়ই খুব লেগেছে তোমার?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

এই অভিশপ্ত ট্রেনের অনেক যাত্রীই বেঁচে নেই। আহত হয়েছেন বহু লোক। আমাদের উদ্ধার করবার জন্য এখনও পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেনি। কিছু লোক অবশ্য এসেছে লুঠপাট করতে, কিন্তু তারা আমাদের কোনওরকম সাহায্য করবে না।

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার আব্বাজান?

কোথায় তিনি?

আপার বার্থে শুয়েছিলেন।

রঞ্জন টর্চ নিয়ে চারদিকে ঘোরাতে লাগল। কিন্তু না। কোনও বার্থেই কেউ নেই।

মেয়েটিও উঠে দাঁড়াল এবার। তারপর আলো ধরে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেল ওর আব্বাজানকে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক ঘাড়গুঁজে পড়ে আছেন একদিকে। তাঁর বুকের ওপর একটি ট্রাঙ্ক চাপা। সেই দৃশ্য দেখে মেয়েটি অধীর হয়ে উঠল। রঞ্জনের সাহায্যে কোনওরকমে ট্রাঙ্কটি সরিয়ে তার আব্বাজানের বুকে হাত রাখতেই বুঝল তিনি মৃত। রঞ্জনও স্পর্শ করে দেখল ভদ্রলোকের হিমশীতল অঙ্গ বাস্তবিকই তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করছে। মেয়েটি ওর আব্বাজানের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

প্রিয়জন হারানোর বিচ্ছেদ যে কত মর্মান্তিক, তা অনুভব করল রঞ্জন। ভাগ্যে ও একা এসেছিল। মেয়েটির কান্না আর থামে না। জোয়ারের গঙ্গার মতো ফুলেফুলে কাঁদছে মেয়েটি। ওর কান্না থামে না দেখে রঞ্জন বলল, শোনো, এইভাবে কেঁদে কোনও লাভ হবে না। চলো, আমরা বরং ট্রেন থেকে নেমে কাছেপিঠে কোনও লোকালয় থাকলে সেখানে খবর দিই। তারা নিশ্চয়ই এই রকম দুর্ঘটনার সংবাদ পেলে ছুটে আসবে।

মেয়েটির কিছুতেই তার বাবাকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছা হল না। অথচ না-গিয়ে উপায়ই বা কী? রঞ্জন আর একটুও দেরি করতে রাজি নয়। কেন না আর্ত মানুষের এই অন্তিম হাহাকার কান পেতে শোনা যায় না।

রঞ্জনের বহু অনুরোধে মেয়েটি যখন শেষবারের মতো ওর আব্বাজানের ললাট চুম্বন করে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখল আর একজন কে যেন বহু কষ্টে ওদের

দিকে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক প্রবীণ। বললেন, তোমরা কি তোমাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছ?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

আমিও হারিয়েছি। আমার একমাত্র সন্তান এই দুর্ঘটনায় আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তোমরা যদি সুস্থ থাক তো এই মুহূর্তে পালিয়ে যাও এখান থেকে। চারদিকে লুঠপাট শুরু হয়ে গেছে। তা ছাড়া এই চক্করের বাইরে গিয়ে রেলের কাছ থেকে ডেড বডি আদায় করো। এখন কোনও মতেই এখানে থেক না। হয়তো বিপদে পড়ে যাবে।

রঞ্জন বললে, কেন?

যা বলছি তাই করো। একেবারে অপারগ না হলে থেক না। থাকতে নেই। তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব এখন তোমাদেরই। আর কারও নয়। আমার একটা পা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তবুও আমি চলে যাচ্ছি। হাতের কাছে নিজেদের জিনিসপত্তর যদি কিছু পাও তো নিয়ে নাও। ফেলে রেখে যেয়ো না।

মেয়েটি হয়তো বুঝল ব্যাপারটা। তাই কাঁদতে কাঁদতে ওর বাবার পাঞ্জাবির সোনার বোতাম, রিস্টওয়াচ আর পকেটের টাকাগুলো বার করে নিল। তারপর বহু কষ্টে দরজার হাতল ধরে ওপরে উঠে লাফিয়ে নামল পাশের লাইনে।

এখানে চারদিকেই শুধু জঙ্গল আর পাহাড়। নিশ্চয়ই কেউ ফিস প্লেট সরিয়ে এই অপকর্মটা ঘটিয়েছে। ওদের মতো আহত, অল্প আহত, অক্ষত আরও অনেকেই নেমেছে দেখা গেল। কিন্তু মজার ব্যাপার সামান্য কিছু লোক ছাড়া বেশির ভাগ লোকই জঙ্গলের পথ ধরে পালাচ্ছে। কেন? কেন পালাচ্ছে ওরা?

মেয়েটির হাতধরে রঞ্জনও এগোতে শুরু করল।

রঞ্জনের ছোটা অভ্যাস আছে। কিন্তু মেয়েটির? ও কি পারবে ওর সঙ্গে ছুটতে অথবা দ্রুত পা চালাতে? অবশ্য সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা এবং আঘাতের অবসাদ নিয়ে দ্রুত পথ চলা খুবই কষ্টকর। তবু ওরা চলতে লাগল।

কিছুটা পথ যাবার পরই হাঁপিয়ে উঠল ওরা। দু'জনেরই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মেয়েটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। একে সদ্য পিতৃ-বিয়োগে দারুণভাবে ভেঙে পড়েছে মেয়েটি, তার ওপর ব্যথা-বেদনার শরীর নিয়ে পথচলা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে।

ওদের সম্মুখের পথটা ক্রমশ উঁচু দিকে উঠে গেছে। অর্থাৎ ওরা মালভূমির মতো অংশে একটা বড়সড় টিলার দিকে এগোচ্ছে। তারই খাড়াই পথের আকর্ষণ হাঁফ ধরাচ্ছে ওদের। এখানে শুধু শিমুল ও মহুয়ার বন। মাঝেমধ্যে দু'-একটা ঘন পাতার সেগুন গাছও দেখতে পাচ্ছে ওরা। রঞ্জন মেয়েটির একটি হাত শক্ত করে ধরে আছে।

যেতে যেতে এক সময় মেয়েটি বলল, আর কতদূর যেতে হবে আমাদের? আর যে পারছি না।

রঞ্জনও কি পারছে? ওরও পাদুটো যেন ভারী অসুখ থেকে উঠলে যেমন হয়, সেই রকম ভেরিয়ে পড়ছে। না হলে এই ফুলের মতো মেয়েটিকে পিঠে নিয়েই চা-বাগানের কুলির মতো উঠে যেত ঠিক। রঞ্জন তো আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়। রীতিমতো শরীর চর্চা করে। ওর হাতের একটা চড় অথবা ঘুসি হজম করা অনেক শক্তিমান লোকের পক্ষেও অসম্ভব। তবুও এই দুর্ঘটনার পর কী যে হয়ে গেল। সবসময় যেন মাথাটা ঝিমঝিম করছে। হাত খুব বেশি জোরে মুঠো করতে পারছে না। পা কাঁপছে। এক এক সময় মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই ও বেঁচে আছে তো? এই চাঁদনি রাতের জ্যোৎস্নালোকে শিমুল-মহুয়ার বনে টিলা পাহাড়ে এক অনাত্মীয় কিশোরীর হাতধরে পথচলা এ তো স্বপ্নময়।

মেয়েটি বলল, আর যে পারছি না। উঃ কী কষ্ট।

আর একটু। এই টিলাটার ওপরে উঠে একটু বিশ্রাম নেব আমরা।

আমি আর পারছি না।

আমিও পারছি না। তবু এসো। একটু কষ্ট করে চলে এসো এটুকু পথ।

রঞ্জন মেয়েটির দেহের ভার অনেকটা নিজের ওপর নিয়ে নিল। মেয়েটির চুল এলিয়ে পড়েছে। সে ওর মাথাটা রঞ্জনের কাঁধের ওপর কাত করে রেখে টলতে টলতে উঠতে শুরু করল বাকি পথটুকু।

পথ শেষ হল এক সময়।

তারায় ভরা আকাশের নীচে লাল টিলার মাথার ওপর বন-জ্যোৎস্না গায়ে মেখে ধুপ ধাপ বসে পড়ল দু'জনে। আঃ কী নিবিড় শান্তি এখানে। মেয়েটি বসে পড়েই একটি পাথরের বুকে 'হায় আল্লা' বলে লুটিয়ে পড়ল।

রঞ্জনের কিশোরমন এই অনাত্মীয় কিশোরীর বিয়োগবেদনা দেখে ব্যথিত হল। ওর চোখদুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠল এবার। ওর মা-বাবা সঙ্গে থাকলে আজ তাদের ভাগ্যেও এই রকম করুণ পরিণতি জুটত কি না কে জানে? প্রত্যেক যাত্রায় প্রতিটি মানুষের নিয়তি নির্ধারণ করা থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মানুষ নিয়তির দাস। এই কিশোরী কোথায় যাচ্ছিল কে জানে, ট্রেন-ভ্রমণের আনন্দময় অভিযানের আগে স্বপ্নেও কি ভেবেছিল, যে নিঠুর নিয়তি এই মায়াভরা জ্যোৎস্নারাতে এই বনে-পাহাড়ে তার মায়াকাঠি দিয়ে ওর আব্বাজানকে ওর বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে?

এতক্ষণ মনে উত্তেজনা থাকায় মেয়েটির দিকে ভাল করে নজর দিতে পারেনি রঞ্জন। এখন রাত্রি শেষের জ্যোৎস্নালোকে খুব ভাল করে দেখল ওকে। মনে হল যেন এই বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে শিলাখণ্ডের ওপর লুটিয়ে পড়া ওই

কিশোরী মেয়ে নয়। শরতের একরাশ শুভ্র শেফালি। সাদা কাগজের মতো গায়ের রং। যেন একটা শ্বেতকবুতর কিশোরীর শরীর পেয়ে এই বন-জ্যোৎস্নায় ফুট ফুট করছে। এত ফর্সাও কেউ হয়? এর ওপর জ্যোৎস্নার আলো পড়ে মেয়েটি যেন দুধসাগরে ভাসছে। কতই বা বয়স হবে? খুব জোর বছর পনেরো। রঞ্জনেরই সমবয়সি। দেখে মনে হয় অবস্থাপন্ন ঘরেরই মেয়ে। ওর রক্তেভেজা চুড়িদার সস্তা কাপড়ের নয়। পায়ে জুতো নেই। খুলে রেখে শুয়েছিল হয়তো। কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে? রঞ্জনও খালি পা। ওই অন্ধকারে আর ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর জুতো খোঁজার ব্যাপারটা ওরও মনের কোণে উদয় হয়নি।

রঞ্জন কিশোরীর খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, এই শোনো। এভাবে কেঁদ না। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। এটাকে এভাবেই মেনে নাও। যা হবার, তা বেশ হয়ে গেছে। এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে চলো আমরা শহরের দিকে যাই।

মেয়েটি এক হাতে ওর কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সেও পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তার উদ্ধারকর্তা এই বন্ধুটিকে। এক সময় শান্ত গলায় বলল, না। আর কাঁদব না। আমার সব কান্নার শেষ হয়ে গেছে। তোমায় ধন্যবাদ। তুমি আমায় ওই নরক থেকে মুক্ত করে এনেছ। তুমি না থাকলে হয়তো ওই প্রেতপুরীতে আমিও মরে পড়ে থাকতাম। এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে নিজের রক্তভেজা পোশাকের দিকে তাকাল।

রঞ্জন বলল, কাল সকালেই শহরে গিয়ে আগে তোমার জন্য একটা নতুন স্কার্ট বা চুড়িদার কিনব। যেটা পরে আছো সেটা পরে তো পথচলা যাবে না।

মেয়েটি বলল, তুমি কোনও আঘাত পাওনি তো?

পেয়েছি। সামান্য। মাথায় খুব জোর লেগেছে।

তা হলে তোমার জামার ওই রক্ত!

ও তোমারই। আমরা এক সঙ্গে আসছিলাম, তাই লেগে গেছে।

এখানে কোথাও কি জল পাওয়া যাবে? তা হলে আপাতত একটু ধুয়ে নিতাম।

এমন সময় কাছেরই একটি গাছের ডাল থেকে কুহু কুহু করে একটা কোকিল ডেকে উঠল। তারপর একটি দুটি করে পাখি। তার মানে ভোর হয়ে আসছে।

রঞ্জন বলল, পূবের আকাশে সামান্য একটু লালাভা দেখা দিচ্ছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। রাতের শেষ। দিনের শুরু। চলো আমরা নীচে নামি। টিলার ওপারে নীচের দিকে একটা পাহাড়িয়া নদী আছে মনে হচ্ছে। আমরা ওখানেই যাই। মুখহাত ধুয়ে নিই। জামা থেকে রক্তের দাগ তুলি। তারপর বাড়ি ফেরার

ব্যবস্থা করা যাবে। ট্রেন তো চলবে না। অন্য কিছু যদি ম্যানেজ করা যায় তো সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

মেয়েটি বলল, তাই চলো। দূরের ওই নদীর জলে আমরা একটু পরিষ্কার হয়ে নিই। তারপর কাছেপিঠে কোনও শহরে গিয়ে বাড়িতে একটা তার করব।

রঞ্জন বলল, সেই ভাল।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারল না। খানিক উঠেই ধপ করে বসে পড়ল। বলল, পায়ে বড় ব্যথা। খালি পায়ে হাঁটা অভ্যেস নেই। কী করে যে যাব তা জানি না।

রঞ্জন ওর হাতধরে টেনে তুলল। বলল, আস্তে আস্তে এসো। কোথাও ওষুধের দোকান থাকলে দু'-চারটে ট্যাবলেট খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেয়েটি ওর হাত ধরে ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগল।

রঞ্জন বলল, যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলি?

কী কথা বলো।

আমরা দু'জনে এতক্ষণ আছি, কিন্তু কেউ কারও নাম জানি না। এটা কি ঠিক?

মেয়েটি মরা চাঁদের মতো ম্লান হেসে বলল, না। মোটেই ঠিক নয়। কী নাম তোমার?

আমার নাম রঞ্জন।

তুমি হিন্দু। আমার নাম শবনম। আমি মুসলমান। আমি কলকাতায় পার্ক সার্কাসের কাছে পার্ল স্ট্রিটে থাকি।

আমি থাকি বালিগঞ্জে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনে।

ওখানে আমার এক বান্ধবী থাকে।

আমার কিন্তু কোনও বান্ধবী কোথাও থাকে না।

সে কী! তোমার বান্ধবী তো এখন তোমার পাশেই আছে। মুসলমানের মেয়ে বলে আমি কি পারি না কোনও হিন্দু ছেলের বান্ধবী হতে?

কেন পার না? আমাদের ঈশ্বর বা তোমাদের আল্লার কাছে সত্যিই কি কোনও ভেদাভেদ আছে? সবার রক্তের রংই তো লাল। এই দেখ না তোমার রক্ত আমার গায়ে, আমার জামায় লেগে আছে।

তুমি বড় ভাল।

তুমিও। তোমার মতো মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। ঈশ্বর করুন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ যেন কখনও না হয়। বাড়িতে তোমার কে কে আছে শবনম?

আমার কেউ নেই। মা মারা গেছেন ছেলেবেলায়। আব্বাজান আর আমি। আমার দাদা ছিল। সে মাফিয়া দলের সঙ্গে মিশে উচ্ছন্নে গেছে। আব্বা তার মুখ দেখেন না। চাচা-চাচি আছেন। লোক সুবিধের নয় তাঁরা।

আমিও আমার বাবার একমাত্র সন্তান বলতে পার। আমার বড় দিদি ছিলেন। তিনি মারা গেছেন গত বছর। আমার দিদির ছেলেরা খুব ছোট। একজনের বয়স ছ'বছর। একজনের চার। আমি সম্বলপুরে তাদের কাছেই যাচ্ছিলাম।

আমি আব্বার সঙ্গে যাচ্ছিলাম হীরাকুদে।

এমন সময় গাছপালার আড়াল থেকে জনাচারেক লোক বেরিয়ে এসে বলল, তা তো যাচ্ছিলে। কিন্তু তোমার হাতে ওগুলো কী বাবা?

ওরা দু'জনেই চমকে উঠল এই নির্জন টিলায় ওই গুন্ডাকৃতি আগন্তুকদের দেখে।

শবনমের হাতে ওর আব্বাজানের ঘড়ি, বোতাম আর মানিব্যাগটা ছিল। একজন এসে ছিনিয়ে নিল সেটা।

আর একজন বলল, বেশ জায়গাটি বেছে নিয়েছ বাছাধনরা। ভেবেছ এখানে এসে গা ঢাকা দিলে কেউ আর দেখতে পাবে না তোমাদের। কিন্তু এটাই যে আমাদের স্বর্গরাজ্য। তা বুঝি জানতে না?

রঞ্জন বুঝল লোকগুলোর মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে। তার মানে নেশা করেছে ওরা। চারজনের মধ্যে দু'জন খুবই অপ্রকৃতিস্থ।

রঞ্জন বলল, এটা স্বর্গই হোক আর নরকই হোক। যেগুলো নিয়েছ সেগুলো ফেরত দাও।

চুপ কর বদমাশ কোথাকার। মেরে মুখ ভেঙে দেব। এক ফোঁটা ছেলেমেয়ে এই বয়সেই চরতে শিখেছ? রাতের অন্ধকারে বনে-জঙ্গলে ঘুরতে এসে শুরু করেছ ছিনতাইবাজি?

রঞ্জন বলল, আমরা ছিনতাইবাজি করতে এসেছি, না তোমরাই লুটপাট করবার জন্যে রাতের অন্ধকারে ফিস প্লেট সরিয়ে নিয়েছিলে লাইন থেকে?

লোকগুলো এবার গম্ভীর মুখে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। তারপর একজন এগিয়ে এসে বলল, তুই কী ম্যানেজ করেছিস দেখি?

রঞ্জন বলল, এই দেখ। বলেই সে সজোরে লোকটার তলপেটে একটা ঘুসি মারল।

মারার সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা বিকৃত হয়ে জিভটা ঝুলে পড়ল লোকটির। ঠোঁটের কষ বেয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল।

একটি কিশোর বয়স্ক ছেলের হাতে একজন সঙ্গীর ওই রকম দুর্দশা দেখে বাকি তিনজন থতিয়ে গেল প্রথমে। ওদেরই একজন পিছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঞ্জনের ওপর। কিন্তু এই কিশোরের শারীরিক শক্তি এবং জুজুৎসুর প্যাঁচের নমুনা জানা ছিল না বাছাধনদের। তাই নিমেষে লোকদুটোকে ধরাশায়ী করে আবার রুখে দাঁড়াতেই একজনের লাথির ঘায়ে ছিটকে পড়ল ও। সেই

সময়টুকুর মধ্যেই বাকি দু'জন ওর পকেট হাতড়ে যা যেখানে ছিল সব কিছু সাফ করে নিল। রঞ্জন বাধা দেবার আর কোনওরকম সুযোগই পেল না। উপরন্তু একজন দু'হাতে সজোরে ওর গলাটাকে টিপে ধরল।

এই আকস্মিক বিপদে হতভম্ব হয়ে শবনম বেচারা বোবার মতো দাঁড়িয়ে ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে রঞ্জনের অবস্থা দেখে শিউরে উঠল ও। ওদের অন্য মনস্কতার সুযোগ নিয়ে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে যে লোকটা রঞ্জনের গলা টিপে ধরেছিল তার মাথার ওপর সজোরে বসিয়ে দিল। এক ঘা-ই যথেষ্ট। ভারী পাথরের আঘাতে মাথাটা গুঁড়িয়ে গেল একেবারে।

বাকি রইল আর দু'জন। ক্রুদ্ধ কুকুরের মতন এগিয়ে এল তারা শবনমের দিকে। বলল, তবে রে শয়তান মেয়ে।

একজন বলল, আয় তোকে পাহাড় থেকে ছুড়ে ফেলে দিই।

আর একজন বলল, না। ওকে মেরে ফেললে চলবে না। ওর গায়ের রং মুখশ্রী দেখেছিস? বড় হলে ও নূরজাহান হবে। আমাদের সঙ্গেই ওকে নিয়ে চলে যাই চল।

শবনম বলল, খবরদার এক পাও এগোবে না বলছি আমার দিকে। খুব সাবধান। আমি কিন্তু জ্যান্ত গোখরো সাপ। এমন ছোবল দেব যে তা ভাবতেও পারবে না।

কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনি। যাদের বলা হল, তারা কর্ণপাতও করল না শবনমের কথায়। একজন এসে জোর করে কাঁধে উঠিয়ে নিল শবনমকে।

শবনম চিৎকার করতে লাগল, ছাড়ো ছাড়ো। ছাড়ো বলছি আমাকে। ছেড়ে দাও। রঞ্জন!

রঞ্জন তখন অতি কষ্টে আবার উঠে বসতে যাচ্ছে। কিন্তু যতবার উঠতে যাচ্ছে ততবারই পড়ে যাচ্ছে ও।

শবনম তখনও চিৎকার করছে, আমাকে বাঁচাও! রঞ্জন! এরা আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

যে লোকটি ওকে কাঁধে নিয়েছিল সে বলল, তোমার বন্ধু এখন হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে বাঁচাতে আসবে না খুকুমণি। এখন চলো তুমি আমাদের গুহাতীর্থে বন্দিনী হবে বলে।

শবনম বলল, এখনও বলছি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। না হলে তুমি মরবে।

কে মারবে আমাকে! তোমার ওই হিরো?

ও নয়। আমিই মারব তোমাকে। বলার সঙ্গে সঙ্গে যা করবার তা করে ফেলল শবনম।

লোকটি যেন সাপের ছোবল খেয়ে চিৎকার করে উঠল। দেখা গেল নিজের গুপ্তস্থান থেকে ছোট্ট একটি পেনসিল কাটা ছুরি দিয়ে লোকটার গলার নালি দু'ফাঁক করে দিয়েছে শবনম।

ততক্ষণে রঞ্জনও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরও নাকেমুখে রক্ত। কপালের একটা পাশ কেটে গেছে।

আক্রমণকারী দলের বাকি একজন দারুণ বিপাকে পড়ে গেল এবার! দুটি কিশোর কিশোরীর হাতে ওর তিন সঙ্গীর ওই দুর্দশা দেখে আর এগোতে সাহস করল না সে। এবার এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে লাগল তাই।

ছোট্ট ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা হাতে নিয়ে শবনমও কেউটে সাপের মতো হিল হিল করে এগোতে লাগল ওর দিকে, আয় না। কাছে আয়। পালিয়ে যাচ্ছিস কেন?

লোকটি এবার পিছু হটতে হটতে প্রাণের দায়ে দৌড়তে লাগল।

আকাশের পট থেকে শেষরাতের সমস্ত গ্লানি মুছে গেছে তখন। জ্যোৎস্নারাতের যদিও গ্লানি থাকে না, তবুও দুধফিকে অস্পষ্টতা যেটুকু ছিল সেটুকুও পরিষ্কার হয়ে গেল।

কী অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার। চারদিকে পাহাড়ের ঢেউ। সবুজ বনানী। তীরে শিমুল-পলাশে রাঙা গহন বনরাজি। গাছে পাখির ডাক। কী চমৎকার।

রঞ্জন টলতে টলতে এসে শবনমের একটা হাত ধরল। ওর চোখের কোলে চিক চিক করছে মুক্তোর মতো জল।

শবনম বলল, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, রঞ্জন?

হ্যাঁ। প্রচণ্ড মার দিয়েছে ওরা। গলাটা এত জোরে টিপে ধরেছিল যে এখনও লাগছে। তা ছাড়া ওরা আমার সব টাকাগুলোও কেড়ে নিয়েছে।

আমারও। এখন কী করি বল তো?

কী আর করবে? আপাতত লোকালয়ে যাই চলো।

ওরা উঁচু টিলার ঢাল বেয়ে নীচে নামতে লাগল। হঠাৎই কী মনে পড়ে যেতে শবনম বলল, রঞ্জন, আমার মনে হয় ওই লোকগুলোর পকেট হাতড়ালে হয়তো আমাদের খোয়া যাওয়া জিনিসপত্তরগুলো পাওয়া যেতে পারে।

রঞ্জন বলল, ঠিক বলেছ তো। চলো চলো। ওদের চারজনের তিনজনকেই আমরা শেষ করে দিয়েছি। বাকি একজন কি সব নিয়ে পালাতে পেরেছে?

শবনম রঞ্জনকে বলল, তুমি একটু ধীরে ধীরে এসো। আমি ততক্ষণ দেখছি।

রঞ্জন বলল, তাই যাও। যা করবার তাড়াতাড়ি কোরো। না হলে লোকজন এসে পড়বে এখুনি। ভোর হয়েছে। সকাল হতেও বেশি দেরি নেই। কেউ আসার আগেই কেটে পড়তে হবে আমাদের। না হলে খুনের দায়ে ধরা পড়ব আমরা।

শবনম অত্যন্ত চতুরা। এই কৈশোর বয়সেই তার বুদ্ধি, সাহস এবং কর্মতৎপরতা সত্যিই প্রশংসা করবার মতো। সে ক্ষিপ্রগতিতে তিনজনের দেহ উলটে পালটে পকেট হাতড়ে অনেক কিছুই বার করে ফেলল।

রঞ্জন এসে উদ্ধার করল শবনমের আব্বাজানের সোনার বোতামটা। পাওয়া গেল না শুধু ঘড়ি আর মানি ব্যাগ। রঞ্জনের টাকাগুলো যে হাতিয়েছিল তার মাথা তো গুঁড়িয়ে দিয়েছিল শবনম। কাজেই সেগুলো উদ্ধার করতে খুব একটা কষ্ট হল না।

এমন সময় ওরা বহু দূর থেকে দুম দাম শব্দ শুনতে পেল।

শবনম বলল, ও কীসের শব্দ?

মনে হয় গুলির। ব্লাঙ্ক ফায়ার করে রেলপুলিশ নিশ্চয়ই দুর্ঘটনাস্থল থেকে লোকজন সরাচ্ছে।

তার মানে রেসকিউ পার্টির লোকেরা এসে গেছে?

মনে হয়।

রঞ্জন! আমার আব্বাজান?

দুঃখ কোরো না শবনম! এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশ থেকে কলকাতার পথে আপাতত আমরা পাড়ি দিতে পারব না। বরং চলো কোথাও থেকে তার করে যে যার বাড়িতে আমাদের অবস্থার কথা জানাই। তোমার আব্বাজানকে পেলেই বা এখন তুমি কী করবে? তুমি আমি দু'জনে কি পারব তাঁর মৃতদেহ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে?

শবনম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এসো। টিলার নীচে ওই নদীতে গিয়ে বরং আমরা আগে একটু পরিষ্কার হই।

রঞ্জন নিজের টাকা শবনমের আব্বাজানের বোতাম ছাড়াও ওদের পকেট হাতড়ে যা কিছু পেয়েছিল সব নিজের কাছে রেখে দিল। বলল, বলা যায় না, এই কাগজপত্রের ভেতর দিয়েই হয়তো ওদের পরিচয় এবং অনেক গোপন তথ্য পেয়ে যাব। আর সেগুলো পুলিশের হাতে তুলে দিলে নিশ্চয়ই দুষ্কৃতীরা দলকে দল ধরা পড়বে।

ঠিক বলেছ তুমি। আল্লা করেন যেন তাই হয়। দলকে দল ধরা পড়ে ওরা। আমরা তো তিনজনের বদলা নিয়েইছি।

ওরা আর একটুও বিলম্ব না করে সেই ঘন গাছপালায় ভরা উচ্চ টিলার ওপর থেকে নীচে নেমে এল। একেবারে নীচে নেমে আসার পর দেখল ছোট্ট একটি গিরিনদী এঁকেবেঁকে পাহাড়ের খাঁজেখাঁজে অশান্ত গতিতে বয়ে চলেছে।

শবনম বলল, তুমি এইখানে একটু আড়ালে বসে থাক। আমি ততক্ষণ এগুলো পরিষ্কার করে নিই।

রঞ্জন বসে রইল।

সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই মুখহাত ধুয়ে পোশাকে লেগে থাকা রক্তের দাগ মুছে উঠে এল শবনম। বলল, এবার আমি বসি, তুমি যাও।

রঞ্জন বলল, তা তো যাব। কিন্তু এই সাতসকালে একেবারে সব যে ভিজিয়ে ফেললে তুমি। এখন উপায়?

উপায় আর কী বল? আমি তো তোমার মতো ছেলে নই। না হলে খালি গায়ে থাকতাম। গায়ে জল বসুক আর যাই হোক ভিজে জামাই পড়ে থাকতে হবে।

সত্যিই তো। উপায় কী?

রঞ্জন নিজেও এবার নদীতে নেমে মুখহাত ধুয়ে পরিষ্কার হল। ওর জামাতেও যে সব জায়গায় রক্তের দাগ লেগেছিল, সেগুলো পরিষ্কার করল। পরিষ্কার করতে গিয়ে নিজের জামাও ভিজিয়ে ফেলল রঞ্জন। তারপর ভিজে জামা গায়ে দিয়েই উপরে উঠে এল।

ঠিক এই সময়ই পাহাড়ের ঘন শাল বনের ভেতর থেকে প্রভাতসূর্যের আলোর ছটা ওদের গায়ে এসে পড়ল। গাছের সবুজ পাতায় লাল আলো কী অপরূপ।

ইতিমধ্যেই চারদিকে লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে। তবে তা নেহাতই দেহাতি লোকজনের। ওরা সেই পথে যেতে যেতে বনের ভেতর হঠাৎ একটা মন্দির দেখতে পেল।

রঞ্জন বলল, যাক বাবা, বাঁচা গেছে। ওইখানে উঠে ওদের আশ্রমে যে ভাবেই হোক একটু থাকার ব্যবস্থা করে নেব। তারপর স্থানীয় কোনও সরকারি-বেসরকারি অফিস অথবা পোস্ট অফিস থেকে ট্রাঙ্ককল করব বাড়িতে।

শবনম বলল, হ্যাঁ। না হলে আজকের কাগজে এই দুর্ঘটনার কথা যদি ছাপা হয়ে থাকে তা হলে সবাই খুব চিন্তা করবে। আর চাচাজিকে খবর না দিতে পারলে আমার আব্বাজানের ডেড বডিও বেপাত্তা হয়ে যাবে।

আমার সন্দেহ হচ্ছে কী জান শবনম, হয়তো শেষ পর্যন্ত তোমার আব্বাজানের ডেড বডি পাওয়াই যাবে না।

পাওয়া যাবে না! কেন?

তা জানি না। তবে শুনেছি রেল দুর্ঘটনায় এই রকমই নাকি হয়।

কথা বলতে বলতে ওরা সেই মন্দিরের কাছে এসে পড়ল। মন্দিরের বাইরের গেটে লেখা আছে গোবিন্দজির মন্দির। বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে মন্দিরটা। কয়েকটি তালাবন্ধ ঘরও রয়েছে।

রঞ্জন বলল, এইখানেই আমরা আজকের মতো আশ্রয় নেব। তারপর এদের সাহায্য নিয়ে যা করবার করব।

মন্দিরের সেবায়েত গিরিধারীজি ওদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। যদিও অবাঙালি, তবুও পরিষ্কার বাংলায় বললেন, এসো এসো। ভেতরে এসো।

শবনম ও রঞ্জন ভেতরে ঢুকল।

গিরিধারীজি বললেন, এ কী! তোমাদের এই রকম অবস্থা কেন? এই সাতসকালে ভিজে কাপড়ে ব্যাপারটা কী?

রঞ্জন বলল, পূজারিজি, আমরা মাত্র একদিনের জন্য আপনার এখানে আশ্রয় চাই। আজ আপনার মন্দিরে আমাদের দু'জনের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থাও করতে হবে। যা লাগে দেব আমরা। খুব বিপদ আমাদের।

গিরিধারীজি সস্নেহে বললেন এবার, প্রসাদ জরুর মিলেগা। লেকিন তুম দোনো কৌন হো? কাঁহাসে আ রহে হো তুম! কীসের বিপদ তোমাদের?

রঞ্জন বলল, কাল রাত্রে ওই টিলার ওপরে যে বন, সেইখানে এক গুরুতর রেল দুর্ঘটনা হয়েছে।

হাঁ হাঁ শুনা। বহুত আদমিকা নিধন হো চুকা।

আমরাও ওই রেলের যাত্রী ছিলাম। ওই দুর্ঘটনার পর ভয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।

আঃ হা। বঢ়ি আপশোশ কী বাত। ঠিক হ্যায়। মাত ডরো। হিঁয়া ঘর ভি মিলেগা, খানা ভি মিলেগা। এ লেড়কি তুমহারা কৌন হ্যায়?

বহিনকা মাফিক।

বহিন কা মাফিক? বহিন নেহি? বলেই ডাকলেন, জানকি বেটি? এ জানকি বেটি?

ভেতর থেকে উত্তর এল, যাতে হেঁ।

গিরিধারীজি বললেন, জলদি আ যাও। তারপর রঞ্জনকে বললেন, খুব জোর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শুনলুম। কোনও আদমিকে ওখানে যেতে দিচ্ছে না পুলিশ?

রঞ্জন বলল, না। তারপর বলল, একটু বেলায় এখানে কোথাও থেকে বাড়িতে একটা ট্রাঙ্কল করা যাবে?

হাঁ হাঁ। নিশ্চয়ই করা যাবে।

এমন সময় মধ্যবয়সি এক মহিলা সম্ভবত জানকি বিটিয়া এসে দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর ওদের দেখে কতকটা নিজের মনেই যেন আস্তে করে বললেন, দোনো কাঁহাসে আ গিয়া?

গিরিধারীজি বললেন, দুর্ঘটনা সে ফাঁস গয়া বেচারা। যাও কুছ খানা লে আও।

জানকি বিটিয়া একটু সময়ের মধ্যেই দুটো প্লেটে দুটো করে মুগের লাড্ডু আর ভাল ঘিয়ের হালুয়া নিয়ে এলেন।

গিরিধারীজি বললেন, তোমরা কলকাতা থেকে আসছ নিশ্চয়ই? পাথুরেঘাটার দুনিচাঁদবাবুকে চেনো?

রঞ্জন বলল, না।

জানকি বিটিয়া বললেন, ইয়ে মন্দির উনহোনে বনায়া।

গিরিধারীজি বললেন, যাও, ও বগলবালা ঘর ও লেড়কাকো দে দো। আউর লেড়কিকো সাথ রাখো তুমহারা। আচ্ছা সে দেখভাল করো।

রঞ্জন বলল, ওর সব কিছু ভিজে আছে। দয়া করে ওকে একটা শুকনো কিছু পরবার জন্য দিন।

গিরিধারীজি বললেন, চিন্তা মাত করো বেটা। এটা দেবস্থান। গোবিন্দজির মন্দিরে যখন এসে পড়েছ তখন সব কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে তোমাদের। দরকার হলে আমিই তোমাদের বাড়িতে খবর পাঠাব। ভাবনা কোরো না। তারপর বললেন, ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা।

আমার নাম রঞ্জন রায়।

আর উস লেড়কি কো?

শবনম।

বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত হয়ে গেল। লাফিয়ে উঠলেন গিরিধারীজি, কেয়া নাম বতায়া? শবনম?

শবনম বলল, হ্যাঁ।

মহামেডান!

জি হ্যাঁ?

নিকালো, নিকালো, আভি নিকালো হিঁয়াসে। এটা গোবিন্দজির মন্দির। বাবু জানতে পারলে আমার নোকরি থাকবে না। হিন্দুর মন্দিরে মুসলমানের কোনও স্থান নেই। অন্য কোথাও রাস্তা দেখ তোমরা।

খাওয়া অর্ধপথেই রইল। রঞ্জন মুখের গ্রাস নামিয়ে বলল, সে কী পূজারিজি! এই অচেনা জায়গায় আমরা কোথায় রাস্তা দেখব? শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধে এই ফুলের মতো মেয়েটা হিন্দুর মন্দিরে আশ্রয় পাবে না?

না পাবে না। বলেই শবনমকে বললেন, তুমি এখুনি মন্দিরের বাইরে চলে যাও।

শবনমের দু'চোখে জল এল।

রঞ্জন দুঃখ করে বলল, পূজারিজি, আপনি যে গোবিন্দজির সেবা করছেন সেই গোবিন্দজিরই উপাসক চৈতন্যমহাপ্রভু, যবন হরিদাসকে তাঁর বুকের মাঝে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর আপনি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আরে থামো। ফালতু বকোয়াস মাত করো ছোকরা। ভাগো হিঁয়াসে।

রঞ্জন না-খেয়েই উঠে দাঁড়াল। তারপর থুঃ করে একটা থুতু ফেলে চলে এল মন্দির থেকে।

শবনম কাঁদছিল।

রঞ্জন বলল, কেঁদো না। আমাদের পুরোহিত-ব্রাহ্মণরা এই রকমই। আমাদের সংস্কারও এই রকম। এখন চলো যেদিকে লোকবসতি আছে সেই দিকে যাই।

শবনম বলল, আমার জন্যে তুমিও আশ্রয়হীন হলে। তার চেয়ে তুমি থাকো, আমি যাই।

ছিঃ শবনম। তুমি আমাকে এত হীন ভাবলে? মন্দির আর মসজিদের মহিমা ওরা কী বুঝবে? তা যদি বুঝত তা হলে কি এত কষ্ট থাকত মানুষের? যিনি খ্রিস্ট তিনি কৃষ্ণ তিনিই আল্লা এই সরল সত্যকে যুগে যুগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের মনীষীরা। তবুও আমাদের মাঝে এর এত ভেদাভেদ। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমিও তো হিন্দুর ছেলে। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলেও, আর এক হিন্দু ভাই যে তোমাকে গ্রহণ করতে চায়, তার বেলা?

শবনমের মুখে এবার একটু হাসি ফুটল। বলল, চলো, চলে যাই। কাল রাত্রি থেকে কী যে হচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছি না। আমার খুব খিদে পাচ্ছে। তোমারও পাচ্ছে নিশ্চয়ই?

ওরা দু'জনে ধীরে ধীরে বনপথ-রেখা ধরে এগিয়ে চলল। বেশ কিছুদূর যাবার পর লোকজনের দেখা মিলল। এরা সব লাইন দিয়ে জঙ্গলের কাঠ কাটতে চলেছে। ওদের প্রত্যেকেরই মুখে গত রাতের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কথা।

রঞ্জন ওদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ভাই, এখানে কাছেপিঠে কোথাও কোনও দোকানটোকান আছে?

হাঁ হাঁ। সিধা চলা যাইয়ে! দুকান মিলেগা। সবজি মণ্ডি মিলেগা। সব কুছ হ্যায় হুঁয়া পর।

ওরা আশান্বিত হয়ে সেই দিকেই এগিয়ে চলল।

খানিক যাবার পর দু'-একটা করে ঘরবাড়ি চোখে পড়ল ওদের। অবশেষে ছোট্ট একটি বাজারের কাছে এসে পড়ল ওরা। একটি দোকানে গরম গরম কচুরি আর জিলিপি ভাজা হচ্ছিল। দোকানের বাইরে পেতে রাখা একটা নড়বড়ে বেঞ্চিতে এসে বসল দু'জনে।

ওদের ভিজে পোশাকপরা চেহারার দিকে তাকিয়ে দোকানদার বলল, তুম দোনো কাঁহা সে আ রহে ভাই?

রঞ্জন বলল, কাল রাত্রে যে ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে আমরা তারই যাত্রী ছিলাম।

এখন তোমাদের দেশে এসেছি। যে ভাবেই হোক আমাদের কলকাতায় ফিরে যাবার একটা পথ বলে দাও।

ক্যায়সে যাওগে? সব রাস্তা বন্‌ধ।

তা হলে?

তা হলে কেয়া? কুছ না কুছ হোগা। আভি বতাইয়ে ক্যা চাহিয়ে।

আপাতত চারটে করে কচুরি আর একশো গ্রাম করে জিলিপি দাও। আমাদের কাছে টাকা-পয়সা আছে। দাম দিতে পারব।

দোকানদার একটু জিভ কেটে বলল, হায় রাম। হাম এতনা বূঢ়া আদমি নেহি। তুমহারা পাশ পইসা নেহি রহনে সে ভি খিলায়াগা তুমকো। আও, অন্দর চলা আও।

রঞ্জন বলল, কেন, বেশ তো বাইরে আছি।

আরে খোকাবাবু! ও তো স্রেফ দেহাতি লোগোকে লিয়ে। তুম দোনো অন্দরমে আ যাও।

কিন্তু আমি হিন্দু, আর ও মুসলমান। ভেতরে ঢুকলে দোকানের জাত যাবে না তো?

দোকানদার ফিক করে একটু হেসে বলল, নেহি। হোটেল রেস্টুরেন্ট মে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সবকো একই নজর সে দেখা যাতি হ্যায়। তুম ডরো মাত।

ওরা দু'জনে দোকানের ভেতরে ঢুকে পেটভরে কচুরি আর জিলিপি খেল।

শবনম বলল, আমি চা খাব না। তুমি খাও তো খেতে পারো।

রঞ্জন নিজের জন্য একটা চা বলল।

চা খেতে খেতে রঞ্জন দোকানদারকে বলল, ভাই সাব, হিঁয়া ঠারনেকে লিয়ে হোটেল মিলেগা?

নেহি ভাই। লেকিন একঠো ধরমশালা হ্যায় নদীকা কিনারা মে। হুঁয়া চলা যাও।

ওরা দু'জনে খাবারের দাম মিটিয়ে বাইরে এসে বাজারের কাছে একটি দোকান থেকে দু'জোড়া চটি ও শবনমের জন্য একটা স্কার্ট কিনে ধর্মশালার দিকে চলল। ধর্মশালাটি যদিও মাড়োয়াড়ির, তবুও দেখাশোনার জন্য একজন বাঙালি ভদ্রলোক ছিলেন। রঞ্জনের মুখে সব শুনে বললেন, ঘর আমাদের আছে। কিন্তু শত বিপদেও এই ধর্মশালায় কোনও মুসলমানকে ঘর দেবার হুকুম নেই।

রঞ্জন বলল, তা হলে আমরা কোথায় যাব?

তা তো বলতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি এই ধর্মশালায় তোমাদের স্থান হচ্ছে না।

রঞ্জন আর এক মুহূর্ত রইল না সেখানে। শবনমের হাত ধরে চলে এল সেখান

থেকে। তারপর নদীর ধারে পাথরের একটি খাঁজের কাছে এসে বলল, তুমি একটু আড়ালে গিয়ে পোশাকটা পালটে নাও শবনম। আর সভ্যতার আলোয় নয়, দেবস্থানে ধর্মশালাতেও নয়, চলো আমরা জঙ্গলে যাই। সেখানে কোনও অরণ্যবাসীর গৃহে আশ্রয় নেব, নয়তো গাছের ডালে বসে রাত কাটাব। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার।

বাড়িতে ফোন করার তা হলে কী হবে?

সে ব্যাপারে তোমার কোনও চিন্তা নেই। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আগে একটা থাকার জায়গা ঠিক করি। তারপর সব কিছুর ব্যবস্থা করব।

ওরা ধীরে ধীরে জঙ্গলমুখো হল।

গভীর জঙ্গলে ঢোকার মুখে আবার পড়ল সেই নদীটা। তবে এখানে নদী পারাপারের জন্য একটা শক্ত মোটা গাছের গুঁড়ি রাখা আছে। তার মানে এখান দিয়ে লোকজন যাওয়া আসা করে। ওরা খুব সাবধানে সেই গুঁড়ির ওপর পা রেখে নদী পার হল। ছোট্ট নদী। বড় বড় পাথরের ওপর পা দিয়েও পারাপার হওয়া যায়।

নদী পার হয়ে কিছু দূর যাবার পরই এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখতে পেল। ওরা আশান্বিত হয়ে সেই গুহার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

রঞ্জন বলল, এই আমাদের উপযুক্ত জায়গা। এখানে কেউ আমাদের জাত জানতে চাইবে না। কেউ বিরক্ত করবে না, খুব শান্তিতে থাকতে পারব আমরা।

শবনম বলল, তা না হয় হল। কিন্তু রাত্তিরে যদি বাঘ-ভালুক এসে ঢোকে?

রঞ্জন বলল, সে ব্যবস্থাও করব বইকী। জঙ্গলে গাছের ডাল ভেঙে এনে পাথর সাজিয়ে মুখটাকে ছোট করে দেব। দিব্যি আরামে থাকব আমরা। দু'-একদিন থাকলেই যথেষ্ট। রাস্তা খুলে যাবে। এখন এখানটা পরিষ্কার করে চলো একটু বেলায় স্নান করে আবার শহরে যাই। সেখানে খেয়েদেয়ে সন্ধের আগেই এখানে ফিরে আসব।

শবনম খুশি মনে রঞ্জনের হাত ধরে গুহায় ঢুকল।

দুই

গুহার ভেতরটা খুবই অপরিষ্কার। দু'-একটি শূন্য বোতল বা বিড়ির টুকরোও পাওয়া গেল সেখানে। তার মানে এখানে কেউ আসে। ওরা বেশ ভাল ভাবে গুহার ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। খুব যে একটা বড়সড় গুহা তা নয়। তবে দু'-দশজন লোক অনায়াসে দিনের পর দিন থাকতে পারে এখানে।

শবনম বলল, চমৎকার জায়গা। এই গভীর জঙ্গলে গুহার আশ্রয়ের কাছে ধর্মশালার ওই ঘর কোথায় লাগে। এখন এসো সর্বাগ্রে দু'জনে মিলে এর ভেতরটা পরিষ্কার করে ফেলি।

রঞ্জন তক্ষুনি গুহার বাইরে গিয়ে কয়েকটি আগাছা উপড়ে এনে ঝাঁট দিতে শুরু করল। সে কাজে শবনমও হাত লাগাল বইকী। তারপরে দু'জনে ঘাসপাতা ইত্যাদি নিয়ে এসে মেঝের পাথরের ওপর বিছাল। কেন না একেবারে কঠিন পাষাণের বুকে তো শোয়া যায় না।

এরপর দু'জনে আশপাশে ঘুরে হঠাৎ এক জায়গায় ছোট্ট একটি ঝরনা আবিষ্কার করল।

রঞ্জন উল্লসিত হয়ে উঠল ঝরনা দেখে। বলল, এখানে স্নান এবং খাবার জলের সমস্যাটা মিটে গেল।

শবনম বলল, তাই তো। দাঁড়াও, কিছুটা জল ওই শূন্য বোতল গুলোয় ভরে রাখি। বলে গুহার ভেতর থেকে দুটি বোতল এনে জল ভরল। তারপর সেগুলো রেখে এসে বলল, একটু স্নান করতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে হত। কিন্তু গা মুছব কীসে?

রঞ্জন বলল, একটু পরেই তো আমরা খেতে যাব। অমনি দুটো গামছা কিনে আনব। আর এই ঘাসপাতায় বিছোবার জন্যে একটা শতরঞ্জি।

শবনম বলল, সেই সঙ্গে দেশলাই, মোমবাতি সম্ভব হলে একটা কেরোসিনের কুপি অথবা হ্যারিকেনও নেওয়া যেতে পারে। টর্চ তো আছেই সঙ্গে।

আর তার সঙ্গে রাতের খাবার।

ঠিক বলেছ।

শুধু তাই নয়, কালকের জন্যেও কিছু দোকান বাজার করে আনব। সম্ভব হলে এই জঙ্গলেই পিকনিকের মতো নিজেরা রেঁধে খাব আমরা।

দি আইডিয়া।

তারপর বেলাবেলি ফিরে এসে গুহার মুখটাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করব। করতেই হবে। না হলে নির্ঘাত বাঘের পেটে যাব। কাছেই যখন ঝরনা, তখন বুনো জন্তুর দল ওখানে জল খেতে আসবেই। সেই সময় মানুষের গন্ধ পেয়ে যদি কেউ ঢোকে তো ব্যস। কেল্লা ফতে করে ছেড়ে দেবে।

ওরা আবার বনভূমির পথ ধরে নদী পার হয়ে এপারে এল। তারপর প্রথমেই ওরা নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে গিয়ে ট্রাঙ্ককল করল শবনমের বাড়িতে।

শবনমের চাচাজি বললেন, এইমাত্র রেডিয়ো সংবাদটা শুনেছেন তিনি। শবনমকে একটু সাবধানে থাকতে বললেন, ডেড বডি আনার ব্যাপারে ঝামেলা অনেক। কেন না এখন তিনি ইচ্ছে করলেও ঘটনাস্থলে যেতে পারবেন না। তবে

যদি কোনও উপায়ে কিছু করা সম্ভব হয় তো তিনি তা করবেনই।

রিসিভার নামিয়ে রেখে শবনম ছলছল চোখে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন আমার জীবনে একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ নেই রঞ্জন।

রঞ্জন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আল্লার মরজি।

এই পোস্ট অফিস থেকেই রঞ্জন ওর বাড়িতে এবং দিদির বাড়ি সম্বলপুরে দুটো টেলিগ্রাম করে ওর কুশলবার্তা জানিয়ে দিল।

এবার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্তর যা যা দরকার সব কিছু একটা ঝোলা ব্যাগ কিনে তাতে রাখল। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে ফেরার সময় একটা বেশ ধারালো কাটারিও কিনল রঞ্জন।

শবনম অবাক হয়ে বলল, এটা দিয়ে তুমি কী করবে?

এটা আমাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। তা ছাড়া বনের কাঠ কাটতে এরকম একটা কিছুর তো খুবই দরকার। তাই নিলাম।

ওরা যেন একটা নতুন পরিবেশে থাকবার আনন্দে বিভোর হয়ে সেই গুহার দিকে এগিয়ে চলল।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই শবনম নিজের মনকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিল। আব্বাজানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ওর সমস্ত স্নেহমমতা এবং মায়াবন্ধনের দরজা রুদ্ধ হয়েছে। এখন ওর মনে হচ্ছে আর শহরে নয়, এই ঘন অরণ্যের বুকে গুহাবাসী হয়ে ওর এই কিশোর সঙ্গীটিকে নিয়ে যদি দিনের পর দিন কাটাতে হয়, তাতেও সে রাজি! চাচা-চাচির নিষ্ঠুরতার বলি সে হতে চায় না। অবশ্য আল্লার দোয়ায় এমনিতেই কারও মুখাপেক্ষী তাকে হতে হবে না। আব্বাজান যা রেখে গেছেন ওর জন্যে, তাতে সারা জীবন কোনও কিছু না-করলেও খাবার অভাব হবে না ওর। কিন্তু মনে মনে স্বপ্ন দেখলেও বরাবরের জন্য তো এই অরণ্যবাস সম্ভব নয়। শবনম তার সব কিছু হারালেও রঞ্জনের তো সবাই আছে। ঘরের ছেলে ও ঘরে। তো ফিরতেই হবে ওকে।

যাই হোক। কিছু সময়ের মধ্যেই জঙ্গলের গভীরে সেই গুহার কাছে চলে এল ওরা।

গুহার ভেতরটা অন্ধকার। ছোট্ট একটা চিমনি জ্বেলে সেই অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর ব্যবস্থা করা হল। শবনম রঞ্জনের কাঁধ থেকে ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে একপাশে রেখে, পুরু করে পেতে রাখা সেই ঘাসপাতার ওপর শতরঞ্জিটা বিছিয়ে, টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল একবার।

রঞ্জন বলল, কী ব্যাপার! শরীর খারাপ করছে নাকি?

না। বড় ক্লান্ত। ঘুম পাচ্ছে।

ঠিক আছে। তুমি বিশ্রাম করো। আমি ততক্ষণে একটু চেষ্টা করে দেখি

কীভাবে এই গুহার মুখটাকে আটকানো যায়।

শবনম শুয়ে থেকেই বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে লাফিয়ে উঠল, ওঃ হো। এখন তো বিশ্রামের সময় নয়। তুমি একা কেন, এসো আমরা দু'জনে মিলেই হাত লাগাই।

রঞ্জন বলল, এসো তবে।

প্রথমেই ওরা শুকনো কাঠকুটো যা কিছু পারল সব এনে জড়ো করল গুহার ভেতর। তারপর বয়ে আনা যায় এমন বড় বড় পাথর জড়ো করে গুহার মুখটাকে সংকীর্ণ করে ফেলল। এবার জঙ্গলের শক্ত মোটা গাছের ডাল এনে সেগুলো গুহামুখে আটকে এমন একটা ঘর সৃষ্টি করল যে, একমাত্র সাপ আর ইঁদুর ছাড়া কারও সাধ্য নেই এর ভেতরে ঢোকে।

দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রম সন্ধের মধ্যেই হয়ে গেল সব কিছু। এবার গুহার ভেতরে বসে দীর্ঘরাত্রির অবসানের প্রতীক্ষা করা।

চিমনি লণ্ঠনের আলোটা উসকে দিয়ে ওরা নিজের জিনিসগুলো গোছগাছ করতে লাগল।

রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেই এনেছে ওরা। পাঁউরুটি, কলা, বিস্কুট, মিষ্টি সব কিছুই আছে। খাবারের জন্য জলও আছে দু'বোতল ভরতি।

গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে শবনম পাদুটো লম্বালম্বি ভাবে ছড়িয়ে উদাস হয়ে বসে রইল। রঞ্জনও ঠিক ওই একইভাবে বসে রইল ক্লান্ত দেহ নিয়ে। দুই শহরবাসী কিশোর কিশোরীর দৈব দুর্ঘটনায় এই অরণ্যবাস অভূতপূর্ব।

রঞ্জন বলল, তুমি নিয়তি মানো শবনম?

মানি বইকী।

একদিন আগেও আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না।

এখন তো চিনেছি।

তোমার ভয় করছে না তো?

উ হুঁ। ভয় করবে কেন? আসলে আমাদের জীবনে ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা না-ঘটলে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা কি হত আমাদের? এই ঘন অরণ্যের গভীরে একটি গুহার ভেতরে পরম নিশ্চিন্তে এইভাবে বসে থাকা কি কখনও সম্ভব হত?

না। তা অবশ্য হত না।

এই উদাহরণ তোমার কাছে কেমন লাগছে রঞ্জন?

অপূর্ব। আমার কী মনে হচ্ছে জানো?

কী মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে আমার কোনও অতীত বলে কখনও কিছু ছিল না, মনে হচ্ছে আমি যেন প্রকৃতই এই গুহারই বাসিন্দা।

আশ্চর্য! ঠিক ওইকথাই আমারও বার বার মনে হচ্ছে। আরও কী মনে হচ্ছে জানো?

কী?

মনে হচ্ছে এই গুহা ছেড়ে কখনও আর শহরের চার দেওয়ালের ঘরে যেন ফিরে না যাই। আমার তো সর্বস্ব গেছে। আর একাও থাকতে পারব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে রঞ্জন, তা হলে সারা জীবন আমি এই জঙ্গলে গুহার ভেতরে কাটিয়ে দিতে পারতাম। প্রকৃতির বুকে এমন নিবিড় শান্তির স্বর্গ যে রচনা করা যায়, তা এখানে না-এলে অনুভবই করতে পারতাম না।

রঞ্জন কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা শবনম, একটা কাজ করলে হয় না? আমরা যদি ইচ্ছে করেই কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাই, তা হলে কেমন হয়?

শবনমের চোখদুটো চকচকিয়ে উঠল।

রঞ্জন বলল, নতুন করে আবার কখনও আসা হয়তো হয়ে উঠবে না। কিন্তু এসে যখন পড়েছি, এই গুহার ভেতরে নিজেদের ঘর নিজেরাই যখন তৈরি করে নিয়েছি, তখন থেকেই যাই না কিছুদিন।

শবনম বলল, আমি রাজি। যে বাড়িতে আমার আব্বাজান নেই, সে বাড়িতে ফিরতে আমার মন একটুও চাইছে না রঞ্জন। এখানে তবু তুমি আছ বলে বহু কষ্টে আমার বুকটাকে বেঁধেছি। কিন্তু কলকাতায় ফিরে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

রঞ্জন বলল, তবু ফিরতে তো হবেই।

জানি। কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। আমার এত বড় বিপদে আমার পাশে আছ। নিজের স্বার্থত্যাগ করেও আমাকে নিয়ে এই গুহায় এসে কত কষ্ট করছ। এখন তুমিই আমার সব। তাই তুমি থাকলে আমি থাকব। তুমি গেলে আমাকেও যেতে হবে। একা তো এই বনের ভেতরে থাকা যায় না। তাই, যদি পার তো কিছুদিন থেকেই যাও এখানে।

রঞ্জন হেসে বলল, থাকব। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, আমার কোনও বোন বা বান্ধবী নেই। আর তোমার মতন এত ফর্সা, এত স্মার্ট মেয়েও আমি কখনও দেখিনি। এই সারাদিনে তোমার ওপর আমার অনেক মায়া পড়ে গেছে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না শবনম, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন করবে।

শবনমের চোখদুটি জলে ভরে এল। বলল, সত্যি বলছ?

রঞ্জন ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। তারপর বলল, আমি এখনও স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করিনি। সামনের বছর ফাইনাল দেব। আমি যদি বড় হতাম নিজের পায়ে দাঁড়াতাম, তা হলে তোমার সব দায়িত্ব আমি

নিয়ে নিতাম। হিন্দু-মুসলমানের কোনও ভেদাভেদ আমার মধ্যে নেই। কিন্তু আমার মা-বাবা আছেন। তাঁরা কীভাবে নেবেন তোমাকে? তুমি যদি মুসলমান না হতে, তা হলে তোমাকে আর পার্ল স্ট্রিটের বাড়িতে তোমার চাচা-চাচির সঙ্গে থাকতে যেতে হত না। আমি ঠিক তোমাকে নিয়ে হাজির হতাম আমাদের বাড়িতে। এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকতে পারতে। কিন্তু তা যে হবার নয়। আমি সংস্কারমুক্ত হলেও তাঁরা হবেন কেন?

শবনম রঞ্জনের একটি হাত স্নেহভরে ওর বুকে নিয়ে বলল, আচ্ছা রঞ্জন, আমি যদি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু হয়ে যাই? তা হলে তোমার মা-বাবা পারবেন না আমাকে তোমার কাছে থাকতে দিতে?

রঞ্জন বলল, কিন্তু আমাদের ধর্মের যে গোঁড়ামি অনেক। হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া যায়, কিন্তু মুসলমান থেকে হিন্দু হওয়া যায় কি না আমি জানি না।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। দু'জনে রাতের খাওয়া সেরে আলো নিভিয়ে সেই গদির মতো তৃণশয্যায় রেখে শুয়ে পড়ল চুপচাপ।

রাত তখন কত তা কে জানে? শবনমের ঠ্যালা পেয়ে ঘুম ভাঙল রঞ্জনের। আর ঘুম ভাঙতেই শুনতে পেল বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ। মশালের আলোর আভাও সংকীর্ণ গুহামুখ দিয়ে ফুটে উঠল।

রঞ্জন বলল, নিশ্চয়ই কোনও দুষ্কৃতীর দল এসে জুটেছে এখানে।

আমার ভয় করছে রঞ্জন।

রঞ্জনের মুখও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বোকার মতো এখানে আশ্রয় নেওয়াটা খুবই কাঁচা কাজ হয়েছে। চোরডাকাত প্রভৃতি দুষ্কৃতকারীদের আড্ডার জায়গাই হল এই সব পরিত্যক্ত গুহা। এখন ওরা যদি ওদের ঘাঁটি দখল করতে আসে? তা হলে সমূহ বিপদ। রঞ্জন নিজের জন্য চিন্তা করছে না। ভয় ওর শবনমকে নিয়ে। ওর সুন্দর মুখশ্রী এবং গায়ের রং সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এখন ওরা এই রাতে যদি গুহা দখল করে, তা হলে শবনমকে রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়বে ওর পক্ষে।

শবনম ভয়ে ভয়ে বলল, কী হবে রঞ্জন?

রঞ্জন কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। বলল, ভেঙে পড়ো না। দেখাই যাক না ওরা কী করে। তুমি এক কাজ করো, গুহামুখের দেওয়ালের কোণে একেবারে লেপটে থাকো। যদি ওরা ঢোকে তা হলে আমি আগে মোকাবিলা করব ওদের। বলেই ঘাসপাতার বিছানা থেকে শতরঞ্জিটা তুলে ওর হাতে দিয়ে বলল, তুমি এটা মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকো। যাও।

তুমি?

আমি এখানেই থাকব। এমন ভান দেখাব যেন আমায় জোর করে কেউ এখানে আটকে রেখে গেছে।

রঞ্জনের কথামতো তাই করল শবনম। শতরঞ্জিটা সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে গুহামুখের একপাশে অন্ধকার কোণে লুকিয়ে রইল।

একটু পরেই ওরা যা আশঙ্কা করেছিল তাই হল। বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় একটা হাঁক শোনা গেল, অন্দরমে কৌন হ্যায় রে। জলদি বাহার নিকালো।

রঞ্জন কোনও সাড়া শব্দ না দিয়ে চুপ চাপ বসে রইল।

ওদিক থেকে তখন কাঠের আটকান ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে।

রঞ্জনও এক-পা দু'-পা করে পিছু হটতে লাগল। আর পথ নেই। দেয়ালের শেষপ্রান্তে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। কাটারিটা এই অন্ধকারে কোথায় রয়েছে কে জানে? সঙ্গে থাকলে ভাল হত। কেউ আক্রমণ করলে সমুচিত শিক্ষা দিত তাকে।

কাঠের আগল ভেঙে দু'-এক ধাপ পাথর সরাতেই একজন লোকের গলে ঢোকার মতো পথ হয়ে গেল।

রঞ্জন সবিস্ময়ে দেখল মাথায় পাগড়ি, অর্ধেক মুখ কাপড়ঢাকা বন্দুকধারী একজন ভেতরে ঢোকার জন্য মাথা গলাল। শরীরের অর্ধেক ঢুকেছে কি না-ঢুকেছে হঠাৎ দেখা গেল মাথাটি তার খসে পড়ল ধর থেকে। রঞ্জন শিউরে উঠল। এ কী করল শবনম! এমন কাঁচা কাজ কেউ করে? বাইরে ওরা কতজন আছে-না-আছে তা কে জানে? যদি ওরা টের পায়? রঞ্জন ছুটে এসে লোকটার হাতদুটো ধরে হিড় হিড় করে টানতেই পুরো দেহটা ভেতরে চলে এল। কয়েকটি পাথরও ধসে পড়ল দুড়দাড় করে। তার পর দেহটা এক ধারে সরিয়ে রেখে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল সর্বাগ্রে।

শবনম বলল, তুমি বন্দুক ছুড়তে পার?

না।

তা হলে ওটা নিয়ে কী করবে?

ওদের ভয় দেখাব।

শবনম হেসে বলল, তা হলেই হয়েছে। দাও ওটা আমাকে দাও। আর বন্দুক চালানো কাকে বলে চেয়ে দেখো।

তুমি পার রাইফেল শুটিং করতে?

পারি বলেই তো মুণ্ডুটা ওর নামিয়ে দিলাম।

কিন্তু মৌচাকে ঢিল ছুড়লে তো?

তা ছুড়লাম। যাক, তুমি কি কাটারিটা নেবে?

নেব! আমি ভেবেই পাচ্ছি না কোন ফাঁকে কাটারিটা তুমি নিলে।

বাইরে থেকে তখন হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে, আরে এ শম্ভু ভেইয়া। কা ভৈল?

খানিক বাদেই মস মস জুতোর শব্দ। এ লোকটিও আগের লোকটির মতো মাথা গলাতেই রঞ্জনের কাটারির ঘা পড়ল তার ঘাড়ের ওপর। অনভ্যস্ত হাত। তাই এক কোপে বিচ্ছিন্ন হল না। লোকটি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

রঞ্জন ওই অবস্থাতেই লোকটিকে ঢোকাল ভেতরে। সেই যন্ত্রণার দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। শবনম একটুও দেরি না করে ওর বুকের বাঁদিকে একটা গুলি করল।

বাইরে থেকে একজনকে বলতে শোনা গেল, আরে বাঃ। এ জাদু গুম্ফা হো গিয়া ক্যা। যো অন্দর মে ঘুসতা ও বাহার নেহি নিকাল তা।

আর একজন কে বলল, চোপ রহো বুরবাক কাঁহাকা। অন্দরমে গোলি কা শব্দ শুনা?

আর একজন বলল, হাঁ হাঁ শুনা। আভি চলো, ভাগো হিঁয়াসে। জরুর কুছ গড়বড় হো গিয়া হোগা।

কিন্তু ভাগবে কী? গুহার ভেতর থেকে শবনমের বন্দুক তখন গর্জে উঠেছে 'ডিস্যুম ডিস্যুম'।

দু'-দুটো তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। ঘোড়াগুলো চিঁ হি-হি-হি শব্দ করে ঊর্ধ্বপদ হয়ে লাফিয়ে উঠল একবার। কয়েকজন অশ্বারোহীর পলায়নের শব্দও শোনা গেল।

শবনমের কীর্তি দেখে রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। এমন সুন্দর কান্তি যার, যার মুখের দিকে তাকালে স্বর্গের সুষমা অনুভব করা যায়, তার হাতে এমন মৃত্যুমাদল কী করে বেজে উঠল? তাই ভয়ে ভয়ে বলল, এবার আমরা কী করব?

শবনমের চেহারাটাই তখন অন্যরকম হয়ে গেছে। কী দারুণ তেজ ওর শরীরে। কে বলবে ও একটি সদ্য পিতৃহারা কিশোরী মেয়ে। ওর দিকে চোখ মেলে তাকাতেও এখন ভয় করল রঞ্জনের।

শবনম একটু স্বাভাবিক হয়ে বলল, এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কিছু নেই যদিও, তবুও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

এই ডেড বডি দুটোর কী হবে?

দুটো তো ভেতরে। বাইরে আরও দুটো আছে। এখন এই রাতে যে যেখানে আছে সে সেখানেই থাকুক।

কিন্তু ওরা যদি একটু পরে দলবল নিয়ে আবার ফিরে আসে?

শবনম একটু চিন্তা করে বলল, তোমার ধারণাটা অবশ্য অমূলক নয়। এবং তা যদি হয় তা হলে সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। আর সেই যুদ্ধে মরবে ওরাই। আমাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।

কেন?

আমরা গুহার ভেতর থেকে পাথরের খাঁজ দিয়ে ওদের লক্ষ করতে পারব। কিন্তু ওরা বাইরে থেকে তা পারবে না। কোনওরকমে রাত্রিটা কাটাতে পারলে দিনের আলোয় পালাবে ওরা। আমরা তখন বেরোতে পারব।

কিন্তু সারারাত লড়াই করার মতো গুলি কি দুটো বন্দুকে আছে?

বন্দুকে না থাকলেও ওদের কাছে আছে। তা ছাড়া বাইরে যে দু'জন ঘুমিয়ে আছে তাদের কাছ থেকেও নিয়ে আসতে হবে বন্দুকদুটো।

রঞ্জন ভয় পেয়ে বলল, না না। বাইরে যাবার দরকার নেই। এই দুটোতেই কাজ চলুক।

শবনম বলল, ও দুটো আনতেই হবে রঞ্জন। লড়াই যখন শুরু করেছি, তখন শেষ না, হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাব।

তা হলে নিয়েই আসি ও দুটো?

উঁহু। তুমি নয়, আমি।

কেন আমিই যাই না?

তুমি ভয় পেয়েছ রঞ্জন। তা ছাড়া যদি কোনও বিপদ আসে সেটা আমার ওপর দিয়েই আসুক। বিপদ এলে বন্দুক নিয়ে আমি লড়তে পারব। তুমি পারবে না।

শবনম বেরোতে যাচ্ছে, রঞ্জন ওর একটি হাত ধরে টান দিল। বলল, তার চেয়ে বলি কী, এখুনি এই গুহা ছেড়ে আমরা কোথাও পালিয়ে যাই চলো।

কোথায় যাব? এই জঙ্গলে রাতদুপুরে চিতার পেটে যাব যে। এখান থেকে সকালের আগে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। হাত ছাড়ো।

শবনম বন্দুক নিয়ে সেই সংকীর্ণ গুহামুখে পাথরের আটকানের ফাঁক দিয়ে বাইরে গেল।

রঞ্জন ভেতর থেকেই দেখতে পেল, চারপাশ একবার ভালভাবে দেখে নিয়ে ডাকাতদের মশালের আলোয় কী দ্রুত গতিতে কাজ সারল শবনম। চটপট বন্দুকগুলো কেড়ে নিয়েই রঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিল। তারপর ওদের পকেট হাতড়ে দোনলা রিভলভার বার করল দুটো। সেই সঙ্গে কয়েকটি কার্তুজ। আর তারপরই যা করল তা একেবারে অভাবনীয়। সেই লোকদুটোর একজনের পোশাকপরে মাথায় ফেট্টি বেঁধে মিলিটারি মেজাজে আবার গুহার ভেতরে এসে ঢুকল। ওদের ফেলে যাওয়া মশালও একটা নিয়ে আসতে ভুলল না।

ওর ওই রণচণ্ডীমূর্তি দেখে রঞ্জন ভয় পেয়ে গেল খুব। বলল, না না। এই পোশাকে তোমাকে মানায় না।

শবনম ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল হো হো করে। বলল, তুমি ভয় পেয়েছ রঞ্জন?

হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি। সত্যিই ভয় পেয়েছি আমি। মায়ের মুখে দশমহাবিদ্যার গল্প শুনেছিলাম। সতী পিতৃগৃহে যাবার জন্যে শিবকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন তোমার মধ্যেও আমি এই গুহার ভেতর সেই রূপ দেখতে পাচ্ছি। তুমিই সেই ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী। তুমিই সব। না না শবনম, আবার তুমি আবেগের মতো হয়ে যাও। তোমাকে দেখে আমার বুকের ভেতরে কীরকম যেন হচ্ছে।

আমারও। বলে রঞ্জনের কাঁধে একটা হাত রেখে শবনম বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি হঠাৎ কী করে যেন আমি বদলে গেছি। আসলে এই বন্দুকের নলে আমি যেন মহাশক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছি। না-হলে এই বন্দুক হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমন ভয়ংকর দস্যুদের চার-চারজন প্রাণ হারাল কী করে? আসলে কোনও এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে চায়। না হলে এ রকম দুর্ঘটনাই বা ঘটবে কেন, আর আমরাই বা এখানে আসব কেন? আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি রঞ্জন। এই বন্দুকের নল দিয়েই আমি আমার আব্বাজানের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দেব।

রঞ্জন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি কি ফুলনদেবী হতে চাও?

হতে চাই কেন? হয়েছি। এই পোশাক যখন পরেছি, এই বন্দুক ও রিভলভার যখন হাতে নিয়েছি তখন আর আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। আমি খুঁজে বার করব এই দস্যুর দলকে। ওদের সঙ্গে হাত মেলাব। তারপর তাদের অস্ত্রে তাদেরকেই এক এক করে সমুচিত শিক্ষা দেব আমি।

তারপর?

তারপর! জঙ্গলের আরও গভীরে এই রকমই একটি পরিত্যক্ত গুহা বেছে নিয়ে সেখানে একাকী রাজত্ব করব। আমি নিজেও একটা দল গড়ে তুলব এখানে। অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার বন্দুকের নল গর্জে উঠবে।

পারবে তুমি নিরন্নের মুখে অন্ন দিতে?

পারব।

এখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়কে বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে?

পারব।

পারবে আরণ্যকদের অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিতে?

পারব।

যদি না পার?

এই রিভলভারের শেষ গুলিটি খরচা করব আমি আমার নিজের জন্য।

এই তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ। এই আমার শেষ কথা। আমি মরে গেছি। এই বন্দুকের গুলির শব্দ আমার পুনর্জন্ম ঘোষণা করেছে।

তোমাকে ভূতে পেয়েছে। তাই এত আবোল তাবোল বকছ।

আমি আবোল তাবোল বকছি? তা হলে এই যে প্রাণহীন দেহগুলো এখানে পড়ে আছে এগুলোও কি মিথ্যে? আমি ফুলনদেবী নই রঞ্জন। এমনকী শবনমও নই। এখন আর আমার কোনও জাত নেই। আমি নইকো হিন্দু, নই মুসলমান, নইকো বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান।

তা হলে তুমি কী?

গুহামুখের সংকীর্ণ ফাঁকটুকুর ভেতর দিয়ে 'গুডুম গুডুম' শব্দে দু'বার গুলি করে শবনম বলল, আজ থেকে আমি এই অরণ্যের দেবী। আমাকে অরণ্যদেবী বলতে পারো। লোকে ভয়ে ভক্তি করবে আমাকে। অবশ্যই দুষ্ট লোকে। ভাল লোকেদের সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক থাকবে। খারাপ লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক হবে সাপ আর নেউলের। তাদের কাছে আমি হব ভয়ংকরী। দেবী ভয়ংকরী হবে আমার নাম।

শবনমের দুটি চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ঝিমঝিমিয়ে উঠল রঞ্জনের মাথাটা। তারপর হঠাৎই একসময় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। অবশ্য মেঝেতে পড়ার আগেই শবনম তাকে ধরে ফেলল। তারপর ওকে শুইয়ে দিল ওদেরই সৃষ্ট সেই তৃণশয্যায়। ওর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কান্নার মতো হয়ে। মুখে অস্ফুট উচ্চারণ করল, 'ছেলেমানুষ'।

খুব ভোরে যখন হুঁশ ফিরল বা ঘুম ভাঙল রঞ্জনের, তখন ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। দেখল ওর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে শবনম। এই নাকি অরণ্যদেবী! দেবী ভয়ংকরী। পাগলি আর কাকে বলে।

রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে যেই-না গুহার বাইরের অবস্থাটা দেখতে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে অমনি বাধা পেল। আরে! করছে কী মেয়েটা! ওর পায়ের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে নিজের পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। সেই টান পেয়ে শবনমও উঠে বসল। বলল, কী ব্যাপার! একা একা কোথায় যাচ্ছ? আমাকে ফেলে রেখে পালাচ্ছ বুঝি?

না না। তা কেন? আসলে কাল অনেক রাত অব্দি জেগে তুমি ঘুমচ্ছ তাই ডাকিনি।

শবনম হেসে বলল, দেখলে তো কেমন বুদ্ধি? তুমি যে চুপি চুপি পালাবে সে উপায় রাখিনি।

রঞ্জন বলল, হ্যাঁ, বুদ্ধির তোমার প্রশংসা করি। কিন্তু বাইরে দুটো, ভেতরে দুটো ডেড বডি রেখে তুমি যে এমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা খাচ্ছিলে তা সেই সুযোগে যদি কোনও বাঘটাঘ এসে ঢুকত?

তা ঢুকতে পারত। তবে সারারাত জেগে ভোরের দিকেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। এখন চলো দেখি ঝরনার জলে গিয়ে মুখহাতগুলো ধুয়ে আসি। সত্যি, যা গেল কাল।

ওরা গুহামুখের পাথর সরিয়ে পথ প্রশস্ত করে বাইরে এল। দুটি ডেড বডির একটিও তখন বাইরে নেই। না থাক! ওরা ঘন অরণ্যানির মধ্যে দিয়ে সেই ঝরনাতলায় গিয়ে মুখহাত ধুয়ে পরিষ্কার হল।

শবনম বলল, এই সময় একটু চা-টোস্ট পেলে কেমন হত রঞ্জন?

মন্দ হত না। কিন্তু ওসব যে খেতে যাব সে উপায়ও তো রাখনি তুমি। যে পোশাক চড়িয়েছ অঙ্গে এই পোশাকে কি শহরে যাওয়া যায়? মাথার ভূত যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে তা হলে এখুনি পোশাকটা ছেড়ে আগের মতো ভাল হয়ে এসো। না হলে এই পোশাক দেখলে নির্ঘাত পুলিশে ধরবে।

রঞ্জনের কথায় হোঃ হোঃ করে গগনফাটিয়ে হেসে উঠল শবনম। বলল, ওটি হচ্ছে না। আমার আব্বাজান মিলিটারির লোক ছিলেন। ঘোড়ায় চড়া থেকে কার ড্রাইভিং এবং বন্দুক চালানো থেকে পর্বতারোহণ সবই আব্বাজান আমাকে শিখিয়ে গেছেন। এই যন্ত্র হাতে যখন পেয়েছি, তখন লড়ে যাব একবার। যাও, বাকি বন্দুক রিভলভার যা আছে তা গুছিয়ে গাছিয়ে রেখে এসো। প্রয়োজনে পরে এসে নিয়ে যাব।

রঞ্জন ইতস্তত করতে লাগল দেখে শবনম আবার বলল, যাও। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। ভয় নেই, নিজের স্বার্থের জন্য তোমার জীবন নষ্ট করব না। তোমার দয়ায় এই প্রাণ আমি ফিরে পেয়েছি। আমার উপযুক্ত একটা জায়গা পেয়ে গেলেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাবে।

রঞ্জন একান্ত বাধ্য অনুগতর মতো আবার গুহার ভেতরে ঢুকে সব কিছু চাপা চুপি দিয়ে রেখে এল। তারপর শবনমের নির্দেশ মতো বনপথ ধরে চলতে শুরু করল ওরা।

পাহাড়টা এবার ক্রমশ চালু হয়ে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে মিশেছে। সেই ঢালু পথে হঠাৎ একটি তেজস্বী ঘোড়াকে ঘাস খেতে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল শবনম। বলল, পেয়েছি। পেয়েছি।

কী পেয়েছ?

আমার নতুন বন্ধুকে।

ঘোড়াটা তোমার বন্ধু?

নিশ্চয়ই। কাল যারা ডাকাতি করতে এসেছিল এ তাদেরই ঘোড়া।

কী করে বুঝলে?

দেখছ না ঘোড়ার পিঠে বসার জায়গায় জিন লাগানো আছে। বুনো ঘোড়া হলে এসব থাকত না। তা ছাড়া বুনো ঘোড়ার চেহারায় এত চাকচিক্য থাকে না। এ বাইরের দেশের ঘোড়া। হয়তো অস্ট্রেলিয়ার।

রঞ্জন মনে মনে শবনমের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না।

শবনম ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ঘোড়াটার কাছে। তারপর ওর লাগাম ধরে টান দিয়ে ওকে কাছে এনে এমন অদ্ভুত কায়দায় ওর ঘাড়েগলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল যে ঘোড়াটা একটুও ছটফট করল না, বা বিরক্ত হল না। বরং একদৃষ্টে কিছুক্ষণ শবনমের দিকে চেয়ে থেকে ওর গা শুঁকতে লাগল।

এই সুযোগে শবনম চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়াটা বাধা দিল না। বরং টান হয়ে গলা উঁচিয়ে আদেশের প্রতীক্ষা করল।

রঞ্জন অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শবনমের দিকে। পুরুষের পোশাকপরা, মাথায় ফেত্তি বাঁধা কাঁধে বন্দুক আর এক হাতে রিভলভার ধরা এই মেয়েটি যে এক দস্যুনেত্রী নয়, তা কে বলবে? ওকে দেখে ওর রীতিমতো ভয় করতে লাগল।

শবনম বলল, তুমিও এসে বসো না আমার পিছনে।

আমি উঠতে পারব না। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, আমার খুব ভয় করছে। তাই বলি, তুমি বরং ঘোড়ায় চেপেই চলো। আমি হেঁটে যাই।

শবনম হেসে বলল, আমাকে দেখেও তোমার ভয় কাটছে না রঞ্জন? তুমি না ছেলে? এসো। উঠে এসো। হাত ধরো আমার। বলে, একটা হাত বাড়িয়ে দিল শবনম।

রঞ্জন তবুও উঠল না। ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে হেঁটেই পথ চলল। শবনম ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করল। পাহাড়ের সেই ঢালু পথবেয়ে ঘোড়াটা ওদের দু'জনকে পিঠে নিয়ে এগিয়ে চলল।

খানিকটা পথ যাবার পর এক জায়গায় ওরা 'ঠক ঠক' করে একটানা একটা শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল শবনম। তারপর রঞ্জনকে নিয়ে নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। পাশেরই একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে, ওরা সেই শব্দ শুনে এগিয়ে চলল। কিছু দূর যাবার পরই দেখতে পেল, এক জায়গায় কিছু অনুন্নত শ্রেণীর পাহাড়িয়া লোকজন নির্মম কুঠারের আঘাতে বড় বড় গাছপালার ডাল কেটে ফাঁকা করে দিচ্ছে।

শবনম বাঘিনীর মতো হুংকার দিয়ে উঠল, হুঁশিয়ার।

সবাই চুপ। ঠুক ঠাক শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলেরই চোখেমুখে বিস্ময়, এ আবার কে রে বাবা!

শবনম বলল, এ তোমরা কী করছ?

আমরা গরিব মানুষ মা। দুটি ভাত-রুটির জন্য গাছ কাটছি।

কার হুকুমে?

আজ্ঞে শেঠ মংঘীরামজির হুকুমে।

কত টাকা পাও তোমরা?

গাছ প্রতি বিশ টাকা।

শবনম গম্ভীর মেজাজে এদিক থেকে সেদিকে পায়চারি করতে করতে বলল, মাত্র বিশ টাকা! তোমরা কী জানো এই পাহাড়ে এমন গাছও আছে যার দাম বিশহাজার টাকা থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত।

না মা।

তোমরা কোথায় থাক?

আজ্ঞে এই পাহাড়েই।

সামান্য ক'টা টাকার লোভে তোমরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছ! জান, এই সবুজ বনবীথির মধ্যেও প্রাণ আছে। প্রতিটি কুঠারাঘাতের সঙ্গে বাতাসের হু হু শব্দে ওদের বুকফাটা কান্না তোমাদের অভিশাপ দেয়। এইভাবে গাছ কাটতে কাটতে এই অরণ্য যেদিন নির্মূল হয়ে যাবে, সেদিন কোনও শেঠজিই আর টাকার থলি নিয়ে এগিয়ে আসবে না তোমাদের কাছে। সেদিন কী হবে একবার ভেবে দেখেছ? সেদিন এই শ্রীহীন প্রান্তরে তোমরা শুকিয়ে মরবে। ঝরনার পানি শুকিয়ে যাবে। শীতে শীত পড়বে না। গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন চারদিক জ্বলেপুড়ে খার হয়ে যাবে, তখন বৃষ্টির পানি দিতে আকাশে ঘন কালো মেঘ আসবে না। চারদিক খরায় জ্বলবে। ফসল ফলবে না।

তা হলে এখন আমরা কী করব?

অরণ্যকে রক্ষা করে অরণ্যের অধিকার নেবে! তোমাদের এই অরণ্যজগতে বাইরের কোনও মানুষকে সহসা ঢুকতে দেবে না। অবশ্য অরণ্যকে ভালবেসে কোনও অরণ্য-প্রেমিক যদি কখনও এখানে এসে উপস্থিত হয়, তা হলে তাকেই শুধু উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বরণ করে নিয়ো। এই অরণ্যের ফুলফল সব কিছু শুধু তোমরাই ভোগ করবে।

এক বৃদ্ধ পাহাড়ি এগিয়ে এসে বলল, সবই তো বুঝলুম মা। কিন্তু এখন যে আমরা না খেয়ে মরব তা হলে।

সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।

কিন্তু মা! তোমার বয়স কম। কে তুমি, কোথা থেকে এলে জানি না তাও। এই অরণ্যে যেমন বাঘ-ভালুক আছে তেমনি আছে চোরডাকাত এবং নানা ধরনের হিংস্র মানুষের দল। তারা যে আমাদের সুস্থভাবে খেয়েপরে বাঁচতে দেবে না।

তাদের শায়েস্তা করার জন্য আমি আছি। তোমাদের প্রধান কে?

আমি মা।

নাম কী তোমার?

হিংলাজ পাটসানি। ওড়িশার ঢেনকানালের কাছে দারুথাং-এ আমাদের পূর্বনিবাস। আমরা বুনো। বনে বনেই ঘুরে বেড়াই।

এই বনে তোমরা কত দিন আছ?

তা মা কম করেও বছরবারো তো আছি।

ওই শেঠজির সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ কী ভাবে হল?

হঠাৎই হয়ে গেল। ওই শেঠজিই একদিন সরকারের লোকেদের নজর এড়িয়ে আমাদের কাছে এসে লুকিয়ে কাঠ কাটার মতলব দিলে। আমরা টাকার লোভে, ওর কথা মতো কাজ শুরু করলাম।

ঠিক আছে। যা করেছ করেছ, আর ও কাজ কোরো না।

তা হলে আমরা কী করে বাঁচব মা?

এই কাজ করার আগে যে ভাবে বেঁচেছিলে সেই ভাবে বাঁচবে। এখন তোমরা আমাদের দু'জনকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে চলো। তারপর তোমাদের নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করা যাবে।

বেশ তো চলো।

শবনম ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে, একাই চলে গেল গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখা ঘোড়াটকে খুলে আনতে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কোথায় গেল ঘোড়াটা? ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কে খুলে নিয়ে গেল ওটাকে?

শবনম ফিরে এসে বলল, আমার ঘোড়াকে একটা গাছের ডালে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। এখন দেখছি সে সেখানে বাঁধা নেই। এটা কী করে সম্ভব! কার এত সাহস?

হিংলাজ হাতজোড় বলল, তুমি কে মা তা জানি না। তবে তোমাকে দেখে কোনও দেবী অথবা দস্যুকন্যা বলে মনে হচ্ছে। এই পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটি উচ্চ চূড়ায় মস্ত একটি গুহা আছে, সেই গুহার ভেতরে হিন্দোলসর্দার নামে এক কুখ্যাত ডাকাত বাস করে। আমার মনে হয় এ কাজ তারই।

আমি ওই দস্যুসর্দারের সন্ধান চাই।

কিন্তু মা। ও বড় নৃশংস। খুন জখম ডাকাতি রাহাজানি সব কিছুরই নায়ক ও।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ট্রেনডাকাতি কী না করে ও। আমরা সবাই ওকে যমের মতো ভয় করি। দূর থেকে ওকে দেখতে পেলে লুকিয়ে পড়ি আমরা।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আমি যে ওই লোককেই খুঁজে বেড়াচ্ছি হিংলাজ। আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে যাবে?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে কে বা কারা যেন বলে উঠল, আমরা তোমাকে আমাদের সর্দারের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই এখানে এসেছি দেবী।

যারা এসেছে তাদের দিকে তাকিয়ে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল রঞ্জনের। কী ভয়ানক চেহারা তাদের। যেন এক একটি জ্যান্ত নরখাদক।

শবনম বলল, তোমরা কারা?

আমরা হিন্দোলসর্দারের লোক।

পাহাড়ি লোকগুলোও ভয় পেয়ে গেল এই লোকগুলোকে দেখে।

শবনম কিন্তু একটুও ভয় পেল না। বলল, ঠিক আছে চলো। দেখি তোমাদের সর্দার কী রকম। যদি বুঝি তো তোমাদের দলেই ভিড়ে যাব আমি। তবে তোমরা খুব ভীতু আর অকর্মণ্য। না হলে কাল রাতে তোমাদের চার-চারজনকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম, অথচ তোমরা আমাদের কিছুমাত্র করতে পারলে না।

বেশি বাজে কথা না বলে আমাদের সঙ্গে এসো।

আমার ঘোড়া কই?

ও ঘোড়া তোমার কেন হবে? আমাদের ঘোড়া আমরা খুলে নিয়ে গেছি। এখন আমাদের বন্দুকটা ভালয় ভালয় দিয়ে দাও দেখি।

শবনম বলল, বন্দুক নিয়ে কী করবে? কাক মারবে! এ বন্দুক তোমাদের হাতে শোভা পায় না। যারা চার-চারজন সঙ্গীর মরণদশা দেখেও বিনা যুদ্ধে পালিয়ে যায়, তাদের হাতে বন্দুকের বদলে একটা করে ছাতার বাঁট ধরিয়ে দেওয়াই উচিত।

এই কথা শুনে একজন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল শবনমের ওপর। তারপর গায়ের জোরে ওর হাত থেকে কেড়ে নিল বন্দুকটা। বলল, শখ মন্দ নয়। ফুলনদেবী হবে। যা ভাগ।

কিন্তু শবনমের মধ্যে যে প্রেতিনী ভর করেছে, তার ব্যাপারে ওরা সচেতন ছিল না বলেই এই ভুলটা করে বসল। নাই বা থাকল বন্দুক। শবনম রিভলভারটাই কাজে লাগাল এবার। কোমর থেকে সেটা টেনে নিয়েই ছুটিয়ে দিল 'দড়াদ্দুম'। টিপ ঢাপ করে কলাগাছ পড়ার মতন পড়ে গেল দু'-তিনজন। বাকি একজন বন্দুক ওঠাবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ একটা পাথর এসে লাগল

তার মুখে। লোকটি আর্তনাদ করে পড়ে গেল।

কে ছুড়ল পাথর!

রঞ্জন বলল, আমি।

শবনম ওর পিঠ চাপড়ে বলল, শাবাশ দোস্ত। এই তো হাত খুলে গেছে তোমার। এসো তোমাকেই আমি এই পাহাড়-বনের রাজা করে দিই। তারপর দখল করি হিন্দোলসর্দারের কেল্লা। আল্লার দোয়া যদি হয় তো ওকে আমি প্রাণে মারব না রঞ্জন। ওর দুটো হাত কেটে নিয়ে তোমাদের কালীঠাকুরের মতো আমার কোমরে বেঁধে নৃত্য করব।

কিন্তু আমরা দু'জনে কি পারব এ কাজ করতে?

কে বললে আমরা দু'জন? এই তো আমাদের বন্ধুরা সব দলে দলে রয়েছে এখানে। পারবে না তোমরা আমাদের সাহায্য করতে?

হিংলাজসর্দার ছুটে এসে শবনমের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। বলল, পারব মা। নিশ্চয়ই পারব। ওই হিন্দোলসর্দার বড় অত্যাচারী। ও বা ওর দলের লোকেরা মা-বোনেদেরও মর্যাদা দেয় না। ওর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার একমাত্র মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

শবনম চিৎকার করে উঠল, আর তুমি বদলা না-নিয়ে চুপচাপ বসে আছ?

কী করব মাগো, আমরা যে গরিব লোক। মংঘীরামের মতো লোকেরা তাদের সুবিধার জন্য আমাদের ডাকে। কিন্তু আমাদের বিপদে আমাদের ডাকে কেউ এসে পাশে দাঁড়ায় না। তা ছাড়া আমরা দুর্বল। কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে পারি। শুধু হাতে দুশমনের সঙ্গে লড়ে যেতে পারি, কিন্তু বন্দুকের সামনে তো রুখে দাঁড়াতে পারি না।

কেন পার না? মরবার ভয়ে? কই তোমার মেয়েটা তো গলায় ফাঁস দিয়ে লটকাবার সময় মরবার ভয় করল না। তা হলে তুমি কেন মরবার ভয় করছ?

তুমি ঠিক বলেছ তো মা। এই কথাটা তো আমি কখনও ভাবিনি। আজ এই মুহূর্তে আমি আমার মরা মেয়ের নামে শপথ করে বলছি, আমি আমার লোকজন নিয়ে এখন থেকেই তোমার দাস হয়ে গেলাম।

কতজন আছ তোমরা?

আমরা উনিশজন আছি। তা ছাড়া আমাদের বউবাচ্চা সব আছে।

তোমাদের বসতি কতদূরে?

কাছেই।

আমাদের নিয়ে চলো সেখানে। আর এই আহত লোকটিকেও হাত-পা বেঁধে নিয়ে চলো। ওর পেট থেকে কিছু কথা আদায় করতে হবে।

হিংলাজ গর্জে উঠল, এই। বাঁধো ইসকো। লে চলো ঝোপড়ি পর।

শবনম বলল, আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। তোমরা তোমাদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে আগে আমাদের কিছু খাবার ব্যবস্থা করে দাও। তারপর আমরা দলবদ্ধ ভাবে মোকাবিলা করব হিন্দোলসর্দারের।

হিংলাজ বলল, এসো মা। গরিবের কুঁড়েতে পায়ের ধুলো দেবে এসো।

ওরা হিংলাজকে অনুসরণ করল।

তিন

পাহাড়িদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ওরা যখন একটু নিচুতে এক অপূর্ব পাহাড়িয়া গাঁওতে এসে হাজির হল তখন নয়নমন ভরে গেল। ওরা যাওয়া মাত্রই এখানকার আঞ্চলিক দেশীয় প্রথায় শিঙা আর ডুগডুগি বাজিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হল ওদের।

শবনম বলল, এখন থেকে আমরা দু'জন তোমাদের গ্রামেই থাকব। তোমরা আমাদের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করো।

কিছু লোক সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ কঞ্চি তালপাতা ইত্যাদি নিয়ে লেগে গেল ঘর তৈরির কাজে। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে পাহাড়ের একটি ঢালের গায়ে ওরাই দেখিয়ে দিল ওদের উপযুক্ত স্থান। এখান থেকে নীচেকার দৃশ্য অতি মনোরম। বহু দূরে আরও উচ্চস্থানে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটি মোচাকৃতি পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা নজরে পড়ল।

হিংলাজ বলল, ওই হল হিন্দোলসর্দারের কেল্লা। ওই অরণ্যদুর্গে এক সময় এক চোখো এক অসুর বাস করত। শোনা যায় সেই অসুর ছিল এই অঞ্চলের রাজা। ওই গুহায় সে অনেক ধনরত্ন সঞ্চিত রেখে একবার এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করতে যায়। সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। আর ফেরে না। ওই গুহার জঠরে কোথায় যে তার ধনসম্পদ সে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে তা কেউ জানে না। এসব হল পুরনো দিনের কথা। কয়েক বছর আগেও এখানে আমরা সুখেশান্তিতে ছিলাম। এখন নিত্যনতুন উপদ্রবে আমরা সদ্য শঙ্কিত থাকি।

এইসব কথা শুনতে শুনতে শবনমের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোতে লাগল। শুধু বলল, তোমাদের মা কালী আর দেবী দুর্গা যখন অসুরনিধন করেন তখন তাদেরই মধ্যে থেকে কয়েকটা ছিটকে ছাটকে পাতালেটাতালে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল। এখন তারাই এসে তোমাদের জ্বালিয়ে মারছে। আমি মা কালী আর দেবী দুর্গার কৃপায় নবশক্তিতে নবরূপে ভয়ংকর মূর্তিতে এখানে এসে হাজির হয়েছি। শুধু তোমরা আমার সঙ্গে থেকো। ওই কেল্লা দখল করে আমি

থাকব ওখানে। আমি অতন্দ্রপ্রহরীর মতো সদা সতর্ক হয়ে পাহারা দেব তোমাদের। আমি সর্বহারা হয়ে এখানে এসেছি। তোমরা আমাকে দেখো। আমি তোমাদের দেখব।

শবনমের রুদ্রমূর্তি, রক্তচক্ষু এবং ওই ডাকাতরানির মতো পোশাক দেখে ওর কথাটা যে নেহাতই ফাঁকা বুলি তা বলে কেউ মনে করল না। সবাই বিশ্বাস করল, হ্যাঁ এবার সত্যিকারের এমন একজন ওদের মাঝে এসেছে যে কিনা ওদের হয়ে লড়তে পারবে।

শবনম বলল, শোনো, শুধুহাতে ওই দুর্ধর্ষ ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। তাই আমি তোমাদেরকেও বন্দুকবাজি শেখাব। ওরা দলে কত জন আছে জান?

তা পনেরো-কুড়িজন তো বটেই।

তার মধ্যে কয়েকজনকে আমি একাই মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকিগুলোকে আমরা সবাই মিলে বলি দেব। ওদের একটা লোক তো আমাদের হাতে বন্দি হয়েছে।

হ্যাঁ।

লোকটাকে কড়া পাহারায় রাখো। ওকে মোচড় দিয়েই ওদের গুপ্তকথা আমি টেনে বার করব।

একজন বলল, একটা শিরীষ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রেখেছি ওকে।

ঠিক আছে। তোমাদের কিছু লোক এই এলাকাটা পাহারা দাও এবার। যাতে ওরা আচমকা এখানে এসে উপদ্রব করতে বা ওই লোকটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে। আর ওদের বন্দুকগুলো আমার জিম্মায় রেখে লাশগুলো ফেলে দাও পাহাড়ের খাদে।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শবনমের কথা শুনে গেল। রঞ্জন ওর মায়ের মুখে শুনেছে ঠাকুর দেবতার 'ভড়' হওয়ার কথা। 'ভড়' যদি ভণ্ডামি বা ভড়ং না হয় তা হলে নাকি ওই অবস্থায় সে যাকে যা বলে তাই ফলে, শবনমের মধ্যেও কি ওই রকম কোনও শক্তি 'ভড়' করল? না হলে চোদ্দো-পনেরো বছরের একটি মেয়ের মধ্যে এত বিক্রম এল কী করে? এই সামান্য সময়ের মধ্যে এতগুলো দুর্ধর্ষ মানুষের জীবনান্ত যেন রূপকথার গল্পের মতো ঘটে গেল। এই কিশোরীর ব্যক্তিত্বর কাছে এই পাহাড়ি মানুষগুলো যেন হুকুমের চাকর হয়ে উঠল। এর রহস্য কী? কোন শক্তির প্রভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হল!

হিংলাজসর্দারের মাটির দাওয়ায় ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা হল! আলু ভাজা, মুড়ি আর ভেলিগুড়ের হালুয়া।

একটি সাত-আট বছরের বালিকা এসে ডেকে নিয়ে গেল ওদের। কালো কষ্টিপাথরের মতো ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটি।

ওরা মুখ, হাত-পা ধুয়ে দাওয়ায় পাতা চাটাইতে বসে জলযোগ করতে লাগল। এর সঙ্গে এল মশলা দেওয়া চা। ভারী চমৎকার। খেয়ে মুখ ছেড়ে গেল যেন।

একটা কুকুর অনেকক্ষণ থেকে ছোঁক ছোঁক করছিল।

শবনম সামান্য দুটি মুড়ি ছড়িয়ে একটু হালুয়া দিতেই কুকুরটার আনন্দের আর অবধি রইল না। সে ঘন ঘন লেজ নেড়ে তার আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল।

রঞ্জনের খুব ভাল লেগে গেল এখানকার আরণ্যক পরিবেশ। হিংলাজ পাটসানির দাওয়ায় বসেই অরণ্যের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। এ বাড়ির চৌহদ্দির বাইরেই ধানের গোছার মতো বড় বড় সাবাই ঘাসের সবুজ শোভা মনকে মোহিত করে দেয়।

ওরা পেট ভরে জলখাবার খেয়ে দাওয়ায় নেমে পায়চারি করতে লাগল। আর কুকুরটা ঘুরতে লাগল ওদের পায়ে পায়ে। শবনম ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে আরও আপন করে নিল।

রঞ্জন বলল, একবার ওই লোকটার কাছে আমাদের গেলে হত না?

কোন লোকটার কাছে?

যাকে শিরীষ গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

শবনম হাসল। হেসে বলল, হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কিছু কথা ওর পেট থেকে বার করতে না-পারলে হিন্দোলসর্দারের কেল্লায় ঢোকা যাবে না।

ওরা হিংলাজকে সঙ্গে নিয়ে সেই লোকটির কাছে গিয়ে হাজির হল। রঞ্জনের পাথরের আঘাতে লোকটির নাককেটে রক্ত ঝরছে। সেই অবস্থাতেই একটি বড় গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। দু'জন লোক সমানে পাহারা দিচ্ছে লোকটাকে।

শবনম ভয়ংকরী মূর্তিতে লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রঞ্জন রইল একপাশে।

শবনম লোকটিকে বলল, কী নাম তোর?

বলব না।

হিন্দোলসর্দারের দলে কতদিন আছিস?

বলব না।

দলে তোরা কতজন?

বলব না।

লোকটির জেদ দেখে রঞ্জনের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। আসলে রক্ত

ঝরানোর নেশাটাই একটা উন্মাদনা এনে দেয়। বিশেষ করে এ সব ক্ষেত্রে প্রতিহিংসা প্রবল হয় অতি। কেন না ওদের এই কষ্টের, আজকের এই বনবাসের মূলেই তো এরা। রঞ্জন বলল, এখনও বলছি যা জিজ্ঞেস করব ভালভাবে তার উত্তর দিবি। না হলে কিন্তু জীবন সংশয় হবে তোর।

লোকটি রক্তচক্ষুতে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থুঃ করে একটু থুতু ছেটাল।

অমনি রঞ্জন একটা শক্ত মোটা গাছের ডাল ভেঙে বেধড়ক পেটাতে লাগল লোকটাকে। সে কী প্রচণ্ড মার। সারা গায়ে কালশিটে পড়ে গেল। লোকটি তবুও জেদের সঙ্গে বলল, বলব না।

এমন সময় রঙ্গমঞ্চে একজনের আবির্ভাব হল।

এক বিশাল শরীর ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটিকে একটি গাছের ডালে বেঁধে সদর্পে এগিয়ে এসে বলল, এ এ ক্যা তামাশা হো রহা হ্যয়া? তুম সব কাম পর নেহি গিয়া কিঁউ?

পাহাড়িরা নীরব। সবাই শবনমের দিকে তাকাল।

শবনম বন্দির দিক থেকে নজর সরিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকাল। তারপর বলল, কৌন হো তুম?

আগন্তুক বলল, তুম কৌন হো?

আমি এই অরণ্যের দেবী।

দেবী? হিঁয়া দেবীটেবী কুছ হ্যায়ই নেহি। বলে পাহাড়িদের বলল, চলো, তুম সব কাম পর চলো। তারপর বেঁধে রাখা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, এ আদমি কৌন?

শবনম বলল, আমার শিকার।

শিকার? মেরা সমঝমে তো কুছ নেহি আতা।

শবনম এবার পরিষ্কার করে বলল, তুমিই বুঝি শেঠ মংঘীরামজি?

এ মাত পুছো। বলে পাহাড়িদের বলল, চলো চলো, কাম পর চলো।

শবনম বলল, না। আজ থেকে ওরা আর কেউ তোমার কাজে যাবে না। তোমার বাত ভি শুনবে না। আমি এই পাহাড় বনের রানি। এখানকার দেবী। আমি যা বলব, তাই শুনবে ওরা।

মংঘীরাম চিৎকার করে উঠল, নেহি। ও লোগ হামারা বাত শুনেগা। কাম করনেহি পড়েগা সবকো।

না করলে?

জিন্দা মার ডালুঙ্গা।

শবনম বলল, মংঘীরামজি, এতদিনে তোমার পালা শেষ। গাছ প্রতি বিশ রুপিয়া হাতে গুঁজে দিয়ে অনেক ফায়দা লুটেছ তুমি। এখন তার খেসারত দাও।

কুড়ি টাকার গাছ লক্ষ টাকায় বেচেছ। অসহায় মানুষগুলোর রক্তচুষে তুমি হয়েছ শেঠ। কিন্তু আর তো তা হচ্ছে না।

মংঘীরাম চেঁচিয়ে উঠল, তুম সব খাড়ে হোকর ক্যা দেখতে হো? এ লেড়কি তুমহারা রোটি মারনে মাংতা। পাকড়ো ইসকো। বলেই ডাকল, আগারাম, বাগারাম ইধার আ যাও তো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন তাগড়াই চেহারার ভোজপুরী এসে দাঁড়াল সেখানে।

শবনম বলল, খবরদার! আগে মাত বাড়ো। বলেই পাহাড়িদের বলল, তোমরা মংঘীরামকে ধরে রাখো। ওর সঙ্গে একটু বেশি রকম বোঝাপড়া করতে হবে আমাকে।

পাহাড়ি লোকগুলো তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল মংঘীরামের ওপর। তারপর ওকেও বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলল একটা গাছের সঙ্গে।

ভোজপুরী দুটো মংঘীরামকে উদ্ধার করবার জন্য আসছিল। কিন্তু শবনমের বন্দুক ও পাহাড়িদের বিরুদ্ধ আচরণ দেখে ভয় পেয়ে গেল ওরা। তা ছাড়াও শবনমের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটার মতিগতি ওদের সুবিধের মনে হল না। কুকুরটা কেমন যেন ক্রুদ্ধ চোখে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ওদের দিকে তাকাচ্ছে।

মংঘীরাম বাঁধা পড়ে ছটফট করতে লাগল।

শবনম ওর বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলল, শোনো মংঘীরামজি এখন থেকে আমি এই জঙ্গলের দেখাশোনা করব। এখানকার মানুষজন আমার প্রজা। তাই এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। তুমি এদের ঠকিয়ে আসল প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে অনেক অর্থ রোজকার করেছ। তার এক মুঠো আমার এক্ষুনি প্রয়োজন। আশা করি আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে এতক্ষণে তোমার একটা ধারণা জন্মে গেছে। তুমি অবিলম্বে লাখ খানেক টাকা আমাকে পাঠিয়ে দেবে।

মংঘীরাম চেঁচিয়ে বলল, নেহি, হাম পুলিশকো বুলায়গা।

মংঘীরামের কথা শুনে আকাশ-কাঁপিয়ে হেসে উঠল শবনম। বলল, যাও। আভি যাকে বোলাও। বলে বলল, তুমি জঙ্গলের কাঠ চোরাইপথে চালান দাও। তুমি যাবে পুলিশের কাছে? ওসব ভয় অন্য লোককে দেখাবে। খুব শিগগির আমি হিন্দোলসর্দারের কেল্লা দখল করব। তখন আর আমার কোনও অভাব থাকবে না। কিন্তু যতক্ষণ না তা করি ততক্ষণ তুমি আমাকে টাকার জোগান দেবে।

ঠিক হ্যায়। রুপিয়া মিল যায়ে গা, লেকিন—।

লেকিনটেকিন কিছু নেই। আমার টাকার দরকার। টাকা চাই। তোমার সঙ্গে

আমার শত্রুতার নয়, বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠুক এই আমি চাই।

মংঘীরাম এবার যেন বুকে বল ফিরে পেল। বলল, তব তো রুপিয়া জরুর মিলেগা। তো তুম এক কাম করো। হামারা সাথি হো যাও। দোস্তি করো। আউর তুমহারা আদমি কো বোলো জঙ্গল কাটনে কে লিয়ে।

না। জঙ্গল কাটা চলবে না। তুমি অন্য কোনও বিজনেসের ধান্দা করো মংঘীরামজি। এখন এদের ঠকিয়ে যে পয়সা কামিয়েছ, তা একটু একটু করে ফেরত দাও। আমি জানি তুমি পুলিশের কাছে যাবে না। গেলে বিপদে পড়বে। তাই বলি ভালয় ভালয় নোট ছাড়ো। না হলে কিন্তু তোমার বাড়িতে গিয়েও চড়াও হব আমরা। হিন্দোলসর্দারকে তুমি কত করে টাকা দাও?

আমি কাউকে কিছু দিই না।

মিথ্যে কথা। হিন্দোলসর্দার এই পাহাড়-বনের সন্ত্রাস। সে এক কুখ্যাত দস্যু। তার এলাকায় এসে তুমি লাখ লাখ টাকার সম্পদ কেটে নিয়ে যাবে, আর সে দিনের পর দিন মুখ বুজে তাই দেখবে, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? বলো কত করে দাও তাকে?

মংঘীরামজি মাথা হেঁট করে বলল, তাকে যা দিই তোমাকেও যে তাই দেব, সে আশা তুমি কোরো না খুকি।

শবনম চমকে উঠল, খুকি কী? দেবী বলো।

হাঁ হাঁ দেবীজি। তবে একটা বাত আমার বলবার আছে। হিন্দোলসর্দারের সঙ্গে লড়বার আগে নিজের ক্ষমতাটা একটু বাজিয়ে দেখো। আমাদের বিচ্‌মে তুমি খাড়া হলে তুমি আর জিন্দা থাকবে না। তোমার লোক ভি মরবে। তুমি ভি মরবে।

শবনম বলল, শোনো। তোমার সামনে ওই যে লোকটা বাঁধা রয়েছে দেখছ ও হিন্দোলসর্দারের লোক। ওদের দলের বেশ কয়েকজনকে আমি শেষ করেছি। এবার ওকেও করব। আমি তোমাকে মারব না। কেন না আমার অর্থের এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কই মাছের মতো জিইয়ে রাখব তোমাকে। যতক্ষণ কথা শুনবে ততক্ষণ ঠিক থাকবে। অন্যমতি হলেই 'ডিস্যুম'। কী বুঝলে? আর হ্যাঁ, এখন থেকে হিন্দোলসর্দারের পাওনাটা আমিই নেব। আজ থেকেই ওর টাকা বন্ধ করে দাও তুমি।

হিন্দোলসর্দারের সঙ্গে দুশমনি করলে ও আমাকে প্রাণে মারবে।

আমার কথা না-শুনলে আমিও তোমাকে প্রাণে মারব। এখন তোমাকে আমি মুক্তি দেব। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তুমি আমাকে এক লাখ টাকা পৌঁছে দেবে। আর কিছু বন্দুক ও কার্তুজ কয়েক দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে এখানে। এই পাহাড়িদের আমি যুদ্ধ করা শেখাব। না হলে এরা চিরকাল পড়ে পড়ে মার খাবে।

কিন্তু জঙ্গল কা লকড়ি নেহি মিলনে সে হাম তো মর যাউঙ্গা দেবীজি।

শবনম বলল, তোমার মতন লোকের কখনও শুধু একটা লকড়ির ব্যবসা থাকতে পারে না। তোমার আরও অনেক ব্যবসা নিশ্চয়ই আছে। তুমি সেই দিকে নজর দাও। যাও! এখুনি গিয়ে টাকার ব্যবস্থা করো।

মংঘীরামজি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ঠিক হ্যায়। ছোড় দিজিয়ে।

শবনম পাহাড়িদের বলল, মংঘীরামকে ছেড়ে দিতে।

মংঘীরামজি ছাড়া পেল। ছাড়া পেয়ে চলেও গেল।

শবনম আবার তাকাল বন্দির দিকে। বলল, এই তোমাকে শেষ সুযোগ দিলাম বলবার। কিছু বলবে?

না!

শবনম বলল, এই লোকটাকে তোমরা পিছমোড়া করে বেঁধে গলা পর্যন্ত পুঁতে রাখো। আর ওর মুখের কাছে রেখে দাও কয়েকটা শুকনো রুটি এবং এক গেলাস জল।

পাহাড়িরা এখন রীতিমতো খেপে উঠেছে। যে মংঘীরামকে ওরা বাঘের মতো ভয় করত, সেই মংঘীরামকে এই এক রত্তি মেয়েটা কী ভয়ংকর ভাবেই না শাসিয়েছে। আর ওই হিন্দোলসর্দার! ফণাওয়ালা গোখরো সাপ একটা। তারও বিরুদ্ধে যে কঠিন সংগ্রাম করেছে মেয়েটি, তা রীতিমতো দুঃসাহসিক। এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, যেন এক দেবকন্যা। দৈবশক্তি না থাকলে এই অসম্ভব কী করে সম্ভব হয়?

শবনমের কথায় ওরা ধৃত লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর সত্যি সত্যিই কোদাল গাঁইতি নিয়ে এই কঠিন শিলাস্তরের বুকে যেখানে একটু মাটি আছে সেখানে গর্ত খুঁড়তে লাগল।

এতক্ষণে ভয় পেল লোকটি। বলল, ম্যায় সব কুছ বতাতা হুঁ। লেকিন।

লেকিন? লেকিন কী?

লেকিন। আমার কথা শেষ হলেই তোমরা আমাকে গুলি করে মারবে।

রঞ্জন বলল, শুধু শুধু মারব কেন?

লোকটি বলল, তোমরা যদি না মারো হিন্দোলসর্দার মারবে। তবে সে মৃত্যু হবে অতি নৃশংস। হাত-পা কেটে, চোখ উপড়ে, জিভ টেনে বার করে মারবে।

বেশ। তাই করব। এখন বলো ওই গুহা দুর্গে যাবার উপায় কী? শুনেছি ওর ধারেকাছে নাকি যাওয়া যায় না।

না। ওই দুর্গের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুপ্তকক্ষ আছে। কেউ ভুল করেও তার পাঁচশো গজের মধ্যে গিয়ে পড়লে সেই গুপ্তকক্ষের ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে

গুলি ছুটে আসে। যদি কোনওরকমে সেই আসন্ন মৃত্যুকে আড়াল করে গুহাতে পৌঁছানো যায়। তা হলেও কিন্তু রহস্য ভেদ হবে না। তার কারণ ওই গুহার গোলকধাঁধায় অনেক সময় আমরাও ধাঁধিয়ে যাই।

বেশ, এখন প্রশ্ন, ওই গুহার পিছন দিকে আর কোনও গুপ্তপথ আছে কি না?

বলতে পারব না। তবে মনে হয় নেই। কেন না গুহাটি প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে এমনভাবে সৃষ্ট হয়েছে যে, এই গুহায় প্রবেশ করে পাতালপুরীর মতো ক্রমশ অনেকটা পথ নামবার পর দেখা যাবে গুহাটা প্রশস্ত হয়েছে। আসলে ওইটি একটি ফাঁপা পর্বত বলা যেতে পারে।

হুঁ। দলে তোমরা কতজন আছ?

এখনও পর্যন্ত জীবিত আছি এগারোজন।

পরশু মধ্যরাতে যে ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটে ওটিতে তোমরা কারা অংশ নিয়েছিলে?

ওটি নেহাতই দুর্ঘটনা। ওতে আমাদের কোনও হাত ছিল না।

রঞ্জন তখন সজোরে একটা ঘুসি মেরে দিয়েছে লোকটির মুখে! সেই ঘুসির আঘাতে ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত নেমে এল। রঞ্জন বলল, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি কিছু লোক যাত্রীদের জিনিসপত্তর লুণ্ঠন করছিল। এই অঞ্চলে তোমরা ছাড়া কারা করবে ওই সব কাজ?

মংঘীরামজিও সাধুপুরুষ নন। তাঁর লোকজন অথবা অন্য দলও এ কাজ করতে পারে।

মংঘীরামের দলের লোক কত?

তা বিশ-পঁচিশজন হবে।

লুঠের মালপত্তর ওরা রাখে কোথায়?

মংঘীরামজির গোডাউনে।

ঠিক বলছ?

মিথ্যে বলে লাভ?

মংঘীরামজির গোডাউন কোথায়?

এই পাহাড়ের নীচে যে নদীটা আছে, সেই নদীর ওপারে হনুমান মন্দিরের পিছনে।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে জায়গাটা কত দূর?

তা এক কিলোমাটির তো হবে।

শবনম বলল, দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন কি তুমি সেখানে ছিলে?

লোকটি নীরব।

বলো ছিলে কি না?

ছিলাম।

এই কাজ করার আগে বিবেকে একবার বাধল না? লুঠের মাল তো মংঘীরাম আর হিন্দোলসর্দার ভাগাভাগি করে নেবে। কিন্তু তোমরা কোন স্বার্থে এই কাজ করতে গেলে? তুমি কি জান, এই দুর্ঘটনায় আমি আমার আব্বাজানকে হারিয়েছি! অনেক বাবা-মা তাদের একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছে। কত নিরীহ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে। সে খবর রাখ?

লোকটির চোখদুটি এবার জলে ভরে এল।

রঞ্জন বলল, এ জল তোমার চোখে মানায় না ভাই।

লোকটি বলল, তা হলে শোনো, তোমাদের বন্দুক থেকে মাত্র একটা গুলি তোমরা আমার জন্যে খরচ করো। না হলে যতদিন বাঁচব ততদিন এই দুর্ঘটনার কথাটা আমি ভুলতে পারব না। আসলে এই দুর্ঘটনার মূলে ওই মংঘীরামজি।

কী রকম!

সর্দার আমাদের বলেছিলেন ডাউন লাইনের ফিসপ্লেট সরিয়ে দিতে। কারণ একটি মালগাড়িকে ফেলে দিয়ে লুঠপাট করবার মতলব ছিল আমাদের। ঘটনাস্থলে হঠাৎ ওই মংঘীরাম গিয়ে সব গোলমাল করে দেয়। সে বার বার বলতে থাকে, সর্দার নাকি বলেছেন ডাউন নয় আপ লাইনেই খুলতে হবে ফিস প্লেট। আমরা ওর কথামতো কাজ করতে গিয়েই এই অবস্থা হয়। আসলে যাত্রীবাহী ট্রেন ওলটানোর কোনও পরিকল্পনাই ছিল না আমাদের। পরে দুর্ঘটনার পর যখন সর্দারকে গিয়ে খবর দিই সর্দার তখন একটা মোটা দাঁও হাতছাড়া হওয়ার ক্ষোভে বোমার মতো ফেটে পড়েন। এতে আমাদের লাভ কিছুই হয় না। মাঝখান থেকে ছিঁচকে চোরের দল সব কিছু লুটেপুটে খায়।

শবনম কিছুক্ষণ লোকটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার তো অনুশোচনা করবার কিছু নেই। কুখ্যাত দস্যুর দলে রয়েছ তুমি। খুন-জখম-লুণ্ঠন এ সব তো তোমাদের পেশা। তা হলে?

লোকটি বলল, হ্যাঁ ঠিকই। তবে তোমার মতন মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোনও ভদ্র ঘরের মেয়ে। কত কম বয়স তোমার। অথচ এই বয়সে যেন ভোজবাজির মতো হঠাৎ একটা ভেলকি লাগিয়ে দিলে। আমি বুঝতে পারছি তোমার হাতেই আমাদের নিয়তি। নারীশক্তির কাছে অসুরকেও হার মানতে হয়। তাই তোমার কাছেও আমাদের হার মানতে হবে। অত্যাচারী হিন্দোলসর্দার তোমার শক্তিতেই বধ হবেন।

শবনম বলল, তোমার নাম?

আমার নাম বিক্রমজিৎ।

তুমি কতদিন এই দলে আছ?

তা কম করেও দশ বছর।

তুমি পারবে ওই দল ছেড়ে আমার দলে চলে আসতে?

পারব। না পারা ছাড়া উপায় নেই। না হলে এখান থেকে শুধু হাতে ফিরে গেলে সর্দার আমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমি তোমার দলেই থাকব।

তা হলে অবশ্য আমার সুবিধে হয়। তবে হ্যাঁ, আমি নিরীহ মানুষদের ওপর কোনও অত্যাচার করব না। কিন্তু মংঘীরাম ও হিন্দোলসর্দারকে আমি কাঁচা খাব। ওদের দু'জনকে শেষ করেই সাঙ্গ করব আমার হত্যালীলা। তারপর ওই অরণ্যদুর্গে হিন্দোলকেল্লা লুণ্ঠন করে ওই গুম্ফার কাছে আমি মন্দির-মসজিদ বানিয়ে আমার জীবন উৎসর্গ করব। একদিকে আমার এই তরুণ বন্ধুটি দেবী দুর্গার স্তোত্র পড়বে। অপর দিকে আমি পাঠ করব পবিত্র কোরান-শরিফ। আর ও যদি থাকতে না চায়, তা হলে কোনও সাধুসন্ন্যাসীকে এনে আশ্রম করতে বলব এখানে। ব্যস। আমার কাজ শেষ। তোমরা যারা আমার কাছে থাকবে তাদের সঙ্গেই আমি হাতে হাত মিলিয়ে রক্ষা করব এই বনভূমিকে। আমরা কেউ না থাকলে এই অরণ্য আবার সমাজবিরোধীদের ঘাঁটি হয়ে উঠবে।

শবনমের নির্দেশে বিক্রমজিৎকে ছেড়ে দেওয়া হল।

পাহাড়িরা বিক্রমজিৎকে ওদের ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিকভাবে একটু শুশ্রূষা করল। তারপর ক্ষতস্থানগুলোতে দেশীয় প্রথায় কিছু গাছগাছড়ার রস লাগিয়ে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে একটু বেঁধেছেঁদে দিল। এরপর হিংলাজসর্দারের দাওয়ায় বসিয়ে পেট ভরে গুড় মুড়ি খাওয়ানো হল ওকে।

বিক্রমজিৎ এখানকার সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত। কেন না এই পাহাড়জঙ্গলে হিন্দোলসর্দারের লোক হিসাবে অবাধ গতিবিধি ছিল ওদের। ওকদিন এই লোকের চেহারা দেখলেই গ্রামবাসীরা ভয়ে পালাত। আর আজ এমন ভাবে কালের চাকা ঘুরে গেল যে, সেই লোকই দাওয়ায় বসে অতিথি হয়ে ক্ষুধার খাদ্য গ্রহণ করছে।

খেয়েদেয়ে বিক্রমজিৎ আবার শবনমের কাছে এল। শবনম তখন ওর ঘর তৈরি দেখছে।

রঞ্জন তদারক করছে।

অন্যান্য পাহাড়িরা দলবদ্ধ হয়ে কেউ কাজ করছে, কেউ বা নজর রাখছে দুর্গের দিকে। হঠাৎ যদি সেদিক থেকে কোনও আক্রমণ আসে তাই।

বিক্রমজিৎ শবনমকে বলল, দেবী!

শবনম বলল, কিছু বলবে?

তোমার ঘোড়াকে আমিই খুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাইরে একটু দূরে একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছি। নিয়ে আসব সেটাকে?

নিশ্চয়ই। ঘোড়ায় না চেপে আমার পক্ষে শুধু পায়ে হেঁটে দূর দূরান্তরে যাওয়া অসম্ভব। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। শুধু ওই ঘোড়াটা নয় অন্যগুলোকেও যদি দেখতে পাও ধরে নিয়ে এসো।

অন্যগুলো ছাড়া পেয়ে ওদের ডেরাতেই ফিরে গেছে। ওই ঘোড়াটা বাঁধা ছিল। তাই ওটাকেই আমরা ফিরে পাব।

রঞ্জন বলল, ইতিমধ্যে ওই ঘোড়াটাকে কেউ খুলে নিয়ে যায়নি তো?

কে নিয়ে যাবে? আমরা যারা এখানে এসেছিলাম তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই তো জীবিত আছি।

শবনম বলল, ঠিক আছে দাও।

বিক্রমজিৎ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। তারপর আঁকাবাঁকা পার্বত্যপথে কিছুদূর গিয়ে একটি বড় পাথরের আড়ালে সেগুন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা সেই সাদা ঘোড়াটাকে বাঁধন মুক্ত করেই লাফিয়ে তার পিঠে চড়ল। ঘোড়াও আর বিলম্ব করল না। বিক্রমকে পিঠে নিয়ে খটাখট শব্দ তুলে এগিয়ে চলল হিন্দোলকেল্লার দিকে।

পাহাড়িদের এই ছোট্ট বস্তিতে মুরগির অভাব ছিল না। কাজেই গরম ভাত আর মুরগির মাংস দিয়ে দুপুরের খাওয়াটা দমভোর খেয়ে নিল ওরা। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রামের জন্য ওদের নতুন পর্ণকুটিরে এল ওরা। খড় বিছিয়ে চাটাই পেতে সুন্দর বিছানা হয়েছে দুটো।

শবনম ও রঞ্জন দু'জনেই দু'পাশে শুয়ে পড়ল।

রঞ্জন বলল, মানুষকে বিশ্বাস করার ফল দেখলে তো? কেমন চমৎকারভাবে নিজেকে স্যারেন্ডার করিয়ে আবার ব্লাফ মেরে পালাল লোকটা।

শবনম বলল, ও যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা কিন্তু ভাবতেই পারিনি।

ওই জন্যেই এই ধরনের ক্রিমিন্যালদের বাঁচিয়ে রাখতে নেই। শত্রুকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবার ফল কী ভয়ংকর।

তবে আমার মনে হয় আমাদের শত্রুপক্ষ যে কোনও কারণেই হোক খুব ভয় পেয়ে গেছে।

কী করে বুঝলে?

প্রথমত, কাল রাতের ওই আঘাত ওদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আজ সকালে সশস্ত্র কিছু লোককে আমাদের সন্ধানে পাঠিয়েও ওরা পরাস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছে এলাকার পাহাড়িরা ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বলে। যে মানুষগুলো একদিন ওদের দেখলে বাঘের মতো ভয় পেত, সেই মানুষগুলিই আজ সব ভয়ভীতি ভুলে এমনভাবে মারমুখী

হয়েছে যে আর কখনও এদের কবজা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয়েছে। এইবার এই এতগুলি মারমুখী মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের ঘাঁটি আগলানো প্রায় দুঃস্বপ্নের মতো।

তা হলে?

তা হলে আর কী। ওরা প্রকাশ্য দিবালোকে তো আসবে না। গভীর রাতের অন্ধকারে আচমকা ওদের মেশিনগান বা রাইফেল ব্যবহার করে পুরো বস্তিটার ওপর হামলা চালাবে। তারপর ওই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পর এলাকা ছেড়ে চলে যাবে কিছু দিনের জন্য। প্রাচীনকালের সেই অসুরও যেমন ওই গুহার জঠরে তার সর্বস্ব জমা রেখে বরাবরের জন্য চলে গিয়েছিল, এদেরও সেই অবস্থাই হবে।

কিন্তু তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, তা হলে তো রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার। আমাদের উসকানিতে মেতে ওঠার ফলে এই সব অসহায় মানুষগুলোর মৃত্যুর জন্য আমরাই তো দায়ী হব।

এইটাই আমার ভয়। তা ছাড়া আমাদের এখন উভয় শত্রু। একদিকে মংঘীরাম, অপর দিকে হিন্দোলসর্দার। এই উভয় প্রতিপক্ষকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে আমাদের।

কিন্তু কীভাবে?

রঞ্জন! তুমি একটু জেগে থাকতে পারবে? আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমব। দুপুরটা গড়িয়ে গেলেই আমাকে ডেকে দেবে কিন্তু। আমি চুপি চুপি একটা বড় গাছের ডালে বসে সারা রাত জেগে বন্দুক নিয়ে পাহারা দেব এদের।

রঞ্জন বলল, ঠিক বলেছ। না হলে যে কোনও মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। তুমি ঘুমোও। আমি জাগছি। ইতিমধ্যে মংঘীরামের কাছ থেকে কেউ যদি আসে তোমাকে ডাকব কি?

মংঘীরামের কাছ থেকে কেউ কোনওদিনই আসবে না রঞ্জন। ওদের টাকা এত সস্তা নয় যে আমি চাইলেই দিয়ে দেবে ওরা। মংঘীরামের কাছ থেকে টাকা চেয়ে পাব না। জোর করে আদায় করতে হবে।

রঞ্জন অবাক চোখে চেয়ে রইল শবনমের মুখের দিকে। কী সুন্দর ফুলের মতো মেয়েটি। কিন্তু ওর এই সৌন্দর্যের মধ্যেও অমন খুনের নেশা কোথায় কোন গোপনে ঘুমিয়েছিল? তা ছাড়া এমন প্রখর বুদ্ধি, এমন ভয়ানক দুঃসাহস ওর কী করে হল?

রঞ্জন বলল, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও শবনম। আমি তো আছি। তুমি ঠিকই বলেছ, আমাদের রাত জেগেই পাহারা দিতে হবে।

শবনম সেই খড়ের শয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। শোয়ামাত্রই ঘুম ঘুম্ ঘুম।

রঞ্জন নিদ্রিত শবনমের মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল। শবনমকে এই মহারণ্যে ফেলে রেখে ও কী করে ফিরে যাবে নিজের দেশে? শবনম ফুলনদেবী হবে, পাহাড়-বনের রানি হবে। কিন্তু তার সঙ্গে ওর যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, যে-বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, সেটাকে সে কাটিয়ে উঠবে কেমন করে? তাই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যে ভাবেই হোক বুঝিয়েবাঝিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে শবনমকে প্রকৃতিস্থ করে আবার শহর-সভ্যতার সংস্পর্শে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার।

রঞ্জন অনেকক্ষণ ধরে নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে ঠিক করল কাল সকালেই ওরা ফিরে যাবে এখান থেকে। রঞ্জন শবনমকে নিয়ে ওদের বাড়িতেই গিয়ে উঠবে। শবনমের আপত্তি না থাকলে সে থাকবে ওদেরই কাছে।

যেই না মনে হওয়া অমনি আনন্দে উত্তেজনায় বুক ভরে উঠল রঞ্জনের। এত সহজে যে জিনিসের মীমাংসা হয়ে যায় তার জন্য এত ভাবনাচিন্তার কোনও প্রয়োজন ছিল কি? রঞ্জন একবার ঝুঁকে পড়ে দেখল শবনমকে। তারপর খুব আলতো করে ওর কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিতেই চোখ মেলল শবনম। একবার ঝেড়ে উঠে বসেই বলল, কী হল রঞ্জন! ভয় পেলে?

না।

তাই ভাল। তারপর মৃদু হেসে বলল, হঠাৎ এত আদরের ব্যাপার কী?

আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি।

কী সিদ্ধান্ত বলো?

ভাবছি এইসব ঝামেলায় আর নিজেদের না জড়িয়ে কাল সকালেই চলে যাই চলো।

কোথায়?

যেখান থেকে এসেছি সেখানেই।

শবনম হঠাৎ কীরকম দপ করে জ্বলে উঠল। বলল, তুমি কী করে ভাবলে যে আমি আমার আব্বাজানের হত্যাকারীদের বদলা না নিয়ে ফিরে যাব? তা ছাড়া এই মুহূর্তে আমরা আমাদের আদর্শচ্যুত হয়ে চলে গেলে এই পাহাড়িদের অবস্থাটা কী হবে তা একবার ভেবে দেখেছ? মংঘীরাম আর হিন্দোলসর্দারের লোকেরা বিদ্রোহী হওয়ার অপরাধে এদের পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে। এই সহজ সরল নির্বোধ মানুষগুলোকে অসহায় ভাবে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়ে আমরা চলে যাব? তুমি যাও রঞ্জন। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও তুমি। আমার কাজ আমাকে করতে দাও।

রঞ্জনের চোখদুটো ছল ছলিয়ে উঠল। বলল, তুমি আমায় ভুল বুঝলে শবনম। তোমাকে ছেড়ে যাবার হলে আমি কি এতটা সময় থাকতাম তোমার কাছে? আমি কি পারতাম না সেই গোবিন্দজির মন্দিরে আমার নিজের ব্যবস্থাটা করে

নিতে? শুধু তোমার অসহায়তার কথা ভেবেই তো আমি আমার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে গুহাবাসী হলাম। আর তুমিই কি না আমাকে চলে যেতে বলছ? ঠিক আছে, বদলা নিয়েই না হয় যাব আমরা। শবনম! জেনে রেখো, আমি এক সদ্‌বংশজাত ভদ্র পরিবারের ছেলে। এবং নেহাত বালকও নই! সত্যের জন্যে, ধর্মের জন্যে এবং তোমার জন্যে আমি জীবনও দিতে পারি।

শবনম মাথা নত করে বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা করো রঞ্জন। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। তবু তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখো, যে কথাটা তুমি বললে সেটা নিছক স্বার্থপরের মতো কি না?

কতকটা তাই। তবে এই বদলা নেওয়ার কাজটা পুলিশকে দিয়েও করানো যেত।

যেত না। কিছু কিছু কাজের জন্য জনসাধারণকেও এগিয়ে আসতে হয়। পুলিশকে দিয়ে সব কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেত, তা হলে এদেশে এত কড়াকড়ির মধ্যেও মংঘীরাম ও হিন্দোলসর্দারের অত্যাচার প্রাধান্য পেত না। এখানকার এই দুই প্রধান শত্রুর মোকাবিলা না-করে আমরা ফিরতে পারি না রঞ্জন। এতে পাহাড়িদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

রঞ্জন বলল, হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ। আমি আমাদের দিকটাই চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু এদের কথাটা ভাবিনি।

এমন সময় কয়েকজন পাহাড়ি ছুটে এসে বলল, দেবীজি! পাহাড়ের নীচের দিক থেকে কিছু লোক আমাদের এই দিকে আসছে। ওদের হাতে বন্দুক ভি আছে।

ওরা কারা?

মালুম নেহি। তবে মনে হচ্ছে পুলিশের লোক।

ওরা কতজন আছে বলতে পারো?

তা বিশ-পঁচিশজন তো হবেই।

রঞ্জন আর শবনম পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

রঞ্জনের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল ভয়ে। কিন্তু শবনম বেপরোয়া। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে বলল, বুঝেছি। মংঘীরাম আমার সঙ্গে দোস্তি নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসছে। তবে আমিও খোদাতালার নাম নিয়ে বলছি ওদের একটাকেও আমি ফিরে যেতে দেব না। আমি জানি ওরা কারা। ওরা কখনওই পুলিশের লোক নয়।

পাহাড়িরা বলল, কিন্তু দেবী! একা আপনি লড়বেন কী করে ওদের সঙ্গে? ওরা বিশ-পঁচিশ জন। আপনি একা। আমরা কেউ যুদ্ধ জানি না। বন্দুকের চেহারা দেখেছি। কিন্তু বন্দুক চালাবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

শবনম তখন রুখে দাঁড়িয়েছে।

আবার যেন এক প্রেতিনী ভর করল তার ওপর। বজ্রমুষ্ঠিতে বন্দুক ধরে বলল, ঠিক আছে। তোমরা একটু বালবাচ্চা নিয়ে সাবধানে থেকো। পারো তো কাছেপিঠে কোনও গুহাটুহা থাকলে লুকিয়ে পড়ো সেখানে। সন্ধে হয়ে আসছে। আর দেরি কোরো না। যাও। রঞ্জন তুমিও যাও ওদের সঙ্গে।

রঞ্জন শবনমের একটা হাত শক্ত করে টিপে ধরে বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে শবনম? একা তুমি অতগুলো লোকের সঙ্গে লড়বে কী করে? চলে এসো। ওরা এখুনি মেরে ফেলবে তোমাকে।

শবনম বন্দুকে টোটা পুরে বলল, রঞ্জন! আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। শুধু জেনে রেখো, যে মানুষ মরতে চায় তার মরণ হয় না। তাকে মারতে কেউ পারে না। মরে তারাই যাঁরা বাঁচবার জন্যে হাঁকপাঁক করে। তবে হ্যাঁ, এ কাজে ঝুঁকি আছে। তাই তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি না। তুমি ওদের সঙ্গে যাও।

না। তোমাকে আমি ছাড়ব না। মরলে দু'জনেই একসঙ্গে মরব।

এমন সময় হিংলাজসর্দার এগিয়ে এসে বলল, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। আমরাও তোমাদের একা ছাড়ব না। তোমাদের এই দুই নাবালক ছেলেমেয়েকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব ভেবেছ? তোমরা যদি আমাদের জন্য জীবন বিপন্ন করতে পার, তা হলে আমরাই বা নিজেদের জন্যে লড়তে পিছব কেন? শুধু ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়ে এসো আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

আর একজন বলল, ঠিক। সর্দার যা বলেছে তা ঠিক। অনেক মার খেয়েছি আমরা। আর মার খাওয়া নয়। এবার আমরা পালটা মার দেব। কেউ পালাব না এখান থেকে। মরলে সবাই মরব একসঙ্গে। আজ রাতের অন্ধকারে হয় ওরা মরবে, নয়তো আমরা শেষ হয়ে যাব। আমরা জানি ওরা কী করবে। ওরা আমাদের ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। দিক। আমাদের একজনও যদি বাঁচি তা হলে ওই আগুনকে দাবানল করে ছড়িয়ে দেব চারদিকে।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তির, কাঁড়া, বল্লম, কুড়ুল হাতে হাতে চলে এসো সব।

শবনম বন্দুকের নল শূন্যে উঁচিয়ে একটা শব্দ করল। আর সেই শব্দের সঙ্গে হই হই করে উঠল আরণ্যকরা।

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, জয় দেবী ভয়ংকরীর জয়। আমাদের অরণ্যদেবী অমর রহে।

রঞ্জন বন্দুক চালাতে না পারলেও সঙ্গে নিয়েছে একটা।

অদূরে হিন্দোলকেল্লার মাথায় একটা মশালও জ্বলতে দেখা গেল। সেই

মশাল নেড়ে কে যেন কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে কি বন্দুকধারী ওই যোদ্ধারা মংঘীরামের লোক নয়? এরা কি হিন্দোলসর্দারেরই সৈন্যবাহিনী?

সব যেন কীরকম জট পাকিয়েছে যাচ্ছে।

পাহাড়ের নীচে আর পাহাড়ের চূড়ায় এই দুই ঘোড়েল শয়তানকে জব্দ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবুও সাহসে বুকবেঁধে ওরা এগিয়ে চলল সন্তর্পণে। পা টিপে টিপে। বাঘিনী যেভাবে তার শিকারের দিকে এগোয় ঠিক সেইভাবে শবনমও এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

এক জায়গায় বড় একটি পাথরের আড়ালে এসে থামল শবনম।

ওই তো দূরে পাহাড়ের ঢালে দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে। দেখে মনে হচ্ছে ওরা পুলিশেরই লোক। কিন্তু মংঘীরাম এত তাড়াতাড়ি পুলিশকে ফিল্ডে নামাবে কী করে? এরা নকল-পুলিশ নয় তো? তা ছাড়া হিন্দোলকেল্লার মাথায় ওই মশালের আলো কীসের বার্তা বহন করছে? কোনও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে।

শবনম সকলকে বলল, তোমরা যে যার সুবিধামতো বড় বড় গাছের ডালপালায় লুকিয়ে থাকো। ওদিক থেকে বাধা না পেলে বা আমি না বললে কাউকে আক্রমণ করো না।

নীচের লোকগুলি বন্দুক উঁচিয়ে এমনভাবে এগিয়ে আসছে যে, মনে হচ্ছে রাতের অন্ধকার না হলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে না।

কিন্তু মুশকিলটা হল এই যে, এই সন্ধ্যার ধূসর যবনিকায় ওরা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ওদের ছায়া ছায়া কালো কালো মূর্তিগুলো এক সময় আর দেখাই গেল না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারা গেল যে ওরা আসছে— আসছে— আসছে।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে শিকারি বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা।

চার

শবনম কিছুতেই ভেবে পেল না, এই মুহূর্তে তার করণীয় কী? এদিকে পাহাড়িরাও আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলা করবার জন্য দারুণভাবে মরিয়া। আসলে সুপ্ত চেতনা জাগরিত হলে যা হয় আর কী? তবে ওরা শুধু আদেশের অপেক্ষায় আছে। কতক্ষণে ওদের দেবী একবার শুধু বলবে 'মারো'। কিন্তু শবনম তো এখনি সে কথা বলতে পারে না। কেন না যদি এরা সত্যিই পুলিশের লোক হয়।

ওই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর পুলিশও তো চুপ করে বসে থাকবে না। তারাও তন্ন তন্ন করে চারদিক থেকে লুঠের মাল উদ্ধারের চেষ্টা করবে। হয়তো ওরা সেই সূত্রেই এই গিরি-অরণ্যে অভিযান চালিয়েছে।

রঞ্জন শবনমের খুব কাছেই ছিল। বলল, কীভাবে কী করবে ঠিক করলে কিছু?

না।

তোমার কী মনে হয় ওরা সত্যিকারের পুলিশ?

ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

তা হলে?

ওরা আর একটু কাছে আসুক।

আমার কিন্তু মন বলছে ওরা পুলিশের লোক নয়।

তোমার এইরকম মনে হওয়ার কারণ?

কেন না পুলিশের লোক হলে এই অন্ধকারে ওরা চুপি চুপি চোরের মতো আসত না। প্রকাশ্য দিবালোকেই আসত।

ঠিক। তবে এমনও তো হতে পারে, ওরা অতর্কিতে আক্রমণ করবে বলেই এইভাবে আসছে।

মানলাম। তা হলে হিন্দোলসর্দারের কেল্লা থেকে মশালের আলোর সংকেতে কাদের দৃষ্টি ওরা আকর্ষণ করছে?

সেটা আর একটু পরেই জানা যাবে। ওই শোনো বুটের শব্দ।

হ্যাঁ। সত্যিই তো। বেশ ভারী পায়ের মসমস শব্দ কাছের দিকে এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

শবনম হঠাৎ রঞ্জনকে কিছু না-বলেই ওর গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর একটি বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাগ করে বলল, হল্ট।

পায়ের শব্দ থেমে গেল।

শবনম বলল, তুম সব কৌন হো?

হাম পুলিশকা আদমি। তুম?

ম্যায় ইস পাহাড়-জঙ্গলকা রানি হুঁ।

সমঝ গিয়া। তুম ডাকু সর্দারকা আদমি। আভি বন্দুক ফিক দো। নেহি তো মুশকিল হো যায়ে গা।

শবনম এবার আত্মপ্রকাশ করে বলল, আমি এই জঙ্গলের রানি। যদিও কোনও রাজা নেই। তবুও আমি রানি। এরা আমার প্রজা। এখানকার সব কিছুর ওপরই আধিপত্য আছে আমার। তবে হিন্দোলসর্দারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। অবশ্য একেবারে যে নেই তা নয়। দুশমনির সম্পর্কটা আছে! তা আপনারা কি হিন্দোলসর্দারের খোঁজে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তো বেশ ভাল বাংলা বলতে পার দেখছি। কী নাম তোমার?

আমার নাম শবনম। আমি উর্দুতে পড়াশুনা করলেও, কলকাতার মেয়ে। বাংলা ভালই জানি। আপনি?

আমিও বাংলা জানি।

কিন্তু আপনি যে ডাকুসর্দারের খোঁজে চলেছেন আপনি কি জানেন ওই কেল্লার কাছাকাছি গেলেই অতর্কিতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি কেল্লার ভেতর থেকে ছুটে আসে?

জানি।

তা হলে?

আমরা জেনেশুনেই এসেছি! আমাদের একজন লোক ছদ্মবেশে ওদের দলে আছে। সে-ই ডাকিয়েছে আমাদের। ওই দেখো আলোর সংকেত।

শবনম দেখল বেশ কিছু পুলিশের লোক রাইফেল-স্টেনগান ইত্যাদি নিয়ে জড়ো হয়েছে সেখানে। অদূরে কেল্লার মাথা থেকে আলোর সংকেতও দেখা যাচ্ছে।

রঞ্জনও কখন যেন চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। অন্যান্য পাহাড়িরাও ঘিরে আছে চারদিক।

শবনম বলল, আপনি নিশ্চয়ই ইনস্পেক্টর?

হ্যাঁ। আমিই ইনস্পেক্টর জেনারেল বলতে পারো। তবে আসল নয়। নকল। আর এরা আমার দলের লোক।

শবনম সবিস্ময়ে বলল, সে কী! তা হলে কে আপনি?

আমার নাম লালচাঁদ রায়। বাঙালি। চিরকাল মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়াতে কাটিয়েছি। ওই ডাকাতসর্দার আমার সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপারে বেইমানি করেছে। তাই সেই বেইমানির বদলা নিতেই এসেছি আমি। আমার একজন লোক ওদের দলে আছে। ওই আলোর সংকেত সেই দেখাচ্ছে।

শবনম উৎসাহিত হয়ে বলল, কী নাম বলুন তো?

তুমি চিনবে না! ওর নাম ভীমা গাড়োয়াল।

ওর ভরসায় আপনারা এমন ঝুঁকি নিয়ে এসেছেন? কিন্তু ও যদি আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে?

গাড়োয়ালরা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

কে বললে? ওই গাড়োয়াল হিন্দোলসর্দারের সঙ্গে তার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না কি?

লালচাঁদ এবার চমকে উঠলেন। বললেন, কে তুমি! এই অল্প বয়সে এমন প্রখর বুদ্ধি রাখ।

আমি যে কে, তা আমিই জানি না। এখন আমি এই অরণ্যের দেবী। এই যে দেখছেন সহজ সরল পাহাড়িরা, ওই অত্যাচারীর অত্যাচারে ওরা জর্জরিত। ওই কেল্লাপাহাড়ে হিন্দোল আর নীচের অরণ্যে মংঘীরাম এই দুই অত্যাচারীর অত্যাচার ও শোষণে এরা আধমরা হয়ে আছে। এরা এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বহু মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছে। সেই দুর্ঘটনায় আমি আমার আব্বাজানকে হারিয়েছি! আরও কতজন কতজনকে যে হারিয়েছে তার ঠিক নেই। তাই আমিও চাইছি ওই শয়তানের কেল্লা দখল করে ওর মুণ্ডু হাতে নিয়ে মা কালীর মতো নাচতে।

লালচাঁদের চোখদুটো জ্বলে উঠল। বললেন, তোমার আর আমার পথ একই। কিন্তু এই জঙ্গলে হত্যার নেশায় মেতে ডাকাতরানি সেজে তুমি কতক্ষণ লড়বে? একমাত্র তোমার হাতে ছাড়া আর কারও হাতেই তো বন্দুক দেখছি না।

শবনম বলল, এই একটিমাত্র বন্দুকেই আমি এ পর্যন্ত অনেকগুলো প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছি। হিন্দোলসর্দারের দলের অনেক লোককে একা আমিই খতম করেছি এই বন্দুক দিয়ে।

তাই নাকি? কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হল?

আমার আব্বাজান মিলিটারির লোক ছিলেন। উনি আমায় সবকিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

লালচাঁদ দলের লোকেদের বললেন, এই মেয়েটিকে দেখে তোমরা শেখো প্রতিশোধ কী করে নিতে হয়। একে দিয়েই তোমরা অনুভব করো মানুষ মরিয়া হলে কী না করতে পারে। তারপর শবনমকে বললেন, তুমি যদি সত্যিই ওই দুরাত্মার প্রতিশোধ নিতে চাও তা হলে আমার সঙ্গে হাত মেলাতে পারো। আমি তোমাকে সব রকমের সাহায্য করব।

সত্যি বলছেন?

তোমাকে মিথ্যে বলে লাভ? তোমার চোখে যে আগুন আমি দেখেছি, তোমার মনের মধ্যে যে বারুদের স্তূপ আমি আবিষ্কার করেছি, তাতে বেশ বুঝতে পারছি আর এক নতুন পুতলিবাঈ জন্ম নিয়েছে এখানে। কাজেই আমার স্বার্থের জন্যে, দলের প্রয়োজনের জন্যে, তোমাকে আমার একান্তভাবে প্রয়োজন।

আমি রাজি।

ওদিকে হিন্দোলকেল্লার মাথার ওপর আলোর সংকেত আবার দুলে উঠল।

ওই দেখো! সুবর্ণ সুযোগ। আমি আমার বদলা নিতে চলেছি। তুমিও তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চলেছ। গো-অ্যাহেড।

শবনম এবার রঞ্জনের দুটি হাত শক্ত করে ধরে বলল, রঞ্জন! তুমি থাকো। আমি যাই! ওই কেল্লা বিজয় করে কাল সকালের আগেই আমি ফিরে আসব।

আমি না-আসা পর্যন্ত একটু একা থাকো। আমাদের পাতার ঘরে নির্ভয়ে বিশ্রাম করো তুমি।

হিংলাজসর্দার এবং তার দলের লোকেরা বলল, ওই কেল্লা যদি সত্যিই দখল হয় তা হলে চলো না কেন আমরাও সবাই মিলে দল বেঁধে যাই। শত্রুর শেষ একদিনেই হয়ে যাক।

লালচাঁদ বললেন, না। সবাই গেলে ওরা আমার চাতুরি ধরে ফেলবে। হিন্দোল আমার চিরশত্রু। আমি ছদ্মবেশে এসেছি। ছদ্মবেশেই ঢুকব। ওর অত্যাচারে ওর দলের অনেক লোকই দল ত্যাগ করেছে।

শবনম বলল, বাকি যারা ছিল তাদের ভেতর থেকেও কয়েকজনকে আমি খসিয়ে দিয়েছি।

বেশ করেছ। এখন আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট নয়। চলো সবাই সতর্ক হয়ে যাই।

রঞ্জনের এ ব্যাপারে খুব একটা সায় ছিল না। তাই বলল, শবনমের কি না গেলেই নয়?

শবনম বলল, ভয় নেই, আমি আবার ফিরে আসব। হিন্দোলসর্দারের সাধ্য কী যে আমায় ধরে রাখে? তা ছাড়া এখন আমরা দলে অনেক ভারী।

রঞ্জনের চোখদুটি ছলছলিয়ে উঠল। বলল, খোদা মেহেরবান। তুমি জয়যুক্ত হয়ে ফিরে এসো শবনম।

সেই আলোর সংকেত ধরে ওরা সবাই পা টিপে টিপে দুর্গমপথে হিন্দোলকেল্লার দিকে এগোতে থাকল। আলোর সংকেত থেমে গেছে। তবু ওরা এগিয়ে চলল। এইভাবে ছলচাতুরি না করে ওই কেল্লায় ঢোকবার কোনও পথই তো জানা নেই।

যেতে যেতে লালচাঁদ বললেন, একবার শুধু ভেতরে ঢুকি। তারপর আজই রাতের অন্ধকারে তোমার বুক চিরে আমি রক্তপান করব ঘোড়েল শয়তান। তোমার বেইমানির বদলা আমি নেবই।

ওরা ধীরে ধীরে এগোতে থাকল।

বন্দুক উঁচিয়ে নিঃশব্দে কেল্লার কাছাকাছি যেই না গেছে ওরা অমনি হঠাৎ রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে শব্দ হল, ডিস্যুম, ডিস্যুম, ডিস্যুম। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি দুর্গ প্রাকার থেকে ছিটকে এসে ঝাঁঝরা করে দিল ওদের। এক লহমায় কয়েকটি তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কেল্লার মাথায় বুরুজের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভীমা গাড়োয়াল দাঁড়িয়েই রইল একভাবে। ওর হাত থেকে খসে পড়েছে মশালের আলোটা। ধড় থেকে মুণ্ডুটাও ছিটকে পড়েছে এক কোণে। ভীমার মাথাটা একজন এসে কুড়িয়ে

নিয়ে বুরুজের লৌহ শলাকায় গেঁথে রাখল। আর যে অস্ত্রের ঘায়ে ওর ধড় থেকে বিচ্যুত হয়েছিল মুণ্ডুটা, সেই অস্ত্রের গায়ে লেগে থাকা রক্তের দাগ নিয়ে নিজের কপালে একটা টিপ্পা দিলেন সর্দার। সর্দারের রক্তচক্ষুতে তখন আগুন জ্বলছে। কেল্লার মাথা থেকেই চিৎকার করে উঠলেন সর্দার, আগ লাগা দো বস্তি মে। আউর ফুলনদেবী বননেবালী উস লেড়কিকো পাকড়কে লে আও। যাও। আভি চলা যাও সব।

চোখের পলকে পাঁচজন অশ্বারোহী মশাল ও বন্দুক নিয়ে সেই অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলল পাহাড়ি বস্তির দিকে। কিছুটা পথ যাবার পর পাঁচজন পাঁচদিক থেকে ঘিরে ফেলল বস্তিটাকে। কেন না সর্দারের হুকুম অমান্য করার সাহস ওদের নেই। অথচ সুন্দরী কিশোরী ডাকু শবনমের বেপরোয়া অব্যর্থ গুলি চালানোর কাহিনিও শোনা এবং জানা আছে। তাই সব দিক থেকে আক্রমণের জন্যই ওরা এই ব্যবস্থাটা নিল।

একেবারেই অতর্কিত আক্রমণ।

যুদ্ধ না করা সরল প্রাণ পাহাড়িরা তখন একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিল। বরং হিন্দোলকেল্লার দিক থেকে ছুটে আসা গুলির শব্দকে ওরা নকল পুলিশবাহিনীর আক্রমণ ভেবে আনন্দে উল্লাস করছিল। এমন সময় হঠাৎ হতচকিত হয়ে ওরা দেখল রাতের অন্ধকারে ওদের পাতার ঘরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। কোনও কিছু ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই ওরা দেখল, ওদের ক্ষুদ্র বস্তিতে যেন বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেছে। ওরা হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগল কয়েকজন ডাকাত ঘোড়ার পিঠে চেপে এদিক সেদিকে ছুটোছুটি করছে।

তির, কাঁড়, টাঙি, বল্লম, শাবল, কুড়ুল নিয়ে যারা ওদের বাধা দিতে গেল, তারা মরল। যারা প্রাণের ভয়ে লুকোল, তারা বাঁচল।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন ঘোড়ার পিঠে বসেই হঠাৎ চোখের সামনে হিংলাজসর্দারকে দেখতে পেয়ে তার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলল, ও লেড়কি কাঁহা হ্যায়?

হিংলাজসর্দার তখন ছুটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই তাকে উঠতে না দিয়ে ঘোড়ায় বসা লোকটি রক্তচক্ষুতে বলল, বোল জলদি ও লেড়কি কাঁহা হ্যায়?

অন্য ডাকাতরা তখন বন্দুক তাগ করে কয়েকজন পাহাড়িকে ধরে এনেছে সেখানে। তারা বলল, তুম সবকো সর্দারকা পাশ জানা হোগা।

পাহাড়িরা বলল, দোহাই। আমাদের প্রাণে মেরো না। গরিব মানুষ আমরা। এখন থেকে তোমরা যা বলবে তাই শুনব। আর কখনও বিদ্রোহী হব না।

মারো চপ্পল বদমাশকো। জলদি চল সর্দারকে পাস।

আর এক ডাকাত পাহাড়ি বস্তির কয়েকজন রমণীকে জোর করে টেনে আনছে।

হিংলাজসর্দার মরিয়া হয়ে বন্দুকের নলটা শক্ত করে ধরে হেঁচকা টান দিল একটা। কিন্তু তাতে অবশ্য লাভ হল না কিছু। ডাকাতের গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। সে যেমন বসেছিল তেমনিই রইল। শুধু হিংলাজ তার বুকের ওপর থেকে কোনওরকমে নলটা নীচের মাটিতে নামাতে পারল।

ঘোড়সওয়ার ভয়ংকর রেগে আবার বলল, ও লেড়কি কাঁহা হ্যায়?

নেহি বতাউঙ্গা।

তো ঠিক হ্যায়। আপনা ভগবান কো ইয়াদ করো। রাম-দো-তিন...।

ডিস্যুম।

পাহাড় ও বনভূমি কাঁপিয়ে একটা বন্দুকের গুলির শব্দ। আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা ডাকাতের মাথাটা তুবড়ির মতো উড়ে গেল।

সবাই হতচকিত। এ কী জাদুরে বাবা। অন্যান্য ডাকাতরা তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

এমন সময় সেই অন্ধকারে হঠাৎই শবনমের গলা শোনা গেল, বন্দুক ফিক দো শয়তান ডাকু।

ডাকুদের আর বন্দুক ফিকতে হল না। পাহাড়িরাই আবার তাদের নেত্রীর কণ্ঠস্বর শুনে ঝপাঝপ লাফ মেরে কেড়ে নিল বন্দুকগুলো। দিশেহারা ডাকাতরা তখন প্রাণভয়ে পালাতে গেল। কিন্তু সেই অন্ধকারে গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে জখম হয়ে দু'জন পড়ে গেল মাটিতে। আর বাকি দু'জন শবনমের গুলিতে নিহত হয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে ঢিপ ঢাপ পড়ল।

হিংলাজসর্দার নিজেই পাকড়াল একজন ডাকাতকে।

অন্য একজনকে বাকিরা।

আর ঘোড়াগুলোর সব ক'টাই ধরে ফেলল সকলে মিলে।

ঘোড়াগুলোকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ধৃত ডাকাত দুটিকে কবজা করল ওরা।

ভয়ে কথা বলতে পারছে না ডাকাতরা! কেন না ওরা বুঝতেই পারছে কী ভয়ংকর পরিণতিটাই না ঘটতে চলেছে এবার। এই কিশোরীডাকু ওদের সর্দারের চেয়েও মারাত্মক। ওরা ভয়ে ভয়ে দেখল একটা বাঘিনী যেন একটা ছুরি হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ছুরির ফলাটা ওদের চোখের দিকে তাগ করা।

বাঘিনী এগিয়ে আসছে। ওই অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে এইটুকু একটা মেয়ের সে

কী ভয়ংকরী রূপ। ওরা চিৎকার করে উঠল, নেহি নেহি নেহি।

বল শয়তানরা এখানে তোরা কী করতে এসেছিলি? তোরা কি জানতিস না এই অরণ্যে আমি ডাকিনী মন্ত্র নিয়ে অরণ্যকে পাহারা দিচ্ছি? এর আগে তোদের অন্যান্য সঙ্গীদের আমি কী ভাবে হত্যা করেছি সে কথা কি ভুলে গেছিস?

ভুলিনি দেবী।

তা হলে কোন সাহসে আবার এসেছিলি এখানে? কেন এদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিলি? কেন এখানকার মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছিলি? বল? কেন এ কাজ করতে এসেছিলি?

সর্দারের হুকুমে।

তোদের সর্দারের ওপর তো দেখছি দারুণ ভয় তোদের। কিন্তু আমাকে তোরা ভয় পাস না?

ওরা কাঁপতে কাঁপতে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ পাই।

তা হলে কোন সাহসে এসেছিলি আমার ঘরে আগুন দিতে? এক লহমায় কী ভয়ানক কাণ্ডটা করে ফেলেছিস তোরা তা জানিস? এত দুঃসাহস তোদের কী করে হল?

আমাদের এবারের মতো ক্ষমা করুন দেবী। আমরা কথা দিচ্ছি আর কখনও আপনার সঙ্গে লাগতে আসব না। আমরা দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দেব। আপনার গোলাম হয়ে থাকব আমরা।

এই রকম কথা তো আরও একজন দিয়েছিল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করার পরও সে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

কে সে?

তার নাম মুখে আনতেও ঘৃণা হয়।

না বললে আমরা কী করে বুঝব বলুন?

ওর নাম 'থুঃ'।

হিংলাজসর্দার বলল, ওই বিশ্বাসঘাতকের নাম বিক্রমজিৎ।

বিক্রমজিৎ! কিন্তু সে তো এখন আমাদের দলে নেই। সে তো ফেরার। দলত্যাগী।

তোমরা মিথ্যে কথা বলছ। সেই বিশ্বাসঘাতক এখান থেকে ছাড়া পেয়েই তোমাদের কেল্লায় ফিরে যায়। সে শঠ। প্রবঞ্চক।

হতে পারে। আপনাদের এখান থেকে ছাড়া পেয়ে সে পালিয়েছিল ঠিকই। তবে আমাদের দুর্গে সে ফিরে যায়নি। দুর্গের প্রহরীদের সে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, আমাদের অত্যাচার আর অনাচারের ফল নাকি আমরা হাতেনাতেই পাব এবার। আমরা যেন হিন্দোলকেল্লা ছেড়ে এখুনি পালাই। নয়তো শিগগির

প্রাণে মরব। কেন না এক কিশোরীর শরীরে এখানকার জাগ্রতা অরণ্যদেবী ভর করেছেন। তিনি অতি নিষ্ঠুরা। এই বলে সে দ্রুত অন্য পথে পালিয়ে যায়। সর্দার তখন কেল্লায় ছিলেন না। তাই তাকে মৃত্যুদণ্ড আমরা দিতে পারিনি কেউ।

শবনম বলল, পালিয়ে সে কোথায় যেতে পারে? সে তো আমার কাছেই আসতে পারত?

পালিয়ে সে একটি জায়গাতেই যেতে পারে, সেটি হল শহরের পুলিশচৌকিতে।

কিন্তু সেখানে গেলে তো অ্যারেস্ট হয়ে যাবে সে।

হবে। তার চোখেমুখে আমরা তীব্র অনুশোচনা এবং কঠিন সংকল্প দেখেছি। আমরা বুঝেছি মরতে সে আর একটুও ভয় পায় না। সর্দার তাকে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের একজন লোক সব সময় খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে।

লালচাঁদ ও তাঁর সাতজন যোদ্ধা শবনমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্গের ভেতর থেকে গুলি ছিটকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যারা ছোট বড় পাথরের আড়ালে কোনওরকমে লুকিয়ে পড়ে প্রাণটা বাঁচাতে পেরেছে একমাত্র তারাই ফিরে এসেছে এখানে। লালচাঁদ পাকা লোক। তবুও তিনি ভাবতে পারেননি এমন একটা কাণ্ড আচমকা ঘটে যাবে বলে। তবে শবনমের সতর্কবাণীর জন্য তিনি একটু সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন তাই রক্ষে। গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শবনমকে জড়িয়ে ধরে বড় একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েন। তারপর আর না এগিয়ে ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে থাকেন। দলের লোকেদের বলেন যারা বেঁচে আছ তারা লুকিয়ে থাকো। আর একদম এগিয়ো না। এগোলেই মরণ। কেন না ওরা দুর্গের আড়ালে আছে। আমরা আছি প্রকাশ্যে। আমরা গুলি ছুড়লে ওদের গায়ে লাগবে না। কিন্তু ওরা গুলি ছুড়লে আমরা সবাই মরব।

অতএব লালচাঁদ ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছেন।

ধৃত লোকদুটির দিকে তাকিয়ে লালচাঁদ বললেন, আমাকে চিনতে পারো চেৎ সিং আর কালুরাম?

লালবাবু!

হ্যাঁ। আমি মরিনি। আমি এখনও জিন্দা আছি। ওই শয়তান সর্দার আমার চরম সর্বনাশ করেছে। ওর বদলা নেব বলেই আমি এসেছি। ভীমা গাড়োয়াল বিক্রমকে দিয়েই আমার কাছে খবর পাঠায়। সে এখন আমারই এক গোপন ঘাঁটিতে লুকিয়ে আছে। তিনদিনের মধ্যে আমার দিক থেকে কোনও খবর না-গেলে সে ফোনে পুলিশকে জানাবে।

কিন্তু ভীমাকে তো সর্দার খতম করে দিয়েছে।

সর্দার টের পেল কী করে যে ভীমা আমার হয়ে কাজ করছে?

সর্দারের অজানা কিছু আছে কি? বাতাস ওর কানে কানে সব কথা বলে দেয়।

যাক। এখন তোদের জন্যে আমরা কী শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি বলো?

আমাদের এবারের মতো ক্ষমা করো লালবাবু।

তোদের ক্ষমা করব আমি? আমার সর্বনাশের সময় তোরা তো কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকিসনি। আমার চোখের সামনে আমার ছেলেকে তোরা গুলি করে মেরেছিস। আমার বউ, তাকে যে তোরা কোথায় নিয়ে গেছিস, তার খোঁজ আজও পাইনি। ওই হিন্দোলকেল্লার ভেতরে তাকে কি আমি আবার ফিরে পেতে পারি?

না। সর্দার তাকে গুলি করে মেরেছে।

তার অপরাধ?

কোনও অপরাধ নেই। তবে সর্দার বেশিদিন কাউকে বেঁচে থাকতে দেন না।

তা হলে এর পরেও কি করে তোরা বলিস তোদের ক্ষমা করতে? তোদের শক্তিতেই তো ওর শক্তি। ডাক এবার তোদের ভগবানকে। এক— দুই— তিন।

চিৎকার করে উঠল শবনম, না। আপনি ওদের মারবেন না। ওদের শাস্তি আমি দেব। এটা আমার এলাকা। ওরা যেমন এই পাহাড়ের বুক থেকে নিভৃত শান্তির ঘরগুলো পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। অসহায় শিশু, গোরু, ছাগল, যেমন অসহায়ভাবে পুড়ে মরেছে, তেমনি ওদেরকেও পুড়ে মরতে হবে তিল তিল করে। আমি ওদের জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেব। রঞ্জন! তুমি ওদের চিতা সাজাও। হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ওদের ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারব আমি। রঞ্জন!

কিন্তু কোথায় রঞ্জন!

শবনম চিৎকার করে ডাকল, রঞ্জন!

কোনও সাড়া নেই। শব্দ নেই। ডাকের পর ডাক। তবু কোনও প্রত্যুত্তর নেই। শুধু ওর দীপ্ত কণ্ঠস্বর পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল, রঞ্জন! রঞ্জন! রঞ্জন! তুমি কোথায়? কোথায়? কোথায়?

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল সকলে। তাই তো! গেল কোথায় ছেলেটা? খোঁজ খোঁজ। সবাই এতক্ষণ এই ধৃতদের নিয়ে আর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। কে কার খোঁজ রাখে তখন। বস্তির আগুনের হলকায় সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

শবনমের হঠাৎই তখন মনে হল সেই ভয়ানক কথাটা। বলল, ও আমাদের পাতার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিল না তো?

হিংলাজসর্দার বলল, হ্যাঁ মা! ওকে তো আমরা ওখানেই থাকতে দেখেছি।

হয়তো বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই পাতার ঘর? সে ঘর কি আস্ত আছে?

কী জানি?

দু'জন লোককে ধৃতদের পাহারায় রেখে সবাই ছুটল সেই পাতার ঘরের দিকে। কিন্তু না। সেখানে ঘরের চিহ্নও কোথাও নেই। নিভু নিভু আগুনের ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ তখন ধিকি ধিকি জ্বলছে। তাই দেখে সেই কঠিন পাষাণের বুকে আছড়ে পড়ল শবনম, রঞ্জন! আমাকে ক্ষমা করো বন্ধু। তুমিই আমার জীবন দান করলে, অথচ আমারই জেদের জন্যে আজ তোমাকে এই ভাবে পুড়ে মরতে হল। তবে আল্লা-কসম। আমি পবিত্র কোরান শরিফের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আল্লার নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা শেষ হলে আমিও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আমার আত্মাহুতি দেব। আমার জন্যে যে কষ্ট তুমি পেয়েছ সেই কষ্টের ভাগ আমিও সমানভাবে ভাগ করে নেব। তোমার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।

সমস্ত পাহাড়িরা তখন শোকস্তব্ধ হয়ে জড়ো হয়েছে সেখানে। অনেকেরই চোখে জল।

লালচাঁদের লোকেরা সেই অগ্নিকুণ্ডের ছাইভস্ম ঘেঁটে রঞ্জনের আধপোড়া শরীরটাকেও যদি পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু না। সেখানে শুধু মুঠো মুঠো ছাই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

শবনম ভয়ংকরী মূর্তিতে সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠে বলল, নিয়ে এসো ওই শয়তান দুটোকে।

পাহাড়িরা ধৃত ডাকাত দুটিকে নিয়ে এল।

এইখানে এই গাছটার সঙ্গে বাঁধো।

একটা আধমরা পলাশ গাছের গুঁড়িতে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা হল দু'জনকে।

শয়তানদুটো তখনও নির্লজ্জের মতো প্রাণভয়ে ভীত হয়ে চেঁচাতে লাগল, একবার। শুধু একবার আমাদের ক্ষমা করো দেবী। আমরা কসম খাচ্ছি, আজ থেকেই এই দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দেব আমরা। আমরা ভাল হব।

শবনম বলল, ভাল তোমরা এমনিতেই হবে। কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নিশুদ্ধি হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যাবে তোমরা। আবার নতুন করে মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে নতুন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে এসে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। তখন ভাল হবার চেষ্টা কোরো। এ জনমে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আর ভাল হতে যেয়ো না।

কিন্তু দেবী, আমরা যে এ জন্মেই বেঁচে থেকে সৎভাবে জীবন যাপন করতে চাই। ভাল হতে চাই।

তা তো আর সম্ভব নয়। সময় পার হয়ে গেছে।

কোনও উপায়েই কি এই অসম্ভবকে সম্ভব করানো যায় না? একটু কৃপা করুন দেবী।

শবনম বলল, আমি এখনি তোমাদের মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে।

বলুন কী সে শর্ত?

আমার রঞ্জনকে ফিরিয়ে দিতে হবে! তোমাদের নৃশংস অত্যাচার ও অগ্নিকাণ্ডর ফলে এই পাহাড়িদের যে সব নিরীহ নারীপুরুষ যুবা বৃদ্ধ শিশু পুড়ে মরেছে, তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে। পারবে? যদি পার মুক্তি দেব।

তা কী করে সম্ভব?

তা হলে তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। বলেই ভয়ংকরী নাদে চিৎকার করে উঠল শবনম, আগুন আগুন আগুন জ্বালাও। পুড়িয়ে ছারখার করে দাও এই পাপিষ্ঠদের।

প্রচুর শুকনো ডালপাতা এবং খড় এনে ওই ধৃত বন্দিদের গায়ের ওপর রাখা হল। তারপর একটা জ্বলন্ত মশাল এনে ধরিয়ে দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আর সেই অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বার গ্রাসের ভেতর থেকে অত্যাচারীদের অন্তিম হাহাকার শোনা যেতে লাগল। ওরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে যত চিৎকার করতে লাগল, শবনম ততই হাসতে লাগল হো হো করে। সে কী ভয়ংকর পৈশাচিক হাসি। এ যেন স্বাভাবিক কোনও মানুষের নয়। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ এক কিশোরীর অথবা ফুলনদেবী বা দুর্ধর্ষ পুতলিবাঈ-এর।

হাসতে হাসতেই এক সময় সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল শবনম।

হিংলাজসর্দার তাকে ধরে পাঁজাকোলা করে বেশ বড় সড় একটা পাথরের ওপর শুইয়ে দিল। পাহাড়ি মেয়েরা এসে ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। কিন্তু শবনমের জ্ঞান ফিরল না। সে নিথর নিষ্পন্দ হয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে রইল যেন।

অবশেষে কালরাত্রির অবসান হল। গভীর অরণ্যানির মধ্যে ভোরের বারতা নিয়ে কলতান করে উঠল বনের পাখিরা। মানুষের সুখদুঃখের কথা ওরা কি বুঝতে পারে? বোধ হয় পারে না। তাই ওদের এই চঞ্চলতায় কোথাও কোনও মলিনতা নেই। জগতের আনন্দযজ্ঞে ওরা তাই সদানন্দময়। এ ডাল থেকে ও ডালে গান গেয়ে গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে সব। কেউ বা মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। শবনমকে

ঘিরে অনেকগুলি রাতজাগা মানুষ তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে।

পাহাড়িয়া বস্তিতে তখন কান্নার রোল। সকলের সবক'টি ঝোপড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। শিশু ও বৃদ্ধ সহ মোট পাঁচজন মারা গেছে আগুনে পুড়ে। সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা যায় না।

পাহাড়িদের মধ্যে যারা একটু বলবান, তারা আবার শুরু করল তাদের কাজ। অর্থাৎ গাছের ডালপাতা কেটে নতুন নতুন ঝোপড়ি তৈরি করতে লেগে গেল! আবার নতুন করে বাঁচতে হবে তো।

হিংলাজসর্দারের পোষা কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। সেটাও আগুনে পুড়ে মরল নাকি? কত হাঁস মুরগি গোরু ছাগল যে পুড়ে মরেছে তার শেষ নেই। কুকুরটা কোথায় গেল কে জানে?

ওরা যখন আবার নতুন করে বাঁচার কথা ভাবছে তখন সেই শান্ত প্রকৃতির বুকে পাহাড় ও বনভূমি ভেদ করেই যেন আবির্ভূত হলেন এক তেজোময় সন্ন্যাসী। কী দারুণ সৌম্য মূর্তি তাঁর। মাথায় জটা। গলায় রুদ্রাক্ষ, পরণে লাল চেলি। এক হাতে চিমটা অপর হাতে কমণ্ডলু। সন্ন্যাসী খালি পায়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে এলেন, অসতো মা সদ্‌গময়ো তমসো মা জ্যোতির্গময়ো...। তারপর এই ধ্বসংস্তূপের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, আহারে! এমন সাজানো সংসার ছারখার করে দিল কে?

হিংলাজসর্দার লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর পায়ে। বলল, কে আপনি প্রভু? সাধু মহাত্মা! এই গরিবের দেশে পায়ের ধুলো দিলেন? এর আগে আর তো কখনও আপনাকে দেখিনি এখানে?

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, আমাকে তোরা দেখবি কী করে? আমি তো এখানকার লোক নই। দীর্ঘ কুড়ি বছর আগে আমি এই জায়গা ছেড়ে চলে গেছি। এখন ওঙ্কার তীর্থ থেকে আসছি। পায়ে হেঁটে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে শুধু পথ চলেছি, পথই চলেছি।

হিংলাজ বলল, এই পথ চলার শেষ হবে কোথায়?

তা তো জানি না। শুধু পথের রেখা ধরে যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাব। দু'দিন বিশ্রাম করব। ভাল লাগলে সেখানে কিছুদিন থাকব। না লাগলে একদিনও না থেকে চলে যাব।

বাঃ। বেশ মজার ব্যাপার তো। কী সুখের জীবন আপনার। কিন্তু বাবা! আপনি কি কোনও কারণেই স্থায়ী ভাবে ডেরা পাতবেন না কোথাও?

কেন পাতব না? তবে স্থায়ী ভাবে ডেরা পাতবার মতো কোনও সুযোগ সুবিধা যদি কখনও আসে বা সেরকম পরিবেশ পাই, তা হলে নিশ্চয়ই থেকে যাব। কিন্তু তোমাদের এই সুখের স্বর্গ শ্মশান হল কী করে?

অন্যান্য পাহাড়িরাও তখন ঘিরে ধরেছে সন্ন্যাসীকে। এই সন্ন্যাসীকে দেখলে বেশ বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, বিবেচক এবং সাধক বলেই মনে হয়। সকলে একে একে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বলল, আমরা এক সন্ত্রাসের রাজত্বে বাস করছি সাধুবাবা।

কী রকম!

হিন্দোলসর্দার নামে এক কুখ্যাত দস্যু আমাদের ওপর যখন তখন অত্যাচার করে। তার নৃশংস অত্যাচারের বলি কয়েকটি তাজা প্রাণ আর আমাদের এই পাতার ঘরগুলোর ভস্মাবশেষ।

তোমরা প্রতিরোধ করতে পারনি?

আমরা নিরস্ত্র। তার ওপর ওরা অতর্কিতে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে এই কাণ্ড করেছে।

সন্ন্যাসীর দু'চোখে ক্রোধের আগুন। বললেন, তাই নাকি?

হ্যাঁ বাবা। দৈবক্রমে একটি কিশোরী হঠাৎ কোথা থেকে এখানে এসে পড়ে বন্দুক চালিয়ে ওদের বদলা নেয় বা আমাদের জীবন রক্ষা করে। ওর এক সঙ্গী কিশোরও এই অগ্নিকাণ্ডে মারা যায়। তাই কাল রাত থেকে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

বলো কী! কে সেই মেয়ে? কোথায় সে?

সে যে কে তা ঈশ্বরই জানেন। মানবী কি দেবী না কোনও মন্ত্রসিদ্ধ যক্ষিণী তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়ে। জাতিতে মুসলমান। সঙ্গে এক কিশোর। সে হল হিন্দু। একটা ট্রেন দুর্ঘটনার পর ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে দুর্ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের বদলা নেবার উদ্দেশে এখানে এসে হাজির হয়। মজার কথা ওই কিশোরী মেয়েটি যেন হঠাৎই এক দৈবশক্তির প্রভাবে ভয়ংকরী হয়ে ওঠে। সে একাই ওই দুর্ধর্ষ ডাকাতদের প্রায় নির্মূল করে এনেছে। কৌশলে ডাকাত মেরে তাদের বন্দুক ছিনতাই করে ডাকাতদের মধ্যে মড়ক সৃষ্টি করে দিয়েছে। সে যেন এক কিশোরী ফুলনদেবী। আমরা তাকে দেবী বলি।

সন্ন্যাসী লাফিয়ে উঠলেন, জয় মা! জয় মা! এসেছে। এসেছে। এতদিন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

কে এসেছে বাবা?

সে তোমরা বুঝবে না। কিন্তু আমি জানি সে কে। আমার ডাকে সাড়া দিয়ে সে এসেছে। তাকে আসতেই হবে। না হলে আমার এতদিনের সাধনা বিফল হয়ে যাবে যে।

আমরা আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব। ওই যে মেয়েটি ভয়ংকরী মূর্তিতে তোমাদের

মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, ও তো মানবী নয়। দেবী। মা ভবানী। এই পাহাড়ের এক গোপন স্থানে মা ভবানী দীর্ঘ কুড়ি বছর উপবাসী আছেন। তাই মা তাঁর রক্ত পিপাসা মেটাতে আবির্ভূতা হয়েছেন ওই কিশোরীর রূপে।

কিন্তু বাবা, আমরা হিন্দু। মা ভবানী আমাদের দেবী। ও যে মুসলমানের মেয়ে।

ওরে নির্বোধ। আমরা সবাই মায়ের সন্তান। আমাদের কি জাত আছে? না আমাদের কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম আছে? আমাদের জাত একটাই। আমরা মানুষ। গোরু নয়, বাঁদরও নয়। তবে আমাদের অনেকের প্রকৃতির মধ্যে অবশ্য অনেক হিংস্র জানোয়ারের মিল আছে।

কিন্তু ওরা তো গোরু খায়।

ওরা তো জলও খায়! তোরা জল খাস না? সূর্যের কিরণ ওরা গায়ে মাখে। তোরা মাখিস না? যে বাতাসে ওরা শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় সেই বাতাস তোরাও তো নিস? তার বেলা? মা যে কবে তোদের সুমতি দেবে! তা চল দেখি কোথায় তোদের সেই দেবী। আমাকে এখুনি নিয়ে চল তার কাছে।

সবাই তখন সব কাজ ফেলে সেই মহাপুরুষকে নিয়ে চলল শবনমের কাছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর যেন এই মানুষগুলোর আশার প্রদীপ।

লালচাঁদ ও তার দলের লোকেরা এবং কয়েকজন পাহাড়ি মেয়েপুরুষ গাছতলায় বড় একটি পাথরের বুকে শায়িতা শবনমকে ঘিরে ছিল।

সন্ন্যাসীকে দেখেই সসম্ভ্রমে সরে বসল সকলে। সন্ন্যাসী তাঁর দীর্ঘ শরীর নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ছোট একটি পাথরে পা দিয়ে উঠে পড়লেন পাথরের চটানে!

শবনমের তখন জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু সে বড় ক্লান্ত। বন্দুকটা ওর পাশেই শোয়ানো আছে। ও ধীরে ধীরে চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল।

সন্ন্যাসী কাছে গিয়ে কমণ্ডলু থেকে খানিকটা জল নিয়ে ওর চোখেমুখে ঝাপটা দিয়ে বললেন, এখন কেমন আছিস মা?

শবনমের ঠোঁটদুটি বারেকের তরে একবার কেঁপে উঠল। কী যেন বলতে গেল সে কিন্তু পারল না।

সন্ন্যাসী বললেন, তোর কথা আমি সব শুনেছি। একটু সুস্থ হ তুই। আমি নিজে হাতে ফুল এনে তোর পুজো করব। মালা গেঁথে তোকে পরাব। নিজে হাতে তোকে পেট ভরে খাওয়াব। তুই যে দীর্ঘদিন উপবাসী আছিস। আজ কুড়ি বছর কেউ তোকে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করেনি। আজ তোর নতুন করে অভিষেক হবে মা।

বিস্মিত শবনম ধীরে ধীরে উঠে বসল। বলল, হে যোগীরাজ! কে আপনি?

কাকে কী বলছেন? আপনি কি জানেন আমি যবনকন্যা?

তুই কি জানিস অসুর নিধনের জন্যে মা ভবানীকেও একদিন কালী হতে হয়েছিল? আমি সন্ন্যাসী। আমার যেমন জাত নেই, তুই তেমনি দেবী। তোরও কোনও জাত নেই। কী নাম তোর?

আমার নাম শবনম।

সন্ন্যাসী গগন কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

আপনি হাসছেন কেন বাবা?

ওরে পাগলি। তোর নামই যে বলে দিচ্ছে তোর কোনও জাত নেই।

আমার নামই বলে দিচ্ছে আমার কোনও জাত নেই?

হ্যাঁ। তোর নামের মধ্যেই যে তোর পরিচয় লুকিয়ে আছে। তোর প্রকাশ যে তোর নামেই।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

পারবি না তো। আসলে নিজেকে বোঝবার চেষ্টা কেউ করে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'সর্ব ধর্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' অর্থাৎ হে ব্রজবাসীগণ তোমরা ধর্ম ধর্ম করে অযথা হানাহানি না করে সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকে অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণকে' শরণ করো। বা নিজেকে চিন্তা করো।

তা হলে কি বলতে চান ধর্ম বলে কিছু নেই?

আছে বইকী। মানুষের কর্মই ধর্ম। তোর নাম শবনম। শবনম মানে শিশির। কিন্তু অন্য অর্থে 'শব' কাকে বলে জানিস?

মরা মানুষকে।

মড়ার জাত আছে?

নেই।

'নম' মানে?

নমো।

তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে? তুই শব অর্থাৎ তোর কোনও জাত নেই। আর নেই বলেই তোকে নমো করছি। পুজো করব বলে।

শবনম সন্ন্যাসীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। বলল, বাবা! আজ থেকে আমি আপনার মেয়ে। আমাকে আপনার চরণে আশ্রয় দিন বাবা।

ওরে পাগলি! তোর যে এখন অনেক কাজ বাকি। অসুরনিধন করবি না? ওহে ও লালচাঁদ! এ বেটিকে একটু বুঝিয়ে দাও। এত সহজে আশ্রয় নিলে নদী যে মজে যাবে। আরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছ কী? মেয়েটাকে কিছু খেতেটেতে দাও। আর তুমি বাবু তোমার ওই পুলিশি পোশাক ছাড়ো। ওই পোশাকে তোমাকে মানায় না। যদি পারো তো, একটু দুধ গরম করে খাওয়াও মেয়েটাকে।

হিংলাজসর্দার বলল, দুধ তো এখানে পাওয়া যাবে না। আমাদের গবাদি পশুগুলো অর্ধেক মরেছে, অর্ধেক ছাড়া পেয়ে পালিয়েছে।

সে যাই হোক। এখনই ওর কিছু খাদ্যের প্রয়োজন। ও বড় দুর্বল। আমার এক শিষ্যকে আমি অন্য কাজে লাগিয়েছি। সে একাই চেষ্টা করছে মা ভবানীর মূর্তিটাকে জঙ্গলের ভেতর থেকে উদ্ধার করতে। জঙ্গল সেখানে এত গভীর যে একা পেরে উঠবে না সে। মূর্তিটা আশা করি ওখানেই থাকবে। কেন না পাহাড়ের গুহার ভেতরে বড় পাথর কুঁদে তৈরি মূর্তি। কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। আমি যাবার আগে ওই ছোট্ট গুহামুখ পাথর দিয়ে এঁটে গিয়েছিলাম। সেখানটা তো চেনাই যায় না। লোকটা একা আছে। আমি এসেছিলাম আরও কিছু লোকজন সংগ্রহের আশায়। এমন সময় এখানে এসে দেখি এই কাণ্ড। সত্যি! এই দীর্ঘ কুড়ি বছরে কত পরিবর্তন না হয়েছে। তুমিও অনেক পালটে গেছ লালচাঁদ। মোটা হয়েছ। কিন্তু এই বেশে এখানে যে তোমাকে আমি দেখব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আসলে ব্যাপার কী জানো, পাপের ভারা পূর্ণ না হলে পাপীর পতন হয় না। রাবণ বংশ একদিনে ধ্বংস হয়নি। তেমনি, সময় না হলে হাজার চেষ্টা করলেও যার সঙ্গে দেখা হবার নয়, তার দেখা পাওয়া যাবে না। তবু ভাল। দেবী আমার ডাক শুনেছেন। আজ গুহামন্দির সংস্কার করে এসো আমরা সবাই মিলে মা ভবানীর অভিষেক করি। তাড়াতাড়ি চলো সবাই।

লালচাঁদ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সন্ন্যাসীর দিকে। সে দৃষ্টিতে যে কী প্রচণ্ড বিস্ময় তা বলে বোঝানো যাবে না। লালচাঁদ বললেন আ-আ আপনি—!

মনে করে দেখো। দীর্ঘ কুড়িটা বছর পিছিয়ে যাও লালচাঁদ। খোংগসারার জঙ্গলে ওই বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতার বলি হয়েছিলাম আমরা। বিনা অপরাধে আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। তোমারই সহযোগিতায় জেল-হাজত থেকে পালাতে পেরেছিলাম আমি। তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছিলে।

আমার স্ত্রীকেও ওই শয়তানের চরেরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে কত খুঁজেছি তোমাকে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা করেছি। এমন সময় এক সদ্‌গুরুর সন্ধান পাই। তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসজীবন যাপন করছি। বেশ আছি। ছিলাম নর্মদার তীরে ওঙ্কার তীর্থে। হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখলাম মা ভবানীকে। দেখলাম মা'র চোখে জল। মা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার এক চ্যালাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম এখানে। এসে দেখি এই সব কাণ্ড।

লালচাঁদ লাফিয়ে উঠলেন, জয় মা ভবানী। জয় জগদম্বে। কিন্তু আপনি যে এখনও বেঁচে আছেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি সর্দার। আপনি ওঙ্কার তীর্থে,

আমি খাণ্ডোয়ায়। কত কাছাকাছি। অথচ কেউ কাউকে দেখিনি এতদিন!

ওঙ্কারতীর্থে আমি কিছুদিন আগে এসেছিলাম। সেখানে থেকে তোমার সমস্ত খোঁজখবরই রাখতাম আমি। তার আগে দীর্ঘদিন ছিলাম কর্ণাটকে তুঙ্গভদ্রার তীরে।

ঠিক আছে। ওই শয়তানের কেল্লা দখল করে আপনার কেল্লা আপনারই হাতে তুলে দেব সর্দার। হিন্দোলকেল্লা হিন্দোলসর্দারেরই থাকবে। জয় হিন্দোলসর্দারের জয়। জয় মা ভবানীর জয়।

শবনম বলল, আপনিই হিন্দোলসর্দার!

হ্যাঁ মা, যে মানুষ ডাকাত ছিল, কিন্তু কখনও কোনও নিরীহ প্রাণীকে অকারণে হত্যা করেনি, আমিই সেই। ডাকাত হলেও আমি মা ভবানীর উপাসক ছিলাম। তাই বুঝি মা আমার প্রাণহানিটা ঘটতে দেননি।

তা হলে ওই লোকটা কে?

ওর নাম দুর্জন সিং। আমার দলে ছিল। ভেতরে ভেতরে ওর দলের কিছু লোককে আমার দলে ঢুকিয়ে আমার লোকেদের সরিয়ে দিয়ে আমাদের দু'জনের ওপর চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ওই কেল্লায় সর্দার হয়ে বসে। সবাই জানে ওটা হিন্দোলসর্দারের কেল্লা। কিন্তু শয়তান দুর্জন সিং-এর কথা কেউ জানে না। আর জানে না ওর বিশ্বাসঘাতকতার কথা। নতুন যুগের মানুষরা ওই অত্যাচারীটাকেই হিন্দোলসর্দার বলে জানে। আমার নামকে কলঙ্কিত করেছে ওই শয়তানটা। পাছে কেউ চিনে ফেলে তাই মুখে কাপড় বেঁধে ডাকাতি করতে যায়। নানারকম নোংরামি করে দিনের পর দিন আমার নামে চালিয়ে যায়। সমস্ত কুকর্মের দায় আমার ঘাড়ে পড়ে। এখন ও নিজেকেই হিন্দোলসর্দার বলে প্রচার করছে।

শবনম বলল, তাতে ওর লাভ?

আমি পলাতক। আইনের চোখে আমি মারাত্মক অপরাধী। তাই সব রকমের কুকর্মের দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া তো খুব সোজা। ওর পাপ আমার খাতায় দিনের পর দিন জমা হয়। আর আমি ধরা পড়বার ভয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে স্রোতের ধারার মতো গড়িয়ে বেড়াই। না পারি দল গঠন করতে, না পারি ওকে আক্রমণ করতে। শুধু জানতে পারি আমার কেল্লা দখল করে ও দারুণ মজা লুটছে।

শবনম বলল, এর কি কোনও প্রতিকার নেই?

থাকবে না কেন? তবে এখন আমি সাধনমার্গে আসার পর আমার মনের অবস্থা এমনই যে, ওই তুচ্ছ ভোগ দখলের ব্যাপারটা বা প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারটা মন থেকে দূর হয়েছে! তবে একেবারে যে আসক্তিহীন তাও নয়।

বিশেষ করে মা ভবানীর সেবা পূজা করবার জন্যে মনটা আমার বড়ই উন্মুখ হয়ে আছে। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে এখানে কোনও মানুষের বসতি ছিল না। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে দিনের আলো প্রবেশ করত না। শিবাজির পুণা দুর্গের মতো আমার কেল্লাও ছিল অপ্রতিরোধ্য। অবশ্য এখনও তাই। আসলে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান সব কিছুকেই দুর্ভেদ্য করে রেখেছে।

শবনম বলল, আপনি কি পারেন না আবার স্বরূপে এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে?

কেন পারব না? সকলের সহযোগিতা পেলে নিশ্চয়ই পারব। তবে মা, আগের মতো ভোগবাসনা এখন আর নেই আমার। কিন্তু প্রতিশোধ একটা নেওয়া দরকার। তা ছাড়া ওই দুরাত্মার অত্যাচার এখুনি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যে নারীকে আমি চিরকাল মায়ের মর্যাদা দিয়ে এসেছি, ওই পাপাত্মা তাকেও কলঙ্কিত করেছে। আমি আজকে সাধু হলেও একসময় ডাকাত ছিলাম। এখন রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হলেও তখন আমার মধ্যে প্রচণ্ড বদ বুদ্ধি ছিল। অনেক বড় বড় ডাকাতি করেছি। আমার চিঠি নিয়ে লোক যেত। আমার চাহিদার কথা জানিয়ে দিত। পাওনা পেলে চলে আসতাম। বাধা পেলে লড়াই জমত।

কিন্তু কেন আপনি এসব করতেন বাবা?

ওরে পাগলি! কৈশোর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে যে ছেলে পথে পথে ঘোরে, আর সামান্য একটু পেট ভরাবার তাগিদে মানুষের কাছ থেকে যে দুর্ব্যবহার পায় সে যদি কখনও বদলা নেবার সুযোগ পায়, তা হলে কেন সে বিপথগামী হবে না? তোর ফুলনদেবী আর পুতলিবাঈ কি এমনি ডাকাতনী হয়েছিল?

আপনি কী করে ডাকাতদের দলে ভিড়েছিলেন?

সে অনেক কথা। বলতে পারিস মা ভবানীর কৃপায়। এই যে তুই একটা ভাল ঘরের মেয়ে। তুই কেন খুনের নেশায় মেতে উঠেছিস? এমনিই অবস্থার ফেরে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তবে দুর্জন সিংটা বিশ্বাসঘাতক। না হলে এই লালচাঁদও তো আমার হাতে গড়া। কই ও-তো কখনও বেইমানি করেনি। বরং আমার ফাঁসির আদেশ হবার পর ও দলবল নিয়ে এমনভাবে আমাকে পালাবার সুযোগ করে দেয় যে, ওর ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। ওই কাজ করতে গিয়ে ও এবং দু'-একজন ছাড়া সবাই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এদিকে দুর্জন সিং তার লোকেদের নিয়ে কেল্লা এমনভাবে দখল করে যে তার ধারেকাছে কারও যাবার উপায় থাকে না। তা যাক। ওসব আলোচনা এখন না করাই ভাল। এখন আর বৃথা সময় নষ্ট না করে চলো সবাই মা ভবানীর গুহামন্দির সংস্কারের কাজে যাই।

সবাই তখন 'জয় হিন্দোল সর্দারের জয়' বলে কোদাল, কুড়ুল, গাঁইতি নিয়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এগিয়ে চলল।

লালচাঁদ তাঁর কয়েকজন লোককে হিন্দোলকেল্লার দিকে নজর রাখতে বলে দু'জনের কানে কানে ফিস ফিস করে কী যেন বলতেই তারা চলে গেল সম্পূর্ণ অন্যদিকে।

পাঁচ

পাহাড়িদের মনে এখন দারুণ আনন্দের জোয়ার। তাদের একঘেয়ে কর্মময় ক্রীতদাসের মতো যাপন করা জীবনে যেন নবসূর্যোদয়। ওরা হই হই করে এক জায়গায় গিয়ে দেখল সাধুবাবার একজন লোক জঙ্গলের গভীরে পাহাড়ের ত্রিকোণাকৃতি একটি অংশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সাধু বললেন, ওই সেই স্থান। যেখানে আছে ছোট্ট একটি গুহামুখ। সংকীর্ণ একটু অংশের মধ্য দিয়ে মাত্র দু' ফুট ফাঁক। সেটিকে অতিক্রম করতে পারলে মা ভবানীর গুহায় প্রবেশ করা যাবে।

হিংলাজসর্দার বলল, কিন্তু বাবা, গুহার মুখ কোনখানে? আমরা তো বুঝতেই পারছি না।

কী করে পারবি? সে মুখ আমি বুজিয়ে দিয়ে গেছি। তোদের কাছে গেলাম তবে কী জন্যে? ওই মুখ আজ এখুনি খুলব। নে, এখন তোরা এই জায়গাটার জঙ্গল সাফ কর।

সবাই একবার তাকিয়ে দেখল শবনমের দিকে।

শবনম বলল, দেখবার কিছু নেই। কাটো। প্রয়োজনে অনেক কিছুই করবে! কিন্তু অপ্রয়োজনে কিছুই করবে না। তবে এক কাজ করো। সামনের দিকটা জঙ্গল রেখে একেবারে গুহামুখের দিক থেকে চার হাত মাপ করে কাটো।

এগুলো অবশ্য ভাল গাছের জঙ্গল নয়। বড় বড় চিহড়লতায় ঘনান্ধকার করে ঢাকা। আগাছা, কাঁটাবন ও বনতুলসির ঝাড়।

সাধুবাবা বললেন, জঙ্গলের গাছপালার ওপর তোর খুব মমতা দেখছি।

হ্যাঁ বাবা। একটা গাছের ডাল কাটলে আমার মনে হয় কেউ যেন আমার একটা হাতই কেটে নিচ্ছে।

কোদাল, কুড়ুল, গাঁইতির ব্যবহারে মিনিট কয়েকের মধ্যেই বুনো ঝোপগুলো সাফ হয়ে গেল। ওগুলোকে এমনভাবে কাটা হল যাতে করে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে বাইরের জঙ্গল দেখেই বুঝতে পারবে না এর ভেতরে এমন পরিষ্কার

জায়গা আছে। জঙ্গল পরিষ্কারের সময় দু'-একটা খরগোশ গর্তর ভেতর দিয়ে লাফিয়ে পালাল। একটা বিষাক্ত সাপ ফাটল থেকে বেরিয়ে ফোঁস করে উঠতেই হিংলাজসর্দারের গাঁইতির ঘায়ে শেষ হয়ে গেল সেটা।

সাধুবাবা বললেন, ভুল করলি বেটা। এমনিভাবে কোনও নিরীহ প্রাণীকে মারে না কেউ। ওকে কিছু না বললে ও এমনিই পালিয়ে যেত। যাক, এখন ওই পাথরের খাঁজে খাঁজে চাড় দে।

সবাই মিলে গাঁইতির চাড় দিতেই এক এক করে সাজানো পাথর খসে খসে পড়তে লাগল। শাবলের ঘা আর গাঁইতির চাড়। কিছু সময়ের মধ্যেই অপরিসর একটি মানুষপ্রমাণ পাহাড়ের খাঁজ ফাঁকা হয়ে গেল।

সাধু বললেন, জয় মা ভবানী। এবার চলো সব এক এক করে ঢুকে দেখি আমার মা কী অবস্থায় আছে। তবে এখুনি সবাই নয়। আগে আমি আর এই জ্যান্ত ভবানী ভেতরে ঢুকব।

শবনম সাধুবাবার হাত টেনে ধরে বলল, একটু অপেক্ষা করুন বাবা। এখুনি ঢুকবেন না।

ভয় কীরে পাগলি?

ভয় আছে বইকী। কুড়ি বছরের বদ্ধ গুহা আলো-বাতাসের সংস্পর্শে না থাকায় এর ভেতরে একটা বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়ে আছে। এখন যে ঢুকবে সেই মরবে।

সাধুবাবা বললেন, তুই ঠিক বলেছিস তো। এই সহজ কথাটা আমার মাথায় আসেনি। অক্সিজেনের অভাবে এর ভেতরটা যে কী হয়ে আছে তা কে জানে? এই বদ্ধ গুহায় ঢুকলেই এখন মৃত্যু।

তার প্রমাণ অবশ্য হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

গুহামুখ অর্গলমুক্ত হওয়ার ফলে গুহার ভেতর থেকে একটা গরম ভাপানি যেন ভক ভক করে বেরিয়ে আসতে লাগল। ভেতরটা যত অক্সিজেনে ভরতে লাগল, বাইরের শীতল বাতাস ততই ঢুকতে লাগল হু হু করে।

সাধুবাবা হিংলাজকে বলেন, কাছেই একটা ছোট্ট ঝরনা ছিল। সেটা শুকিয়ে গেছে কি?

না বাবা, ঝরনার মিঠা পানি খেয়েই তো আমরা বেঁচে আছি।

তা হলে যাও। তোমাদের বস্তি থেকে কয়েকটা বালতি নিয়ে একটু ঝরনার জল এনে জায়গাটা ধুয়েমুছে দাও। আর কাউকে পাঠিয়ে দাও কোথাও থেকে পাহাড়ি গাছ-গাছড়ার ফুল নিয়ে আসতে। কিছু বেলপাতাও নিয়ে এসো। এখানে অনেক বেলগাছ আমি বসিয়েছিলাম। সে সব গাছ এখনও আছে দেখছি। যাও দেরি কোরো না। মায়ের থান পরিষ্কার করতে হবে। মাকে ঝরনার জল দিয়ে স্নান করাতে হবে।

শবনম বলল, একটু আলোর ব্যবস্থাও তো করতে হবে। অনেকগুলো মশাল পড়ে আছে আশপাশে।

হিংলাজ বলল, সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল। পাহাড়ি ললনারা প্রচুর ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করল। বেশির ভাগই আকন্দ, কলকে, করবী, জুঁই ও গুলঞ্চ। সাধুরই সযত্নে বসিয়ে যাওয়া গাছেরা বংশানুক্রমে ফুল দিয়ে যাচ্ছে। তবে এই ফুল এতদিন শুকিয়ে মাটিতে ঝরছিল। এখন মালা হয়ে দেবীর গলায় দুলবে।

মশাল হাতে নিয়ে সাধু শবনমের একটি হাত ধরে ভেতরে ঢুকলেন। লালচাঁদও ঢুকল ভেতরে। বাকিরা রইল প্রতীক্ষায়।

সাধু ভেতরে ঢুকেই দেখলেন মা ভবানী যেখানকার সেখানেই প্রতিষ্ঠিতা আছেন। শুধু চারদিক মাকড়সার জালে ভরে আছে।

সেটুকু পরিষ্কার করতে আর কতক্ষণ?

পাহাড়িরা বালতি বালতি জল এনে দিতে লাগল। সাধু শবনমকে বললেন, ঢাল বেটি দেবীর মাথায়।

কিন্তু বাবা!

আরে! আমি তো বলছি। আজই তোকে আমি দীক্ষা দেব। এমন ধর্মে দীক্ষা, যে ধর্মে কোনও হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ নেই। তুই মাকে স্নান করাবি, গা মুছিয়ে দিবি। তোর হাতে গাঁথা মালা যখন মা ভবানীর গলায় দুলবে তখন ত্রিলোক পর্যন্ত দুলে উঠবে। হিন্দু-মুসলমানের কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। জয় মা ভবানী। নে ঢাল দেবীর মাথায় জলের ধারা।

আনন্দের আবেগে শবনমের দু'চোখে যেন জল এসে গেল। আজ এই চরম সুখের মুহূর্তটিতে ওর বড় বেশি করে মনে পড়ল রঞ্জনের কথা। ওই সুস্থ সুন্দর সুদর্শন কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা ও এখনও ভুলতে পারছে না। আজ যদি রঞ্জন ওর পাশে থাকত। ওর বুক ভরে উঠত এক অনাস্বাদিত সুখে। ওর বাবা-মা জানেনও না তাদের অতি আদরের ছেলেটির এই নিঠুর নিয়তির কথা। 'তার' পেয়ে তাঁরা এখনও কত নিশ্চিন্তে আছেন। কিন্তু যখন দিনের পর দিন যাবে, অথচ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে না, তখন কী যে করবেন তাঁরা? তা কেই বা জানে? রঞ্জনের ঠিকানাও জানে না শবনম, যে খবর দেবে। কিন্তু কী খবরই বা দেবে? ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কি ওই নামের কোনও নিরুদ্দিষ্ট ছেলের বাবা-মা'র খোঁজ নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে বলবে 'আমি এক ভাগ্যহীনা কিশোরী, আমার জেদের বলি হয়ে আপনাদের ছেলেকে কিছু নরপিশাচের পৈশাচিক কর্মের জন্য অকালে প্রাণ দিতে

হয়েছে।' রঞ্জনের কথা মনে হতেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল শবনম।

সাধুবাবা বললেন, কী হল! হঠাৎ এত কান্না এল কেন?

আমি আর পারছি না বাবা। এখন আমার মৃত্যু হলেই ভাল হয়।

মৃত্যু অমোঘ। তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। অযথা ওইসব ভেবে মন খারাপ করিস না।

কিন্তু রঞ্জনকে যে আমি ভুলতে পারছি না বাবা।

ভুলতেই হবে মা। এই জন্যে তোর চোখে জল? তাকা একবার আমার মুখের দিকে। মা'র ছেলে মা'র কাছে গেছে। এই জন্যে তুই কাঁদবি কেন?

ওকে যে আমার জন্যেই যেতে হল বাবা।

কেউ কারও জন্যেই যায় না। যে যার নিজের ভবিতব্যে যায়। আসলে তোর চোখ দেখে আমি বুঝতে পারছি তুই ওকে ঘিরে অন্য স্বপ্ন দেখেছিলি। কিন্তু মা! তুই যে ভবানীর মেয়ে। তোকে যে তাঁর কাজ করতে হবে। ও সুখ তোর সইবে কেন? সেইজন্যেই একে একে তোর সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। মা গেছেন, বাবা গেছেন। তোর কিশোর বন্ধুটিও গেল। এই তো ভাল হল রে। কারও জন্যে আর চিন্তা-ভাবনা রইল না। এখন প্রাণ ভরে মাকে ডাক।

শবনম তবুও কান্না থামাতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলল।

ওরে এক কূল হারিয়ে তবে মানুষ আর এক কূল পায়। তোর তো একূল ওকূল দু'কূল যায়নি। এই দেখ তোর ওপার ভেসে গেছে, এপারে আমি আছি। আমরা আছি। সময়ের ব্যবধানে সব ভুলে যাবি। নে আর দেরি করিস না। জল ঢাল মায়ের মাথায়।

সাধুবাবা অতীতে ডাকাত হলেও এখন তো সাধু। তাই সাধুজনচিত ব্যবহার তাঁর। তা ছাড়া ডাকাত থাকার সময়েও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মা ভবানীর পুজো করতেন। বললেন, ওরে মায়ের ওপর ভরসা রাখ। আমি ভরসা রেখেছিলাম বলেই না আজ আবার নতুন করে মাকে ফিরে পেলাম, সবাইকে ফিরে পেলাম।

শবনম চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল। তারপর দেবী ভবানীর মূর্তির মাথায় জল ঢালতে লাগল বালতি বালতি।

পাহাড়িরা দু'-একটা ঝাড়ু এনেছিল।

লালচাঁদ ও সাধুবাবা ঝাড়ু নিয়ে নিজেরাই লেগে পড়লেন ঝাঁটপাট দিতে। আসলে বাইরেটা বন্ধ থাকায় সামান্য একটু ধুলোর আস্তরণ ছাড়া আবর্জনা বিশেষ কিছু জমতে পারেনি। তবে কাঁকড়া বিছের একটা আড়ত হয়েছিল। ঝাঁটার খোঁচায় আর জলের ধারায় পালিয়ে গেল সব।

ধোয়ামোছা শেষ হবার পর সবাই চলল ঝরনার জলে স্নান করতে।

একে একে স্নান-পর্ব শেষ হতেই শুরু হল দেবীর আরাধনা। সাধুবাবা জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করতে লাগলেন। কাঁসর, ঘণ্টা, কোশাকুশি, কমণ্ডলু, চন্দনপিড়ি, চন্দনকাঠ সবই ছিল, আর ছিল নৈবেদ্য রাখবার বড় বড় রুপোর থালা। ফল কাটবার জন্য বঁটি, কাটারি, কুড়ুনি সব। লোহার জিনিসগুলোয় তাদের ধর্মে জং ধরেছে। যাই হোক, গাছের পেঁপে, কলা, পেয়ারা আর কাঁচা পাকা বেল দিয়ে নৈবেদ্য সাজাল শবনম। সাধুবাবা খুঁজে পেতে তাঁর পরিচিত নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরাল নামে একপ্রকার সুস্বাদু কন্দ তুলে নিয়ে এলেন। ব্যস শুরু হল ভোগের ব্যবস্থা।

সাধুর বজ্রগভীর অথচ সুললিত কণ্ঠস্বরের মন্ত্রধ্বনিতে ও ঘণ্টার শব্দে জায়গাটার পরিবেশই যেন পালটে গেল। সাধু মা ভবানীর কণ্ঠে বেশ মোটা করে গাঁথা জবার মালা, বেলপাতার মালা, গুলঞ্চের মালা ও কলকে ফুলের মালা পরিয়ে একটি গুলঞ্চের মালা শবনমের গলাতে পরিয়ে দিলেন। তারপর এক হাতে দেবীকে ও অপর হাতে শবনমকে পুজো করতে লাগলেন। শবনমের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ কপাল রক্তচন্দনে রাঙিয়ে শিঙায় ফুঁ দিলেন। তারপর বললেন, ওরে হতভাগী! মায়ের পদতলে তোর ওই বন্দুকটা আগে রাখ। রেখে প্রণাম কর। তোর এখন পুনর্জন্ম হল। তুই এখন বিশ্বমাতার কন্যা হলি। আদিপুরুষের নাম ধর্ম নিরঞ্জন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিনজন। সেই নিরঞ্জনই তোর পিতা-মাতা হল। তিনি হিন্দু-মুসলমান সবকিছুর ঊর্ধ্বে। অলখ-নিরঞ্জন। তাঁর কোনও ভেদাভেদ নেই। তাঁর কোনও জাত নেই।

শবনমের দু'চোখে জলের ধারা। সাধুর কথায় বন্দুকটা দেবীর পদতলে রেখে প্রণাম করল।

সাধু বললেন, এই সেই অভিশপ্ত ও মন্ত্রঃপূত বন্দুক। দেবীর ইচ্ছায় তোর হাতে এসে পড়েছিল। এখন যার জিনিস তার কাছে ফিরিয়ে দে। এই বন্দুকের নলে যে শক্তির উৎস, তাকে ওরা অন্য কাজে লাগিয়েছিল। তাই সেই অস্ত্রে ওরাই মরল। এখন তুই বুঝছিস তো পাগলি, কীসের প্রভাবে তুই একটা সাধারণ মেয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলি?

বুঝলাম।

এখন এই অস্ত্রে ওদের সব ক'টাকে নিধন করতে হবে। আগে মা ভবানীকে বল--

কী বলব?

কী বলবি? তাই তো রে! কী বলবি বল তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। বল, মা আজ থেকে আমার কোনও জাত নেই, ধর্ম নেই। আমি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে তোমারই হলাম।

শবনম তাই বলল।

বল, যে ধর্ম মানুষকে মানুষ বলে বিচার করে আমি সেই ধর্মে আজ দীক্ষা নিলাম।

সাধুর কথার সঙ্গে সঙ্গে শবনমের ঠোঁটও নড়তে লাগল।

সাধু বললেন, আমি তোকে দেবী বলেই ডাকব। তুই আমাদের মা ভবানী। আর একটা কথা, এখন তো তোর নতুন জাত। তুই নতুন ধর্ম গ্রহণ করছিস। এখন থেকে আর তুই কখনও মাছ-মাংস খাবি না। যদিও আমাদের ধর্মে ও সব নিষিদ্ধ নয়, তবুও তুই একটু নতুন করে বেঁচে ওঠ দেখি?

শবনম বলল, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব বাবা।

গুহার বাইরে তখন পাহাড়িরা আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। শবনম নিজে হাতে কাঁচা শালপাতায় করে মা ভবানীর প্রসাদ সকলকে বিতরণ করতে লাগল।

কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলো গোগ্রাসে খেতে লাগল দেবীর প্রসাদ। নানারকম ফলের সঙ্গে সেই সুস্বাদু কন্দে সকলের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হল। ক্ষুধাকে জয় করার এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিতৃপ্তির এক অত্যাশ্চর্য উপাদান আছে কন্দমূলে।

শবনম নিজেও খেল। সাধুও খেলেন।

সাধু বললেন, আজ এইভাবেই শুরু হল। কাল থেকে মায়ের পুজো আরও বেশি করে জাঁকিয়ে হবে। বড় বড় কড়াইতে করে ভোগ রান্না হবে মায়ের। খিচুড়ি ভোগ। রাত্রিবেলা হালুয়া পুরি। সেই ভোগের প্রসাদ আমরা সবাই পেট ভরে এক পংক্তিতে বসে খাব। আর আমাদের এই মা ভবানী সবাইকে তা পরিবেশন করবে।

লালচাঁদ হেসে বললেন, কিন্তু কালকের মধ্যে অত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে উঠতে পারবেন?

কেন পারব না লালচাঁদ? তুমি কি এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না, আজ রাতের মধ্যেই আমরা আবার আমাদের কেল্লা দখল করব বলে?

লালচাঁদ হাসলেন। বললেন, ও হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। আজই তো আমরা কেল্লা দখল করছি। আর ওই কেল্লার ভেতর তো আমাদের সবকিছুই আছে। অবশ্য যদি ও সবকিছু রেখে থাকে।

রাখবে রাখবে। ওদের নিজেদের ব্যবহারের প্রয়োজনেই ওরা রাখবে বা রেখেছে। না রাখলে অত লোকের ভোজনপর্ব চলছে কী করে? সাধু বললেন, আজ রাতের অন্ধকারে শয়তান দুর্জন সিং ভূত দেখবে।

শবনম বলল, শুধু দুর্জন সিং নয়। ওই মংঘীরামকেও ভূত দেখাতে হবে। বিক্রমের কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো ওই মংঘীরামের জন্যই আমার আব্বাজানকে হারিয়েছি আমি। তা ছাড়া ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

লালচাঁদ বললেন, সবই তো হল। কিন্তু ওই কেল্লায় আপনি প্রবেশ করবেন কী করে?

সাধু হাসলেন। বললেন, সেই গোপন পথের সন্ধান তোমরা কেউ জানতে না। আজ জানবে। ওই মহা শয়তান দুর্জনও জানে না। তোমার লোকেদের বলবে সামনের দিক দিয়ে দুম দাম গুলিগালা ছুড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। আর সেই সুযোগে...।

সেই সুযোগে?

আমরা পিলপিল করে গোপন পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকব। আজ থেকেই ওই কেল্লায় আমাদের বিজয়পতাকা উড়বে। আজ রাত থেকে ওই কেল্লা আর দস্যুপুরী থাকবে না। আমরা ওর ভেতরে যেখানে যত বন্দি আছে সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেব। আর কাল প্রভাতসূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তোমাদের ওইসব জঘন্য পোশাকপরিচ্ছদ ত্যাগ করে গেরুয়া পরবে।

আমরা কি তা হলে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দেব সর্দার?

হ্যাঁ। কী হবে মানুষ খুন করে? এত খুনজখম তো করলে জীবনে, শান্তি পেলে কি? ওই কেল্লা দখল করতে পারলে আমাদের কোনও অভাব থাকবে না। তখন মা ভবানীর সেবা-পূজা করে সুখেশান্তিতে থাকতে পারব আমরা। এই কেল্লার নাম হবে ভবানী মন্দির।

লালচাঁদ বললেন, যা আপনি বলবেন তাই হবে সর্দার। তবে অদ্যই হোক আমাদের মানুষ মারার শেষ রজনী।

এমন সময় একজন লোক এসে লালচাঁদের কানে ফিস ফিস করে কী যেন বলতেই লালচাঁদ চোখ লাল করে দূরের দিকে তাকালেন। তারপর কাউকে কোনও কথা না বলে হন হন করে এগিয়ে গেলেন লোকটির সঙ্গে।

বেশ কিছু দূর যাবার পর এক নৃশংস দৃশ্য দেখতে পেলেন লালচাঁদ। সে দৃশ্য বড় মর্মান্তিক এবং রোমহর্ষক। দেখেন একজন লোকের দু'চোখ অন্ধ করে তাকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। চোখদুটো খুবলে বার করে নেওয়ায় রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। মুখ দেখে তাকে আর চেনবার উপায় নেই সে কে। লালচাঁদ বললেন, কে তুমি?

আমি যোগীন্দর।

যোগীন্দর! তোমার এই অবস্থা কে করল?

জানি না। আমি কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই কে যেন পিছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার চোখদুটো খুবলে বার করে নিল। তারপর এইভাবে বেঁধে রাখল আমাকে। আমি কত বললাম ওকে, এ শাস্তি আমার প্রাপ্য নয়। আমাকে একেবারে মেরে ফেলো। কিন্তু সে কথা ও কিছুতেই শুনল না।

তোমার পরিচয়?

এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে যে বেরিয়ে এল তাকে দেখেই চমকে উঠলেন লালচাঁদ, এ কী বিক্রম! তুমি এখানে?

এই শয়তানটার পরিচয় দেব বলে লুকিয়ে বসেছিলাম।

ওর এই দশা কে করেছে? তুমি?

হ্যাঁ। আমাকে হত্যা করবার জন্য এই লোকটাকে কাজে লাগিয়েছিল শয়তানটা। অবশ্য এতটা নির্দয় আমি হতাম না ওর ওপর, যদি না ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত।

কীরকম বিশ্বাসঘাতকতা?

আমি ওকে চিনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান করে দিই এবং বলি ওকেও আমার মতো দলত্যাগী হতে। ও প্রথমটা রাজি হয়নি। পরে অবশ্য অনেক বোঝাতে রাজি হয়। কিন্তু তখন বুঝিনি ওর এই রাজি হওয়াটা অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। আমি ওকে বিশ্বাস করে সঙ্গে নিয়ে পথ চলছি এমন সময় দেখি পাহাড়ি বস্তির হিংলাজসর্দারের পোষা কুকুরটা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ছুটতে ছুটতে কী একটা যেন মুখে নিয়ে বস্তির দিকে যাচ্ছে। আমি যেই সেদিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, অমনি শয়তানটা আমাকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে পাহাড়ের খাদে ফেলে দেয়।

তারপর?

ভগবান রক্ষে যে পড়ে গিয়েও একটা শক্ত মোটা চিহড়লতাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে গেলাম। আমার চিৎকার শুনে এবং পড়ে যাওয়া দেখে ও ধরেই নিয়েছিল আমি খাদে পড়ে মরে গেছি। কিন্তু আমি যে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আবার ওকে ফলো করব, তা ও ভাবতেও পারেনি। এই শয়তানটা চিরকাল নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন করে তাদের চোখ খুবলে নিত। তাই আমিও ওর অন্তিমসময়ে আমার নিজস্ব আদালতের বিচারে ওকে ওই শাস্তিই দিলাম।

ঠিক করেছ।

লালচাঁদ এবার লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে বললেন, বিক্রম যা বলল তা ঠিক?

লোকটি নীরব।

তোমার নীরবতাই জানিয়ে দিচ্ছে ওর কথাই সত্য। যাক। তোমার উপযুক্ত শাস্তি তুমি পেয়েছ। এখন তোমার নিয়তিই তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে। এখন তুমি পাহাড় থেকে পড়ে মরবে কি পুলিশের গুলি খাবে সেটা নির্ভর করবে তোমার ভবিতব্যের ওপর। বলে একজনকে বললেন, দে, এর বাঁধনটা খুলে দে।

একজন লোক বাঁধন খুলে দিল।

বাঁধন খুলে দিতেই দু'হাতে চোখ ঢেকে সেখানেই বসে পড়ল লোকটি। লালচাঁদ, বিক্রমজিৎ এবং তাঁর অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এলেন।

হিংলাজসর্দারের পোষা কুকুরটা আসায় সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে বিস্ময়কর যেটা হল, তাতে সবাই একটা আশার আলো দেখতে পেল। ওই অগ্নিকাণ্ডর পর থেকে কুকুরটা নিখোঁজ হওয়ায় সবাই প্রায় ধরেই নিয়েছিল ওটা পুড়ে মরেছে। কিন্তু তার এই সুস্থ শরীরে ফিরে আসা এবং তার এই মুখের বস্তুটি চমক লাগিয়ে দিল সকলকে।

কুকুরটা ফিরে এসেই শবনমের পায়ের কাছে কী যেন একটা রেখে কুঁই কুঁই করে ছটফট করতে লাগল।

কী ওটা? কী রাখল?

শবনম সেটা কুড়িয়ে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, কোথায়? কোথায় পেলি এটা? আমাকে তুই নিয়ে চল সেখানে। আমার বন্দুক! বন্দুকটা কেউ আমাকে এনে দাও। মা ভবানীর মন্ত্রপূত বন্দুক। যার নিশানা ব্যর্থ হবার নয়।

সাধু বললেন, কী হল মা! ওটা কী? কী পেয়ে তুই এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলি? আমাকে বল?

সে মরেনি বাবা। সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কেউ কোথাও লুকিয়ে রেখেছে তাকে। এই দেখুন তার রুমাল। এই রুমাল মুখে নিয়ে ও যখন আমার কাছে এসেছে, আর বারে বারে ছটফট করছে, তখন ও নিশ্চয়ই জানে সে কোথায় আছে। আমি এখনি তার খোঁজে যেতে চাই। আর দেরি করলে হয়তো তার আরও বিপদ হবে।

সাধু ডাকলেন, লালচাঁদ!

বলুন সর্দার।

একে মদত করো। তুমিও সঙ্গে যাও। পারলে সঙ্গে নাও আরও দু'-একজনকে। আমি এদিকটা দেখছি। তুমি ওদিকে দেখো। দেবীকে একা ছাড়া ঠিক হবে না।

লালচাঁদ তক্ষুনি তাঁর দলের সবাইকে ডেকে নিলেন। দু'জন রইল দুর্গ পাহারায়। আর রইল পাহাড়িয়া মানুষগুলো। ওরা এমনভাবে দুর্গ ঘিরে রইল যাতে ওদিক থেকে কেউ গুলিগালা ছুড়লে এদিকের কারও গায়ে না লাগে, আবার ওদিকের দুর্গ থেকেও কেউ বেরোতে গেলে এদিকের গুলির মুখে পড়ে। এই অবরোধ এমনই যে দুর্গ থেকে বেরোতে না পারলে খাদ্য এবং পানীয় জলের

অভাবে তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে ওরা। ঘুঘুরা এখন নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়েছে।

শবনম, লালচাঁদ, বিক্রমজিৎ তিনজনে তিনটে ঘোড়ায় চেপে বসল। বাকিরা চলল পদব্রজে। সবার আগে চলল কুকুরটা। আর কুকুরের নির্দেশিত পথে ওরা সকলে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল।

পাহাড়ের ঢালু পথে নামতে নামতে ভীষণ জঙ্গল পার হয়ে একসময় ওরা এক প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

দরোয়ান পাহারা দিচ্ছিল গেটে।

বিক্রম ওর কাছে গিয়ে বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলল, দরোয়াজা খুলো।

দরোয়ান বলল, হুকুম নেহি।

শবনম বলল, না খুললে বিপদ হবে। খোলো দরোয়াজা।

দরোয়ান বলল, শেঠজি হামকো নোকরি সে নিকাল দেগা।

লালচাঁদ বললেন, দরজা না খুললে আমরাও তোমাকে জিন্দগি থেকে নিকাল দেব।

দরোয়ানটি সঙ্গে সঙ্গে একটা কলিংবেলের সুইচ টিপে দিতেই চারদিক থেকে বিপজ্জনক ঘণ্টি বাজতে শুরু করল।

বিক্রমের বন্দুক গর্জন করে উঠল 'গুডুম'।

রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়ল দরোয়ান।

ওরা এবার নিজেরাই দরোয়ানের পকেট থেকে চাবি নিয়ে গেট খুলে ফেলল। তারপর হই হই করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আর ঢোকা মাত্রই দেখল দশ-বারোজন যোদ্ধা স্টেনগান উঁচিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

এরা ঢুকতেই ওরা বলল, জলদি বাহার নিকালো। নেহি তো...।

লালচাঁদ বললেন, ও লেড়কা কাঁহা হ্যায়?

শবনম বলল, কাঁহা হ্যায় ও লেড়কা?

কাঁহা হ্যায় দেখোগে? বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা গুলি চালানো শুরু করল।

বিক্রম, লালচাঁদ এবং শবনম তিনজনেই ছিটকে পড়ল গুলি খেয়ে। ঘোড়াগুলো প্রচণ্ড আর্তনাদ করে শূন্যে দু'পা তুলে লাফিয়ে উঠল একবার। আর সঙ্গে সঙ্গেই লালচাঁদের লোকেরা উঁচু পাঁচলের ওপর থেকে গুলির পর গুলি চালিয়ে সেই আক্রমণকারীদের সব ক'টাকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। তারপর পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে মেন গেটটা বন্ধ করে দিল একেবারে। লাফ দিয়ে

ছুটে এসে বিক্রম, লালচাঁদ আর শবনমকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বারান্দার নীচে শোয়াল।

বিক্রমের বুক গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ওর আর বাঁচার আশা নেই।

লালচাঁদও গুরুতর রকমের জখম হয়েছেন।

শবনমের বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছে।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে সকলে।

শবনম এক হাতে ওর বাঁ কাঁধটা চেপে ধরেছে। ঝর ঝর করে লাল রক্ত ঝরে পড়ছে সেখান দিয়ে। যন্ত্রণা এত প্রবল যে মনে হচ্ছে এখুনি হার্টফেল করবে বুঝি। গায়ে যেন জ্বর আসছে। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। এখুনি গুলি বার করতে না পারলে পরে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন আর কোনও কিছু করাই সম্ভব হবে না।

একজন লোক লালচাঁদকে ঘোড়ায় তুলে সঙ্গে সঙ্গেই স্থান ত্যাগ করল। যদি কোনও ডাক্তারের কাছে গিয়ে অস্ত্রোপচার করে কোনওরকমে মানুষটাকে বাঁচানো যায়।

আর একজন শবনমকে বলল, চলুন দেবীজি। আপনারও গা থেকে ওই বুলেটগুলো বার করা দরকার। না হলে খারাপ হয়ে যাবে। কোনও ডাক্তারখানায় গিয়ে ওগুলো বার করে দু'-একটা সুইটুই নিয়ে নেবেন।

শবনম বলল, আগে যে কাজে এসেছি সেই কাজ করি। তোমরা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখো কোথায় লুকিয়েছে ওরা ছেলেটাকে।

এই ডামাডোলের মধ্যে ওরা কেউ নজরই দেয়নি কুকুরটার দিকে। কুকুরটা তখন উঠোনময় ছুটোছুটি করে এক জায়গায় গিয়ে প্রচণ্ড রকমের চিৎকার করতে লাগল। ঘেউ। ঘেউ ঘেউ। ঘেউ। ঘেউ ঘেউ—উ—উ—উ।

শবনম সেই অবস্থাতেই ছুটে গেল সেখানে। গিয়ে দেখল একটা আংটাওয়ালা কাঠের ডালা উঠোনের এক প্রান্তে নীচের একটি গর্তমুখে ঢাকা দেওয়া আছে। বলল, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও গোপন ঘর বা ওই জাতীয় কিছু আছে। আমার মন বলছে এখানেই আছে রঞ্জন।

একজন লোক শবনমকে সরিয়ে এনে এক জায়গায় বসাল। বলল, আপনি আহত। বেশি পরিশ্রম করবেন না বা উত্তেজিত হবেন না। আমরা দেখছি ওর ভিতরে কী আছে না আছে।

শবনম বলল, আমিও নামব ওর ভেতরে।

তা হলে আমাদের রক্ষা করবে কে? সবাই গেলে কি হয়? এই বলে দু'জন লোক সেই ডালা তুলে যেই না ভেতরে নামতে যাবে অমনি দোতলার বারান্দা থেকে দুটো বুলেট যেন হাওয়ায় ছিটকে এসে শেষ করে দিল দু'জনকে।

বাকি দু'জন তখন একটু নিরাপদ দূরত্ব থেকে সেই বারান্দা লক্ষ্য করে গুলি ছোটাতে লাগল।

একজন চেঁচিয়ে বলল, দেবীজি! তুম হঠ যাও হিঁয়াসে। ইয়ে আদমি বহুত খতরনক হ্যায়। তুম আভি কোঈ ডাক্তারকা পাশ চলা যাও। নেহি তো বহুত দের হো যায়গা।

শবনম একটু সময় কী যেন ভাবল। তারপর লাফিয়ে বসল একটা ঘোড়ার পিঠে।

ওদিক থেকে হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠল, ইধার মাত আও দেবীজি। ও শয়তানকা বাচ্চা উপর সে গোলি চালায়গা।

শবনম তখন আবার সেই আগের মতো প্রেতিনী হয়ে উঠল। বাঁ কাঁধের যন্ত্রণার কষ্ট ভুলে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে ঘোড়ায় চেপেই একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ওর ওই রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে যে যেদিকে পারল পালাল। যে বাধা দিতে এল সেই পড়ল গুলির মুখে।

ঘোড়া তখন ঘরের ভেতর ঢুকে প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে একেবারে দোতলায় উঠে পড়ল।

দু'জন লোক তখন বারান্দার থামের আড়াল থেকে গুলির জবাব গুলিতে দিচ্ছে।

শবনম ঘোড়া থেকে না নেমেই পিছন দিক থেকে গুলি করল লোক দু'জনকে।

গুলি খেয়ে দু'জনে দু'দিকে ছিটকে পড়ল আর্তনাদ করে।

শবনম বারান্দায় এসে হাত নেড়ে ওদের জানাল আর কোনও ভয় নেই। এবার তোমরা বিপদমুক্ত।

লোকগুলো এবার নির্ভয়ে নীচের উঠোনে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

দু'জন লোক সেই কুকুরের চিৎকারের সূত্র ধরে তরতর করে নীচে নেমে গেল। কিন্তু না। সেখানে তখন ফাঁকা ঘর। কেউ কোথাও নেই।

শবনম দু'জন লোককে ওপরে ডেকে প্রতি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু না। কেউ কোথাও নেই। একটি ঘরের দরজা শুধু ভেতর থেকে বন্ধ। ওরা আঘাতের পর আঘাত করেও যখন সে দরজা খুলতে পারল না, তখন একজন লোক নীচে নেমে একটা শাবল জোগাড় করে এসে তাইতে চাড় দিয়ে ভেঙে ফেলল দরজাটা।

সেই ঘরের ভেতরে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে শেঠ মংঘীরামজি থরথর করে কাঁপছিলেন।

শবনমকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন মংঘীরাম, নেহি নেহি নেহি। মুঝে মাত মারো দেবীজি। মুঝে মাত মারো।

শবনম বলল, বড্ড প্রাণের মায়া যে। শয়তান। লোকের সর্বনাশ করার সময়, ট্রেন ওলটানোর সময় এই প্রাণে খুব ফুর্তি হয় না? এখন তোর প্রাণ নিয়ে আমি ফুটবল খেলব।

ম্যায় গোড় পাকড়তি হুঁ দেবীজি! মুঝে মাফ করো।

আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলি কেন? কী বলে পালিয়ে এসেছিলি ওখান থেকে? কোন সাহসে আমার সঙ্গে বেইমানি করলি, বল?

মুঝে মাফ কর দো। মেরা গলতি হো গিয়া।

ফের ওই এক কথা?

মংঘীরামের বউ-ছেলেমেয়ে সবাই তখন ছুটে এসে শবনমের পাদুটো জড়িয়ে ধরল। বলল, উনকো মাত মারো দেবীজি। হাম সব অনাথ হো যাউঙ্গা।

শবনম বলল, এই কথা বলতে সরম লাগছে না তোমাদের? এই পাপীর পাপের পয়সা নিয়ে দিব্যি তো সুখভোগ করছিলে? এখন অনাথ হয়ে যাবার শোকে নাকিকান্না কাঁদছ? কেন তোমরা বাধা দাওনি ওকে ওইসব কাজ করতে?

মংঘীরামের বউ ডুকরে কেঁদে উঠল।

শবনম ওর গলার হারটা এক টানে ছিড়ে দিয়ে বলল, এ হার কার?

মেরা।

তোমার? না ট্রেনডাকাতি করে পাওয়া লুটের মাল? সত্যি করে বলো?

ও হার মেরা।

শবনম সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, তোমরা একটু ওপাশের ঘরে যাও। এ শয়তানটার সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া আছে।

নেহি। ম্যায় নেহি যাউঙ্গা। তুম উনকো মার ডালোগে।

শবনম ওর লোকেদের বলল, মংঘীরামের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে অন্য ঘরে সরিয়ে দিতে।

কিন্তু ওরা এমনভাবে কান্নাকাটি করতে লাগল যে তা আর সম্ভব হল না। অগত্যা ওরা মংঘীরামকেই টেনে বার করতে গেল হিড় হিড় করে।

মংঘীরাম ছুটে গিয়ে সিন্দুক খুলে গাদা গাদা নোটের বান্ডিল ছুড়ে দিতে লাগল শবনমের দিকে, ইয়ে লো। তুম মুছে এক লাখ দেনে কো লিয়ে বোলা থা, ইয়ে লো দশ লাখ রুপয়া। সোনাদানা যো কুছ হ্যায় লে লো। লেকিন মুঝে জিনে দো।

শবনম তখনও ঘোড়ার পিঠেই চেপে আছে। একবারও নামেনি। মংঘীরামের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বলল, ও মুঝে নেহি চাইয়ে মংঘীরাম।

তো ক্যা চাহিয়ে তুমকো?

হামারা আব্বাজান কা জিন্দগি আউর রঞ্জনকো চাহিয়ে।

ও লেড়কা মিল যায়ে গা। লেকিন আব্বাজান কি বারেমে ম্যায় কুছ নেহি জানতা।

তো লেড়কা কো আপস দে দো।

ও মিট্টিকা অন্দর হ্যায়।

জিন্দা না মুর্দা?

জিন্দা। আন্ডারগ্রাউন্ড মে হ্যায় ও।

চলো নিকালো।

মংঘীরাম ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বিয়ে নীচে নামল। শবনমও ঘোড়া নিয়ে নামতে লাগল নীচে। তারপর ওরা সেই কাঠের আংটাওয়ালা পাটাতনটার কাছে যেতেই শবনম বলল, ইসকো অন্দরমে কোঈ নেহি হ্যায়। হাম সব পহলেই দেখা।

হ্যায়। লাস্ট স্টেপিং পর যানে কা বাদ এক সুইচ বোর্ড মিলেগা। হুঁয়া তিন নম্বরমে পুস করনে সে এক অলগ কামরা কা ওয়াল হট যায়েগা। রঞ্জনবাবু হুঁয়া পর হ্যায়।

ঠিক হ্যায়, লেকে আও।

মংঘীরাম বলল, আপ ভি আইয়ে।

শবনম ঘোড়া থেকে নেমে যেই না ভেতরে ঢুকতে গেল অমনি লোক দু'জন বাধা দিল ওকে। বলল, আপ মাত যাইয়ে দেবীজি। উনকো যানে দিজিয়ে। হাম দোনো যাউঙ্গা ও শয়তান কা সাথ।

এদিকে 'জলদি আইয়ে' বলে মংঘীরাম সেই কাঠের পাটাতনের ডালা তুলে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমেই ডালাটা ফেলে ভিতর থেকে লক করে দিল।

শবনম এবং তার লোকেরা বারবার চেষ্টা করতে লাগল সেটাকে ভেঙে ফেলবার, কিন্তু পারল না।

বাইরে তখন সাইরেনের শব্দ।

শবনমের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, পুলিশ! পুলিশ! জলদি ভাগো হিঁয়াসে। দেবীজি চলা আও।

কিন্তু যাবে কোনদিকে?

একজন বলল, আমরা এর ভেতরে ঢুকেই বাইরে পালাবার রাস্তা দেখে এসেছি। ওই পিছন দিকে একটা তালাওয়ের পাড় দিয়ে রাস্তা। উধার সে ভাগো।

ওরা পিছনের দরজা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

মেন দরজায় তখন ঘন ঘন পুলিশের করাঘাত। পুলিশের একজন লোক তখন একটি গাছের ডালে উঠে পাঁচিল টপকে ঠিক যেভাবে লালচাঁদের লোকেরা এসেছিল সেইভাবে ভেতরে ঢুকল। তারপর এদিকের বন্ধ দরোজাটা খুলে দিতেই ভ্যান ভরতি পুলিশ হই হই করে ঢুকল ভেতরে।

পুলিশকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই মংঘীরামের বাড়ির চাকরবাকর সহ যে যেখানে ছিল ছুটে এল। ওর বউ-ছেলেমেয়েরাও ছুটে এসে বলল, আপ লোগোনে ইতনা দেরি কিঁউ কিয়া? ও ডাকু আকে হামারা সর্বনাশ কর দিয়া।

পুলিশ অফিসার বললেন, থামুন। আপনারা যে কী চিজ আমি জানি। দিনের পর দিন হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ করে বেড়াবেন আর আপনাদের সর্বনাশ কেউ করতে এলে চেঁচামেচি করবেন, এ কীরকম কথা?

মংঘীরামের স্ত্রী বললেন, দেখিয়ে তো কিতনা আদমি কো মার ডালা ও ডাকুনে।

এইসব লোক আপনাদের?

জি হাঁ।

আমি তো এদেরকেই ডাকাত মনে করেছিলাম। এত স্টেনগান বন্দুক এরা পেল কী করে?

মংঘীরামের স্ত্রী এবার চুপ করে রইলেন।

পুলিশ অফিসার বললেন, শুনুন, দুর্নীতির অভিযোগে এখানকার এস পি-কে বদলি করা হয়েছে। নতুন এস পি হুকুমত সিং অত্যন্ত কড়া লোক। আপনাদের রামরাজত্বের অবসান একেবারেই হয়ে গেছে ধরে নিতে পারেন। আর আমিও এখানে নতুন এসেছি। শুধু আগের এস পি সাহেবের জন্যে কিছু করতে পারছিলাম না। এখন বলুন শেঠজি কোথায়?

ডাকুরানি উসকো লেকে ভাগা।

ডাকুরানি?

হাঁ হাঁ। কাঁহাসে এক বদমাশ লেড়কি ফুলনদেবী বনকে আয়া। ও সবকো মারতা।

কোথায় থাকে সে?

ওই পাহাড় পর যো হিন্দোলগড় হ্যায়, হুঁয়াকা বস্তিমে।

হিন্দোলগড়! ও তো আর এক জায়গা। যতসব কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের ঘাঁটি একটা। ওর ধারেকাছে গেলেই তো শুনেছি গুলি করে। আমি অনেকবার এস পি সাহেবকে বলেছিলাম ওই পুরনো কেল্লায় রেড করতে। কিন্তু ওনার কী যে স্বার্থ ছিল তা কে জানে, ওই কেল্লার কথা উঠলেই তেড়ে একটা ধমক দিতেন।

পুলিশের লোকেরা তখন ডেড বডির গাদা করেছে।

তরুণ অফিসার চারদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই কাঠের ডালার কাছে এসে বললেন, এটা এখানে কী?

মংঘীরামের স্ত্রী বললেন, উধার কুছ নেহি। ও আন্ডারগ্রাউন্ড কা দরোয়াজা।

তোড়ো। হাম দেখেঙ্গে। কনস্টেবল! তোড়ো ইস ডালে কো।

পুলিশের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে এর ডালা ভেঙে ফেলল। তারপর টর্চের আলো ফেলে ভেতরে ঢুকেই আর যাবার পথ পেল না।

পুলিশ অফিসার বললেন, ব্যস। এইটুকু নামার জন্যে এত কাণ্ড?

মংঘীরামের স্ত্রী বললেন, হাম তো পহলেই আপকো বোলা ইসকো অন্দরমে কুছ হ্যায়ই নেহি। আপ তো শুনা নেহি মেরি বাত।

কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, এর ভেতরে কিছু যদি না-ই থাকবে তা হলে এর ডালাটা ভেতর থেকে লক করেছিল কে?

মংঘীরামের স্ত্রী এবার জবাব দিতে পারলেন না।

পুলিশ অফিসার বললেন, শুনুন। এ যাত্রায় আপনাদের বাঁচবার কোনও রাস্তাই আমি দেখতে পাচ্ছি না। এখনও বলছি যদি নিজেদের মঙ্গল চান তো পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

হাম আপকো বহুত রুপিয়া দেঙ্গে। আপ হামারা পতিকো বাঁচাইয়ে।

পুলিশ অফিসার বললেন, একটা কথা জেনে রাখুন, পুলিশের মধ্যে অনেক খারাপ লোক যেমন আছে, তেমনি ভাল লোকও অনেক আছেন। আমি মধ্যবিত্ত বাঙালির ছেলে। এই বিদেশে পুলিশের চাকরি করতে এসেছি। আমার অনেক অভাব আছে। তাই বলে টাকার লোভে কোনও বর্ন ক্রিমিন্যালকে আমি প্রশ্রয় দেব না। আপনাদের ওই পাপের টাকায় হাত দেব না আমি। আমার সন্তান এই পবিত্র ভারতভূমির মাটিতে ঘুষের টাকায় পালিত হয়ে হাওয়াগাড়ি চেপে ঘুরে বেড়াবে এই নীচতা আমার রক্তে নেই। জনগণের আত্মসাৎ করা টাকা আমি সরকারের হাতেই তুলে দেব। কিন্তু এখন বলুন শেঠজি কোথায় বা এর ভেতরে ঢোকার সোজা পথ কোনদিকে?

কথা বলতে বলতেই সুইচ বোর্ডটা নজরে পড়ে গেল অফিসারের। তিনটে সুইচ। দুটো ফলস। একটা আসল। তৃতীয়টায় হাত পড়তেই দু'ফাঁক হয়ে গেল দেওয়ালটা।

পুলিশ অফিসারের নির্দেশে সকলে হই হই করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পরপর অনেকগুলি ঘর। প্রতিটি ঘরের দেওয়ালের পেরেকে চাবি আটকানো। সেই চাবি নিয়ে দরজা খুলতেই বিস্ময়ের পর বিস্ময় দেখা দিতে লাগল। একটি ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার হল গাঁজা-চরস ইত্যাদি কিছু মাদক

দ্রব্য। আর একটি ঘর থেকে দশ-বারোজন সুন্দরী মহিলাকে উদ্ধার করা হল।

একটি ঘরে ছিল ট্রেনডাকাতি করে পাওয়া প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার।

আর একটি ঘরে একশো টাকার জাল নোটের হাজার হাজার বান্ডিল।

শেষ ঘরটিতে ছিল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক কিশোর।

পুলিশ অফিসার গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন, বাঙালির বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে! কী নাম তোমার?

আমার নাম রঞ্জন। আমি কোথায়?

তুমি এখন কুখ্যাত মংঘীরাম শেঠের গুপ্তকক্ষে আছ।

শবনম কোথায়? সে কেমন আছে? তার কোনও ক্ষতি হয়নি তো?

শবনম কে?

বলব বলব। সব বলব। আগে আমাকে একটু জল খেতে দিন।

পুলিশ অফিসার তাঁর সঙ্গের কনস্টেবলদের বললেন, যাও একে বাইরে বার করে নিয়ে যাও। শেঠের বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভাল জল খাইয়ে একটু সুস্থ হতে দাও। তারপর ওর কথা শোনা যাবে।

ওরা রঞ্জনকে বার করে নিয়ে গেলে পুলিশ অফিসার মংঘীরামের স্ত্রীকে বললেন, আপনার স্বামী কোথায়?

কৌন জানে ও কাঁহা হ্যায়।

ঠিক সে বোলিয়ে আপকা পতি মংঘীরাম কাঁহা হ্যায়? কিধার সে ভাগা ও শয়তান, মুঝে বাতাইয়ে।

মংঘীরামের স্ত্রী এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে একটি দেওয়ালের নীচের দিকের সুইচ টিপতেই দেওয়ালটা ওপর দিকে উঠে গেল। আর তখনই দেখা গেল একটি ছোট্ট ঘরের মেঝেয় বসে মংঘীরামজি থর থর করে কাঁপছেন।

পুলিশ অফিসার বললেন, বাঃ শেঠজি। বেশ ভাল একটা নিরিবিলি তপস্যার জায়গা বেছে বার করে নিয়েছেন দেখছি। তা আর কেন? এবার বেরিয়ে আসুন ওর ভেতর থেকে।

হাম জানে নেহি সকতা স্যার। হামারা ব্লাড প্রেশার জায়দা হো গিয়া।

ও এক্ষুনি রুলের গুঁতোয় কমে যাবে। বেরিয়ে আসুন।

হাম আপকো বহুত রুপইয়া দেগা। হামকো ক্ষমা কর দিজিয়ে সাব।

পুলিশ অফিসার বললেন, এই, এর হাতে হ্যান্ডকাপ লাগা তো কেউ!

হ্যান্ডকাপের নামে তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠলেন মংঘীরাম।

নাউ, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। এখন বলুন আপনার এই ধর্মপুরীতে কোথায় কী লুকানো আছে?

কনস্টেবলরা সঙ্গে সঙ্গে মংঘীরামের হাতে হাতকড়া পরাল। তারপর সবাই

মিলে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বার করে আনল তাকে।

মংঘীরামের স্ত্রী যখন বুঝলেন কোনও প্রলোভনেই এই তরুণ বাঙালি পুলিশ অফিসারকে বশে আনানো যাবে না, তখন অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে দিলেন। অবশ্য তাতে লাভ হল না কিছুই। পুলিশ অফিসারের কড়া ধমক ছাড়া কিছুই জুটল না তাঁর বরাতে।

বাইরে এসে মংঘীরাম হঠাৎ নিজমূর্তি ধরলেন। বললেন, বাঙ্গালিবাবু! আপ নয়া অফিসার মালুম হচ্ছে। আপনি কিন্তু ভিমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। আমার নজরানা আপনি নিলেন না, লেকিন আপনার হয়তো জানা নেই যে, আপনার এস পি বাবা আমার জিগরি দোস্ত। কোনও হাজতেই আপনি আমাকে আটকে রাখতে পারবেন না। যে রুপিয়া আপনি আপনার অনেস্টি দেখাতে গিয়ে নিলেনই না, ওই রুপিয়া আমাকে ছাড়িয়ে আনবে, আর আপনাকে ট্রান্সফার করিয়ে দেবে অনেক দূরে। এখনও ভেবে দেখুন কী করবেন। আমি এখনও আপনার সঙ্গে দোস্তি করতে রাজি আছি।

তরুণ পুলিশ অফিসার তখন আর থাকতে না পেরে সবুট একটা লাথি দড়াম করে মেরে বসলেন মংঘীরামের পেটে।

মংঘীরাম লাথি খেয়ে একবার 'ঘ্যাক্' করে মুখ দিয়ে এক বিটকেল শব্দ বার করে বসে পড়লেন।

পুলিশ অফিসার বললেন, তোমার হয়তো জানা নেই বাবা নাদুসরাম, যে...

জি ম্যায় নাদুসরাম নেহি। মংঘীরাম।

তুমি নাদুসরামই। তোমার হয়তো জানা নেই যে ওই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এবং আরও অন্যান্য অনেকগুলি অভিযোগে এখানকার এস পি সাহেব হঠাৎ বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় এখন এসেছেন হুকুমত সিং। তোমার সম্বন্ধে সব কিছুই তিনি শুনেছেন। এমন সময় টেলিফোনে চোরের ওপর বাটপাড়ি হচ্ছে খবর শুনে আমি লোকজন নিয়ে তৈরি হয়ে ছুটে এসেছি। এস পি সাহেবের আদেশ, আমি এখান থেকে ফিরে যাবার সময় যেন তোমার গায়ের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাই। সেটা কীভাবে নিলে তোমার সুবিধে হয় চট করে বলে ফেলো দেখি?

মংঘীরাম থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

তোমার গোডাউন কোথায়?

আমার কোথাও কিছু নেই স্যার। যা কুছু সব এইখানেই আছে।

মিথ্যে কথা।

হুজুর! মংঘীরাম ধার্মিক লোক। মিথ্যা কোথা বোলে না, মিথ্যা কোথা বললে পাপ হয়।

পুলিশ অফিসার এবার মংঘীরামের পায়ের গাঁটে এক ঘা রুলের বাড়ি বসিয়ে দিতেই 'ভ্যা ভ্যা' করে চেঁচাতে লাগলেন মংঘীরাম।

আর এক ঘা দেব?

নেহি। ম্যায় সব কুছ বাতাতা হুঁ। ও নদীকা কিনার মে হামারা এক টিম্বারকা গোডাউন হ্যায়। ব্যস। আউর কুছ নেহি।

পুলিশ অফিসার বললেন, ওখানেও রেড হবে আজ। তারপর এস পি সাহেবের নির্দেশমতো ব্যবস্থা হবে তোমার।

কনস্টেবলরা বলল, একে এখন কোথায় নিয়ে যাব স্যার?

কোথাও না। এইখানেই বেঁধে ফেলে রেখে দাও। আগে ওর বাড়ির ভেতরটা সার্চ করি, পরে ওর ব্যবস্থা হবে।

পুলিশ অফিসার এবার মংঘীরামের বাড়ির বউ-ছেলেমেয়ে চাকরবাকর প্রত্যেককেই পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে সকলকে এক ঘরে পুলিশপাহারায় রেখে বাড়ি সার্চ করতে লাগলেন লোকজন নিয়ে।

দোতলায় একটি ঘরের ভেতর মেঝেময় ছড়ানো একশো টাকার নোটের বান্ডিলগুলো দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, এত টাকা। এগুলো জাল নোট নয় তো?

নোটগুলো বান্ডিল বেঁধে রেখে একতাড়া নোট স্যাম্পেল হিসেবে নিয়ে রঞ্জনের কাছে এলেন। বললেন, এবার বলো তো বাবা তুমি এখানে কীভাবে এলে?

রঞ্জন তখন ট্রেন দুর্ঘটনার রাতের ঘটনা থেকে এক এক করে সব কিছু খুলে বলল পুলিশকে। তারপর বলল, আপনারা যেভাবেই হোক রক্ষা করুন শবনমকে। ওই শয়তান দস্যুটাকে মেরে শবনমকে সুপথে ফিরিয়ে আনুন। না হলে মেয়েটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ওর দায়িত্ব আমি নেব। ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।

তোমার কি ধারণা মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে?

ওর মধ্যে এক অলৌকিক শক্তি ভর করেছে। ওর কোনও ক্ষতি কেউ করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবুও বিশ্বাস তো নেই।

তোমাকে ওরা এখানে নিয়ে এল কী করে?

ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঝোপড়ির ঘরে শুয়ে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ দেখি চারিদিকে আগুন আগুন চিৎকার। আর তারই সঙ্গে দেখতে পাই ঘোড়ায় চড়া কয়েকটা ডাকাত চারদিকময় ছুটোছুটি করছে।

তারপর?

আমি তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম, কী যে করব, কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম এই সময় বোকার মতো এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে যদি ডাকাতদের

নজরে পড়ে যাই তো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওরা। তাই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালাতে গেলাম। হিংলাজসর্দারের একটা কুকুর ছিল। সেটা আমার পাশেই শুয়েছিল। আমাকে পাহারা দেবে বলে। ওই কুকুরটাকে নিয়েই পালাতে গেলাম। হঠাৎ অন্ধকারে দু'তিনজন লোক আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে তুলে নিয়ে চলে এল।

এই লোকগুলো মংঘীরামের?

হ্যাঁ। আসলে মংঘীরামের নির্দেশমতো লোকগুলো আমাদের দু'জনের ওপর আক্রমণের জন্যই আসছিল। কেন না শবনমের জন্য ওর এতদিনের ঠগবাজির ব্যবসা নষ্ট হতে বসেছিল প্রায়। তাই ও চেয়েছিল আমাদের দু'জনকে ওর কয়েদখানায় পুরে পয়েজন করে মেরে ফেলতে। কিন্তু আমরা যে সদাসতর্ক ছিলাম, তা বুঝতে পেরেই ওরা প্রকাশ্য বিদ্রোহে না এসে অপেক্ষা করছিল গভীর রাতের অন্যমনস্কতার। এমন সময় লালচাঁদের আবির্ভাব, শবনমের কেল্লা অভিযান এবং ওই অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড, তদুপরি আমার আত্মরক্ষার্থে পলায়ন ওদের কাছে একটা লোভনীয় সুযোগ হয়ে দেখা দেয়।

তোমাকে ওরা মারধোর করেনি?

না। শুধু বলেছিল শবনমকে নিয়ে আসার পর আমাদের দু'জনকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

পুলিশ অফিসার দাঁতে দাঁত চেপে ভয়ংকর রেগে বললেন, তাই নাকি?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। আজ তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো। ওখানে রাতটুকু খেয়ে ঘুমিয়ে আরামে কাটাতে পারবে। তারপর কাল সকালে আমি এস পি সাহেবকে সঙ্গে নিয়েই ওই কেল্লা-পাহাড়ে অভিযান করব।

কিন্তু তাতে যে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এছাড়া তো উপায় নেই বাবা।

কেন উপায় নেই?

এই রাতদুপুরে ঘন অন্ধকারে কেল্লা-পাহাড়ে উঠব কী করে? পথঘাট চিনি না কিছু।

আমি চিনিয়ে নিয়ে যাব।

তুমিও চিনতে পারবে না। এই অন্ধকারে এক হাত দূরের দৃশ্য দেখা যায় না।

বাঃ রে। আপনাদের তো টর্চ আছে!

তা আছে। তবুও ওই পাহাড়ে যেতে গেলে এই ক'টা লোক নিয়ে হবে না। আরও অন্তত দু' ব্যাটেলিয়ান লোক চাই। প্রয়োজন হলে ওই কেল্লাটাকে আমরা উড়িয়ে দেব।

কিন্তু ততক্ষণে শবনমকে কি উদ্ধার করা যাবে?

না। ওর ভেতরে সত্যিই যদি কোনও অলৌকিক কিছু ভর করে থাকে তা হলে ওর কোনও ক্ষতিই হবে না। যদি তা না হয়ে থাকে, তা হলে কেল্লায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ও শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমাদের এখুনি একবার হেড কোয়ার্টারে খবর দিয়ে মংঘীরামের গোডাউনটা রেড করা দরকার। এদিকে বিলম্ব করলে ওর লোকেরা তৎপর হয়ে মালপত্তর সব হাপিস করে দেবে। কিন্তু হিন্দোলকেল্লার গুপ্তধন নষ্ট হবে না বা ওর ভেতর বসবাসকারীরা নিজেরাও পালাতে অথবা মালপত্তর সরাতে পারবে না। তার কারণ ওখানে তোমার শবনম আছে। লালচাঁদ আছেন। তুমি অযথা ভয় পেয়ো না।

ভয় পাচ্ছি তো আমি অন্য কারণে। ওরা ওইভাবে হিন্দোলকেল্লা আক্রমণ করার পরই দস্যুরা এসে বস্তিতে আগুন ধরাল কী করে? তার মানে নিশ্চয়ই লালচাঁদ হার মেনেছেন। নিশ্চয়ই শবনমের ক্ষতি হয়েছে।

তোমার এই সন্দেহটা অবশ্য অমূলক নয়। ঠিক আছে। তুমি চিন্তা কোরো না। আমি এস পি সাহেবের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে তাঁর মতামতটা নিচ্ছি। ততক্ষণ তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো। যাও। বলে একজন লোককে বললেন, কোথাও থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে রঞ্জনকে ওনার বাসায় পৌঁছে দিতে।

লোকটি রঞ্জনের হাত ধরে বলল, এসো।

রঞ্জন বলল, আমার এখন কোথাও যেতে ভাল লাগছে না। আমি আপনাদের সঙ্গেই যাব। কেন না আমার মনে যে দুশ্চিন্তা রয়েছে তাতে কিছুতেই শুয়ে ঘুমোতে পারব না আমি।

তা হোক। তবু যাও।

অগত্যা যেতেই হল। কিছু দূর যাবার পর একটি বাড়িতে এসে পুলিশের লোকটি দরজায় নক করতেই একজন লোক বেরিয়ে এল, কী ব্যাপার! এত রাত্রে?

আপনার বাইকটা একবার দেবেন? ওই ছেলেটাকে বড়বাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

ঠিক আছে দাঁড়াও একটু। চাবিটা নিয়ে আসি। বলে লোকটি চাবি এনে দালানে রাখা বাইকটা বার করে বলল, ছেলেটাকে পেলে কোথায়?

মংঘীরামের বাড়িতে।

ও আবার ছেলেচুরির কারবারেও নেমেছে নাকি?

ছেলেমেয়ে সবই চুরি করছে। তবে আজ ওর বাড়ি রেড করে একেবারে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছেন বড়বাবু।। কয়েক বস্তা জাল নোট পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

বলো কী? কিন্তু ধরলে কী হবে? ধরে রাখতে পারবে ওকে? ও তো ঠিক টাকার বান্ডিল দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

এবার আর ওটি হচ্ছে না। ওস্তাদের মার শেষরাতে জানেন তো? আগের এস পি হঠাৎ বদলি।

যাই হোক। রঞ্জনকে বাইকের পিছন দিকে বসিয়ে লোকটি রাতের অন্ধকারে অনেক দূর গিয়ে একটি বাড়ির কাছে এসে হর্ন বাজাল। তারপর বাইক থেকে নেমে দরজায় কলিং বেল টিপতেই ভেতর থেকে সুরেলা গলায় সাড়া এল।

কে?

আমি দুলাল। বড়বাবু একটি ছেলেকে পাঠিয়েছেন। ও আজকের রাতটা এখানে থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। একজন সুন্দরী মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। তারপর রঞ্জনকে দেখে স্মিত হেসে বললেন, এসো ভাই, ভেতরে এসো।

রঞ্জন ভেতরে ঢুকলে, লোকটিও আবার চলে গেল বাইক নিয়ে।

পুলিশ অফিসারের স্ত্রী সেই সুন্দরী মহিলা বললেন, কী নাম তোমার?

আমার নাম রঞ্জন।

বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

এই রাতদুপুরে কোত্থেকে এলে? কিছু খাওয়াদাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই?

না। সারাদিন কিছু খাইনি। বড্ড খিদে পেয়েছে। যদি কিছু থাকে তো দিতে পারেন।

মহিলা মধুর হেসে বললেন, দুষ্টু ছেলে। যদি কিছু থাকে মানে? যাও। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসো। আমি তোমার খাবার তৈরি করে দিচ্ছি।

রঞ্জন বাথরুমে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে আসতেই দেখল মায়ের মতো স্নেহময়ী সেই মহিলা ততক্ষণে আটা মেখে গ্যাসের উনুনে পরোটা ভাজার আয়োজন করছেন। রঞ্জন আসতেই বললেন, কই বলো দেখি তোমার কথা, গল্পও শুনি কাজও করি।

রঞ্জন তখন এক এক করে সব বলল।

সব শুনে মহিলা বললেন, ওমা! কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড। জানি না বাবা পুলিশের ব্যাপার স্যাপার। কয়েকটি লোককে তোমার সঙ্গে দিয়ে আজ রাত্রেই তোমাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারত।

উনিও ইচ্ছে করলে যেতে পারতেন।

হয়তো অসুবিধে ছিল। তার কারণ ওই পাহাড়-জঙ্গলে গাড়ি তো ঢুকবে না। তা ছাড়া ডাকাতরা অতর্কিতে যদি আক্রমণ চালায় আর তাতে যদি কোনও

ক্ষয়-ক্ষতি হয় বা প্রাণহানি ঘটে সে কৈফিয়ত দিতে হবে ওনাকেই। কেন না কেল্লা-অভিযানের কাজে উনি যাননি। উনি গেছেন মংঘীরামজির বাড়ি রেড করতে।

রঞ্জন বলল, এখন ধরুন মংঘীরামের বাড়িতে যে ডাকাতরা এসেছিল তাদেরই কারও পিছু নেবার দরকার হলে পুলিশকে তো জঙ্গলে ঢুকতেই হত।

তা হত বইকী। তবে পুলিশের চাকরির মজাটা এই যে পুলিশকে দুঃসাহসও যেমনি দেখাতে হয়, তেমনি ক্ষয়-ক্ষতির দিকেও নজর রাখতে হয়। হিন্দোলকেল্লার ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইতে আরও শক্তিশালী পুলিশবাহিনীর দরকার। তা ছাড়া ওই ধরনের কাজের ঝুঁকি একা একা নিজের থেকেও নেওয়া যায় না। এস পি সাহেবের অনুমতির দরকার। এস পি সাহেব যদি বলেন তা হলে কি-বা দিন, কি-বা রাত। যখন ইচ্ছে যাওয়া যেতে পারে। যাক। আর একটু সময় অপেক্ষা করো। এখনই তো রাত বারোটা। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে যাবে।

রঞ্জনের ঘুম আসছে না। মনের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। তবু শুনতেই হল। একে অন্ধকার রাত, তায় গভীর জঙ্গল। তাকে অতিক্রম করে পালিয়েও যেতে পারবে না ও। অবশ্য পালাবার সুযোগ পেলেও যাবে না। কেন না ওই শ্বাপদসংকুল অরণ্যে ওই কাজ করতে গেলে হয় বাঘের পেটে যেতে হবে, নয়তো ভালুকের আঁচড় খেয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

রঞ্জন তাই এই গভীর রাতের সুখশয্যায় শুয়ে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় প্রহর গুণতে লাগল। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়। কিছু সময়ের মধ্যেই বড়বাবু ফিরে এলেন।

দরজায় কলিংবেল বাজতেই সেই মাতৃপ্রতিম মহিলা গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

রঞ্জনও উঠে গেল।

তরুণ পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে ঘরে এসে এক গ্লাস জল খেয়ে বললেন, ভয় নেই রঞ্জনবাবু। তোমাকে অযথা আমি আটকে রাখব না। সকাল হলেই রওনা দেব লোকজন নিয়ে। কেল্লাটাকে যাতে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলা যায় সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি।

মংঘীরামের গোডাউনে কিছু পেলেন?

না। আমি যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যাবার আগেই ওর লোকজনেরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চারদিক থেকে। মংঘীরামকে বেদম পিটিয়েছি। ওর বাড়ির ভেতরেই আমাদের একটা ছোটখাটো ক্যাম্প বসে গেছে। কিছু অপহৃতা মহিলা, জাল নোটের বস্তা, সোনাদানা সব রাখা আছে। আমি এখুনি হেড কোয়ার্টারে চলে যাচ্ছি। আমার ফিরে আসতে সকাল আটটা হয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা করো। আরও পুলিশ, আরও গাড়ি অনেক কিছুরই

প্রয়োজন। এস পি সাহেব নিজেও হয়তো যেতে পারেন। তুমি শুধু আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করো এখানে। কেমন? বলে যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

এরপরে আর কী ঘুম আসে?

ঘড়ির কাঁটায় টং করে রাত একটা বাজল। রঞ্জন বিছানায় শুয়ে আবার সেই নিঃসঙ্গ শয্যায় প্রহর গুণতে লাগল, আর ভাবতে লাগল শবনমের কথা। শুধু যে শবনমের কথা তা নয়। এবার ওর বাড়ির কথা মনে হতে লাগল। মনে হচ্ছে যেন কতদিন বিদেশে আছে ও। মা'র মুখখানি মনে পড়ল। বাবার জন্য মন কেমন করল। ওর সঙ্গে তো ট্রাঙ্ককলে কথা হয়েইছে। তাঁরা নিশ্চিন্তই আছেন। তাঁদের অত্যন্ত আদরের ছেলেটি যে এই অচেনা পরিবেশে ডাকাতপুরীতে পাহাড়-জঙ্গলের দেশে কী জালে জড়িয়েছে তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না।

ছয়

রক্তাক্ত শবনম রাতের অন্ধকারে ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলেছে। রঞ্জনকে উদ্ধার না করেই শবনমের এইভাবে চলে যাবার ইচ্ছেটা ছিল না। কিন্তু ঘটনাটা এমনভাবে মোড় নিল যে না-পালানো ছাড়া উপায়ও ছিল না তখন। কেন না ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সবদিক কেঁচে যাবে। আগে তো প্রতিশোধ, তারপরে পুলিশ। বিশেষ করে একজনের ধরা পড়া মানেই দলকে দল ধরা পড়া। তা ছাড়া শবনম আরও একটা দিক চিন্তা করে দেখল পুলিশ যখন এসেছে, তখন এই শত্রুপুরীতে রঞ্জন যদিও থেকে থাকে, তা হলে ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে।

বিক্রমজিৎ ঘটনাস্থলেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

লালচাঁদ গুরুতর রকমের জখম হয়েছেন। ও নিজেও আহত হয়েছে বেশ ভালরকম। তাই কোনওরকমে মংঘীরামের প্রাসাদ থেকে পালিয়ে সুচিকিৎসার জন্য পাহাড়ের একটি খাদের কাছে আত্মগোপন করল। লালচাঁদও এখানেই যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

ওরা অতি নির্জন এবং নিরাপদ একটি স্থান দেখে সেখানে বসে ক্লান্তি দূর করতে লাগল। লালচাঁদের কয়েকজন লোক চলে গেল লোকালয়ের দিকে। যে ভাবেই হোক একজন ডাক্তারকে ডেকে এনে ওদের শরীর থেকে গুলিগুলো বার করাতে না পারলে, ফল এমনই খারাপ হবে যে, তখন আর কিছুতেই কিছু করা যাবে না।

একজন প্রবীন ডাক্তার এসে শবনমের ক্ষতস্থান দেখলেন। তারপর অভ্যস্থ হতে শুরু করলেন কাজ। দুটি গুলির টুকরো বিঁধেছিল ভেতরে। সেগুলো বার করে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে একটা ইঞ্জেকশান দিলেন। তারপর লালচাঁদের বুক থেকে বুলেট বার করতে গিয়েই থমকে গেলেন।

শবনম বলল, কী হল?

এনার তো একেবারেই শেষ অবস্থা।

তা হলে?

তা হলে আর কী? দেখি চেষ্টা করে। তবে মনে হয় বাঁচাতে পারব না।

লালচাঁদ বললেন, আমাকে বাঁচতেই হবে ডাক্তার। যে ভাবেই হোক বাঁচান। এখনও আমার অনেক কাজ বাকি।

কী করে বাঁচাব? এসব কাজ কি এইভাবে যেখানেসেখানে হয়? নেহাত তোমাদের ডাকাতের প্রাণ তাই। অন্য কেউ হলে মরেই যেত এতক্ষণ।

মরতে আমিও চাই ডাক্তার। শুধু আজ রাতটুকুর মতো তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দাও।

মরলে তুমি এখুনি মরবে। রাত কাটলে আর তোমাকে মারে কে? দেখি চেষ্টা করে কতদূর কী করতে পারি।

ডাক্তারের কাজ শেষ হলে শবনম বলল, আমরা এই মুহূর্তে আপনার পারিশ্রমিক দিতে পারলাম না। তবে আপনার কার্ডটা রেখে যান। আমাদের লোক যথাসময়ে গিয়ে আপনার টাকা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, টাকাই কী জীবনের সব মা? এসব কাজ পুলিশকে লুকিয়ে আমাদের প্রায়ই করতে হয়। তবে একটাই অনুরোধ, কখনও কোনও বিপদে যদি পড়ি, তখন তোমাদের সাহায্য চাইলে একটু পাশে এসে দাঁড়িয়ো।

শবনম বলল, যদি বেঁচে থাকি আর ওইরকম দিন যদি সত্যিই কখনও আসে, তা হলে নিশ্চয়ই আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াব আমরা।

ডাক্তারবাবু চলে গেলন।

লালচাঁদকে বহু কষ্টে ঘোড়ায় বসিয়ে সবাই আবার সেই ঘনান্ধকারে কেল্লা-পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগল।

সাধু ওদের জন্য হানটান করছিলেন এতক্ষণ।

বিক্রমের মৃত্যুর কথা এবং লালচাঁদের গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা শুনে, একদিকে যেমন দুঃখ পেলেন, অপর দিকে তেমনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। এই ক্রোধ অবশ্যই ওই শয়তান দুর্জন সিং-এর ওপর। মংঘীরামের ওপর।

যাই হোক। লালচাঁদকে পাহাড়িদের জিম্মায় রেখে সাধু বললেন, আর দেরি নয়। এই হচ্ছে প্রকৃত শুভক্ষণ। এইবার আমরা গোপন পথে কেল্লার ভেতরে ঢুকব।

হিংলাজসর্দার বলল, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব বাবা। ওই শয়তানের শয়তানির উপযুক্ত জবাব আমিও দিতে চাই।

বাইরে তা হলে নেতৃত্ব দেবে কে?

লালচাঁদ অতিকষ্টে বললেন, বাইরেটা আমিই দেখতে পারব সর্দার। আপনি ভেতরে ঢুকুন। কেল্লা দখল হয়ে গেলেই আলোর সংকেত দেবেন। আমরাও তখন ভেতরে ঢুকব। কিন্তু যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ যে ওই কেল্লার ভেতর থেকে বেরোতে যাবে তাকেই গুলি করে মারব। অতএব সাবধান। সংকেত না দিয়ে কেউ যেন সামনের ফটক দিয়ে বেরোতে যাবেন না।

সাধু শবনমের একটি হাত ধরে টান দিলেন, আয় মা। দেবীর চরণস্পর্শ করানো এই বন্দুক আর একবার দেবীর পদতলে রেখে চল ওই দুষ্টুকে দমন করতে।

সাধুবাবা, শবনম, হিংলাজ এবং লালচাঁদের দলের আরও জনা-চারেক যোদ্ধাকে সঙ্গে নিলেন। এদিকে পাহাড়ি বস্তির সবাই প্রায় তির, কাঁড়, টাঙি, বল্লম, কুড়ুল নিয়ে তৈরি। সবাই যেতে চায় সাধুর সঙ্গে ওই কেল্লার ভেতরে।

সাধু একটু কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, সবাই আয়। তবে এই গোপন পথের সন্ধান কাউকে দিবি না। বিশেষ করে পুলিশকে। আজ রাতেই হোক, আর কাল সকালেই হোক পুলিশ এখানে আসবেই। পুলিশ না যাওয়া পর্যন্ত আমি এই গুহার জঠরে লুকিয়ে থাকব। যদিও পুলিশ আমাকে চিনবে না। কেন না এখনকার নতুন নতুন পুলিশ আমার চেহারাটাই দেখেনি কখনও। তা ছাড়া আমি একজন তান্ত্রিক সাধু, এই হবে আমার পরিচয়। ভয় শুধু লালচাঁদকে নিয়ে।

লালচাঁদ বললেন, ভয় নেই। পুলিশ এলে আমিও গা ঢাকা দেব। আমার লোকেরাও সরে পড়বে। তারপর পুলিশ চলে গেলে সাধারণ মানুষের মতো আমরা আবার এসে জুটে যাব ঠিক। তা ছাড়া আপনার আশীর্বাদে, মা ভবানীর কৃপায়, আমার দুর্বলতা একটু একটু করে কাটছে। মনে হচ্ছে এ যাত্রা হয়তো আমি বেঁচেও যেতে পারি।

মা ভবানী তোমার ভাল করুন। কেল্লাটা দখল করতে পারলে ওর ভেতরে পেট ভরে একটু খাওয়াদাওয়া করতে পারবে। আরামে ঘুমোতে পারবে। প্রয়োজন হলে শহরের হাসপাতাল থেকে কাল সকালে যে কোনও ডাক্তারকে ডেকে এনে তোমার আরও ভাল চিকিৎসা করাতে পারব। ওষুধ-ইঞ্জেকশান দেওয়াতে পারব।

ঠিক আছে সর্দার। এখন মায়ের নাম নিয়ে ঢুকে পড়ুন। আর দেরি করবেন না। রাত বাড়ছে। দেরি হয়ে আসছে ক্রমশ।

সাধু হাত তুলে ইঙ্গিত দিলেন, জয় ভবানী।

সবাই বলল, জয় ভবানী।

ভবানী কসম।

শবনম বলল, আল্লা কসম।

সাধুর হাতে জ্বলন্ত মশাল।

সেই মশালের আলোয় পথ দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সকলে।

ভবানী মূর্তির পিছন দিকের একটি ত্রিকোণাকৃতি অংশের কাছে গিয়ে সাধু কয়েকজনকে বললেন, এইখানে একটু শাবলের চাড় দে তো।

একজন খুব জোরে শাবলের চাড় দিতেই একটা আলকাতরা মাখানো কালো কাঠের দেওয়াল সরে গেল। পাটাতনের ওপাশে কিছু ভারী পাথর থাকে থাকে সাজানো। এবার সবাই মিলে সেই পাথরগুলো এক এক করে নামাতেই একটি অপরিসর সুড়ঙ্গমুখ নজরে এল।

সাধু একজনের হাতে মশালটা দিয়ে সঙ্গে আনা রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরলেন। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। এক জায়গায় গিয়ে হাতের ইঙ্গিতে সকলকে থামতে বললেন। তারপর নিঃশব্দে পাথরের দেওয়ালে গা ঘেঁষে একটু একটু করে এগোতে লাগলেন। কিছুটা পথ যাবার পরই পৌঁছে গেলেন সঠিক জায়গায়। দু'জন লোক যেখানে বসে দুর্গের বাইরের দিকে নজরদারি করছিল এবং ধারে কাছে কেউ এলে তাকে গুলি করবার জন্য অপেক্ষা করছিল, ঠিক সেইখানে।

এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারণ যে, লোকদুটি টেরই পেল না কী চতুর পদক্ষেপে মর্মান্তিক মৃত্যু ধীরে ধীরে তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সাধুর দু'চোখে এখন প্রতিহিংসার আগুন। এই গুহার জঠরে পা দেওয়া মাত্রই তাঁর পূর্ব স্মৃতি যেন আবার ফিরে এল। সেই দস্যুসর্দারের মেজাজ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাঁর দেহমনকে। তিনি আবার সেই বিশ বছর আগের হিন্দোলসর্দার হয়ে উঠলেন। বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে একবার শুধু বলে উঠলেন, জয় ভবানী।

ডাকাত দুটি নিদারুণ ভয়ে চমকে উঠে ফিরে তাকাতেই সুনিপুণভাবে ট্রিগার টিপলেন, ডিস্যুম, ডিস্যুম।

দু'দুটো প্রাণ লুটিয়ে পড়ে কবুতরের মতন ছটফট করতে লাগল।

ওদের বুকের রক্তে তিলক কেটে ইঙ্গিতে সবাইকে চলে আসতে বললেন। বিনা যুদ্ধে আসল জায়গাটাই কবজা হয়ে গেছে। কেল্লা এখন হাতের মুঠোয়। সাধুর ডাক শুনে হই হই করে ছুটে এল সবাই।

একজনের হাত থেকে মশালটা টেনে নিয়েই একেবারে বুরুজের মাথায় উঠে গেলেন সাধু। তারপর ঘন ঘন মশাল আন্দোলন করে চেঁচাতে লাগলেন, এসো,

এসো, সবাই চলে এসো ভেতরে। এবার শুধু দেখো আর মারো।

সাধুর ইঙ্গিত পেয়েই লালচাঁদ তার দলবল নিয়ে কেল্লার মুখে ছুটে এলেন। বিশাল তোরণ ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তাই ঘন ঘন দরজায় লাথি আর ধাক্কা দিতে লাগল।

সাধু ওপর থেকে নেমে এসে ফটকের দরজাটা খুলে দিতে বললেন সকলকে।

হিংলাজসর্দার নিজে গেলেন দরজা খুলতে। কিন্তু দরজার মুখেই বাধা। যমের মতন দু'জন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংলাজের ওপর।

সাধু চেঁচিয়ে উঠলেন, খবরদার। যানে দো উসকো।

লোকদুটি সাধুর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। একজন বলল, আপ— কৌন হ্যায়?

তোদের বাবা। এই কণ্ঠস্বর তোরা অনেকদিন শুনতে পাসনি নারে?

স—স—সর্দার! আপ জিন্দা হ্যায়?

হ্যাঁ। আমি জিন্দা আছি। কিন্তু তোমরা এবার মরবার জন্য তৈরি হও।

শবনম বন্দুক উঁচিয়েছিল।

সাধু বললেন, না। ওভাবে নয়। টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলো ওদের। কেউ গিয়ে দরজাটা খুলে দাও। লালচাঁদ ভেতরে ঢুকুক। ওর লোকজন বাইরে অপেক্ষা করছে।

নির্দেশ পাওয়া মাত্রই হিংলাজের লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই লোকদুটির ওপর। টাঙ্গির কোপে কচুকাটা করে ফেলল আক্রমণকারীদের। ফটকের দরজায় খিল খুলে দিতেই লালচাঁদ তাঁর দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তারপর হই হই করে ছুটে চললেন সামনের দিকে।

লালচাঁদের এসবই তো পরিচিত। হিন্দোলসর্দারের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র ছিলেন তিনি। কিন্তু ভবিতব্য এবং দুর্জনের বিশ্বাসঘাতকতায় দীর্ঘ কুড়িটা বছর এই কেল্লার মসনদ থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল। লালচাঁদ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললেন। তিনি যে আহত। তাঁর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন তা তিনি মনেই করলেন না।

ওরা দলবল সমেত যেই কেল্লার মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে অমনি দেখল চারদিক থেকে দুর্জন সিং-এর লোকেরা ঘিরে ফেলল ওদের।

লালচাঁদের লোকেরাও তো নিরস্ত্র নয়। তাই বন্দুক উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল।

শত্রুপক্ষের হাতেহাতে মেশিনগান। তারা এমনই মরিয়া যে লালচাঁদের লোকেদের আক্রমণ করবার কোনওরকম সুযোগ না দিয়েই শুরু করে দিল— ট্রা-রা-রা-রা-রা।

লালচাঁদ মাঝামাঝি জায়গায় ছিলেন। তাই কোনওরকমে বসে পড়ে প্রাণ

বাঁচালেন। কিন্তু তাঁর দলের লোকেদের দু'-তিনজন একেবারে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়ল।

শত্রুপক্ষের লোকও মরল বইকী।

একজন ছাড়া প্রায় সবাই শেষ।

যে একজন বেঁচে ছিল, শবনমের গুলিতেও সেও লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু আসল মাল কোথায়? সেই দুর্জন সিং?

সাধু চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় গেল সেই শয়তান কুত্তাটা। বেরিয়ে আয় আমার সামনে। বেরো বলছি।

কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

সাধু বললেন, শোনো তোমরা! এই কেল্লার ভেতরে যেদিকে এতটুকু ফাঁক পাবে সে দিকেই ঢুকে পড়ো সবাই। চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো কে কোথায় আছে। বুরুজের মাথায় উঠে যাও কয়েকজন। এখনও নিশ্চিন্ত হবার কোনও কারণ নেই। ওই শয়তান দুর্জন সিং আড়াল থেকে লুকিয়েও আক্রমণ করতে পারে।

এমন সময় হিংলাজসর্দার ছুটে এসে বলল, সাধুজি! একটা জেলখানার মতো ঘরে কতকগুলো মেয়েকে আটকে রেখেছে ওরা। আমার মেয়েটাকেও বোধহয় ওইখানেই রেখেছিল।

বার করে আনো।

কিন্তু লোহার গরাদে তালা দেওয়া।

ভাঙতে পারলে না? ভাঙো।

আমার লোকেরা তালা ভাঙার কাজে লেগে গেছে বাবা।

আর একজন ছুটে এসে বলল, আমরা এইমাত্র দুটো ছেলেকে মুক্ত করে আনলাম।

ওদের তোমাদের জিম্মায় রাখো। আর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো দুর্জন সিং লুকল কোথায়? ওকে খুঁজে বার করতেই হবে।

যে ঘরে বন্দিনী মেয়েদের আটকে রেখেছিল দুর্জন সিং-এর লোকেরা, শবনম সেই ঘরের দিকে গেল।

মেয়েরা ভেতর থেকে চিৎকার করছে, আমাদের মুক্তি দিন। আমাদের বাঁচান।

শবনম বলল, আমার মা-ভগিনীরা। আপনাদের কোনও ভয় নেই। এই কেল্লা আমরা দখল করেছি। এখন আপনারা মুক্ত। আমরা আপনাদের প্রত্যেককে যার যার ঠিকানায় পৌঁছে দেব।

বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় তালা ভাঙা হতেই মেয়েরা বেরিয়ে পড়ল।

এমন সময় হঠাৎ এক পৈশাচিক উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল হিংলাজসর্দার, পেয়েছি পেয়েছি। শয়তানের বাচ্চাটাকে পেয়েছি।

সাধুবাবা ছুটে এলেন, কাকে পেয়েছ হিংলাজ?

এই দেখুন!

বিশ্বাসঘাতক কোথায় লুকিয়েছিল এতক্ষণ?

হিংলাজ বলল, এই চৌবাচ্চাটার ভেতর। আমি চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখি চৌবাচ্চার মাথায় একটা কাঠের তক্তা ঢাকা দেওয়া আছে। দেখেই সন্দেহ হল। যেই না ঢাকাটা সরিয়েছি অমনি শয়তানটা বন্দুক উঠিয়েছে। মারলুম মুখে এক ঘুসি।

আর মেরো না। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।

না। ওর জন্যে আমার মেয়েটা আত্মঘাতী হয়েছে। ওকে আমি ছাড়ব না। আমি নিজের হাতে ওর গলার টুঁটি ছিঁড়ব।

ও কাজটা আমাকে করতে দাও হিংলাজ।

দুর্জন সিং ভয়ে থর থর করে কাঁপছে তখন। তার আর পালাবার পথ নেই। চারদিক থেকে সবাই ছেঁকে ধরেছে ওকে।

সাধু বজ্র নির্ঘোষে বললেন, মাথার ওপর হাত ওঠাও দুর্জন। অদ্যই তোমার শেষ রজনী। কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি শুধু নিজের প্রিয় মুখগুলিকে একবার চিন্তা করে নাও। তারপর তোমাকে আমি একটু একটু করে মৃত্যুর দরজায় ঠেলে দেব। তার আগে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ আমায় তুমি চিনতে পারো কি না?

দুর্জন একবার তাকিয়ে দেখেই বলল, সর্দার তুম!

হ্যাঁ আমি।

তুম আভি তক জিন্দা হ্যায়?

না। আমি মরে গেছি। এটা আমার প্রেতাত্মা। তোমার সঙ্গে জীবনের শেষ দেখা করতে এসেছি আমি ছোরা, টাঙ্গি আর বন্দুকের গুলি নিয়ে। বলো এর মধ্যে কোনটা তোমার পছন্দ?

দুর্জন কাঁপতে কাঁপতে বলল, এর কোনওটাই আমার পছন্দ নয়। তুমি আমাকে আর একবার— জীবনের শেষবার, তোমার সঙ্গে দোস্তি করবার সুযোগ দাও সর্দার।

লালচাঁদও তখন দুর্জনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, তোমার সঙ্গে দোস্তি করলে আমি আমার বউ-ছেলেকে ফিরে পাব?

দুর্জন শিউরে উঠল লালচাঁদকে দেখে।

লালচাঁদ দুটো পেরেক দু'হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন ওর হিংস্র চোখদুটোর দিকে।

দুর্জন চিৎকার করে উঠল, নেহি। নেহি। নেহি।

বল শয়তান, কীসের লোভে আমার ছেলেটাকে গুলি করে মারলি? কেন আমাদের অমন সর্বনাশ করলি? আমার বউকে খুঁজে পেলাম না কেন? কেন তুই সর্দারের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করলি? বল, বল, কেন করতে গেলি ওইরকম বেইমানি?

ম্যায় তুমহারা গোড় পাকড়তি হুঁ। মুঝে মাফ করো লালচাঁদ। এ সাজা মুঝে মাত দো।

সাধু তখন সাধু নয়। আবার হিন্দোলসর্দার। বহুদিনের অভ্যস্ত পায়ে এক লাথি মারলেন দুর্জনকে। সে লাথি হজম করার শক্তি দুর্জন সিং-এর নেই। তাই দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

ততক্ষণে হিংলাজসর্দার আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুর্জনের ওপর।

ওদিক থেকে শবনমও ছুটে এসেছে তখন, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও সর্দার। আমি যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি ওকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবার।

সাধু সাবধান করলেন। লালচাঁদও বাধা দিলেন।

সেই সুযোগে শয়তান আবার নিজমূর্তি ধরল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই এলোপাথাড়ি গুলি করতে লাগল চারদিকে। দু'-চারজন পাহাড়িয়া গুলি খেয়ে ছটফট করতে লাগল। তারপরই সব শেষ! গুলিও শেষ। আর যেই না শেষ হওয়া, অমনি প্রাণভয়ে ফটকের দিকে দৌড়ল দুর্জন।

শবনম ওকে ভয়ংকরভাবে তাড়া করে চলল, পালাবি কোথায় শয়তান? আজ আমার হাতেই তোর মরণ। জয় মা ভবানী।

দুর্জন তখন কেল্লার বাইরে। শবনমও বেরিয়ে এসেছে। কেল্লার ভেতরে থাকায় বুঝতেই পারেনি কেউ, কখন যে এক সময় ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

শবনমকে একা পেয়ে রুখে দাঁড়াল দুর্জন।

আর শবনম তখন সেই অভিশপ্ত বন্দুকের গুলিতে ঝাঁজরা করে দিল দুর্জনের দেহটা। গুলির পর গুলির আঘাতে দুর্জনের দেহটা ছিটকে পড়ল পাথরের বুকে। একবার শুধু থর থর করে কেঁপে উঠল দেহটা। তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল।

ক্লান্ত শবনম তখন সেইখানেই বসে পড়েছে। আঃ কী দারুণ শান্তি। ভোরের বার্তা নিয়ে প্রকৃতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তার আপন বৈচিত্র্যে।

সাধু এসে শবনমের মাথায় হাত রাখলেন।

শবনম ডাকল, বাবা!

মা!

আপনি এবার আত্মগোপন করুন।

কেন রে পাগলি? আমি চোর না ডাকাত? এখন আমি মা ভবানীর উপাসক। আমার অতীতও নেই। ভবিষ্যৎও নেই। আছে শুধু বর্তমান। আমার আসল পরিচয়টা কাউকে দিস না। তা হলেই হবে।

সাধু ও শবনমের কাছে লালচাঁদও এসে দাঁড়ালেন।

সাধু বললেন, ওদিককার কাজ কতদূর?

হিংলাজের লোকেরা ধোয়ামোছার কাজে লেগে গেছে। ডেড বডিগুলোকেও বুরুজের মাথা থেকে ফেলে দিচ্ছে নীচের খাদে।

বারুদ বন্দুক বা অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু আছে, কেল্লার বাইরে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে সব লুকিয়ে ফেলো।

লালচাঁদ চলে গেলেন।

এমন সময় বহু দুর থেকে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরটি আবার শোনা গেল শ—ব—ন—ম!

কে! কে ডাকে! রঞ্জন! রঞ্জন তুমি কোথায়?

এই তো আমি এখানে।

কী আশ্চর্য! তুমি ওখানে গেলে কী করে?

আমি পথ ভুল করেছি শবনম। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমার কাছে চলে এসেছি। আমার সামনে গভীর খাদ।

তুমি ওইখানেই থাকো। যেন লাফিয়ে আসতে যেয়ো না। পড়ে যাবে। আমি হিংলাজসর্দারকে পাঠাচ্ছি। তোমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসবে। একটু অপেক্ষা করো তুমি।

রঞ্জন বলল, মায়ের নাম নিয়ে একটা লাফ দেব?

শবনম তখন খাদের কাছাকাছি চলে গেছে। বলল, খবরদার ওই কাজ করতে যেয়ো না। অযথা জীবনের ঝুঁকি কেন নেবে?

কিন্তু দুরন্ত দুর্বার দামাল কিশোর কি পিছিয়ে থাকতে পারে? হঠাৎ একটু পিছিয়ে গিয়ে ছুটে এসে মারল এক লাফ।

শবনম কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রঞ্জনকে। ওর গায়েমাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তুমি ভাল আছ তো?

আমি ভাল আছি। তোমার কাঁধে ব্যান্ডেজ কেন?

ও কিছু নয়। একটা গুলি লেগেছিল। কিন্তু এই বিপজ্জনক পথে একা তুমি কীভাবে এলে?

সে অনেক কথা। পরে বলব খন। এক পুলিশ অফিসারের ঘরে রাত্রিতে ছিলাম! শেষরাতে তোমার কথা ভেবে ভেবে আর থাকতে পারলাম না! কাউকে কিছু না জানিয়েই পালিয়ে এসেছি।

এটা তুমি খুবই অন্যায় করেছ রঞ্জন। কী ভাববেন বল তো তাঁরা। তা ছাড়া এই বন্দুক তুমি পেলে কোথায়?

পথে আসতে আসতে কুড়িয়ে পেয়েছি।

বন্দুক কী করে চালাতে হয় তাই জানো না, অথচ বন্দুক ঘাড়ে নিয়েছ দুষ্টু কোথাকার।

রঞ্জনকে দেখে সাধুবাবাও এগিয়ে এলেন।

শবনম বলল, বাবা এই সেই। আমার রঞ্জন।

বাঃ ভারী সুন্দর। তোমরা যে দেখছি একেবারে মাণিক-জোড়!

ওকে যে আবার ফিরে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বাবা।

রঞ্জন বলল, আমাদের কেল্লাঅভিযান হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। যার নামে এই কেল্লা ইনিই তিনি। হিন্দোলসর্দার।

সে কী! ইনি তো একজন সাধুবাবা।

এঁর পরিচয় পরে দেব তোমাকে। পুলিশের ঝামেলাটা আগে চুকে যাক। তবে একটু জেনে রেখো আসল শয়তানকে আমি নিজেহাতে গুলি করে মেরেছি।

এমন সময় হিংলাজসর্দার এসে রঞ্জনকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল, এই তো খোকাবাবু এসে গেছেন দেখছি। আসুন ভেতরে আসুন। মুখহাত ধুয়ে গরম গরম হালুয়া-পুরি খেয়ে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নিন।

সাধু বললেন, ঠিক বলেছ। এইবার শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করার দরকার। চলো ভেতরে চলো।

ওরা যখন কেল্লার ভেতরে ঢুকল তখন পুবের পাহাড়গুলোর চূড়া ডিঙিয়ে সোনার বরণ তরুণ তপন রাঙামুখে উদয় হচ্ছে।

ভবানী মন্দিরে আজ জোর পুজোর আয়োজন। আজকের এই পরিবেশ দেখলে কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে এখানে একটা ডাকাতের ঘাঁটি ছিল বা এরাও মোস্ট ডেঞ্জারাস বলে। চারদিকে শুধুই পুজো পুজো গন্ধ। বন্দিনী মেয়েরা সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শবনমের সাথে এক যোগে কাজে লেগেছে। সাধু একজন লোককে নীচে পাঠিয়ে কিছু নতুন বস্ত্র কিনে আনিয়েছেন। শবনমও ওর ডাকাতরানির পোশাক ত্যাগ করেছে। সাবান মেখে ঝরনার জলে স্নান করে রঙিন একটি ডুরে শাড়ি পরে প্রজাপতির মতো যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। ওর চেয়ে সুখী বোধহয় আর কেউ নেই।

রঞ্জনও শবনমের পরিবর্তনে অভিভূত। এই না হলে মেয়ে। কী ভাল যে লাগছে শবনমকে। এমন সুন্দর মেয়েটি কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ফুলনদেবী হয়ে বসে রইল। এর চোখে গভীর প্রশান্তির কোলে ওই হত্যার ঝিলিক একেবারেই অসহ্য।

আজ শুধু দেবীর গলায় নয়। সবার গলাতেই ফুলের মালা। রক্তচন্দনের টিপ। ভবানীমন্দিরের গুহার জঠরে শুধু ধূপধুনোর গন্ধ। কাটা ফলের সুবাস। হিন্দোলকেল্লার চূড়ায় আজ পত পত করে উড়ছে হলুদে ছোবানো পতাকা।

কেল্লার ভেতর থেকে বড় বড় হাঁড়ি-কড়া ইত্যাদি এনে বাইরে ভিয়েন বসানো হয়েছে। বড় বড় কড়াইতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে।

এরই মধ্যে সাধুর নির্দেশে কেল্লার ভেতরে গুপ্তকক্ষগুলিতে যাবার পথগুলো পাথর সাজিয়ে রুদ্ধ করে দিয়েছে সকলে। হিংলাজসর্দারের লোকেরা লালচাঁদের লোকেদের নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে এই কাজ করেছে। লালচাঁদের লোক অবশ্য দু'-চার জন। ওদের লোকই বেশি। এমনভাবে পথ রোধ করেছে যাতে অচেনা কেউ এর ভেতরে ঢুকলে ওদিকে যে যাবার রাস্তা আছে তা বুঝতে না পারে।

বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ পুলিশ এল।

তরুণ পুলিশ অফিসার এসেই রঞ্জনকে বকাবকি করলেন, কী হে ছোকরা! তুমি যে ওইভাবে পালিয়ে এলে, তোমার সাহস তো কম নয়? আর একটু তর সইল না তোমার? এই জঙ্গলের পথে একা একা চলে এলে ভয় করল না? আমি তো ভাবলাম নিয়তি তোমাকে ডেকেছে। নির্ঘাত তুমি বাঘের পেটে গেছ।

রঞ্জন বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কিছুতেই থাকতে পারছিলাম না। জানি খুবই অন্যায় করেছি। তা আমাদের এস পি সাহেব কোথায়? তাঁকে দেখছি না কেন? ওঁর তো আসবার কথা ছিল।

উনি হঠাৎ একটা অন্য কাজে আটকে পড়েছেন। তবে ওনার ইচ্ছে যে আমি তোমাদের দু'জনকে নিয়ে একবার ওনার বাসাতে যাই। বলে তাঁর লোকেদের বললেন, এই হাঁ করে সব দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কেল্লাটাকে ঘিরে ফেল।

এই কথা শুনে এক ডিশ পুজোর প্রসাদ নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে শবনম বলল, তার আর প্রয়োজন হবে না। এখন এগুলো খেয়ে নিন দেখি।

তরুণ অফিসার মুগ্ধ হয়ে গেলেন শবনমকে দেখে। বললেন, তুমি কে মা? নিশ্চয়ই আমাদের নতুন ডাকাতরানি শবনমদেবী?

সাধু নিজে এবার এগিয়ে এসে বললেন, না। শুধু দেবী।

তরুণ অফিসার এগিয়ে এসে সাধুকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, আপনি কে বাবা?

আমি এক ভবঘুরে সন্ন্যাসী। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে দেখি হঠাৎ এক কাণ্ড। তা এই সব পাহাড়ি লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে বহু কষ্টে মেরেধরে তাড়িয়েছি দুর্বৃত্তগুলোকে। কেল্লা এখন শত্রুমুক্ত। এইসব আদিবাসীরা আশ্রয়হীন হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। আমি ওদের সবাইকেই ঢুকিয়ে দিয়েছি ওই কেল্লার

ভেতর। এখানে এক জায়গায় মা ভবানীর একটি মূর্তিও রয়েছে দেখছি। তাঁরই আরাধনা করছিলাম এতক্ষণ।

আপনার নেতৃত্বই এদের প্রেরণা জুগিয়েছে বাবা। আপনি তা হলে এক কাজ করুন না, এখানেই থেকে যান না বরাবরের জন্য।

এরাও তাই বলছে। আমিও ভাবছি। আমরা দলবদ্ধ হয়ে এখানে বসবাস করলে এই কেল্লা চিরকাল শত্রুমুক্ত থাকবে।

শুধু তাই নয়, এইসব লোকজনগুলোও মানুষ হয়ে যাবে। আপনি থেকে যান। আমিও এই বিদেশে একঘেয়ে দিন কাটাচ্ছি। মাঝেমধ্যে আপনার বউমাকে নিয়ে এখানে বেড়িয়েও যাব। চাই কী কেল্লার ভেতরে থেকেও যাব দু'-একটা দিন।

সাধু বললেন, ভালই হবে।

যাক। পুলিশের দায়িত্ব আপনারাই অনেকটা পালন করে দিয়েছেন। আপনাদের কখনও কোনও অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন। আমি সব রকমের সাহায্য করব। হ্যাঁ, একটা কথা। ওদের ঘাঁটি থেকে কোনও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র কিছু পাননি?

সাধু জানতেন পুলিশ একথা জানতে চাইবে। তাই কিছু অস্ত্র পুলিশকে দেবার জন্য হাতের কাছেই রেখেছিলেন।

পুলিশের লোকেরা সেগুলো গ্রহণ করল।

সাধু বললেন, অনেক অসহায় মেয়ে এখানে বন্দিজীবন কাটাচ্ছিল। তাদের যার যার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে কিন্তু।

মেয়েরা সবাই বলল, না। আজ আমরা কোথাও যাব না। যা হবে কাল। আজ আমরা এখানে মাতৃ-আরাধনা করব।

সাধু বললেন, শবনম তুমি কী করবে? রঞ্জন?

রঞ্জন বলল, এখন এখান থেকে চলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আরও দু'-একটা দিন থাকতেই হবে এখানে।

শবনম বলল, না বাবা। ওকে যেতেই হবে। না হলে ওর মা-বাবা চিন্তা করবে খুব। আমি কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যাব না। এই কেল্লা, ওই পাহাড়, এই অরণ্য এর চেয়ে মধুময় আমার কাছে আর কিছুই নেই। তা ছাড়া আমি চলে গেলে মা ভবানীর সেবা পুজোর জোগাড় করে দেবে কে?

রঞ্জন বলল, কী পাগলের মতো বকছ যা তা! তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। লেখাপড়া করবে। বড় হবে। যেতেই হবে তোমাকে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

সাধু বললন, ও ঠিকই বলেছে মা। এই বনবাস তোমার সাজে না। তা ছাড়া

এখন তো আর তোমার জাতপাত নেই। তুমি এখন দেবী। তুমি আমার মেয়ে। মা ভবানীর মেয়ে।

তবু আমি এখানেই থাকব। এই ভবানী মন্দিরে দেবদাসী হয়ে বেঁচে থাকব সারাজীবন। আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। রঞ্জনকে যেতেই হবে। ও যাক। বরং আমাদের বন্ধুত্বকে স্মরণীয় করে রাখতে মাঝেমধ্যে ও চলে আসবে এখানে। পারলে ওর মা-বাবাকেও নিয়ে আসবে।

রঞ্জনের চোখে যেন জল এসে গেল। বলল, তুমি যাবে না শবনম?

শবনম স্মিত হেসে ঘাড় নাড়ল, না।

পুলিশ অফিসার বিদায় নিলেন। পাহাড়িয়া মানুষগুলো আবার নতুন করে কাজে মেতে উঠল। শবনম রঞ্জনের হাত ধরে টানতে টানতে কেল্লার বুরুজের মাথায় উঠে গেল। অভিমানে রঞ্জনের বুক তখন ভরে উঠেছে।

শবনম বলল, তোমার ভালর জন্যই আমি যাচ্ছি না। তুমি বড় হও। নিজের পায়ে দাঁড়াও। তারপরও যদি আমার কথা মনে থাকে তা হলে আমাকে এসে নিয়ে যেয়ো, আমি যাব। এই মুহূর্তে যদি তোমার মা-বাবা অরাজি হন আমি তা হলে যাব কোথায়? ওই পার্ল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে আমি আর ফিরছি না। তুমি আমাকে ভুল বুঝ না রঞ্জন। এখানে আমি সুখেই থাকব।

রঞ্জন বুরুজের খাঁজে মাথা রেখে কাঁদছিল।

শবনম আলতো করে পিঠে হাত রেখে ডাকল, রাজা।

উঁ।

জলভরা চোখে রঞ্জন তাকাল শবনমের দিকে। শবনম ওর আঁচলের খুট দিয়ে রঞ্জনের চোখের জল মুছিয়ে দিল।

রঞ্জন বলল, আমি ফিরে গেলে তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো?

আল্লার কসম। মা ভবানীর দিব্যি। আমার এই বন্ধু রাজাকে আমি কি ভুলতে পারি? তুমি ফিরে যাও। মাঝে মাঝে তোমার মা-বাবাকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসো। আমি তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে এখানে সুখে থাকি। রাজ্যপাট চালাই। তারপর যখন আমরা আরও বড় হব, তখন যা হয় হবে।

হিন্দোলকেল্লার বুরুজের মাথায় ওরা দু'জনে হাতে হাত রেখে গঙ্গা-যমুনার ধারার মতো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে বইতে লাগল। চারদিকের পাহাড় ও বনভূমিতে উজ্জ্বল দিন এবং আকাশের নীলিমায় সাদা মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা উদাস করে দিল মনকে। নীচে ভবানী মন্দিরে ভোগারতির ঘণ্টা বাজল বুঝি। এক ঝাঁক রঙিন টিয়া, রঙের বাহার নিয়ে হারিয়ে গেল সুদূর বনরেখায়। এই বন, এই পাহাড়, সবই যেন কাব্যময় হয়ে উঠল।

নয়নাগিরি অভিযান

এক

হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও শুভ সংবাদ যদি পেয়ে যায় কেউ, তা হলে কি আনন্দের আর শেষ থাকে? বন্যাপাড়ার মাঠে যযাতি সংঘের ফুটবল ম্যাচ ছিল, তাই দেখতেই গিয়েছিল গৌতম। এদিকে বাবার কড়া নিষেধ। যেখানে খুশি চলে যাও, ঘোরোফেরো কোনও আপত্তি নেই, শুধু সন্ধের আগে ঘরে ফিরো এবং বন্যাপাড়ায় যেয়ো না। বড় কুখ্যাত জায়গা ওটা। এক তো ওর চারদিক ঘিরে সমাজবিরোধীদের ঘাঁটি, তার ওপর শ্রাবণ মাসে জগৎগৌরীর মেলাতেও ওখানে সাপের কামড়ে একজন-দু'জন মরেই থাকে। তাই কাউকে কিছু না বলে চুপিচুপি লুকিয়েই এসেছিল গৌতম। কিন্তু ফেরার পথে বন্ধু পল্টনের মুখে এমন একটা খবর পেল যে আনন্দের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারল না। চোখদুটো বড় বড় করে বলল, সত্যি!

পল্টন বলল, সত্যি না-তো কি মিথ্যে? কালই আমাদের যেতে হচ্ছে। কিন্তু তুই এত দেরি করলি কেন?

তোকে বলা হয়নি রে। আমি বন্যাপাড়ায় ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম।

আমিও আন্দাজ করেছিলাম তাই। সেইজন্যেই শোঁটেদার দোকানে ডিম-টোস্ট খেয়ে তোর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তোদের বাড়ি গিয়ে শুনলুম তুই স্কুল থেকে এসে বইপত্তর রেখেই ছুটেছিস। জলখাবারও খাসনি। খিদে পায়নি তোর?

পেয়েছে। তুইও আয় আমাদের বাড়ি। এক সঙ্গে খাব।

যাবই তো। তোর বাবা আমাকে তোরই খোঁজে পাঠালেন। তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে না?

বাবা! এমন সময় বাবা কোত্থেকে আসবেন?

তা তো জানি না। তবে আমাকে দেখেই বললেন, বন্ধু তো বাড়ি নেই। যাও যেখান থেকে পারো ধরে নিয়ে এসো।

তারপর?

আমি তখন সাহস করে ভয়ে ভয়ে বলেই ফেললাম কথাটা।

কী বললেন উনি?

এক কথায় রাজি।

আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশ্বাস না হবার কথাই বটে। তোর বোন ঝুমুও যেতে চাইছিল। ঝুমুকে অবশ্য যেতে দেবেন না তোর মা। তবে তুই যাচ্ছিস।

কথা বলতে বলতেই ওরা বাড়ি এল।

ছোট্ট ঝুমু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল দাদাকে। বলল, এই দাদা, বাবলিদির বিয়েতে তুই নেমতন্ন যাচ্ছিস। আমাকে নিয়ে যাবি রে? আমাকেও নেমতন্ন করেছে।

মা শুনতে পেয়ে বললেন, শখ মন্দ নয়। এ যেন এপাড়া ওপাড়া। কোথায় হাওড়া, কোথায় পাটনা। তা ছাড়া এই তো সেদিন বম্বে থেকে ঘুরে এলি।

বাঃ রে। তা হলে দাদা যাচ্ছে কেন? দাদাও তো বম্বে গিয়েছিল। দাদার বেলায় দোষ নেই, যত দোষ আমার বেলায়?

বলতে লজ্জা করে না? দাদা সামনের বছর ফাইনাল দেবে। আর তুই? দশ বছরের মেয়ে এখনও রাত্তির বেলা বিছানায়...।

জোঁকের মুখে নুন। কাঠবিড়ালির মতো তুড়ুক করে লাফিয়ে পালাল ঝুমু। রোজ তো নয়, না হয় মাঝেমধ্যে একআধদিন রাত্তিরবেলা ঘুমের ঘোরে একটু হয়েই যায়, তাই বলে কি একেবারে পল্টনদার সামনে এইভাবে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হবে?

গৌতম হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢুকল।

বাবা বললেন, কী রে! কোথায় গিয়েছিলি?

কোথাও নয় বাবা। একটু পুলকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

পুলক হচ্ছে পল্টন ও গৌতমের বন্ধু। বাবা-মা সবাই ওকে চেনেন। এ বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াতও আছে। তাই আর কেউ কিছু বললেন না। ভাবলেন হবেও বা।

গৌতম বলল, তুমি আজ এত সকাল সকাল চলে এলে যে বাবা?

মা জল খাবারের ডিশ হাতে ঘরে এসে বললেন, কেন উনি আসায় তুমি কি খুশি নও?

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ। এইভাবে কখনও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলে? আমি তো রোজ এই সময় আসি না, তাই ও জিজ্ঞেস করেছে। এতে ওর দোষটা কোথায়? বলে গৌতমকে বললেন, আজ আমাদের অফিসের স্পোর্টস। সেইজন্যে দুটোর সময় ছুটি হয়ে গেছে। আমি তো খেলাধুলোর ভক্ত নই। তাই মাঠে না গিয়ে বাড়ি চলে এলাম। এসে শুনলাম তোমাদের বাবলিদির বিয়ে। আর সেই বিয়েতে যাবার জন্যে তোমাদের দু'ভাই-বোনেই নিমন্ত্রিত হয়েছ।

আমি যাব বাবা?

নিশ্চয়ই যাবে। বাবলিদির বিয়ে বলে কথা।

মা বললেন, বাবলির দেখাশোনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। কিন্তু বিয়ে হচ্ছিল না। এবার মনে হয় রাতারাতি কোনও ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

কিন্তু যতই রাতারাতি হোক। বিয়ে বলে কথা। কিছু দিনের একটা তোড়জোড় তো ছিলই।

সবই তো ছিল।

তা হলে? রেজেস্ট্রি করে চিঠি দেওয়া উচিত ছিল ওদের।

রেজেস্ট্রি চিঠিই তো এসেছে দশ দিন বাদে।

বাবা বললেন, এই জন্যেই আজকাল লোকে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে চিঠি পাঠায়। এতে খরচও কম। চিঠিও তাড়াতাড়ি যায়।

ওদের জলখাবার খাওয়া হলে গৌতম বলল, আমি পল্টনের সঙ্গে একবার ওদের বাড়ি যাব মা?

এখন ক'টা বাজে জানো? পড়তে বসতে হবে না?

আজ একদম পড়ায় মন বসছে না, বিশ্বাস করো।

বাবা হেসে বললেন, ঠিক আছে যাও। ওদের বাড়িতে কী সব আলোচনা হয় শুনে এসো। বিয়ে বাড়ি যাচ্ছ। শুধুহাতে তো যাওয়া যায় না। কিছু একটা নিয়ে যেতে হবে। যদি সময় থাকে তা হলে আজ নয়তো কাল সকালেই কিনে ফেলতে হবে জিনিসটা। কী দেওয়া যায় বলো তো? বলে মায়ের দিকে তাকালেন বাবা।

মা বললেন, কী বলব বলো? এত তাড়াতাড়ি যে ভেবে দেখারও সময় পাব না। যা হোক কিছু দেবে। ছোট ছেলে। ভাইয়ের মতো।

গৌতম আর দেরি করল না। পল্টনের সঙ্গে ওদের বাড়ির দিকে চলল। খুব বেশি দূরে নয়। ওদের বাড়ি থেকে সোজা এগিয়ে দুটো মোড় পার হলেই পল্টনদের বাড়ি।

দুই

পল্টনের কাকামণি রুদ্রমশাই একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। গানের গলা ভাল নয়। তবে গান জানেন। বাংলা এবং বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রী আছে। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই রেডিয়ো বা টিভিতে গানটান গায়। সংগীত গুরু হিসেবেই তাঁর খ্যাতি। বিয়েথা করেননি। ভাইপো-ভাইঝিদের তিনি নিজের ছেলেমেয়ের মতোই দেখেন। সর্বাধিক স্নেহ করেন তিনি পল্টনকে।

পাটনা শহরের আর এক সংগীতগুরু সত্যসুন্দরবাবুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। সত্যবাবু প্রবাসী বাঙালি। তিনি কলকাতায় এলে কাকামণির কাছে ওঠেন। কাকামণিও পাটনায় গিয়ে ওঠেন তাঁর বাড়িতে। প্রায় একটানা চল্লিশ বছর ধরে এইরকম চলছে। সেই সূত্রেই পরিচয়। বাবলিদি সত্যবাবুর একমাত্র মেয়ে। মেয়ে তো নয়, যেন দুর্গাপ্রতিমা। যেমনি রূপ, তেমনি গানের গলা। পাটনা রেডিয়ো সেন্টারে নিয়মিত গান গাইবার সুযোগ পান। গৌতমরা কতবার রেডিয়োর নব ঘুরিয়ে শুনেছে সেই গান।

কলকাতায় এলে কাকামণির সঙ্গে গৌতমদের বাড়িতেও কতবার এসেছেন বাবলিদি। পল্টনের মায়ের সঙ্গেও এসেছেন। সত্যবাবু কোনও কাজে কলকাতায় এলেই বাবলিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আসলে মেয়েকে ছেড়ে একদম থাকতে পারেন না তিনি। তা সেই বাবলিদির বিয়ে। আর সেই বিয়েতে যাবার জন্যে নিজে হাতে চিঠি লিখেছেন বাবলিদি। কাকামণিকে যে চিঠি লিখেছেন তারই একপাশে লেখা আছে, আপনাদের সকলেরই আসা চাই। আর বিশেষ অনুরোধ, পল্টনের বন্ধু গৌতম ও ঝুমুকেও সঙ্গে আনতে ভুলবেন না। ওরা যেন বাদ না যায়। গৌতম আশা করি নিশ্চয়ই আসবে। সেই সঙ্গে ঝুমুও! বিয়ের পরে আর কখনও ওদিকে যেতে পারব কি না জানি না। অনেক দূরে চলে যাব তো। তাই ওদেরও একটু দেখতে চাই।

এইরকম চিঠি পাবার পর কি না-গিয়ে থাকা যায়? এখন মুশকিল হল একটাই, পল্টনের কাকামণি রুদ্রমশাই বাড়িতে নেই। কী একটি বিশেষ কাজে তিনি এলাহাবাদ গেছেন। চিঠিটা যদি দিনকতক আগেও আসত তা হলে কোনও ভাবনা ছিল না। এল এমন সময় যখন তিনিই নেই।

পল্টন যখন খুব ছোট তখনই ওর বাবা মারা যান। বিধবা মা, দুই দিদি আর পল্টনের দায়িত্ব নেন কাকামণি। উনি বিয়ে-থা করেননি তাই রক্ষে। কঠিন হাতে সংসারের হাল ধরলেন।

সেই কাকামণির অভিন্নহৃদয় বন্ধু হলেন সত্যবাবু। তাঁর মেয়ে বাবলিদির বিয়ে, অথচ কাকামণি নেই। এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কী-ই বা হতে পারে? এখন বাড়িসুদ্ধু সবাই চলে গেলে কাকামণি হঠাৎ করে যদি ফিরে আসেন তা হলে ঘরে ঢুকতে পারবেন না। অবশ্য তেমন হলে না হয় উনি কোনও ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু পাটনা পর্যন্ত বাড়িসুদ্ধু সকলের যাওয়াটাই কী মুখের কথা?

গৌতমকে দেখে পল্টনের মা বললেন, এই যে এসেছিস বাবা, বেশ করেছিস। বাবলির বিয়ের চিঠি এসেছে। তোদের দু'ভাইবোনকেই যেতে লিখেছে।

তা তো জানি। বোন যাবে না। তবে আমাকে বাবা যাবার অনুমতি দিয়েছেন।

কিন্তু পল্টনের চিন্তা হচ্ছে আপনি কী করে যাবেন? কাকামণি নেই।

ওই একটা চিন্তা তো আমারও। এতগুলো লোকের গাড়িভাড়া, দেওয়াথোয়ার ব্যাপার, কাকামণি থাকলে সামলাতে পারতেন। হয়তো একটা সোনার জিনিসই দিতেন। কিন্তু আমি কী করে কী করব?

গৌতম বলল, আমি একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?

না না। কী মনে করব?

কাকামণি যখন নেই তখন আপনি বরং একবার আমার বাবার সঙ্গে দেখা করুন। দেওয়ার ব্যাপারটা না হয় কাকামণি এলেই হবে। এই বিয়েতে সবাই মিলে আনন্দ করে যাওয়াটা অন্তত হোক। আমাদের সকলের গাড়িভাড়ার টাকাটা বাবা যে করেই হোক ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। এখন না হয় তাঁর কাছ থেকে ধার হিসেবেই টাকাটা নিন। পরে কাকামণি এলে দিয়ে দেবেন।

মা বললেন, তা কি হয় বাবা? কাকামণি হঠাৎ ফিরে এসে যদি দেখেন আমরা নেই, তা হলে খুবই দুঃখ পাবেন। তা ছাড়া এ অনেকগুলো টাকার ব্যাপার। বিশেষ করে সবাই চলে গেলে বাড়ি একদম ফাঁকা থাকবে। তার চেয়ে তোমরাই দু'বন্ধুতে যাও।

তা হলে দিদিরাও যাক।

না বাবা। দিদিরা এখন বড় হয়েছে। কাদের ভরসায় যাবে ওরা? আমি থাকলে আলাদা কথা। তোমরা ছোট ছেলে।

কী যে বলেন কাকিমা? আমরা নাকি এখনও ছোট। সেদিন খেজুরবাগানে মোষওয়ালাটাকে পল্টন আমি কীরকম পিটিয়েছিলাম জানেন না তো?

সে কী! শুনিনি তো? তোমরা দু'জনে মারপিট করে বেড়াচ্ছ নাকি? কী সাংঘাতিক!

তাই বলছিলাম দিদিরা সঙ্গে গেলে কোনও অসুবিধাই নেই।

তা হয়তো নেই। তবে কাকামণি রাগ করবেন। তা ছাড়া ওরা আমাকে ছেড়ে যাবে না। বিয়েবাড়ি বলে কথা। কত লোকজন আসবে। তার ঠিক কী? বিশেষ করে আমরা কখনও কেউ যাইনি ওখানে। কীরকম জায়গা তাও জানি না। এ অবস্থায় অত বড় মেয়েদের তোমাদের ভরসায় ছাড়া যায় না! তোমরা দু'বন্ধুতেই যাও। তোমার বাবাকে বলো উনি যেন তোমাদের দু'বন্ধুকে কাল ট্রেনে তুলে দিয়ে আসেন।

সেই ভাল। কাকামণি যখন নেই আর বিয়েও যখন হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে গেছে, বিশেষ করে চিঠিও এসেছে দেরিতে, তখন কিছুই আর করবার নেই। দু'বন্ধুতেই যাওয়া যাক। সত্যি, কী মজাটাই না হবে।

গৌতম বলল, তা হলে আমরা কালই যাব কাকিমা?

হ্যাঁ। কালই যেতে হবে। কেন না পরশু তো বিয়ে।

কাল তা হলে কোন গাড়িতে যাব?

সকালে গেলে তুফানে যেতে পারো। আর রাতের গাড়িতে যদি যাও তা হলে পঞ্জাব মেলে। দানাপুর এক্সপ্রেস, দিল্লি এক্সপ্রেস, জনতা এক্সপ্রেস যাতে খুশি যাওয়া যায়। তোমার বাবাকে বলবে, উনিই গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবেন তোমাদের।

গৌতম লাফিয়ে উঠল, হুর্‌র্‌র্‌ রে।

পল্টন বলল, তা হলে তুমি একবার চলো না মা ওদের বাড়িতে। ওর বাবাকে একটু বলে আসবে।

হ্যাঁ। যাব বইকী! আমি না গেলে হয়?

এরপর গৌতম ও পল্টনকে নিয়ে পল্টনের মা ওদের বাড়িতে গেলেন।

গৌতমের বাবা সব শুনে বললেন, না না। কাকামণি যখন নেই তখন একেবারে ঘর ফাঁকা রেখে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়। ওরা দু'বন্ধুতেই যাক। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমি নিজে গিয়ে ট্রেনের টিকিট কেটে ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।

কোন গাড়িতে যাবে তা হলে ওরা? সকালের গাড়িতে গেলে দশটার মধ্যে হাওড়ায় পৌঁছতে হবে ওদের। দশটা কত-র যেন ট্রেন!

সকালের গাড়িতে কেন যাবে? পরশু যখন বিয়ে তখন রাতের গাড়িতেই যাওয়া ভাল। সকালের গাড়িতে গেলে সেই রাতদুপুরে স্টেশনে নেমে ঠিকানা খুঁজে বার করতে অসুবিধে হয়ে যাবে। রাতের গাড়িতে গেলে ভোর ভোর পৌঁছবে। সারাটা দিন সময়। এর মধ্যে আমিও দেখি না চেষ্টা করে ওদের কোনও রিজার্ভেশন পাই কি না।

অতএব রাতের গাড়িতেই যাওয়া ঠিক হল।

পল্টনকে নিয়ে ওর মা চলে গেলে গৌতমের মা বললেন, আমার বাপু ভয় করে। দু'-দুটো ছেলে অত দূরে একটা নতুন জায়গায় যাবে। সঙ্গে বড় কেউ নেই।

তাতে কী হয়েছে? কত লোক যাচ্ছে। পাটনায় নামবে, এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে গাড়িতে। আমি ওদের গাড়িতে উঠিয়ে সকলকে বলেকয়ে দেব।

পাটনায় নেমে যদি ওরা জায়গা ঠিক করতে না পারে?

খুব পারবে। স্টেশনের সামনেই অটো, রিকশা যা চাইবে তাই পাবে। তাদের হাতে ঠিকানা লেখা কাগজ ধরিয়ে দিলে তারাই পৌঁছে দেবে বাড়িতে।

তা হলে কোনও ভয় নেই বলছ?

ভয় কী? ছেলেপুলেদের যত ঘরে আটকে রাখবে ততই ওরা ঘরকুনো হবে। আমি তো চাইছিলুম ছেলেটা এবার থেকে একটু করে ডানামেলে উড়তে শিখুক।

সে রাতটা প্রায় আনন্দের স্বপ্ন দেখেই কাটল। বাবলিদির বিয়ের জন্য যে ঠিক, তা নয়। পল্টনের সঙ্গে পাটনা যাবার আনন্দে। পাটনায় যাবার শখ কী ওর কম? ওদের বাড়ি যে গোয়ালাটা দুধ দিতে আসে তারও বাড়ি পাটনায়। গঙ্গার ওপারে ছাপরা জেলায়। প্রত্যেক বছর কার্তিক পূর্ণিমায় ওদের ওখানে শোনপুরের মেলা বসে। খুব নামকরা মেলা। সবাই বলে হরিহর ছত্রের মেলা। তা ওর মুখেই গল্প শুনে পাটনায় যাবার ইচ্ছেটা ওর খুব। ওখানে পুনপুন নামে একটি নদী আছে। ছোট্ট নদী। কিন্তু বর্ষায় নাকি এমনই হয় যে সেই নদীই ভয়ংকরী হয়ে ওঠে। তখন তাকে ধরে রাখা দায়। বাঁধভেঙে প্লাবন বইয়ে দেয় চারদিকে। আর আছেন পতিত পাবনী মা গঙ্গা। বাবলিদির মুখেও পাটনা শহরের কথা, গঙ্গার কথা কত শুনেছে গৌতম।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাই যাবার তোড়জোড়।

ঝুমুটার অবশ্য মুখ ভার। সে দূরে দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখছে দাদাকে, আর চোখে চোখ পড়লেই মুখ ঘুরিয়ে এমনভাবে চলে যাচ্ছে যে ভাবটা এই, এঃ তুমি যাচ্ছ তো আমার কী? আমি তো যাচ্ছি না। আমার আনন্দ করতে বয়েই গেছে।

তিন

সন্ধেবেলা হাওড়া স্টেশনে এসে বাবা ওদের পঞ্জাব মেলেই তুলে দিলেন। পঞ্জাব মেল মানে থ্রি জিরো জিরো ফাইভ আপ অমৃতসর মেল। না, কোনও গাড়িতেই কোনও রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। তাই একটা কুলিকে টাকা দিয়ে জানলার ধারে মুখোমুখি দুটো সিটের ব্যবস্থা করলেন।

পল্টন ও গৌতম এতেই খুশি। একটা রাত বই তো নয়। দিব্যি গল্প করতে করতে কেটে যাবে। ঘুমোবার জন্য রোজ বাড়ির বিছানা আছে। ট্রেনে উঠে আবার ঘুম কী? তা ছাড়া ঘুমোবেই যদি তো দেখবে কখন? রাতের গাড়িতে সাঁ সাঁ করে ছুটে যেতে যেতে কালো ধূসর প্রকৃতির চেহারা না দেখলে কি দেখা হল? তা ছাড়া আসবার সময় মা বলে দিয়েছেন মধুপুর, জসিডি পেরোবার পর নাকি ছোট বড় অনেক পাহাড় আর ঘন বনানী চোখে পড়ে। রাতের অন্ধকারে সেই বনানীর ছায়ারূপ তো দেখতেই হবে।

যদিও ওরা খেয়ে এসেছিল তবুও রাতের খাবার দু'জনদের বাড়ি থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মায়েরা। পল্টনের মা টিফিন কৌটো ভরতি করে লুচি, আলুর দম আর বোঁদে দিয়েছিলেন। গৌতমের মা দিয়েছিলেন লুচি, হালুয়া আর সন্দেশ। সেই সঙ্গে ওয়াটার বটল ভরতি করে জল। কত খাবে খাও না কেন?

যথা সময়ে ট্রেন ছাড়ল।

বাবা বিদায় নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, কাল সকালের আগে ভুলেও যেন কোনও স্টেশনে না নামে।

এখন নভেম্বর মাস। তাই শীত শীত ভাব আছে। বিহারে নাকি কলকাতার চেয়ে এখন অনেক বেশি ঠান্ডা। গাড়িতেই ওরা ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোয়েটার ইত্যাদি পরে নিল। পল্টনের ঠান্ডার ধাত বেশি। তাই গলায় মাফলার জড়িয়ে বসে রইল চুপ চাপ। গৌতমের সঙ্গে মাংকি ক্যাপ ছিল। কিন্তু সেটা সে পরল না। কেন না এখনও এত শীত পড়েনি যে এরই মধ্যে মাংকি ক্যাপ চাপাতে হবে। ও পকেট থেকে একটি ছোট্ট নোটবুক বার করে পল্টনের হাতে দিয়ে বলল, এই দেখ।

কী ওটা?

বল দিকিনি ওটা কী? ভাল করে দেখ।

পল্টন নোটবুকটা হাতে নিয়ে বলল, এটা তো একটা নোটবুক।

খুলে দেখ আগে।

পল্টন নোটবুকটা খুলে দেখল কতকগুলো জায়গার নাম ওর নোটবুকে নোট করা আছে। এই নামগুলোর প্রত্যেকটিই ওর পরিচিত। বলল, এই নামগুলো এতে টুকে রাখার মানে?

মানে একটাই। রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচাও হবে। অর্থাৎ বাবলিদির বিয়েতে গিয়ে আমরা কি শুধুই নেমন্তন্ন খাব আর হই হুল্লোড় করব? মোটেই না। পাটনা শহরটা চষে বেড়াব আমরা। কখনও রিকশায়, কখনও অটোয়, কখনও পায়ে হেঁটে। পাটনা হচ্ছে বিহারের রাজধানী। ষোড়শ শতাব্দীতে শের শাহের হাতে এই শহরের গোড়াপত্তন। এই পাটনাই প্রাচীন মগধ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অজাতশত্রু রাজত্ব করেছেন এখানে। সম্রাট অশোকের রাজধানী।

অশোক তো পাটলিপুত্রের রাজা ছিলেন।

সেই পাটলিপুত্রই আজকের পাটনা। মৌর্যযুগের রাজধানী।

বলিস কী রে! জানতাম না তো?

সবাই জানে। বিশেষ করে আমার আগে তোরই জানা উচিত ছিল।

তা হলে নিশ্চয়ই সেকালের নিদর্শনও কিছু দেখতে পাব আমরা!

এক বাঙালি ভদ্রলোক সামনের দিকের বাঙ্কের ওপর ঘুমনোর ভান করে শুয়েছিলেন। এদের কথাবার্তা শুনে বললেন, পেতে। যদি না, ১৫৩৪ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে সবকিছু চাপা পড়ে যেত।

গৌতম বলল, আপনি কি পাটনায় থাকেন?

না। আমি থাকি দানাপুরে।

পাটনায় দেখবার কী কী আছে বলুন তো?

দেখবার মতো আহামরি কিছুই নেই ওখানে। মিউজিয়াম, হরমন্দির, গোলঘর এইসব দেখতে পারো। তা ছাড়া সদাকত আশ্রমটা দেখো।

আচ্ছা, গোলঘরটা কী জিনিস?

গোলঘর কী জানো, এটি একটি শষ্যাগার। অনেকটা মৌচাকের মতো গড়ে ওঠা একটি ঘর। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের স্মৃতি মনে রেখে ক্যাপটেন জন গারস্টিন এই শষ্যাগারটি ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করান। এর মাথায় ওঠবার সিঁড়ি আছে। সেখান থেকে পাটনা শহরের দৃশ্য এবং গঙ্গার সৌন্দর্য খুব ভাল করে দেখা যায়।

আমাদের উঠতে দেবে?

কেন দেবে না। সবাই ওঠে।

ওটা তা হলে মনুমেন্ট বলুন?

ঠিক তাই।

ওখানে আর কিছু দেখার নেই?

ওখানেই আছে, হরিমন্দির বা হরমন্দির। আগে ওটা ছিল একটা মস্ত বড় হাবেলি। নাম জহুরি শালিস রায়ের হাবেলি। এই জহুরি ছিলেন খুব হরিভক্ত। ওই হাবেলিতে তিনি দানধ্যান করতেন। হরি সংকীর্তন করতেন। তোমরা নিশ্চয়ই শিখদের দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ সিং-এর নাম শুনেছ? তাঁর জন্মস্থান ছিল পাটনা। সেই কথা স্মরণে রেখেই পঞ্জাব কেশরী রণজিত সিং এখানে একটি গুরদোয়ারা তৈরি করে দেন। গম্বুজাকৃতি এই গুরুদ্বার বা গুরদোয়ারাটি পাঁচতলা উঁচু। শ্বেত পাথরে তৈরি। সোনা দিয়ে মোড়া এর প্রধান দ্বার। শিখদের পবিত্র তীর্থ। ওই গুরদোয়ারাটা কিন্তু তোমরা দেখো।

আর এক ভদ্রলোক এক পাশে বসেছিলেন। তিনি বললেন, তবে তুমি ওই যে তখন বললে পাটলিপুত্রের কথা, তা অশোকের আগেও মানে আজ থেকে প্রায় দু'হাজার তিনশো বছর আগে আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাশকে যিনি পরাজিত করেছিলেন সেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল পাটনা। তাঁর পুত্র অশোক তো পরে রাজত্ব করেন। আর একটা জিনিস তোমরা নোট করে নাও, খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে ভগবান বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন।

কথা বলতে বলতে কত সময় যে কীভাবে কেটে গেল তা কেউ টের পেল না।

ট্রেন এসে বর্ধমানে থামল।

থেমেই ছাড়ল। মেল ট্রেন তো। বেশিক্ষণ থামে না।

সবাই যে যার খাবার দাবার বার করে খেতে লাগল।

পল্টন ও গৌতমও বাদ গেল না। অনেক খাবার। এত কী খাওয়া যায়?

কয়েকজন দেহাতি আশপাশে বসে বসে খইনি টিপছিল। পল্টন কিছু খাবার ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো খেয়ে নাও দেখি?

ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে বলল, লেকিন তুমহারা কমতি হো যায়েগা না?

না বাবা। আমাদের পেট কী মধ্যে জায়গা নেই। সেই জন্যেই তুম সবাইকে খিলাতা হ্যায়।

পল্টনের হিন্দি শুনে ফিক করে হেসে ফেলল গৌতম। হিন্দি সে-ও খুব একটা ভাল বলতে পারে না। তবে এতটা খারাপ বলে না।

দেহাতিদের খাবার দিয়ে নিজেরাও খেতে লাগল।

ট্রেন ছুটছে ঝড়ের বেগে। কী ভাল যে লাগছে। ট্রেনের দুলুনিতে বসে থাকতে থাকতেই এক সময় ঘুমে দু'চোখ লুটিয়ে এল ওদের।

রাত জেগে আঁধারের প্রকৃতি দেখা মাথায় উঠল।

ওরা আর থাকতে না পেরে মেঝেতেই বেডসিটটা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল টান হয়ে। তারপর নাক ডাকিয়ে সে কী ঘুম।

চার

শেষরাতে ট্রেন এসে থামল পাটনা জংশনে! ঘড়ির কাঁটায় তখন চারটে। একে ঠিক শেষরাত নয়, ভোরই বলা উচিত। ওরা ঘুমোচ্ছিল। কে যেন একজন ডেকে তুলে দিল ওদের, কী গো ভাইয়েরা, পাটনা তো এসে গেছে। নামবে না?

পল্টন-গৌতম দু'জনেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। তারপর যে যার ঝোলাব্যাগ সামলে নেমে পড়ল টুক করে।

আলো ঝলমল পাটনা জংশনে তখন শুধুই লোকের ব্যস্ততা।

ওরা গেটে টিকিট জমা দিয়ে স্টেশনের বাইরে এল। এত ভোরেও স্টেশন এলাকাটা জমজমাট।

অটো, রিকশা, বাস কী না নেই সেখানে?

একজন চাওয়ালা জ্বলন্ত উনুনের ওপর বড় একটা কেতলি বসিয়ে চা তৈরি করছিল। ওরা সেখানে গিয়ে সেই চা, এক ভাঁড় করে খেল। সে চায়ের স্বাদই আলাদা। চায়ের দোকানের রেডিয়োয় লতা মঙ্গেশকরের 'মেরা নাম হ্যায় চামেলি' গান হচ্ছে। ওরা চা খেয়ে চারদিকে পায়চারি করতে লাগল।

তারপর একটু একটু করে আলো ফুটলে ওরা একটা রিকশায় চেপে বলল, দরিয়াপুর!

রিকশাওয়ালা বলল, তিন রুপিয়া লাগে গা।

চলে তো।

রিকশা 'পিঁকু পিঁকু' করে ভেঁপু বাজিয়ে ওদের নিয়ে তরতরিয়ে এগিয়ে চলল রাজপথ ধরে। অজানা দেশ, অচেনা জায়গা। তবু কী ভাল যে লাগল, তা বলবার নয়। ভাল লাগবে নাই বা কেন? হাজার হলেও রাজধানী শহর তো। বিহারের রাজধানী। তার একটা ঐতিহ্য আছে বইকী। কত উন্নতমানের ঘরবাড়ি যে ওদের নজরে পড়ল তার যেন শেষ নেই।

ওরা এ পথ সে পথ করে এক সময় দরিয়াপুর এসে পৌঁছুল। একটি নোংরা গলির মুখে রিকশা থামলে, ওরা রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাল। তারপর একটি পানের দোকানে গিয়ে সত্যসুন্দরবাবুর নাম করতেই দোকানদার বলল, মাস্টারজিকা মকান?

পল্টন বলল, হ্যাঁ!

ইস গলি কা অন্দর।

ওরা দু'জনে গলির ভেতরে ঢুকে যেতেই বাঁদিকে বহুদিনের পুরনো একটি কোঠা বাড়ি নজরে পড়ল। সাবেক কালের বাড়ি। তার পাঁচিলটাই দশ ইঞ্চি ইটের গাঁথনি দেওয়া। পাঁচিলের গায়ে অজস্র ঘুঁটে। তারই একপাশে খটিয়া বস্তি।

একটি পেয়ারা গাছ, তার ডালে কেমন পেয়ারা হয়েছে দেখাবার জন্যই বুঝি পাঁচিল টপকে ঝুঁকে পড়েছে রাস্তার ওপর।

পল্টন বলল, এই বাড়ি।

ওরা দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর একটা স্বর ভেসে এল, কে?

পল্টন বলল, আমি! বলেই গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, কাকুমণির বাবা। সদাশিববাবু। কাকামণির বন্ধু বলে সত্যসুন্দরবাবুকে ওরা কাকুমণি বলে!

গৌতম বলল, ওরে বাবা! কাকুমণির বাবা মানে তো অনেক বয়স। এখনও বেঁচে আছেন?

বেঁচে আছেন বলেই তো সাড়া দিচ্ছেন। কীরকম লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা দেখবি। ঠিক যেন সম্রাট সাজাহান।

ভেতর থেকে আবার সাড়া এল, আমি কে?

আমি পল্টন। হাওড়া থেকে আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন সত্যসুন্দরবাবু। বললেন, চিঠি পেয়েছ তা হলে? আর সব কই?

আর কেউ নেই। শুধু আমরাই দু'জনে এসেছি।

সে কী! রুদ্রদা, তোমার মা, বোনেরা কেউ এল না?

কী করে আসবে? কাকামণিই যে বাড়িতে নেই।

কোথায় গেছেন?

ইলাহাবাদে।

অ। বুঝেছি। প্রয়াগ সংগীত সম্মেলনের ব্যাপার।

আপনার চিঠিটা আর কিছুদিন আগে পেলেই হত। এমন সময় পেলাম যে এক তো কাকামণি নেই, তায় বিয়েটা একেবারে মাথায় মাথায়।

এসো এসো। ভেতরে এসো।

ওরা বাইরের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরদিকে বাড়ির বাইরের অংশে একটি চালাঘর আছে। সেই ঘরে সত্যসুন্দরবাবু ক্লাস করেন। রেওয়াজ করেন। বাইরের গেস্টরা এলে থাকতে দেন। পল্টন আর গৌতমকে নিয়ে সেই ঘরে গেলেন তিনি।

সাজাহানের মতো শুভ্রকেশ ও দাড়িওয়ালা দীর্ঘ উন্নত সদাশিববাবু এগিয়ে এসে বললেন, তোমাদের বাড়ি খুঁজে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

পল্টন বলল, কিছুমাত্র না।

ওরা দু'জনেই সদাশিববাবু ও সত্যসন্দুরবাবুকে প্রণাম করল।

সদাশিববাবু বললেন, তুমি পল্টন, তোমাকে তো চিনলাম। কিন্তু ও ছেলেটি কে? গৌতম বুঝি?

গৌতম বলল, আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু আমাকে তো আপনি দেখেননি কখনও, আমার নাম জানলেন কী করে?

তোমার কথা বাবলির মুখে কী কম শুনেছি আমি? তোমার বোনের নাম ঝুমু। ঠিক কি না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পল্টন বলল, যাই। ভেতরে গিয়ে বাবলিদি আর কাকিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। ওঁরা এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছেন নিশ্চয়ই?

সত্যবাবু বললেন, ওরা তো কেউ নেই। বাড়ি একেবারে ফাঁকা।

সে কী? কেউ নেই কেন?

বিয়ের জন্যে আমি কদমকুঁয়ায় একটা অন্য বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

এত বড় বাড়ি থাকতে?

এই নোংরা গলির ভেতর পুরনো ভাঙা বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যাও অনেক। তাই সবাইকে সরিয়ে দিয়ে শুধু বাবা আর আমি বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। এখানে চোরের উপদ্রব খুব। কেউ বাড়িতে না থাকলে তালা ওরা ভাঙবেই।

গৌতম বলল, বাবলিদির কোথায় বিয়ে হচ্ছে কাকুমণি?

ফৈজাবাদে।

সে তো অনেকদূর।

হ্যাঁ। তবে ভালই হয়েছে। রুদ্রদা অবশ্য দেখেছেন ছেলেটিকে। তা যাক। তোমরা সারারাত ট্রেন জার্নি করে এসেছ। ক্লান্ত শরীর তোমাদের। এখন মুখহাত ধুয়ে একটু চা-টা খেয়ে নাও। পরে তোমাদের কদমকুঁয়ায় পাঠিয়ে দেব।

সদাশিববাবু বললেন, এখন ওদের কদমকুঁয়ায় যাবার দরকারটাই বা কী? একেবারে সন্ধেবেলা যাবে, ওই হইহট্টগোলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে ওদের। তার চেয়ে বরং চারদিক একটু ঘুরে দেখুক ওরা।

সে ওরা যা ভাল বুঝবে।

সত্যবাবু ওদের বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

ওরা দাঁত মাজতে মাজতে উঠোনময় ঘোরাঘুরি করে বাথরুমের কাজ সেরে বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে নিল। তারপর ঘরে এসে পোশাক পালটে কৌচে হেলান দিয়ে বসে যখন সদাশিববাবুর সঙ্গে গল্পে মেতেছে, তেমন সময় একটি মেয়ে ওদের জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এল। জলখাবার মানে বড় বড় কচুরি-লাড্ডু-গজা আর অমৃতি। সেই সঙ্গে ধূমায়িত চা।

পল্টন ও গৌতম অবাক হয়ে গেল খুব।

অবাক হবার কারণও অবশ্য যথেষ্ট ছিল। যেখানে বাড়িসুদ্ধু লোক সবাই চলে গেছে সেখানে এই মেয়েটি এল কোত্থেকে? তা ছাড়া মেয়েটি কে? মেয়েটির সুন্দর মুখ, শরীরস্বাস্থ্য, ফুটফুটে চেহারা আর গায়ের রং দেখে তাকে মেয়ে বলেও মনে হয় না। তা হলে?

স্কার্টপরা চোদ্দো-পনেরো বছরের ভদ্র মেয়েটি, বেশ লাজুক লাজুক মুখে খাবারের জায়গাগুলো ওদের সামনের চা-টেবিলে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু পরেই একেবারে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে সত্যসুন্দরবাবু এলেন। এসে বললেন, তোমরা তা হলে যখন হোক চলে যেয়ো। কদমকুঁয়ায় গিয়ে পড়লে বিয়েবাড়ি চিনে নিতে অসুবিধে হবে না। যদি এ বেলা যাও, তা হলে ওখানেই খাওয়াদাওয়া করে নিতে পারো। আর যদি বিকেলে যাও তা হলে গোপাকে বলে দিয়ো ও দুটো ঝোল ভাত রেঁধে দেবে তোমাদের। বাবার জন্যে তো রান্না করবেই। অমনি তোমাদেরও হয়ে যাবে।

পল্টন বলল, গোপা কে কাকুমণি?

সত্যসুন্দরবাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, বড় ভাল মেয়ে। ওর মা আমার কাছে গান শিখত। এখন ও শেখে। ওর গানের গলা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আচমকা শুনলে মনে হবে রেডিয়োয় গাইছে বুঝি কেউ। বাবার তো বিয়েবাড়ির ভিড়ভাট্টা

সহ্য হবে না আর গুরুপাক খাওয়াও চলবে না। সেইজন্যে বাবার দেখাশোনা করছে ও।

সে কী! ও তা হলে বিয়েবাড়ি যাবে না?

কেন যাবে না? বিকেলবেলা বাবাকে নিয়ে যাবে ও। তোমরা কী করবে বলো?

সদাশিববাবুই ওদের হয়ে বললেন, কী আবার করবে? ওরা এতখানি জার্নি করে এসেছে, এখন একটু ঠান্ডা হোক। দুপুরে এখানেই ঝোলভাত খেয়ে নিক দুটো। একটু ঘুমিয়ে নিক। তারপর বিকেলে বিয়েবাড়ি যাবে। দু'বেলাই গুরুপাক খেলে শরীর খারাপ করবে যে।

গৌতম বলল, উনি ঠিক কথাই বলেছেন কাকুমণি। আমরা বিকেলেই যাব। এখন একটু রেস্টের খুবই দরকার।

আমি তা হলে গোপাকে বলে যাই। বলে ভেতর বাড়িতে চলে গেলেন সত্যসুন্দরবাবু। তারপর যাবার সময় আর একবার দেখা করতে এলেন সদাশিববাবুর সঙ্গে, আপনি তা হলে একটু সাবধানে থাকবেন বাবা। বেলাবেলি গোপাকে নিয়ে চলে যাবেন।

সদাশিববাবু বললেন, আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক সময়েই যাব।

সত্যসুন্দরবাবু চলে গেলেন। এখন তাঁর কত কাজ। হাজার হলেও কন্যাদায় বলে কথা। সব কিছুর তদারকি তো তাঁকেই করতে হবে।

পাঁচ

পল্টন আর গৌতম তখন খোশগল্পে মেতে উঠল সদাশিববাবুর সঙ্গে। এমন রসিক এবং আলাপী মানুষ খুব কমই দেখেছে ওরা। একথা সেকথার পর সদাশিববাবু বললেন, তোমরা ছেলেমানুষ। কী আর বলব বাবা তোমাদের। বিয়েটা ভালয় ভালয় মিটে গেলে যেন বাঁচি। দিনকাল এত খারাপ পড়ছে যে, তা বলবার নয়। মস্তান-গুন্ডার দাপটে এখানে বাস করা দায় হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে এই এলাকাটা খুবই খারাপ। না হলে এতবড় বাড়ি থাকতে এতখানি জায়গা থাকতে, কখনও অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নিয়ে নাতনির বিয়ে দিই।

পল্টন বলল, আমিও তাই অবাক হয়ে গেলাম।

বাবলির বিয়ের যেদিন ঠিক হল সেইদিনই একটা চিঠি এল গফুরগুন্ডার কাছ থেকে। বিয়ের দিন ওকে নগদ দশ হাজার টাকা দিতে হবে আর পঞ্চাশজন

লোককে খাওয়াতে হবে। এটা না হলে বরকনেকে বেরোতেই দেবে না এই গলির ভেতর থেকে।

সে কী!

তবে আর বলছি কী। তা ছাড়া এই যে মেয়েটিকে দেখলে গোপা, একে নিয়েও কী কম ঝামেলা?

কেন? ওকে নিয়ে আবার ঝামেলা কীসের?

মেয়েটাকে উঠোনে, ছাদে দেখলেই আশপাশ থেকে ঢিল ছুড়ছে। পরের মেয়ে। কী জ্বালা বলো তো?

গৌতম বলল, ওর অপরাধ?

অপরাধের ব্যাপার তো নয়। আসলে মেয়ে একটু বড় হলেই এই সব এলাকায় থাকা বিপদ। বাবলিটাকে যে কীভাবে আগলে রেখেছিলুম তা ভগবান জানেন। এবার শুভ কাজটা ভালয় ভালয় মিটে গেলে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

পল্টন ও গৌতম ভীষণ উত্তেজিত হল।

পল্টন বলল, হোত আমাদের ওখানে...।

এমন সময় দড়াম করে বাড়ির উঠোনের ওপর একটা ইট এসে পড়ল।

সদাশিববাবু বললেন, এই চলছে।

এ কী অসভ্যতা?

আসলে ওই যে টাকাটা দেওয়া হয়নি। তার ওপর বিয়ের দু'দিন আগে থেকেই সরে গেছি সব। সেই রাগে কী যে করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না। তাই যত রাগ ওদের গোপার ওপর। মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতে পারলে বুঝি বাঁচে।

গৌতম বলল, গোপার বাড়ি কোথায়?

কাশীতে। দু'দিন মাত্র এসেছে। এই দু'দিনেই দু'অবস্থা করে ছেড়েছে ওর। আজ বিয়েটা মিটলে আমি ভাবছি কাল সকালে অথবা পরশুই বাড়ি পাঠিয়ে দেব ওকে।

পল্টন বলল, ওর মা-বাবা আসেননি?

বাবা তো নেই। মা আসতে পারেননি শরীর খারাপের জন্য। ও একাই এসেছে।

সে কী! কাশী থেকে একা এসেছে?

ও তো প্রায়ই আসে। কাশী তো এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মেল এক্সপ্রেসে তিন-চার ঘণ্টার পথ।

পল্টন বলল, সেই ভাল। ওকে বরং বাড়িই পাঠিয়ে দিন। তবে একা ছাড়বেন না। সঙ্গে কেউ যাবেন।

কে যাবে বাবা? তবে খোকা গিয়ে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। খোকা হচ্ছে সত্যসুন্দরবাবুর ডাকনাম।

গৌতম বলল, সে না হয় হল। কিন্তু গফুরগুন্ডার যেরকম রাগ দেখছি আপনাদের ওপর তাতে বিয়ের পরে আপনারা কী করবেন?

সেই ভয়েই তো আমি ঘুমোতে পারছি না বাবা। আমি তো ঘর থেকে বেরোতে পারি না। বেরোইও না। কিন্তু বউমা ঘরে থাকে। খোকা অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। আমার ভয় যে খোকাকে নিয়ে। কী যে হবে তা ভগবানই জানেন। অথচ বাড়ি বেচে দিয়ে চলে যাবারও নয়। এতবড় বাড়ি কিনবে কে?

পল্টন বলল, আপনারা থানায় কোনও রিপোর্ট করেননি গফুরের নামে?

ওরে বাবা। থানা-পুলিশ করলে রক্ষে আছে? গোটা বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। তা ছাড়া এদের গাঁটছড়া তো পুলিশের সঙ্গেই বাঁধা। পুলিশ সহায় না হলে ওরা কখনও এত বাড় বাড়তে পারে?

ওরা ওখানে কোনও ঝামেলা করবে না?

না। কদমকুঁয়াটা ওদের এলাকার বাইরে।

সদাশিববাবু বললেন বটে, তবুও পল্টন-গৌতমের মন আশ্বস্ত হল না। কদমকুঁয়া গফুরগুন্ডার এলাকার বাইরে হলেও, ও যদি ভয়ানক হয়, তা হলে আতঙ্কের গ্যাসও সেখানেও ছড়াবে। কারণ কদমকুঁয়া দরিয়াপুর-বস্তির বাইরে হলেও পাটনা শহরের বাইরে তো নয়।

এমন সময় বাইরের দরজায় দমাদুম লাথি পড়ল কয়েকটা।

ভীতা হরিণীর মতো ছুটে এসে ঘরে ঢুকল গোপা।

পল্টন ও গৌতম তাকাল গোপার দিকে।

এর আগে যখন চা দিতে এসেছিল তখন ওরা ভাল করে দেখেনি গোপাকে। আসলে দেখার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়নি। ভেবেছিল কে না কে। এখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি করেই গভীর সহানুভূতিতে ভরে উঠল ওদের মন।

গৌতম অনিমেষে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

ওরা সদাশিববাবুর দিকে তাকাল।

দরজায় আবার দুম দুম শব্দ।

পল্টন ও গৌতম রুখে দাঁড়াল দু'জনেই।

সদাশিববাবু বললেন, খবরদার, সামনে যেয়ো না ওদের।

পল্টন বলল, তাই বলে ওদের এই বেয়াদপি সহ্য করতে হবে?

উপায় নেই। আসলে খোকাকে ওরা বাইরে যেতে দেখেছে। কিন্তু ভোরবেলা তোমাদের আসতে দেখেনি। তাই ভেবেছে এখানে বাধা দেবার কেউ নেই। যা খুশি করবে।

পল্টন আর গৌতম এগিয়ে গেল দু'জনেই। গিয়ে চুপিসাড়ে দরজার

ছিটকিনিটা খুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দরজার দু'পাশে।

খানিক বাদেই হঠাৎ দরজায় একটা লাথি। আর লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থুবড়ে উঠোনের ওপর এসে পড়ল একজন।

যেই না-পড়া পল্টন অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর একেবারে বুকের ওপর চেপে বসেই দু'হাতে গলাটা টিপে ধরল তার।

যেটা পড়েছিল সেটা একটা ঘোড়ামুখো পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক। ঘোড়ার মতো মুখে গাধার মতো চেঁচাতে লাগল। ব্যাপারটা যে এমন হবে সে বোধহয় আগে বুঝতে পারেনি। ওর চেচানিতে আরও কয়েকজন যুবক এসে হাজির হল সেখানে। গলায় রুমাল বাঁধা। মস্তান চেহারা। প্রায় চার পাঁচজন।

একজন বলল, ক্যা রে বে। ইয়ে দোনো কাঁহাসে আ গিয়া?

গৌতম তখন টেনে একটা ঘুসি মেরেছে মস্তানটার মুখে। মারের নিয়মই হচ্ছে সাহস করে যে প্রথমে মারে সেই জেতে। তাই যারা মারতে অভ্যস্ত তারা মার খেলেই ঘাবড়ে যায়। বিশেষ করে এই খালি বাড়িতে দু'জন অল্পবয়সি কিশোরের হাতে মার খেয়ে শুধু ঘাবড়ে যাওয়া নয়, রীতিমতো অবাকও হয়ে গেল। কোনওরকমে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল, তু—তু—তু কৌন?

গৌতম বলল, মেরা জবাব তেরা মু'পর দে দিয়া। আভি পুছতা হ্যায় ম্যায় কৌন? তো ইয়ে দেখ, বলেই পেটে একটা লাথি।

গৌতমের ফুটবল খেলা বলিষ্ঠ পায়ের লাথি সে সহ্য করতে পারবে কেন? তাই 'আঁক' করে পেটধরে বসে পড়ল সে।

অন্যান্য যারা ছিল তারা ন্যাকার মতো 'হুয়া ক্যা। ক্যা তামাশা হো রহে হিঁয়া পর' বলে দু'জনকেই ধরাধরি করে তুলে দাঁড় করাল।

একজন বলল, বাঙালি ভাই, এ কাম তু নে আচ্ছা নেহি কিয়া।

গৌতম বলল, ফির মারেগা, বহুত মারেগা। যা ভাগ। বুলা তেরি গফফুর বাবাকো। হট হিঁয়াসে।

আর কিছু বলতে হল না। খেঁকি কুকুরের মতো গলা করে বীরপুঙ্গবরা বাড়ির বাইরে গিয়ে ভ্যাংচাতে লাগল, হট হিঁয়াসে, হট হিঁয়াসে। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

তারপরই দরজার ওপর আবার একটা ইট।

গরম তেলে জল।

পল্টন আর গৌতম দু'জনেই তখন উঠোনের ওপর পড়ে থাকা একটা মরচে ধরা সাইকেলের চেন ও একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে ছুটে গেল বাইরে। গিয়েই যাকে সামনে পেল তাকেই পেটাতে লাগল। রীতিমতো রক্তারক্তি কাণ্ড। সে কী বেদম মার।

হইহই করে ছুটে এল লোকজন। ব্যাপার কী? এত মারামারি কেন?

গৌতম আর পল্টন সবাইকে খুলে বলল সব কথা।

কথায় বলে মারে ভূত ভাগে। তাই হল। চ্যাংড়ার দল কেটে পড়ল। তবে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে চাপা আক্রোশে ফুলতে লাগল সব। দুই বাঙালি কিশোরের এই বিক্রমে স্তব্ধ এবং হতচকিত হয়ে গেল সকলে।

পল্টন থানায় যাচ্ছিল।

কয়েকজন মুরুব্বি গোছের লোক মানা করল। বলল, পোলিশবালেকো পাশ মাত যাইয়ে। এ লোক আউর কুছ নেহি কিয়েগা। মাস্টারজি আচ্ছা আদমি। উনকা সাথ অ্যায়শা দুশমণি হামলোগ বরদাস্ত নেহি কীয়েগা।

ওরা যখন ফিরে আসছে, তখন দেখা গেল, বেশ কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে এলাকার সন্ত্রাস গফুরগুন্ডা একটা লোহার রড হাতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

গফুরকে দেখেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

মাতব্বররা বলল, তু চলা যা গফুর। তেরা আদমি নে কাম খারাপি কিয়া। ছোড় দো ইয়ে বাচ্চো কো।

গৌতম বলল, ছাড়াছাড়ির কী আছে? মস্তানি করতে হয় বাইরে করুক। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে আসে কোন সাহসে?

গফুর এসে সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দি ছবির ভিলেনের মতো ওদের দিকে তাকিয়ে রডটা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, তু কাঁহাসে আয়ারে চুনমুন? কাঁহাকা চিড়িয়া?

পল্টন আর গৌতম তখনও ফুলছে।

বৃদ্ধ সদাশিববাবু তখন দরজার কাছে চলে এসেছেন। গোপাও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সকলেরই চোখেমুখে ভয় ও উৎকণ্ঠা।

গৌতম বলল, তুমিই গফুর?

গফুর বাঘের বিক্রম নিয়ে বলল, পহলে বোল তু কাঁহাসে আয়া?

গৌতম বলল, কলকাত্তা সে।

যদি বাঁচতে চাস তো এখুনি চলে যা। তুরন্ত চলা যা হিঁয়াসে।

আমরা তোকে রিপিট করব বলে এসেছি গফুর। চলে যাবার জন্য নয়। যদি একান্তই যেতে হয় তা হলে তোকে নিয়েই যাব। মাস্টারমশাইকে একলা পেয়ে খুব রংবাজি করেছিস। এখন ভাল চাস তো পালা।

গফুর হতভম্ব। গত কয়েক বছরের মধ্যে ওর মতো একজন পেশাদার গুন্ডা ও খুনির সঙ্গে এই ভাবে কথা বলেনি কেউ। ওকে দেখামাত্রই দূর থেকে পালায় সব। যারা হঠাৎ করে সামনে পড়ে যায়, তারা ভয়ে থর থর করে কাঁপে। আর এই দুই স্ফুলিঙ্গ এত লোকের সামনে ওর বীরত্বের মর্যাদায় গোবর মাখিয়ে দিল। গফুর হাতের ডান্ডাটাকে শক্ত করে ধরে কাঁপতে লাগল থর থর

করে। রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখচোখ। কঠিন গলায় বলল, আল্লা কসম। এক ঘণ্টার মধ্যে তোরা এখান থেকে চলে যাবি। না হলে তোদের লাশও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গৌতম তখন মরচেধরা চেনটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, শোলে দেখেছিস গফুর? ওই সিনটাকে একটু মনে কর। আমরা দু'জন ধর্মেন্দ্র আর অমিতাভর রোল নিয়ে এসেছি। আর তুই হচ্ছিস সিনেমার সেই গব্বর সিং। ওরা গব্বরকে যেভাবে পিটিয়েছিল, আমরাও তোকে ঠিক সেইভাবেই পেটাব। আমরা তোকে এক ঘণ্টা নয়। মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিলুম। হয় যাবি, না হলে দেখছিস? বলেই চেন দেখাল।

গফুর আর ঠিক রাখতে পারল না নিজেকে। হিংস্র উন্মাদনায় ডান্ডা উঁচিয়ে মারতে গেল গৌতমকে। কিন্তু ও মারবার আগেই গৌতমের চেন গফুরের ঘাড় ও মাথার ওপর পড়েছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল গফুর, ইয়া আল্লা।

গৌতম একটা হেঁচকা টান দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পাশের কাদা ভরভর ড্রেনের ওপর পড়ল গফুর। তারপর যেই-না উঠে দাঁড়াতে যাবে অমনি পল্টনের এক লাথি। আবার যেই উঠতে যাবে আবার লাথি। ফের লাথি।

তবুও ওরই মধ্যে পাঁকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা শোল মাছের মতো পিছলে সরে এল গফুর। তারপর কাদামাখা রক্তমাখা দেহে উঠে দাঁড়িয়েই ডান্ডা ফেলে, চাকু বার করল। কত মানুষের জীবন যে ওই চাকুর মুখে গেছে তার হিসেব বুঝি গফুরেরও নেই।

সদাশিববাবু চিৎকার করে উঠলেন, কী হচ্ছে এসব। গফুর তোমায় জোড়হাত! তোমার দশ হাজার টাকা তুমি পাবেই। ওদের ছেড়ে দাও। আমার কথা রাখো।

গফুর বলল, অনেক দেরি হয়ে গেছে বুড়া বাবা। খোদার কসম খেয়েছি আমি! ওদের সিনা আমি ফুটো করবই।

গৌতমের চেন এবার গফুরের কবজির ওপর পড়ল। হেঁচকা একটা টান। চাকু ছিটকে পড়ল রাস্তায়! গৌতম সেটা কুড়িয়ে নিয়েই ওর একটা কান কচ করে কেটে দিয়ে বলল, যা ভাগ। জিন্দগিভর ইয়াদ রাখনা।

মুহূর্তের মধ্যে কী যে হয়ে গেল কেউ কিছু ভেবে পেল না। সেই বিখ্যাত গফুরগুন্ডা দুটি কিশোরের হাতে এমনভাবে পরাজিত হবে কেউ কি ভেবেছিল? হইহই করে উঠল সকলে। তা হলে গুন্ডা-বদমাশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তাদের প্রতিরোধ করা যায়? বস্তিবাসী সকলেই ছুটে এল এবার। এবং সবাই সমর্থন করল গৌতম ও পল্টনকে।

কানকাটা গফুরকে ওর দলের লোকেরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল।

সদাশিববাবু পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরও দু'চোখে তখন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। রণক্লান্ত গৌতম ও পল্টনকে বললেন, তোমাদের অভিনন্দন জানাবার মতো ভাষা আমার জানা নেই বাবা। আজ তোমরা যা করলে তার তুলনা হয় না। তোমরা চলে গেলে বিপদ হয়তো আমাদের আরও বাড়বে। তবু তোমরা এই ভাবে সর্বত্র জয়যুক্ত হও এই কামনা করি।

পল্টন বলল, আমরা এতটা উত্তেজিত হতাম না দাদুভাই। যদি না গোপাকে বিরক্ত করবার জন্য এগিয়ে আসত ওরা। তাতেই খুন চেপে গেল।

গৌতম বলল, আমরা না থাকলে ওরা জোর করে বাড়িতে ঢুকত।

পল্টন বলল, গোপাকে দেখেই আমার দিদিদের কথা মনে হল। তাদের কেউ অমর্যাদা করবে আর আমরা বসে বসে দেখব তা কী হয়? মা-বোনেদের মর্যাদা রক্ষা করতে যদি নিজের জীবনও বিপন্ন করতে হয়, তা করতেও আমরা প্রস্তুত।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই গোপার তখন ভাবান্তর। সে অবাক চোখে চেয়ে রইল পল্টন ও গৌতমের দিকে। গৌতমের সেই বিক্রম, ওর ওই সুন্দর সুগঠিত শরীরে রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গি, ওর ওইভাবে সিনেমার নায়কদের মতো চেন ঘোরানো, সবই নাটকের দৃশ্যের মতো মনে হল। ওর খুব ইচ্ছে হল দুটো জয়মাল্য পরিয়ে দেয় এই দুই বীর কিশোরের গলায়। কিন্তু মালা তো এখানে নেই। তাই ও চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেল।

গৌতম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু।

খুশিতে উপচে পড়ল গোপা। আনন্দে নন্দিত হয়ে ফুলেভরা মাধবী লতাটির মতো দুলে উঠল।

ওরা ঘরে এলে গোপা বলল, বসো। তোমাদের জন্যে চা করে আনছি।

গৌতম ও পল্টন সোফায় এলিয়ে দিল দেহটা।

ছয়

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর ভেতরবাড়িতে শুতে গেল ওরা। সদাশিববাবু বাইরের ঘরেই রইলেন। পল্টন আর গৌতম দু'জনেই শুয়ে শুয়ে নানারকম আলোচনা করতে লাগল। আলোচনাটা অবশ্যই গফুরকে নিয়ে। ওর কান কেটে সমুচিত শিক্ষা তো ওকে দিয়েছে। কিন্তু ওরা চলে গেলে এই ঝাপটাটা সত্যসুন্দরবাবু যে কী করে সামলাবেন সেটাও একটা ভাবনার বিষয়। আলোচনা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়ল পল্টন।

গৌতম শুধুই এপাশ ওপাশ করতে লাগল। টেবিলের ওপর প্লাস্টিক জাগে

জল ছিল। ঢক ঢক করে খেল খানিকটা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ছাদে উঠল।

এখানে এখন কনকনে ঠান্ডা। অথচ ছাদে কত রোদ্দুর। আর খোলা আকাশের নীচে এই ছাদের ওপর থেকে আজকের পাটনা বা অতীতের পাটলিপুত্র কী অপরূপ।

ছাদে উঠেই গৌতম দেখল গোপা সেই মিঠেকড়া রোদে বসে নিশ্চিন্ত মনে কেমন চুল শুকোচ্ছে। গৌতমকে দেখেই খুশিতে উপচে পড়ে বলল, কী হল! ঘুম হল না বুঝি সাহেবের?

না। পল্টনটা যা নাক ডাকাচ্ছে তাতে ঘুম আর আসবে না। তা ছাড়া দিনে আমি ঘুমোতে পারি না।

ঠিক আমারই মতো।

তুমি তা হলে দিনের বেলা না ঘুমিয়ে ছাদে বসে চুল শুকোও?

সব সময় নয়। তারপর বলল, তবে যা বীরত্ব তুমি দেখিয়েছ, তাতে একটু ঘুমিয়ে পড়া তোমার উচিত ছিল। তোমাকে দেখে তখন আমার কী মনে হচ্ছিল জানো?

তোমার মনের কথা আমি কী করে জানব?

আমার মনে হচ্ছিল তুমি সেই সিনেমায় দেখা স্বপ্ন কি সওদাগর। ভয় লাগছিল। আবার ভালও লাগছিল।

তাই নাকি?

তবে অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারতে।

তোমার জন্যই তো করলাম। যেই শুনেছি তুমি আসার পর থেকেই ওরা তোমাকে অযথা বিরক্ত করছে, অমনি মাথাটা গেল গরম হয়ে। মেয়েদের কেউ বিরক্ত করলে আমার খুব রাগ হয়।

গোপা গৌতমকে ছাদের আলশের দিকে টেনে নিয়ে গেল। তারপর বলল, ভাগ্যে বাবলিদির বিয়ে উপলক্ষে এখানে এসেছিলাম, তাই তো তোমার মতো একজন বীরপুরুষের দেখা পেলাম। এখানে এসে একা একা কী বোর যে লাগছিল তা কী বলব। তার ওপরে ওই উপদ্রব। অথচ কাকুমণি বা দাদুভাইকে ফেলে যেতেও পারছিলাম না। আজ এই যে বিয়ে বাড়িতে যাব আর ফিরছি না। আমি এখান থেকেই পালাব কাল! মাসে একবার গান শিখতে আসতাম। তাও আর আসা হবে না পাপেদের জ্বালায়। কাকুমণি যখন আমাদের ওখানে যাবেন তখনই একটু তালিম নিয়ে নেব।

গৌতম বলল, সেই ভাল। এখানকার যা অবস্থা তাতে আর তোমার এখানে না-আসাই উচিত। এলেও মাকে নিয়ে আসবে।

আমার না খুব ইচ্ছে করছে আমার মায়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে। আমার বন্ধুদের দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে যে, আজকালকার ছেলেরা সবাই কাপুরুষ নয়। আর সব গৌতমই, বুদ্ধদেব নয়। মগধের মাটিতে কলির গৌতমও পৌরুষে ঘা লাগলে চণ্ডাশোক হয়ে ওঠে। এতক্ষণ ছাদে বসে আমি তোমার কথা খুব বেশি করে ভাবছিলাম! আমার মতো এক অতি নগন্যা মেয়ের জন্যে আর একটু হলেই তুমি জীবন দিতে যাচ্ছিলে। যদি কোনও অঘটন ঘটত তা হলে কী হত বলো তো?

কী আবার হত? মরে যেতাম। সব মানুষই মরণশীল। তবে শত্রুর শেষ করে যদি মরতাম, তোমরা কিছুদিন শান্তিতে থাকতে। মনুষ্যত্বের বিকাশ তার বেঁচে থাকায় নয়, প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা রাখায়।

গোপা অবাক হয়ে গেল গৌতমের কথা শুনে। এইটুকু একটা ছেলের মুখে এমন জ্ঞানের কথা কী করে আসে? কতই বা বয়স গৌতমের? এখনও স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি হয়তো। সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। ও অপলকে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

গোপার দিকে চেয়ে থাকতে গৌতমেরও ভাল লাগল খুব। গোপার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ওর মুখে। আজকাল ফ্রকের বদলে মেয়েরা স্কার্ট পরে। গোপাও তাই পরেছে। লম্বা বেণীটি পিঠ বেয়ে কোমরের কাছে দুলছে। ওর ফর্সা রং রোদের ছটায় ফুট ফুট করছে। ঠিক যেন একটি গন্ধরাজ অথবা ঝরে পড়া শিউলি ফুলটি।

মাথার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল কোথায়।

গোপা বলল, তুমি কলেজে পড়?

উঁহু! সামনের এপ্রিলে ফাইনাল দেব।

মাধ্যমিক?

হ্যাঁ। তুমি?

আমি দেব সামনের বছর।

তারপর আরও পড়বে নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। আর্টস নিয়ে পড়ব। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনেছ তো?

শুনেছি। মদনমোহন মালব্য যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আমি সেইখানেই ভরতি হব।

তোমার কী ভাগ্য।

তোমার ভাগ্যটাই বা খারাপ কী? বাঙালির ছেলে বাংলায় আছ। বাংলা পড়ছ। একাধিক স্কুল-কলেজ আছে। আমাদের তো সবই হিন্দি। তবে লেখাপড়ার মান খুব একটা খারাপ নয় আমাদের। ক' ভাইবোন তোমরা?

আমি আর আমার বোন।

আমি একা। বাবা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। শুধু মা আর আমি! অগস্তকুণ্ডার গলিতে একটা ছোট্ট বাড়ি আছে আমাদের। সেখানেই থাকি।

তবে যে শুনলুম কাশীতে থাক।

কাশীতেই তো। যে কাশী সেই বারাণসী। অগস্তকুণ্ডা কাশীরই একটা জায়গার নাম। গোধুলিয়ার মোড়ের কাছে।

গোধুলিয়া! ভারী চমৎকার নাম তো।

কাশীর চৌরঙ্গি হল গোধুলিয়া। সবচেয়ে ব্যস্ত এবং যানজটের জায়গা। একবার এসো না আমাদের কাশীতে। খুব ভাল লাগবে তোমার। আমি তোমায় সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাব। গঙ্গার ওপারে ব্যাসকাশী নিয়ে যাব। সারনাথে গৌতমবুদ্ধ যেখানে পঞ্চশিষ্যকে সর্বপ্রথম উপদেশ দেন, সেখানে যাব।

আমি যাব। নিশ্চয়ই যাব।

যেয়ো। তোমার আমার বন্ধুত্ব যেন এখানেই শেষ না হয়ে যায়। আমার মাকে তোমার কথা বলব। এই শীতেই তোমার বাবা-মাকে নিয়ে চলে এসো কাশীতে। তোমরা আমাদের বাড়িতেই থাকবে। আমরা সবাই মিলে হইচই করব। তোমার বোন, আমি, তুমি সব সময় গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরব। বেণীমাধবের ধ্বজায় উঠব।

খুব ভাল হবে। তোমার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। আমার ঠিকানা তুমি নিয়ো। তুমি আমাকে চিঠি লিখবে। আমি তোমাকে চিঠি লিখব। আসলে আমার অনেক ছেলেবন্ধু আছে। মেয়েবন্ধু একজনও নেই। তাই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার খুব ইচ্ছে করছে। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে ভালই হয়।

এমন সময় পল্টন এসে হাজির হল সেখানে। বলল, কী রে! ছাদে এসে কী করছিস?

গোপার সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম।

এদিকে যে তিনটে বাজল। তৈরি হতে হবে না?

গোপা বলল, তিনটে বেজে গেছে? তা হলে আর নয়। চলো তোমাদের একটু চা করে খাওয়াই। দাদুভাইকে চা দিই।

পল্টন বলল, চা খাওয়াও আর যাই করো, কদমকুঁয়ায় গিয়ে বাবলিদির বিয়ের আসরে তোমার একটা গান কিন্তু আমরা শুনব।

নিশ্চয়ই শুনবে। একটা কেন? যত বলবে তত গাইব। তবে যে গান গাইব সে গান শুনলে তোমরা কিন্তু কানে আঙুল দেবে।

কেন?

সে দোষ অবশ্য আমার নয়। কাকুমণি তো আমাকে বাসরঘরে গাইবার গান শেখাননি। উনি শিখিয়েছেন উচ্চাঙ্গ সংগীত। খেয়াল-ঠুংরি এই সব।

গৌতম ও পল্টন হেসে উঠল হো হো করে।

ওপর থেকে নেমে এসেই ওদের সাজগোজের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গেল। ওইটুকু মেয়ে। কিন্তু কী চটপটে। হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে দুধ, চিনি, চা-পাতা এক সঙ্গে ফুটিয়ে চোখের পলকে করে ফেলল কয়েক কাপ চা। তারপর বাথরুমে ঢুকে একটু সাবান মেখে তৈরি হয়ে নিতে যেটুকু সময়।

সদাশিববাবু ধুতি-পাঞ্জাবি-শাল চড়িয়ে বললেন, নাতনির বিয়ে। কত আনন্দ করব, তার জায়গায় কী হয়ে গেল। এখন ঘর ফেলে বেরোতে ভয় করছে।

পল্টন বলল, কোনও ভয় নেই দাদুভাই। আজ সকালে যা হয়ে গেছে তারপরে আর কোনও মিঁয়া আসবে না এখানে ঝামেলা করতে। গফুরও তো এখন নার্সিংহোমে। আগে ও নিজের কান সামলাক। পরে অন্যের প্রাণ নেবে।

ওরা ঘরে তালাচাবি দিয়ে বাড়ির বাইরে এল।

গলির মোড়ে যে পানওয়ালাটা ছিল সদাশিববাবু তাকে বললেন, তুমি তা হলে দোকান বন্ধ করে সময়মতো যেয়ো বচনভাই। আর একটু নজর রেখো বাড়িটার দিকে।

বচনভাই বলল, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না বাবুজি। আজ আর কোনও ভয় নেই। যে মার খেয়েছে সব, ধারেকাছে কেউ নেই। আসলে এদের আমরা চিনি তো, এদের স্বরূপ দেখেছি। তাই ভয়ে কিছু বলতে পারি না। এই ছেলেদুটো হচ্ছে নতুন। উঠতি হিরো। টগবগে বয়স। কাজেই রাগের মাথায় দিয়েছে পিটিয়ে। তবে এই বয়সের ছেলে যে এত দুঃসাহসী হয়, তা কিন্তু ভাবিনি কেউ। গফুরের ইজ্জত একেবারে ধুলোয় লুটিয়েছে।

সদাশিববাবু একটু হেসে বড় রাস্তায় রিকশার দর করতে যেতেই একটা মোটর এসে থামল সেখানে। এক সুদর্শন যুবক সদাশিববাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকেই নিতে আসছিলাম। মাস্টারমশাই পাঠালেন।

তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না বাবা!

আমি ওনার ছাত্র। প্রকাশ।

কিন্তু আমরা যে চার জন।

গাড়িতে আরও তিনজন ছিলেন। অবাঙালি। প্রকাশ বলল, দু'জন হতে পারে। দু'জন উঠে আসুন, আর দু'জন রিকশায় চলে যাক।

পল্টন বলল, সেই ভাল। গোপাকে নিয়ে আপনি উঠে পড়ুন। আমরা রিকশায় যাই।

সদাশিববাবু আর গোপা মোটরে বসল।

পল্টন আর গৌতম চলল রিকশাতে। রিকশা এগিয়ে চলল, কদমকুঁয়ার পথে।

বেশ কিছুটা পথ এসেছে এমন সময় অঘটন।

হঠাৎ কোথা থেকে হেলমেটপরা এক দানব স্কুটার চালিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এল ওদের দিকে। তারপর পল্টনদের রিকশার চাকায় একটা ধাক্কা দিয়েই কেটে পড়ল চোখের পলকে।

হালকা রিকশা সেই আঘাত সহ্য করতে পারবে কেন? তাই ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই উলটে গেল রিকশাটা। পল্টন আর গৌতম দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল রিকশা থেকে। পল্টন একেবারে ড্রেনের ওপর। আর গৌতম রাস্তার মাঝখানে। রিকশাওয়ালাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা লরির কাছে। ভাগ্য ভাল যে চাকার তলায় যায়নি।

আশপাশ থেকে অনেক লোক তখন একসঙ্গে হইহই করে ছুটে এল সেখানে। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে ওদের টেনে তুলল। গৌতমের হাত-পা ছড়ে গেছে। জামাটাও ছিঁড়ে গেছে এক জায়গায়। শুধু তাই নয়, চিৎ হয়ে পড়ার জন্য মাথার পিছন দিকেও লেগেছে খুব। আর পল্টন? তার অন্য কিছু না হলেও ড্রেনের ময়লায় জামাপ্যান্ট মাখামাখি হয়ে গেছে।

পাশের একটি কল থেকে জল নিয়ে সেসব ধুয়েমুছে ফেললেও দাগ একটা রয়েই গেল। তার ওপর এই শীতকালে ভিজে জামাপ্যান্টে যেন কাঁপুনি ধরে গেল সারা শরীরে। একটি ওষুধের দোকানের কর্মচারীরা সহৃদয়ভাবে গৌতমকে একটু ফার্স্ট এড দিয়ে ছেড়ে দিল। সবই হল। এখন সমস্যা যেটা দাঁড়াল সেটা হল, এই অবস্থায় এই রকম ভেকে বিয়ে বাড়ি যাওয়া যায় কী করে?

যে রিকশায় ওরা আসছিল, সে রিকশার অনেক কিছুরই ক্ষতি হয়েছে। তাই সে আর যেতে চাইল না। ওরা তাই অন্য আর একটি রিকশা ভাড়া নিয়ে এগিয়ে চলল কদমকুঁয়ার পথে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই কদমকুঁয়ায় পৌঁছে গেল ওরা।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। সানাইয়ের পাগল করা সুরে সুরভিত আলোঝলমল একটি বিয়েবাড়ির সামনে ওরা রিকশা থেকে নামল।

সত্যবাবু কাছাকাছিই ছিলেন। অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করছিলেন। ওদের দেখেই ছুটে এলেন, কী ব্যাপার! এ কী অবস্থা তোমাদের?

গৌতম বলল, আর বলবেন না। একটা স্কুটার এসে এমন ধাক্কা দিল রিকশাতে যে তার পরেই এই অবস্থা।

এঃ। তোমার তো অনেক জায়গাতেই চোট লেগেছে দেখছি। লোকটা ধরা পড়ল?

কে ধরবে? কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই তো হাওয়া। যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমনই চলে গেছে।

সত্যবাবু পল্টনের হাত ধরে বললেন, এসো এসো, ভেতরে এসো। আপাতত

আমার একটা ধুতি পরে শাল চাপাও গায়ে। না হলে এই ঠান্ডায় ভিজে পরে থাকলে অসুখ করে যাবে। বাবা কি তোমাদের সঙ্গেই আসছেন? না পরে আসবেন? আমি অত করে বলে এলাম একটু সকাল করে আসতে। বুড়োমানুষ।

গৌতম বিস্মিত হয়ে বলল, সে কী! উনি আসেননি?

কই ন্না—তো!

ওঁর তো আমাদের আগেই এসে যাওয়ার কথা। গোপাকে নিয়ে উনি মোটরে এসেছেন।

মোটর কোথায় পেলেন?

গৌতম আর পল্টন তখন সব বলল।

সত্যবাবু বললেন, সেরেছে। আমার ছাত্রদের কি বাবা চেনেন না? তা ছাড়া প্রকাশ নামে আমার কোনও ছাত্রই নেই।

গৌতম ও পল্টনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কাকিমা কান্নাকাটি করতে লাগলেন। সত্যবাবুকে দোষারোপ করে বললেন, যত নষ্টের গোড়া হচ্ছ তুমি। কী দরকার ছিল এত সব ঝামেলার? গফুরকে একটু বুঝিয়েবাঝিয়ে ওর কথাটা মেনে নিলেই তো ব্যাপারটা চুকে যেত। এখন সারাজীবন শত্রুতা করবে ও। বাবা বুড়োমানুষ। কোনওরকম হেনস্থাই তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তা ছাড়া গোপা পরের মেয়ে। ওর মাকে আমরা কী কৈফিয়ত দেব?

হঠাৎই বিয়েবাড়িতে একটা শোকের ছায়া নেমে এল। সানাইয়ের সুর নীরব হল। অতিথি অভ্যাগতদের মুখে কথা নেই।

এরই মধ্যে পল্টন ওর পোশাক পরিবর্তন করল।

বাবলিদি কী সুন্দর করে সেজেছিলেন। কিন্তু কান্নার অশ্রুতে সেই সাজের বাহার অনেকটাই ম্লান হয়ে গেল। গৌতম আর পল্টনকে কাছে টেনে বাবলিদি বললেন, তোমরা এসেছ এ যে আমার কী আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দের দিনে এমন এক নিরানন্দের ব্যাপার ঘটে গেল যে তোমাদের সঙ্গে ভাল করে কথাও বলতে পারছি না। কারা এ কাজ করল বল তো? গফুর, না আর কেউ?

পল্টন বলল, আর কেউ কেন হবে বাবলিদি?

আমার মনটা যেন তাই বলছে। আচ্ছা, প্রকাশ না কী যেন নাম বললে, কেমন দেখতে তাকে?

খুব সুন্দর। ভদ্র-চেহারা। তা ছাড়া মোটরেও তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য সবাই অবাঙালি। আমরা ভাবলাম তাঁরা নিশ্চয়ই বিয়ে বাড়িতেই আসছেন, তাই কোনও সন্দেহ হল না।

তবেই বোঝো। গফুরকে তো তোমরা দেখনি। তা হলে বুঝতে ওর সঙ্গে

কোনও ভদ্র-চেহারার মানুষের যোগাযোগই সম্ভব নয়।

পল্টন বলল, দেখিনি মানে? আমরা ওর কান কেটে ছেড়ে দিয়েছি আজ।

পল্টনের কথা শুনে বাবলিদি অবাক। কাকিমা এবং সত্যবাবুও বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কী রকম!

গৌতম বলল, আপনারা জানেন না? গফুরের ব্যাপার নিয়ে পাটনা শহর তোলপাড় হচ্ছে আজ।

সত্যবাবু বললেন, আমরা কেউ কিছু জানি না। আসলে সারাটা দিন বিয়ে বিয়ে করে ধকলটা যাচ্ছে, তার ঠ্যালা সামলাতেই অস্থির হয়ে উঠেছি। কোনও কথাই কানে আসেনি আমাদের। কোনওদিকেই মন দিতে পারছি না।

কাকিমা বললেন, কী হয়েছে আগাগোড়া সব ব্যাপারটা খুলে বলো তো?

পল্টন আর গৌতম সবিস্তারে বলল সব।

শুনে কপাল টিপে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সত্যবাবু। তাঁর মাথার ভেতরটা যেন ঝিমঝিম করতে লাগল।

বাবলিদি বললেন, এই যদি হয়ে থাকে তা হলে দাদুভাই আর গোপাকে যারা নিয়ে গেছে তারা গফুরের লোক নাও হতে পারে! গফুর নিজেই যেখানে আহত সেখানে এমন প্ল্যানমাফিক অপহরণ করবার মতো সাহস এবং বুদ্ধিটা জোগাবে কে? শুধু কী তাই? ওই রিকশার ব্যাপারটাও নিছক দুর্ঘটনা নয়। ওটাও পরিকল্পনামতো শয়তানি। শত্রুপক্ষ যেই হোক না-কেন, সে ওদের দু'জনকেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

গৌতম বলল, তা যদি হয় এ তা হলে গফুরেরই কাজ। আমরা ওর কান কেটেছি। এর পরেও ও প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না তা কী হয়? আমাদের ওপর রাগ হওয়াটা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। এখানে অন্য কেউ আসে কোত্থেকে?

বাবলিদি বললেন, গোপাকে যেভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তাতেই অন্য লোকের সন্দেহটা মনের মধ্যে উঁকি মারছে। বিশেষ করে আজ কয়েক বছর এইসব এলাকা থেকে ছেলেমেয়ে চুরির হিড়িক পড়ে গেছে একটা।

কিন্তু সেইসঙ্গে দাদুভাইকেও নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী?

সন্দেহমুক্ত হবার জন্য। ওরা শুধু গোপাকে নিতে চাইলে তোমরা কি যেতে দিতে?

না।

তা হলে?

এমন সময় গৌতম হঠাৎ বলল, আচ্ছা বাবলিদি, এমনকী হতে পারে না? মাথামোটা গফুরকে পরিচালনা করত হয়তো একটি বিশেষ দল! তারা হয়তো সমাজের কোনও বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তারা এমনভাবে সবার চোখের

আড়ালে থাকত যে, তাদের সন্দেহও করত না কেউ। তারাই হয়তো গফুরকে দিয়ে খারাপ খারাপ কাজগুলো করিয়ে প্রোটেকশন দিত। এখন গফুর বেকাদায় পড়ায়, তারা ধরা পড়ার ভয়েই হোক বা গফুরের ইমেজ নষ্ট হলে নিজেদের স্বার্থে ঘা পড়বে ভেবেই হোক, নিজেরাই ফিল্ডে নেমে পড়েছে।

ঠিক। তোমার অঙ্কে এতটুকুও ভুল নেই। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ গৌতম। এখন এই মুহূর্তে ওরা তোমাদের মেরে গোপাকে অপহরণ করে সমস্ত অপরাধগুলো গফুরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। এখন যা কিছুই হোক-না-কেন সবাই সন্দেহ করবে গফুরকে। এমনকী পুলিশও এই সব অভিযোগের ভিত্তিতে গফুরকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য। অতএব ভেবে দেখতে হবে এই অলক্ষ্য শত্রুটি কে?

সত্যসুন্দরবাবু সব শুনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, শোনো আমাকে এখুনি একবার যেতেই হচ্ছে থানায়। তোমরা একটু সাবধানে থেকো। বর আসবারও সময় হয়েছে। তবু আমাকে যেতে হচ্ছে। আমি না-আসা পর্যন্ত বাইরের কোনও লোককে তোমরা ওপরে উঠতে দেবে না। যে কোনও একজনকে আমি সিঁড়ির মুখে মোতায়েন রাখছি। বাবলির ঘর ভেতর থেকে বন্ধ থাকবে। ও ঘরে কেউ যেন না ঢোকে। পল্টন আর গৌতম থাক বাবলির কাছে। ওর ঘরে টাকাকড়ি, গয়নাগাটি সব কিছুই আছে। ও জিনিস খোয়া গেলে বিয়েই বন্ধ হয়ে যাবে হয় তো।

গৌতম বলল, আপনি একা যাবেন? আমিও যাই না কাকুমণি আপনার সঙ্গে?

খবরদার নয়। ওই শত্রুদের হাতে তোমাদের জীবনও বিপন্ন। ওরা যেখানে তোমাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করছে, সেখানে এই রাতের অন্ধকারে কখনও বাইরে বেরোয়? ঘরেই থাকো তোমরা।

কাকিমা বললেন, তাই বলে তুমি একা যাবে? কাউকে অন্তত সঙ্গে নাও। রঘুরাইকে ডাকাব?

আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।

সত্যবাবু আর একটুও দেরি না করে, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। তাঁর কয়েকজন ছাত্রও তখন এসে উপস্থিত হয়েছে। সত্যবাবু তাদের সকলকেই খুলে বললেন সব কথা। তারপর বর এলে যাতে অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি না হয়, এই রকম পরামর্শ দিয়ে থানায় যাবার জন্য যেই-না স্কুটারে উঠতে যাবেন, অমনি একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল সেখানে।

একজন ইনস্পেক্টর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ আপনার মেয়ের বিয়ে। কিন্তু এই শুভদিনে একটা খুব খারাপ খবর নিয়ে আসতে হল আমাকে।

সত্যবাবু আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ছল ছল চোখে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, আমার বাবার ডেড বডিটা ওরা কোথায় ফেলে রেখেছে?

আপনি জানতেন ব্যাপারটা?

হ্যাঁ। একটু আগেই খবর পেলাম। তা যাক। বলুন ডেড বডিটা কোথায় পাওয়া গেছে?

মহেন্দ্রুঘাটের কাছে। তবে উনি মৃত নন। সম্ভবত ওনাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

মেয়েটার খবর কী?

মেয়েটা! কোন মেয়েটা?

আমার ছাত্রী গোপা। চোদ্দো-পনেরো বছরের কিশোরী।

তা তো বলতে পারব না। তবে আপনার বাবাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তুলে এনে হসপিটালে ভরতি করা হয়েছে। উনি কথাই বলতে পারছেন না। কাজেই মেয়েটার ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ওঁর মুখে না শুনে তো কিছু করা যাবে না।

সত্যবাবু বললেন, বাবাকে যখন মহেন্দ্রুঘাটের কাছে পাওয়া গেছে, তখন মেয়েটাকে নিশ্চয়ই ওরা কাছে রাখেনি। জলপথে পাচার করেছে। আপনারা যে ভাবেই হোক উদ্ধার করুন তাকে। পারলে গফুরগুন্ডাকে অ্যারেস্ট করুন।

মেয়েটার একটা ফটো দিতে পারবেন?

না। ফটো কোথায় পাব?

তা হলে তো কিছুই করতে পারব না আমরা।

বেশ। আপাতত গফুরকে অ্যারেস্ট করুন। ও-ই সব বলবে। এটা ওরই কাজ। দলের লোক দিয়ে করিয়েছে।

ইনস্পেক্টর বললেন, গফুরকে কোথায় পাব? সে তো আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সত্যবাবু হেসে বললেন, দেখুন মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আপনারাই তো আশকারা দিয়ে মাথায় তুলেছেন ওদের। নেলোগুন্ডা, গফুর— এরা আপনাদের মদত না-পেলে এত বাড় বাড়তে পারে? আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। আপনি গফুরকে যে ভাবেই হোক ধরুন। ওকে ধরলেই মেয়েটাকে পেয়ে যাব।

দেখুন, গফুরকে ধরবার সাধ্য আমাদের নেই। তবে মেয়েটার ব্যাপারে আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি। এখন আসুন আপনি আমাদের সঙ্গে হসপিটালে। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করুন, আর থানায় গিয়ে আমাদের খাতায় একটা মিসিং ডায়েরি লিখিয়ে যান।

ততক্ষণে পল্টন-গৌতম সবাই নেমে এসেছিল নীচে। কাকিমাও এসেছিলেন।

গৌতম বলল, চলুন তো। আমরাও আপনার সঙ্গে যাই। থানায় গিয়ে ও সি-র সঙ্গে দেখা করে বলি গফুরকে ধরতে, পুলিশের বাধাটা কোথায়?

ইনস্পেক্টর বললেন, ও সি কেন? স্বয়ং পুলিশ কমিশনার এলেও অ্যারেস্ট করতে পারবে না গফুরকে।

কেন?

সে অমরাবতী নার্সিং হোমে এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে আজই দুপুরে। তার ডেড বডি এখন পুলিশমর্গে। প্রকাশ্য দিবালোকে আততায়ী নার্সিং হোমে ঢুকে বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে ওকে।

সত্যবাবু বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, গফুর খুন হয়েছে! ওকে মারে এমন দুঃসাহস কার?

হয়তো আপনার। নয়তো যে সাহসী ছেলেদুটো ওর কান কেটে দিয়েছিল তাদের। তাও যদি না হয়, বিরুদ্ধ কোনও শক্তি কাজ করেছে ওর বিপক্ষে।

গৌতম বলল, গোপাকে যারা অপহরণ করেছে তাদের মধ্যে এক সুদর্শন যুবকও ছিল। নাম প্রকাশ।

সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। আমার দিক থেকে আমি অবশ্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখব না।

সত্যবাবু বললেন, ধন্যবাদ। মেয়েটার জন্য কিছু অন্তত করুন। ওকে খুঁজে না পাওয়া গেলে হয়তো আমাকে সুইসাইড করতে হবে। বিধবার একমাত্র সন্তান। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না আমি।

সত্যবাবু পুলিশের জিপেই চলে গেলেন। কাজেই স্কুটার নিয়ে যাবার প্রয়োজন আর হল না তাঁর।

সত্যবাবু চলে যাবার পরমুহূর্তেই বরের গাড়ি এসে হাজির হল। কাকিমাই চোখের জলে বরণ করলেন জামাইকে। এ বাড়ির বিপদের কথা তখন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। বরকর্তা বললেন, আপনারা কোনওরকমেই নিজেদের অসহায় ভাববেন না। শুভ কাজ মিটিয়ে নেওয়ার দায়িত্বটা আমিই নিচ্ছি। পুরোহিতের কাজ পুরোহিত করুক।

কাকিমা যেন আশার আলো দেখতে পেলেন।

সাত

সত্যবাবুর ছাত্রদের মধ্যে কাছাকাছি বাড়ি ছিল একজনের। সেসব শুনেটুনে পল্টন ও গৌতমকে নিয়ে গেল ওদের বাড়ি। তারপর নিজের প্যান্টজামা, সোয়েটার ইত্যাদি পল্টনকে পরতে দিল।

পল্টন বলল, তুমি যখন এতই করলে ভাই, তখন কিছু টাকার ব্যবস্থা আমাদের করে দাও। সঙ্গে রাখি। দাদুভাইকে যখন মহেন্দ্রুঘাটের কাছাকাছি পাওয়া গেছে তখন ওরা নিশ্চয়ই গঙ্গার ওপারে পাচার করেছে গোপাকে।

হতে পারে। ওপারে ছাপরা জেলা। হয়তো বা শোনপুরের ভেতর দিয়ে পাচার করেছে উত্তরপ্রদেশে বা অন্য কোথাও। কিন্তু তোমরা দু'জনে এই অচেনা জায়গায় রাতদুপুরে ওদের খোঁজে যাবে নাকি?

ইচ্ছেটা তাই।

খুব সাবধান। মহেন্দ্রুঘাটের এলাকাটা মোটেই ভাল নয়।

আমরা এমনভাবে যাব যাতে কেউ টেরও পাবে না।

কিন্তু তোমরা তো আদৌ চেনোই না জায়গাটা। খোঁজখবর করে যেতে গিয়ে যদি নতুন করে তোমাদেরই কোনও বিপদ হয়?

কী আর করা যাবে? তবু আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি যদি কোনও ক্লু পাই। অর্থাৎ মেয়েটাকে ওরা ওইখান দিয়েই নিয়ে গেছে কি না বা যদিও নিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে কীভাবে এবং ঠিক কতক্ষণ আগে—একটু জানবার চেষ্টা করি।

ছেলেটি বলল, মাস্টারমশাই ফিরে এসে যদি জানতে চান তোমাদের কথা, তা হলে কী বলব?

সত্যি কথাই বলবে।

পল্টন ও গৌতম আর দেরি না করে কদমকুঁয়ার মোড় থেকে একটা রিকশা নিয়ে মহেন্দ্রুঘাটে এল। আলোঝলমল পাটনা শহরের পথঘাট তখনও জমজমাট। ঘাটের কাছে একটি হনুমানমন্দিরে তখন ঢোল-খোল পিটিয়ে জোরে গানবাজনা হচ্ছে। এখানটা কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। ওরা রিকশা থেকে নেমে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে রাখতে লঞ্চঘাটের দোতলা কফি হাউসে উঠে এল। আর ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ওরা।

প্রকাশ নামের সেই সুদর্শন যুবক তখন এক কোণে বসে এক সর্দারজির সঙ্গে চাপা গলায় কী যেন বলছে ফিসফিস করে আর কফি খাচ্ছে।

ওরা ইচ্ছে করেই সেদিকে না-তাকানোর ভান করে ওদের দিকে পিছু হয়ে দু'কাপ কফির অর্ডার দিল।

এই শীতেও যেন গায়ে ঘাম দিচ্ছে ওদের।

এরই ফাঁকে ওরা আড়চোখে দেখে নিল প্রকাশের চেয়ারের পাশে মেঝেয় একটা অ্যাটাচি রাখা আছে।

পল্টন বলল, যে ভাবেই হোক ওই অ্যাটাচিটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতেই হবে।

গৌতম বলল, কী ভাবে নিবি?

পল্টন বলল, তোর কাছে কিছু টাকা রাখ। একটু পরেই আমরা দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশপাশে কোথাও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকব। তারপর ওরা যেই উঠে আসবে অমনি তুই একটা ল্যাং দিবি লোকটাকে। অথবা পড়ে যাওয়ার ভান করবি। সেই সুযোগে আমি ওটা ছিনিয়ে নিয়ে পালাব।

পারবি তো?

পারতেই হবে।

যদি ধরা পড়িস?

তা হলে ও নিশ্চয়ই আমাকে পুলিশে দেবে। আর পুলিশে দিলে, পুলিশকেই আমরা সব কথা খুলে বলব।

গৌতম বলল, আমার কাছে এখন সবচেয়ে রহস্যের ব্যাপার কী জানিস?

কী?

এইরকম একজন অপরাধী একটি খুন, একটি আধা খুন এবং মেয়েচুরির মতো নোংরা কাজ করেও শহরের বুকে এমন প্রকাশ্য জায়গায় বসে আছে কী করে?

তার একমাত্র কারণ ও ধরেই নিয়েছে ওকে চেনা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। গফুরকে খুন করেছে ওদের পোষা গুন্ডা। দাদুভাইকে চলন্ত মোটর থেকে যেভাবে ফেলে দিয়েছে, তাতে ওরা ধরেই নিয়েছে সেই মহাপতনেই বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটবে। আর গোপাকে অপরহরণ? ও তো শুধু নিয়েই এসেছে। তাকে নিয়ে গেছে অন্য লোক। ওর কাজ হয়তো শেষ। তা ছাড়া ওর চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে রীতিমতো ধনী লোকের ছেলে ও। কাজেই ওকে সন্দেহ করা বা ওর নাগাল পাওয়া একটা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। টাকার পাহাড় দিয়ে ওর সমস্ত অপরাধ হয়তো ওর বাবা ঢেকে দেবে।

ওরা যখন এই সব আলোচনা করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা দু'জনে কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। সর্দারজি আর প্রকাশ।

পল্টন ও গৌতম সতর্ক হয়ে সরে দাঁড়াল অন্ধকার ঘেঁষে একপাশে।

ওপার থেকে একটি লঞ্চ এপারে আসছে। হয়তো ওরা পার হবে এই লঞ্চে।

গৌতম বলল, এখনই আক্রমণ না করে ওদের পিছু নে পল্টন। লঞ্চে গেলে ওদের ফলো করতে অসুবিধা হবে না। মোটরে গেলেই বিপদ।

তবে ওরা লঞ্চ এপারে এলেও ধরবার জন্য এগোল না। গেটের কাছে থমকে দাঁড়াল।

দু'জন ভোজপুরী সভয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

প্রকাশ বলল, সব ঠিক হ্যায়?

বহুত গড়বড় হো গয়া শংকরজি।

ক্যা হুয়া?

ও অচানক পানিমে কুদ পড়ি।

ইম্পসিবল!

ইচ্ছা করকে কুদ পড়ি ও। লাফিয়ে পড়েছে।

তুমি টেলিফোন কিঁউ নেহি কিয়া?

ফোন নাম্বার তো মুঝে মালুম নেহি।

সর্দারজি বাংলায় বলল, আরে বাবা লঞ্চের কাউন্টারে গেলে তো এপারে রিং করে দিত। তা ছাড়া তোমরাও তো সঙ্গে সঙ্গে জলে লাফিয়ে পড়তে পারতে?

আন্ধেরিমে কুছ মালুম নেহি হুয়া ও কীধার গিরে হুয়ে।

তুমহারে লিয়ে ইয়ে দশ হাজার রুপাইয়া হামারা লুকসান হো গিয়া। আব ম্যায় ক্যা করুঁ?

ভোজপুরী দু'জন নীরব।

সর্দারজি বলল, শেঠকো এ রুপিয়া বাপস দে দো শংকরভাইয়া। আউর উধার নয়নাগিরিমে ফোন কর দো মাল নেহি পঁহুছেঙ্গে।

শংকর বলল, তুম এক কাম করো। রাতভর চক্কর লাগাও। ও ডেড বডি পুলিশকো নেহি মিলনা চাইয়ে।

সর্দারজি বলল, মিলনে সে ভি লুকসান ক্যা হোগা? দিস ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। আমরা তো ওকে মার্ডার করে ফেলে দিইনি। কাজেই পুলিশি ঝামেলা কিছু হবে না।

আরে তুমি বুঝছ না কেন দয়ালদা, মার্ডার আমরা না করলেও কিডন্যাপ তো করেছি। এদিকে গফুরের কেসটা আমাদের ঘাড়ে চাপছে।

ওকে মার্ডারই বা করল কে?

নেলোর দল, আবার কে? গফুরের জন্য মাথা তুলতে পারছিল না। এখন এই ব্যাপারটাতেও আমরা জড়িয়ে পড়লাম। পুলিশ ভাববে কোনও পুরনো শত্রুতার প্রতিশোধ নিতেই বুঝি আমরা ওকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছি। তার মানে দু' দুটো মার্ডার কেস।

আর মেয়েগুলো কোথায়?

ডিসুজার বাংলোয় আছে। ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে ওদের। গফুরের খুনের

ব্যাপারটা না ঘটলে আজই পাচার করে দিতাম। তবে ওদের পাচার করতে হবে মুখখোলা কফিনে পুরে ওষুধের ভ্যান গাড়িতে।

ওরা কথা বলতে বলতেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল।

ওরা নেমে যাওয়ার পর পল্টন ও গৌতমও নেমে এল। ভোজপুরীদুটো গিয়ে ঢুকল একটা বস্তির খোলার ঘরে। গৌতম ও পল্টন ভিলেনদের পিছু নিল।

যেতে যেতে চাপা গলার কথাবার্তা শুনতে পেল ওরা। প্রকাশ ওরফে শংকর বলল, মেয়েটার ওপর অনেকদিন ধরেই নজর ছিল আমার। চমৎকার মেয়ে। বয়স কম। বেনারসে থাকে। লুকিয়ে ওর বাড়িও আমি দেখে এসেছি। কৃষ্ণমূর্তিজি যেমনটি চাইছিলেন ঠিক সেইরকম। বেনারসে সুবিধে করতে পারিনি। তাই এখানেই কতদিন ওত পেতেছিলাম। আজকেই মওকা মিলল। বাবার বিজনেস পার্টনারদের নিয়ে রুবি হাউসে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি মাস্টারজির বাবা মেয়েটিকে নিয়ে রিকশা খুঁজছেন। দুটো ছেলেও ছিল সঙ্গে।

গফুরের কান কেটে দিয়ে যে ছেলেদুটো?

সম্ভবত। আমিও একটা টোপ ফেলে দেখলাম লাগে কি না। ভাগ্য ভাল। বঁড়শিতে মাছ গিঁথল। ওরা গাড়িতে উঠতেই আমি করলুম কী, রুবি হাউসে পার্টনাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ছোটালাম মহেন্দ্রুঘাটের দিকে। বুড়োটা চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকতে গেল। তাই দিলাম এক ঝটকায় গাড়ি থেকে ফেলে। মেয়েটাকে বললাম, খুব সাবধান। চেঁচালেই বিপদ হবে। তা মেয়েটা তখনকার মতো চুপ করে গেল। আমি ওকে সোজা নিয়ে গিয়ে তুললাম ডিসুজার বাংলোয়। ডিসুজা আগের মেয়েগুলোকে তখনও বাগে আনতে পারেনি। তার ওপর কোত্থেকে দুটো ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। সব এক সঙ্গে পাঠাতে চায়।

সর্দারজি ওরফে দয়ালদা বলল, ডিসুজার দিকটা উনি সামলান। তুমি এক কাজ করো, এই মেয়েটার ব্যাপারে একটু নজর রাখো। মেয়েটি জলে ঝাঁপ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যদি ও কোনওরকমে প্রাণে বাঁচে তা হলে কিন্তু ঘোর বিপদ।

বিপদ কীসের?

বিপদের রাস্তাটা তুমিই তো দেখিয়েছ ভাই। ওকে ডিসুজার বাংলোয় নিয়ে যেতে তোমাকে কে বলেছিল? তা ছাড়া এতদিন এ লাইনে আছ, এখনও বুঝলে না, যারা বাধা না দিয়ে ভাল মানুষের মতো চুপচাপ থাকে, তারাই সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়। মেয়েটি ভয় পাওয়ার ভান করে চুপ হয়ে গিয়েছিল। আর তুমি ভাবছিলে ও বুঝি পোষা হরিণের মতো তোমার বাধ্য হয়ে গেছে। তা ছাড়া এও জেনে রেখো, জল এমন মারাত্মক জিনিস যে সাঁতার জানে না সে কখনওই নিজের থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে না।

তোমার এ যুক্তিটা আমি মানতে পারলাম না। মেয়েটি আত্মহত্যার জন্যেও তো জলে ঝাঁপ দিতে পারে?

তা যদি হয় তবেই মঙ্গল। না হলে ও যদি বেঁচে ফিরে আসে তা হলে ডিসুজার বাংলোর খবর ও পুলিশকে দেবেই।

ডিসুজার বাংলো ও চিনবে না।

চোদ্দো বছরের মেয়ে। বয়সটা নেহাত ফেলনা নয়। এই বয়সে কত মেয়ের বিয়েই হয়ে যায়। ওদের স্মৃতিশক্তি এবং অনুসন্ধান করবার ক্ষমতা তোমার আমার চেয়েও ঢের বেশি।

কথা বলতে বলতে বেশ খানিকটা পথ যাবার পর একটা গলির ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

গলির মুখেই মস্ত একটি বাংলো। সেই বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় ওদের মধ্য থেকে হঠাৎই একজন দেখতে পেল ওদের।

পল্টন ও গৌতম তখন গলির মুখে দাঁড়িয়ে দুষ্কৃতীদের গতিবিধি লক্ষ করছিল।

দুষ্কৃতীরা দেখামাত্রই ছুটে এল ওদের দিকে।

পল্টন হঠাৎ শংকরের দিকে একটা পা এগিয়ে দিতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

আর গৌতম করল কী, ছদ্মবেশী দয়ালদার দাড়িধরে ঝুলে পড়তেই নকল দাড়িগোঁফ সব খুলে গেল তার। কিন্তু সে কিছু করবার আগেই গৌতম ওর চোখ লক্ষ্য করে সজোরে একটা ঘুসি ছুড়ল।

দয়ালদা তখন চোখে হাত দিয়ে বসে পড়েছে সেখানে। ঘুসিটা বেশ মোক্ষম জায়গাতেই লেগেছে মনে হচ্ছে।

এদিকে যে বাড়ির দরজায় কলিং বেল টেপা হয়েছিল সেই বাড়ি থেকেও দু'-তিনজন লোক বেড়িয়ে ওই রকম দৃশ্য দেখে ছুটে এল ওদের দিকে।

পল্টন আর গৌতম তখন উপায়ান্তর না দেখে প্রাণপণে ছুটে চলল যে পথে এসেছিল সেই পথে। গৌতম পল্টনের আগে আগে ছুটছে। পল্টন পিছনে।

ছুটতে ছুটতে পল্টন বলল, আগুপিছু তাকাবি না। যেদিকে সুবিধে বুঝবি পালাবি।

গৌতম বলল, কিন্তু আমরা কি এইভাবে ছুটে পারব ওদের খপ্পর থেকে নিজেদের বাঁচাতে?

পারতেই হবে।

শত্রুরা তখন বুলডগের মতো ছুটে আসছে। ভাবটা এই, পেলেই যেন ছিঁড়ে খাবে।

হঠাৎ একটা ইট এসে লাগল পল্টনের মাথায়।

ও আর ছুটতে পারল না। মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। মাথায় হাত দিয়ে 'বাবারে' বলে বসে পড়ল পল্টন।

ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

গৌতম দেখেও থামল না। ছোটার গতি আরও একটু বাড়িয়ে দিল। বলা যায় না, থামতে গিয়ে যদি বা ধরা পড়ে! এখন ওকে পালাতেই হবে। পালিয়ে বাঁচতে হবে। না হলে কেউ-ই উদ্ধার হবে না।

পল্টনকে যখন ওরা ধরল, শংকরও তখন উঠে এসেছে।

শংকর বলল, আর একটা কই? আর একটা? তারপর পলায়মান গৌতমকে দেখে বলল, ওই তো! ওই—ওই...পালাচ্ছে। ধর ধর।

গৌতম তখন অনেক দূরে চলে এসেছে। ও যেখানে এসেছে সেখানেই মোড়ের মাথায় এক জায়গায় কতকগুলো কংক্রিটের ড্রেন পাইপ জড়ো করা ছিল।

ও তারই একটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মুখের ওপর একটা লাথি এসে পড়ল। সেই সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগালি।

গৌতম নিরুপায় হয়ে মুখটাকে চেপে ধরল তার। যাতে আর না চেঁচায়।

শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি। আর তারই ফলে ড্রেন পাইপগুলো দুড়দাড় করে পড়তে আর গড়াতে লাগল। ফলে হল কী, ধ্বস্তাধস্তির বদলে নিজেদের রক্ষা করতে দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

গৌতম বুঝল প্রতিপক্ষ একটি মেয়ে।

মেয়েটি বুঝল আগন্তুক একটি ছেলে।

গৌতম চাপা গলায় বলল, তুই মেয়েটা এত রাত্তিরে এর ভেতরে কী করছিস রে?

তু কৌন হো পুছনেবালি?

গৌতম বলল, কয়েকজন লোক আমাকে ধরবে বলে তাড়া করেছে। তাই আমি ভয়ে এর ভেতর ঢুকে পড়েছি। কিন্তু তুই যে এর ভেতরে থাকবি তা কী করে জানব? ওঃ। যা জোরে একটা লাথি মেরেছিস না?

মুঝে মাফ কর দো ভাইয়া। ম্যায় বুরা সমঝা তুমকো।

গৌতম বলল, কে তুই?

মেয়েটি বলল, বাঙালিদাদা, আমি রাস্তার মেয়ে। বেওয়ারিশ লেড়কি আছি।

আমার মা-বাবাকে আমি কখনও চোখে দেখি নাই। ভিখ মেঙে খাই। রাতে বিরেতে কত রকম লোক ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। যদি কেউ আমাকে নিয়ে পালায় তখুন আমি কী করব। সেই ডরসে ভাগে হুয়ে আমি এইসব জায়গায় লুকিয়ে থাকি। আমি জেগে থাকব তো, আমার গায়ে কেউ হাত দিতে এলে তাকে আর আস্ত রাখব না। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে তো আমি জানব না কিছুই?

গৌতম বলল, ঠিক আছে। তোর কোনও ভয় নেই। তবে তোর পক্ষে এই জায়গাটাও খুব নিরাপদ নয়! তার কারণ এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে যে একটা বাড়ি আছে, ওই বাড়িটা হল শয়তানের ঘাঁটি। ওখানে তোর মতো মেয়েদের কিছু লোক চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। পরে নয়নাগিরি না কোথায় যেন পাচার করে দেয়।

মেয়েটি বলল, সমঝ গিয়া। ও লোগ একরোজ ধান্দা লেকে হামারা পাস ভি আয়া থা।

তারপর?

হামকো কাম করনে বোলা ও আদমিকা সাথ। ম্যায় তো মু'পর থু কর দিয়া।

কেন?

আরে বুরাই কা কাম। দেখো ভাইয়া, ম্যায় ইনসান সে পয়দা হুয়া লেড়কি। ভগবান মেরা মা-বাপ। শয়তানকা কাম কিউ করেগি? ম্যায় ভিখ মাংতা। লেকিন কিসিকা কোই চিজ চোরি করতা নেহি।

গৌতম বলল, তুই গরিব হলেও তোর মনটা খুব ভালরে। কী নাম তোর?

মেরা নাম দুলালি।

গৌতম বলল, দেখ দুলালি, আমারই এক বন্ধুকে ওরা ওই বাড়ির ভেতরে আটকে রেখেছে। আমাদের পরিচিত একটি মেয়েকে নিয়ে ওরা পালিয়ে এসেছিল বলে আমরা ওদের পিছু নিয়েছিলুম। এখন বন্ধুকে কী করে উদ্ধার করি বল দেখি? তুই ওই বাড়ির ভেতর গেছিস কখনও?

নেহি তো।

তা হলে উপায়?

দুলালি কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা বাহার তো নিকাল পহলে।

ওরা হামাগুড়ি দিয়ে ড্রেন পাইপের বাইরে এল দু'জনে।

তখন বেশ রাত হয়েছে। তাই চারদিক নিঝুম। এই নোংরা গলিপথে রাস্তার কুকুরগুলো ছাড়া জনপ্রাণী নেই। ড্রেন পাইপ থেকে বেরিয়ে এসে গৌতম দেখল ভিখারিণী দুলালি, ওদেরই বয়সি একটি মেয়ে। ঘন কালো গায়ের রং। এত কালো যে সচরাচর দেখা যায় না। আর তেমনি সাদা ওর চোখদুটো। রুপোলি মাছের মতো যেন চক চক করছে। লম্বা একটি বেণী দুলছে পিঠের ওপর।

শতছিন্ন মলিন একটি ফ্রকপরে আছে। সম্ভবত নিয়মিত স্নান করে। তাই গা-হাত-পা বেশ পরিষ্কার।

দুলালি বলল, আভি বতাও তামাশা ক্যা।

গৌতম আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল ওকে।

সব শুনে দুলালি বলল, দেখো ভাইয়া ও আদমি পুলিশকা এক জবরদস্ত অফিসার থা। আভি ও নোকরি নেহি করতা।

অবসর নিয়েছেন বুঝি?

হো সকতা। ও তো মুঝে মালুম নেহি। লেকিন কাম বহুত খারাবি করতা।

তা করুক। ওর খপ্পর থেকে আমার বন্ধুটিকে কী করে উদ্ধার করি বল তো?

দুলালি কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর গৌতমকে বলল, আও মেরা সাথ। বলে গলির পর গলি, তস্য গলি পার হয়ে আবার যখন মহেন্দ্রুঘাটের কাছে এল, তখন সেখানে একজন পানওয়ালা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছে। দুলালিকে দেখেই বেশ আদুরে গলায় বলল, ক্যারে দুলালিয়া। ক্যা ভৈল তেরি? ইতনা রাত হো গৈল, তোহরকা নিদ না আয়ি?

দুলালি ছুটে গিয়ে সব কথা বলল পানওয়ালাকে।

পানওয়ালা একবার দেখল গৌতমকে। তারপর বলল, এক মিলে গা তুমকো। লেকিন দুসরা নেহি মিলেগা!

গৌতম বলল, এক মিলেগা মানে?

আও মেরা সাথ।

বেশ খানিকটা ওর সঙ্গে যাবার পর একটা অনুন্নত এলাকায় এল ওরা।

পানওয়ালা ওদের নিয়ে একটা বাড়ির ভেতর ঢুকতেই চমকে উঠল গৌতম।

ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে এক খটিয়া পরিবারের লোকেদের সঙ্গে ময়লা একটি ডুরে শাড়ি পরে বসে আছে গোপা।

গৌতমকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে।

গৌতমও অবাক, এ কী! গোপা তুমি এখানে?

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল গোপা। বলল, আমি আর কখনও এখানে আসব না। চাই না আমি গান শিখতে। তুমি আমাকে আমার মায়ের কাছে দিয়ে আসবে চলো লক্ষ্মীটি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

গৌতম বলল, অবুঝ মেয়ের মতো কাঁদে না। এখানে তুমি কী করে এলে? আমাদের কত বিপদ তা জানো?

এইবার একটু আশ্বস্ত হয়ে গোপা বলল, কী বিপদ তোমাদের?

দাদুভাইকে ওরা গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল তা নিশ্চয়ই জানো?

জানি। উনি কি বেঁচে আছেন?

হয়তো মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। আমরা এই খবর শুনে তোমার খোঁজে মহেন্দ্রুঘাটে আসি। এখানে এসে শুনি তুমি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছ। কিন্তু তুমি যে প্রাণে বাঁচবে তা ভাবতেও পারিনি।

আমার বেঁচে থাকবার কথা নয়। যেমনি ঠান্ডা এখানকার গঙ্গার জল, তেমনি হচ্ছে জলের টান। কী ভাগ্যিস এই বাড়ির মেয়েরা তখন ঘাটের ধারে ছিল। তাই এদের এখানেই উঠেছি। এরা আমাকে একটু বেশি রাতে কদমকুঁয়ায় পৌঁছে দেবে বলেছে। তা ভালই হয়েছে তুমি এসে পড়েছ। আমি আর কদমকুঁয়ায় যাব না। ওই অভিশপ্ত জায়গায় আর না যাওয়াই ভাল। তুমি আমাকে এখুনি নিয়ে চলো স্টেশনে। আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো!

গৌতম বলল, তাই কী হয়? বাড়ি যে যাবে গাড়ি ভাড়া আছে সঙ্গে? টাকা চাই না? তা ছাড়া কাকুমণি কী ভাববেন? তাঁরা বুঝি চিন্তা করছেন না আমাদের কথা? তাঁদের না জানিয়ে এইভাবে ছেলেমানুষের মতো কি চলে যাওয়া উচিত? তা ছাড়া আমাদের বিপদের কথা তো তুমি শোনইনি। তোমার খোঁজে এসে দু'জন দুষ্কৃতীর পিছু নিতে গিয়ে আমাদের কী অবস্থা হয়েছে জান? ওরা আমাদের এমন তাড়া করেছে যে আমি পালাতে সক্ষম হলেও পল্টন বেচারি আহত হয়ে ওদের কবজায় পড়ে গেছে।

শিউরে উঠল গোপা, তা হলে কী হবে?

যেভাবেই হোক ওকে শয়তানের খপ্পর থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। এখনই গিয়ে পুলিশকে বলতে হবে কথাটা।

দুলালি বলল, পুলিশবালে মদত নেহি করে গা।

গোপা বলল, তুমি কে?

গৌতম বলল, ও বেচারা বড় দুঃখী। ও ছিল বলেই তো এমন নাটকীয়ভাবে তোমাকে পেলাম।

ও কী করে জানল আমি এখানে আছি?

পানওয়ালাকে দেখিয়ে গৌতম বলল, ও আমাকে পল্টনের ব্যাপারে সাহায্যের আশায় এই দাদার কাছে নিয়ে আসে। ওনার কাছে এসেই তোমাকে পেলাম। তার আগে কেউই জানতাম না তুমি কোথায় আছ।

পানওয়ালা বলল, দেখো ভাই, একটা কথা। আমরা গরিব লোক। আর ওরা হল রাজা উজির। ওদের সঙ্গে লেগে আমরা পেরে উঠব না। ওই ডিসুজাসাহেব একজন সাসপেন্ড হওয়া জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। অনেক তাবড় তাবড় লোক ওঁদের চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কাজেই থানা-পুলিশ করেও খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। এখানকার পুলিশ সব জানে। তাই ভয়ে ওদের এড়িয়ে চলে। এরা সব মাফিয়াচক্রের লোক। এখন তোমরা যেভাবেই হোক গা-ঢাকা

দিয়ে পালাও। ওদের শিকারকে আমরা ঘরে ঢোকাই না। তবে আমি তো বাঙালির ছেলে। বহুদিন এই দেশে আছি। এখানকার মেয়ে বিয়ে করে ঘরসংসার করছি। এখন আর আমার মধ্যে কোনও বাঙালিয়ানা নেই। রীতিমতো খটিয়া বনে গেছি। তবু মেয়েটার বিপদের কথা শুনে ওকে আশ্রয় দিলাম। এখন যাও, চুপি চুপি চলে যাও তোমরা এখান থেকে। দুলালি তোমাদের পথ চিনিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসবে।

কিন্তু আমার বন্ধুর কী হবে?

তা কী করে বলব? ওকে উদ্ধার করবার চেষ্টা তোমরা অন্য কোনও উপায়ে কোরো। কিন্তু দয়া করে যেন আমাদের জড়িয়ো না। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটিকে নিয়ে পালাও। যদি ওরা কোনওরকমে জানতে পারে আমরা মেয়েটিকে এখানে আশ্রয় দিয়েছি, তা হলেও হয়তো আমাদের বিপদ হবে।

গৌতম বলল, না না। কোনও ভয় নেই তোমাদের। এই বিপদের দিনে তোমরা যা করেছ তার তুলনা হয় না। কেউ জানতে পারবে না এখানকার কথা। এমনকী পুলিশও না। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে ও বলবে অতি কষ্টে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে নিজেই চলে এসেছে ও।

তা হলে আর দেরি নয়। এই বেলা চলে যাও। গলি থেকে বেরিয়েই বড় রাস্তা পাবে। সেখানে অটো, রিকশা সব কিছুই পেয়ে যাবে তোমরা।

ওরা তখনই রওনা হল। এখানে থাকার প্রয়োজনটাই বা কী আর? এখন ঘরে ফেরা একান্ত দরকার।

দুলালিও চলল ওদের সঙ্গে।

বড় রাস্তার মুখে এসে গৌতম ওর পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে দুলালির হাতে দিয়ে বলল, তুই এটা রেখে দে দুলালি। আর ভিক্ষে করা ছেড়ে দে। তুই খুব ভাল মেয়ে। ভালভাবে বাঁচবার চেষ্টা কর। ভিক্ষে না-করে ঝি-গিরি কর।

দুলালি হেসে বলল, এ রুপিয়া তু রাখ দে ভাইয়া।

কেন? রেখে দেব কেন? আমি তোর দাদা হই। তোকে মিষ্টি খেতে দিলুম। আর শোন, তোর তো কেউ কোথাও নেই। আমাদের এইসব ঝামেলা মিটে গেলে আমি তোকে আমাদের দেশে নিয়ে যাব।

দুলালি হেসে বলল, নেহি ভাইয়া। ইয়ে শহর ছোড়কর ম্যায় কঁহি নেহি যাউঙ্গি। ইয়ে মেরা জনমভূমি হ্যায়। গঙ্গাজি মেরা মা। পাটনা মেরা বাপ।

আচ্ছা ঠিক আছে। দেখা যাবে তুই যাস কি না যাস। আমারও একটা বোন আছে। তোর চেয়ে অবশ্য অনেক ছোট। সে বড় হলে তার যখন বিয়ে দেব তখনও কী সে তার জন্মভূমির দোহাই দিয়ে শ্বশুরবাড়ি না-গিয়ে মা-বাবার কাছে

পড়ে থাকবে ভেবেছিস? ওরে তুই একটা মেয়ে। তুই তো একদিন আরও বড় হবি। তুই কি চিরকাল ফুটপাথে পড়ে থাকবি আমরা থাকতে? আমার মা-বাবা তোর মা-বাবা হবে। আমি তোর দাদা হব। তোর মতো মেয়েকে কখনও ভেসে যেতে দিই? আজ এই মুহূর্তে তোর জন্যে কিছু করতে না পারলেও ঝামেলাটা একটু মিটতে দে। তারপর দেখবি কী করি।

দুলালি অস্ফুটে উচ্চারণ করল, ভাইয়া!

গৌতম বলল, আসছিরে।

গোপা ততক্ষণে একটা অটোকে দাঁড় করিয়েছে। ওরা অটোয় চেপেই বলল, কদমকুঁয়া।

গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা দুলালিকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওরা। তারপর প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটে চলল কদমকুঁয়ার পথে।

আট

অটো একেবারে বিয়েবাড়ির সামনে এসে থামল। নিমন্ত্রিতরা প্রায় সকলেই বিদায় নিয়েছে তখন। বরযাত্রীরা আছে। আছে কিছু পুলিশ। তবু যেন শ্মশানের নীরবতা। কারও মুখে কথাটি নেই।

ওরা যেতেই হই হই করে উঠল সকলে।

সত্যবাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এসেই গোপাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের ভেতর। বললেন, তোকে যে আর কখনও ফিরে পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি মা। কীভাবে কী হল শুনি? তারপরই হঠাৎ কী মনে পড়তে বললেন, পল্টন কোথায়? ওকে দেখছি না কেন?

গৌতম কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, গোপাকে উদ্ধার করার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। শুধু ভাগ্যজোরে ফিরে পেয়েছি ওকে। তবে—।

তবে কী!

পল্টনকে হারিয়েছি।

তার মানে?

পুলিশের লোকেরাও তখন ছেঁকে ধরেছে গৌতমকে। সচ মুচ বতাইয়ে ক্যা হুয়া থা?

গৌতম বলল, এক মিনিট। মেয়েটাকে আগে যথাস্থানে রেখে আসি। তারপর সব বলছি।

গোপার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই ওপরে নিয়ে এল গৌতম।

শুভকার্য তখন সম্পন্ন হয়েছে।

বাসরঘর আলো করে বাবলিদি বসে আছেন। কাকিমাও ছিলেন আশপাশেই।

গৌতম গোপাকে কাকিমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, বহু কষ্টে গোপাকে ফিরিয়ে এনেছি কাকিমা। তবে পল্টনের খুব বিপদ। ও একেবারে শয়তানদের হাতে পড়ে গেছে। ওর খোঁজেই যাব এবার। গোপাকে সাবধানে রাখুন।

কাকিমা বললেন, সে কী! ওকে ফিরে পাব তো?

ভগবান জানেন। আমি আসছি। কাকুমণি নীচে আছেন।

গৌতম আর একটুও সময় নষ্ট না করে তরতর করে নীচে নেমে এল! তারপর আগাগোড়া যা যা ব্যাপার ঘটেছিল সব খুলে বলল সকলকে। শুধু দুলালির ব্যাপারটাই যা চেপে গেল। এবং বলল না কীভাবে উদ্ধার করেছে গোপাকে। শুধু এইটুকুই বলল, তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসবার সময় হঠাৎ করে গঙ্গার ধারে অসহায় অবস্থায় আবিষ্কার করেছে গোপাকে।

গৌতমের কথা সকলে যেমন বিশ্বাস করল, তেমনি ভয় পেল ডিসুজার কথা শুনে।

কী ভাগ্যিস কাকুমণি জিজ্ঞেস করেননি, যে মেয়েটি চুড়িদার পরে উধাও হয়েছিল সে হঠাৎ ডুরে শাড়িটি পরে ফিরে এল কী করে?

পুলিশের যে এস আই এখানে ছিলেন তিনি সব শুনে বললেন, গফুরকে নেলোর দল খুন করবে এটা অবশ্য ভাবতে পারিনি। তবে আলোচনাটা যা শুনেছে এরা তাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে একাজ নেলোই করেছে। এখন শংকর ও দয়ালদা নামের যে লোকটার কথা বলছে তাতে তো কেসটা আরও জটিল হয়ে গেল। বিশেষ করে ডিসুজার নাম শুনে তো নার্ভাস হয়ে পড়েছি। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হয়ে গেছে। ডিসুজা এই অঞ্চলের সন্ত্রাস এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। শংকর এবং দয়ালের সঙ্গে ডিসুজার যোগাযোগ অপ্রত্যাশিত। কেন না এই দুই ক্রিমিনালকে হত্যা করবার জন্য একসময়ে ডিসুজা উঠেপড়ে লেগেছিলেন। অথচ এরই মধ্যে এমন জোট, ধারণার বাইরে। ডিসুজাকে চ্যালেঞ্জ করাও বুকের পাটার দরকার। শংকর আর দয়াল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত। মাঝেমধ্যে ভাল ভাল ছেলেমেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওদের ছবির কাজে লাগায়। কিন্তু ডিসুজার কাজ হল ছেলেমেয়ে বিদেশে পাচার করা। সেটা আরও বিপজ্জনক। এখন শংকর ও দয়াল ওর সঙ্গে হাত মেলালে তো রক্ষে নেই।

সত্যবাবু বললেন, গৌতমের সাক্ষ্য নিয়ে ডিসুজার বাড়ি সার্চ করতে আমাদের অসুবিধেটা কোথায়? ডিসুজার গায়ে হাত না-দেওয়া যায়, শংকর ও দয়ালকে তো অ্যারেস্ট করা যাতে পারে?'

পারে। কিন্তু ওদের জামিনে বেরিয়ে আসাটা আটকাবেন কী করে? শংকর কে জানেন?

কে?

এস আই সত্যবাবুর কানের কাছে মুখ এনে কী যেন বললেন।

সত্যবাবু চোখদুটো বড় বড় করে বললেন, ওরে বাবা!

তা হলেই বুঝছেন তো কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে? ভাগ্যবিপর্যয়ে এই কালচক্রে জড়িয়ে পড়েছেন আপনারা। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। বিপদটা আপনাদের ক্ষেত্রেও যেমনি চরম, আমাদের ক্ষেত্রেও কম নয়।

তা হলে কী হবে?

কিচ্ছু বলা যাচ্ছে না। আপাতত থানায় চলুন। ও সি কী নির্দেশ দেন দেখি।

তাই চলুন তা হলে।

দু'জনেই গাড়িতে উঠুন।

সত্যবাবু গৌতমকে নিয়ে ভ্যানে উঠলেন। পল্টনকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ঘোর সংশয় দেখা দিল সত্যবাবুর মনে। যেতে যেতেই উনি বললেন, ছুটোছুটি আর উত্তেজনায় তোমার তো কিছুই খাওয়া হল না বাবা। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?

গৌতম বলল, অন্যদিন হলে খিদেয় পেট ছিঁড়ে যেত এতক্ষণে। আজ কিন্তু একটুও খিদে পায়নি। যা টেনশন যাচ্ছে। এতে কি খিদে পায়?

তা অবশ্য ঠিক।

দাদুভাইকে কেমন দেখে এলেন?

ভাল নয়। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি। এত দুর্যোগ সত্ত্বেও বাবলির বিয়েটা ভালয় ভালয় মিটে গেছে। সব চেয়ে বড় কথা গোপাকে তুমি ফিরিয়ে আনতে পেরেছ। তুমি যে আমার কী উপকার করেছ তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। ওকে ফিরে না পেলে ওর মাকে আমি কী কৈফিয়ত দিতাম? তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো মুখও থাকত না আমার। ওই মেয়েটি ছাড়া ওর মায়ের কেউ নেই আর। একমাত্র মেয়ে। পরের মেয়ের দায়িত্ব যে কত, তা আজ বুঝলাম। তাই বলি বাবা যত কষ্টই হোক, ভোরের ট্রেনেই তুমি ওকে রেখে এসো ওর মায়ের কাছে। আমাকে দায়মুক্ত করো।

কিন্তু কাকুমণি, পল্টনের কোনও খোঁজখবর না-পেলে আমি কী করে যাব? ও যে এখন শত্রুর কবলে।

জানি। তবুও বলি, ঝামেলা যা কিছু তা গোপাকে নিয়েই। পল্টনকে নিয়ে নয়। তা ছাড়া শয়তানের ঘাঁটিটা যখন তুমি পুলিশকে বলে দিতে পেরেছ তখন ভয় কী? ও যদি বেঁচে থাকে তা হলে ওকে উদ্ধার আমরা করবই। কিন্তু মেয়েটাকে

এক্ষুনি সরিয়ে না ফেললে নয়। তার কারণ শত্রুপক্ষ জানে মেয়েটা জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেছে। কিন্তু পুলিশ জেনে গেছে ওকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। তা হলেই বুঝতে পারছ তো ব্যাপারটা জানাজানি হতে খুব একটা দেরি হবে না। আর তখন হবে কী ওকে হয়তো এই শহর থেকেই বার করতে পারব না আমরা।

গৌতম বলল, বেশ, তাই করব। আপনি পল্টনের ব্যাপারটা দেখবেন তা হলে?

নিশ্চয়ই দেখব। ওকে না দেখলে রুদ্রদাকে আমি কৈফিয়ত দেব কী? তুমি ভোরের ট্রেনেই ওকে নিয়ে চলে যাও। তারপর ওইখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে যেয়ো। ইতিমধ্যে আমি বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের বাড়িতে টেলিফোন আছে?

না। তবে আমাদের পাশের বাড়িতে আছে।

ফোন নম্বরটা মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ। কাগজ দিন, লিখে দিচ্ছি।

সত্যবাবু একটা হিসেব লেখা কাগজ গৌতমের দিকে এগিয়ে দিলে তাইতে ফোন নম্বরটা লিখে দিল গৌতম। এরপর উৎকণ্ঠার নীরবতা।

ভ্যান এসে থামল পুলিশের হেড কোয়ার্টারে।

নয়

ও সি বলরাম ত্রিবেদী সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, ও শয়তান ডিসুজা যব তক জিয়েগা তব তক সবকো জ্বালায়গা। বহুত খতরনক ও আদমি। পুলিশকো ভি ট্রাবল দেতা। আদমি কো ভি। ঠিক হ্যায়...। বলে এস আইকে বললেন, যাও মকান সার্চ করো। জলদি যাও।

লেকিন...।

ডরো মাত।

এস আইকে তবুও ইতস্তত করতে দেখে ত্রিবেদী দারুণ রেগে গেলেন। তারপর নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সমঝ গিয়া। ম্যায় যা রহা হুঁ।

এস আই বললেন, হামকো গলদ মাত সমঝিয়ে স্যার। ও হামরা ডিপার্টমেন্ট কা এক বড়া অফিসার থা।

লেকিন আভি ও এক মোস্ট অর্ডিনারি ক্রিমিনাল।

এস আই মাথা হেঁট করলেন।

ত্রিবেদী বললেন, চলুন। দেখি কোথায় ওরা আপনাদের ছেলেকে আটকে রেখেছে।

পুলিশের গাড়ি ঝড়ের বেগে ছুটে চলল রাজপথ ধরে। গৌতম সঙ্গে থাকলেও সে বুঝতে পারল না কোথা দিয়ে এবং কীভাবে ওরা পৌঁছে গেল সেই গলির মুখে।

একদল পুলিশ সহ মি. ত্রিবেদী, সত্যবাবু ও গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে সেই কুখ্যাত বাড়িটার কাছে এসে হাজির হল।

বাড়ির দরজায় নক করতেই এক বৃদ্ধ চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

ঘরের ভেতর ঢুকতেই সকলে দেখল দানবাকৃতি এক মধ্যবয়সি ভারিক্কি চেহারার লোক দু'জন বন্ধুর সঙ্গে তাস খেলছেন। ত্রিবেদীকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আরে ত্রিবেদীজি। আপ খুদ চলে আয়ে মেরে গরিবখানে পর? আইয়ে আইয়ে বয়ঠিয়ে।

ত্রিবেদী বললেন, আমি এখানে বসবার জন্য আসিনি মি. ডিসুজা। আমি জানতে এসেছি আপনি আপনার ওই নোংরা ব্যবসাটা এবার বন্ধ করবেন কি না?

ডিসুজা হো হো করে হেসে বললেন, ত্রিবেদীসাব, আপ তো কানুন কা ধর্মাবতার। লেকিন ইতনা কলঙ্ক মুঝ পর মাত দিজিয়ে।

গৌতম বলল, কলঙ্ক তো আপনি নিজেই নিজের গায়ে মাখছেন মশাই। আমার এক বন্ধুকে আপনার লোকেরা নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছে এখানে। তা ছাড়া আপনার দুই সাগরেদ শংকর আর দয়ালদার মুখে শুনেছি কয়েকটি ছেলেমেয়েকেও আটকে রেখেছেন আপনার এই বাংলোতে।

ডিসুজা এবার চোখ লাল করে বললেন, শয়তান কা বাচ্চা। অ্যায়শা কাম ম্যায় নেহি করতা। তেরা দোস্ত ইধার চোরি করনে আয়া তো মার মারকে উসকো জাহান্নমমে ভেজ দিয়া। বলে ত্রিবেদীকে বললেন, আপ অন্দর যাইয়ে। সার্চ করকে দেখিয়ে। লেকিন এক বাত। ফির কভি অচানক আকে হামকো ডিসটার্ব মাত কর না, সমঝা?

ত্রিবেদী বললেন, মি. ডিসুজা, আপনার এখানে সার্চ করে আমি যে কিছুই পাব না তা আমি জানি। তবু অভিযোগের ভিত্তিতে এখানে এসেছি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন এখন কিন্তু আপনি আর এস পি নন। নিজের দোষে নিজের নাম সরকারি ব্ল্যাক লিস্টে উঠিয়ে সাসপেন্ড হয়ে বসে আছেন। আজ যারা আপনাকে মদত দিচ্ছে— এতটুকু স্বার্থে ঘা লাগলে কাল কিন্তু তারাই আপনাকে ব্ল্যাকমেল করবে। আর সেদিন আমি নিজে এসে আপনার হাতে হাতকড়া পরাব। এবং সেদিনেরও খুব বেশি দেরি নেই। আচ্ছা গুড বাই। বলে সকলকে বললেন, চলুন।

সত্যবাবু বললেন, একবার একটু খুঁজে দেখবেন না ছেলেটাকে যদি কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে?

কী লাভ? ও এখানে নেই। যেভাবেই হোক আমার আসার খবর পেয়ে পাচার করে দিয়েছে ছেলেটাকে। সেই সঙ্গে অন্য মেয়েদেরও। দেখছেন না উনি নিজের থেকেই জোর গলায় সার্চ করতে বলছেন।

এবার গৌতম বলল, আচ্ছা, নয়নাগিরিটা কোথায়?

ত্রিবেদী বললেন, নয়নাগিরি? ও নাম তো কখনও শুনিনি।

ওদের মুখে শুনেছি ওরা ওইখানেই সকলকে পাচার করে। সেখান থেকেই যা হবার হয়।

তা হলে অন্য কোনও স্টেটে। বিহারে নয়। তবে নামটা যখন কানে এসেছে তখন খোঁজখবর আমি নেবই।

সত্যবাবু বললেন, আপনি বাঙালি স্যার?

হ্যাঁ। অবশ্য বাংলার বাঙালি নই। প্রবাসী বাঙালি। আমার দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। যশোর জেলায়।

ছেলেটার ব্যাপারে তা হলে কী হবে?

চেষ্টা করব। ওরা নিজেরাই যখন ওদের ফাঁদে পা দিয়েছে, তখন ফল ভোগ করতেই হবে। ডিসুজা তো বলেই দিল জাহান্নমে পাঠিয়ে দিয়েছে। তা ওর জাহান্নম নয়নাগিরিও হতে পারে, আবার বুকে পাথর বাঁধা অবস্থায় গঙ্গার নীচেটাও হতে পারে। ছেলেটাকে আদৌ বাঁচিয়ে রেখেছে কিনা তাই বা কে জানে? এক এক সময় মনে হয় গুপ্তঘাতক দিয়ে মেরে ফেলি শয়তানটাকে। কিন্তু ওর সার্কেলটা এমনই যে, সব জেনেশুনেও আমরা অসহায়। আমিও ফ্যামিলিম্যান তো?

গৌতম বলল, আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? মহেন্দ্রুঘাটের বস্তিতে ভোজপুরী লোকদুটিকে ঢুকতে দেখেছিলাম, মানে যারা গোপাকে নিয়ে পালাচ্ছিল বা যাদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল গোপা। সেই লোকদুটোকে মোচড় দিয়ে কোনও কথা আদায় করা যায় না?

ত্রিবেদী বললেন, হ্যাঁ। সেটা অবশ্য করা যায়। চলো তো দেখি।

ওরা মহেন্দ্রুঘাটে এসে যখন পৌঁছল তখন নিস্তব্ধ চারদিক। কেউ কোথাও নেই। একে তো শীতকাল। তায় রাতও গভীর। সবাই ঘরের ভেতর দরজাজানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে যে যার।

তারই মধ্যে পুলিশ নিয়ে ঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির হল গৌতম। কিন্তু হলে কী হবে? বাড়ি ঠিক করতে পারল না।

ত্রিবেদী নিজেই এবার চিৎকার করে উঠলেন, পুলিশ পুলিশ। তারপর ঢিসুম

ডুসুম করে দুটো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করালেন একজন কনস্টেবলকে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। বেশ কয়েকজন লোক কাঁচা ঘুম ভেঙে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। তাদের সঙ্গে সেই ভোজপুরী দুটোকেও দেখা গেল।

গৌতম দেখেই চিনতে পারল তাদের। বলল, ওই তো। ওই সেই লোকদুটো।

পুলিশ দেখেই ওরা ছুটতে গেল।

ত্রিবেদী হুংকার দিলেন, হল্ট।

একজন থামল আর একজন যেই পালাতে গেল ত্রিবেদী বললেন, ফায়ার।

কনস্টেবলরা গুলি করল।

গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটি।

যে লোকটি ধরা দিল ত্রিবেদী তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে বললেন, ক্যা নাম তুমহারা।

মেরা নাম যজ্ঞেশ্বর।

সামকো তুম ও লেড়কিকো কাঁহা লেকে ভাগা?

বাবু, মেরা বাত তো শুনিয়ে...।

ঠাস করে গালে একটা চড়।

কতদিন করছ এইসব নোংরা কাজ? কিতনা রুপিয়া মিলতা তুমকো?

রুপিয়া নেহি মিলতা বাবু। ও ডিসুজা সাব কা আদমি শংকরবাবু শোনপুরমে ভেজা থা। হাম দোনো ভাই মিল কর গিয়া। শংকরবাবুকা বাত নেহি শুননেসে ও হামকো বস্তিসে নিকাল দেগা।

শোনপুরে কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

নেহি গিয়া সাব। ও লেড়কি অচানক পানিমে কুদ পড়ি তো হাম বাপস আয়ি।

শোনপুরকা পতা?

ও তো মুঝে মালুম নেহি। শংকরজিনে কহা থা তুম স্টেশন পর চলা যাও, হুঁয়া আদমি মিলেগা।

ওই আদমিকে তুমি চেনো?

জি সাব।

কী নাম?

নাম নেহি মালুম। লেকিন ম্যায়নে বহুত দফে দেখা উনকো।

তোমরা কি আজ শুধু মেয়েই পাচার করছিলে? না কোনও ছেলেও পাচার করেছ?

ম্যায়নে তো এক আধা মুর্দা লেড়কা কো হাই ড্রেনমে ফিক দিয়া।

ও মাই গড। কাঁহা পর?

চলিয়ে ম্যায় দিখাতা হুঁ!

যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে সকলেই চলল হাই ড্রেনের দিকে। গৌতম তখন কেঁদে ফেলেছে। বাড়ি ফিরে কী বলবে ওর মাকে? অর্ধমৃত পল্টন হাইড্রেনের অন্ধকূপে বিষাক্ত গ্যাসে এতক্ষণে মরেই গেছে হয়তো।

সত্যবাবুর চোখে জল। কী থেকে কী হয়ে গেল। সংকট এমনই একটা দিকে মোড় নিয়েছে যে মৃত্যুপথযাত্রী বাবার কাছে মুখে একটু জল দেবার জন্যও থাকবার উপায় নেই।

হাইড্রেনের কাছে গিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে যজ্ঞেশ্বর বলল, এহি পর ফিক দিয়া ও লেড়কাকো।

পুলিশ নাকে রুমাল চাপা দিয়ে টর্চের আলো ফেলেও ভেতরে পাঁক আর নোংরা জল ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। পল্টনের কোনও অস্তিত্বই সেখানে নেই।

সত্যবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কতক্ষণ আগে ফেলেছ তোমরা ছেলেটাকে?

এক-দেড় ঘণ্টা পহলে।

ত্রিবেদী হতাশ হয়ে বললেন, চলুন থানায় চলুন। ও ছেলের আশা ছেড়ে দিন। কাল সকালের আগে আর কিছু হবে না। সকালবেলা ভেতরে লোক নামিয়ে চেষ্টা করব ডেড বডিটা উদ্ধার করবার।

পুলিশের গাড়িতে চেপেই ফিরে এলেন সকলে।

এস আই সত্যবাবুকে বললেন, আপ ঘর চলা যাইয়ে। আপকা পিতাজিকা নিধন হো গিয়া।

শিশুর মতন ডুকরে কেঁদে উঠলেন সত্যবাবু, বাবা নেই!

না। আভি খবর আয়া। সবেরে আদমি লেকে হসপিটাল চলা আইয়ে। ডেড বডি মিল যায়ে গা।

সত্যবাবুর চোখের সামনে সমস্ত চরাচরটা যেন দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গৌতমকে নিয়ে একটা অটোয় করে চলে এলেন কদমকুঁয়ায়।

এরই মধ্যে সত্যবাবু অসম্ভব রকমের শক্ত করে নিলেন নিজেকে। গৌতমকে বললেন, শোনো, হাতে আর আধঘণ্টা সময় আছে। তুমি এখুনি গোপাকে নিয়ে চলে যাও এখান থেকে।

অসম্ভব। আপনি কী বলছেন কাকুমণি!

ঠিকই বলছি বাবা। পল্টনের নিয়তি ওকে কোথায় টেনে নিয়ে গেছে জানি না। মেয়েটাও যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। আর এতটুকু রিস্ক নিতে আমি চাইছি না।

গোপাও ছুটে এসেছে তখন। সে করুণভাবে বলল, এই সময় আমাদের চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

যাবার এই তো সময় মা। আর একটু পরেই আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এখন আমাদের শোকতাপ কান্নাকাটির পালা। সারাদিন আমরা বাবার শেষকৃত্য নিয়ে মেতে থাকব। ওই সময় তোমাদের দেখাশোনা করবে কে? আমাদের দেখবার লোকের অভাব হবে না। তোমরা এই বিশ্রী পরিবেশ থেকে সরে যাও। তা ছাড়া বলা যায় না ইতিমধ্যে আবার কী অঘটন ঘটে। বলে মানিব্যাগ বার করে দুটো একশো টাকার নোট গৌতমের হাতে দিয়ে বললেন, গোপাকে একা ছাড়তে সাহস পাচ্ছি না, তাই তোমাকে পাঠালাম। নিজের বোনের মতো সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। তা ছাড়া এই পরিবেশে তোমারও থাকা চলে না। তুমি কাশীতে ওদের বাড়ি দু'-চারদিন থাকো। আমি তোমার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেব। যাতে তিনি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসেন সেইরকম ব্যবস্থাই করব। পল্টনের জন্য দুঃখ কোরো না। ওইরকম দুর্ভাগ্য তোমারও হতে পারত।

গৌতম ও গোপা প্রণাম করতে গেল সত্যবাবুকে। উনি বললেন, আমার অশৌচ অবস্থা। এ সময় আমাকে প্রণাম করতে নেই।

ওরা বাবলিদির সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু বাবলিদি তখন আর প্রকৃতিস্থ নেই। কাকিমাকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছেন বাবলিদি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দেহটা যেন ওঠা-নামা করছে।

গোপা আর গৌতম স্তব্ধ হয়ে গেল।

ওদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা জামাকাপড়ের ব্যাগ ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসপত্তর সব দরিয়াপুরে কাকুমণির বাড়িতেই রয়ে গেছে। তা থাক। জিনিসপত্তরের চেয়ে নিরাপত্তা বড়। ওরা আর বিলম্ব না করে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

কাকুমণির সেই ছাত্রটি যে ওদের টাকা দিয়েছিল সে-ই তৎপর হয়ে অটোর ব্যবস্থা করে দিল।

গৌতম বলল, তোমার কাছে আমরা দুই বন্ধু ঋণী রয়ে গেলাম।

কী জন্য ভাই? ওই টাকাটার ব্যাপারে?

ঠিক তাই। আমাদের সব কিছুই তো কাকুমণির বাড়িতে।

ওর জন্যে তোমরা চিন্তা কোরো না। বিদেশে বিভুঁয়ে এরকম হতেই পারে। এখন তোমরা নিরাপদে নির্বিঘ্নে পৌঁছলে আমরা সবচেয়ে বেশি খুশি হব। ওখানে গিয়েই কিন্তু পৌঁছনো সংবাদ দিয়ো।

গৌতম বলল, কীভাবে দেব?

আমাদের বাড়ি ফোন আছে।

গোপা বলল, আমার মা জানেন। উনি তো মাঝে মাঝে ফোন করেন

কাকুমণিকে। ফোনেই খবর দেব আমি। আপনারা একটু দেখবেন দাদুভাইয়ের শেষকাজটা যাতে ভালভাবে হয়।

গৌতম বলল, যেতে মন চাইছে না তবু যেতেই হবে।

থেকেই বা কী করবে? তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল। এইরকম শোকতাপের পরিবেশে না-থাকাই উচিত।

গৌতম বলল, তা ছাড়া গোপাকে তো আর এখানে রাখা ঠিক নয়। হারানিধি যখন একবার ফিরে পাওয়া গেছে, তখন ওকে ওর মায়ের কাছেই পৌঁছে দিতে হবে।

আমি কি স্টেশন পর্যন্ত যাব তোমাদের সঙ্গে?

গোপা বলল, কোনও দরকার নেই। আপনি বরং কাকুমণিকে দেখুন। বাবলিদি যাতে নির্বিঘ্নে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করুন।

অটো স্টার্ট নিল।

ওরা হাত নেড়ে টা টা করে বিদায় জানাল।

অটো এ-পথ, সে-পথ করে ফাঁকা রাস্তায় ছুটে চলল স্টেশনের দিকে।

বেশ খানিকটা এসেছে এমন সময় হঠাৎ বুঝতে পারল একটা স্কুটার ভয়ংকর গতিতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। তাই না দেখে তো, ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের।

সর্বনাশ। দুর্ঘটনা ঘটবে না তো?

গৌতম অটো ড্রাইভারকে বলল, মেহেরবানি করকে জেরা হুঁশিয়ারিসে চালাইয়ে ভাই।

কুছ নেহি হোগা।

উধার দেখিয়ে।

স্কুটারটা তখন আরও কাছে এগিয়ে আসছে। একেবারে মুখোমুখি। তবে ধাক্কাটাক্কা না দিয়েই পাশ কাটিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল সেটা।

তারই মধ্যে আরোহীকে দেখে চমক উঠল গৌতম। সেই ভীষণ দানবাকৃতি শয়তানটা। যে ওদের রিকশায় ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছিল।

গৌতম বলল, আবার বোধহয় আমরা একটা জালে জড়াতে যাচ্ছি।

কীরকম।

ওই স্কুটারই আমাদের ধাক্কা দিয়েছিল কাল বিকেলে কদমকুঁয়ায় যাবার পথে। এখন আবার আমাদের টার্গেট করছে।

সে কী! তা হলে তো ভয়ানক ব্যাপার? আবার কী আমরা ওদের খপ্পরে পড়ে গেলাম?

মনে হচ্ছে তাই।

কী হবে তা হলে?

জানি না। এখন তোমাকে নিয়েই আমার ভয়।

গোপা সভয়ে জড়িয়ে ধরল গৌতমকে। দু' চোখ বুজে ওর কোলে মুখ লুকল।

গৌতম বলল, ভয় পেয়ো না। এই সময় অসীম ধৈর্য এবং সাহস সঞ্চয় করতে না পারলে সমূহ বিপদ। ওরা যে ভাবেই হোক টের পেয়ে গেছে আমরা পালাচ্ছি বলে।

কিন্তু কীভাবে পেল?

হয়তো বা ওদের কোনও চর ঘুরঘুর করছিল আমাদের আশপাশে।

ওই ওই আসছে। আবার আসছে।

সত্যিই এল। সেই দানব আবার ধেয়ে এল ওদের দিকে। এবং পাশ কাটিয়ে চলেও গেল।

ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বলল, দুশমন হামকো টার্গেট করতা কিঁউ?

গৌতম বলল, ওর টার্গেট তুমি নও। আমরা।

সঙ্গে সঙ্গে অটো থামাল ড্রাইভার। বলল, উতারো।

গৌতম ভয় পেয়ে বলল, এই আধোঅন্ধকারে নির্জন পথে তুমি আমাদের নামিয়ে দেবে?

হ্যাঁ। ওই লোকের টার্গেট যখন তোমরা, তখন হামকো ছোড় দিজিয়ে। ওর সঙ্গে দুশমনি আমি করব না। ও অ্যাকসিডেন্ট করেগা তো হামারা গাড়ি টুট যায়েগা।

কিন্তু এইভাবে বাঘের মুখে ছেড়ে দিলে ও আমাদের মেরে ফেলবে যে।

তুমহারা বদনসিবমে যে হোগা ও-তো হোগাই।

স্কুটার তখন আবার সজোরে ছুটে এসেছে এদের দিকে।

অটো থেকে ওরা তখন নেমে পড়েছে। না-নামা ছাড়া উপায়ই বা কী? যতক্ষণ ওর খোশামোদ করবে ততক্ষণ আত্মরক্ষার অন্য কোনও উপায় ঠিক করে নেবে।

ওরা নামতেই স্কুটার এসে থামল ওদের পাশে।

নেলো বলল, কী হল, গাড়ি খারাপ হয়ে গেল নাকি?

গোপা-গৌতমের মুখে কথা নেই।

ড্রাইভার অটো নিয়ে পালাচ্ছিল। নেলো ঘুরে গিয়ে ধরল তাকে। একেবারে অটোর সামনে এমনভাবে স্কুটারটাকে নিয়ে গেল যে আর এগোতে পারল না সে।

নেলো স্কুটার থেকে নেমে এসে ড্রাইভারকে বলল, কাঁহা ভাগতা তুম?

ড্রাইভার বলল, ও সব ঝুট ঝামেলাকি কাম হামি না করবে নেলোদাদা। ইসি

লিয়ে নিকাল দিয়া দোনো কো। আভি তুম সামালো। ও লড়কা কিসিকা লেড়কি লেকে ভাগ্‌তা কৌন জানে?

নেলো তখন ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছে ড্রাইভারের গালে। ড্রাইভার গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, মেরা ক্যা কসুর?

উঠাও উসকো। কাঁহা যা রহে ও?

স্টেশন পর।

লে চলো।

কিন্তু কাদের নিয়ে যাবে?

গৌতম ও গোপা তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

কালো রাত শেষ হয়ে এলেও আলোর আভাস নেই। স্ট্রিট লাইট এবং অন্যান্য যানবাহনের আলোয় পিচ ঢালা পথ যেন অজগরের পিঠ। তারই ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে দু'জনে। গৌতম একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে গোপার। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দেখছে।

অটো আর স্কুটার দুটোই ওদের অনুসরণ করল।

ওরা কোনদিকে যাবে, কোথায় যে লুকোবে, কিছু ঠিক করতে পারল না।

নেলো স্কুটার নিয়ে ওদের সামনে এসে পথ রোধ করল।

থমকে দাঁড়াল ওরা।

নেলো বলল, পালাচ্ছ কেন তোমরা? এইভাবে ছুটে হেঁটে কি স্টেশনে যাওয়া যায়?

গৌতম বলল, পালাচ্ছি তার কারণ আছে। কাল বিকেলে তুমিই-না আমাদের রিকশাতে ধাক্কা দিয়েছিলে?

হ্যাঁ দিয়েছিলাম। তখন অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখন আর প্রয়োজন নেই তার। তখন ভেবেছিলাম আমার দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারব। কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমাদের ওপর তো আমার কোনও রাগ নেই। তাই অযথা তোমাদের কষ্ট দিতে চাই না। গফুর আমার দীর্ঘদিনের শত্রু। ওর সমুচিত শিক্ষা তোমরা দিয়েছ। আমিও ওকে উচিত শিক্ষা দিয়েছি। এখন নির্ভয়ে তোমরা স্টেশনে চলে যাও।

সেই অটো ওদের কাছে এসে বলল, উঠিয়ে।

গোপা দু'হাতে গৌতমকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল থরথর করে। বলল, না উঠো না গৌতম। এসবই এদের ছলচাতুরি।

নেলো বলল, ভয় নেই। আমি তোমাদের ক্ষতি করব না। ওঠো। এমন সময় স্টেশনে যাচ্ছ যখন নিশ্চয়ই তোমরা পঞ্জাব মেল ধরবে? তাড়াতাড়ি যাও।

গোপা বলল, না না না।

গৌতম বলল, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়। তবুও যে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না ভাই।

আমাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তবে তোমাদের মতো বীরকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি।

তোমার মনে কোনও মতলব না থাকলে এই শেষরাতে তুমি আমাদের পিছু নিলে কেন?

আমার মনে মতলব থাকলে এতক্ষণে আমি আমার কাজ করেই ফেলতাম। আসলে কাল বিকেলে আমি যেমন দুর্ঘটনা ঘটাতে চেয়েছিলাম, এখন আমি তার উলটোটাই করছি। এখন তোমাদের বডি গার্ড হয়ে এসেছি।

গোপার চোখে জল। বলল, মিথ্যে কথা।

গৌতম বলল, হঠাৎ এই পরিবর্তনের কারণ?

কারণ একটাই, গফুরের সামনে যারা বুকফুলিয়ে রুখে দাঁড়ায় তারা আমার সত্যিকারের দোস্ত। তোমরা ওর কান কাটলে, আর আমি তোমাদের প্রাণ নেব? তা ছাড়া আমি জানি তোমরা পালাতে গেলেই ডিসুজার লোক তোমাদের পিছু নেবে। হয়তো গুলি চালাবে। তাই সেসব কিছু যাতে না হয়, সেইজন্য আমি তোমাদের পিছু নিয়েছি। না হলে তো কখন ধাক্কা মেরে উলটে দিতাম অটোটা। নাও তাড়াতাড়ি করো।

গৌতম বলল, ডিসুজার লোক কি আমাদের পিছু নিয়েছে?

চোখে তো পড়েনি। বলেই রিভলভার বার করে বলল, এই দেখো, আমি একেবারে তৈরি হয়েই বেরিয়েছি। এই ডিসুজা শয়তানটা আমার পথের কাঁটা। আর ওর ওই চামচা দুটো। ওদের মেরে আমি গাড়োয়ালের দিকে পালাব। এখন তোমরা পালাও।

গোপা ও গৌতম অটোয় বসল।

নেলো ড্রাইভারকে বলল, এদের কাছ থেকে ভাড়া নেবে না।

নেহি লেগা।

এতক্ষণ এদের সঙ্গে আমার কী কথাবার্তা হল কিছু শুনলে?

কুছ না শুনেছি আমি।

ভেরি গুড। যদি কিছু শুনে থাক তা হলে—। বলেই রিভলভার দেখাল ড্রাইভারকে।

ড্রাইভার ভয়ে চোখ বুজল।

অটো আবার চলতে শুরু করলে নেলো সেই একইভাবে ওদের অনুসরণ করল। তারপর স্টেশন এলাকায় এসে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে কেটে পড়ল সে।

ওরা অটো থেকে নামতেই ভাড়া না-নিয়ে পালাল অটোওয়ালা। ওরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গোপা প্রায়ই আসা-যাওয়া করে, তাই লেডিজ কাউন্টার চেনে। গৌতমের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছুটে গিয়ে দুটো টিকিট করে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল।

ট্রেন তখন এসে ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে। খুব একটা ভিড় ছিল না তাই রক্ষে। ওরা ট্রেনে উঠে একটু বসবারও জায়গা পেয়ে গেল।

ট্রেন ছুটে চলল ঝড়ের বেগে।

অন্ধকার দূর হয়ে তখন একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে আকাশটা।

গোপা মনে মনে নেলোর ব্যাপারে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও, গৌতমের কিন্তু বারবার মনে পড়তে লাগল পল্টনের কথা। ওর মায়ের মুখখানিও চোখের সামনে ফুটে উঠল। এই মর্মান্তিক সংবাদ পেলে ওর মা নিশ্চয়ই আছাড়কাছাড় করে কাঁদবেন। দিদিরাও। আর বৃদ্ধ কাকামণি ইলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে যখন শুনবেন এই খবরটা, তখন কী যে করবেন তা কি ভাবা যায়? অথচ নাটকের দৃশ্যের মতো পরপর ঘটনাগুলো এমনভাবে ঘটে গেল যে, ওরা যেন নীরব দর্শক। গৌতমের মা-বাবাই বা কীভাবে নেবেন ব্যাপারটা তাই বা কে জানে? বাবা কি সত্যি সত্যিই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাশীতে ছুটে আসবেন? এইসব কত কীর কথা চিন্তা করতে করতে দু'চোখ বুজে এল গৌতমের। সারাটা দিন দুপুর, রাত্রিতে এতটুকু শোয়াবসার সময় পায়নি। তাই যত রাজ্যের ঘুম নেমে এল দু'চোখ জুড়ে।

গোপাও বসে বসে ঢুলতে লাগল।

দশ

এবারে পল্টনের কথায় আসা যাক।

গৌতম তো ওদের খপ্পর থেকে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু পল্টন বেচারি ধরা পড়ে গেল শয়তানদের হাতে। আসলে মাথায় ইটটা না লাগলে ও ছোটা থামাত না। ইটটা লাগতেই ওর গা-মাথা কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে 'উঃ বাবারে' করে বসে পড়ল। আর যেই না বসে পড়া, ওমনি ওরা এসে ধরে ফেলল ওকে।

এরপর পাঁজাকোলা করে ওকে ওরা তুলে নিয়ে গেল ডিসুজার বাংলোয়।

শংকর আর দয়াল বলল, এই ছেলেটা আমাদের ফলো করছিল বস।

ডিসুজা বলল, তাই নাকি! কে ছেলেটি?

সম্ভবত গফুরের কান কেটেছিল যারা তাদেরই একজন।

আর একজন কোথায়?

পালিয়েছে।

ডিসুজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমরা এতজন, আর এরা দু'জন। তাতেও পালায় কী করে?

শংকর বলল, গফুরের কান কাটার মতো দুঃসাহস যারা রাখে তাদের অসাধ্য কি কিছু আছে?

চমৎকার। তা হলে আর আমার হাতে হাত মিলিয়ে লাভ কী? এদেরই লিডার করে তোমাদের কাজ কারবার চালিয়ে যাও।

সকলের মাথা তখন হেঁট।

ডিসুজা বললেন, এরা তোমাদের কোথা থেকে ফলো করছিল?

তা তো জানি না।

দয়ালদা বলল, সম্ভবত মেয়েটার খোঁজেই এসেছিল এরা।

কিন্তু মেয়েটাকে যে তোমরাই কিডন্যাপ করেছ, তা এরা জানল কী করে?

সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করুন বস।

ডিসুজা এবার এক পা-এক পা করে এগিয়ে এলেন পল্টনের দিকে। তারপর ওর চুলের মুঠি ধরে বললেন, কী নাম তোর?

পল্টন।

তোর আর এক বন্ধুর নাম?

গৌতম।

গফুরের কান তোরা কেটেছিলি?

হ্যাঁ।

হঠাৎ ওই ভূত চাপল কেন তোদের মাথায়?

ওর লোকেরা আমাদের এক বোনকে খুব বিরক্ত করছিল। সেইজন্যে তাদের আমরা শিক্ষা দিয়েছিলুম একটু। তা গফুর খবর পেয়ে আমাদের ওপর চড়াও হল। সেই রাগে আমরা ওকেও একটু শিক্ষা দিয়ে দিলুম।

তোদের সেই বোন এখন কোথায়?

গঙ্গার জলে।

তার মানে?

এই শয়তান শংকর তাকে কিডন্যাপ করে আপনার এখানে নিয়ে এসে তুলেছিল। পরে নয়নাগিরি না-কোথায় যেন পাচার করবার তালে ছিল। মেয়েটাকে লঞ্চে গঙ্গা পার করবার সময় সে ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপরই নিখোঁজ।

বোমার মতো ফেটে পড়লেন ডিসুজা, হোপলেস। তারপর শংকর আর দয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, শোনো, তোমরা কিন্তু খুব শিগগির ফেঁসে যাবে। এইসব কাজের ঝুঁকি নেবার আগে ভাল করে আটঘাট বেঁধে নিতে হয়। এখন কোনওরকমে মেয়েটি যদি বেঁচে যায় তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে জানো? বিশেষ করে এই ছেলে দুটি যখন বাড়ি চিনে গেছে, তখন কেলেঙ্কারি একটা করবেই। তার ওপর নয়নাগিরির নামও জেনেছে।

শংকর বলল, মেয়েটা নির্ঘাত মরেছে। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন বস। আর পালালেও ছেলেটাকে ধরে আনার দায়িত্ব আমাদের।

থাক। আর অত কাজ দেখাতে হবে না। এখন ছেলেটা যদি পুলিশে খবর দিয়ে থাকে কিংবা বাড়ি পৌঁছে থাকে তা হলে ওকে ধরতে যাওয়া মানেই আর এক কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

দয়ালদা বলল, আপাতত এটাকে তো ভোগে পাঠিয়ে দিই?

ডিসুজা বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, ওটা তো খুব সহজ কাজ। এখন কঠিন কাজটা আগে করো দেখি?

কী কাজ বলুন?

যে ছেলেমেয়েগুলোকে ডার্করুমে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এখুনি তাদের সরিয়ে ফেলো এখান থেকে।

কোথায় সরাব?

যেখানে হোক। মনে রেখো মি. ত্রিবেদী কিন্তু আমাদের ঘোর শত্রু। অনেক চেষ্টা করেও আমি ওকে বাগে আনতে পারিনি। যদি কোনওরকমে খবর পায় তা হলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে। দলবল নিয়ে এসে খেয়ে ফেলবে একেবারে।

শংকর বলল, আপাতত ওদের শোনপুরেই পাঠিয়ে দিই।

ইডিয়ট। এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি যদি থাকত মাথায়। ওদের খোঁজে পুলিশ যদি এতক্ষণে মহেন্দ্রঘাটে এসে থাকে তা হলে কী করবে?

আমরা লঞ্চে পার করব কেন? আঘাটায় নিয়ে গিয়ে নৌকোয় পাচার করব।

মাঝিমাল্লারা যদি পুলিশকে বলে?

দয়ালদা বলল, তার চেয়ে একটা কাজ করা হোক। আপনি ডা. সাহানিকে একবার ফোন করে দিন। আপাতত ওনার নার্সিংহোমের কোনও একটা ঘরে এখনকার মতো ঢুকিয়ে দিক ওদের।

ডিসুজা দয়ালের কথাটা শুনলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, এখন এছাড়া আর কোনও পথ নেই। বলেই বললেন, তুমি এখুনি চলে যাও সাহানির কাছে। গিয়ে সব বলে ওনার অ্যাম্বুলেন্সটা নিয়ে চলে এসো। দেরি কোরো না। পুলিশ

আসবেই। কাজ হয়ে গেলে তোমরাও গা ঢাকা দাও। ফোনে কথা বলার চেয়ে সেইটাই কাজের কাজ হবে।

শংকর বলল, আমি তা হলে...?

তুমি একটা সাইকেল নিয়ে চলে যাও। ওই ভোজপুরী বলদদুটোকে এখুনি ধরে আনো। এই ছেলেটার ব্যবস্থা ওরাই করুক। তারপর বললেন, না থাক। তুমি যেয়ো না। আমি অন্য লোক পাঠাচ্ছি। বলে ভেতরঘরে ঢুকে গেলেন ডিসুজা। বললেন, অশোককে পাঠালাম।

অশোক হচ্ছে দলেরই একজন।

শংকর বলল, আমিও কি গাঢাকা দেব কিছুদিনের জন্য?

শুধু তুমি কেন? আমিও দেব। তবে ত্রিবেদীর সঙ্গে একটু মোকাবিলা করে।

তুমি যে বারণ করছ বস। না হলে কবে আমি ওটাকে শেষ করে দিতাম।

তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই বারণ করেছি। ফাঁসির দড়িকে যদি ভয় না পাও, তা হলে ও কাজ করতে পারো। তুমি জেলের ঘানি টানবে আর আমি শত্রুমুক্ত হয়ে সমানে ব্যবসা চালিয়ে যাব। সেটা যদি পারো তা হলে বলো। ত্রিবেদী-হত্যা ব্যাপারে আমি তোমাকে বিশেষভাবে মদত করতে রাজি আছি।

আপনি একটু এস পি, ডি এস পি-কে সামলান।

তাতে লাভ কী? মি. ত্রিবেদীর নৌকোর কাছি আরও অনেক বড় গাছের ডালে বাঁধা আছে। সেন্ট্রালের একজন মিনিস্টারও নাকি ওঁর স্ত্রীর সম্পর্কে কে হন। তা ছাড়া খুন করার পর যদি তুমি কোনওরকমে একবার ধরা পড় তখন মারের চোটে আগে আমার নামটাই বলে দেবে। অত কাঁচা কাজ কখনও আমি করি? আমাকে আমার ব্যবসা করতে দাও, তুমি তোমার কাজ করো। তা মেয়েটাকে যে ধরলে এখুনি তাকে নয়নাগিরি পাঠাতে হল কেন?

শংকর বলল, এইরকম একটি মেয়ের কথা কৃষ্ণমূর্তিজি আমাকে বেশ কিছুদিন ধরেই বলছিলেন। ওঁর সেই জন্মান্ধ ছেলেটির বিয়ে দেবার জন্য কোনও মেয়ে পাচ্ছিলেন না। তা একবার দূর থেকে উনি মেয়েটিকে দেখে বলেছিলেন ঠিক এইরকম একটি মেয়েকে পেলে লক্ষাধিক টাকাতেও কিনে নিতে রাজি আছেন। তা ওই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া গেলেও ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে একটিও পাওয়া যায়নি। সেইজন্যই আমি ওকে টার্গেট করেছিলাম। এমনকী দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্সও নিয়েছি আমি।

বুঝেছি। কৃষ্ণমূর্তিজির উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ। মেয়েটা সুখেই থাকত। কিন্তু আমার এখানে কী মেয়ের অভাব ছিল?

না। এ মেয়েটির বয়স খুব কম। তা ছাড়া আরও একটা অন্য ব্যাপার আছে।

কী ব্যাপার!

কৃষ্ণমূর্তিজীর সেই হারানো মেয়েটির সঙ্গে নাকি এই মেয়েটির মুখের এক আশ্চর্য রকমের মিল আছে। তাই একদিকে তিনি কিশোর পুত্রের জন্য কিশোরী বধূ, অপরদিকে নিজের মেয়ের শোক ভুলতেন এই মেয়েটিকে পেয়ে। এই অপহরণের মধ্যে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। ওকে আমাদের কোনও ছবির কাজেও লাগাতাম না, বিদেশেও পাচার করা হত না। পরে অবশ্য কৃষ্ণমূর্তিজি সস্ত্রীক এসে ওর মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতেন। বা এই ব্যাপারটা ওর মাকে মেনে নিতে বলতেন।

আমিও তাই ভাবছি। কারণ কৃষ্ণমূর্তিজি আমাদের সঙ্গে অনেক আজেবাজে ব্যাপারে যুক্ত থাকলেও, মেয়েঘটিত কোনও ব্যাপারে ওনার দুর্নাম নেই। তা মেয়েটির বাবা নেই?

শুধু মা ছাড়া কেউ নেই। তাও এখানকার মেয়ে নয়। কাশীর একটা অন্ধকার গলিতে ওরা থাকে।

কথা বলতে বলতেই অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল।

দয়ালদা ঘরে এসেই বলল, সাহানিকে ম্যানেজ করেছি বহু কষ্টে। ওদের আনা যেতে পারে এবার।

দয়ালদা, শংকর এবং আরও জনা দুই-তিন লোক মিলে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে কয়েকজন নানাবয়সি ছেলেমেয়েকে বার করে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠাল।

ডিসুজা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করলেন।

পল্টন এতক্ষণ সবকিছু শুনছিল দেখছিল। কেনও টুঁ শব্দটি করেনি। এইবার ও ডিসুজাকে একা পেয়ে একটা মতলব ঠিক করল। ডিসুজা যেই ওদের বিদায় দিয়ে ঘরে ঢুকেছেন ও অমনি একটা চিনা মাটির ফুলদানি নিয়ে ডিসুজার মাথায় মারবার জন্য ছুটে গেল দরজার কাছে।

হাজার হলেও ডিসুজা ছিলেন পুলিশের লোক। এইরকম পরিস্থিতিতে ঠিক কী করা উচিত তা তিনি জানতেন। তাই পল্টন কিছু করবার আগেই অতর্কিতে ওর হাতের কবজিতে একটা ঝটকা দিতেই ফুলদানিটা ছিটকে পড়ল হাত থেকে। ছিটকে সেটা পাশের দেওয়ালে লেগে চুরমার হয়ে গেল।

আর ঠিক সেই সময়েই সাক্ষাৎ যমের মতো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সেই ভোজপুরীদুটো, ফরমাইয়ে সাব।

ডিসুজা বললেন, চেহারা দুটো তো তৈরি করেছ নৃসিংহ অবতারের মতো। বলি খুপরিতে কি কিছুই রাখনি?

ভোজপুরীদুটো অসহায়ভাবে বলল, গলতি হো গিয়া হুজুর। অ্যায়শা তো কভি নেহি হুয়া। আভি হামকো কাম দিজিয়ে।

পল্টনকে দেখিয়ে ডিসুজা বললেন, ইয়ে লেড়কাকো লে যাও। মার মারকে

গন্ধি নালা মে ডাল দো। জিন্দা মাত ছোড় না। আউর ইয়াদ রাখো। পোলিশ আনেবালে। ও জরুর আ যায়ে গা।

ভোজপুরী দু'জন বেড়ালে যেমন ইঁদুর ধরে ঠিক সেইভাবে ধরল এসে পল্টনকে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল পল্টনের।

অসহায়ভাবে ওদের শিকার হল।

ওরা মারতে মারতে গলির মুখে নিয়ে এল ওকে।

দু'-চার ঘা খেতেই অবসন্ন হয়ে পড়ল ও। তাই ইচ্ছে করেই একটু বেশি রকমের নেতিয়ে পড়ার ভান দেখাল।

ভোজপুরীদুটোর একজন করল কী একটা হাই ড্রেনের ঢাকনা খুলে ওকে ফেলে দিল তার ভেতর। দিয়েই মুখটা এঁটে দিল। তারপর এদিকসেদিক তাকিয়ে দ্রুত চলে গেল নিজেদের বস্তির দিকে।

এগারো

সেই অন্তিম মুহূর্তে আতঙ্কে-ভয়ে পল্টনের মনের যে কী অবস্থা হয়েছিল তা ওইরকম বিপদের মুখোমুখি যে না-হয়েছে, সে ঠিক বুঝতে পারবে না। ওই আসুরিক শক্তির ধারক ভোজপুরীদুটোর হাতে মার খেয়ে ও সত্যিই নির্জীব হয়ে পড়েছিল। তারপর যে মুহূর্তে ওরা ওকে ম্যানহোলের ঢাকা খুলে একমানুষ গভীর ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিল, তখন জীবনের আশা একেবারেই ছেড়ে দিল ও।

তবু জলমগ্ন ব্যক্তিও ডুবে মরার আগে একবার কুটো ধরে বাঁচতে চায়।

তাই সেও এই গর্তে নামার সময় পাছে বিষাক্ত গ্যাসটা সহসা ওর নাকে না যায় সেইজন্যে জীবনে শেষবারের মতো বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিল।

তারপরই সব অন্ধকার।

কাদায়-পাঁকে কোমর পর্যন্ত এমনভাবে ডুবে গেল যে একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল ও। ভেবেছিল ওরা চলে গেলে নীচে থেকে ঢাকনাটা খুলে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তা আর হল না। ড্রেনের দু'পাশের দেওয়াল এত দূরে যে পা গেল না। আর দমও রাখতে পারল না বেশিক্ষণ। নিশ্বাস ছেড়ে আর একবার দম নিতেই গা-মাথা ঘুলিয়ে কীরকম যেন হয়ে গেল। ঝিমঝিম করতে লাগল মাথাটা। বিষপ্রবাহ ঘটে গেল যেন সারা শরীরে।

এই নরকে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনার আগে বড় বেশি করে মনে পড়ল মায়ের কথা।

এমন সময় হঠাৎই কোন জাদুতে খুলে গেল ঢাকনাটা।

ওর তখন সংজ্ঞাহীন হবার মতো অবস্থা।

একটা মুখ উঁকি দিল ওপর থেকে। কী যেন বলল। শুনতে পেল না। তারপরই নেমে এল একটা দড়ি।

এমন আশ্চর্যজনক ঘটনাও নাকি ঘটে?

ও সেই দড়ি ধরে কোনওরকমে কাদা-পাঁক থেকে নিজেকে মুক্ত করে ম্যানহোলের মুখের কাছে পৌঁছল। তারপর দু'হাতে ভর করে পায়ের বুড়ো আঙুলের টিপনিতে দড়িটা ধরে ওপরে উঠে এল। ওপরে উঠে আসার মুহূর্তেই একটি হাত টেনে তুলল ওকে।

বাইরের খোলা বাতাসে নিশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন করে গা-মাথা আর একবার ঘুলিয়ে উঠল। হুড় হুড় করে বমি করল খানিকটা। তারপর কিছুই আর মনে নেই।

ঘোর কাটল অনেক পরে। যখন বুঝল কেউ যেন ওর শরীরের বোঝাটা অতিকষ্টে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোথাও। কতকগুলো রাস্তার কুকুরও ওদের সঙ্গে চলেছে।

ও ভয় পেয়ে বলল, কে! কে তুমি!

একটি মেয়েগলায় উত্তর এল, ঘাবড়াইয়ে মাত।

ওর তখন প্রচণ্ড শীত করছে।

মেয়েটি ওকে নামিয়ে দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে এক জায়গায় কতকগুলো ড্রেন পাইপের কাছে নিয়ে এসে বলল, অন্দর ঘুসো!

ড্রেন পাইপগুলো এত বড় বড় যে তার ভেতর দিব্যি শোয়াবসা যায়। তবে দাঁড়ানো যায় না।

অন্ধকারে মেয়েটির মুখ ভাল বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য এটুকু বোঝা যাচ্ছে এই মেয়েটি না-থাকলে ওকে ওই ভয়াবহ নরকেই পচে মরতে হত। কিন্তু কে এই রহস্যময়ী?

পল্টন কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কে তুমি! তোমার পরিচয় দাও আমাকে। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। আমার আরও কাছে এসো। একটু দেখি তোমায়।

মেয়েটি বলল, ম্যায়নে তো কুছ নেহি কিয়া। যো কুছ কিয়া ও উপরওয়ালানে।

ওইসব কথা আমাকে বোলো না। আমি জানতে চাই তুমি কে?

দুলালি।

কিন্তু কার?

ম্যায় তো আসমান সে পয়দা হুয়া লেড়কি। ভগবান মেরা মা-বাপ। আমি ভগবানকা দুলালি।

তুমি নিশ্চয়ই ভগবানের দুলালি। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। তুমি হচ্ছ সেই অমৃতের পুত্রী। কোথায় থাকো তুমি?

এই তো, এইখানে। হিঁয়াপর।

পল্টন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, শোনো দুলালি, যদি সত্যিই তোমার কেউ না থাকে তা হলে আজ থেকেই তুমি আমার বন্ধু হয়ে যাও। আমার সঙ্গে থাকো। বাড়িতে আমার মা-দিদিরা আছেন, আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে তুমি তাদের কাছেই থাকবে।

সচ! কিন্তু দু'দিন বাদে যদি তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দাও?

এই ব্যাপারে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। এতখানি বেইমানি আমরা করব না। আচ্ছা, তোমার যখন কেউ নেই তখন তোমার চলে কী করে?

ভগবান চালিয়ে দেন। আমি ভিখ মেঙ্গে খাই।

তা হলে তোমার ভাবনা কী? আমরা যদি কখনও তোমাকে তাড়িয়ে দিই তখনই তুমি তোমার পুরনো ব্যবসায় আবার নতুন করে লেগে পড়তে পারবে। ও চাকরি ফিরে পেতে তো দেরি হবে না।

বেশ। আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি আছি। এখন তোমার খুব শীত করছে নিশ্চয়ই? খুব যে কাঁপছ দেখছি।

হ্যাঁ। দারুণ শীত করছে আমার। সবই তো ভিজে গেছে।

তা হলে গায়ের জামাটামা খুলে এই চটগুলো তুমি চাপা দাও। বলে কোথা থেকে যেন এক বান্ডিল নোংরা ময়লা চট এনে পল্টনকে দিল।

পল্টন ওর জামাগেঞ্জি খুলে চট চাপা দিল গায়ে।

একটু আগুন করব?

কীসে করবে?

খড় আছে আমার কাছে। দিয়াশালাই আছে। সবকিছু আছে। এই ড্রেন পাইপের মধ্যেই আছে আমার ছোট্ট সংসার।

দুলালির কথা শুনে অবাক হয়ে গেল পল্টন। বলল, তা হলে একটু আগুন যদি করতে পারো তো মন্দ হয় না। বড্ড কাঁপ দিচ্ছে আমার!

দুলালি তখনই দেশলাই জ্বেলে খড়ের নুটি এনে আগুন করল সেই ড্রেন পাইপের ভেতরে।

এতক্ষণে মেয়েটির মুখ দেখতে পেল পল্টন। দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন সুন্দর চোখমুখ। এই মেয়ে ভিক্ষে করে? গায়ের রং কালো, তা হোক। মাথায় ঘন চুল। খুবই ভাল লাগল পল্টনের।

আগুন জ্বালতেই গরম হয়ে উঠল ভেতরটা। তবে মুশকিল হল এই বদ্ধ জায়গায় ধোঁয়ার চোটে দম বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। তাই নিভিয়ে দিতে পথ পেল না।

পল্টন বলল, তুমি একা থাক তোমার ভয় করে না?

উঁহু।

সারাটা দিন তুমি কী করো?

সকাল থেকে গঙ্গার ঘাটে বসে ভিক্ষা করি। তারপর অনেক বেলা পর্যন্ত ভিক্ষে করে কোনও গাছতলায় বসে ডাল-ভাত একটু রেঁধে নিই। বিকেলে মন্দিরে যাই। সেখানেও ভিক্ষে করি। জুতো আগলাই। ভাল পয়সা পাওয়া যায়। সন্ধেবেলা কোনও হোটেলে ঢুকে মাংস-রুটি খাই। তারপর নাইট শো'তে একটা সিনেমা দেখে, যেখানে হোক পড়ে থাকি। তবে এখন বড় হচ্ছি তো, তাই রাত্রিবেলা যেখানে সেখানে থাকতে খুব ভয় করে। ইদানীং এই নিরাপদ জায়গাটা আমি বেছে নিয়েছি।

চমৎকার। ভিক্ষে করে তোমার কত রোজগার হয়?

কোনওদিন বিশ-পঁচিশ রুপাইয়া। কোনওদিন আরও বেশি। জুতো জমা নিয়ে পঞ্চাশ-একশো রুপিয়া পাই। আর পালেপার্বণে এক এক দিনে দু'-পাঁচশোও হয়ে যায়।

বলো কী! এত টাকা তুমি কী করো?

আমি একটা পোস্ট অফিসে জমিয়ে রাখি। আমার এখন অনেক টাকা। জানো?

তবু তুমি ভিক্ষে করো?

বাঃ রে। এতে যে আমার অনেক লাভ। খাটতে হয় না, কষ্ট করতে হয় না। অথচ বসে বসে রোজগার। তবে আমার আরও অনেক— অনেক টাকা হলে তখন ভেবে দেখব কী করব।

পল্টন বলল, তা না হয় করলে। কিন্তু এইরকম ছেঁড়া একটা ফ্রকপরে ড্রেন পাইপের ভেতরে একা একা থেকে নিজেকে কষ্ট দাও কেন?

এসব আমার জন্ম থেকেই সয়ে গেছে দোস্ত।

নিদেন কোথাও একটা ছোটখাটো ঘরও তো ভাড়া নিতে পারো?

কী হবে? সাজগোছ করলে খারাপ লোকে নজর দেবে। ঘরভাড়া নিয়ে থাকলে লোকে ঝিয়ের কাম করতে বলবে। কেউ ভিক্ষে দেবে না। আমার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া এসব আমার সয়ে গেছে। তবে দোস্ত! আমি লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করলেও খারাপ মেয়ে নই। আর ঘর ভাড়া নিয়ে থাকার কথা বলছ? আমাকে ঘরভাড়া দেবেই বা কে? সবাই তো আমাকে চেনে। তা

ছাড়া ঘরভাড়া করলে রুপিয়া লাগবে না? আমার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে তখন।

তুমি যে পোস্ট অফিসে টাকা রাখ তোমার পাস বই আছে?

হ্যাঁ। ওসব আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। কাল সকালে আমি তোমাকে সব দেখাব।

ঠিক আছে দেখিয়ো। আজকাল পোস্ট অফিসে টাকা জমা রাখলে পাঁচ-ছ' বছর বাদে তা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আমি তোমাকে সেইসব নিয়মগুলো বলে দেব।

পোস্টমাস্টার মশাইও আমাকে অনেকবার বলেছিলেন ওইভাবে টাকা রাখতে। আমি রাখিনি।

ভুল করেছ। তা যাক, আমাকে একটা কথা ঠিক করে বল তো, আমি ওই ড্রেনের মধ্যে ছিলাম তুমি কী করে জানলে?

বাঃ রে। আমি যে নিজের চোখে সব দেখলাম। তাই যেই দেখলাম তোমাকে ওরা ওর ভেতরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তখুনি আমি ছুটে গেলাম তোমাকে বাঁচাতে। এখানে দড়ির অভাব নেই। তাই নামিয়ে দিলাম একটা। আমি না-থাকলে তুমি মরে যেতে। ওর ভেতর বেশিক্ষণ থাকা যায় না। দম বন্ধ হয়ে যায়।

পল্টন বলল, তুমি না-গেলে মরে আমি যেতাম ঠিকই। কিন্তু আমি যে বেঁচে আছি তুমি সেটা বুঝলে কী করে?

ওরা যে তোমাকে মারতে মারতে নিয়ে এল তাই। মরাকে কেউ মারে?

তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে আমার মা তোমাকে খুব ভালবাসবেন। এত রাত্রে যদি তুমি জেগে না-থাকতে তা হলে আমার অবস্থাটা যে কী হত তা একবার ভেবে দেখেছ?

আমি তোমার জন্যই জেগে ছিলাম।

আমার জন্য?

হ্যাঁ। তোমার দোস্তের সঙ্গে আমার মুলাকাত হয়েছে। তোমাদের একটি মেয়েকে গুন্ডারা নিয়ে পালিয়েছিল। তারও খোঁজ পাওয়া গেছে। তোমার দোস্তই আমাকে তোমার কথা বলেছিল। ডিসুজার লোকেরা নাকি তোমাকে ওই বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল। তাই আমি, তোমার দোস্ত আর ওই মেয়েটাকে কদমকুঁয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে এখান থেকে ওই বাড়িটার দিকে লক্ষ রাখছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম তোমাকে ওইভাবে মারতে মারতে নিয়ে আসছে। তারপর ওরা তোমাকে ফেলে দিয়ে পালাতেই ছুটে গেলাম আমি। ভাগ্যে তুমি ভেতরেই অজ্ঞান হয়ে যাওনি। তা হলে তোমাকে বাঁচাতে পারতাম না। আমি তো নামতে পারতাম না ওর ভেতরে। নামলে আমিও উঠতে পারতাম না। দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম।

ঠিক। ওর ভেতরে যে কী বিচ্ছিরি একটা গ্যাস, তা তোমাকে কী করে বলব। আমি একবার শ্বাস নিয়েই বুঝেছি। গা-মাথা যেন ঘুরে উঠল। তাই তো ওপরে উঠেই জ্ঞান হারালাম। এরপর তুমি যে আমাকে নিয়ে কীভাবে কী করলে তা কিছুই জানি না।

আমি তোমাকে বহু কষ্টে আমার পিঠে করে বয়ে নিয়ে গেলাম গঙ্গার ঘাটে। তবে আঘাটায়। সেইখানে গঙ্গার জলে তোমার সমস্ত কাদা ধুয়ে পরিষ্কার করলাম। তারপর আমার ঘরে তোমাকে নিয়ে আসছি এমন সময় আবার জ্ঞান ফিরল তোমার।

কথা বলতে বলতেই ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠল।

পল্টন বলল, শোনো, আর দেরি করে লাভ নেই। আমি এখন একটু সুস্থ হয়েছি। কাল সারাটা রাত যা ধকল গেছে আমার ওপর তা কী বলব। শুধু রাত কেন? বিকেল থেকেই তো চলছে। এবার বেরিয়ে পড়া যাক।

তুমি চলে যাবে?

বাঃ রে। যেতে হবে না? আমার জন্যে ওরা কত চিন্তা করছে বলো তো? তা ছাড়া সকাল হলে দিনের আলোয় যদি আবার ধরা পড়ে যাই?

তা হলে যাও। কিন্তু তোমার জামাপ্যান্ট সব তো ভিজে।

তা কী করব। তুমি তো মেয়ে। ছেলে হলে না হয় তোমারই একটা কিছু পরতাম।

তাড়াতাড়ি পরে নাও তা হলে। মোড়ের দোকানে তোমাকে একটু চা খাইয়ে দিই। কাল রাতে তোমায় তো কিছু খেতে দিতে পারলাম না। আমার ঘরেও কিছুই নেই। সারারাত নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি তোমার?

না। এসেছিলাম বিয়েবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে। তার জায়গায় মারধোর খেয়ে মরলাম। সবই কপাল।

দুলালি হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এল। ওর পিছু পিছু চটমুড়ি দিয়ে পল্টন।

এ কী! এই অবস্থায় যাবে নাকি তুমি?

তা ছাড়া উপায় নেই। ভিজেগুলো পরতে পারছি না!

দুলালি ফিক করে হাসল। বলল, চলো।

তুমি যাবে না?

আমি কোথায় যাব?

আমার সঙ্গে?

দুলালি ঘাড় নাড়ল, নেহি। তারপর বলল, তুমি আগে বাড়ি যাও। তোমার বাড়িতে গিয়ে আমার কথা বলো। তোমার মা-বাবা যদি সব শুনে আমাকে নিয়ে যান তা হলে ভেবে দেখব। না হলে আমি যেমন আছি তেমনি থাকি।

তুমি তা হলে আমাকে বিশ্বাস করছ না?

হামকো বুরা মাত সমঝো। তুমি এখন যেখানে যাচ্ছ তারা এইখানকারই লোক। আমাকে দেখলেই চিনতে পারবে। আর দূর দূর করে তাড়াবে!

এত সস্তা নাকি? তুমি চলোই না আমার সঙ্গে। তারপর দেখি কে কী বলে?

কী পাগলামি করছ বলো তো তুমি? আমি একটা ভিখিরির মেয়ে। আর তুমি লিখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলে।

পল্টন ওই অবস্থায় নিজের জামাসোয়েটার বগলদাবা করে দুলালির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

দুলালি বলল, হাত ছাড়ো। চলো আগে মোড়ের দোকানে একটু চা খাই। তারপর যেখানে বলবে সেখানেই যাব। তোমাদের দু' বন্ধুর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। তোমরা দু'জনেই আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ। লেকিন একবারও ভেবে দেখছ না, ইয়ে নেহি হো সকতা।

গৌতমও তোমাকে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল বুঝি?

হ্যাঁ।

বলবেই তো। তোমার মতো মেয়ে হয় না।

দুলালি বলল, তোমরা বলছ বটে। কিন্তু এখানে আমি কেমন স্বাধীনভাবে ছিলাম বলো তো? ভিক্ষেদুঃখু করে যা পাই তাই খেয়ে গাছতলায় শুয়ে কেমন সুন্দরভাবে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। এখন তোমরা দয়া করে দুটি খেতে দিলে তবে তো খেতে পাব।

সেরকম বুঝলে পালিয়ে আসবে তুমি।

ওরা বড় রাস্তার ধারে একটা দোকানে এসে দেখল এরই মধ্যে চায়ের দোকান জমজমাট। শিঙাড়া, জিলিপি ভাজা হয়েছে। চা হচ্ছে।

পল্টনের ওইরকম অবস্থা দেখে সবাই তাকাতে লাগল ওর দিকে। কেউ কেউ দুলালিকেও দেখল।

পল্টনের কাছে টাকা ছিল। ও চায়ের অর্ডার দিয়ে শিঙাড়া, জিলিপি নিয়ে অর্ধেক দুলালিকে দিয়ে, অর্ধেক নিজে খেল।

একজন পল্টনকে দেখে বলল, এ হাল ক্যায়সে হুয়া ভাই?

দুলালি বলল, পানিমে গির গিয়া।

গঙ্গাজিমে?

হ্যাঁ।

চা খাওয়া হলে দাম দিতে গেল পল্টন। কিন্তু দুলালি কিছুতেই তা দিতে দিল না। এবং ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে দোকানদারও দাম নিল না। বলল, ঠিক হ্যায় বাবা। পহলে তুম ঘর তো চলা যাও।

অগত্যা একটা রিকশা ডেকে তাইতেই উঠে পড়ল পল্টন। দুলালিকেও প্রায় জোর করে টেনে তুলল রিকশায়। কিন্তু সে গেল না। রিকশায় উঠেই লাফিয়ে পড়ল। বলল, মুঝে সরম লাগতা। তুমি যাও দোস্ত। আমি না। বলে ছুটে চলে গেল গলির মোড়ে। সেখান থেকেই একবার হাত নেড়ে হারিয়ে গেল কোথায় যেন।

দুলালির এই চপলতা ওর এই সরলতা খুবই ভাল লাগল পল্টনের। ও মনে মনে ঠিক করল গৌতমকে সঙ্গে নিয়েই দুলালিকে নিতে আসবে কাল। এমন একটি জীবন কিছুতেই অবহেলায় ঝরে যেতে দেবে না।

রিকশাওয়ালা বলল, কিধার যানে হোগা বাবু?

কদমকুঁয়া।

রিকশা তরতরিয়ে এগিয়ে চলল কদমকুঁয়ার দিকে। আকাশ এখনও ভাল করে ফর্সা হয়নি।

রাস্তায় আলো এখনও জ্বলছে।

চট জড়ানো পল্টনও রিকশায় বসে শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে। কদমকুঁয়া পৌঁছতে খুব একটা বেশি সময় লাগল না।

ওকে ওইরকম চট মুড়ি দেওয়া অবস্থায় রিকশা থেকে নামতে দেখেই ছুটে এল সকলে। যারা এল তাদের অনেককেই অবশ্য ও চেনে না। এদের কেউ কাকুমণির ছাত্র, কেউ বা বরযাত্রীর লোক।

ও কিন্তু কারও দিকে না তাকিয়ে হনহন করে উঠে গেল ওপরে।

কাকিমা ওকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এই তো! এই তো ফিরে এসেছে পল্টন। বাবা বিশ্বনাথ। আমি কাশী গিয়ে তোমার পুজো দিয়ে আসব বাবা। পরের ছেলে, পরের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে এসে যদি গুন্ডা-বদমাশের পাল্লায় পড়ে, তবে এর চেয়ে দুশ্চিন্তার কিছু আছে কি? সারাজীবনের জন্য দায়ী থেকে যেতুম আমরা।

বাবলিদি বললেন, তোকে নিয়ে যে কী দুর্ভাবনা হয়েছিল আমাদের তা কী বলব। কিন্তু তোর এই দশা কী করে হল? জামা-প্যান্ট-সোয়েটারের বদলে চটমুড়ি দিয়ে, ব্যাপারটা কী?

বলব বলব, সব বলব। কাকুমণি কোথায়?

কাকিমা বাবলিদি দু'জনেই কেঁদে ফেললেন এবার, দাদুভাইকে আনতে গেছে হাসপাতাল থেকে।

দাদুভাই.....!

দাদুভাই মারা গেছেন। গুন্ডারা গোপা আর দাদুভাইকে চুরি করে নিয়ে পালাবার সময় গাড়ি থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল দাদুভাইকে। তাতে

আঘাত পেয়েছিলেন খুব। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেছেন ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ হয়ে। কোমরের হাড়ও ভেঙেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল পল্টনের বুক থেকে। বলল, সে কী! গৌতম কই? গোপাকে দেখছি না কেন?

ওদের বেনারসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বেনারসে! কার সঙ্গে গেল?

গৌতমই নিয়ে গেছে গোপাকে। না হলে ওকে একা তো ছাড়তে পারি না।

ভাল করেছেন। কখন গেল?

ভোরবেলা, পঞ্জাব মেলে। তা তোমার ব্যাপার কী বলো তো? তুমি কীভাবে রেহাই পেলে ওদের খপ্পর থেকে? তোমার কাকুমণির মুখে যা শুনলাম সেটা অত্যন্ত খারাপ খবর। তোমাকে নাকি আধমরা করে ওরা ড্রেনের ভেতর ফেলে দিয়েছিল?

হ্যাঁ। খুবই ভুল করেছিল ওরা। ওদের সেই ভুলের জন্যেই আমি এখন এখানে।

বাবলিদি বললেন, কীভাবে কী হয়েছিল শুনি?

পল্টন তখন আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল, কাকিমা ও বাবলিদিকে।

কাকিমা বললেন, আহারে! কত কষ্টই না পেয়েছিস তুই। তবে ভিখিরির মেয়ে হোক, ওই দুলালি না কী যেন নাম বললি, ওই তোর ভাগ্যলক্ষ্মী। ও না থাকলে তোকে বেঁচে ফিরতে হত না।

ওর ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না কাকিমা। আমার জীবনরক্ষার জন্য ভগবান ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ও ঋণ কী শোধ করা যায়?

বাবলিদি বললেন, পল্টন! আমি তোমার দিদির মতো। আমি বলছি ওই হতভাগীকে কোনওমতেই পথের ধুলোয় ঝরে যেতে দিয়ো না। যেভাবেই হোক বুঝিয়ে বাঝিয়ে নিয়ে এসো তুমি। ওর জন্যে কিছু করা তোমার একটা পবিত্র কর্তব্য। তোমার দিদিরা আছেন। যদি ওর বয়সি তোমার আর একটি বোনই থাকত, তা হলে? মনে করবে ও—ও তোমার এক দুখিনি বোন।

আমি তো ওকে নিয়েই যেতে চাই। কিন্তু ও না এলে? তা ছাড়া বাবলিদি, আর একটা কথা। আমি তো ইস্কুলে পড়ি। চাকরি বাকরি কিছুই করি না এখন। বড় হয়ে এই বাজারে আদৌ চাকরি পাব কি না তাও জানি না। এখন কাকামণিই আমাদের ভরসা। উনি কি ঘরে নেবেন ওকে?

কাকিমা বললেন, তোমার কাকামণিকে তুমি আজও চেননি তা হলে। ওঁর মতো মানুষ হয় না। বিশেষ করে যে মেয়ের জন্যে তোমার জীবন রক্ষা হয়েছে,

তাকে ঘরে ঠাঁই দেবেন না মানে? যদি না দেন তখন আমি তো আছি। বাবলি চলে গেলে তো ঘর আমার ফাঁকা। আমি ওকে আমার কাছে রাখব। অত বড় মেয়ে একা একা যেখানে সেখানে পড়ে থাকবে। ভিক্ষে করবে। তাই কখনও হয়? তুমি আজই ওকে এখানে নিয়ে এসো।

বাবলিদি বললেন, এখন থাক। আর তুমি বাইরে বেরিয়ো না। ওরা জানে তুমি মৃত। সেই জানাটুকুই ওদের অভ্রান্ত হোক। আর পরোপকার করতে গিয়ে নিজের বিপদ বাড়িয়ো না।

পল্টন এইসব কথাবার্তার ফাঁকেই ওর পোশাক পরিবর্তন করল।

সারারাত খাওয়াদাওয়া নেই বেচারির।

কাকিমা তাই ওকে নিজে হাতে ওর পছন্দমতো বাসি খাবার দই-মিষ্টি সব পেট ভরে খাইয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে চোখের জলে বিদায় নিতে হল বাবলিদিকে।

সত্যবাবু তখন শ্মশানে।

বাবলিদি চলে গেলে একটা অটো ডেকে কাকিমা পল্টনকে নিয়ে চলে এলেন দরিয়াপুরের বাড়িতে।

চারদিক তখন শান্ত। কোথাও কোনও উত্তেজনা নেই।

অনেক বেলায় শ্মশান থেকে ফিরে এসে পল্টনকে একবার আড়চোখে দেখলেন সত্যবাবু। তবে চমকালেন না। কেন না ছাত্রদের মুখে শ্মশানে বসেই তিনি পল্টনের ফিরে আসার সংবাদ পেয়েছেন। তাই শুধু আদর করে ওর গায়েমাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। তারপর বাবার বিছানায় লুটিয়ে পড়ে শিশুর মতো সে কী কান্না।

বারো

কাল সারারাত ঘুম হয়নি। দুপুরবেলা তাই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল পল্টন। বিকেলে যখন ঘুম থেকে উঠল, শরীর তখন অনেক ঝরঝরে। কোনও ক্লান্তিবোধ আর নেই।

কাকুমণি অন্যের মুখে সব কিছু শুনলেও ওর মুখেও আবার নতুন করে শুনলেন সব। শুনে বললেন, তুমি যে মেয়েটির কথা বলছ ওকে আমি চিনি। খুব ছোট থেকেই ভিক্ষে করতে দেখছি ওকে। তা ও যদি সত্যি সত্যিই কোনও গেরস্থ বাড়িতে থাকতে চায় তা হলে আমিই ওকে থাকতে দিতে পারি। বাবলির বিয়ে হয়ে গেল। বাবা চলে গেলেন। ঘর তো আমার ফাঁকা। ছেলে নেই যে তার একটা বিয়ে

দিয়ে বউ নিয়ে আসব। এই অবস্থায় আমি বাইরে থাকলে তোমার কাকিমার একা থাকতে অসহ্য লাগবে। অতএব মেয়েটিকে পেলে কিন্তু মন্দ হয় না।

পল্টন বলল, আপনার এখানে স্থান পেলে তো ওর পক্ষেও খুব ভাল হয়। কেন না এখানকার গঙ্গা এবং পাটনা শহর দুটোর কোনওটাকেই ছেড়ে থাকতে পারবে না ও।

কাকুমণি বললেন, আচ্ছা, ওকে এখানে আনার ব্যবস্থা করছি।

হিতৈষী কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা সব শুনে বললেন, আনছ আনো, তবে কিনা ওইসব মেয়েকে পোষ মানানো বড়ই কঠিন ব্যাপার। কোনওদিন হয়তো চুরিচামারি করে পালাবে। না হলে বাইরের চোরডাকাতকে ঘরের সম্পত্তির কথা বলে দেবে। তা ছাড়া এই তো একটা মেয়েকে দু'দিনের জন্য রেখে কী কাণ্ড। আবার সেই কাজ করবে?

কাকুমণি এবার ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, তা অবশ্য ঠিক। শেষকালে আবার নতুন করে কোন ঝামেলা দেখা দেয় তা কে জানে?

পল্টন বলল, আবার কী ঝামেলা দেখা দেবে? আসল ঝামেলা যারা করত তাদের পাণ্ডা তো মরেছে। আর ও মেয়েও রাস্তার মেয়ে। ওকে কেউ বিরক্ত করলে সেও ছেড়ে কথা বলবে না।

তবুও আমাদের মতে ও পাপ ঘরে না-ঢোকানোই ভাল।

পল্টন বলল, বেশ। আমিই তা হলে ওকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। ও আমার মায়ের কাছেই থাকবে।

কাকুমণি বললেন, সেটা হলে তো খুবই ভাল হয়। তবে কি না তোমার মুখে যা শুনলাম তাতে ও যেতে চাইবে কি?

না যায় কী আর করব? চেষ্টা করব ওর ভাল করবার।

এরপর সন্ধে পর্যন্ত আরও অনেক লোকজন এল। কত কথাবার্তা হল। এই আকস্মিক বিপদের জন্য সহানুভূতি জানালেন অনেকে। সান্ত্বনা দিলেন। আগামীকাল বাবলিদির বউভাত। অথচ কী করে যে কী করবেন সত্যবাবু তা ভেবে পেলেন না। যদিও এখন আর তাঁর করণীয় কিছুই নেই। বরপক্ষের ওরা বলেই গেছে ব্যাপারটা ওরাই সেরে নেবে। তবুও মন কী মানে?

সন্ধের পরে সত্যবাবুর সেই ছাত্রটি এল, যে কিনা ওদের টাকা দিয়েছিল এবং যাদের বাড়ি টেলিফোন আছে।

সত্যবাবু বললেন, দিবাকর! তুমি একটু বেনারসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার? ছেলেমেয়ে দুটো সেই ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে চলে গেল, কীভাবে পৌঁছুল না পৌঁছুল কিছুই জানতে পারলুম না। একবার দেখো না চেষ্টা করে, যদি লাইন পাওয়া যায়?

দেখছি। তবে বেনারসের লাইন খুব ডিসটার্ব করছে ক'দিন ধরে।

পল্টন বলল, আমিও যাব তোমাদের বাড়ি। যদি লাইন পাওয়া যায়, তা হলে গৌতমের সঙ্গে কথা বলব একটু।

সত্যবাবু বললেন, বেশ তো যাও। তারপর দিবাকরকে বললেন, ওকে বরং তোমাদের বাড়িই রেখে দাও। আর এখানে পাঠিয়ে কাজ নেই। কাল বাবলির বউভাতে নিয়ে যেয়ো তোমাদের সঙ্গে। পরশু ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

একা ছাড়বেন?

পল্টন বলল, একা ছাড়লে ক্ষতি কী? গুন্ডারা এসে আবার আমাকে ধরবে? অত ভয় আমি করি না। তা হলে ওদের কবল থেকে এইভাবে পালিয়ে আসতে পারতুম না। তা ছাড়া ট্রেনের কামরায় একবার ঢুকে পড়লে কে আমার কী করবে শুনি?

তুমি যদি যেতে পার আমার আপত্তি নেই। একা যদি যাও তা হলে রাতের গাড়ি নয়, দিনের বেলা তুফানে তোমাকে চাপিয়ে দেব। সকালে চাপলে সন্ধেবেলা হাওড়ায় পৌঁছে যাবে।

সেই ভাল। পারি তো ওই মেয়েটাকেও সঙ্গে নেব।

কাকুমণি হাসলেন।

দিবাকর বলল, কোন মেয়েটি?

যেতে যেতে তোমাকে সব বলব।

পল্টন ওর এবং গৌতমের ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে দিবাকরের সঙ্গে সাইকেলে ওদের বাড়ির দিকে চলল, যেতে যেতেই সব কথা সবিস্তারে খুলে বলল দিবাকরকে।

দিবাকর বলল, বুঝেছি তুমি কোন মেয়েটির কথা বলছ। মেয়েটি সকালে ঘাটে ভিক্ষে করে আর সন্ধের পর মন্দিরের সামনে বসে দর্শনার্থীদের জুতো আগলায়। মেয়েটা ভাল। ঘরে নিয়ে যাবার মতো। বলতে গেলে ও শুধু তোমার কেন, তোমাদের দু' বন্ধুরই উপকার করেছে। এমনকী গোপাকে ফিরে পাওয়ার মাধ্যমও ওই মেয়েটি।

ঠিক তাই।

আবার কদমকুঁয়ার কাছেই দিবাকরদের ফ্ল্যাটবাড়িতে এল ওরা। দিবাকররা এই ফ্ল্যাটের দোতলায় থাকে। গৌতমকে নিয়ে এর আগেই তো এখানে এসেছিল পল্টন। ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। ওর জামা-প্যান্ট-সোয়েটার নিয়েছিল। আবার এল। দিবাকর যদিও ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়, কলেজে পড়ে, তবুও ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করেছিল।

সেই দিবাকরের বাড়িতে এসেই বারাণসীতে ট্রাঙ্ককল করল। টেলিফোন

গোপাদেরও নেই। ওদের পাশের বাড়িতে আছে, যেখানে ফোন করলে ওদের পাওয়া যায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর লাইন পাওয়া গেল।

ওধার থেকে উত্তর এল, হ্যালো.....।

একটু গোপাকে ডেকে দেবেন?

কে গোপা?

আপনাদের পাশের বাড়িতে থাকে। ও আর ওর মা।

আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

পাটনা থেকে।

বুঝেছি। আপনি খুকুর কথা বলছেন?

কে খুকু! আমি তো জানি না। গোপাকে জানি। পাটনার দরিয়াপুরে সত্যসুন্দরবাবুর কাছে গান শেখে।

একটু ধরুন। ডেকে দিচ্ছি।

খানিক ধরে থাকার পরই এক মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল, হ্যালো! কে বলছেন?

তুমি কি গোপা?

আমি ওর মা ফোন করছি। আপনি কে?

আমাকে আপনি বলবেন না মাসিমা। আমি পল্টন। বাবলিদির বিয়েতে এসেছি।

তুমি পল্টন!

হ্যাঁ।

কী আশ্চর্য! তোমার জন্যে ছেলেমেয়ে দুটো ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে। তোমার তো খুব বিপদ হয়ে গিয়েছিল। এখন কেমন আছ তুমি?

আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি।

তোমরা দু' বন্ধুতে আমার মেয়ের জন্যে যা করেছ তার তুলনা নেই। আমি কী বলে যে তোমাদের ধন্যবাদ জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না। আমার বুকের মাণিক ফিরিয়ে দিয়েছ তোমরা। মাস্টারমশাইয়ের খবর কী?

একরকম। আমি এখন ও বাড়িতে নেই। যেখান থেকে ফোন করছি সেই বাড়িতে আছি।

দিবাকরদের বাড়ি। খুব ভাল ছেলে ও।

আপনি একবার গৌতমকে ডেকে দিন।

ওরা তো কেউ নেই। সারা দুপুর ঘুমিয়ে এখন একটু দশাশ্বমেধের দিকে গেছে।

সেটা আবার কী?

এখানকার একটা ঘাটের নাম। আমি আজই রাত্তিরে ফোন করতাম। তুমি যখন করলে তখন ভালই হল। তা বলছিলাম কী, তুমিই বা ওই বিষাক্ত পরিবেশে একা থেকে কী করবে? চলে এসো এখানে। দিনকতক থেকে ঘুরে বেরিয়ে যাও। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক কাল কলকাতা যাচ্ছেন। আমি তাঁর হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের বাড়িতে। কাজেই কোনও চিন্তা নেই। তোমরা আনন্দে কিছুদিন ঘুরতে পারবে এখানে। তারপর আমি টিকিট কেটে রিজার্ভেশন করিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে দেব। নির্ভাবনায় বাড়ি পৌঁছে যাবে। ওখানকার যা অবস্থা তাতে আর একদিনও ওখানে থাকা ঠিক নয় তোমার।

আপনি যা বললেন সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি কখনও বেনারসে যাইনি। কী করে যাব?

শোনো! তুমি দিবাকরকে বলো ভোরবেলা পঞ্জাব মেলে তোমাকে তুলে দিতে। তা ছাড়া এখনও সময় আছে। তুমি অমৃতসর এক্সপ্রেসটা যদি ধরতে পার তো খুব ভাল হয়। তা হলে একেবারে সকাল ন'টার মধ্যে বারাণসী পৌঁছে যাবে। গোপাকে নিয়ে আমি নিজে স্টেশনে থাকব। তোমার কাছে যদি গাড়ি ভাড়া না থাকে তা হলে দিবাকরকে বলো ও দিয়ে দেবে।

না না। এখন আমার কাছে টাকা আছে। আমরা তো ফিরে যাবার গাড়ি ভাড়া সঙ্গে নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম।

তা হলে আর দেরি কোরো না। এই বেলা তৈরি হয়ে নাও। রাত দুটো পঞ্চাশে অমৃতসর এক্সপ্রেস পাটনা থেকে ছাড়ে। বারোটা-একটা নাগাদ স্টেশনে চলে এসো। তবে একা এসো না, দিবাকরকে সঙ্গে নিয়েই এসো।

ঠিক আছে। আমি যাবই।

তুমি একবার দিবাকরকে দাও।

পল্টন রিসিভারটা দিবাকরের হাতে দিয়ে বলল, গোপার মা।

দিবাকরের সঙ্গে ফোনে অনেক কথা হল।

দিবাকর বলল, বেশ তো, ওর জন্যে আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমি নিজে গিয়ে ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।

ফোনে কথাবার্তা শেষ হলে পল্টন বলল, কত আনন্দ নিয়ে এখানে এসেছিলাম কিন্তু এখন আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে কতক্ষণে যাই।

দিবাকর বলল, আমারও মনে হয় তোমার চলে যাওয়াই ভাল। মাস্টারমশাইকে আমি বলে আসছি সেই কথা। তারপর তোমাকে অমৃতসর এক্সপ্রেসেই তুলে দিয়ে আসব।

পল্টন বলল, তার আগে একটা অনুরোধ। তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে ভাই।

কী করতে হবে বলো?

তুমি যে ভাবেই হোক একবার ওই মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও।

কার কথা বলছ?

দুলালির কথা বলছি।

কী হবে দেখা করে?

পল্টন বলল, তা ঠিক। তবে কি না এই শহরে আর তো আমি ভুলেও কখনও আসব না। তাই যাবার আগে একবার ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নিতে চাই। কেন না ইতিমধ্যে যদি ও কোনওকারণে মনস্থির করে থাকে, তা হলে কিন্তু আমি আর না গেলে ও ভীষণ দুঃখ পাবে। ভাববে হয়তো কথার কথা বলেছি ওকে। অন্তর দিয়ে বলিনি। এখন যদি ও যেতে রাজি না হয় তা হলে নিজের কাছে আমি ঠিক থাকব। ও-ও আমাকে ভুল বুঝবে না। বা কোনও দোষারোপ করবে না।

দিবাকর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা অবশ্য ঠিক। তবে আমার মনে হয় ওসবের ভেতরে আর নিজেকে না-জড়ানোই ভাল। তা ছাড়া ওই জায়গায় আবার তুমি যাবে সেটা ঠিক নয়।

তা হলে এক কাজ করো না, তুমিই ওকে নিয়ে এসো না এখানে?

আমার বাড়ির লোক সেটা পছন্দ করবেন না।

পল্টন আহত হয়ে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি তা হলে কাকুমণিকে জানিয়ে এসো আমি আজই চলে যাচ্ছি।

দিবাকর ঘড়ি দেখে বলল, এখন সবে পৌনে আটটা। তুমি একটু বিশ্রাম নাও। মাকে বলে যাচ্ছি তোমার খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধে হবে না। আমার তো এখন অনেক কাজ। মাস্টারমশাই আমাকে অনেক কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি দশটা-এগারোটা নাগাদ ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। তবে হয়তো তার আগে তোমাকে একবার থানাতেও যেতে হতে পারে। কেন না পুলিশ জেনেছে তুমি নিখোঁজ হওনি।

পুলিশকে এ খবর কে দিল?

আমরাই দিয়েছি। না হলে অযথা ওরা তোমাকে খুঁজতে ড্রেনের ভেতর তোলপাড় করত।

আমি কোনও অবস্থাতেই পুলিশের কাছে যাব না। পুলিশের সাহায্য ছাড়াই যখন আমি বেঁচে ফিরেছি, তখন ওদের এড়িয়েই আমি চলে যাব।

পুলিশ চাইলে যেতে তোমাকে হবেই। তবে কি না একান্তই যদি যেতে হয় তা হলে পুলিশকে এই কথাটাই বলবে কার সাহায্যে এবং কীভাবে তুমি প্রাণে বেঁচেছ।

পল্টন বলল, তার মানে যে মেয়েটির দয়ায় আমি জীবন ফিরে পেলাম পুলিশের কাছে তার নামটি বলে তাকে আরও বিপদের জালে জড়িয়ে দেব। এই তো?

দিবাকর আর কিছু না বলে চলে গেল।

ও চলে গেলে পল্টন খস খস করে একটা চিঠি লিখে টেবিলের ওপর রেখে পেপারওয়েট চাপা দিল। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে শুধু টাকা ছাড়া অন্য কোনও কিছু না নিয়েই একেবারে বড় রাস্তায় এসে রিকশা ধরল। নেবার মধ্যে নিয়েছিল শুধু মাংকি ক্যাপটা। সেটাতে মুখ ঢেকে নিজেকে এমন করে নিল যে ওকে কারও চেনবার উপায়টি রইল না। আজ এবেলায় শীত একটু কম। তাই পথেও কোনও কষ্ট হল না।

ও ঠিক জায়গায় এসে টুপ করে রিকশা থেকে নামল। তারপর চুপিসাড়ে সেই ড্রেন পাইপগুলোর কাছে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও দুলালিকে দেখতে পেল না। হঠাৎ মনে হল রাত তো বেশি নয়। তা হলে ও তো এখন মন্দিরে থাকবে। কিন্তু মন্দিরটা কোথায়? ও অনুমানে গঙ্গার দিকে একটু এগোতেই ঢোল-খোলের শব্দ শুনতে পেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে খানিকটা যেতেই দেখতে পেল মন্দিরটা।

মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই দেখল দুলালি একটা বিস্তীর্ণ চাতালের পাশে লাঠি হাতে বসে বসে বসে দর্শনার্থীদের জুতো পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে গোরু-ছাগল এলে তাড়াচ্ছে। চারদিক বেশ জমজমাট।

পল্টন একটু কেশে ওর দিকে চোখ রেখে এক পা এক পা করে এগোতেই ওকে দেখতে পেল দুলালি।

ও কোনও কথা না-বলে মাংকি ক্যাপটা একবার তুলে মুখটা বার করে দেখাল। তারপর আবার ঢেকে ফেলল মুখখানা।

দুলালি কেমন যেন ভয় পেয়ে ছুটে এল ওর কাছে। তারপর চাপা গলায় বলল, আরে! তুমি ইধার কিঁউ আয়া?

তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে।

হিস্‌স্‌। ডিসুজাকা আদমি পূজা দেনে আয়া হিঁয়া পর। চলো চলো, উধার চলো।

দুলালি পল্টনের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল এক অন্ধকার নির্জনে।

পল্টন বলল, শোন, আমাকে আজই এখান থেকে বেনারসে চলে যেতে হচ্ছে। না হলে হয়তো পুলিশ আমাকে টানাহেঁচড়া করবে। যাবার আগে আমি শেষবারের মতো তোমার কাছে এসেছি। তুমি কী ভদ্রসুস্থ একটা জীবনকে বেছে নেবে? না এইভাবে ভিক্ষে করে দিন কাটাবে? তুমি বড় হচ্ছ। রাত্রিবেলা ড্রেনপাইপের ভেতরে লুকিয়ে আর কত রাত নিজেকে আড়ালে রাখবে?

হামকো শোচনে দো।

ভাববার সময় কিন্তু আর পাবে না। আমাকে যেতেই হবে। কেন না পুলিশের খপ্পরে আমি পড়ছি না। আর পাটনা শহরেও দ্বিতীয়বার আসছি না।

দুলালি কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, তুমি কি সত্যিই আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও?

না হলে কি এই রাতদুপুরে আমি সিনেমা করতে এসেছি?

তো ঠিক হ্যায়। তুম স্টেশন পর চলা যাও। অকেলে। এক নম্বর খিড়কি পর ইন্তেজার করো। হাম যা রহেঁ। জলদি যাও।

পল্টন বলল, যদি টাকার দরকার থাকে নিতে পার। যাবার সময় কোনও দোকান থেকে একটা নতুন কিছু কিনে নিয়ো। এই ছেঁড়াটাকে ত্যাগ করতে হবে এবার।

দুলালি বলল, ম্যায় যানে কে লিয়ে তৈয়ার হুঁ। সব কুছ হ্যায় হামারা পাস তুম যাও।

পল্টন চলে গেল।

ওর চলে যাওয়া পথের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন ভাবল দুলালি। তারপর মন্দিরে এসে বজরঙ্গবলিকে একটা প্রণাম করে পাশের গলিতে হারিয়ে গেল।

তের

পল্টনকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ও যাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুলালি গিয়ে হাজির হল। দুলালির সাজপোশাক দেখে তো প্রথমে চিনতেই পারেনি পল্টন। এ কাকে দেখছে ও? নতুন চুড়িদার পরা বন্যসৌন্দর্যে ভরা খুশি খুশি ঝলমলে একটি মেয়ে।

পল্টন অবাক হয়ে বলল, এমন ঝকঝকে মেয়ে তুমি। আর নিজেকে কী করে রেখেছিলে? কী চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে তা জানো? সত্যি বলতে কী, তোমাকে দেখে এখন আমার একেবারে অন্যরকম লাগছে।

ট্রেন ক বাজে মিলেগা?

রাত্রি দুটোর পর।

আভি দশ বাজ গিয়া হোগা?

সাড়ে দশটা। এখন চলো কোনও একটা হোটেলে ঢুকে পেট ভরে দুটো খেয়ে নিই। খিদে পাচ্ছে খুব।

দুলালি বলল, শোনো, তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে অনেকে হয়তো অন্যরকম ভাববে। কেউ খারাপ কথা বললে তুমি যেন কিছু বলবে না। রাগটা একটু সামলে রাখবে, কেমন?

ঠিক আছে।

ওরা বাইরের হোটেলে না খেয়ে রেলের ক্যান্টিনে খেল। পল্টনের প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল ধরা পড়বার। যদি ওর চিঠি পেয়ে দিবাকর বা কাকুমণি ছুটে আসেন, তা হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তার ওপর এইরকম সুসজ্জিতা দুলালিকে দেখে অন্যরকম সন্দেহ করেন যদি? ভয় হল কাকুমণিকে। ও তো ঝোঁকের মাথায় ছিঁড়ে আনল এই বনফুল। তিনিও যদি অন্য রকম কিছু ভেবে বসেন?

খাওয়া দাওয়া করে ওরা বেনারসের দুটো টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে আসতেই দেখল একটা প্রায় ফাঁকা গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে।

পল্টন একজন চেকারকে জিজ্ঞেস করল, এ গাড়িটা কোথায় যাবে?

তোমরা কোথায় যাবে?

আমরা বেনারস যাব।

এটা ভাগলপুর বোম্বাই এক্সপ্রেস। বেনারস যাবে না। তবে তোমরা মুঘলসরাই পর্যন্ত চলে যেতে পার এই গাড়িতে। ওখান থেকে যে কোনও ট্রেনে অথবা বাসে চলে যেয়ো বেনারসে।

ওরা আর বিলম্ব না করে চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরেই উঠে পড়ল ট্রেনে। দুলালি আগে উঠলে, ছুটে উঠল পল্টন। গাড়িটা জনতা গাড়ি। সব বগিই সেকেন্ড ক্লাস। লোক্যাল যাত্রীদের ভিড় নেই বললেই হয়। তাই বসবার কোনও অসুবিধে হল না। পরের স্টেশন দানাপুরে একজন যাত্রী নেমে যেতে বাঙ্কও পেয়ে গেল একটা।

একজন সহযাত্রীর মুখে শুনল একেবারে শেষ রাতে অথবা ভোরে এ গাড়ি মুঘলসরাই পৌঁছবে। তাই ওরা দু'জনেই সেই বাঙ্কটি দখল করে বসে রইল চুপচাপ। ঘুম এলে শুয়েও পড়া যাবে।

রাতের অন্ধকারে চলমান ট্রেনের কামরায় সমস্ত বিপদের মেঘ যেন কেটে গেল।

দুলালি ওর বুকের কাছে গুঁজে রাখা পলিথিনে মোড়া কী যেন একটা বার করে পল্টনের হাতে দিল।

পল্টন বলল, কী এটা?

দেখোই না। তুমি তো লিখাপড়া জানো। তুমি পড়তে পারবে।

পল্টন সেটা খুলে দেখল পোস্ট অফিসের একটি পাস বই। তারই পাতায় ওর

দিনে দিনে সংগ্রহ করা ভিক্ষালব্ধ অর্থের এক অসামান্য সঞ্চয়। মাত্র চার বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর জমে গেছে। পল্টন বিস্মিত হয়ে বলল, এ কী করে সম্ভব!

দুলালি বলল, আমি সারা দিন ভিক্ষে করে পঁচিশ থেকে ত্রিশ রুপাইয়া পাই। আর জুতো রাখার ব্যবসায় কম করেও পঞ্চাশ থেকে একশো রুপিয়া, কখনও দেড়শো-দুশোও হয়ে যায়! পালেপার্বণে তো কথাই নেই। আগে এগুলো একটা কৌটোয় জমিয়ে রাখতুম। তারপর মাস্টারমশাইয়ের কথায় পোস্ট অফিসে জমা রাখছি।

পল্টন বলল, তুমি তো অনেকের চেয়ে দেখছি বড়লোক। তা যাকগে এই টাকার কথা তুমি কাউকে বলবে না কিন্তু।

দুলালি বলল, এই বইটা এখন থেকে তোমার কাছেই থাকবে। আমি আর রাখতে পারব না।

পল্টন বলল, এখন আমি রাখছি। পরে আমার কাছেও রাখব না। আমার কাকুমণির কাছে রেখে দেব। উনি পোস্ট অফিসের অনেক ব্যাপারস্যাপার জানেন। পাঁচ বছর, ছ' বছরে এই টাকা পোস্ট অফিসে ডবল হয়ে যায়। উনি সেই ব্যবস্থাই করে দেবেন।

দুলালি হঠাৎ কোমরে বাঁধা একটা গেঁজে বার করে বলল, এতেও অনেক রুপিয়া আছে। কাল আজ সারাদিনের কামাই। গুণে দেখো তো কত? এর ভেতর থেকে সামান্য কিছু খরচ করেছি। এই চুড়িদারটা কিনেছি। ট্রেনের ভাড়া অবশ্য তুমি দিয়েছ, খাইয়েছ।

পল্টন সেই সব টাকা-পয়সা গুণে দেখল কিছু কম পঞ্চাশ টাকা।

দুলালি বলল, ওগুলোও তোমার কাছে রাখো।

পল্টন বলল, না। কোনও অবস্থাতেই নিঃসম্বল হওয়া উচিত নয়। এগুলো এর ভেতরে যেমন ছিল তেমনি থাক। বলা যায় না কখন কী হয়।

অগত্যা দুলালি ওগুলো আবার আগের মতোই নিজের কাছে রেখে দিল।

পল্টন বলল, সবাই যদি তোমার মতো হিসেবি হত?

দুলালি বলল, পোস্ট অফিসের খোঁজ সবাই এখন জেনে গেছে। পোস্টমাস্টারমশাই রোজ গঙ্গায় চান করতে যান। আর আমাদের মতন ভিখিরিদের রুপিয়া নিয়ে বই করে দেন। আবদুলের মা'র এখন এক লাখসে জায়দা রুপিয়া হয়ে গেছে।

তবুও সে ভিক্ষে করে?

আমিও তো করি। আমাদের ঘরভাড়া লাগে না। ভিক্ষের চাল-ডাল ফুটিয়ে খাই। বসে বসে রুপিয়া পাই। আমার খরচা শুধু সকালেবিকেলে এক কাপ করে

চা। রাত্রে হোটেলে মাংস-রুটি। আমি মাংস খেতে খুব ভালবাসি। তা দশ টাকার মধ্যেই হয়ে যায়।

সেই সঙ্গে সিনেমা দেখতেও তো ভালবাস।

তা বাসি। নাইট শোতে একটা যে কোনও সিনেমা দেখা আমার চাই-ই।

আমাদের বাড়ি গেলে সিনেমা দেখাটি কিন্তু তোমার চলবে না।

দুলালি বলল, আমি সব সময় তোমার মাকে জড়িয়ে ধরে থাকব। তোমাদের ঘরের সব কাজ করে দেব। থালাবাসন মেজে দেব। তোমার দিদিরা কোথাও বেড়াতে গেলে তাদের সঙ্গে যাব। তবে আমার এই রুপিয়াগুলো ডবল হয়ে গেলে তুমি যদি রাজি থাকো তা হলে ছোটখাটো একটা ব্যবসা করব।

তুমি এইটুকু মেয়ে তোমাকে ব্যবসার বুদ্ধি কে দিল?

আমাদের গাঙ্গুরামকে তো তুমি চেনো না? ও মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে দু'-হাজার রুপিয়া নিয়েছিল। সেই টাকায় কলকাতা গিয়ে রথের মেলা আর দুর্গাপুজোয় তালপাতার বাঁশি বেচে দশ হাজার রুপিয়া করেছে। তুমিও বড় হয়ে চাকরি না করে বিজনেস করবে।

পল্টন বলল, তোমাদের গাঙ্গুরামরা যা পারে, আমরা যে তা পারি না দুলালি। আমরা জীবনে বড় হবার স্বপ্ন দেখি। আশায় আশায় দিন গুনি। আমাদের কত সুন্দর ফুলের মতো জীবনগুলো একসময় পাপড়ির মতো ঝরে যায়। আমরা যখন জীবনে হেরে যাই তখন ভগবানকে দোষারোপ করে স্যুইসাইড করি। আর তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের জাতভাইরা আমাদের দেশে এসে আট হাতি ধুতি আর কাঁধে গামছা নিয়ে ফুটপাথে শুয়ে ছাতু খেয়ে শুধু চানা বেচে বড় বড় শেঠ হয়ে যায়।

তবে! তুমিও তাই হবে। দরকার হলে আমি তোমাকে রুপিয়া দেব।

তুমি আমাকে এতখানি বিশ্বাস কেন করলে?

তা জানি না। তবে আমার জন্যে আমার মনে যখন দরদ আমি মালুম পেয়েছি, তখনই বুঝেছি তুমি আমার সত্যিকারের দোস্ত। আমি তোমার সঙ্গে আসতে চাইলাম না। ছুটে পালিয়ে গেলাম। তারপরেও তুমি আমার কাছে এলে। সেই জন্যেই আমিও আমার ব্যবসা ছেড়ে, মুলুক ছেড়ে, তোমার সঙ্গে দোস্তি করতে চলে এলাম।

পল্টন বলল, আসলে আমারও তোমাকে খুব ভাল লেগেছিল। তুমি আমায় প্রাণে বাঁচালে। কত করলে আমার জন্যে। তা বড় হয়ে তোমার কথামতো চাকরির সোনার হরিণের পিছনে না ছুটে ব্যবসা করলে কিন্তু মন্দ হয় না। জীবনে দাঁড়াবার জন্যে দরকার হলে তোমাদের গাঙ্গুরামের মতো তালপাতার বাঁশিই বেচব। তোমরা বিহার ইউ পি থেকে কলকাতায় আসছ। আমি হাওড়া কলকাতা

থেকে তোমাদের দেশে যাব। তা হলে কেউ আমাকে চিনবে না। আমরা তো বেনারসে যাচ্ছি। শুনেছি বেনারস খুব ভাল জায়গা। এখন সব দেখেশুনে যাই। পরে বেনারস থেকেই আমার ব্যবসা শুরু করব।

ট্রেন এসে আবার একটা স্টেশনে থামল। জনতা গাড়ি তো। মেল-এক্সপ্রেসের ভাড়া নিয়েও সব স্টেশনে থামে। লোকজন অবশ্য খুব বেশি ওঠানামা করল না।

কথা বলতে বলতে দু'জনেরই চোখে ঘুম আসছিল। তাই দু'জনে দু'দিকে মাথা করে একটু টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল যে যার।

ট্রেন চলতে লাগল।

ওরাও ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

সকালবেলা একজন চেকারের ধাক্কায় ঘুম ভাঙল পল্টনের।

টিকট দিখাইয়ে।

পল্টনের মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে তখন। তবুও ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখল দুলালি নেই। গাড়িতে এখন ভিড়ে ভিড়। বসবার জায়গা না-পেয়ে কত লোক যে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক নেই।

টিকট কাঁহা।

পল্টন টিকিট দেখাল।

এ টিকট তো মুঘলসরাইমে খতম হো গিয়া। বনারস কা টিকট।

পল্টন বলল, হ্যাঁ বেনারসের টিকিট।

তুমকো জুরমানা দেনে পড়ে গা।

জরিমানা দেবার টাকা আমার কাছে তো নেই।

তব জেল যা না পড়ে গা। তুমহারা আউর সাথি কাঁহা?

জানি না। বোধহয় বাথরুমে গেছে।

ডাকো। আউর হিঁয়া উতারো।

পল্টন বাঙ্ক থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু কোথায় দুলালি? কেউ কোথাও নেই। শুধু যেখানে ওরা শুয়ে ছিল তার এক পাশে ওর কাচের চুড়িগুলো ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। আর এক পাশে পড়ে আছে এক পাটি জুতো। তবে কী! মনে হওয়ামাত্রই শিউরে উঠল পল্টন। তবে কি কেউ কোনও ঘুমের ওষুধ ওর নাকে চেপে দুলালিকে নিয়ে পালিয়েছে? না হলে কী করে সম্ভব এই রহস্যময় অন্তর্ধান? কেনই বা ঘুমনোর পর ওর মাথাটাও ঝিমঝিম করছে?

চেকার বলল, মির্জাপুর আ গিয়া তুম হিঁয়া উতারো।

পল্টন ছলছল চোখে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। তারপর সব কথা খুলে বলল চেকারকে। দুলালির চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলল নিশ্চয়ই মেয়েটাকে গুম করেছে কেউ।

চেকার ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জি আর পি-তে ডায়েরি লেখালেন। তারপর পাটনায় সত্যবাবুর বাড়ির ঠিকানাটা নোট করে ছেড়ে দিলেন ওকে। জরিমানা দিতে হল না।

মির্জাপুর থেকে বারাণসীর ঘন ঘন বাস ছাড়ে। তারই একটাতে জি আর পি-র লোকেরা বসিয়ে দিল ওকে। ও সেই বাসে চেপে বারাণসী এল। ময়দাগিন নামে একটা জায়গায় বাস থেকে নেমে ও রিকশা করল। ঠিকানা তো জানে না। তাই শুধু অগস্ত্যকুণ্ডার কথা বলল। রিকশাওয়ালা ওকে নিয়ে এল গোধূলিয়ায়। তারপর ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যান্ডের পিছন দিকের গলিটা দেখিয়ে বলল, অগস্ত্যকুণ্ডা উধার মিলে গা।

অনেক বেলা হয়েছে তখন। তা প্রায় একটা-দেড়টা।

পল্টন এই অচেনা জায়গায় এসে ঘাবড়ে গেল খুব। নাম জানে না, ঠিকানা জানে না, এই অবস্থায় কাউকে কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? তবু একজন বাঙালিকে দেখে বলল, আচ্ছা এখানে গোপাদের বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন?

গোপা? কে গোপা? বাবার নাম কী? ঠিকানা কত?

পল্টন ওর বিপদের কথা বলল।

ভদ্রলোক বললেন, এভাবে তো খুঁজে বার করা মুশকিল। তবু দেখি কী করতে পারি। বলে একজনদের বাড়ির একটি মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, খুকি শোনো! তোমরা তো এই মহল্লায় থাক, এখানে গোপা নামে কেউ থাকে জানো?

মেয়েটি বলল, জানি। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো?

এই ছেলেটি নতুন এসেছে এখানে। ওদের বাড়ি যেতে চায়।

গোপা আমার বন্ধু। তবে বাড়ি তো দেখাব না। কেন না একটু দুষ্টচক্রের নজর পড়েছে ওর দিকে। পাটনায় গিয়ে ওর খুব বিপদ হয়েছিল। তা ওর নাম এবং কোথা থেকে আসছে জানালে আমি ওর মাকে গিয়ে বলতে পারি। এর পরে ওঁরা যদি নিয়ে যেতে বলেন তা হলে নিয়ো যাব।

পল্টন বলল, তা হলেই হবে। একটা কাগজ দাও, আমি আমার পরিচয় লিখে দিচ্ছি।

মেয়েটি একটি কাগজ দিলে, পল্টন লিখল, আমি এসে গেছি। আমাকে নিয়ে যাও।—পল্টন

সেই চিরকুটটা নিয়ে মেয়েটি চলে গেল। একটু পরেই দেখা গেল গৌতম ও গোপা হন্তদন্ত হয়ে আসছে ওর দিকে।

গৌতম তো এসেই জড়িয়ে ধরল পল্টনকে। তারপর বলল, ব্যাপারটা কী! আমরা দু'জনে স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলা হয়ে গেলাম। অমৃতসর এক্সপ্রেসে

এলি না, পঞ্জাব মেলে এলি না। তাই ভাবলাম হয়তো কোনওকারণে আসতে পারলি না তুই। ওখান থেকে ফিরে এসে সবে স্নান খাওয়া সেরেছি। এমন সময় তুই এলি।

পল্টন বলল, হ্যাঁ এলাম। তবে মনের মধ্যে মুক্তির আনন্দ নিয়ে আসিনি ভাই। বুকভরা চাপা কান্না নিয়ে এসেছি।

দাদুভাইয়ের ওইরকম মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য তো? কী আর করবি বল, যার যা নিয়তি তার তো তাই হবে।

নারে। আমি আমার এক সত্যিকারের বন্ধুকে চিরকালের জন্য হারালাম আজ। বনের ফুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসছিলাম। সে ফুল অপরে নিয়ে গেল। ওর এতবড় ক্ষতিটা হয়ে গেল শুধু আমার জন্য। কেন যে ওকে আনতে গেলাম?

কার কথা বলছিস তুই?

যে তোকে সাহায্য করেছিল, গোপার খোঁজ দিয়েছিল, আমার জীবন রক্ষা করেছিল, তার কথা।

অর্থাৎ দুলালি? সেই নিষ্পাপ সুন্দর মেয়েটি?

হ্যাঁ।

কী ব্যাপার বল তো?

গোপা বলল, রাস্তায় কথা বলার দরকার নেই। ঘরে চলো।

ওরা গোপাদের বাড়ি এল।

এখান থেকে গঙ্গা খুব কাছে। তবুও অনেক বেলা হয়ে গেছে বলে পল্টন বাড়িতেই স্নান করল। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। কিন্তু কী সুন্দর। নীচের তলাটা অন্ধকার। ওপরটা খোলামেলা। কাশীর সব বাড়িই প্রায় এই রকম। এই বাড়িও তার ব্যতিক্রম নয়।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ছাদে রোদ্দুরে শুয়ে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা ওদের দু'জনকে খুলে বলল পল্টন।

সব শুনে স্তব্ধ এবং মর্মাহত হয়ে গেল ওরা।

গোপা বলল, আর কেউ নয়, নির্ঘাত ওই শয়তান ডিসুজার লোকই পিছু নিয়েছিল তোমাদের। ছদ্মবেশে ট্রেনের কামরায় উঠেছিল। পরে তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে নাকে ক্লোরোফর্ম মাখানো রুমাল চেপে আরও ঘুম পাড়িয়ে কাজ হাসিল করে।

গৌতম বলল, ঠিক তাই। পল্টন দুলালিকে ডাকতে গিয়েই ভুল করেছিল। তখন থেকেই ওকে ফলো করেছে ওরা। তারপর স্টেশনে এসে দু'জনকে ভাগতে দেখেই পিছু নেয়। ট্রেনের কামরায় দু'জনকে একসঙ্গে পেয়ে সুবিধেই হয়েছে ওদের। টার্গেটটা বেশি করে গিয়ে পড়ে দুলালির ওপর। পল্টনকে ছেড়ে দুলালিকে নিয়েই পালায় ওরা।

পল্টন বলল, কিন্তু কামরায় তো আরও অনেক লোক ছিল।

ছিল। হয় তারা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, নয়তো ছোরা-রিভলভার নিয়ে ভয় দেখিয়েছিল তাদের।

পল্টন বলল, এখন তা হলে উপায়?

নয়নাগিরি অভিযান।

নয়নাগিরি কোথায় তাই তো জানি না আমরা।

সেটা জানতে হবে এবং জীবন দিয়েও দুলালিকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। যার জন্যে গোপাকে আমরা ফিরে পেয়েছি, তোর জীবন রক্ষা হয়েছে, তার জন্যে প্রয়োজন হলে যমের সঙ্গে লড়ে যাব আমরা।

কিন্তু নয়নাগিরির সন্ধান আমরা কী করে পাব?

নয়নাগিরির সন্ধান পেতে গেলে আজই বিকেলে রাণামহলের ঘাটে ঘুরঘুট্টিবাবার দর্শন পেতে হবে আমাদের!

ঘুরঘুট্টিবাবা কে?

তুই চিনবি না। উনি পায়ে হেঁটে সারা ভারত ভ্রমণ করেছেন। চিত্রকূট পর্বতে থাকেন উনি। এখন একমাস কাশীতে থাকবেন। কাল ওনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমাদের। চমৎকার এবং নির্লোভ সাধু। উনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন নয়নাগিরিটা কোথায়।

পল্টন বলল, তা হলে আর দেরি নয়। একটু বিশ্রাম নিয়েই চল গিয়ে দেখা করে আসি।

গৌতম বলল, আমার মনে হয় নয়নাগিরিটা পাটনা এবং বেনারসের মাঝামাঝি অথবা কাছাকাছি।

এইরকম মনে হওয়ার কারণ?

কারণ একটাই, এই ধরনের কাণ্ডকারখানা মূল কেন্দ্র থেকে খুব বেশি দূরে হওয়াটা সম্ভব নয়। ত্রিবেদী বলেছিলেন, বিহারে নয়নাগিরি নামে কোনও জায়গা নেই। তা যদি হয় তা হলে নয়নাগিরি উত্তরপ্রদেশে হতে বাধা কোথায়? বিশেষত অপহরণটা যখন বক্সার ও মুঘলসরাইয়ের মধ্যে হয়েছে।

পল্টন বলল, তুই ঠিক বলেছিস। আমি মির্জাপুরে জি আর পি-তে ডায়েরি লেখালেও এখানকার পুলিশকে একবার জানাই চল। ওঁরা ত্রিবেদীর সঙ্গেও কথা বলে নেবেন। আর আমরা ঘুরঘুট্টিবাবার কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করব নয়নাগিরিটা কোথায়?

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে সেই সময় গোপার মা এলেন। আলোচনাটা তাই অন্য দিকে মোড় নিল। চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে গত রাতের ট্রেন জার্নির ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল পল্টন।

চোদ্দো

বিকেলবেলা চা-টা খেয়ে সবাই এল দশাশ্বমেধ ঘাটে। প্রচুর জনসমাগমে ঘাট তখন জমজমাট। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই ঘাটগুলোর ধারে ধারে কত যে মন্দির তার যেন লেখাজোখা নেই। সামনেই নীল জলের গঙ্গা। কী চমৎকার। সেই গঙ্গার জলে সারি সারি নৌকা আর বজরা বাঁধা আছে। মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। কত ভিখারি বসে আছে ঘাটের সিঁড়িতে। কত হিপি ও অন্যান্য বিদেশিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আছে অগণিত ভ্রমণার্থী।

পল্টন মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, এই কাশী! এত সুন্দর!

গোপা বলল, হ্যাঁ, এই কাশী। অপর নাম বারাণসী। এর আরও একটা নাম আছে।

গৌতম বলল, কী নাম!

অবিমুক্তক্ষেত্র।

পল্টন বলল, দুলালিকে যদি ওরা চুরি না করত, তা হলে আজকের এই পরিবেশ আমাদের কাছে আরও রমণীয় হয়ে উঠত।

গৌতম বলল, আমার এত ভাল লেগেছে যে মনে হচ্ছে এখুনি বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে সবাইকে ডাকিয়ে আনি।

পল্টন বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিছু না হোক মাকে একবার আনতেই হবে। আমার মায়ের অনেক দিনের আশা কাশীতে আসবার। আচ্ছা, বিশ্বনাথের মন্দিরটা কোথায়?

সন্ধের পর নিয়ে যাব। আগে চলো আমরা ঘুরঘুট্টি বাবার সঙ্গে দেখা করি।

ওরা পায়ে পায়ে রাণামহলের ঘাটের দিকে এগোল।

পল্টন বলল, এরকম কতগুলো ঘাট আছে এখানে?

চারশো একটি। রাজঘাট থেকে অসিঘাট পর্যন্ত। গঙ্গা-বরুণা-অসি তিন নিয়ে বারাণসী। বরুণা নদী সারনাথ গেলে দেখতে পাবে।

গৌতম বলল, এবারে কিছুই দেখা হবে না। পরের বার সবাইকে নিয়ে আসব, দল বেঁধে হইহই করে ঘুরব সকলে।

রাণামহলে ঘাটের সিঁড়িতে ঘুরঘুট্টিবাবা বসে বসে তপজপ করছিলেন। ওদের দেখেই হাসিমুখে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন।

গোপা গৌতম পল্টন তাঁর কাছে গিয়ে বসল। গোপা বাবাজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল পল্টনের। তারপর আসল কথায় এল।

গৌতম বলল, এ পর্যন্ত আপনি কতদেশ ঘুরেছেন বাবাজি!

ও তো মুঝে ইয়াদ নেহি বাবা। বহুত তীরথ ঘুমা ম্যায়নে। ইয়ে বাত কিঁউ পুছ রহে তুম?

পল্টন বলল, বাবা চা খাবেন?

খিলানে সে খায়গা জরুর, চা নেহি পিয়েঙ্গে তো জীয়েঙ্গে ক্যায়সে?

পল্টন চা আনতে চলে গেল।

গোপা বলল, আপনি নয়নাগিরি গেছেন বাবাজি?

নয়নাগিরি! ও নাম তো ম্যায়নে কভি নেহি শুনা। ক্যা হ্যায় হুঁয়া পর?

তা জানি না। কয়েকজন লোক বলাবলি করছিল কি না তাই।

এমন সময় কোথা থেকে এক বাঙালি সাধু এসে জুটে গেলেন সেখানে। বললেন, এলাহাবাদে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের এপারে হল নৈনি। ওইখানে অনেক ছোট ছোট বুনো পাহাড় আছে। বিন্ধ্যাচলের শাখাপ্রশাখা। তা ছাড়া বিন্ধ্যাচলের কাছেই আছে কালীকুঁয়া, সীতাকুণ্ড, পর পর। নয়নাগিরি ওইখানেই কোথাও হবে!

হ্যাঁ।

তা হলে এক কাজ করো, কাল সকালের বাসেই তোমরা বিন্ধ্যাচলে যাও। ওখানে বিন্দুবাসিনী দেখে সীতাকুণ্ড কালীকুঁয়া দর্শন করো। তবে একটা কথা, ওসব জায়গা কিন্তু খুব খারাপ। চোরডাকাতের আড্ডা ওখানে। দুষ্কৃতীরা ওখানে এমনই সক্রিয় যে জলজ্যান্ত একটা মানুষকেও হাপিস করে দিতে পারে। তোমরা বিন্ধ্যাচলে গিয়েই ছত্রী ধর্মশালায় উঠবে। খুব ভদ্র ব্যবহার ওদের। তারপর কালীকুঁয়ায় গিয়ে বজরঙ্গবাবা নামে একজন সাধুর সঙ্গে দেখা করবে। উনিই তোমাদের বলে দেবেন নয়নাগিরি কোথায়। তবে আমার মনে হয় ওইখানেই আশেপাশে হবে।

পল্টন তখন চা নিয়ে এসেছে। ওর ভাগেরটা সেই আগন্তুক সাধুকে দিয়ে ও নিজের জন্য এক কাপ আনতে গেল। চা খাওয়া হলে ঘুরঘুট্টিবাবাকে প্রণাম করে সন্ধে পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে ঘুরে বেড়াল একটা বজরা ভাড়া নিয়ে। এরপর অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন করে ওরা থানায় এসে রিপোর্ট করল কালকের ঘটনাটা।

পুলিশ অফিসার সব শুনে যা বললেন তা হল এই, উত্তরপ্রদেশের আয়তন দু' লক্ষ চুরানব্বুই হাজার চারশো তেরো স্কোয়ার কিমি। এক বিশাল এলাকা। এখানকার ধারেকাছে নয়নাগিরি নামে কোনও পাহাড় আছে কি না তাঁদের জানা নেই। তা ছাড়া আদৌ ওরা দুলালিকে নয়নাগিরি নিয়ে গেছে কি না তাই কে জানে? বা ওই একই দল যে ওই কাজ করেছে তারই বা প্রমাণ কী?

গোপা বলল, তা হলে এক্ষেত্রে কি আপনাদের কিছুই করণীয় নেই?

নেহি। বারাণসী পুলিশ কুছ নেহি কিয়েগা। ইয়ে বিহার-পুলিশ ঔর রেলওয়ে-পুলিশ কা কাম। হামারা কাম স্রেফ তুমকো অ্যারেস্ট করনা।

অ্যারেস্ট করবেন? আমাদের অপরাধ?

ও লেড়কিকো সাথ লেকে কৌন আয়া থা?

পল্টন বলল, আমি।

অন্দর ঘুসো। বলে প্রায় ধাক্কা দিয়েই পল্টনকে লকআপে পুরে দিল পুলিশের লোকেরা।

পল্টনের চোখে তখন জল এসে গেছে।

পুলিশ বলল, এটা একটা নাবালিকা অপহরণের কেস।

গোপা বলল, কিন্তু মেয়েটির তো কেউ কোথাও নেই। স্বেচ্ছায় এসেছিল সে। আমরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে তাকে আমাদের পরিবারের মধ্যে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম।

ও হামলোগ নেহি সমঝে গা। মি. ত্রিবেদীকা রিপোর্ট মিলনেসে তব ছোড়ে গা। নেহি তো কোর্ট মে ভেজেঙ্গে কানুন মোতাবিক।

ঠালা সামলাও। অপমানে দুঃখে রাগে কী যে করবে পল্টন কিছু ঠিক করতে পারল না। হিতে বিপরীত একেই বলে।

গোপা ও গৌতম তখুনি ছুটল বাড়িতে। ওর মা এই দুঃসংবাদ পেয়েই একে ওকে তাকে ধরে অনেক চেষ্টা করলেন পল্টনকে ছাড়াবার। কিন্তু না, পুলিশ কোনও অবস্থাতেই ওকে জামিন দিতে রাজি হল না। আবার নতুন করে একটা দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে এল সকলের মনে।

সারারাত ঘুম হল না কারও।

গোপা আর গৌতম দু'জনেই পাটনায় ফোন করে সত্যসুন্দরবাবুকে পল্টনের অ্যারেস্ট হওয়ার খবরটা জানিয়ে দিল। এবং এও বলল এই ব্যাপারে মি. ত্রিবেদীকে একটু সাহায্য করতে।

অপহৃতা দুলালির খোঁজে বিন্ধ্যাচলে যাওয়া মাথায় উঠল ওদের। এখন থানা-পুলিশ কোর্ট-কাছারিতে জড়িয়ে পড়লে আরও অনেক কিছুই মাথায় উঠবে। আবার বিন্ধ্যাচলে গেলেই যে নয়নাগিরি যেতে পারবে তারও কোনও মানে নেই। তবু মনের ভেতরটা কেন কে জানে বার বার বলছে মেয়েটির খোঁজে একবার অন্তত যাওয়া উচিত। নয়নাগিরির খোঁজ পেলে শুধু দুলালি নয়, আরও অনেকের অনেক দুলালিরই মান রক্ষা হবে।

ভোরবেলা পুলিশ এসে পৌঁছে দিয়ে গেল পল্টনকে। মি. ত্রিবেদী সত্যসুন্দরবাবুর রিপোর্ট অনুযায়ী এখানকার থানায় বিশদ জানিয়েছেন। এবং এও জানিয়েছেন কাল রাতে ডিসুজার লোকেরা নাকি প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল মি. ত্রিবেদীর। শংকর, দয়াল এবং ডিসুজার নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই তিন কুখ্যাত শয়তান সম্ভবত উত্তরপ্রদেশেই গা ঢাকা দিয়েছে কোথাও। তা সে নয়নাগিরিতেই হোক বা যেখানেই হোক।

এখানকার পুলিশকেও তাই সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছেন তিনি!

পল্টনকে ফিরে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল গৌতম।

পল্টন বলল, এখন আনন্দ প্রকাশের সময় নয়। যেভাবেই হোক আগে নয়নাগিরিতেই যাই চল।

গোপার মা বললেন, সেটা আবার কোথায়?

তা আমরাও জানি না। তবে এক সাধুর মুখে শুনেছি ওটা বিন্ধ্যাচলের কাছাকাছি। আমরা এখুনি যাব সেখানে।

কিন্তু যদি তোমাদের কোনও বিপদ হয়?

হোক। তবু যাব। তা ছাড়া দুলালিকে যদি আমাদেরই একজন বলে মনে করি তা হলে এ বিপদ তো আমাদেরই। বিশেষ করে মেয়েটি আমাদের ভরসাতেই তার দেশ ছেড়ে এসেছিল।

তবু আমার ভয় করে বাবা।

গৌতম বলল, ভয় করলেই ভয়। ভয় না পেলেই জয়। তা ছাড়া আপনার মেয়ের জন্যও তো আমরা জীবন বিপন্ন করে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলাম। পল্টনের ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখুন তো?

মা এরপরে আর কোনও কথাই বললেন না। সঙ্গে সঙ্গে স্টোভ ধরিয়ে ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

পল্টন আর গৌতম যাবার জন্য তৈরি হতেই গোপা বলল, আমিও যাব।

মা বললেন, তুই কোথায় যাবি?

আমি যাবই।

গৌতম বলল, না গোপা। তোমার যাওয়া উপযুক্ত মনে করছি না আমরা। কীভাবে তোমাকে রক্ষা করেছিলাম বলো তো?

জানি। তবে আমি যদি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে না পড়তাম তা হলে কি পারতে আমাকে উদ্ধার করতে? ওই শয়তানদের উপযুক্ত শিক্ষা আমিই দেব। তোমরা দু'জনে শুধু আমার পাশে থাকবে। তারপর যা করবার করব আমি। তবে যাবার আগে—।

যাবার আগে কী?

এক মিনিট বসো। আমি এখুনি আসছি।

গোপা কাউকে কোনও কথা না বলে তর তর করে নেমে গেল নীচে। অনেক পরে যখন সে ফিরে এল তখন ওর বেশ খুশি খুশি মুখ। আর চেহারাতেও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। ওর এতদিনের লম্বা বেণীটাকে কেটে চাইনিজ কাট দিয়েছে চুলে। কেমন যেন একটা গোলাপি রঙের স্কার্ট পরে এসেছে কোনও এক বান্ধবীর কাছ থেকে চেয়ে। কী স্মার্ট যে দেখাচ্ছে ওকে তা বলবার নয়। এসেই

বলল, শোনো, আমাদের বিন্ধ্যাচলে যাবার একটা ব্যবস্থা করে এলাম। বাস ধরবার জন্য সেই ময়দাগিনে ছুটতে হবে না। গোধূলিয়ার মোড় থেকে একটা ট্যুরিস্ট বাস ছাড়ছে চুনার বিন্ধ্যাচলের। আমরা সেই বাসেই যাব। ওরা আগে বিন্ধ্যাচল গিয়ে পরে চুনার যাবে। লাক্সারি বাস। আমরা বিন্ধ্যাচলে নেমে ওই বাস ছেড়ে দেব।

কত করে ভাড়া নেবে কিছু জেনেছ?

হ্যাঁ। আপ-ডাউনের ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। আমাদের ত্রিশ টাকা করে দিলেই চলবে। এখুনি ছাড়বে বাস। এসো।

গোপা, গৌতম, পল্টন মাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। মা শুধু ম্লান মুখে একবার ভগবানকে ডাকলেন, বাবা বিশ্বনাথ ওদের রক্ষা কোরো।

ওরা খুব জোরে পথ হেঁটে গোধূলিয়ার মোড়ে এল। বাস তখন ছাড়ব ছাড়ব করছে। বোধহয় ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই বিন্ধ্যাচলে পৌঁছে গেল ওরা। সেখানে তখন মন্দিরে পুজো দেবার দারুণ ভিড়। সমস্ত যাত্রীদের পূজাপাঠ শেষ হলে তবেই ছাড়বে বাস। অথচ এদের আর ধৈর্য নেই।

ছোট্ট একটি পাহাড়ের ওপর মা বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। একান্নটি সতীপীঠের অন্তর্গত একটি পীঠ। তাই মহিমা এখানে খুব। এই পাহাড়ে কোনও গাছপালা নেই। শুধু ঘরবাড়ি আর দোকানপত্তর।

প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে গেল এখানে। তারপর বাস এল সীতাকুণ্ডে। ঘন জঙ্গলে ভরা একটি পাহাড়ের পাদদেশে বাস থামতেই নেমে পড়ল যাত্রীরা। এইখান থেকেই পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে কালীকুঁয়ায়।

অতএব শুরু হল পর্বতারোহণ। পাহাড়ের ওপরে ওঠার ভাল ব্যবস্থা আছে। তবে অসংখ্য হনুমানের উপদ্রব এখানে। ওরা দলবদ্ধ ছিল তাই হনুমানগুলো ওদের আক্রমণ করল না। শুধু দাঁতমুখ খিঁচিয়েই ছেড়ে দিল।

সীতাকুণ্ডে একটি ঝরনা আছে। আর আছে একটি সাধুর আশ্রম। ওরা সহযাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই আশ্রমে বসে সাধুদের সঙ্গে গল্প জমাল। তারপর ঝরনার জল খেল পয়সা দিয়ে। একজন সাধুবাবা লোটা ডুবিয়ে জল খাওয়ালেন ওদের। এই কুণ্ড কোনও যাত্রীকে স্পর্শ করতে দেন না সাধুরা।

জলটল খেয়ে ওরা একজন সাধুকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বাবা, এই যে পাহাড় এর নাম কী?

বিন্ধ্যাচল। অষ্টভুজা ভি কহা যাতা হ্যায়।

তা হলে নয়নাগিরিটা কোথায়?

ও মুঝে মালুম নেহি।

এখানে বজরঙ্গবাবা নামে কেউ আছেন?

হাঁ হাঁ। কালীকুঁয়া চলা যাও। হুঁয়া মিল যায়ে গা।

ওরা আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে চলল। কিছু পথ যাবার পরই দেখল এক জায়গায় একটি সুবৃহৎ ঝরনা রয়েছে। দেখেই মনে হল বর্ষায় এর রূপ ভয়ংকর। এখন জলহীন হলেও তখন এখানে ঝরনা নয়, জলপ্রপাত হয়। বন-জঙ্গলে ভরা এখানকার চারদিক।

গোপা বলল, আমার মনে হয় আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি।

গৌতম বলল, তুমি কি বলতে চাও এইটাই নয়নাগিরি?

এটা না হলেও এর ধারে কাছেই হবে।

ওরা যখন এই সব আলোচনা করছে তেমন সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে জটাধারী এক সন্ন্যাসী লোটা হাতে বেরিয়ে এলেন। এসেই বাজখাঁই গলায় বললেন, এ! তুম সব হিঁয়া ক্যা করতে হো?

আমরা বেড়াতে এসেছি এখানে।

ইধার মাত ঠারো। কালীকুঁয়া চলা যাও।

আমরা কালীকুঁয়াই যাচ্ছি, ওখানে বজরঙ্গবাবার সঙ্গে দেখা করতে।

বজরঙ্গবাবা? বজরঙ্গবাবা তো ম্যায় হুঁ। মেরা নাম কিনোনে বতায়া তুমকো?

বেনারসের এক সাধুবাবা।

সমঝ গিয়া। ও বঙ্গালিবাবা প্রেমদাসনে বতায়া তুমকো। বোলো ক্যা মতলব?

গৌতম বলতে যাচ্ছিল।

বজরঙ্গবাবা বললেন, হিঁয়া নেহি। আশ্রম পর চলো।

ওরা যাবার পথে এক অন্ধকার গুহায় অষ্টভুজার মূর্তি দর্শন করল। সে কী অন্ধকার। তায় আবার মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে হয়। ভয়ও লাগে। তারপর পাহাড় থেকে নেমে পাদদেশে কালীকুঁয়ায় এল। এক ভয়ংকরী দেবী হাঁ করে আছেন সেখানকার মন্দিরে। সেকালে ডাকাতরা নাকি নরবলি দিয়ে সেই রক্ত এই দেবীর হাঁ মুখে ঢেলে দিত। দেবী যদি সেই রক্ত পান করতেন, তবেই ডাকাতরা যেত ডাকাতি করতে, আর যদি সেই রক্ত দেবীর মুখ দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে আসত, তা হলে আর ভয়ে যেত না।

শুনে গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল।

বজরঙ্গবাবা বললেন, আগে তো এখানে মহারণ্য ছিল। বিশ পঁচিশ বছর আগেও এখানে যেসব ডাকাতরা ছিল, তারাও ছিল মারাত্মক। এখনও এখানে চোরডাকাত নেহাত কম নেই। বেশ কয়েক বছর আগে একবার বিকেলের দিকে মোটর বাইকে চেপে এক ভদ্রলোক এলেন এখানে পুজো দিতে। কোনও যাত্রী নেই। নির্জন চারদিক। সঙ্গে বহুরানি আর চার-পাঁচ সাল কি উমরের এক লেড়কা ছিল। তা ওদের মন্দিরে রেখে পুজোর ডালি কিনতে গেলেন ভদ্রলোক। ফিরে

এসে দেখলেন কেউ নেই। মন্দিরের পূজারি সাধুরা বললেন, তু ঘর চলা যা বেটা, তেরা বহু-বাচ্চা নেহি মিলেগা। তা সেই ভদ্রলোক তো খুব কান্নাকাটি করলেন। তারপর পুজোর ডালি নিয়ে মোটর বাইক চেপে যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। খানিক বাদেই হল কী এই সমস্ত এলাকাটা মিলিটারিতে ঘিরে ফেলল। আসলে ভদ্রলোক ছিলেন সেনাবাহিনীর এক পদস্থ অফিসার। সেটা কেউ জানত না, তাই ভুল জায়গাতেই হাত দিয়ে ফেলেছিল। তা এখানে যত পাণ্ডা আর সাধু ছিল সব ক'টাকে ধরে তখন সে কী মার। মারের চোটে তারা যখন সত্যিকথা বলল তখন দেখা গেল শিশুটিকে গলাটিপে মেরে এক জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর মহিলার গা থেকে গয়নাগাটি নেবার জন্য তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। সেই রাতে আমি এখানে ছিলাম না, তাই বেঁচে গেছি। না হলে এখানে যে যেখানে ছিল সবাইকে গুলি করে মেরেছিল তারা। একজনও প্রাণে বাঁচেনি। সেই এক রাতেই সমস্ত ডাকাতকে নির্মূল করে দিয়েছিল। কতদিন যে কার্ফু ছিল তার ঠিক নেই। পরে অবশ্য আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অপরাধে সেই অফিসারকে সাসপেন্ড করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর মাঝে বেশ কয়েক বছর শান্ত ছিল জায়গাটা। আবার নতুন করে দুষ্টচক্র দানা বাঁধছে।

বলেন কী!

এখন তোমরা বলো আমার কাছে কী জন্য এসেছ, ক্যা জাননে চাতা হ্যায় তুম?

আপনি তো দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে আছেন, বলতে পারেন নয়নাগিরিটা কোথায়?

বজরঙ্গবাবা চমকে উঠলেন। মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল। ভয়ে নয়। এক অশুভ ইঙ্গিত পেয়ে। বললেন, তুমহারা কোঈ বিছোড় গিয়া?

পল্টন বলল, আপনি কী করে জানলেন বাবা?

বজরঙ্গবাবা হাসলেন, যব তুমনে নয়নাগিরিকা নাম পুছা তব হামে মালুম হো গিয়া। ও পাপ কা পীঠস্থান।

আমাদের একটি মেয়ে চুরি হয়ে গেছে। আমরা কোনওরকমে জানতে পেরেছি ওকে নয়নাগিরিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অথচ নয়নাগিরি যে কোথায় তা কেউ জানে না। তাই বলতেও পারছে না কেউ।

নয়নাগিরি নজদিকমেই হ্যায়।

গোপা বলল, বলুন না বাবা কোনখানে?

তুম উধার মাত যাও বেটি।

আমরা তিনজনেই যাব।

তুম বহুতই খুবসুরত লেড়কি। উধার তুমকো যানা ঠিক নেহি।

গৌতম বলল, ও না গেলেও আমাদের যেতেই হবে।

ফায়দা ক্যা। ও নেহি মিলেগা তুমকো।

বজরঙ্গবাবার কথায় আশার আলো দেখতে পেলেও তাঁর নিশ্চিত ধারণা দেখে ভয় পেয়ে গেল ওরা। তবে কি সত্যিই মেয়েটাকে উদ্ধার করা যাবে না?

বজরঙ্গবাবা বললেন, ক্যা বিগড় গয়া তুমহারা সাচমুচ বতাও।

গৌতম আর পল্টন তখন সব কথা খুলে বলল বজরঙ্গবাবাকে।

সব শুনে বজরঙ্গবাবা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বললন, ও লেড়কি কাঁহা লোপাট হুয়া থা?

ঠিক বলতে পারব না। তবে বক্সার ও মুঘলসরাইয়ের মধ্যে।

কৌন সা গাড়ি থা?

ভাগলপুর বোম্বাই এক্সপ্রেস।

সাধুবাবা বললেন, ও লেড়কি মিল যায়ে গা।

আপনি কী করে জানলেন বাবাজি?

পাহাড় পর যাঁহা তুমহারা সাথ মুলাকাত হুয়া উধার দোনো আদমিকা বাতচিত শুনা। ও তুমহারে বারে মে কহতা থা। মালুম হোতা ওহি আদমিনে চুরায়া ও লেড়কি কো।

গৌতম বলল, ওই জঙ্গলে ওরা কী করছিল?

ও লোগ ও সি ত্রিবেদীকো মারনে গিয়া। পুলিশ পিছে পড়া তো ভাগকে চলা আয়া হিঁয়া পর।

গৌতম বলল, তা হলে তো এখনি গিয়ে আমরা পুলিশে খবর দিতে পারি।

অ্যায়শা বুরবাকি কাম না করো। পহলে ও লেড়কি কা জানমান বাঁচাও, উসকে বাদ যো কুছ করনা হ্যায় করো। আভি সাম হোনে বালে। হামারা আশ্রমমে এক রাত আরাম করো। কাল সবেরে নয়নাগিরি চলা যাও।

নয়নাগিরিটা কোথায়?

বজরঙ্গবালা বললেন, তুম চুনার গিয়া থা?

না।

ওই পর্বতকা নাম চরণাগড়। দূর সে এক চরণকা মাফিক নজর আতি হই। চরণাগড় সে চুনার হো গয়া। লেকিন রাজা ভর্তৃহরি নে ওই পর্বতপর যব কিলা বনায়া থা তব উসকা নাম থা নয়নাগিরি। এরপর বাবাজি আরও যা বললেন তাতে বোঝা গেল কারও মতে ওই পর্বতের প্রাকৃতিক অবস্থান চরণের মতো, কারও বা মতে নয়নের মতো। প্রাচীনকালে তাই ওই পর্বতের নাম ছিল নয়নাগিরি। এখন ও নাম কেউ জানেও না, বলেও না। এইখানে পাহাড়ের গায়ে গুপ্তযুগের একটি শিলালিপি আছে। পাহাড়ের ওপর যে দুর্গ আছে সেটি এখন

সেনাবাহিনীর দখলে। এই পাহাড়ের পিছনদিকে বয়ে চলেছেন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী। পাহাড়ের ওপর থেকে গঙ্গার দৃশ্য দেখলে মন যেন ভরে যায়। প্রাচীনকালে এই পাহাড়ের সঙ্গে গঙ্গার মধ্যে অনেকগুলি সুড়ঙ্গপথ ছিল। তারই একটির মধ্যে দুষ্কৃতীদের আস্তানা। ওরা ওদের কাজের সুবিধার জন্য সাংকেতিক হিসাবে প্রাচীন নামটিই বেছে নেয়।

শুনে গৌতম বলল, সে কী! সেনাবাহিনীর লোকেরা বাধা দেয় না?

না। তার কারণ হয় তাদের কারও সঙ্গে ওই দুষ্কৃতীদের কোনও গোপন আঁতাত আছে অথবা ব্যাপারটাই তারা জানে না।

গৌতম বলল, আমরা তা হলে ট্যুরিস্টদের দলে মিশে কাল সকালে ওখানে অভিযান চালাব। তবে আজ একবার জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে খুঁজে দেখব ওই দুই পলাতককে। মনে হচ্ছে ওরা শংকর ও দয়াল ছাড়া অন্য কেউ নয়।

বজরঙ্গবাবা বললেন, যো তুমহারা মর্জি ওহি করো। লেকিন লেড়কিকো লে যাও মাত।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে। গৌতম ও পল্টন গোপাকে সাধুর আশ্রমে রেখে দু'জনে দুটো বল্লম নিয়ে আবার পাহাড়ে উঠল।

গোপা ওদের সঙ্গে না-গেলেও লোকজনের আনাগোনা দেখতে কালীকুঁয়ার মন্দিরের চাতালে বসল। পাহাড়ি এলাকা হলেও এখানে বিন্ধ্যাচল থেকে অনেক লোকজন আসে পুজো দিতে। একদল হনুমান চারদিকে প্রহরীর মতো বসে আছে। তারা যাত্রীদের কাছ থেকে হাত পেতে বাদাম, চানা, কলা ইত্যাদি নিচ্ছে। গোপা বসে বসে এই সব দেখতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে একটা অ্যামবাসাডার এসে থামল। গাড়ি থেকে যিনি নামলেন তাঁকে দেখেই ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওর! সে কোনওরকমে উঠে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল একটা থামের আড়ালে। এই সময় গৌতম ও পল্টন কাছে থাকলে ও এতটা ভয় পেত না। ও সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই কেমন যেন একটা বিপদের পদধ্বনি শুনতে পেল। ও দেখল লোকটা মন্দিরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

পনেরো

পল্টন ও গৌতম সাহসে ভর করে সেই অন্ধকার নির্জনে এগিয়ে চলল গিরিপথ ধরে। জঙ্গল খুব একটা ঘন না হলেও পাহাড়ের আকৃতি ভয়াবহ। ওরা ধীরে ধীরে সেই বড় ঝরনাটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। দু'জন লোকের অস্পষ্ট কথা বলার আওয়াজ ওদের কানে এল। ওরা পাথরের খাঁজে পা দিয়ে একটু উচ্চস্থানে

উঠে দেখল একটি পাথরের চাতালে বসে দু'জন লোক নিশ্চিন্তে বিড়ি ফুঁকছে। ওরা দেখেই বুঝতে পারল এদের একজন হচ্ছে শংকর, অপরজন দয়াল। ওরা নিঃশব্দে চতুর বেড়ালের মতো ওদের অনেকটা কাছাকাছি এসে বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিল ওদের দিকে।

আচমকা এই রকমটা হয়ে যাওয়ায় চমকে উঠল দু'জনে। কিন্তু সেই আধো অন্ধকারে ওরা বুঝতে পারল না কোথা থেকে এবং কীভাবে পড়ল পাথরটা। তাই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কে! কে ওখানে?

গৌতম বলল, আমি ত্রিবেদী। তোদের দু'জনকে ফাঁসির দড়িতে লটকাব বলে এখানে এসেছি।

ওরা দু'জনেই লাফিয়ে উঠেছে তখন। দু'জনের হাতেই চলে এসেছে রিভলভার।

পল্টন বলল, রিভলভার দেখিয়ে খুব একটা সুবিধে হবে না। অজস্র পুলিশ এই পাহাড়টাকে ঘিরে আছে। এখন ভাল চাও তো বলো, ট্রেনের কামরা থেকে পরশু রাতে ওই মেয়েটাকে চুরি করে তোমরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

শংকর বলল, ওকে আমরা বিক্রি করে দিয়েছি। এমনই জায়গায় পাচার করেছি যে ওকে আর ফিরে পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পল্টন একটা পাথর ছুড়ে মারল একজনের মুখে। একেবারে মোক্ষম টিপ যাকে বলে। নাক-মুখ ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল সেই পাথরের ঘায়ে। পাথরটা লেগেছে দয়ালকে।

শংকর তখন আন্দাজে ভর করেই গুলি চালিয়েছে একটা। এই নির্জনে গুলির শব্দ ভয়ংকর শোনাল। তবে পাথরের আড়ালে থাকায় গুলি লাগল না কাউকেই।

গৌতম বলল, কোথায় কতদূরে পাচার করেছিস তাকে?

শংকর বলল, যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে অ্যারেস্ট করো। কোর্টে দাঁড়িয়ে যা বলবার বলব। ত্রিবেদীর গলার স্বর আমি চিনি। এই পাহাড় যদি অজস্র পুলিশে ঘিরে থাকে তা হলে তাদেরও আসতে বলো। আমি একাই মোকাবিলা করব তাদের।

গৌতম বলল, ওই দেখ তোর পিছনে যম এসে দাঁড়িয়েছে।

শংকর পিছু ফিরতেই পল্টন আর একটা পাথর ছুড়ে দিল শংকরের দিকে। কিন্তু পাথরটা তাকে লাগল না। তবে সেই মুহূর্তে সত্যি সত্যিই যমের মতো একজন এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল।

শংকর বলল, এ কী! তুই এখানে?

তোদের খোঁজে এলাম। তোরা ত্রিবেদীর ভ্যানে বোমা ছুড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস। ত্রিবেদী মরেনি। তোরাও এমন কাঁচা কাজ করলি যে আর কখনও

ভুলেও তোরা পাটনা শহরের ধারেকাছে যেতে পারবি না। তোর বাবা নিজে চাইছেন পুলিশ তোকে অ্যারেস্ট করুক। গফুরকে মেরেছি। এখন আমার টার্গেট হল ডিসুজা। ওর বাড়িতে চড়াও হয়ে ওকে পেলাম না। তবে ওর চাকরবাকরদের মোচড় দিয়ে জানতে পারলাম তোরা নয়নাগিরি অথবা এইখানে লুকিয়ে আছিস। এখন তোদের দেখা পেলেও নয়নাগিরির খোঁজ পাইনি। বল সেই শয়তানের ঘাঁটিটা কোথায়?

শংকর বলল, বলব না।

বল তোরা একটি অসহায় মেয়েটাকে রাতদুপুরে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিলি কেন?

ওই শয়তান মেয়েটা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।

তোদের ধারণা ভুল। আসলে পাপের ভারা এখন এত বেশি হয়েছে যে তোরা তোদের নিজেদের ছায়া দেখেও ভয় পাচ্ছিস।

শংকর বলল, দেখ নেলো, আমরা এখন মরিয়া। আমাদের সঙ্গে লাগতে আসিস না।

আসতুম না। যদি না তোরা এই মেয়েটার গায়ে হাত দিতিস। কত ছোট থেকে দেখেছি ওকে। তোরা কিনা শেষকালে ওর গায়ে হাত দিলি? লজ্জা করল না?

নেলো! পথ ছাড় বলছি।

শুনলি না একটু আগেই ওরা কী বলল তোকে? যম এসে দাঁড়িয়েছে। আমি সেই যম। যম কারও পথও ছাড়ে না, ফিরে যেতেও জানে না। তোর হাতে রিভলভার আছে। আমি রিভলভার সঙ্গে নিয়েও শুধু হাতে আছি। কেন বল তো?

ক্যা—ক্যা—কেন?

তোরই রিভলভার দিয়ে তোকে গুলি করে মারব বলে।

নেলোর কথা শেষ হওয়ামাত্রই ওর দিকে রিভলভার তাগ করল শংকর।

নেলো চকিতে ওর হাতটা ধরে মট করে মটকে দিল একটু।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল শংকর।

ওর হাত থেকে রিভলভারটা তখন কেড়ে নিল নেলো। তারপর ওর দিকে সেটা তাগ করে বলল, গফুরকে ঠিক যেভাবে মেরেছিলুম, তোকেও সেইভাবেই মারব। তোদের দু'জনকেই।

শংকর বলল, আ-আ আমাকে ছেড়ে দে নেলো। আমার হাত ভেঙে দিয়েছিস তুই। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কী দিবি?

ওকে কোথায় রেখেছিস?

এই পাহাড়ের পিছন দিকে একটা গুহায়। আমাকে ক্ষমা কর ভাই। ছেড়ে দে এবারের মতো।

নেলো হাসল। বলল, একেবারেই ছেড়ে দেব। বলেই ট্রিগারে চাপ দিল 'গুড়ুম'। আবার একটা চাপ। শংকরের দেহটা ছিটকে লাফিয়ে উঠল। তারপর পাথরের চটানে পড়ে স্থির হয়ে গেল একসময়।

সেই সঙ্গে আরও একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল নেলো।

ওরা ছুটে গিয়ে নেলোকে ধরতেই আবার একটা গুলি এসে লাগল নেলোর বুকে।

আহত দয়ালদা এইরকম অবস্থাতেও শত্রুর শেষ রাখল না। দুটি বুলেট খরচা করে মরণ কামড় দিল।

গৌতম তখন লাফিয়ে পড়েছে দয়ালের ওপর। ওর হাতটাকে পা দিয়ে টিপে ধরে কবজি শিথিল করে দিল।

দয়ালদা হেসে বলল, ওতে আর গুলিই নেই।

পল্টন তখন নেলো আর দয়ালদার হাত থেকে রিভলভার দুটো কেড়ে নিয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী নেলো গৌতমকে বলল, দোস্ত! একটু পানি পিয়াও। বড্ড জলতেষ্টা পেয়েছে।

গৌতম তখুনি ছুটে গেল ঝরনার কাছে। খুব সামান্য একটু জল ছির ছির করে পড়ছিল একদিকে। তাই থেকে এক আঁজলা জল এনে ওর মুখে দিতেই একটু দূরের দিকে আঙুল তুলে কী যেন দেখাল নেলো। তারপর জল খেয়ে আঃ করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

ওরা সেই ঝরনা পাথরের পিছন দিকের একটা মোচাকৃতি পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে কাকে যেন উঠতে দেখল তখন। যে উঠছে সে একটি মেয়ে। দেখেই মনে হল জীবন বিপন্ন করে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে বেচারি। এবং এই মেয়ে দুলালি ছাড়া কেউ নয়।

ওরা এবড়ো খেবড়ো পাথরে পা দিয়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে।

পল্টন বলল, দুলালি নেমে এসো। আমরা এসে গেছি। কোনও ভয় নেই তোমার, আমাদের শত্তুর, নিপাত গেছে।

দুলালি বলল, আমি নামতে পারব না। আমার হাত-পা কাঁপছে। গির পড়ি তো মুঝে বচায়গা কৌন?

গৌতম বলল, ঠিক আছে। তুই যেমন আছিস থাক। একদম নড়াচড়া করবি না। আমি এখুনি লোকজন ডেকে আনছি। পল্টন, তুই ততক্ষণ পাহারা দে ওকে।

গৌতমকে অবশ্য বেশি দূরে যেতে হল না। খানিক যাবার পরই দেখল বজরঙ্গবাবা একদল লোক নিয়ে ওদের খোঁজে আসছেন। যারা আসছে তাদের কারও হাতে বন্দুক, কারও হাতে ভোজালি, কেউ বা লাঠি, বল্লমও নিয়েছে

কেউ। আসলে গুলির শব্দ শুনেই সতর্ক হয়েছে সবাই এবং বজরঙ্গবাবার মুখে আরও কিছু শুনে তৈরি হয়ে এসেছে। এসেই যা দেখল তাতেই তো চক্ষুস্থির। একজনকে অর্ধমৃত এবং দু'জনের মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠল সবাই।

পল্টন আর গৌতম সব কথা খুলে বলল সকলকে।

দয়ালদার হাত-পা বেঁধে কয়েকজন টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল পাহাড়ের নীচে। মৃতদেহ অবশ্য ছুঁল না কেউ। পুলিশ এসে যা করবার করুক। ওরা সবাই মিলে তখন অসহায় দুলালিকে উদ্ধার করবার জন্য ছুটে গেল। গাছের ডালে, বড় পাথরে দড়ি বেঁধে কী কাণ্ড করে যে নামানো হল তাকে সে এক বিপজ্জনক ব্যাপার। তবুও যা হোক করে মেয়েটাকে উদ্ধার তো করা হল।

সবচেয়ে খুশি হল পল্টন। ও সযত্নে ধরে ধরে বজরঙ্গবাবার আশ্রমে নিয়ে চলল দুলালিকে। দুলালি এখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পরিশ্রমে ক্লান্ত। খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েছে তাই।

ওরা যখন আশ্রমে ফিরে এল চারদিক তখন নিশুতি হয়ে গেছে। অথচ রাত বেশি নয়, সবে সাড়ে সাতটা। কালীমায়ের মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে। কিন্তু গোপা কই? কোথায় গেল মেয়েটা? না মন্দিরে, না সাধুর আশ্রমে, কোনওখানেই পাওয়া গেল না তাকে। বিপদের পর বিপদ আবার নতুন করে দেখা দিল।

একটি ছোট ছেলে কালীমন্দিরের সামনে দোকানে বসে ফুল বিক্রি করছিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করতে সে বলল, এক আদমি আয়া থা। টোপি ঔর চশমাবালা। ও লেকে ভাগা।

বজরঙ্গবাবা বললেন, আউর আদমি নেহি থা হিঁয়া পর?

বহুত আদমি থা। লেকিন উনকো হাতমে রিভলভার থা, ইসি লিয়ে সব চুপ চাপ হো গিয়া।

ও আদমি কৌন থা?

মুঝে না মালুম।

সব যখন ফাঁস হয়ে গেল তখন মুখ খুলল অনেকেই। সবাই বলল মেয়েটি বোধহয় আগন্তুককে চিনত। তাই ভয়ে লুকিয়ে পড়েছিল একটি থামের আড়ালে। যে এসেছিল সে সবার চোখের সামনে পকেটের শিশি থেকে কী একটা ওষুধ রুমালে মাখিয়ে নাকে চেপে ধরল মেয়েটার। তারপর সকলকে রিভলভার দেখিয়ে বলল, কিসিকো মাত বোল না। বলে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

গৌতম বজরঙ্গবাবাকে বলল, এই আগন্তুক ডিসুজা ছাড়া কেউ নয়। আমি এখুনি নয়নাগিরি যাব। আপনারা দয়ালটাকে নজরে রাখুন। পুলিশে খবর দিন। দেখবেন ও যেন পালাতে না পারে।

পালাবে কী? দয়ালকে তখন পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে স্থানীয় লোকেরা।

মন্দিরের সামনেই একটি টাঙ্গা ছিল। ওরা তাতে করেই বিন্ধ্যাচলে এল। সেখান থেকে বাসে মির্জাপুরে।

গৌতম পল্টনকে বলল, তুই দুলালিকে নিয়ে এখানকার জি আর পিতে চলে যা। সেখানে তোর তো ডায়েরি করাই আছে। তাই পুলিশকে গিয়ে সব কথা খুলে বল, আর পারিস তো কিছু পুলিশ সঙ্গে নিয়ে নয়নাগিরিতে চলে আয়।

দুলালি বলল, ভাইয়া আমি কিছুতেই থানা-পুলিশের ঝামেলায় যাব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমার দোস্ত বরং পুলিশে খবর দিক। তুম হামকো সাথ লে চলো।

পল্টন বলল, সেই ভাল। কেন না এই যাত্রায় আমার ভাগ্য যেভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে তাতে আমি আর কাউকেই সঙ্গে নিতে ভরসা পাচ্ছি না। তুই ওকে নিয়েই যা। তবু একজন সঙ্গী পাবি। আমি পুলিশ নিয়ে কখন যাব তার ঠিক কী। তা ছাড়া জি আর পি মানেই রেল-পুলিশ। রেলের আওতার বাইরে আদৌ তারা যাবে কিনা তাই বা কে জানে?

তবুও তুই গিয়ে সব কথা খুলে বল। ওরা না গেলেও লোক্যাল পুলিশকে জানিয়ে দেবে সব কথা। আমিও যেতাম তোর সঙ্গে। কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করতে আমার মন চাইছে না। তা ছাড়া পুলিশ দেখলে ওরা হয়তো সতর্ক হয়ে যাবে! আবার আমাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সাহায্যও দরকার। আমরা ততক্ষণে কোনও ক্লু পাই কি না দেখি। জ্যোৎস্না রাত, পথ চলার অসুবিধে খুব একটা হবে না। সারারাত ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরব চারদিক।

এই রাতদুপুরে ওই দুর্গ পাহাড়ে যেতে গিয়ে কোনও বিপদ ঘটাবি না তো?

বিপদ যে কোনও মুহূর্তেই ঘটতে পারে।

তা আমি বলছিলাম কী, আর অযথা থানা-পুলিশ না করে আমরা তিনজনেই এক সঙ্গে গেলে কেমন হয়?

অতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। এ পথে পরিবহনের অভাব নেই। পুলিশে খবর দিয়েই চলে আয় তুই। আর যদি পারিস তো পুলিশ সঙ্গে নিয়ে আসিস।

পল্টন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ও চলে গেলে দুলালি বলল, দশ মিনিট ইন্তেজার করো না ভাইয়া। দোস্ত কো আনে দো।

গৌতম বলল, বেশ! দশ মিনিট অপেক্ষা করছি। অবশ্য এখুনি যে বাস পাব চুনারের তারও ঠিক নেই।

দশ মিনিটের জায়গায় কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। তবুও পল্টন ফিরল না দেখে

দুলালিকে নিয়ে গৌতম বারাণসীর বাসে চাপল। এই বাসই চুনার হয়ে বেনারস যাবে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল বাসে। ওরা যখন চুনারে পৌঁছুল তখন চারদিকে জমাজমাট অন্ধকার।

গৌতম বলল, আজকের এই নৈশ অভিযান আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে করতে হবে এই কাজটুকু। ডিসুজাকে কোনওরকমে ফাঁদে ফেলতে পারলেই আমাদের অভিযান সফল হবে। তা ছাড়া গোপাকে উদ্ধার করতেই হবে।

জরুর হবে। ভাইয়া, তুমি যদি গোঁসা না করো তো একটা কথা বলি।

কী কথা?

তোমাকে আর গোপাকে এক সঙ্গে দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। তোমরা দু'জনেই খুব সুন্দর। তাই বলছিলাম কী—।

থাক, আর বলতে হবে না। তুই কী বলবি তা আমি জানি। তুই যে একটা পাকলু মেয়ে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

তা হলে তুমি গোপার জন্য এত করছ কেন?

কর্তব্যের খাতিরে। আমরা সবাই যে এখন একসূত্রে গাঁথা। বন্ধুর মতো। ওসব কথা থাক। চল আগে কোনও একটা হোটেলে দুটো খেয়ে নিই। খিদে পাচ্ছে খুব।

ওরা দু'জনে একটা হোটেলে বসে পেট ভরে মাংস-ভাত খেল। তারপর একজন বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালাকে ডেকে বলল চারদিক ভাল করে ঘুরিয়ে দিতে।

টাঙ্গাওয়ালা বলল, লেকিন দাদাবাবু এখন তো তোমরা গড় পর চড়তে পারবে না।

গৌতম বলল, কেন?

কিল্লা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সামকো পাঁচ বাজকে বাদ উধার কা খিড়কি বন্‌ধ হো যাতা।

তা হলে?

কিলা কি অন্দর যানে নেহি দেঙ্গে ও লোগ। লেকিন গঙ্গা কি কিনারে মে তো চলো।

গৌতম নকসা করে বলল, এই রাতদুপুরে গঙ্গার ধারে কোনও ভয় নেই তো?

বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা এক চোখ টিপে বলল, দাদাবাবু। আমার নাম আছে রহমত। যবতক আমি জিন্দা থাকব তবতক কারও সাধ্যি হবে না রহমতের সওয়ারির গায়ে হাত দেয়।

বেশ! তুমি কী নেবে বলো?

কিতনা টাইম ঘুমোগে তুম?

ধরো সারারাত।

রহমত অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর বলল, হাম দো ঘণ্টেসে জায়দা নেহি ঘুমায়েঙ্গে। পঁচিশ রুপিয়া লেগা। হ্যায় তুমহারা পাস?

হ্যাঁ! চলো উস তরফ।

চাঁদনি রাতে পাথুরে রাস্তায় টগবগ টগবগ করে টাঙ্গা ছুটে চলল। পূর্ণিমার গোল চাঁদটা যেন আকাশ থেকেই হাতছানি দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদের। জ্যোৎস্নালোকে চুনার দুর্গ ওদের কাছে ভয়বহ এবং বিভীষিকাময় বলে মনে হল। কোথাও কোনও গাছপালা নেই, কিছু নেই, শুধু পাথর আর পাথর। যেন পাথরের খাড়াই দেওয়াল একটা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা গঙ্গার ধারে এসে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে গেল। তবু মনের মধ্যে রইল দারুণ একটা উৎকণ্ঠা।

রহমত ওদের দেখাতে লাগল এই পাহাড়ের উপরিভাগে যে দুর্গ আছে তার সঙ্গে গোপন সুড়ঙ্গপথে এই গঙ্গার সাথে প্রাচীন কালের যোগাযোগের নিদর্শনগুলো। ওরা তীক্ষ্ণ চোখে সব কিছু দেখল। কিন্তু সেখানে সন্দেহজনক কিছুই পেল না।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে রহমত বলল, আভি হামকো ছুট্টি দে দো। হামকো ঘর যানা হ্যায়।

গৌতম তিরিশটা টাকা রহমতের হাতে দিয়ে বলল, এই নাও।

রহমত বলল, হামকো পঁচিশ রুপিয়া চাহিয়ে।

পাঁচ টাকা বকশিশ দিলাম তোমাকে।

রহমত হেসে বলল, মেরা পাপ্পু মেহনত কা দাম লেতা বকশিশ নেহি।

কিন্তু পাপ্পুর বাবা রহমতকে যদি আমরা চা খেতে দিই তা হলে?

তব ভি নেহি।

গৌতম রহমতের কাছ থেকে দশ টাকা ফেরত নিয়ে পাঁচ টাকা দিল।

রহমত বলল, এক বাত পুছেগা তুমকো?

কী কথা বলো?

এত রাতে তোমরা এখানে কী করতে এসেছ? তোমাদের বয়সি ছেলেমেয়ে রাত্তিরে এইখানে ঘুরেবেড়ালে পুলিশ তোমাদের পাকড়ে লিবে।

গৌতম বলল, দেখো রহমত, তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি একজন সাচ্চা আদমি। তোমার কাছে লুকোব না, আমরা কিন্তু কোনও খারাপ মতলব নিয়ে এখানে আসিনি। এমনকী বেড়াতেও আসিনি এখানে। আমরা বিন্ধ্যাচল গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের দলের একটি মেয়েকে দুষ্টচক্রের লোকেরা

অপহরণ করে। আমরা জানতে পেরেছি এইখানেই কোথাও এনে ওরা লুকিয়ে রেখেছে তাকে।

রহমত বলল, ইয়ে বাত? তো তুম পহলে কিঁউ নেহি বতায়া? তোমরা তো গলদ রাস্তায় চলে এসেছে।

এটা নয়নাগিরি নয়?

ইয়ে নয়নাগিরি, চরণাদ্রি, চুনার। সব কুছ। উঠো উঠো জলদি উঠো।

ওরা উঠে বসতেই টাঙ্গা ঘুরে গেল এই পাহাড়ের উলটো দিকে।

এক জায়গায় টাঙ্গা থামিয়ে রহমত বলল, থোড়া দূর পয়দাল চলা যাও। হাম রোড পর যা রহেঁ। পোলিশবালে আনেসে হাম উধার ভেজ দেঙ্গে। তুম দোনো উধার নজর রাখো। ও রহেগা তো উধারই রহে গা।

ওরা রহমতের কথামতো টাঙ্গা থেকে নেমে সোজাপথ না-ধরে খাড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। এক জায়গায় বড় একটি পাথরের আড়াল থেকে দেখল বেশ কিছু দূরে একটি গুহার সামনে একটি অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সামনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ডিসুজা। তবে দেখে মনে হচ্ছে কোথাও যাবার উপক্রম করছেন।

গৌতমের বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। ডিসুজা গোপাকে নিয়ে কোথাও পালাবার তাল করছেন না তো? গৌতম দুলালির কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, তুই যেভাবেই হোক একবার মেইন রোডে চলে যা। গিয়ে রহমতকে খবর দে। ও নিশ্চয়ই লোকজন নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

দুলালি বলল, আমি একা যাব ভাইয়া? পথ যে অনেক দূর। যদি আমাকে একা পেয়ে আবার কেউ চুরি করে নেয়?

গৌতম বলল, ঠিক বলেছিস। তুই বরং এক কাজ কর, এইখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে থাক। আমি চুপি চুপি গিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করি ওকে। পল্টন পুলিশ নিয়ে এলে এদিকে পাঠিয়ে দিস।

তুমি কীভাবে যাবে ওখানে? চারদিক ফাঁকা। তুমি গেলেই ও দেখতে পাবে তোমাকে।

তবু যেতে হবে।

গৌতম সবে এক পা এগিয়েছে অমনি দেখল সেই গুহামুখের দরজার পাল্লা খুলে দু'জন লোক কাকে যেন পাঁজাকোলা করে নিয়ে এল। আসামাত্রই ডিসুজা তাকে কাঁধের ওপর শুইয়ে নিলেন। তারপর এক হাতে রিভলভার ধরে পাহাড়ের ঢালুতে নেমে চললেন হন হন করে।

লোকদুটো আবার গুহায় ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

গৌতম তখন ওদের নাগাল পাবার জন্য প্রাণপণে ছুটছে। ডিসুজাও পাহাড়ের একটি বাঁকের আড়ালে। ও ছুটে ছুটে যখন সেই গুহামুখের কাছে এল তখন দেখল এটা একটা মোটর মেরামতির ঘাঁটি ছাড়া কিছুই নয়। ওপরে একটা সাইনবোর্ডও রয়েছে সেইরকম। অর্থাৎ লোকের চোখে ধুলো দেবার একটা সহজ উপায় মাত্র। তবে এটা যে একটা শয়তানের ঘাঁটি তা হয়তো অনেকেই জানে। না হলে রহমত এত সহজে এই ঠেকটা ওদের চিনিয়ে দিতে পারত না। সেই গুহামুখ পার হয়ে বাঁকের মুখে এসেই দেখল ডিসুজা রিভলভার হাতে গোপাকে কাঁধে নিয়ে এদিকওদিক তাকাতে তাকাতে গঙ্গার দিকে চলেছে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, শুধুমাত্র গোপার জন্যই হাতের মুঠোয় পেয়েও ডিসুজাকে আক্রমণ করতে পারল না ও।

হঠাৎ একটা কালপ্যাঁচা এমন বিশ্রীভাবে কর্কশ ডাকে ডেকে উঠে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে যে চমকে উঠলেন ডিসুজা। প্যাঁচাটা আর একবার ডাকতেই সেটাকে লক্ষ্য করে 'ডিস্যুম' করে গুলি করলেন একটা।

আর সেই মুহূর্তে গৌতম একটা ভয়াবহ চিৎকার করে উঠল, আ—আ—আ—।

থমকে দাঁড়ালেন ডিসুজা। ব্যাপারটা যে কী হল কিছু ভেবে পেলেন না। গুলি করলেন প্যাঁচাকে, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে মানুষের আর্তনাদ ভেসে আসে কী করে? অচৈতন্য গোপাকে শুইয়ে রেখে ব্যাপারটা কী হল দেখবার জন্য এগিয়ে আসতেই গৌতম একটি পাথরের খাঁজে সেট হয়ে দাঁড়াল। তারপর যেই না ডিসুজা এসে হাজির হলেন সেখানে অমনি সেই অন্ধকারের আড়াল থেকে একটা ল্যাং মারল ওঁকে। ডিসুজা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন পাশের খাদে। এবার ওরই গলা দিয়ে একটা মরণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল—আ—আ—আ।

শয়তানের খেলা শেষ।

গৌতম ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল গোপার কাছে। তারপর ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ধীর পায়ে নেমে এল গঙ্গার ধারে। বড় একটি পাথরের ওপর ওকে শুইয়ে পর পর কয়েকবার ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতেই চোখ মেলে তাকাল ও। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি কোথায়?

গৌতম বলল, তুমি আমি দু'জনেই এখন নয়নাগিরিতে। আর আমাদের কোনও ভয় নেই। আমাদের অভিযান সফল হয়েছে। এখন দু'চোখ মেলে গঙ্গার দৃশ্য দ্যাখো। এমন শোভা কিন্তু কাশীতেও নেই।

গোপা আদুরে মেয়ের মতো বলল, লক্ষ্মীটি, তুমি কাশীর সঙ্গে কারও তুলনা কোরো না। প্লিজ।

গৌতম বলল, চলো, আমরা দু'জনে একটা নৌকায় চেপে গঙ্গার মাঝখান থেকে ঘুরে আসি। খুব ভাল লাগবে কিন্তু।

তাই কী হয়? তোমার বন্ধু খোঁজ করবে না? দুলালিই বা কী ভাববে? ওরা সব কোথায়?

ওরা এখানেই আছে। চলো ওঠা যাক।

গোপার একটি হাত ধরে গৌতম যখন ফিরে আবার উপক্রম করছে, তখনই দেখতে পেল একদল পুলিশ নিয়ে পল্টন আসছে লাফাতে লাফাতে। ওর সঙ্গে দুলালিও আছে।

দেখা হতেই পল্টন গৌতমকে এবং দুলালি গোপাকে জড়িয়ে ধরল।

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, কাঁহা হ্যায় ও বদমাশ?

গৌতম আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, উপর।

তারপর গৌতম ওদের সকলকে নিয়ে ঠিক জায়গাটিতে এসে খাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে সকলকে বলল, ওই দেখুন।

খাদটা খুব একটা গভীর নয়। তবু মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে অবস্থা কাহিল হয়েছে ডিসুজার। মাথা ফেটে, নাকেমুখে আঘাত পেয়ে রক্তে যেন স্নান করেছে। অথচ পালাতেও পারছে না।

একদল পুলিশ সেই খাদে নেমে তুলে আনল ডিসুজাকে। তারপর ওপরে এনে হাতকড়া পরাল।

এরপর পুলিশের লোকেরা সেই গুহাচক্রে হানা দিয়ে পঞ্চাশটিরও বেশি ছেলেমেয়েকে উদ্ধার করল। আর সুন্দর একটি সরকারি রেস্ট-হাউসে সে রাতে আশ্রয় পেল গৌতমরা। তবে ওরা কিন্তু না-ঘুমিয়ে সারারাত জেগে, জ্যোৎস্নালোকে এখানকার পার্বত্য প্রকৃতি ও নয়নাভিরাম গঙ্গার সৌন্দর্য উপভোগ করল।

পরদিন সকালে বিখ্যাত চুনার দুর্গ ঘুরে দেখল সেনাবাহিনীর লোকেদের সাথে। তারপর রহমতের টাঙ্গায় চেপে চারদিক ঘুরে, চিনামাটির ফুলদানি থেকে শুরু করে নানারকম কেনাকাটা করে আবার ফিরে এল বারাণসীতে।

অমরকণ্টক রহস্য

এক

ভাল নাম চন্দ্রকান্ত হলে কী হয়, ডাক নাম কিন্তু চাঁদু। চাঁদের মতোই ছেলে। যেমন সুন্দর মুখশ্রী, তেমনি ফর্সা গায়ের রং। বাপের একমাত্র ছেলে না হলেও খুবই আদরের। যেমনি ডাকাবুকো, তেমনি সাহসী। লেখাপড়াতে ও এমন কিছু অসাধারণ নয়। তবে রেজাল্ট মোটামুটি ভালই করে।

সেই ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েই জেদ ধরল এবারে আর কোনও কথা নয়, বিলাসপুরে সুজয়দের বাড়ি যাবেই যাবে। সুজয় ওর একমাত্র বন্ধু। পাশের বাড়িতে থাকত। এক স্কুলে পড়ত। তারপর হল কী, একদিন সুজয়ের বাবা বদলির অর্ডার পেয়ে চলে গেলেন বিলাসপুরে। সেও তো চার বছর আগেরকার কথা। সেই থেকে চিঠিপত্রে যোগাযোগ।

সুজয় কতবার চিঠি লিখেছে ওকে। প্রত্যেক চিঠিতেই একান্তভাবে বিলাসপুরে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু আমন্ত্রণ পেলেই তো হল না, সময় এবং সুযোগ দুটোই পাওয়া চাই।

তা এখন পরীক্ষার পর বেশ কিছুদিনের অখণ্ড অবসর। অন্তত মাস দুয়েকের তো বটেই। তার ওপর মাত্র কিছুদিন আগে সুজয়ের আর একটা চিঠি এসেছে। সুজয় লিখেছে, ভাই চাঁদু, পরীক্ষার ফল বের হলে যে-করেই হোক একবার তুই চলে আয়। এলেই বুঝবি, কী জায়গায় আমরা আছি। বিলাসপুর শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে আমরা জমি কিনে বাড়ি করেছি। চমৎকার একটা বাড়ি। হাওড়ায় আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তার চেয়ে অনেক ভাল। আমাদের এই জায়গাটা হাওড়ার মতো ঘিঞ্জি নয়। চারদিক বেশ ফাঁকা ফাঁকা। আর খুব সুন্দর করে সাজানো। দেখলে মন ভরে যাবে। তুই এলে তোকে নিয়ে টেনগন মডা আর খোংগসরার জঙ্গলে বেড়াতে যাব। না হলে চলে যাব পেনড্রা রোড হয়ে অমরকণ্টক। অথবা অনুপপুর থেকে চিরিমিরিও যেতে পারি। তুই এলে যে কী ভাল লাগবে আমার, তা বলে বোঝাতে পারব না। কতদিন তোকে দেখিনি, একসঙ্গে ঘুরিনি। এখানে আসার কোনও ঝামেলা নেই। হাওড়া থেকে অনেক ট্রেন আছে। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, বম্বে মেল। তবে তুই এলে বম্বে মেলেই আসিস। টিকিট কেটেই তার করিস আমাকে। আমি স্টেশনে

থাকব। লক্ষ্মীটি, একবার আসিস ভাই। এলে খুব খুশি হব। সব জায়গা আমিও যে খুব ভাল করে ঘুরেছি তা নয়। চেনা-অচেনা জায়গাগুলো দু' বন্ধুতে একসঙ্গেই ঘুরব। কেমন?

এই চিঠি পাওয়ার পর আর কী চুপ করে থাকা যায়? কিন্তু যেতে গেলে মা-বাবা দাদাদের অনুমতি নিতে হবে। তা ছাড়া যে গাড়িতে যাবে তার রিজার্ভেশন করাতে হবে। অমনি যাব মনে করলেই হল না। তাই চিঠিটা বাবার হাতে দিয়েই চাঁদু বলল, তুমি যে ভাবেই হোক আমাকে একটা টিকিট কেটে বিলাসপুরে যাবার ব্যবস্থা করে দাও বাবা। দিন দশেকের জন্য ওদের ওখান থেকে আমি ঘুরে আসি।

চাঁদুর বাবা তারাপদবাবু অত্যন্ত বদমেজাজি এবং রাশভারী প্রকৃতির লোক। তাঁর অন্যান্য ছেলেরা, এমনকী স্ত্রী পর্যন্ত ভয় করেন তাঁকে। একমাত্র চাঁদু ছাড়া। তার কারণ চাঁদুই একটু বেশিরকম ভালবাসা পায় বাপের কাছ থেকে।

তারাপদবাবু চিঠিখানা হাতে নিয়ে বেশ কয়েকবার পড়ে বললেন, বিলাসপুর যাবে, দিনকতক ঘুরে আসবে তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করে তবেই তোমার যাওয়া উচিত।

বাঃ রে। তখন স্কুল-কলেজে ভরতি হওয়ার একটা ব্যাপার আছে না? সেসময় তো যেতেই পারব না।

বুঝলাম, কিন্তু এখন যা রাস্তাঘাটের অবস্থা, দিনকাল যা খারাপ পড়েছে তাতে তোমাকে একাই বা ছাড়ি কী করে?

হলেই বা একা? গাড়িতে কি আর লোক থাকবে না? তা ছাড়া আমিও আর আগের মতো ছোটটি নেই। এখন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলাম। রাতের বম্বে মেলে তোমরা আমাকে চাপিয়ে দিলেই সকালে বিলাসপুরে ঠিক আমি নেমে পড়তে পারব। বিশেষ করে খবর পেলে সুজয় তো স্টেশনে আসবেই আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য।

ধরো যদি কোনওকারণে সে না-আসতে পারে?

তাই কখনও হয়? আমার টিকিট কাটা হলেই টেলিগ্রাম করব ওকে। ও না-আসতে পারলেও কেউ-না-কেউ তো আসবে।

তবু তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারি না। আজকাল ট্রেনে উঠতে আমাদেরই ভয় করে। এ তো হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল-বর্ধমান নয়, বিলাসপুর বলে কথা। তুমি বরং মধুপুরে যাও। সেখানে দিদি আছেন, দিন কতক থেকে এসো। মধুপুর তোমার অচেনা জায়গা নয়। আমিও নির্ভাবনায় তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব।

চাঁদু বলল, মধুপুরে যাবার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। কতবার গেছি বলো

তো? একই জায়গায় বারবার যেতে ভাল লাগে? তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, সুজয়ের জন্য আমার ভীষণ মন কেমন করছে।

শুনে মা বললেন, বাপরে! এমনই কী বন্ধুত্ব যে, এইভাবে মন কেমন করা? ওরা তো গেছেও আজ চার বছর। সুজয় নিজেও কি একবার এসেছে তারপর থেকে?

বাবা বললেন, অবশ্যই। তা ছাড়া ওদের রেলের পাস আছে। ট্রেনে চাপলে ভাড়া লাগে না। সে যখন আসে না, তখন তার জন্য তোমার এত দরদ কীসের?

চাঁদু বলল, সে কী করতে আসবে বলো? কী আছে এখানে যে আসবে? তা ছাড়া এটা তার পুরনো জায়গা।

ওখানেই বা হাতিঘোড়া কী আছেটা শুনি?

ওখানে যা আছে তা এখানে নেই। ওখানে আছে নয়নাভিরাম দৃশ্য। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-ঝরনা।

তোমার মুণ্ডু। মানচিত্র-জ্ঞান আছে কিছু? বিলাসপুরে আবার ঝরনা কোথায়?

বিলাসপুরে না-থাকলেও তার আশপাশে তো আছেই?

মা বললেন, না নেই।

তার মানে, সোজা কথায় তোমরা আমাকে যেতে দেবে না।

তারাপদবাবু এবার একটু নরম হয়ে বললেন, শোনো, তুমি সুজয়কে চিঠি লেখো। সুজয় অথবা ওর বাবা যদি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যান, তা হলে অবশ্য আমি তোমাকে ছাড়তে পারি। না হলে নয়।

চাঁদুর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এর পরে আর কোনও যুক্তিই খাটে না। তাই আর কোনও কথা না-বলে একটু গম্ভীর হয়ে জামাটা গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

ও জানত বিলাসপুরে যাওয়ার ব্যাপারে ওর মা-বাবা রাজি হবেন না। তবু ওর তো উচিত যাবার আগে একবার বাড়িতে জানানো। এখন পরের পদক্ষেপটা কী হবে, তা-ও নিজেই স্থির করবে। আপাতত রতনদের বাড়িতে একবার যাওয়া যাক। রতন ওর ইদানীংকালের বন্ধু। কৈলাস বসু লেনের একটা গলির ভেতর ওরা থাকে। চাঁদু গিয়ে দরজায় নক করতেই রতনের বোন সাড়া দিল, কে?

আমি চাঁদু।

ছিপছিপে লম্বাটে চেহারার এক কিশোরী হাসিমুখে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তারপর ভ্রমরের মতো চোখদুটো নাচিয়ে বলল, এ কী! চাঁদুদা!

এতে অবাক হবার কী আছে? রতন কই?

দাদা তো বাড়ি নেই। মাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গেছে।

তুই গেলি না কেন?

ওরে বাবা! বাসে উঠলেই আমার বমি পায়। তা এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবেন, না ভেতরে আসবেন?

রতন যখন নেই, তখন কী করতে যাব? ওর সঙ্গেই দরকার ছিল।

ও, আমি বুঝি কেউ নই?

নিশ্চয়ই। তুই আমার বোন তো বটেই।

তা হলে ভেতরে এসো।

অগত্যা ভেতরে ঢুকল চাঁদু। খুবই গরিব এরা। কিন্তু হলে কী হবে, মনটা এদের অতি সরল। যেমনি রতন, তেমনি ওর আদুরে বোন জুলি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মেয়ে। অথচ চোখদুটো কী দারুণ সাদা। কই মাছের মতন ছটফট করে সর্বক্ষণ। ওর মা-ও তেমনি। চাঁদুকে ঠিক নিজের ছেলের মতন ভালবাসেন। তাঁর খুবই দুশ্চিন্তা জুলিকে নিয়ে। একে গরিব, তায় কালো মেয়ে। কী যে ওর ভবিষ্যৎ তা কে জানে?

চাঁদু জুলির সঙ্গে ওদের ঘরে এসে বসল। একটিই মাত্র ঘর ওদের। পাঁচ ইঞ্চি, বাই দশ ইঞ্চি গাঁথনি দেওয়া। মাথার ওপর টিনের শেড। চেরা বাঁশে দরমা সেঁটে হালকা একটা সিলিং এমনভাবে আটকানো যাতে তাপ রোধ হয় না। শুধু শীতকালে টিনের ঘাম থেকে বাঁচা যায় একটু।

চাঁদুকে ঘরে বসিয়ে জুলি বলল, তুমি এলে, কিন্তু তোমাকে কী খাওয়াই বলো তো চাঁদুদা? ঘরে আমাদের কিছু নেই।

তোদের পাড়ায় মোড়ের মাথার সেই দোকানটায় আগের মতো হিংয়ের কচুরি করে না?

করে না আবার? ওই কচুরি বেচে ব'লে ওরা দোতলা হাঁকিয়ে ফেলল।

তা ঠিক আছে। চট করে খান দশেক কচুরি নিয়ে আয় দেখি। তোতে-আমাতে খাই। এই নে টাকা। বলে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে ওর হাতে দিল।

জুলি কচুরি খাবার আনন্দে টাকাটা নিয়ে ফ্রক উড়িয়ে, বেণী দুলিয়ে দুষ্টু প্রজাপতির মতো ছুটে চলে গেল গলির মোড়ে।

চাঁদু আপন মনে বসে বসে ভাবতে লাগল মানুষের দুরবস্থার কথা। কী কষ্টের সংসার এদের। রতনের বাবা সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর ওর মা নিয়মিত পেনশেনটা পাচ্ছেন এই যা রক্ষে। না হলে কী যে হত। অবসর সময়ে মা ঘরে বসে ঠোঙা তৈরি করেন। সেই ঠোঙা দু'-ভাইবোন দোকানে দোকানে দিয়ে আসে। এতেই ওদের খাওয়াপরা স্কুলের মাইনে সব কিছুই হয়ে যায়।

চাঁদুর খুব ভাল লাগে এদের। রতন, জুলি, ওর মা। এত দুঃখেও কী দারুণ

সুখের সংসারটি গড়ে তুলেছেন ওরা সব। শত দুঃখেও দুঃখকে জয় করে দুঃখজয়ী হয়েছেন. তাই ওদের জয়যাত্রা রয়েছে অব্যাহত। কিন্তু এত দেরি করছে কেন জুলিটা? এই তো কাছেই দোকান। কচুরি কি তবে ভাজিয়ে আনছে? এক ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল। বসে বসে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল চাঁদুর। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে ডুবে গেল হাওড়া শহর। কিন্তু জুলি কই? সে ফিরে এল না কেন? অথচ ঘর ফেলে যেতে পারছে না চাঁদু। আরও এক ঘণ্টা হয়ে গেল। না-ফিরল রতনকে নিয়ে ওর মা, না-ফিরল জুলি। চাঁদুর খুব ভয় করতে লাগল। তাই একসময় ঘরের দরজায় শিকল দিয়ে চোরের মতোই চুপিসারে চলে আসতে হল ওকে।

দুই

পরদিন সকালেই রতন ছুটতে ছুটতে এল ওদের বাড়িতে। কিন্তু এলে কী হবে? সিঁড়ির মুখেই ওকে আটকালেন তারাপদবাবু। বললেন, কাকে চাই?

চাঁদুকে একবার ডেকে দিন না কাকাবাবু, বিশেষ দরকার।

তুমি কৈলাস বসু লেনের বস্তিতে থাক না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমারই নাম রতন?

হ্যাঁ। চাঁদু আমি একসঙ্গে একই স্কুলে পড়ি।

জানি। কিন্তু চাঁদুর সঙ্গে তো দেখা হবে না।

আমি আপনার দুটি পায়ে পড়ি কাকাবাবু। একবার অন্তত আপনি ওর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিন।

বললাম তো দেখা হবে না।

তারাপদবাবুর এইরকম ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে গেল রতন। এর আগেও তো কয়েকবার এ-বাড়িতে এসেছে ও। কই তখন তো তিনি এরকম করেননি। সে ছলছল চোখে বলল, শুনুন, আমার বোন জুলি...।

জানি।

এই ব্যাপারেই আমি চাঁদুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

এই ব্যাপারে ওর সঙ্গে কোনও কথাই তুমি বলবে না। প্লিজ, ইউ গো ব্যাক।

আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না কাকাবাবু। কাল বিকেলে চাঁদু আমাদের বাড়ি গিয়েছিল।

বিশ্বাস করি না।

রতন বিনীতভাবে বলল, বেশ তো। আপনি ওকেই জিজ্ঞেস করুন। তা ছাড়া প্রতিবেশীরা দেখেছে। তাই ওকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস না-করলেই নয়।

সে এখানে নেই। কাল রাতের গাড়িতেই সে বিলাসপুর চলে গেছে। তুমি এখন যেতে পারো।

এবার কেমন একটু হতাশ হয়ে পড়ল রতন, কাল সে বিলাসপুর চলে গেছে? কোন গাড়িতে?

অত কৈফিয়ত তো আমি তোমাকে দিতে পারব না বাবা।

কাকাবাবু!

তুমি কি ভাল ব্যবস্থায় যাবে? না আমি অন্য রাস্তা দেখব।

রতন এবার বিমর্ষ গলায় বলল, শুনুন কাকাবাবু! চাঁদু আমার ভাইয়ের মতো। ওকে কোনওভাবে জড়াবার বা সন্দেহ করবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি আমাকে তাড়ালেও পুলিশকে কিন্তু ঠেকাতে পারবেন না। একটু পরেই পুলিশ আসবে ওর খোঁজে। আমি যাচ্ছি। ও ঘরে থাকলে ওকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

রতন যখন ফিরে আসছে তখনই সিঁড়ির ওপর থেকে চাঁদুর গলা শোনা গেল, তুই যাস না রতন। শোন, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

ধমকে উঠলেন তারাপদবাবু, চাঁদু!

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে চাঁদু বলল, আমাকে ওর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে দাও বাবা। আমি সত্যি সত্যিই কাল বিকেলে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম।

তারাপদবাবু বললেন, তা তো গিয়েছিলে। কিন্তু তুমি কি জান কাল কী হয়েছিল?

না। কিছু জানি না আমি। কাল যখন আমি ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম তখন রতন বা ওর মা কেউই ঘরে ছিল না। আমি ফিরে আসছিলাম। ওর বোন জুলি আমাকে ডেকে নিয়ে ঘরে বসায়। ওদের বাড়িতে তখন এমন কিছু ছিল না যে খেতে দেয় আমাকে।

তুমি কি বাড়িতে খেতে পাও না যে লোকের বাড়ি খেতে গেছ?

আমি ওদের বাড়ি খেতে যাইনি বাবা। গিয়েছিলাম রতনের খোঁজে অন্য একটা দরকারে। তবে মানুষের বাড়িতে মানুষ গেলে স্বাভাবিক ভাবেই একটু খেতে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে। কিছু-না-হোক এক কাপ চা-ও দেওয়া হয়। আমরাও তো দিই। তার মানে কি এই যে, আমাদের বাড়িতে যাঁরা আসেন তারা খেতে পান না?

তুমি দেখছি এর মধ্যে অনেক কথা শিখে গেছ? তারপর কী হল বলো।

তারপর আমি ওকে পাঁচটা টাকা দিয়ে মোড়ের মাথা থেকে কচুরি আনতে বলি। ও হিংয়ের কচুরি খেতে খুব ভালবাসত, আমিও। কিন্তু সেই যে গেল ও

আর ফিরল না। দেরি দেখে ভয় পেয়ে গেলাম আমি। ঘরের দরজায় শিকল দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে এলাম। আমি কিন্তু এখনও জানি না ওর কী হয়েছে। তবে আমার মন বলছে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে ওর।

চাঁদুর কথা শেষ হতেই রতন ডুকরে কেঁদে উঠল। বলল, কেষ্ট মিত্তিরের সেই বখাটে ছেলে রাজুর কথা মনে আছে তোর?

হ্যাঁ। বছরখানেক আগে স্কুল থেকে ফেরার পথে জুলিকে বিরক্ত করেছিল বলে তুই আমি খুব করে পিটিয়েছিলাম ওকে এবং শাসিয়েছিলাম ফের কখনও এইরকম হলে জান্ত কবর দেব বলে। কিন্তু এখানে রাজুর প্রসঙ্গ আসছে কেন? সে তো এখন খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছে। নলহাটিতে পড়াশুনা করছে।

দিনকতক হল সে বাড়ি এসেছে। কাল বিকেলে মানে সন্ধের মুখে জুলি যখন মোড়ের মাথায় কচুরি কিনতে যায়, রাজু তখন ওর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল। জুলিকে দেখেই এগিয়ে যায় সে। ওকে তোর আর আমার কথা জিজ্ঞেস করে। জুলি প্রথমটা এড়িয়ে যায় ওকে। তারপর কচুরির অর্ডার দিয়ে বেশ ভালভাবেই কথা বলতে থাকে ওর সঙ্গে। মনে হয় কোনও অশোভন আচরণ করেনি ও। তারপর কথা বলতে বলতে একটু দূরের দিকে এগিয়ে যায় ওরা।

চাঁদুর চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে।

তারাপদবাবু বললেন, ওঃ মাই গড। আমি ভেবে পাচ্ছি না এই সেদিনের ছেলে তোমরা ভেতরে ভেতরে এতখানি অ্যাডাল্ট কী করে হলে? এসব কী শুনছি?

চাঁদু বলল, তারপর কী হল বল?

তারপর থেকেই জুলি নিখোঁজ। তবে রাজুর লাশটা বৈষ্ণবপাড়ায় হাওয়াপুকুরের কাছে পাওয়া গেছে। কিন্তু জুলির কোনও খবর নেই।

এসব খবর তোকে কে দিল?

রাজুর বন্ধুরা। তা ছাড়া পুলিশও বলেছে। পুলিশ তো কাল রাত থেকে জেরায় জেরায় প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে আমাদের। শুধু পাড়ার লোকেদের জন্যে এখনও আমাকে অ্যারেস্ট করেনি। তবে ওর বাবা কেষ্ট মিত্তির পুলিশকে বলেছে জুলির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা নাকি একটা সাজানো নাটক। আসলে আমরা নাকি ষড়যন্ত্র করে কোনও কিছুর বদলা নেবার জন্যই রাজুকে খুন করেছি বা করিয়েছি। কেষ্ট মিত্তির তাই উঠি-পড়ি করে লেগেছেন তাঁর একমাত্র ছেলের হত্যাকারী হিসেবে তোকে-আমাকে আইনের জালে জড়াতে। ঘটনার দিন তুই যে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলি সে-কথাও লোকমুখে শুনে খোঁজখবর নিয়ে কেষ্ট মিত্তির পুলিশকে বলেছে।

চাঁদুর মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

রতন বলল, পুলিশ তোর কাছেও আসবে। তবে জুলিকে খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত সম্ভবত ওরা আমাদের দিকে নজর দেবে না। অথচ আসল সর্বনাশটা হল কিন্তু আমাদেরই। এক তো বোনটাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার ওপর কাগজে কী লিখেছে জানিস?

কী লিখেছে?

তারাপদবাবুর হাতে সেদিনের খবরের কাগজটা ছিল। সেটা চাঁদুর দিকে মেলে ধরলেন।

চাঁদু কাগজ পড়েই চমকে উঠল।

বড় বড় হরফে কাগজের প্রথম পাতায় লেখা আছে 'বিখ্যাত ব্যবসায়ী কেষ্ট মিত্তিরের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে খুনি কিশোরী নিখোঁজ।'

চাঁদু বলল, না না। এ হতে পারে না। এ মিথ্যা! ওই খুন যদিও কেউ করে থাকে— জুলি নয়। করলেও বাধ্য হয়েই করেছে। তা ছাড়া রাজুর সঙ্গে গায়ের জোরে ও পেরে উঠবে কেন? আর খুন করতে গেলে যে কোনও একটা অস্ত্র হাতের কাছে থাকা চাই। কাগজে লিখছে ক্ষুরজাতীয় কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলিটাকে দু' ফাঁক করা হয়েছে, কিন্তু জুলির পক্ষে তা কী করে সম্ভব! ওইসময়ে হাতের কাছে সে ক্ষুরই বা পাবে কোথায়?

রতন অশ্রুসজল চোখে বলল, সেইজন্যেই তোর কাছে ছুটে এসেছি ভাই। পুলিশ এলে শুধু এই কথাটাই পুলিশকে তুই বুঝিয়ে বলবি।

বলবই তো।

তারাপদবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, পুলিশ এ-বাড়িতে আসবে না। সে-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

চাঁদু বলল. কেন আসবে না?

পুলিশের মুখ আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

রতন ও চাঁদু মুখ চাওয়াচায়ি করল।

তারাপদবাবু বললেন, পুলিশ কাল রাত্তিরেই এসেছিল। পুলিশকে যা বলবার আমি বলেছি।

রতন বলল, পুলিশকে আপনি কী বলেছেন?

বলেছি আমার ছেলে এই ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে কলকাতার বাইরে ওর বন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে। এবং আগামী দু'-এক মাসের মধ্যে সে এখানে আসবে না।

কিন্তু পুলিশ তো জানে ও কাল আমাদের বাড়িতে ছিল।

জানে বলেই তো এখানে এসেছিল। কিন্তু আমার টাকা জানিয়ে দিয়েছে ও এখানে ছিল না।

রতন খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, কাকাবাবু! আপনার অনেক টাকা। তাই আপনি এই কাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু...।

নিজের ছেলেকে বাঁচাবার জন্য সব বাবাই এই কাজ করে থাকেন। তা ছাড়া আমার চাঁদু নির্দোষ। আমি ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

কিন্তু আমার অসহায় বোনটি? সেও তো নির্দোষ।

ঘটনা কিন্তু তা বলে না। যাই হোক, ওর ব্যাপারটা আদালতেই প্রমাণ হবে। তুমি এখন যেতে পার।

রতন নীরবে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে বিদায় নিল সেখান থেকে।

রতন চলে গেলে তারাপদবাবু সস্নেহে ছেলের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আজ সারাদিনে তুমি একদম ঘর থেকে বেরোবে না। শুধু তাই নয়, আজ রাতের গাড়িতেই তোমাকে বিলাসপুরে যেতে হবে। ওখানে সুজয়দের বাড়িতে তুমি যতদিন ইচ্ছে থাকবে। আমি আর তোমাকে আটকাব না। আমি নিজে গিয়ে তোমাকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে আসব। আমি এখুনি ওর বাবার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করছি।

সে তুমি করতে পারো বাবা। তবে এখন আমি আমার মতের পরিবর্তন করেছি।

তার মানে?

তার মানে আমি যাচ্ছি না।

কী বলত চাও তুমি?

এই অবস্থায় আমার পক্ষে এইভাবে চোরের মতো পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

তারাপদবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবার, যেতে তোমাকে হবেই। এখন ভাবছি তুমি নিজের থেকে যখন যেতে চেয়েছিলে তখনই আমার রাজি হওয়া উচিত ছিল। তা হলে হয়তো এই জালে তোমাকে জড়িয়ে পড়তে হত না। মনে রেখো, কেষ্ট মিত্তিরের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের শত্রুতা। এবং সেও একটা ক্রিমিন্যাল। তার একমাত্র ছেলের হত্যাকারীকে সে সহজে ছাড়বে না।

কিন্তু বাবা! জুলি এ কাজ করতে পারে না।

কে কী পারে, না পারে সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। এটা তো ঠিক, দিস ইজ এ কেস অব মার্ডার?

তা হলে এটাও তো ঠিক শুধুমাত্র আমারই জন্যে একটি পরিবারের বুকে আজ এত বড় একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে এল? না আমি ওকে কচুরি কিনতে পাঠাব, না এই কাণ্ডটা হবে।

এর নাম নিয়তি। ললাটের লিখন কেউ রোধ করতে পারে না। তুমি উপলক্ষ মাত্র।

চাঁদু কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। ওর মনের মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। ও আবার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল। বাবার হুকুম অমান্য করবার মতো সাহস এবং স্পর্ধা ওর নেই। অথচ এই অবস্থায় ও চলে গেলে রতনটা কী ভাববে? সহায়-সম্বলহীন ফুলের মতো পবিত্র মেয়েটা এইভাবে শুকনো পাতার মতো ঝরে যাবে, এ কী ভাবা যায়? জুলির ভ্রমরের মতো চোখদুটো ওর চোখের সামনে যেন ভাসতে লাগল।

তিন

সারাটা দিন যে কীভাবে কাটল চাঁদুর তা সেই জানে। সন্ধের পর বাবা ওকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে বম্বে মেলের বিলাসপুর কোচে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। প্রথম শ্রেণীর একটি কুপে কোচ অ্যাটেনডেন্টকে বলে ওর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তবেই গেলেন তিনি।

এই নিরানন্দ যাত্রায় চাঁদুর বুকের গভীরে যে কী দারুণ যন্ত্রণা তা বুঝবে কে? বাবা শুধু তাঁর নিজের স্বার্থটাই দেখলেন। কিন্তু এক কন্যাহারা জননীর মর্মবেদনা একবারও উপলব্ধি করলেন না। তাই দ্রুতগামী ট্রেনের কামরায় শুয়ে চাঁদু জুলির কথাই ভাবতে লাগল শুধু। জুলির এই বিপদের জন্য বার বার নিজেকেই অপরাধী মনে হতে লাগল ওর। কেন যে মরতে ওদের বাড়ি গিয়েছিল। যদি না যেত, দুর্ঘটনাটা যদি ওকে বাদ দিয়েই ঘটত, তা হলে কিন্তু এতটুকুও অনুশোচনা হত না। ভাবত জুলির এটা দুর্দৈব ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু যেখানে ও নিজে জড়িত সেখানে কি অন্য কিছু ভাবা যায়?

এইসব ভাবতে ভাবতেই কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল চাঁদু। ট্রেনের দোলানিতে সেই ঘুম আরও গভীর হল। ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। ট্রেন এসে থামল চম্পা স্টেশনে। কী সুন্দর নাম স্টেশনটার। এখানে বেশিক্ষণ থামল না গাড়ি। বোধ হয় দু'-পাঁচ মিনিট থেমেই আবার শোঁ শোঁ করে ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগল।

চম্পার পরই বিলাসপুর। স্টেশনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ও গেটের কাছে চেকারের পাশে সুজয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। জানালা দিয়েই হেঁকে ডাকল, সু-জ-য়!

সুজয়ও হাত নাড়ল দুর থেকে, চাঁদু! তার মানে সেও ওকে দেখেছে এবং ওর ডাক শুনেছে। তা ছাড়া গাড়ির গতির সঙ্গে ছুটতে ছুটতে সুজয় এসে ওর কম্পার্টমেন্টের সামনে দাঁড়াল। চাঁদুও সুটকেশটা নিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ল

স্টেশনে। বেশ জমকালো স্টেশন। হইহই করছে চারদিকে লোকজন। তার ওপর বম্বে মেল বলে কথা। যেমনি নামার ভিড়, তেমনি ওঠার। সেই ভিড়ের মধ্যেই মহামিলন।

চাঁদু ট্রেন থেকে নামতেই সুজয় জড়িয়ে ধরল ওকে। বলল, শেষ পর্যন্ত এলি তা হলে?

এলাম। তবে খুব একটা আনন্দ নিয়ে আসিনি। ওখানকার খবর শুনেছিস নিশ্চয়ই?

শুনেছি। তোর বাবা ফোনে সব কথা আমার বাবাকে জানিয়েছেন। তা ওই কেলটিটা শেষপর্যন্ত খুন করতে গেল কেন?

ছিঃ সুজয়। অন্যের বোন সম্বন্ধে এইরকম মন্তব্য কেউ করে? জুলির গায়ের রংটাই শুধু দেখলি, ওর চোখদুটো দেখিসনি? ওরকম পদ্মচক্ষু ক'টা মেয়ের হয়? তা ছাড়া ও তো আমাদেরও বোন। চোখের সামনে লাউ ডগাটির মতো কেমন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল।

তোকে কাব্যরোগে পেল নাকি? একটা শুঁটকি কালটি মেয়ে...।

আবার!

আচ্ছা বাবা আচ্ছা। আর বলব না।

জুলিকে তুই ভুল বুঝিস না রে। ওর মতো মেয়ে হয় না। ও কখনওই খুন করতে পারে না।

সুজয় চাঁদুর সুটকেশটা হাতে নিয়ে গেট পার হয়ে বাইরে এল। তারপর একটা রিকশায় চেপে পাশাপাশি বসল দু'জনে। বলল, বেশ, তা না হয় না করল। কিন্তু গেল কোথায় মেয়েটা?

সেইটাই তো রহস্য।

আমার মনে হয় কী জানিস, রাজুটা তো ডেঁপো ছেলে। প্রথমে ভাল ব্যবহার করে পরে নিশ্চয়ই আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওকে ভয়টয় দেখিয়েছে। আর জুলি তখন ওর অস্ত্রেই ঘায়েল করেছে ওকে। তারপর পালিয়েছে।

আমি কিন্তু ও-কথা একদম ভাবছি না। তুই জানিস না সুজয়, রাজুর গায়ে কী অসম্ভব জোর। রতন আমি দু'জনে মিলে একবার ওকে পেটাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছি। তা ছাড়া হাওয়াপুকুর তো ওখান থেকে অনেক দূরে। সেখান পর্যন্ত জুলিকে ও নিয়ে যাবে কী করে?

তা হলে কী বলতে চাস তুই?

আমার মনে হয় রাজুর এই ব্যাপারটা প্রি-প্ল্যানড মার্ডার। জুলিটা ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছে। আসলে রাজুকে যারা মার্ডার করেছে, তারাই কিডন্যাপ করেছে জুলিকে।

কী বলছিস তুই?

ঠিকই বলছি। আর এই সংকটমুহূর্তে মেয়েটাকে যেখানে উদ্ধার করবার জন্য খোঁজখবর নেওয়ার দরকার সেখানে আমার বাবা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে সরিয়ে দিলেন।

তুই থেকেই বা কী করতিস? গোয়েন্দাগিরি? বই পড়ে সবাই কি পাণ্ডব গোয়েন্দা হয়? না হওয়া যায়?

তা কেন? তবে চেষ্টা করবার মানসিকতা তো আসে? আর সেইজন্যই তো বই পড়া। না হলে বই পড়বার প্রয়োজনীয়তাই বা কী?

পরের ব্যাপারে বেশি মাথা না-ঘামানোই ভাল।

ঘামাতাম না রে। যদি না মেয়েটাকে আমি নিজে পকেট থেকে টাকা বার করে কচুরি কিনতে পাঠাতাম। ওর মা-ও তো এখন ভাবতে পারে যে, এইরকম একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটবে জেনেই আমি অসময়ে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম বা ওকে কচুরি আনতে পাঠিয়েছিলাম। অর্থাৎ ওই দুষ্টুচক্রের চক্রীদের মধ্যে আমিও একজন।

সুজয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হুঁ। এরকম অবশ্য উনি ভাবতে পারেন। ভাবাটা অন্যায় নয়।

রিকশা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানদিকে বেঁকে রেল কোয়ার্টারের দিকে এগোতে লাগল। কী সুন্দর এলাকাটা। পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। সাজানো গোছানো। এখানকার রাস্তাঘাট এবং পরিবেশ দেখে প্রথমদর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গেল চাঁদু। সুজয়রা এখানে কী সুখেই না আছে।

রিকশা ওদের কোয়ার্টারের সামনে আসতেই ওর মা-বাবা হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন, এসো বাবা, এসো। আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

সুজয়ের বাবা-মাকে প্রণাম করে ঘরে ঢুকল চাঁদু। ওইটুকু সময়ের মধ্যে কত কথাই না হল।

সুজয়ের মা বললেন, কী সব আজকালকার ছেলেমেয়ে বাবা। কতই বা বয়স— এর মধ্যেই খুনখারাপি!

বাবা বললেন, কিন্তু মেয়েটা গেলই বা কোথায়? ও না-পালালে তো তোমাকে কেউ সন্দেহ করত না।

চাঁদু বলল, সন্দেহ তো করেনি কেউ। তবে কালচক্রে ঘটনাটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি আমি।

সুজয় বলল, আসতে-না-আসতেই এসব কথা কেন? ওসব এখন ভুলে যাও। ওই প্রসঙ্গে কোনও আলোচনাই কেউ কোরো না তোমরা।

চাঁদু প্রথমেই বাথরুমে গিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। তারপর

গাড়িতে পরে আসা জামাপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরল।

এক বিদ্যুৎবর্ণা কিশোরী এসে লাজুক লাজুক মুখে দু' কাপ চা আর টোস্ট এনে ওদের সামনে রাখল। তারপর চাঁদুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই বাধা দিল চাঁদু, এ কী! আমাকে প্রণাম করছ কেন?

মেয়েটি বলল, তাতে কী হয়েছে?

সুজয় বলল, এ কে জানিস? আমরা মামাতো বোন গোলাপ। খুব ভাল মেয়ে। দারুণ স্মার্ট। এ বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এইট থেকে নাইন।

চাঁদু বলল, এইবার মনে পড়েছে। যদিও ওকে দেখিনি এর আগে। তবে তোর মুখে ওর কথা অনেকবার শুনেছি। ওরা ধানবাদে থাকত না?

এখনও থাকে। মামা-মামি এসেছিলেন। ওঁরা চলে গেছেন, ও আছে। থাকবে এখানে মাসখানেক। খুব সময়ে এসে পড়েছিস তুই। তিনজনে দাপিয়ে বেড়াব চারদিক। আজকের দিনটা যাক। কাল থেকে প্রথমেই শুরু করব সিনেমা দেখা।

সে কী! তোর মা-বাবা কিছু বলবে না?

এখানে কেউ কিছু বলে না। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি সবাই সিনেমা দেখে এখানে। ঘরে ঘরে টিভি। সবাই বুঝে গেছে এসবে ছেলেমেয়ে খারাপ হয় না! গোলাপ কি সিনেমা কম দেখে? তবুও ক্লাসে ফার্স্ট হয়। আসলে পড়াশুনাটা হল মেধার ব্যাপার! ও যার আছে তার কোনও কিছুতেই আটকাবে না। আমার তো মনে হয় যারা যত বেশি শাসনে থাকে তারা তত বেশি খারাপ হয়।

চাঁদু বলল, ওখানে একদম সিনেমা দেখতে পাই না রে। টিভিই দেখতে পাই না বাড়িতে। অথচ কত দামি কালার টিভি বসানো আছে বড়ঘরে। টিভি শুরু হলে আর ঘরে ঢোকবার উপায় নেই আমার।

এখানে ওসব নেই। দেখবি কী সুন্দর সব সাজানোগোছানো সিনেমা হল। ওরকম হল হাওড়া, কলকাতায় একটাও নেই। হল দেখলেই মাথা ঘুরে যাবে। সিনেমা দেখা তো দূরের কথা।

গোলাপ ওদের জলখাবার দিয়ে চলে গেল।

এরপর মাসিমা এলেন আরও কত খাবার নিয়ে। শিঙাড়া, জিলিপি, লাড্ডু, প্যাঁড়া— কত কী।

চাঁদু তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল।

খাওয়া হলে সুজয় বলল, চল তোকে আমাদের রেলওয়ে কলোনিটা ঘুরিয়ে আনি। এই কলোনির জন্যেই বিলাসপুর বিখ্যাত। কত রকমারি বাংলো আর কোয়ার্টার যে আছে এখানে তা দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। আর দেখবি নানান জাতের মানুষের মেলা। আসলে এই জায়গাটাকে মানুষের চিড়িয়াখানা বলতে পারিস।

সুজয়ের কথা শুনে হাসল চাঁদু। বলল, কী সব আবোল-তাবোল বকছিস! চল কোথায় নিয়ে যাবি।

ওরা যখন বেরোচ্ছে তখন পাকা গিন্নির মতো গোলাপ এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। বলল, খুব বেশি দেরি কোরো না যেন। কত দূর থেকে এল ছেলেটা, আসতে-না-আসতেই তাকে নিয়ে চলল।

ছেলেটা অর্থাৎ চাঁদু।

সুজয় বলল, ছেলেটা তুই কাকে বলছিস? ও তোর চেয়েও দু' বছরের বড় তা জানিস?

গোলাপ চোখে তারায় ঝিলিক মেরে বলল, জানি। আমার বুড়ো দাদুর বয়সি তো নয়? বলে একবার তাকাল চাঁদুর দিকে। তাকিয়ে বলল, আপনার বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ঘরের কথা ভুলে যাবেন না যেন। কাল সারারাত ট্রেন জার্নি করেছেন। আজ একটু সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বেন। না হলে শরীর খারাপ করবে । বিলাসপুরের রেল কলোনি একদিনে ঘুরে দেখার নয়।

সুজয়ের সাইকেল ছিল। সেই সাইকেলে চেপেই ওরা চলল পথপরিক্রমায়। চাঁদুকে সামনের রডে বসিয়ে ডবল ক্যারি করতে লাগল সুজয়। যেতে যেতেই বলল, এই যে আমার মামাতো বোনকে দেখলি। কী সুন্দর মেয়ে বল তো? অত ভাল চোখমুখের গড়ন, ফর্সা গায়ের রং সচরাচর দেখা যায় না। গোলাপ তো, গোলাপ। যেন সত্যিকারের একটি গোলাপ ফুল। তেমনি লেখাপড়ায়। অথচ ওর মধ্যে কোনও অহংকার নেই। কত সহজে মানুষকে আপন করে নেয় ও, তা ভাবতেও পারবি না। তুই আসবি শুনে আনন্দে কী যে করবে তার ঠিক নেই । ওইটুকু মেয়ে। রান্নার কাজ থেকে সব কাজই শিখেছে ও । বাপের একমাত্র মেয়ে। আদরিণী কিন্তু গরবিনী নয়।

চাঁদু বলল, সেটা আমাকে যখন প্রণাম করতে এল তখনই বুঝেছি। আজ পর্যন্ত আমার পায়ে কেউ হাত দেয়নিরে। এই প্রথম ও দিল।

যেহেতু তুই আমার বন্ধু।

অনেক দুঃখ, বেদনা আর বিবেকের দংশন নিয়ে তোর এখানে এসেছিলাম। মনে হচ্ছে ক'টা দিন এখানে ভালই কাটবে।

তুই না এলে আজই আমরা অমরকণ্টক যেতাম। মা, আমি আর গোলাপ। তোর বাবা দুপুরে ফোন করতেই যাওয়া বাতিল করে দিলাম। ঠিক হল তুই এলেই যাব। তবে মা হয়তো নাও যেতে পারেন। এখন তুই, আমি আর গোলাপ, এই তিনমূর্তিতে তোলপাড় করব চারদিক।

কেন মাসিমা যাবেন না কেন?

আসলে গোলাপ আমাদের কাছে যতই ছোট হোক, তবু বয়সের মেয়ে তো।

চোদ্দো বছর বয়স হল। তাই একা আমার সঙ্গে ওকে পাঠাতে মা ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। বলা যায় না কখন কী বিপদ ঘটে। এখন তুই এসে পড়ায় আর কোনও দুশ্চিন্তা রইল না।

তা হোক। তবু মাসিমার আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত। মাথার ওপর একজন অভিভাবক থাকলে আমরা শান্তিতে ঘুরে বেড়াতে পারব। না হলে যতই ও আমাদের বোন হোক, তবু অনেকে অনেকরকম ভাবতে পারে। বাইরের লোকের মনে আমাদের সম্বন্ধে কোনও বাজে ধারণা আমরা জন্মাতে দেব কেন?

যা তুই বলবি।

কথা বলতে বলতে ওরা অনেক দূরে চলে এল । কাছেই একটা নদী দেখা যাচ্ছে। নদীতে জল একদম নেই বললেই চলে। শুধু বলি আর বালি। ওরা নদীতে নেমে বালির ওপর রুমাল পেতে বসল।

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। একসময় সুজয়ই বলল, আজ কাল দু'দিন তুই রেস্ট নে। পরশু সকালের ট্রেনে আমরা রওনা হব।

চাঁদু অবাক বিস্ময়ে বলল, কোথায় যাব?

এতক্ষণ তা হলে কোথায় যাবার কথা হল? অমরকণ্টক।

ও। সেখানে বুঝি ট্রেনে করে যেতে হয়?

হ্যাঁ। বিলাসপুর থেকে ইন্দোর এক্সপ্রেসে পেনড্রা রোড নামে একটা স্টেশন আছে, সেখানে যেতে হবে। তারপর পেনড্রা রোড থেকে বাসে অমরকণ্টক। কালিদাসের মেঘদূতে যে মেকল পর্বতের নাম আছে, সেই মেকল পর্বতই হল অমরকণ্টক। ওইখানে শোন আর নর্মদার উৎস। ভারী মনোরম জায়গা।

চাঁদু বালিতে আঁচড় কাটতে কাটতে অন্যমনস্ক ভাবেই বলল একসময়, তোদের এখানে বাংলা খবরের কাগজ পাওয়া যায় না?

কেন যাবে না? কালকের কাগজটা আজকে পাবি।

কালকেরটা তো দেখা।

আজকের কাগজ পাবি কাল সকালে।

আমাকে একটা কাগজ জোগাড় করে দিস তো কাল। আনন্দবাজার আনবি।

আমাদের বেঙ্গলি ক্লাবে সব কাগজই যায়। তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। সেখানেই দেখে নিবি তুই।

চাঁদু আর কোনও কথা না-বলে দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

সুজয় বলল, তুই আসলে জুলির ব্যাপারটা একদম মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিস না, নারে?

ঠিক তাই। আমার মনের ভেতরটা যে কী হচ্ছে সুজয় তোকে কী বলব?

আমার কী মনে হচ্ছে জানিস, মনে হচ্ছে এখুনি যে কোনও একটা ট্রেন ধরে হাওড়ায় ফিরে যাই। তারপর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকি কোথাও, আর ভেতরে ভেতরে খোঁজখবর লাগাই।

সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু তাতে লাভ?

হয়তো কোনও-না-কোনও সূত্র ধরে রাজুর হত্যাকারীর সন্ধান পাব। আর জুলিরও যদি ওইরকম কোনও মর্মান্তিক পরিণতি না হয়ে থাকে, তা হলে জুলিকেও উদ্ধার করতে পারব।

তোর কি মনে হয় জুলি বেঁচে আছে?

নিশ্চয়ই। না হলে ওর ডেড বডিটা তো পাওয়া যেত।

আমি বলি কী, তুই এক কাজ কর। যা হবার তা হয়ে গেছে। দু'-চারদিন এখানে বসে খবরের কাগজগুলো লক্ষ কর। তারপর কী করবি-না-করবি সিদ্ধান্ত নে। ইতিমধ্যে পুলিশ যদি এই ব্যাপারে কোনও কিনারা করতে পারে তা হলে তো কথাই নেই। না হলে যা মন চায় করিস। তবে যাবার আগে তোর বাবাকে কিন্তু জানিয়ে যাস।

বাবা জানতে পারলে আমাকে যেতেই মানা করবেন।

উনি কিন্তু আমাদের ওপর ভরসা করেই ছেড়ে দিয়েছেন তোকে। এখন ওইসব গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে তোর যদি কোনও বিপদ হয়, তা হলে আমরা তাঁর কাছে কী কৈফিয়ত দেব বল?

কোনও বিপদই হবে না আমার।

না হোক। তবু আমাদের স্বার্থে একাজ তোকে করতেই হবে ভাই।

চাঁদু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, বেশ। তাই হবে। বাড়িতে ফোন করেই আমি উধাও হয়ে যাব। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কেউ কিছুই জানবে না। কাউকে কিছু জানাবও না।

ওরা যখন নদীর বালিতে বসে এইরকম সব আলোচনা করছে, তেমন সময় একজন লোক স্কুটার নিয়ে ধুলোবালি উড়িয়ে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় কেন যেন এক রহস্যময় চোখে তাকিয়ে গেল ওদের দিকে।

চাঁদু বলল, লোকটা কে রে? চিনিস তুই?

না। তবে চেনা চেনা লাগছে?

আমারও কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। কেবলই মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি।

আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।

কীসের ভয়?

তোর পিছনে সি আই ডি লাগেনি তো?

চাঁদু ঘাড় নেড়ে বলল, না। তারপর বলল, সি আই ডি-দের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে আমার পিছনে লাগতে যাবে। তা ছাড়া বাবা ওদিকটা সামলে নিয়েছেন।

তা হলে?

এমনি কেউ হতে পারে।

সুজয় বলল, যেই হোক। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল দেখি?

চাঁদু বলল, আর একবার যদি এসে পড়ে লোকটা, ফের ওইভাবে তাকায়, তা হলে দেব ওর চোখের মধ্যে বালি পুরে।

সুজয় লাফিয়ে উঠল, তোর সাহস তো কম নয়। গায়ের জোরে পেরে উঠবি তুই ওই লোকটার সঙ্গে?

খুব পারব। চোখে ধুলো পড়লে সবাই অন্ধ হয়। গায়ের জোর তখন কোন কাজে লাগবে শুনি?

এমন সময় স্কুটারে চড়া লোকটি আবার ওদের দিকে এগিয়ে এল। বেশ ভারিক্কি এবং বলিষ্ঠ চেহারার লোক। লোকটি ওদের দিকে তাকিয়ে স্কুটার থেকে না-নেমেই বলল, তোমার নাম চাঁদু না?

হ্যাঁ, ভাল নাম চন্দ্রকান্ত।

এখানে বসে কী করছ?

দেখতেই তো পাচ্ছেন এমনি বসে আছি।

ও ছেলেটি কে?

এত সব কথা জানবার কোনও অধিকার আপনার আছে কি?

লোকটি হেসে বলল, মনে হচ্ছে এখানকার বি এস আই-এর ছেলে।

সবই তো জানেন দেখছি। কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারলুম না তো?

আমাকে চেনার অসুবিধে আছে ভাই। আমাকে না চেনাই ভাল।

তা হলে কেটে পড়ুন এখান থেকে।

কেটে তো পড়বই। কিন্তু তোমার বাবা হঠাৎ এত ভয় পেয়ে তোমাকে সরিয়ে দিলেন কেন?

সে কথাটা আমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

খবরটা পেয়েই সকাল থেকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে।

চাঁদু বলল, আপনি মাথামোটা লোক তাই অযথা এত পরিশ্রম করলেন। সকালে বম্বে মেলের সময়ে স্টেশনে গেলেই তো দর্শন পেতেন আমার।

হ্যাঁ আমি খবর পেয়ে যখন স্টেশনে গেলাম বম্বে মেল তখন রায়পুরে পৌঁছে গেছে।

এখন আপনি কী করতে চান?

আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে দু'জন লোক আজই মধ্যরাতে বিলাসপুরে এসে পৌঁছুবে। সম্ভবত ওরা গীতাঞ্জলিতে আসছে। কাজ হাসিল করলেই প্রচুর অর্থ পাবে ওরা।

শিউরে উঠল চাঁদু, সত্যি! কিন্তু আমার অপরাধ? আমি তো ওদের কোনও ক্ষতি করিনি। ওদের কেন, কারও ক্ষতিই করিনি আমি। তা হলে?

বাঃ রে। কেষ্ট মিত্তির তার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবে না?

কেষ্ট মিত্তিরের ছেলের খুন হওয়ার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

রাগটা তোমার বাবার ওপর।

আমার বাবাও তো খুন করেননি।

করাতে তো পারেন।

না। আমার বাবা এ কাজ করতে পারেন না।

জুলিও পারে না।

আপনি চেনেন জুলিকে?

তোমাকেও চিনি, তোমার বাবাকেও চিনি। যাক। আমার কাজ শেষ। তোমাকে যে খুঁজে পেয়েছি এতেই আমি খুশি।

জুলি এখন কোথায়? আপনি যখন সবই জানেন তখন দয়া করে একবার বলুন না সে কোথায়? আমি ওকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। তারপর খুন হই, যা হই কোনও কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

লোকটি স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে বলল, আমার সময় খুব কম। আজই রাত্রের মধ্যে যেখানে হোক পালিয়ে যেয়ো তুমি। শুধু বাড়ি যেয়ো না। গেলেই বিপদ। বিলাসপুরেও থেক না।

পালিয়ে কোথায় যাব একটু বলে দিন না?

কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়। ইন্দোর ভূপাল জব্বলপুর ইটারসি যে দিকে হোক কেটে পড়ো। আচ্ছা চলি। বাই বাই।

লোকটা চলে যেতেই লাফিয়ে উঠল সুজয়। বলল, এ যে রীতিমতো নাটক জমে উঠল রে ভাই।

তাই তো দেখছি।

ওরা পায়ে পায়ে বালি হেঁটে ওপরে বাঁধে উঠে সাইকেল নিয়ে চলে গেল। দু'জনের কারও মুখে আর একটুও কথা নেই।

চার

থমথমে মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরল দু'জনে। দু'জনেরই চোখেমুখে আতঙ্ক। মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা। কে এই রহস্যময় লোক? সে কি সত্যিই কোনও হিতৈষী? নাকি ওকে পথে বার করে সহজে গুম করবার কোনও অভিনব ফন্দি এঁটেছে?

মা বললেন, কী রে! এত দেরি করলি কেন?

সুজয় বলল, দেরি কোথায় মা?

সেই কখন গেছিস বল তো?

চাঁদুকে রেল কলোনিটা ঘুরিয়ে দেখালাম। নদী দেখাতে নিয়ে গেলাম।

তাই বল। এবার চানটান করে নে দেখি? খেয়েদেয়ে ছেলেটা একটু ঘুমোক।

ওদের ভাবান্তর গোলাপের নজর এড়াল না। সে তেলের বাটি আর তোয়ালে এগিয়ে দিতে এসে চাঁদুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কী ব্যাপার! হঠাৎ কী হল আপনাদের? কারও মুখে হাসি নেই, কিছু নেই। গম্ভীর গম্ভীর ভাব।

সুজয় চোখ টিপে দিল চাঁদুকে।

চাঁদু তবুও মরা চাঁদের মতো ম্লান হেসে বলল, সে তুমি বুঝবে না গোলাপ, আমার যে কী জ্বালা। কতদিনের আশা ছিল বিলাসপুরে বেড়াতে আসার। কিন্তু সেই আশা এমনভাবে পূর্ণ হল যে আর মনে হচ্ছে না এক মিনিটও এখানে থাকি।

কোনও খারাপ খবরটবর পেলেন নাকি কিছু ?

মাসিমাকে কিছু যেন বোলো না। খুবই খারাপ খবর।

কীরকম তবু শুনি?

হয়তো খাওয়াদাওয়া করেই আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

কোথায় যাবেন?

জানি না।

পাণ্ডুর হয়ে গেল গোলাপের মুখ। সে একবার করুণভাবে সুজয়ের দিকে তাকাতেই মুখ নামিয়ে নিল সুজয়।

চাঁদু খুব তাড়াতাড়ি ব্যস্ততার সঙ্গে স্নানপর্বটা মিটিয়ে নিল। চাঁদুর হলে সুজয় ঢুকল বাথরুমে। গোলাপ অনেক আগে থেকেই শুচিস্নিগ্ধ হয়ে ছিল।

ঘড়ির কাঁটায় দেড়টা।

মাসিমা ডাইনিং টেবিলে খেতে দিলেন তিনজনকেই। তবে চাঁদু ও সুজয় পাশাপাশি বসলেও গোলাপ কিন্তু বসল না। ও নিজেও মাসিমার সঙ্গে পরিবেশনের কাজে হাত লাগাল। কত কী রান্না করেছেন মাসিমা। গোলাপও সহযোগিতা করেছে। সরু চালের ভাত, মাংস, মাছ দু'-তিন রকমের তরকারি, চাটনি।

চাঁদু ও সুজয় ঘাড় হেঁট করে খেয়ে যেতে লাগল। কারও মুখে কথা নেই। গোলাপও নীরব।

মাসিমা বললেন, কী রে তোরা সব এমন বোবা হয়ে গেলি কেন?

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

একটা-দুটো কথাটতা বল? তবে তো ভাল লাগবে। মাংসটা গোলাপ রেঁধেছে। বেশি ঝাল হয়নি তো?

চাঁদু জোর করে মুখে হাসি এনে বলল, খুবই উপাদেয় হয়েছে। মনে হচ্ছে আরও খাই। অনেক খাই।

তা খাও না বাবা। দেব আর একটু?

না মাসিমা। একদম নয়। এত রান্না না হলে আরও খেতাম। অনেক খেতাম।

খাওয়া হলে ঘরের দরজা বন্ধ করে আলোচনা করতে বসল ওরা, চাঁদু আর সুজয়।

সুজয় বলল, তুই তা হলে কী ঠিক করলি বল?

চাঁদু বলল, পালাব। এমনিতেই আমার মন চাইছিল না থাকতে। তার ওপর লোকটা যখন অযাচিতভাবে এসে চলে যাবার কথা বলেই গেল তখন আর অযথা মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?

তা হলে কোথায় যাবি তুই?

ভাবছি অচেনা জায়গায় দূরে কোথাও না গিয়ে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাব।

ও লোকটা কিন্তু বাড়ি যেতে নিষেধ করেছে তোকে।

কিন্তু অচেনা জায়গায় গিয়ে আমি করবটা কী? কোথায় থাকব-না-থাকব এসবের কিছুই তো জানি না আমি। তা ছাড়া অত টাকা-পয়সাও আমার কাছে নেই।

আমি তোকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে পারি।

আমার কাছে দু' হাজার টাকা আছে। তাতেই আমি যেতে সাহস করছি না, তোর ওই পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে?

সুজয় চুপ করে গেল।

ঘড়িতে দুটো বাজল।

সুজয় বলল, কখন যাবি তা হলে?

সন্ধে হলেই যাব। আমি চলে গেলে তারপরে তোর মাকে যা বলার বলবি। আগে কিছু বলিস না যেন। গোলাপকেও কিছু বলার দরকার নেই। আমি এদিক-ওদিক করতে করতে সুট করে কেটে পড়ব একসময়।

ওরা দরজা বন্ধ করে কথা বললেও উৎসাহী গোলাপের কান যে জানালার

পাশে সজাগ হয়ে আছে তা ওরা ভাবেওনি। গোলাপ খুবই সতর্কতার সঙ্গে ওদের কথাবার্তা শুনছিল, এমন সময় মাসিমা ডাক দিলেন, ওখানে জানলার কাছে কী করছিস গোলাপ? আর দেরি না করে খেতে আয়।

গোলাপ ত্রস্তে সরে গেল সেখান থেকে।

পরক্ষণেই মাসিমা এসে ঘরে ঢুকলেন, এ কী শুনছি বাবা? তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

মাসিমা ঘরে ঢুকলেও গোলাপ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

চাঁদু বলল, গোলাপ বলেছে বুঝি?

তোমরা তো বলনি বাবা। কিন্তু চলেই যাবে যদি তা হলে এলে কেন? একটা রাত অন্তত থেকে গেলে হয় না?

গোলাপ বলল, আসলে আমরা তো ওনার সেবাযত্ন করতে পারছি না ঠিক মতো তাই বোধহয় উনি চলে যাচ্ছেন।

চাঁদু বলল, না না। তা নয়।

সুজয়ই এবার সেই ভয়ংকর কথাটা শুনিয়ে দিল মাকে। বলল, ওর চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই মা। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস রাত বারোটা নাগাদ এখানে আসবে। তারপরে আর একটা মুহূর্ত ও যদি এখানে থাকে, তা হলে খুন হয়ে যাবে ও।

মা দু'হাতে কানঢেকে শিউরে উঠলেন, চুপ চুপ! আর বলিস না। কী সাংঘাতিক কথা! শিগগির তোর বাবাকে ফোন কর।

কাউকে কিছু করবার দরকার নেই। কাকপক্ষীতে টের পাবার আগে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পালাতে হবে ওকে।

কোথায় যাবে ও?

সেটা ওকেই ঠিক করে নিতে হবে। এমনকী বাড়িও যেতে পারবে না বেচারি। ওর মৃত্যুদূতেরা সেখানেও অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

গোলাপও এবার ছুটে ঢুকে এল ঘরের ভেতর। বলল, একথা তোমরা এতক্ষণ বলনি কেন?

সুজয় বলল, এ কী পাঁচকান করবার কথা রে? ভেবেছিলাম কাউকে না জানিয়েই চুপি চুপি পাঠিয়ে দেব ওকে।

গোলাপের চোখে জল এসে গেল এবার। বলল, চাঁদুদা ছেলেমানুষ। একা উনি কোথায় যাবেন? এইভাবে ওনাকে কি ছেড়ে দেওয়া যায়? বিশেষ করে এই বিদেশবিভুঁয়ে?

ছেড়ে যে দিতেই হবে বোন। ও যেখানে হোক চলে যাক। তারপর সুবিধেমতো সেখান থেকে ফোন করে ওর বাড়িতে যোগাযোগ করুক। এবার ওর বাবা-মা যা ভাল বুঝবেন করবেন।

আমি বলি কী, তুমিও ওর সঙ্গে যাও।

মাসিমা বললেন, না না। তা হয় না। সুজয়কে আমি কাছ ছাড়া করতে পারব না। কার কোপ কার ঘাড়ে পড়ে কেউ কি তা বলতে পারে? এই জ্বালে আমার ছেলেকে আমি কিছুতেই জড়াতে দেব না।

চাঁদু বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন মাসিমা। আমার সময় এখন খারাপ। কখন কী হয় তা বলা যায় না। আমি চলে গেলেও আমার খোঁজে ওরা হয়তো এখানে আসবে। তখন কী যে হবে তা ভগবানই জানেন। সুজয়কে আপনি একটু সাবধানে রাখবেন। পারলে আশপাশের কারও বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।

কী বললে? এখানে আসবে? তোমার খোঁজে? সর্বনাশ। তোমাকে না-পেয়ে যদি ওরা সুজয়কে পায়?

সেই জন্যেই তো বলছি ওকে একটু সাবধানে রাখবেন।

তুমি আর সন্ধের জন্য অপেক্ষা কোরো না। এখুনি চলে যাও। তোমার বাবা তোমাকে পাঠাবার আর জায়গা পেলেন না, এইখানে পাঠালেন। আর কোথাও কি কেউ ছিল না তোমাদের?

সুজয় বলল, মা।

গোলাপ বলল, এসব কী যা তা বলছেন আপনি? তা ছাড়া সন্ধে হতে আর দেরিই বা কত? দিনের আলোয় পাঁচজনকে দেখিয়ে কোথায় যাবেন উনি?

যে চুলোয় হোক যাক। এখুনি বিদেয় হতে বল ওকে।

অপমানে, দুঃখে পায়ের তলার শেষ মাটিটুকুও যেন সরে যেতে লাগল চাঁদুর। এই সুজয়ের মা। এদের এখানে আসবার জন্যই এতদিন ধরে মনে মনে এত রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল ও? সত্যি, বিপদে না-পড়লে মানুষকে চেনা যায় না। এই জন্যেই বাবা বলেন, কখনও কারও আশ্রয়ে উঠতে নেই। তা সে যত আপনজনই হোক।

সুজয়ের মাকে প্রণাম করে চাঁদু বলল, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি মাসিমা। আমি চাই না আমাকে ঘিরে আপনাদের পরিবারে কোনও বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসুক। বলে চকিতে নিজের ব্যাগটাকে গুছিয়ে নিয়ে সুজয়কে বলল, আসিরে সুজয়।

সুজয় বলল, সাবধানে যাস।

এরপর গোলাপের কাছে এসে বলল, সুজয়ের মুখে তোমার কথা আমি অনেক শুনেছিলাম। দেখবার ইচ্ছেও ছিল তোমাকে। দেখা হল। এখন আসি কেমন?

মৌন গোলাপের ডালিমের মতো গালদুটি বেয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল মুক্তোর মতো ঝরে পড়ল। সে একভাবে চেয়ে রইল ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

সুজয়ের মা বললেন, ওর জন্যে তোর চোখে জল কেন? ও কে তোর? নিজের দাদা নয়, কিছু নয়, কোনও আত্মীয়স্বজনও নয়। ন্যাকামো।

গোলাপ চোখের জল মুছে বলল, পিসিমা। আপনি শুধু সুজয়দার কথাটাই চিন্তা করলেন। ওই খুনিরা এলে আমারও যে কী বিপদ হতে পারে কই একথা তো একবারও ভাবলেন না? আর চাঁদুদা আপনার নিজের ছেলে না হলেও আর এক মায়ের ছেলে তো সে। নিজের স্বার্থের কথা ভেবে তাকে আপনি এইভাবে ঠেলে দিলেন ঘাতকের মুখে?

সুজয় বলল, তুই এবার খেয়ে নে গোলাপ।

আমার খিদে নেই। তা ছাড়া আজ রাতে যদি কোনও গোলমাল হয় তাই আমিও আর এখানে থাকতে সাহস পাচ্ছি না। আমি আজই রাতের ট্রেনে যে কোনও গাড়িতে কলকাতায় যাব। বাবা-মা'র জন্যে ভীষণ মন খারাপ করছে আমার। এখন ভাবছি সেদিন ওদের সঙ্গে চলে গেলেই হত।

তুই চলে যাবি! বিনা রিজার্ভেশনে একা একা?

সব গাড়িতেই লেডিজ কম্পার্টমেন্ট থাকে। মেয়েদের অসুবিধে কোথায়? তা ছাড়া টাকা ফেললে একটা বার্থ কোনও-না-কোনও গাড়িতে মিলেও যেতে পারে।

কলকাতা যাবার কোনও গাড়ি আছে এখন?

জানি না। যে গাড়ি পাব তাতেই উঠব।

গোলাপও আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জিনিসপত্তর গোছাতে লাগল ওর। ওকে দেখে মনে হল বয়সে ছেলেমানুষ হলেও মনের দিক থেকে ও যেন অনেক বড় হয়ে গেছে।

পাঁচ

মৃত্যুভয় যে কী সাংঘাতিক তা যে না পেয়েছে তাকে বোঝানো যাবে না। রাস্তায় নেমেই চাঁদু টের পেল ওর মতো অসহায় বুঝি আর কেউ নেই। এই দূরদেশে একা ও কোথায় যাবে? যে লোকটি এত বড় একটা খবর দিয়ে সাবধান করল ওকে, সেই বা কে? অজ্ঞাত আততায়ীরা এসে চাঁদুকে খুন করলে তার কী এসে যেত? শুধু তাই নয়, সে বলল, ওকে, ওর বাবাকে সবাইকেই নাকি চেনে। এমনকী জুলিকেও। লোকটি তা হলে কে? আর লোকটিকে চিনতে না পারলেও চেনাচেনা লাগছে। কিন্তু মনে করতে পারছে না কিছুতেই।

চাঁদু প্রথমেই নির্জন পথ এড়িয়ে জনারণ্যে মিশে গেল। ওরা নাকি মধ্যরাতে

গীতাঞ্জলিতে আসবে। কিন্তু তার আগেই যদি এসে পড়ে? এখনও যদি এসে থাকে? ওরা এই ভিড়েও ওকে লক্ষ করছে না তো? না কি এ সবই লোকটার চাল? তবে লোকটি যে মিথ্যে বলছে এমন বলেও মনে হল না। কিন্তু ও কিছুতেই ভেবে পেল না কোথায় যাবে এখন। বাড়ি যেতে পারলে সব থেকে ভাল হত। অথচ বাড়ির দিকে যাওয়া মানেই মরণকে বরণ করা। তাই জুলির থেকেও নিজেকে রক্ষা করার চিন্তাটাই ওকে পেয়ে বসল বেশি।

ও পায়ে পায়ে স্টেশনে এল।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে তখন। টিকিটঘরের সামনে এসে একবার চুপ করে দাঁড়াল। কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন। কোন ট্রেন কোনদিকে যাচ্ছে, কোথায় কীভাবে যেতে হয় কিছুই তো জানে না ও। তাই উদ্দেশ্যহীনভাবে ও যখন নানারকম ভাবতে ভাবতে পায়চারি করছে তেমন সময় হঠাৎই একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর ওর কানে এল, চাঁদুদা!

কে?

চাঁদু ঘুরে তাকিয়েই অবাক। দেখল একটা কাঁধে ঝোলাব্যাগ নিয়ে কোথায় যেন যাবার জন্য তৈরি হয়েই এসে হাজির হয়েছে গোলাপ। বলল, কী ব্যাপার। তুমি এখানে?

ছল ছল চোখে গোলাপ বলল, আমিও চলে এলাম। যে ভাবে ওরা আপনাকে তাড়িয়ে দিল তাতে খুবই খারাপ লাগল আমার।

তা তো এলে । কিন্তু এই রাতদুপুরে তুমি যাবে কোথায়?

আমি বাড়ি ফিরে যাব।

ওরা তোমাকে একা আসতে দিল?

আমাকে ওরা চেনে। আমি যদি যাব মনে করি, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তা ছাড়া আমি তো ঘরকুনো মেয়ে নই। একা একা যাতায়াত আমি করেই থাকি।

সে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। অত্যন্ত স্মার্ট মেয়ে তুমি।

গয়া, দেওঘর, রাজগির, পুরী, বেনারস এসব আমি একাই যেতে পারি।

তুমি বুঝি অনেকবার গেছ ওইসব জায়গায়?

বাবা-মায়ের সঙ্গে বছর বছর গেছি।

তা হলে আমাকে তুমি রাজগির বা বেনারসের কোনও একটা ঠিকানা বলে দাও না গোলাপ। আমি সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকি কিছুদিন। পুরী হলেও মন্দ হয় না।

গোলাপ বলল, আমি একটা কথা বলব চাঁদুদা?

বলো।

আপনি বরং আমাদের বাড়ি চলুন। আমার মা-বাবা খুব খুশি হবেন আপনাকে দেখে। আমাকেও একা যেতে হবে না। তা ছাড়া আপনি গেলে আমার খুব ভাল লাগবে।

চাঁদু যেন অকূলে কূল পেল এবার। সে গোলাপের হাতদুটি ধরে বলল, গোলাপ। মায়ের মুখে শুনেছিলাম যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। এখন দেখছি সত্যিই তাই। তুমিই আমার ভগবান। একা একা কী খারাপ যে লাগছিল তা কী বলব। এখন তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে বাঁচব। তোমাদের বাড়িতে কয়েকটা দিন থাকতে পেলে আমিও শান্তিতে থাকব। তার পর বাবা এসে যখন নিয়ে যাবেন তখন হাসিমুখে বিদায় নেব তোমাদের কাছ থেকে। এখন দেখো ধানবাদ যাবার গাড়ি কখন আছে।

গোলাপ বলল, ধানবাদ যাবার গাড়ি এখানে কোথায় পাবেন? এখন আমাদের যে কোনও ট্রেন ধরে যেভাবেই হোক যেতে হবে হাওড়ায়। তারপর ওইখান থেকে অন্য ট্রেনে ধানবাদ।

হাওড়ার নাম শুনেই মুখ শুকিয়ে গেল চাঁদুর। বলল, এবার তা হলে আর যাওয়া হল না তোমার সঙ্গে।

কেন? কেন?

তুমি তো সবই শুনেছ? হাওড়াতেই যদি যাব তা হলে আর বাড়ি যেতে দোষ কী? মিছিমিছি তোমাদের কষ্ট দিতে যাব কেন? হাওড়ায় গেলেই তো আমি খুন হয়ে যাব।

গোলাপ শিউরে উঠে বলল, না না তা হলে গিয়ে কাজ নেই। এ কথাটা মনেই ছিল না আমার।

তাই বলি তুমি রাজগির, পুরী কিংবা বেনারসে যাবার রাস্তাটা বলে দাও। আমি ঠিক চলে যাব। ওখানে গিয়ে কোথায় থাকব, কী করব যদি জানা থাকে তাও বলো।

গোলাপ বলল, আপনি যেসব জায়গার নাম বললেন, এখান থেকে সেগুলো অনেক-অনেক দূরে। রাজগির বেনারস গেলে প্রথমেই আমাদের হাওড়ায় যেতে হবে। তারপর আবার অন্য ট্রেনে রাজগির, বেনারস। সেও এক রাতের রাস্তা। অর্থাৎ মোট দু' রাতের জার্নি। পুরীও তাই। পুরী গেলে অবশ্য খড়্গপুরে নামলেই চলবে। সেখান থেকে...।

থাক। আর দরকার নেই। তোমাকে হাওড়ার গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি ভাবছি টিকিট না-কেটে যেখানে হোক চলে যেতে পারব।

সে কী। চেকার এসে ধরলে অনেক টাকা ফাইন দিতে হবে তা জানেন? তার ওপর গাড়ি যেখান থেকে আসছে সেইখান থেকে ভাড়া দিতে হবে।

না দিতে পারলে?

জেল।

জেল থেকে পালানো যায় না?

কী করে পালাবেন? চারদিকে পুলিশের কড়া পাহারা।

চাঁদু যেন অকূলে কূল পেল না এবার। বলল, তা হলে গোলাপ, আমার মনে হয় বিনা টিকিটেই ট্রেনে চাপা ভাল। চেকার ধরলে ভাড়া দেব না। যদিও দু' হাজারের মতো টাকা আছে আমার কাছে। আর ভাড়া না দিলেই জেল। জেলে থাকলে সেখানে তো কেউ আমাকে খুন করতে পারবে না।

গোলাপ বলল, ভারী দুষ্টু বুদ্ধি তো আপনার। তাই যদি মনে করেন তা হলে সোজা এখানকার থানায় গিয়ে সব কথা খুলে বললেই তো হয়।

এমন সময় অচেনা একটি ছেলে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন তোমরা? সবাই দেখছে যে?

চাঁদু বলল, কে তুমি?

তোমার বন্ধু। শিগগির পালাও! গা ঢাকা দাও। ভূপাল এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি ছাড়বে। ওইতে চেপে ভূপালের দিকেই পালাও।

চাঁদু ভয়ে ভয়ে বলল, ভূপাল কী করে যাব?

ওই গাড়িতে চেপেই যাবে। পেনড্রা রোড, অনুপপুর, কাটনি হয়ে যাচ্ছে ট্রেন। সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস ওটা। লেট গাড়ি, এক্ষুনি ছাড়বে। চলে যাও।

টিকিট কাউন্টরে তখন অনেক ভিড়। তাই না দেখে গোলাপ ওর ঝোলা ব্যাগটা চাঁদুর কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে ছুট্টে চলে গেল টিকিট কাটতে। লেডিজ কাউন্টার একেবারে ফাঁকা। ও গিয়ে দুটো টিকিট কেটেই চাঁদুর হাতে টান দিয়ে বলল, চলে আসুন।

ওরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই দেখল ট্রেন ছাড়ার সিগন্যাল হয়ে গেছে। দু'জনে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে একটা কামরার হাতল ধরে কোনওরকমে ভেতরে ঢুকতেই একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট হা হা করে ছুটে এলেন, ইয়ে থ্রি-টিয়র হ্যায়। ইসমে মাত চড়িয়ে।

গোলাপ বলল, আমরা মাত্র দুটো স্টেশন যাব।

লেকিন ইয়ে গাড়ি তুমহারে লিয়ে নেহি। ইয়ে সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস। একশো চার রুপিয়া নিকাল। তুমকো জুরমানা দেনে পড়েগা।

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে।

চাঁদু বলল, আমাদের কাছে কোনও রুপিয়াই আর নেই।

অ্যাটেনডেন্ট গজ গজ করতে করতে চলে গেলেন।

অত্যন্ত দ্রুতগামী ট্রেন। ছাড়ার পরই ভয়ংকর গর্জনে অজগরের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটতে লাগল ঝড়ের বেগে!

চাঁদু বলল, এটা কী হল?

গোলাপ বলল, কীসের কী হল?

আমরা এই গাড়িতে যাচ্ছিটা কোথায়? তা ছাড়া তুমি তো বাড়ি যাচ্ছিলে?

যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে পারলাম কই? আপনার এই অসহায় অবস্থার কথা আর কেউ না বুঝুক আমি তো বুঝি। তা ছাড়া এখনই আমার কলকাতা যাওয়ার ট্রেন না-ও থাকতে পারে। তাই আমার বিশেষ পরিচিত একটি জায়গাতেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে আপনাকে রেখে তবেই বাড়ি ফিরব আমি। অবশ্য এখন আমার বাড়ি ফেরবার তাড়াও নেই। শুধু বাবাকে একটা ফোন করে দেব, তা হলেই হবে।

কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এলে, তোমার বাবা যদি রাগ করেন? আমি তো তোমাদের কেউ নই।

এক সময় কেউ ছিলেন না ঠিকই। এখন নিশ্চয়ই কেউ। না হলে আমিই বা এলাম কেন আপনার সঙ্গে? দু'-এক বছরের তো ছোটবড় আমরা। ভাইবোনও হতে পারি। বন্ধুও হতে পারি।

তুমি কোনটা হতে চাও বলো?

আমি শেষেরটাই চাই।

আমিও। বন্ধুত্বের সম্পর্ক হলে মেলামেশায় কোনও জড়তা থাকবে না। ভাইবোনের মতো পবিত্র বন্ধন থাকবে। অথচ ব্যবহার হবে বন্ধুর মতো।

না হলে দাদাগিরির মধ্যে একটা কেমন যেন গাম্ভীর্য এসে যায়।

তা যদি হয় তা হলে কিন্তু এখন থেকে আর আপনি নয়। তুমি আমাকে তুমিই বলবে।

গোলাপ মিষ্টি হেসে বলল, তাই বলব।

এখন বলো তো এই রাতদুপুরে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

আমরা যাচ্ছি অমরকণ্টক। কালিদাসের মেঘদূতের সেই মেকল পর্বতে। ওখানে বরফানিবাবার আশ্রমে আমরা উঠব। আমার বিশেষ পরিচিত জায়গা। গিরিধারীদাদা নামে একজন আছেন ওখানে। তিনি আমার খুবই পরিচিত। দরকার হলে উনি নিজে সঙ্গে করে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন আপনার বাড়িতে।

তুমি কিন্তু শর্ত ভুলে যাচ্ছ গোলাপ। আমাকে আবার আপনি বলছ।

আয়্যাম ভেরি স্যরি ব্রাদার।

ব্রাদার!

নিশ্চয়ই। যতই আমরা বন্ধু হই না কেন। সুজয়দার বন্ধু তো আপনি। না না, আপনি নয়, তুমি।

চাঁদু বলল, তুমি সঙ্গে আছ বলে এখন কিন্তু আমার আর কোথাও যেতে ভয় করছে না।

আপাতত বরফানিবাবার আশ্রমটাই তোমার নিরাপদ আশ্রয়। কাল ওখানে পৌঁছে প্রথমেই বাড়িতে একটা ফোন করবে। আমিও করব।

আজ রাতে কোথায় থাকব আমরা?

পেনড্রা রোডেই। ওখানে নর্মদা লজে উঠব আমরা।

ঠিক আছে।

গোলাপ এবার অন্য একটা প্রশ্ন করল, জুলির জন্য তোমার এখনও মন খারাপ করছে চাঁদুদা?

এই মুহূর্তে না করলেও মনে পড়লেই করছে। কোথায় যে তলিয়ে গেল মেয়েটা?

আচ্ছা ধরো, এই মুহূর্তে আমাকেও যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়। তুমি তা হলে কার কথা বেশি ভাববে? আমার কথা, না জুলির?

দু'জনকার কথাই ভাব। তবে ভগবান করুক আর কোনও দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

ট্রেন এসে পেনড্রা রোডে থামল।

রাত্রি তখন আটটা।

স্টেশনের কাছেই নর্মদা লজ। ম্যানেজার খুবই পরিচিত গোলাপের। ওকে দেখেই হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, এ কী দিদিভাই? আউর সব কাঁহা?

গোলাপ মিথ্যে করে বলল, মা-বাবা কালপরশু আসছেন।

এখন কোথা থেকে এলে? বিলাসপুর থেকে?

হ্যাঁ। সেখানে আমাদের এক রিলেটিভের বাড়িতে ছিলাম।

ইনি কে আছেন?

আমার দাদা।

ম্যানেজার তিনতলার একটা ডাবল বেডের রুম খুলে দিয়ে বলল, খানা পিনার কুছু ব্যবস্থা হোবে?

ওমলেট ভাজি আর পুরী।

সবজি কুছ?

নেহি।

মাটন কারি মিলেগা।

লে আইয়ে।

সে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শরীরে অনেক ক্লান্তি নিয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনে।

শুয়ে শুয়ে কত কী চিন্তা করতে লাগল চাঁদু।

গোলাপ বলল, এখন তো নিশ্চিন্দি। এত কী ভাবছ চাঁদুদা?

ভাবছি কী থেকে কী হয়ে গেল। কেষ্ট মিত্তির আমার পিছনে কেন গুন্ডা লাগাল বলো তো? আমার বাবার সঙ্গে ওর দীর্ঘদিনের শত্রুতা তা জানি। তাই বলে আমাকে মেরে বদলা নিতে হবে? সবচেয়ে বড় কথা ওই লোকটিই বা এত সব জানল কী করে? শুধু আমার বা আমাদের কথা নয়। জুলির কথাও। তা ছাড়া ও বিলাসপুরেই বা এল কেন? ওর কি এখানে বাড়ি? কেষ্ট মিত্তিরের ছেলের খুন হওয়ার পিছনে ওর কি কোনও হাত আছে? আমাকে বাঁচানোর জন্যই বা ওর অত প্রয়াস কেন?

গোলাপ বলল, সবই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে না?

আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না গোলাপ।

আর ভাবতে হবে না। চুপ করে শুয়ে ঘুমোও তো দেখি?

ঘুম আসছে না। দুশ্চিন্তা যে কী ভয়ংকর তা আজ বুঝতে পারছি।

গোলাপ বলল, তবু ভাল, ওই অচেনা আগন্তুকরা তোমাকে সাবধান করে দিল। আমার মনে হয় ওরা আর যাই হোক, তোমার হিতৈষী।

হলেই ভাল।

চাঁদু চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। ঘুমিয়ে পড়ল গোলাপও। আঃ কী সুন্দর, নিবিড় গভীর ঘুম। আর তেমনই মধুময় এই পেনড্রার নর্মদা লজ।

ছয়

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল দু'জনার। ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়ল। বেশি তৎপরতা গোলাপের। বলল, আর এখানে থাকা নয়। এখুনি সকালের বাসেই চলে যেতে হবে আমাদের।

অতএব পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে পথে নামা।

পেনড্রা রোড শহরটি খুবই ছোট্ট। স্টেশনের কাছেই বাসস্ট্যান্ড। আবার নর্মদা লজ থেকেও স্টেশন বেশি দূরে নয়। ওরা স্টেশনে আসতেই অমরকণ্টকের বাস পেল। সকালের বাস বলে ভিড় বেশি নেই। বাসে উঠে বসবার জায়গাও পেল। ওরা জানলার ধারে সাইড সিটে বসল দু'জনে। বাস ছাড়লে বাসে বসেই পেনড্রা রোডের যা কিছু দেখবার তা দেখে নিল। কাল রাতের অন্ধকারে কিছুই তো দেখা হয়নি। গোলাপের যদিও এ শহর দেখা, কিন্তু চাঁদুর প্রথম। শহরের দোকানপাটে নানা দ্রব্যের পসারি। পথে অটো, বাস, টাঙ্গা, সাইকেল-রিকশা কী নেই? এমনকী সিনেমা হলও আছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই শহর ছেড়ে পার্বত্যপথে এসে পৌঁছল বাস। তারপর পাক খেয়ে খেয়ে পাহাড়ে ওঠা। ঘন সবুজ গাছপালায় আবৃত পাহাড়ের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল চাঁদু। কী সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য। মাঝে মাঝে বাস থামছে। আর দলে দলে লোক উঠছে। এরা সবাই স্থানীয় অধিবাসী। যাবে নর্মদা তীর্থে। স্নানপুণ্য সঞ্চয়ে। মাঝে মাঝে মনের আনন্দ প্রকাশ করে ধ্বনি দিচ্ছে, নর্মদা মায়ি কী জয়।

বাসে চেপে যেতে যেতে কত হনুমান আর ময়ূর দেখতে পেল ওরা।

গোলাপ বলল, আগে এই পাহাড়ে বুনো বাঘ আর ভালুকের দাপট ছিল খুব। যেসময় এখানে বাস ছিল না সেই সময় পদব্রজে লোক এখানে আসত। কত মানুষ যে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে তখন তার লেখাজোখা নেই। তবে সে ছিল এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা। পাহাড়কে জয় করার, দুর্গম পন্থাকে লঙ্ঘন করার আনন্দই ছিল আলাদা। অরণ্যের ঘ্রাণ নিয়ে বন্য জন্তুদের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা মিতালি করতে করতে সেই পথচলার আনন্দ বাসযাত্রায় কই?

সে পথে তুমি গেছ কখনও?

বাবার মুখে শুনেছি। আমার ঠাকুরদাদা নাকি একবার ওইভাবে এখানে এসেছিলেন। নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন তো উনি। তখনই এসেছিলেন। আমরা যতবার এসেছি, ততবার বাসে। আসলে বাস চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকেই পায়ে হাঁটা পথের মহাপ্রস্থানও হয়ে গেছে।

ওদের পাশে এক সাধুবাবা বসেছিলেন। বললেন, তুম দোনো নর্মদা মায়ি কী দর্শন করনে যা রহে হো?

ওরা বলল, হ্যাঁ।

বহৎ কমতি উমর তুমহারা। তারপর মিষ্টি হেসে বললেন, নর্মদা পরিক্রমা করো গে?

গোলাপ বলল, না। শুধুই দর্শন করব। দু'-একটা দিন থাকব।

সাধু কী যেন দেখলেন, কী যেন বুঝলেন। তারপর বললেন, জিন্দগি ভর তুম দোনো এক সাথ দোস্তিমে রহো। ভগবান করে বিছোড় না হো।

চাঁদু ও গোলাপ আবেগভরা চোখে তাকাল সাধুর দিকে।

সাধুজি বললেন, ক্যা নাম তুমহারা?

চাঁদু বলল, আমার নাম চন্দ্রকান্ত।

গোলাপ বলল, আমার নাম গোলাপ।

সাধু বললেন, ফুল য্যায়সি। তো তুমকো গুলাব নেহি গুলেবকায়লি হোনা চাহিয়ে। ও ফুল নন্দনকানন কা পারিজাত কী মফিক। ও কঁহি নেহি মিলতা। স্রেফ ইধরিসে মিলতা। দেখোগে? হাম তুমকো দিখলায়গা।

সাধুজি বড়ই রসিক। আর অত্যন্ত ভাল মানুষ। ওঁর মুখেই ওরা শুনল নর্মদা কী কহানি।

এক গভীর অরণ্যবেষ্টিত উচ্চ গিরিচূড়ায় শিব ছিলেন কঠোর তপস্যারত। কতদিন, কত বছর, কত যুগ ধরে যে তিনি তন্ময় ধ্যানময় হয়েছিলেন তার হিসেব শিবও রাখেননি। ঠিক এমনিই সময়ে এক শুভক্ষণে শিবের নীলকণ্ঠ থেকে নির্গত হলেন নর্মদা। আবির্ভূতা হয়েই তিনি শিবের দক্ষিণ চরণে দাঁড়িয়ে শুরু করলেন শিবের তপস্যা। সেই তপস্যার প্রভাবে শিবের তপস্যাও টলে গেল। একটু একটু করে চোখ মেলে তাকালেন তিনি। দেখলেন এক অপূর্ব সুন্দরী কুমারী কন্যা তাঁর দক্ষিণ চরণে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই কুমারী তাপসীর ধ্যানভঙ্গ করিয়ে সস্নেহে ডাকলেন তিনি, কে মা তুমি? কন্যা বললেন, আমি যে আপনার নীলকণ্ঠ নিঃসৃতা কন্যা। শিব বললেন, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। কী বর চাও তুমি বলো? কন্যা বললেন, আমি আপনার নীলকণ্ঠ নিঃসৃতা হলেও যেন বর প্রভাবে অমৃতময়ী হতে পারি। শুধু তাই নয়, গঙ্গার মতো মাহাত্ম্য যেন আমারও হয়। আমার সলিলে স্নান করে যেন সর্বপাপমুক্ত হয় মানুষ। শিব বললেন, তাই হবে। শুধু স্নানে নয়, তোমাকে দর্শন করলেও মোক্ষ হবে মানুষের। কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর পরে গঙ্গার মাহাত্ম নষ্ট হলে গঙ্গামাহাত্ম্যও লাভ করবে তুমি। কন্যা বললেন, আমি আরও বর চাই পিতা। শিব বললেন, আরও কী বর চাও তুমি? কন্যা বললেন, আপনার দেহ হতে নির্গত হয়েছি আমি। তাই এমন বর দিন যেন সবসময় আপনার সঙ্গে আমি একাত্ম থাকতে পারি। শিব প্রসন্ন হয়ে বললেন, বেশ। আজ থেকেই তুমি শিব মহিমায় মহিমান্বিত হবে। আমার নিত্যতৃপ্তিবিধায়িনী হয়ে চিরকুমারী থাকবে। তোমার নাম হবে নর্মদা। যেখানে তুমি, সেখানে আমি। তাই তো নর্মদা কী কঙ্কর বিলকুল শংকর।

কাহিনি শুনে অবাক হয়ে গেল দু'জনে।

সাধুজি আবার বললেন, এই নর্মদা হল আটশো মাইল দীর্ঘ। এই দীর্ঘপথে কোথাও পর্বত, কোথাও অরণ্য, কোথাও মরুভূমি, আবার কোথাও বা সমৃদ্ধ জনপদ। আর সেই গতিপথের উভয় তীরেই অসংখ্য শিবের মন্দির।

বাস এসে অমরকণ্টকে থামল।

সবাই নেমে গেলে সব শেষে নামল চাঁদু ও গোলাপ। আর জটাজুটধারী সাধুবাবা।

সাধু বললেন, তোমরা দু'জনেই এসেছে তা হলে? আর কেউ আসেনি?

না।

তোমাদের দেখে বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার। তোমাদের পরিচয়?

গোলাপ বলল, তার আগে বলুন আপনি কি এখানেই থাকেন না তীর্থ করতে এসেছেন?

আমি এখানেই থাকি মা। দুগ্ধধারার কাছে নির্জনে আমার আশ্রম।

আপনি বাঙালি?

একজন যোগী এবং ভারতীয়।

গোলাপ বলল, আমরা নিরাশ্রয়।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

না বাবা, ঠিক তা নয়। এই যে ছেলেটিকে দেখছেন এর জীবন বিপন্ন। ভেবেছিলাম বরফানিবাবার আশ্রমে ওকে লুকিয়ে রাখব কয়েকটা দিন। এখন আপনি যদি একটু কৃপা করেন...।

সাধুবাবা সস্নেহে চাঁদুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, এই কথা। কোনও ভয় নেই তোদের। আয়, আমার সঙ্গে আয়। তবে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে কিন্তু। পারবি তো?

ওরা দু'জনেই বলল, হ্যাঁ পারব।

যেতে যেতেই ওরা ওদের পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলল সাধুবাবাকে। আগাগোড়া সমস্ত কথা।

সাধুবাবা সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, এখানে যখন এসে পড়েছিস তখন আর ভয় নেই। কেউ তোদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। শান্তিতে থাক তোরা। তোদের বাড়িতে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা আমিই করব।

এমন সময় ওদেরই বয়সি একটি ছেলেকে সাইকেলে চেপে নির্জন পাহাড়িপথ ধরে আসতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকলেন সাধুজি, বিরজু! এ বিরজু! জেরা ইধার তো আও।

স্বাস্থ্যবান সুন্দর একটি ছেলে সাইকেল নিয়ে ওদের কাছে এল।

সাধুজি বললেন, এই, তোদের ধর্মশালায় একটা ঘর পাওয়া যাবে রে?

বিরজু ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ পাওয়া যাবে। এখন তো যাত্রী একদম নেই।

তা হলে এই ছেলেমেয়ে দুটোকে ঢুকিয়ে দে তো একটা ঘরে।

বিরজু ওদের দু'জনকে দেখে বলল, আমার মাতাজি রাজি হবেন না। কানুন নেহি।

কাহে কো?

এইরকম বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গার্জেন না থাকলে ঘর দেওয়া যায় না।

তোমার মাজিকো আমার প্রণাম তো দেও। আমি গিয়ে দেখা করছি মাজির সঙ্গে। আর তোমার পিতাজির সঙ্গেও একটু বাতচিত আছে আমার।

বিরজু বলল, ঠিক আছে, তবে ওরা আসুক।

চাঁদু বলল, ধর্মশালা কেন। আপনার আশ্রমে আমাদের নিয়ে যাবেন না বাবাজি?

সাধুজি বললেন, তোদের যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় আমি সেইজন্যেই এইরকম ব্যবস্থা করলাম রে বেটা। আমার আশ্রম এখান থেকে অনেক দূর। তা ছাড়া ওখানে সন্ধের পর বাঘ-ভালুকের উপদ্রব আছে। আর ওখানে থাকলে তোরা খাবার পাবি না। ঘুরে বেড়াতে পারবি না। এই যে ছেলেটি তোদের নিয়ে যাচ্ছে এ তো বড় সাংঘাতিক ছেলে। এই হবে তোদের বডিগার্ড। আমি ওকে সব বলে দেব। রামবাঈ ধর্মশালার কেয়ারটেকার ওরা। কাজেই কোনও অসুবিধে হবে না তোদের।

চাঁদু ও গোলাপ বাবাজিকে প্রণাম করে বিরজুর সঙ্গে চলল।

সাধুবাবা বললেন, আজকের দিনটা বিশ্রাম নে। কোথাও যাস নে যেন। কাল সকালে একবার দেখা করিস।

ওরা বিরজুর সঙ্গে রামবাঈ ধর্মশালায় এসে হাজির হল। খুব একটা উন্নতমানের ধর্মশালা নয়। তবে থাকা যায়। ধর্মশালাটি অমরকণ্টকের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। এর আশেপাশে জমজমাট দোকান পসার হোটেল প্রভৃতি। একপাশে একটু উচ্চস্থানে টিলার ওপর সার্কিট হাউস।

ওরা যেতে ওদের বসিয়ে রেখে বিরজু একটা খাতা নিয়ে এসে ওদের নামধাম লিখে নিল। তারপর একটি ঘর খুলে দিয়ে বলল, সামকো বিস্তারা মিলেগা। আভি তুম সামান রাখো। এহি মে রহো।

বিরজুর মা এসে একবার দেখে গেলেন ওদের।

বিরজু বলল, চায় পিয়োগে? এক এক রুপাইয়া।

গোলাপ বলল, এখন আর চা খাব না। এবার স্নানটান করে ভাত খেয়ে নেব একেবারে।

চাঁদু বলল, খাই না এক কাপ। এমন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার। স্নান খাওয়া আরও একটু বেলা করেই করব।

চাঁদু বিরজুকে চা আনতে বলল।

কিছু সময়ের মধ্যেই দু'জনের জন্য দু' কাপ চা নিয়ে চলে এল বিরজু। ওরা আয়েশ করে তৃপ্তির সঙ্গে চা খেতে লাগল ঘরের ভেতরে বসে।

যে ঘরটিতে ওরা জায়গা পেয়েছিল তার মাটির মেঝে। দেওয়ালও মাটির। মাথায় টিনের চাল। স্যাঁত স্যাঁত করছে চারদিক। ঘরের মেঝেয় একটা পুরু শতরঞ্চি পাতা আছে। সেটা এত বিশাল যে যাত্রার আসরে পাতার মতো। কিন্তু সেও এমন স্যাঁতসেতে যে তাতেও শোয়া যাবে না। অথচ শীত এখানে প্রচণ্ড।

এত বেশি শীত যে পৌষ মাসের কনকনে ঠান্ডাকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে। পেনড্রা থেকে দূরত্ব মাত্র তেতাল্লিশ কিমির। উচ্চতাও তিন হাজার চারশো তিরানব্বই ফুট। তবু কী প্রচণ্ড শীত।

গোলাপ বলল, এখানে সারা বছরই শীত। মধ্যপ্রদেশ সরকারের গ্রীষ্মাবাস হচ্ছে এ অমরকণ্টক। তুমি মেঘদূত পড়েছ চাঁদুদা?

না।

আমি পড়েছি। যদি পড়তে তা হলে দেখতে এই অমরকণ্টক তোমার চোখে নতুন রূপে ধরা দিত। কালিদাসের বর্ণনার সেই আম্রকূটই আজকের অমরকণ্টক। মেকল পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া। নর্মদার উৎপত্তি এইখানেই। আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এই নদী। এর একদিকে বিন্ধ্য পর্বতমালা, অপরদিকে সাতপুরা। শাডোল, মান্ডালা, নরসিংপুর, হোসাঙ্গাবাদ, খান্ডোয়া ও খরগোন জেলার ওপর দিয়ে গুজরাটে সৌরাষ্ট্রের কাছে ব্রোচে সমুদ্রে মিলেছে নর্মদা।

নর্মদা সঙ্গম দেখেছ তুমি?

না যাইনি। তবে যাবার খুব ইচ্ছে আছে।

চা খাওয়া শেষ করে ওরা ঘরের দরজায় শিকল দিয়ে বাইরে এল। একটা তালা তো চাই। গোলাপ গিয়ে বিরজুর মাকে বলতেই উনি তালার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অমৃতভূমি অমরকণ্টক গোলাপের একাধিকবারের পরিচিত স্থান। বছর বছর আসে ওরা। কখনও সার্কিট হাউসে, কখনও বরফানিবাবার আশ্রমে থাকে। তা ছাড়া একমাত্র শিবরাত্রির মেলার সময় ছাড়া এখানে থাকার তো কোনও অসুবিধে নেই। তাই ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে বেড়ায় ওরা। এখন শীতের দাপট বেশি বলে যাত্রীর ভিড় একদমই নেই। আসলে এপ্রিল থেকে জুনই হচ্ছে এর উপযুক্ত সময়। তবুও এর মধ্যে হঠাৎ করে যদি কখনও বৃষ্টি হয় তা হলে বৈশাখেও মাঘের শীত।

গোলাপের সঙ্গে বিরহী যক্ষের বেদনাবিধুর এই মেকল পর্বতে পরিভ্রমণ করতে সত্যিই ভাল লাগল চাঁদুর। প্রকৃতি যে কত সুন্দর হতে পারে তা এখানে না এলে বুঝি অনুভব করা যায় না। যেতে যেতেই হঠাৎ একসময় বলল চাঁদু, এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি গোলাপ?

আপাতত নর্মদা মায়ের মন্দিরে। সেখানেই দেখতে পাবে এই পবিত্র নদীর উৎস।

এখন আমার কী মনে হচ্ছে জান?

কী মনে হচ্ছে?

মৃত্যুরূপী মহাকাল আমাদের তাড়া করতে করতে একেবারে স্বর্গের উদ্যানে নিয়ে এসে ফেলেছে। তোমাকে মনে হচ্ছে তুমি গোলাপও নও, সাধুবাবার গোলেবকায়লিও নও, তুমি এক গন্ধর্বকন্যা। আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে এসেছ এই স্বর্গলোকে। নিজেকেও আর অসহায় বলে মনে হচ্ছে না আমার। মনে হচ্ছে আমি নিজেও এক দেবদূত। এই অপূর্ব-সুন্দর প্রকৃতির রাজ্যে আমিও এক দিগ্বিজয়ী বীরের মতো রাজত্ব স্থাপন করতে পারি। এই অরণ্য-পর্বতে আমার প্রাসাদ গড়ে উঠবে। আমি পৌরাণিক রাজাদের মতো ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে যাব। মৃগয়া করব। তুমি...।

সর্বনাশ! তোমার বাবা-মা কাঁদবে না? জুলির কী হবে? বাড়ি ফিরতে হবে না?

চাঁদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সত্যিই আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছে না। খাঁচার পাখি একবার ছাড়া পেলে আর কী সে খাঁচার ভেতর ফিরতে চায়? আমারও তাই একবারও মনে হচ্ছে-না ঘরে ফিরি। মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে এখানে থেকে যাই।

মনে হচ্ছে। মনে হওয়া ভাল। তেমন সুযোগ যদি পাও সত্যিই কি তুমি পারবে এখানে থাকতে?

পারব। অবশ্য তুমিও যদি আমার সঙ্গে থাকো।

গোলাপ বলল, ওই দেখো মায়ের মন্দির।

চাঁদু দেখল এই তীর্থভূমিতে শ্বেতশুভ্র একটি মন্দির সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা উড়ছে পতপত করে। মন্দিরের সামনেই একটু কুণ্ড। কত লোক স্নান করছে সেখানে।

গোলাপ বলল, এই হল নর্মদাকুণ্ড।

চাঁদু বলল, এইখানে স্নান করেই মানুষের মোক্ষ লাভ হয়?

হ্যাঁ। আর ওই যে দেখছ ক্ষীণ জলধারা, ওই হচ্ছে নর্মদার উৎস।

চাঁদু লক্ষ করল একটা পাথরের গোমুখে নর্মদার জল গড়িয়ে এসে কুণ্ডে পড়ছে। তারপর সেইখান থেকেই ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলেছে সুদূর সুরাতে সাগরসঙ্গমের দিকে।

স্নানের সরঞ্জাম সঙ্গে আনেনি ওরা। তাই স্নান হল না। নর্মদার জল স্পর্শ করে মাথায় ছিটাল। এরপর পিছনদিকের নির্জন পাহাড়িপথ ধরে খানিক এগোতেই দেখতে পেল বহু পুরাতন কালের একটি সুদৃশ্য ভগ্ন মন্দির।

এ মন্দিরটা কীসের?

স্থানীয় একজন বলল, করণ মন্দির।

কর্ণ মন্দির?

মহাভারতীয় করণ ইয়ে শিবজি কা আদি মন্দির বনায়া।

ওরা যখন অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে মন্দিরের কারুকার্যগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তখন সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কিছু লোক সেখানে কী সব যেন মাপজোক করতে এল। তাঁদেরই মধ্যে একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ এটা মহাভারতের কর্ণ মন্দিরের নামে খ্যাত হলেও এর নির্মাতা কিন্তু কর্ণ নন। যদিও লোকের ধারণা এটা কর্ণেরই মন্দির। এবং যেহেতু কৌরব কর্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার ব্যাপারে কর্ণের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল, সেই পাপে এখানে তাঁর মন্দির বিশেষ মর্যাদা পায়নি। কেন না নর্মদা চিরপবিত্রা। তাই নর্মদা শংকর কর্ণের ওই পূজা গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে কর্ণের মন্দির আজও অবহেলিতই রয়ে গেছে। তবুও এই কর্ণমন্দির কিন্তু অমরকণ্টকের প্রাচীনতম মন্দির। তবে ইতিহাস বলে এই মন্দিরের আসল প্রতিষ্ঠাতা হলেন কলচুরি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কর্ণদেব। তিনি চেদীরাজ মহাচন্দ্র নামে খ্যাত ছিলেন। এই মন্দিরের নির্মাণকাল দশম বা একাদশ শতাব্দী।

কর্ণমন্দির দেখে ওরা পায়েপায়ে বাজারের কাছে এল। ফুলের মতো ফুটফুটে গোলাপকে দেখে কয়েকটি বখাটে ছেলে খারাপ মন্তব্য করল। ওরা ওসব গায়েও মাখল না। প্রচণ্ড খিদে নিয়ে একটা হোটেলে খেতে বসল ওরা।

কী সুন্দর বাসমতী চালের ভাত এখানকার। তার সঙ্গে ঘন ডাল ও সুস্বাদু তরকারি। পেট ভরে তৃপ্তি করে খেল ওরা। তারপর আবার ফিরে এল ধর্মশালায়। এখন একটু বিশ্রাম নিতে হবে। কিন্তু বিশ্রাম তো নেবে। শোবে কোথায়? এর থেকে বরফানিবাবার আশ্রমটা ভাল ছিল। সবকিছুই মিলত সেখানে। অথচ সাধুবাবা নিজে আগ্রহ করে যখন বিরজুকে ডেকে ব্যবস্থা একটা করে দিলেন তখন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা উচিত না। তা ছাড়া এটা তো ঠিক, সমবয়সি একটি ছেলেমেয়ের মধ্যে যতই বন্ধুত্ব থাক, তাদের একসঙ্গে এক ঘরে থাকাটা খুবই সন্দেহের। সেই সন্দেহের বশে ওখানেও যদি আশ্রয় না মিলত?

বিরজুর মাতাজিকে জানাতেই ওদের বিছানার ব্যবস্থা হয়ে গেল। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ছারপোকায় ভরা শোবার অযোগ্য বিছানা। দেখেই তো গা ঘুলিয়ে উঠল ওদের।

গোলাপ বলল, এইভাবে একটা মুহূর্তও এখানে থাকা সম্ভব নয়।

চাঁদু বলল, আমি জানি তোমার খুব কষ্ট হবে। তাই বলছিলাম তুমি বাড়ি ফিরে গেলেই পারতে। কেন আমার সঙ্গে এত কষ্ট করছ?

আমি বাড়ি চলে গেলে তোমার বরাতে এটুকু আশ্রয়ও জুটত না। তুমি কত কষ্ট পেতে বলো তো? তুমি কি পারতে এত সহজে এইভাবে এখানে বা অন্য কোথাও থাকতে? ভয় করত তোমার। কখনও তো ঘর থেকে বেরোওনি।

যাক, একটু তুমি বসো, আমি এখুনি আসছি।

কোথায় যাবে তুমি?

আসছি। যাব কি আসব।

আমার খুব ভয় করবে কিন্তু। যদি কেউ কিছু করে তোমার?

গোলাপ বলল, এত সস্তা নয়। গোলাপে কাঁটা আছে জানো তো? বলেই গোলাপ চলে গেল।

আধঘণ্টার মধ্যেই হাসি মুখে ফিরে এল সে। বলল, আর কষ্ট ভোগ করতে হবে না। সার্কিট হাউসে একটা ঘর পেয়ে গেছি। চমৎকার ঘর, অ্যাটাচড্ বাথ। গদি, বিছানা, মশারি সবকিছু আছে। ওখানে গিয়ে আর এমনভাবে হি হি করে কাঁপতে হবে না শীতে।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল চাঁদু।

মাতাজির হাতে দশটা টাকা দিয়ে ঘর খালি করে চলে এল ওরা। মাথাগোঁজার জায়গাটা একটু ভদ্রস্থ না হলে চলে?

কথায় বলে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। গোলাপ নিজেও বুঝি সেটা জানে। তা ছাড়া চাঁদুও তো কম সুন্দর নয়। টকটকে ফর্সা গায়ের রং। সুঠাম দেহ নধরকান্তি। তাই তো আদর করে ওর চাঁদ মুখ দেখে ঠাকুরমা ওর নাম রেখেছিলেন চন্দ্রকান্ত। তা এই মুখ দেখিয়ে বা রূপ দেখিয়েই বুঝি বাজিমাত করল গোলাপ। সার্কিট হাউসে গিয়ে একটু ইনিয়ে বিনিয়ে বলতেই ঘর একটা পেয়ে গেল। এবং ঘর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই দশটি টাকা কেয়ারটেকারকে দিতে খুব খুশি সে।

ওর সঙ্গে চাঁদুর চেহারার এমন এক আভিজাত্যের মিল আছে যে, ওদের দু'জনকে কোলেপিঠের ভাইবোনের অতিরিক্ত কিছু বলে মনেও হল না কারও।

ওরা যখন সার্কিট হাউসে এল তখন সন্ধ্যা সমাগত। এখানে তালাচাবির ব্যবস্থা আছে। অবশ্য না থাকলেও ক্ষতি কিছু নেই। কীই বা আছে ওদের, যে চোরে নেবে? টাকা-পয়সা যা কিছু তা তো সঙ্গেই আছে।

মন্দিরে মন্দিরে তখন স্তোত্রপাঠ ও ঘণ্টা ধ্বনি হচ্ছে।

ওরা পায়ে পায়ে বাসস্ট্যান্ড যেদিকে সেইদিকে গেল। এদিকে একপাশে ঘন অরণ্যের হাতছানি। একপাশে মঠ ও মন্দিরের সমারোহ। তারই মাঝখানে চওড়া পিচ ঢালা রাস্তা। যতক্ষণ না অন্ধকার হয়, ততক্ষণ ঘুরে বেড়াল ওরা। তারপর রাতের খাবারের জন্য একটা দোকান থেকে হাতে গড়া গরম রুটি, তরকারি আর প্যাঁড়া নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে উপযুক্ত শীতবস্ত্র নেই। অতএব এইভাবে ঠান্ডায় ঘোরাটা ঠিক নয়।

কেয়ারটেকার ওদের কাছ থেকে একরাতের জন্য পঁচাত্তর টাকা ভাড়া নিল। তা নিক। আপাতত দু'-চারটে দিন তো আরামে থাকা যাবে ওখানে। তারপর

বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে যা হয় করা যাবে। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে এসে মুখহাত ধুয়ে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিল। এখন সবে সন্ধে সাতটা। এখনই দু'চোখ জুড়ে ঘুম আসছে। তবে এখনই ওরা ঘুমোবে না। অন্তত রাত্রি ন'টা না হলে শয্যা গ্রহণ করা উচিত নয়।

গোলাপ বলল, আজ আর শরীর বইছে না। ভাবছি কাল সকালেই বাড়িতে যোগাযোগ করব। এদের ফোন আছে। কাজেই যোগাযোগের অসুবিধে হবে না।

কিন্তু সাধুবাবা যে বললেন, উনিই বাড়িতে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন?

উনি একটা কথার কথা বলেছেন।

তবু আমার মনে হয় কাল সকালেই একবার ওনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা উচিত।

সে তো করবই। বিরজুই আমাদের নিয়ে যাবে সাধুবাবার কাছে।

সাধুবাবা যে তখন বললেন বিরজুই আমাদের বডিগার্ড, তা বিরজুইর তো পাত্তা নেই।

হয়তো গেছে কোথাও।

এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ।

গোলাপ উঠে গিয়ে দরজাটা খুলেই দেখল একজন জাঁদরেল চেহারার কনস্টেবল এবং তাঁর পাশে পুলিশের একজন ইনস্পেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন।

ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওদের।

কনস্টেবল বলল, ঘবড়াও মাত। আমি বিরজুর বাবা আছি। সকালে যে সাধুজির সঙ্গে তোমাদের মুলাকাত হয়েছিল ওই সিদ্ধিবাবা আমাকে সব কুছু বলেছেন। আমি ওই রামবাঈ ধরমশালার কেয়ারটেকার। কখন কোন ফাঁকে তোমরা চলে এলে আমি জানি না।

চাঁদু বলল, আমরা তো মাতাজির সঙ্গে দেখা করে ভাড়া মিটিয়ে এসেছি।

আরে জয়রামজি কী। ও বাত নেহি। তোমরা ভাল ঘরের ছেলেমেয়ে। ওই জায়গায় তোমরা কখনও থাকতে পার? কোনও তখলিফ হলে আমিই তোমাদের ভেজিয়ে দিতাম এইখানে। আমার লেড়কা বিরজু আজ হঠাৎ একটা কাজে শাডোল চলে গেছে। ও তোমাদের এখানকার সবকিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। কাল দশ বাজে বিরজু মিলে গা তুমকো।

গোলাপ বলল, আমি এখানকার সবকিছুই জানি সেপাইজি। বছরে একবার আমি এখানে আসি আমার বাবা-মা'র সঙ্গে।

তব তো কোঈ বাত নেহি। লেকিন আভি তুমহারা জিন্দেগি খতরেমে হো। ইসি লিয়ে বিরজুকো সাথ রাখনা তুমহারে লিয়ে সেফটি হোগা।

বেশ তো, বিরজু থাকবে আমাদের সঙ্গে।

আভি তুমহারা প্রবলেম সাবকো বতাও।

ইনস্পেক্টর ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলেন। তারপর মন দিয়ে সব কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। দু'-একটা দিন তোমরা একটু সাবধানে থাক। বিলাসপুরিয়া পার্টি যখন, এখানে আসতে ওদের খুব একটা দেরি হবে না।

চাঁদু বলল, আমরা এখানে আছি ওরা জানবে কী করে?

তোমরা বিলাসপুরে আছ ওরা খবর পেল কী করে?

কিন্তু ওরা তো আমার কোনও ক্ষতি করতে চায় না।

তোমার গতিবিধির ওপর নজর তো রাখে। তোমরা যখন কাউন্টারে টিকিট কেটেছ তখনই ওরা জেনে গেছে তোমরা কোথায় যাচ্ছ।

চাঁদু ও গোলাপ যুক্তি খুঁজে পেল ইনস্পেক্টরের কথায়।

ইনস্পেক্টর বললেন, তবে ওদের কথা যদি ঠিক হয় আর লোকগুলো যদি গীতাঞ্জলিতে আসে, তা হলে ট্রেন থেকে নামলেই অ্যারেস্ট হয়ে যাবে ওরা। আমি এখুনি বিলাসপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

গোলাপ এবার ইনস্পেক্টরের হাতদুটি ধরে করুণভাবে বলল, আমাদের দু'জনের বাড়িতে খবর দেবার কী হবে? আপনি কি অনুগ্রহ করে একটু সেই ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

অবকোর্স। নিশ্চয়ই পারি। ফোন নাম্বার আছে কিছু?

গোলাপ ও চাঁদু দু'জনেই ওদের নাম, বাবার নাম সহ ফোন নম্বরটা ইনস্পেক্টরকে দিয়ে দিল।

উনি যাবার সময় বলে গেলেন কাল সকালের দিকে ওদের দু'জনকে অবশ্যই একবার থানায় যোগাযোগ করতে।

ওরাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এরপর আর কি দেরি করা উচিত? তাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রাতের খাওয়া খেয়ে আলো জ্বেলেই শুয়ে পড়ল দু'জনে। আলোটা জ্বললে ঘরটা একটু গরম থাকবে হয়তো।

সাত

সকাল সকাল শোয়ার জন্য খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল ওদের। কিন্তু এত ভোরে কে আর ওঠে, একমাত্র পাখিরা ছাড়া? চারদিকে যেমনই সবুজ বনানী, তেমনি পাখিদের কিচির মিচির। ওরা লেপমুড়ি দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল। ডবল বেডেড রুম। কিন্তু বিছানা সেপারেট। খুব ভাল ব্যবস্থা। মশা নেই। ছারপোকাও নেই।

গোলাপ বলল, এই সময় একটু চা পেলে বেশ হত।

চাঁদু বলল, যা বলেছ। একবার একটু রোদ উঠুক। তবেই ঘর থেকে বেরোব। এখন তো চোখেমুখে জল দিতেও ভয় লাগছে।

গোলাপ বলল, কাল রাত্তিরে পুলিশ দেখে আমি কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমিও।

এমন সময় দরজায় টক টক শব্দ।

চাঁদু উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল একটি আট-দশ বছরের ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেটি বলল, চায় কফি কুছ পিয়োগে?

গোলাপ বলল, হ্যাঁ জরুর। তবে গরম থাকে যেন।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল। গোলাপ বলল, এই শোনো, একটু গরম পানির ব্যবস্থা করে দিতে পার? মুখ ধোব।

ছেলেটি আমতা আমতা করতে লাগল।

রুপিয়া মিলেগা। এক রুপিয়া দেগা তুমকো।

রুপিয়ার নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল ছেলেটি। কোনওদিকে না তাকিয়ে ছুটে চলে গেল দোকানের দিকে। পরক্ষণেই এক মগ ফুটন্ত জল এনে বলল, লিজিয়ে।

বাথরুমে কলের জল তখন বরফের মতো ঠান্ডা। সেই জলের সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে চোখমুখ ধুয়ে পরিষ্কার করল। তারপর ছেলেটি চা নিয়ে এলে চা খেল। চায়ের দাম জলের দাম নিয়ে ছেলেটি চলে যেতেই, ওরা নিজেদের একটু চাঙ্গা মনে করল এবার। অল্প অল্প রোদের আভাও তখন ফুটে বেরোচ্ছে পূবের আকাশ থেকে। তাই আর ঘরে থাকতে ভাল লাগল না কারও। দু'জনেই হি হি করতে করতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর ঢাল বেয়ে একটু নামতেই দেখতে পেল বিরজুকে।

বিরজু ওদের দেখেই ছুটে এল। বলল, এই আমি ভাবছিলাম তোমাদের ওখানে যাব। মন্দির দর্শন করিয়ে আনব।

গোলাপ বলল, মন্দির দর্শন কাল আমরা নিজেরাই করে নিয়েছি। আসলে এটা তো আমার চেনা জায়গা।

তা হলে শোনমুড়া চলো।

শোনমুড়া হচ্ছে শোন নদের উৎস।

গোলাপ বলল, শোনো বিরজু, তোমাকে শোনমুড়া, কপিলধারা, দুধধারা কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। তুমি যদি পার তো, আমাদের দু'জনকে একবার

ভৃগুকমণ্ডল নিয়ে চলো। ওই একটা জায়গাই আমরা সাহস করে যেতে পারব না।

ভৃগুকমণ্ডলের নাম শুনে বিরজু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, ও হাম নেহি যা সকতা।

কাহে?

ও রাস্তা মুঝে মালুম নেহি। তা ছাড়া আমার মাজি হামকো উধার নেহি জানে দেঙ্গে।

ওদের কথা শুনে একজন দোকানদার বলল, ও জায়গায় দল বেঁধে না-গেলে যাওয়া যায় না। গভীর বনের ভেতর দিয়ে পথ। বাঘ-ভালুক সবকিছুই মিলতে পারে ও পথে।

চাঁদু উৎসাহিত হয়ে বলল, তাই নাকি?

গোলাপ বলল, আমি একবারই গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে। আমাদের দলে অন্তত পঞ্চাশজন যাত্রী ছিল।

দোকানদার বলল, কী হবে ওখানে গিয়ে? অনেকেই যায় না। এখানেই যা আছে দেখলে মন ভরে যাবে। যাও না, কপিলধারায় গিয়ে বসে থাকো।

গোলাপ বলল, কপিলধারায় তো যাবই। ওই তো এখানকার স্বর্গ।

বিরজু বলল, তোমরা এক কাজ করো, কপিলধারা অনেক দূর। হেঁটে তো যেতে পারবে না। তাই তোমাদের টাঙ্গা একটা করতেই হবে। তাতে হবে কী টাকা লেগে যাবে অনেক। এখন আমার কথা যদি শোনো তা হলে এক কাজ করো, এইখানে ঘণ্টা হিসেবে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়। তোমরা সাইকেল চাপতে জান?

চাঁদু বলল, জানি।

গোলাপ বলল, আমিও জানি।

তোমরা তা হলে দু'জনে দুটো সাইকেল নিয়ে নাও। আট আনা করে ঘণ্টা। দু'জনে এক টাকায় হয়ে যাবে। এখন ওই সাইকেলে চেপে তোমরা কপিলধারা শোনমুড়া যেখানে যাবে চলে যাও। কাজ মিটে গেলে সাইকেল জমা দাও। পরে আবার ভাড়া নাও।

চাঁদু বলল, দি আইডিয়া।

গোলাপ বলল, তুমি বেশ ভাল যুক্তি দিয়েছ তো। এখন চলো সাইকেলের দোকানটা একবার আমাদের দেখিয়ে দাও।

বিরজু ওদের সাইকেলের দোকান দেখিয়ে দিল।

ওরা বিরজুর সঙ্গে আলাপ করতে করতে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। ঘন দুধ দিয়ে কী সুন্দর চা তৈরি করেছে ওরা। শুধু তাই নয় এত বড় বড় শিঙাড়া

আর অমৃতি তৈরি করেছে যে দেখেই লোভ হল ওদের।

ওরা প্রত্যেকে দুটো করে শিঙাড়া-অমৃতি খেয়ে চা খেল এক কাপ করে। তারপর দু'জনে দুটো সাইকেল নিয়ে হাওয়ায় উড়ে চলল শোনমুড়ার দিকে। সাতপুরা আর বিন্ধ পর্বতের মিলনস্থল হচ্ছে মেকল। অর্থাৎ এই অমরকণ্টক। এরই একান্তে অতি নির্জনে শোন নদের উৎস। উৎসের কাছ থেকে এই নদ ঝরনার রূপ ধরে ঝরে পড়ছে অনেক নীচে। তারপর যে কী হচ্ছে তা দেখা যায় না।

ওরা সাইকেল রেখে উঁকিঝুঁকি মেরে নীচে তাকিয়ে দেখল, কিছু দেখা যায় কি না। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এরপরে চলে গেল নর্মদা মায়ের বাগিচা বা উদ্যানে। ঘন বনের মধ্যস্থলে উঁচুনিচু পাহাড়ের পটভূমিতে এ এক মনোরম উদ্যান। নাম মাঈ কি বাগিয়া। এইখানেই ওদের চোখে পড়ল সেই বিখ্যাত গোলেবকায়লি ফুল। যার কথা বাসে আসা সেই সিদ্ধিবাবা বলেছিলেন। যে ফুলের সঙ্গে গোলাপের তুলনা করেছিলেন। যে ফুলের প্রশংসায় উর্দু কবিরা পঞ্চমুখ। একমাত্র এইখানকার মাটিতে ছাড়া যে ফুল কোথাও গজায় না। এই ফুল চোখের পক্ষেও খুব উপকারী। এই ফুলের সুরমাও তাই বিক্রি হচ্ছে এখানে। অনেকের দেখাদেখি গোলাপও ওর চোখের কোলে সুরমার রেখা আঁকল।

মাঈ কি বাগিয়া থেকে ওরা আবার এল নর্মদা মন্দিরের কাছে। সেখানে তখন অগণিত তীর্থযাত্রীর ভিড়। ওরা এবার অন্য কোথাও না গিয়ে অমরেশ্বর শিবের মন্দিরে একটা প্রণাম করে চলল কপিলধারায়। এই অঞ্চলের প্রধান দর্শনীয় স্থানে।

কপিলধারার পথ দুর্গম নয়। তবে অতুলনীয় প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যমণ্ডিত। অমরকণ্টক থেকে প্রায় দশ কিলোমিটারের পথ। কিন্তু প্রকৃতি যেখানে অনবদ্য সেখানে এই পথ এমন আর কী? পথ কখনও উঁচুনিচু, কখনও এবড়ো খেবড়ো। উৎস থেকে নির্গত হয়ে নর্মদা গায়ত্রী সাবিত্রী সঙ্গমের পর গভীর অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে কপিলধারায় পুনরাবির্ভূতা। এইখানে আরও দুটি ছোট পাহাড়িয়া নদী এসে মিশেছে নর্মদার সঙ্গে। তার একটির নাম এরণ্ডী, অপরটির নাম কপিলা। এরণ্ড ও কপিল এই দুই মহামুনির নামেই নদী দুটির নাম। এবং এইখানেই প্রায় সত্তর ফুট নীচে নর্মদার প্রথম প্রপাত।

ওরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একপাশে সাইকেল দুটিকে শুইয়ে রেখে পিচ্ছিল পথে সেই ধারার কাছে এসে প্রপাত দেখতে লাগল। একটি দশ বারো বছরের ছেলে বসেছিল সেখানে। চাঁদু তাকে জিজ্ঞেস করল, সিদ্ধিবাবাকা আশ্রম কিধার?

ছেলেটি বলল, আউর নীচে উতারো। দুধধারা কি পাস।

চাঁদু গোলাপের মুখের দিকে তাকাল।

গোলাপ বলল, আমি দুধধারায় গেছি এর আগে অনেকবার। কিন্তু ওই সাধুকে কখনও দেখিনি।

রাস্তা চেনো তুমি?

চেনাচিনির কিছু নেই। একটাই রাস্তা এর।

ওরা সেই নির্জনে বৃক্ষছায়ায় অন্ধকারে কপিলধারার গতিপথ ধরে আরও নীচে নামতে লাগল। অনেকটা নামার পর এক জায়গায় একটু উচ্চস্থানে সত্যি সত্যিই একটা আশ্রম দেখতে পেল ওরা।

সিদ্ধিবাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন আশ্রমের সামনেই। ওদের দেখে বললেন, এত দেরি হল যে?

আমরা মাঈ কি বাগিয়া দেখতে গিয়েছিলাম বাবা।

তা হলে নিশ্চয়ই তোমরা গুলেবকায়লি ফুল দেখেছ?

একটা দুটো।

সিদ্ধিবাবা ওদের আশ্রমের দাওয়ায় বসিয়ে বললেন, দেখেছ তো কীরকম জায়গায় আমি থাকি? তোমরা এখানে এক দণ্ডও থাকতে পারতে না। তা ওদিককার খবর কী? বিরজু এল না কেন? ওর তো আসার কথা ছিল তোমাদের সঙ্গে।

গোলাপ বলল, এ পর্যন্ত রাস্তা আমার চেনা। তাই ওকে সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করিনি। আর ওদিককার খবর বলতে আমরা সার্কিট হাউসে জায়গা পেয়ে গেছি। তাই রামবাঈ ধর্মশালায় থাকিনি। কাল রাতে বিরজুর বাবার সঙ্গে একজন ইনস্পেক্টর এসেছিলেন। আমরা তাঁকে সব বলেছি। উনি হয়তো টেলিফোনে আমাদের বাড়িতেও খবর পাঠিয়েছেন।

তা হলে তো সমস্ত প্রবলেমই সলভড্ হয়ে গেছে। তবু তোমরা দু'-একটা দিন সাবধানে থেকো। কেমন? বিপদ একটা ঘটে যেতে বেশিক্ষণ নয়। অবশ্য অমরকণ্টক খুব ছোট্ট জায়গা। এখানে বদমায়েশি করে কেউ পার পাবে না। তোমরা বিকেলে মন্দির এলাকায় থেকো। আমি গিয়ে ধরে নেব তোমাদের। সকলকে একটু বলেকয়েও দেব, যাতে কোথাও কোনও অসুবিধে না হয়।

ওরা সিদ্ধিবাবাকে প্রণাম করে ফিরে এল।

আট

ওপরে উঠতেই বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল ওদের। সর্বনাশ, সাইকেলদুটো তো এখানেই ছিল। গেল কোথায়? ভাড়া করা পরের সাইকেল। কে নিল? দু'-দুটো সাইকেলের দাম নেহাত কম নয়। এখন গুণাগার দিতে হলেই তো ফর্সা। তা হলে?

ওরা সাইকেলের দাগ ধরে এদিক সেদিক লক্ষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। চোখের সামনে ওটা কী ও? দেখেই ভয়ে চিৎকার করে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে। আর থর থর করে কাঁপতে লাগল। দু'জনেরই শিরদাঁড়া বেয়ে কনকনে একটা হিমস্রোত।

একটা চিতাবাঘ কপিলধারার কাছে উঁচু একটা পাথরের ওপর দিব্যি আয়েশ করে শুয়ে আছে, আর ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিটিয়ে দেখছে। এই দৃশ্য দেখলে কার না হাত-পা ঠান্ডা হয়? যদিও বাঘটা খুব একটা বড়সড় নয়। অ্যালসেশিয়ান কুকুরের সাইজ। তবু বাঘ তো?

কথায় বলে সাপের লেখা বাঘের দেখা। কিন্তু বরাত ভাল হলে যমেও পরে আসব বলে কেটে পড়ে। তা কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। বাঘটা হঠাৎ একটা লাফ মেরে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা তখনও স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

খানিক বাদে দু'জনে একটু প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করল।

চাঁদু বলল, যেন পুনর্জন্ম হল। বাঘের মুখ থেকে বাঁচা এ কখনও সম্ভব! কাউকে বললেও বিশ্বাস করবে না।

গোলাপ বলল, না করুক। কিছু যায় আসে না তাতে। এখন আর এখানে থাকা নয়। এমনও তো হতে পারে বাঘটা এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনও জায়গায় ঘাপটি মেরে আছে?

কিন্তু সাইকেল? সাইকেলদুটো কোথায় গেল?

গোল্লায় যাক। দু'-দু'জন মানুষের জীবনের চেয়ে সাইকেলদুটোর দাম নিশ্চয়ই খুব একটা বেশি নয়। হেঁটেই যাব আমরা।

অগত্যা ওরা বাধ্য হয়েই হাঁটা পথ ধরল। এছাড়া উপায়ই বা কী? ফিরে তো আসতে হবে। গভীর ঘন বনানীর মাঝখান দিয়ে সাপের পিঠের মতো অমরকণ্টকের পথ। পিচ ঢালা পরিষ্কার। নেহাত এ সময় ট্যুরিস্ট নেই তাই, না হলে টাঙ্গা আর অটোতে জমজম করত চারদিক। মোটরের মিছিল এসে যেত।

ওরা সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে তিনজন

যুবক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। তিনজনেই অপ্রকৃতিস্থ। আর কী ভয়ংকর চোখের চাউনি তাদের। দেখেই বুক শুকিয়ে গেল। ওরা তিনজনে এমনভাবে ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াল যে আর এক পা-ও এগোতে পারল না ওরা।

গোলাপের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে তখন।

চাঁদু ভয় পেয়েও বীরত্ব দেখাতে ছাড়ল না। বলল, রাস্তা ছোড়ো।

নেহি ছোড়ুঙ্গা তো?

চাঁদু বলল, তো তুমহারা হাল হাম বেহাল কর দেগা। বলেই আচমকা একজনের একটা হাত ধরে এমন একটা হেঁচকা টান দিল যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

কিন্তু বাকি দু'জন ভয়ংকর ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তারপর একজন করল কী গোলাপকে তুলে নিয়েই ছুটে চলল বনের দিকে।

গোলাপ চিৎকার করে উঠল। ওর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল চারদিকে। পাহাড় ও বনভূমি মুখর হয়ে উঠল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অঘটন। প্রথমে একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল ওপর থেকে। পরক্ষণেই সেই বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আর একজনের ওপর। তারপর আলুভাতের মতো লোকটাকে মুখে নিয়ে পাথরের খাঁজে খাঁজে লাফিয়ে হারিয়ে গেল কোথায় যেন। যে লোকটা চাঁদুর হাতে ঝাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল সে তখন কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়েই প্রাণপণে ছোটা শুরু করেছে।

গোলাপের চিৎকার তখনও দূর থেকে শোনা যাচ্ছে, ছাড়। ছাড় বলছি। ছেড়ে দে আমাকে। আর মাঝে মধ্যে, বাঁচাও-বাঁচাও-বাঁচাও।

চাঁদু তখন পলায়মান লোকটাকে ধাওয়া করছে। হঠাৎ হাতের কাছে একটা ভারী পাথর পেয়েই ছুড়ে মারল লোকটাকে। পাথরটা গিয়ে লোকটার মাথায় লাগল। এক ঘা-ই যথেষ্ট। 'মর গয়ি' বলে বসে পড়ল লোকটি। তারপর শুধুই চিৎকার।

ততক্ষণে গোলাপও ছুটে এসেছে ওর দিকে। সে তখন থরথর করে কাঁপছে।

চাঁদু বলল, তুমি ফিরে এসেছ গোলাপ? কীভাবে রক্ষা পেলে ওর কবল থেকে?

কাঁপা কাঁপা গলায় গোলাপ বলল, ওই পাজির চোখদুটোকে আমি উবড়ে নিয়েছি এই নখ দিয়ে, দেখো।

চাঁদু দেখল গোলাপের হাতের আঙুলগুলো রক্তে মাখামাখি। ওর পোশাকআশাক কাঁটায় বা শুকনো ডালপালার খোঁচায় ছিন্নভিন্ন। ভয়ংকর একটা বিপদের হাত থেকে বেঁচে ফিরে ও যেন কেমন হয়ে গেছে।

চাঁদু বলল, ভগবান আমাদের দু'-দু'বার বাঁচালেন।

গোলাপ বলল, বাঘ মানুষের শত্রু হয় আবার বন্ধুও। ওই লোকটাকে বাঘে না ধরলে তুমি কিছুতেই রক্ষা পেতে না।

চাঁদু বলল, সে যা হত তা হত। আক্রমণটা তো প্রথমে আমিই করেছি।

তোমার তুলনা নেই। তাই বলি আর কারও ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে চলো এবার যে যার বাড়ির দিকে ফিরে যাই। বাঘ যেখানে বশ মানল আর নিয়তি যেখানে উদার সেখানে কার সাধ্য কেউ আমাদের কিছু করে?

চাঁদু বলল, ঠিক বলেছ তুমি। বরং এখন থেকে আমরা সবসময় তৈরি থাকব আর প্রতিটি আক্রমণের মোকাবিলা করব।

ওরা আবার পথ চলা শুরু করল।

খানিক এসেই গোলাপের কী মনে হতে থমকে দাঁড়াল সে। বলল, আমরা এভাবে হেঁটে যাচ্ছি কেন?

তবে কীভাবে যাব? বাঘের পিঠে চেপে?

তা কেন? আমাদের সাইকেলে।

সাইকেল! সাইকেল কোথায়?

ওই লোকগুলোর কাছে। ওরাই চুরি করেছে আমাদের সাইকেল! ওদের মোচড় দিলেই সব বেরোবে।

ঠিক বলেছ তুমি। এই কথাটা তো একবারও মনে হয়নি আমার। সাইকেল চুরি ওরা ছাড়া আর কেউ করতেই পারে না।

অতএব আবার পিছু হটতে হল ওদের।

যে লোকটার মাথায় পাথর ছুড়ে মেরেছিল সে তখনও মাথা ধরে পথের ওপর বসে আছে।

চাঁদু ও গোলাপকে দেখেই গাঁক করে উঠল সে।

গোলাপ বলল, এই তোমরা আমাদের সাইকেল কোথায় রেখেছ?

লোকটি অতি কষ্টে বলল, হম নেহি জানতা।

চাঁদু বলল, শোনো, তোমাদের এক বন্ধু বাঘের পেটে গেছে। এই মেয়েটি একজনের চোখ উবড়ে দিয়েছে। বাকি আছ তুমি। তোমার অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। তা এবার বলবে কি সাইকেলদুটো কোথায়? না বললে কিন্তু অবস্থা আরও খারাপ করে দেব।

ম্যায় কুছ ভি নেহি জানতা। তুমহারা সাইকিল হমলোক নেহি চুরায়া।

তা হলে কি বলতে চাও যে সাইকেলদুটোকে ভূতে পেল আর ওরা অমনি গড়াতে গড়াতে চলে গেল?

লোকটি চুপ করে রইল।

আর চাঁদু করল কী, বড় সড় একটা পাথর এনে বলল, দেব এটা দিয়ে মাথার ওপর এক ঘা?

লোকটি তখন বলল, নেহি। মাত মারো মুঝে।

তা হলে বলো আমাদের সাইকেল কোথায়?

লোকটি কাঁপা কাঁপা হাতে দূরের দিকে দেখিয়ে বলল, উধার যাও। রামুকো পুছো।

রামু! কে রামু?

উ দেখো।

ওরা তাকিয়ে দেখল কপিলধারার কাছে যে নিরীহ ছেলেটি বসেছিল বা যাকে ওরা জিজ্ঞেস করেছিল সিদ্ধিবাবার আশ্রম কোথায়, সেই ছেলেটি উঁচু একটা পাথরের ওপর বসে ওদের গতিবিধি লক্ষ করছে। ওরা সেদিকে লক্ষ করে কয়েক পা এগোতেই ছেলেটি ওদের লক্ষ করে পাথর ছুড়তে লাগল। বড় বড় পাথর। বৃষ্টির ফোঁটার মতো এসে পড়তে লাগল ওদের সামনে। ছেলেটি ছিল ওপরে, ওরা নীচে। ফলে পালটা আক্রমণ করা ওদের পক্ষে সম্ভব হল না। এমন সময় হঠাৎ একটা পাথর এসে চাঁদুর কপালে লাগল। লাগামাত্রই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল সেখান থেকে। সে কী রক্ত! লালে লাল হয়ে গেল। কপালে হাত চেপে পথের একপাশে বসে পড়ল চাঁদু। পাথর আসার তবুও বিরাম নেই। গোলাপ চকিতে চাঁদুকে টেনে আনল একটা বড় পাথরের আড়ালে। চাঁদু তখন থরথর করে কাঁপছে। হঠাৎ ওর বমি পেল। গা-মাথা ঘুলিয়ে চারদিক দুলে উঠল যেন। তারপর ক্রমশই একটু একটু করে নেতিয়ে পড়তে লাগল। একসময় দু'চোখ বুজে অবশ হয়ে গেল ও।

এই মুহূর্তে গোলাপ যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। এখানে চারদিকেই ওদের শত্রু। ওই শান্ত সুবোধ ছেলেটি ওদের শত্রু। যে লোকটি আহত হয়ে বসে আছে সে শত্রু। এছাড়াও আছে সেই নরখাদক বাঘটা। শুধু তাই নয়, ধারেকাছে কোথাও এমন একটু জলও নেই যে ওর মুখে এনে দেয়। আর এইভাবে তো এখানে বসে থাকা যায় না। অথচ লোকালয় এখান থেকে অনেক দূরে। তাই এই অবস্থায় ওর কী করা উচিত কিছুই ভেবে পেল না ও। তবু আশপাশের পরিস্থিতি দেখে ভাল-মন্দর দিকটা একটু বিবেচনা করে হঠাৎ সাহসে ভর করে চাঁদুর হাতদুটো ওর দু' কাঁধের পাশ দিয়ে টেনে ধরে ওকে পিঠে নিয়েই পথ চলা শুরু করল। দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। খানিক আসার পরই ঘেমে উঠল সে। পথ অসম্ভব খাড়াই। তাই বুকে টান ধরতে লাগল, তবুও হাল ছাড়ল না সে। কষ্ট করেও এগিয়ে চলল।

এইভাবে বেশ খানিকটা পথ যাবার পর একটা পাহাড়িয়া নদী দেখতে পেল

সে। ঝরনার আকারে উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে যেন নেচে নেচে বয়ে চলেছে। সেইখানে এনে মাটিতে ঘাসের ওপর চাঁদুকে শুইয়ে ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিল। তারপর রুমালটা ভিজিয়ে ক্ষতস্থান মুছিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল।

এইবার একটু একটু করে চোখ মেলল চাঁদু। বলল, আমি কোথায়?

গোলাপ বলল, তুমি ঠিক জায়গাতেই আছ। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে চাঁদুদা?

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।

করবেই তো। অতবড় একটা পাথরের টুকরো এসে লেগেছে। ডিপ হয়ে কেটে গেছে কপালের পাশটা। অমরকণ্টকে ফিরেই তোমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। সেলাই করতে হবে মনে হচ্ছে।

খুব ব্লিডিং হয়েছে না?

হয়েছেই তো।

সেইজন্যেই বোধহয় এত বমি ভাব আসছে।

তা আসুক। এখন তুমি কি আমার হাত ধরে একটু একটু করে চলতে পারবে?

চেষ্টা করব। কিন্তু এখানে আমি কী করে এলাম? এখানে তো ছিলাম না।

আমি অনেক কষ্ট করে তোমাকে পিঠে করে বয়ে এনেছি এখানে। আর পারছি না। বড় ক্লান্ত আমি।

তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। এত কষ্ট করলে তুমি আমার জন্য?

বন্ধুর জন্য নিজের জীবনও দিতে পারি আমি। কিন্তু এখন আমি হেরে গেছি। সত্যিই আর পারছি না। আসলে ঢালু পথে কোনও কষ্ট নেই। কিন্তু এত খাড়াই যে দম বেরিয়ে গেছে।

গোলাপকে ভর করে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল চাঁদু। তারপর ধীর পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলল। পা যেন চলছে না। গা-মাথা সব টলছে। মনে হচ্ছে যেন কোনও একটা ভারী অসুখ থেকে উঠেছে। তবু যেতে তো হবে।

খানিকটা পথ এসেছে এমন সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল একদল কাঠুরের সঙ্গে। এরা এখানকার পাহাড়ি। গভীর জঙ্গল থেকে অরণ্যের নিধন করে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরছিল। ওদের দু'জনের ওইরকম অবস্থা দেখেই ছুটে এল তারা, কা হুয়ারে মুন্নু?

গোলাপ আধা হিন্দি আধা বাংলায় সব কথা খুলে বলল ওদের।

সব শোনার পর দলের একজন বলল, থোড়া বইঠিয়ে। ও সাইকিল মিল যায়েগা তুমকো। লেকিন ইধার শের ক্যায়সে আ গিয়া?

চাঁদু বলল, ক্যায়সে আ গিয়া তা জানি না ভাই। তবে এসেছে, একজনকে

নিয়েও গেছে। আর সাইকেলের জন্য আমরা চিন্তা করি না। আমরা এখুনি গিয়ে থানায় খবর দিচ্ছি। সাইকেল আমরা পাবই।

নেহি নেহি। পোলিশবালেকা পাস যানেকা জরুরত নেহি।

সে কী! পুলিশে খবর দেব না?

আর একজন বলল, তুম সব জেরা বইঠো না বাবা। ইতনা দূর পয়দাল কিঁউ যাবে? ও রামু ছোকরাকা দিমাগ ঠিক নেহি। কুছ গড়বড়ি হ্যায়। ওহি নে চুরায়া তুমহারা সাইকিল। হম আতে হেঁ। বলেই একজনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল লোকটি।

ওরা বসে রইল। দেখাই যাক না, যদি পাওয়া যায় সাইকেলদুটো। হাজার হলেও পরের তো।

ওরা বসে বসে পাহাড়িদের সঙ্গে নানারকম গল্প করতে লাগল। এই অমরকণ্টকের পথে চোর ডাকাতের গল্প। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের গল্প, পাহাড়ের ধস নামার গল্প। ওরা বলল, অমরকণ্টকের পথ এখন সুগম হলেও ভৃগুকমণ্ডলের পথ নাকি এখনও দুর্গম। এখনও সেখানে দিনমানেও বাঘ-ভালুক বের হয়।

এইভাবে কথা বলতে বলতেই মিনিট কুড়ি হয়ে গেলে সাইকেলদুটো নিয়ে পাহাড়ি দু'জন ফিরে এল। সেই সঙ্গে কান ধরে টেনে আনল সেই ছেলেটিকে, যে পাথর ছুড়ে চাঁদুর কপাল ফাটিয়েছিল। ওরা ছেলেটিকে টেনে এনেই চাঁদুকে দেখিয়ে বেশ কয়েক ঘা চড়চাপড় দিল। দিয়ে বলল, দেখাতনি, ক্যায়সা হাল বনা দিয়া তু নে?

রামু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ওদের দিকে। সে চাহনি এমনই যে ও স্বচক্ষে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, এই কাজ ও করেছে। কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে চোখদুটোকে নামিয়ে নিল সে।

গোলাপ ওর পা থেকে চটি খুলে মারতে যাচ্ছিল ওকে। চাঁদুই বারণ করল। ছেলেটার যখন সত্যি সত্যিই মাথার ঠিক নেই, তখন অযথা ওকে মারধোর করেই বা লাভ কী? স্বভাবের তো পরিবর্তন হবে না।

কাঠুরেরা বলল, রামু ছেলেটা যে বদ্ধ উন্মাদ তা নয়। মগজ যখন ঠিক থাকে তখন খুব ভাল। কিন্তু যখন বেগড়ায় তখন কী যে না করে, তার ঠিক নেই। তখন ওকে ধরে রাখাই দায়।

যাই হোক, ওরা সাইকেল পেয়ে কাঠুরেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলল সার্কিট হাউসের দিকে।

চাঁদু যে কীভাবে সাইকেলে চেপে যাচ্ছিল তা সে-ই জানে। কেবলই মনে হচ্ছিল সাইকেলসুদ্ধ গড়িয়ে অন্যদিকে চলে যাবে বুঝি।

ওর অবস্থা দেখে গোলাপ বলল, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে চাঁদুদা?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে পড়ে যাব। ঠিকমতো ব্যালান্স রাখতে পারছি না।

গোলাপ সাইকেল থামিয়ে বলল, তা হলে নেমে পড়ো। তুমি বরং আমার সাইকেলে এসে বসো। আমি তোমাকে ডবল ক্যারি করি।

সাইকেল থেকে নেমে চাঁদু বলল, তা হলে এই সাইকেলটার কী হবে?

ওটাকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখো। পরে আমি কারও সঙ্গে এসে বরং নিয়ে যাব।

তার চেয়ে আমি বলি কী, তোমাকে ডবল ক্যারিও করতে হবে না, কিছুই না। তুমি একটু জোরে সাইকেল চালিয়ে সোজা থানায় চলে যাও। তারপর সেখানে গিয়ে আমার অবস্থার কথা বিরজুর বাবাকে বলে কাউকে নিয়ে চলে এসো। বিরজু যদি থাকে তো ওকেও নিয়ে আসতে পার।

সেটা কি ঠিক হবে।

কেন ঠিক হবে না কেন?

একে তোমার ওপর একটা অশুভ গ্রহর কোপ পড়েছে। তার ওপর এই নির্জনে একা একা থাকবে? একটু আগেই একজনকে বাঘে ধরেছে। মনে আছে তো?

ভয় নেই। আমি সাবধানেই থাকব।

থেকো তা হলে। আমি এখুনি আসছি।

চাঁদু পথের ধারে এক জায়গায় সাইকেলটা রেখে একটি পাথরের ওপর বসে রইল। আর গোলাপ সাইকেল নিয়ে ঝড়ের বেগে হারিয়ে গেল সেই নির্জন পাহাড়ে পথের বাঁকে।

নয়

সেই যে গেল গোলাপ আর তার ফিরে আসার নামটি নেই। চাঁদু বসে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে উঠল। এত সময় তো লাগার কথা নয়। তা হলে কি কাউকে পায়নি ও? না পেলে ও নিজেও তো ফিরে আসতে পারত।

চাঁদু আর অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়াল এবার। দুশ্চিন্তা এবং উত্তেজনা ওকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে এখন আর নিজেকে আগের মতো দুর্বল মনে হচ্ছে না। ও সাইকেল নিয়ে পথে নামল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সার্কিট হাউসের দিকে।

ও যখন শহরের কাছাকাছি এসে গেছে, তেমন সময় দেখল অন্য একটা সাইকেলে বিরজু দ্রুত আসছে ওর দিকে।

ওকে দেখেই সাইকেলের ব্রেক কষল বিরজু, হাল ক্যায়সা?

চাঁদু বলল, দেখতেই তো পাচ্ছ ভাই। কিন্তু তুমি এত দেরি করলে কেন? ছিলে না বুঝি?

এই তো খবর পেলাম।

সে কী! গোলাপ এতক্ষণ কী করছিল?

আর বলো কেন? একটা স্টোন চিপ গেঁথে গিয়ে ওর সাইকেলের সামনের চাকার টায়ারটা ফেটে যায়। প্রায় দু' কিলোমিটার রাস্তা হেঁটেই গেছে বেচারি।

আর আমি এদিকে হানটান করছি।

বিরজু একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে সাইকেল থামিয়ে বলল, চা পিয়োগে?

এখন নয়।

আরে পিয়ো পিয়ো।

দোকানদারকে দু' কাপ চা করতে বলে বিরজু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করল, আচ্ছা দোস্ত, সাচ মুচ একটা কথা বলবে?

কী কথা বলো?

ওই যে লেড়কি তোমার সঙ্গে রয়েছে ওর সাথে তোমার কী সম্পর্ক আছে?

চাঁদু হেসে বলল, হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করলে যে?

বুরা না মানো ভাই। কী সুন্দর ফেস কাটিং ওর। কী চমৎকার দেখতে।

তাতে কী হয়েছে?

ও তোমার আপনা বহিন ভি না আছে।

দোকানদার চা দিলে, চা খেতে খেতে খেতে চাঁদু বলল, বিরজু ভাই, তোমার যদি কোনও বহিন থাকত আর সে যদি কোনওকারণে এইভাবে আমার সঙ্গে জুটে যেত, তবে কি তুমি কোনও সম্পর্ক যাচাই করতে? ও আমার বহিন কা মাফিক।

লেকিন তোমার নামে তো একটু পুলিশ কেস হয়ে আছে।

আমার নামে! কীরকম?

তোমার নামে রিপোর্ট আছে তুমি বিলাসপুর থেকে ওই লেড়কিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ।

মিথ্যে কথা। ও নিজেই এসেছে এবং স্বেচ্ছায় এসেছে।

হ্যাঁ, লেকিন যাদের মেয়ে তারা তো সন্দেহ করছে তোমাকে।

বয়ে গেল। ওতে আমি ভয় পাই না। তার কারণ আমি নির্দোষ। তোমার বাবাকে এবং ইনস্পেক্টরকে কাল রাতে সব কথা খুলে বলেছি আমি। আমাদের দু'জনেরই বাড়ির ফোন নম্বর দিয়েছি। কাজেই পালিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই

ওঠে না। এর পরেও ওরা যদি গায়ের জ্বালায় কিছু বলে তো বলুক। গোলাপ নিশ্চয়ই সে কথা বলবে না।

ও সে কথা বলছেও না। তবে সম্ভবত ওকে বিলাসপুরেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বেশ তো। ও যদি যেতে চায় যাক না।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা সোজা থানায় এল। এসেই দেখল সুজয়ের বাবা গম্ভীর মেজাজে বসে আছেন। বিরজুর বাবাও আছে। আর রাগি গোলাপ স্থির হয়ে বসে আছে একপাশে। ইনস্পেক্টর নেই। পরিবেশটা কেমন থমথমে।

চাঁদুকে দেখেই বোমার মতো ফেটে পড়লেন সুজয়ের বাবা। বিরজুর বাবাকে বললেন, ইমিডিয়েটলি এই ছোকরাকে লকআপে ঢোকাও। জেলের ঘানি না-টানিয়ে আমি ছাড়ব না একে। এইটুকু বয়সে একটা ক্রিমিনাল তৈরি হয়ে গেছে।

চাঁদু বলল, এসব কী বলছেন আপনি?

চোপ। বদমাশ কোথাকার।

আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন।

অযথা উত্তেজিত হচ্ছি? কেন তুমি চোরের মতো আমার বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে?

চোরের মতো পালিয়ে আসব কেন? আমি প্রকাশ্যে দিবালোকে সকলকে সব কথা জানিয়েই চলে এসেছি। না-আসা ছাড়া আমার কোনও উপায়ও ছিল না।

আসবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসা উচিত ছিল না?

ছিল। কিন্তু সময় ছিল না।

তুমি এই মেয়েটাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে এলে কেন?

ওর আসার ব্যাপারটা আপনি বাড়িতে ভাল করে শুনেছেন?

শুনেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে এসেছে এই খবরটা তখন পাইনি। যখন পেলাম, তখন মনে হল এটা একটা সাজানো নাটক। তোমার বিপদটা কোথায় আমি জানি। কিন্তু তাই বলে পরের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে আসা শিক্ষিত ভদ্রছেলের কাজ নয়। তুমি চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটা যেভাবে বাড়ি থেকে চলে এল এবং তোমার সঙ্গেই এল তাই তে বুঝতে বাকি থাকে না তোমার চাতুরিটা কোথায়।

আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনাকে আমি একটু মাথা ঠান্ডা করে ব্যাপারটা বুঝে দেখবার অনুরোধ করছি। বিষয়টাকে আপনি এইভাবে নেবেন না প্লিজ।

শোনো চাঁদু, ও যদি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সোজা ওর বাবার কাছে ধানবাদে চলে যেত, তা হলে কিন্তু আমার বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু যেই শুনলাম স্টেশনে এসে দু'জনে একসঙ্গে হয়েছ এবং পেনড্রা রোডের টিকিট কেটেছ, তখনই মাথাটা গরম হয়ে উঠল আমার। তাই তোমাকে আমি ছাড়ব না। মেয়ে চুরির কেসে জেলের ঘানি টানাব।

লজ্জায়, অপমানে আর শারীরিক অবসন্নতায় চাঁদু তখন থরথর করে কাঁপছে।

গোলাপ এতক্ষণ পরে মুখ খুলল, চাঁদুদা! তুমি একদম উত্তেজিত হয়ো না। একটু বসো। অফিসারকে আসতে দাও। তারপর এই সমস্ত নির্বোধ লোকের কথার জবাব কী করে দিতে হয় আমি জানি।

চাঁদু কোনও কথা না বলে একটা চেয়ারে বসে কপালটা ধরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। রক্তে ওর রুমালটাও তখন ভিজে গেছে। চুঁয়ে চুঁয়ে সমানে রক্ত পড়ছে তখনও।

সুজয়ের বাবা বললেন, তুই আমাকে নির্বোধ বললি? গুরুজনের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে কে শেখাল তোকে? এই ছেলেটা?

ও কেন শেখাবে? আপনাদের ব্যবহারই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে! আপনার নিজের যদি মেয়ে থাকত। আর সেও যদি এইভাবেই তার দাদার বন্ধুর কোনও বিপদে এগিয়ে আসত তা হলে তাকেও কি সন্দেহ করতেন আপনি? আজকের দিনে একটি ছেলেমেয়ের মেলামেশাকে আপনারা সহজভাবে মেনে নিতে শেখেননি?

আমার নিজের মেয়ে হলে কোনও কিছুই আমি ভাবতাম না। কিন্তু তুই যে এইভাবে চলে এলি, তোর বাবাকে আমি কী কৈফিয়ত দেব বল?

গোলাপ ফোঁস করে উঠল, কৈফিয়ত আপনি কী দেবেন? যা বলবার আমিই আমার বাবাকে বলব। আপনার অনুপস্থিতিতে কাল এমন কিছু ও বাড়িতে ঘটে গেছে যাতে বাড়ি ছাড়তে আমি বাধ্য হয়েছি।

তোর বাবার সঙ্গে ফোনে আমার কথা হয়েছে। তুই এখুনি আমার সঙ্গে যাবি। তোর বাবা এসে আমার ওখান থেকে তোকে নিয়ে যাবে।

আমার বাবার সঙ্গে আপনার যা কথা হয়েছে তা এক তরফা। আমি নিজে বাবার সঙ্গে কথা না বলে কোনও সিদ্ধান্তই নেব না। তবে এ-ও জানবেন, বাবা-মা দু'জনে বললেও ওই বাড়িতে আর কখনও যাব না আমি।

বেশ, না যাবি। কিন্তু ওই খুনে ছেলেটার সঙ্গেও থাকতে পাবি না তুই।

দরকার হলে আমি পুলিশ হেফাজতে থাকব।

চাঁদু এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, না জেনেশুনে আপনি কিন্তু যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছেন। আমি খুনি নই। বরং আমাকে খুন করবার জন্য কিছু দুষ্কৃতী ওত

পেতে আছে। এই দেখুন, আমারই কপাল দিয়ে খুন ঝরছে। যদিও এটাকে আমি দৈব-দুর্ঘটনা বলে মনে করছি। তবু এর পিছনেও কোনও চক্রান্ত থাকতে পারে! আমি হয়তো তারই বলি।

সুজয়ের বাবা বললেন, তুমি বলছ, তুমি খুনি নও। কিন্তু কলকাতার কাগজ বলছে, রেডিয়ো, টিভি বলছে। আমরা কার কথা বিশ্বাস করব! তোমার, না সরকারি রেফারেন্সের?

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো চুপসে গেল চাঁদু।

গোলাপও এবার কীরকম যেন ভয়ে ভয়ে চাঁদুর দিকে তাকাল। ভাবটা এই, ফুলের মতো সুন্দর এই সুকুমারমতি ছেলেটা সত্যিই কি খুনি? আজকাল তো এরকম কত হয়। কিন্তু ওর যা ব্যবহার, ওর মধ্যে যে সরলতা আছে, তা দেখে তো, ওকে সেরকম বলে মনে হয় না। হয়তো বড়লোকের ছেলে, রাগের মাথায় বা ঘটনাক্রমে খুন একটা করেইছে। তাই ওর বাবাও চাইছে ছেলেটিকে চোখের আড়ালে পাঠিয়ে অবস্থার সামাল দিতে। না হলে ওর পিছনেই বা লোক লাগবে কেন? কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকালে তো বারেকের তরেও মনে হয় না ও কখনও ওই ধরনের অপরাধ করে থাকতে পারে বলে।

এমন একটা সময় পুলিশের জিপ এসে থামল বাইরে থানার সামনে। ইনস্পেক্টর এবং আরও দু'জন অফিসার ঘরে ঢুকলেন।

বিরজুর বাবা এবং অন্যান্য কনস্টেবলরা উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট জানাল।

চাঁদুকে দেখেই শিউরে উঠলেন ইনস্পেক্টর, এ ক্যা!

চাঁদু সব কথা খুলে বলল ইনস্পেক্টরকে।

তো তুম ডক্টরকো পাস কিউ নেহি গিয়া?

চাঁদু বলল, আমরা তো এইমাত্র আসছি।

ইনস্পেক্টর বিরজুর বাবাকে বললেন, তুম বহৎ বুডঢা হো গিয়া বাবা। নোকরি ছোড় দো। ইতনা উমর হো গিয়া লেকিন আভি তক ইয়ে খেয়াল নেহি হুয়া যো ডক্টরকো বোলনা চাহিয়ে?

মেরা বাত তো শুনিয়ে।

হম কুছ নেহি শুননা চাতে।বলেই রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে বললেন, হ্যালো! ডক্টর লোহিয়া! ম্যায় পুলিশ ইনস্পেক্টর বোল রহা হুঁ। জলদি আইয়ে আপ। এক লেড়কাকো শির মে বহতই চোট লাগা। খুন নিকলতা। থোড়া ফার্স্ট এড দেনে পড়েগা।

ফোন করে রিসিভার নামিয়ে রেখে ইনস্পেক্টর সুজয়ের বাবাকে বললেন, বঙ্গালিবাবু! আপনি কিন্তু কাল একটু ফলস স্টেটমেন্ট দিয়েছেন পুলিশকে। একটা ভাল ছেলের নামে আপনি কিডন্যাপিং কেস চাপিয়ে দিয়েছেন?

তার মানে? আমার স্টেটমেন্ট ফলস? তা হলে এই যে মেয়েটে এখানে বসে আছে এটাও কি মিথ্যে?

বসে আছে তো কী হল? কাল রাত্রে আমি এদের মুখে সবকিছু শুনেই বিলাসপুর পুলিশকে জানাই। বিলাসপুর পুলিশ আমাকে জানায় কাল নাকি ওই ছেলেটার নামে থানায় একটা রিপোর্টও করেছেন আপনি। যেটা ঠিক নয়।

করবই তো?

আচ্ছা মশাই বলুন তো, পুলিশে রিপোর্ট তো আপনি করলেন। কিন্তু আপনার বাড়িতে থাকা এই দুটি ছেলেমেয়েকে আপনি প্রোটেকশন দিতে পারলেন না কেন? এদের বাবা-মা তো আপনার বাড়িতে নির্ভাবনায় রেখেছিল এদের। এখন যদি এদের কিছু হয়ে যেত তা হলে তাদের কী কৈফিয়ত দিতেন আপনি? ওই পুলিশের খাতায় লেখানো ডায়েরি দেখিয়েই কি আপনি পার পেতেন?

ছেলেটি বা মেয়েটির চলে আসার ব্যাপারে আমি কিন্তু কিছুই জানতাম না। ছেলেটির অবশ্য লাইফ ডেঞ্জার হয়ে উঠেছিল—।

সে কথা পুলিশকে জানিয়েছিলেন?

না। কারণ আমি কোনও কিছুই জানতাম না। বাড়ি গিয়েই সব শুনলাম। আর এও শুনলাম মেয়েটিও বাড়ি থেকে রাগারাগি করে চলে গেছে।

চলে গেছে না তাড়িয়ে দিয়েছিল আপনার বাড়ির লোকেরা?

তাড়িয়ে দেবে কেন? আসলে মেয়েটা অসম্ভব জেদি। ও একবার যাব বললে, ওকে কেউ আটকাতে পারে না।

তাই? তবু আপনার পরিবারের কারও তো সঙ্গে আসা উচিত ছিল!

আমি বাড়িতে থাকলে সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হত। কিন্তু না-থাকাতেই যত গোলমাল। ও-ও চলে এল। ওরাও যেতে দিল।

তা হলে বলছেন মেয়েটিকে আপনারা তাড়িয়ে দেননি, ও স্বেচ্ছায় চলে এসেছে?

হ্যাঁ। নিজের থেকেই চলে এসেছে।

আপনি কীরকম ভদ্দরলোক মশাই? আপনার জবানের কোনও দামই নেই দেখছি। আপনি অমরকণ্টক-পুলিশকে বলছেন, মেয়েটি নিজের ইচ্ছেয় চলে এসেছে। আর বিলাসপুর-পুলিশকে বলেছেন মেয়েটিকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আপনাকে তো অ্যারেস্ট করা উচিত।

সুজয়ের বাবা মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

ইনস্পেক্টর চাঁদুকে বললেন, তোমার স্টেটমেন্ট কাল আমি বিলাসপুর-পুলিশকে জানিয়েছিলাম। সেইমতো কাল রাত্রে চিরুনি অভিযান চালিয়ে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে যারা এসেছিল তাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

চাঁদুর বুকটা যেন হালকা হয়ে গেল। বলল, তা হলে আর আমার কোনও ভয় নেই, কী বলুন?

মনে তো হয় তাই। লেকিন উয়ো তিসরা আদমি কৌন আছে?

কার কথা বলছেন আপনি?

ওই বিলাসপুরবালে। যে তোমাকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল।

তা তো জানি না।

কথা বলতে বলতেই ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। এই অঞ্চলের নামকরা ডাক্তার। আগে মিলিটারিতে ছিলেন। এখন এখানে আছেন। ডাক্তারবাবু চাঁদুকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে ওর ক্ষতস্থান দেখে বললেন, স্টিচ করনা পড়েগা। ইধার নেহি হোগা, অনুপপুর হসপিটালমে ভেজ দিজিয়ে।

চাঁদু তো লাফিয়ে উঠল, ওরে বাবা! হাসপাতালে যাব না আমি। তাতে যা হয় হবে।

যা না হি পড়েগা। হামারা পাস ইন্সট্রুমেন্ট নেহি। আউর তুমকো নার্সিং, ড্রেসিং করেগা কৌন? দু'-চার রোজ-কে লিয়ে রেস্টেরও জরুরত আছে তোমার।

চাঁদুর চোখদুটো ছল ছলিয়ে উঠল।

থানা থেকেই ডাক্তারবাবু ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনালেন, আর তাতে করেই ওরা ওকে নিয়ে গেল অনুপপুর হাসপাতালে।

গোলাপও যাচ্ছিল সঙ্গে। কিন্তু ইনস্পেক্টর যেতে দিলেন না, বললেন, তুম কাঁহা যাওগী? বৈঠো।

গোলাপ বসে রইল চুপ করে।

এরপর সঙ্গে আসা পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কী সব আলোচনা করে ইনস্পেক্টর গোলাপকে বললেন, তুম এক কাম করো। বিলাসপুর চলা যাও।

বিলাসপুর! কেন? সেখানে কী আছে? গেলে আমি আমার বাড়িই চলে যাব। আপনি কি আমার বাবাকে কোনও খবর দিতে পেরেছেন?

না। সময় করে উঠতে পারিনি।

সুজয়ের বাবা বললেন, আমি খবর দিয়েছি। তোমার বাবা শিগগির আসছেন। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

না। আমি আর ও বাড়িতে ফিরে যাব না।

ইনস্পেক্টর বললেন, তব তুম ক্যা করোগে?

আমি এইখানেই থাকব। বাবা বিলাসপুরে এলে, বাবাকে পাঠিয়ে দেবেন। বাবার সঙ্গেই যাব আমি।

লেকিন এখানে তুমি থাকবে কোথায়?

কেন যেখানে আছি। সার্কিট হাউসে।

ও নেহি হো সকতা। অকেলে তুম মাত ঠারো।

আমার কিছু হবে না ইনস্পেক্টর। দু'-চারটে দিন বইতো নয়। আমি ঠিক থাকতে পারব। ততক্ষণে চাঁদুদাও সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। ওকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আর সার্কিট হাউসে থাকার যা খরচ, তা আমার বাবাই দিয়ে দেবেন।

সুজয়ের বাবা এবার অন্য সুরে কথা বললেন, কেন এরকম করছিস গোলাপ? যদি কিছু দোষত্রুটি হয়ে থাকে আমাদের তা হলে সেটা তুই ক্ষমা করে নে।

আমি তো একবার বলেছি ওখানে আমি যাব না।

আর কখনও যেতে হবে না তোকে, কিন্তু এইবারের মতো চল।

ইনস্পেক্টর বললেন, বুরা মাত বনো। যানা হি আচ্ছা হোগা তুমহারে লিয়ে।

গোলাপ মাথা হেঁট করে বসে রইল।

সুজয়ের বাবা বললেন, আমি কিন্তু আর অনুরোধ করব না। এবারে জোর করব। তোমার মালপত্তর কী আছে নিয়ে এসো। যাও। একদম দেরি কোরো না। আমি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করছি।

দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে উঠে গেল গোলাপ। সুরে বাঁধা বীণার তারটা হঠাৎই কীরকম যেন ছিঁড়ে গেল। চাঁদুদা এখন কী করছে কে জানে? এই দূর দেশে ছেলেটা এখন কতই না অসহায়।

কিন্তু সেই যে গেল গোলাপ, ঘণ্টা পার হলেও আর এল না। সুজয়ের বাবা ইনস্পেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে সার্কিট হাউসে গিয়েই শুনলেন মেয়েটি অনেক আগেই এখানকার হিসাবনিকাশ চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

সমস্যার পর সমস্যা।

গোলাপ কি সত্যিই পালাল? নাকি তরতাজা ফুলের মতো মেয়ে দেখে হাপিস করে দিল কেউ?

ইনস্পেক্টর সঙ্গে সঙ্গে থানায় এসে ফোনে ফোনে খবর পাঠালেন চারদিকে। আর এই সময়ই বিলাসপুর থেকে এক নিদারুণ তারবার্তায় জানা গেল কাল রাতে ধৃত দু'জন আসামিই এক রহস্যময় উপায়ে লকআপ থেকে পালিয়েছে।

দশ

অনুপপুর জায়গাটা মন্দ নয়। অমরকণ্টকের যাত্রীরা অনেকে এখান দিয়েও আসেন। যেমন জব্বলপুরের দিক থেকে যারা আসছেন তাঁরা খামোকা পেনড্রা রোডে নামতে যাবেন কেন? তাই এখান থেকেও নিয়মিত বাস চলাচল করছে। শুধু অমরকণ্টক নয়। মনেন্দ্রগড়, চিরিমিরি আরও অনেক জায়গার বাস পাওয়া যায় এখান থেকে।

সকালের সোনার রোদ্দুরে চারদিক যখন ভরে উঠেছে, তখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কত কী ভাবছিল চাঁদু। গোলাপকে কাল ওরা আসতে দেয়নি। আজ নিশ্চয়ই দেবে। সার্কিট হাউসের ওই নিরালা পরিবেশে একা একা কী করছে সে কে জানে? কাল ওর মাথায় স্টিচ করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে। আজ আর কাল দু'দিন থাকলেই ওর ছুটি। অবশ্য ছুটি পেলে আজকেই ও চলে যেতে পারে। কিন্তু তা দেবে না ওরা।

লছমি নামের একজন ছত্তিশগড়িয়া মেয়ে ওর দেখাশোনা করছে। মেয়েটি বড় ভাল। ও বলেছে ওর এই বিপদের খবর পেয়ে ওর বাবা যখন ওকে নিতে আসবেন, তখন বেশ মোটা রকমের বকশিশ দেবে ওকে। বকশিশের লোভেই হোক বা যে কোনও কারণেই হোক লছমি কিন্তু খুব খুশি ওর ওপর।

চাঁদু অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে নানারকম ভাবনা চিন্তা করল। প্রাণহানির আশঙ্কাটা ওর মন থেকে একেবারেই দূর হয়ে গেছে। তাই নির্ভয়ে এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করে অন্যান্য রোগীদের দেখে দরজার কাছে এল। এমন সময় দূর থেকে যাকে আসতে দেখল, তাকে দেখেই, আনন্দে ভরে উঠল ওর মন। ও দেখল স্বয়ং সিদ্ধিবাবা জোর কদমে হেঁটে আসছেন ওর দিকে।

উনি কাছাকাছি আসতেই চাঁদু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল সিদ্ধিবাবাকে।

সিদ্ধিবাবা বললেন, কেমন আছিস বেটা?

আমি ভাল আছি বাবা। এখনও আমি চলে যেতে পারি। কিন্তু এরা বলছে আরও দু'দিন আমাকে এখানে থাকতে।

বেশ তো। ঠারো। আয়েশ করো।

আপনি কী করে খবর পেলেন আমি এখানে আছি?

কাল বিকেলে নর্মদা মায়ের মন্দিরে গিয়ে আমি সব শুনলাম। থানায় গেলাম। আমি কাল তোমার বাড়িতে ফোন করে সবকিছু জানিয়েছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ওই যে লেড়কি ছিল, ও তো নো পাত্তা হয়ে গেছে।

সে কী!

পুলিশ অনেক চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনওরকম সন্ধান করতে পারছে না। আর

তোমরা যে দু'জনকে কপিলধারার কাছে ঘায়েল করেছ, ওদেরও পুলিশ ধরে এনে খুব পেটাচ্ছে। একজনকে বিলাসপুরে পাঠানো হয়েছে। ওর তো দোনো আঁখো বরবাদ হয়ে গেছে।

কিন্তু ওই মেয়েটা গেল কোথায় বাবা?

ভগবান জানে। বাসে, ট্রেনে, হোটেলে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না মেয়েটাকে।

কেউ ওকে কিডন্যাপ করেনি তো?

হো ভি সকতা।

চাঁদুর মনে হল ওর পায়ের নীচে মাটিটাও যেন দুলছে। মেঘের পরে মেঘ যেন সরতে আর চায় না। কী বিভ্রাট!

চাঁদু বলল, বাবাজি, আমি কিন্তু এখন বেশ সুস্থ। আপনি একটু বলে কয়ে আমার ছুটির ব্যবস্থা করে দিন। এখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারব না। গোলাপকে যেভাবেই হোক খুঁজে বার করতেই হবে। এই অমরকণ্টকে এমন কোনও রহস্য আছে যা আমাদের কাঁটার মতো বিঁধছে। যেমন দুধধারার ওই পাগলা রামু। ওই ভয়ংকর লোকদুটো। গোলাপের অন্তর্ধান। সবই তো দেখছি একই সুতোয় বাঁধা। অমরকণ্টক আমাদের নিয়তি। না হলে এত জায়গা থাকতে মরতে আমরা এখানেই বা আসব কেন।

রহস্য আরও আছে। তোমার আততায়ীরাও খুব রহস্যময়ভাবে লকআপ থেকে উধাও হয়েছে।

কী করে?

যে করে রহস্যের পর রহস্য তার জালকে বিস্তার করে চলেছে, সেইভাবে।

বিলাসপুরের ওই অচেনা লোকটিও তো আর এক রহস্য।

সিদ্ধিবাবা ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন, তুমি বেশি বাইরে ঘোরাফেরা কোরো না। হাসপাতালের বেডেই শুয়ে বসে থাক। আমি পুলিশকে বলছি তোমার দিকে একটু নজর রাখতে। ওই পলাতক লোক দু'জন এখানেও তো আসতে পারে। ওরা এসে গেলে তোমার জিন্দগি বরবাদ করে দেবে।

চাঁদু কঠিন গলায় বলল, ওরা আসুক। আর আমি কাউকে ভয় খাই না। আর আমি পালিয়ে বেড়াব না। এবার লড়ে মরব আমি। বাবাজি, আপনি একটু এইখানকার বনে পাহাড়ে গোলাপকে খুঁজে দেখুন। আমার মনে হয় ও এখানেই কোথাও আছে। কেন না পুলিশ যদি সত্যিই ওর খোঁজে লোক লাগিয়ে থাকে তা হলে এতক্ষণে ধরা ও পড়তই। ওকে কেউ গুম করে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তাই ওর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওর কাছে টাকা-পয়সা আছে, মালপত্তর আছে। সেইসব নিয়েও ও তো হেঁটে যাবে না। বাস অথবা ট্রেনে ওকে উঠতেই হবে। উঠলেই ধরা পড়ত।

আমারও তাই মনে হয়। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আমি কয়েকজনকে কাজে লাগিয়েছি। সমস্ত পাহাড়িদের খবর দিয়েছি। ও যদি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েও গিয়ে থাকে, তা হলেও কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিতে গেলেই ধরা পড়বে। ওর চিন্তা তুমি একদম কোরো না।

সিদ্ধিবাবা চলে গেলেন।

সিদ্ধিবাবা চলে যেতেই লছমি কাছে এসে বলল, তোমার কী হয়েছে ভাইয়া? কী বলছিলে তুমি সাধুজিকে?

চাঁদু বলল, ও তুই বুঝবি নারে।

সমঝানে সে ভি নেহি সমঝেগা?

কিন্তু বুঝেই বা তুই করবি কী?

তবু বোলো না ভাইয়া।

চাঁদু তখন ওর দুঃখের কথা এক এক করে সব বলল।

সব শুনে শিউরে উঠল লছমি। বলল, ইয়ে বাত? তো মালুম হোতা হ্যায় তুমহারা গুলাবকো ও শয়তান রকি নে উঠাকে লে গয়া।

রকি! রকি আবার কে?

রামরূপ সিং কি লেড়কা। বহৎই বদমাশ। ও জরুর বুলানারা মে হোগা।

চাঁদু বলল, বুলানারা! সেটা কোথায়?

বহৎ দূর। অমরকন্টক সে কমসে কম দশ মিল হোগা। হিঁয়াসে ভি জায়দা দূর। হুঁয়া চারো তরফ পাহাড়োঁ পাহাড়।

চাঁদু লছমির হাতদুটো ধরে বলল, তুই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবি লছমি? তুই এইখানকার মেয়ে। রাস্তাঘাট চিনিস। তুই ছাড়া আমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। গোলাপকে উদ্ধার করতে পারলে তুইও লাভবান হবি। ওর বাবার অনেক টাকা। তা ছাড়া একমাত্র মেয়ে। ওর বাবা খুশি হয়ে অনেক টাকা দেবেন তোকে।

লছমি বলল, ভাইয়া, তুম হামকো রুপিয়া কি লালস মাত দিখাও। আমি গরিব ঘর কি লেড়কি। পেটকে লিয়ে এখানে আয়ার কাম করতে এসেছি। তুমহারে লিয়ে ইয়ে কাম হম জরুর করেঙ্গী।

তা হলে তুই আমাকে এখুনি নিয়ে চলো সেখানে।

হুঁয়া যানে সে ফায়দা ক্যা হোগা?

ওই শয়তান রকির খপ্পর থেকে গোলাপকে মুক্ত করব।

ও রকি বহতই খতরনক। ও সব লেড়কি কো লে যাতা। মার ডালতা। কলকাত্তা বোম্বাই ভেজ দেতা।

সে কী!

হ্যাঁ। অ্যায়শা হি করতা ও লোগ। উধার কোঈ আদমি যানে সে বহৎ মারতা।

তা হলে?

চলো, আমরা বরং পুলিশে খবর দিই। ও লোগ জরুর পাকড়েঙ্গে।

চাঁদু বলল, খবরদার নয়। পুলিশে খবর দিলে পুলিশ হইচই পাকিয়ে সব ভেস্তে দেবে। আর পুলিশের মধ্যে যদি ওদের কোনও স্পাই থাকে তা হলে ওরাও ওদের সাবধান করে দেবে। আমরা লুকিয়ে ওখানে যাব। এমনভাবে যাব যাতে সবাই ভাববে বুঝি জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে যাচ্ছি। মাথায় কাঠের বোঝা থাকবে। ময়লা জামাপ্যান্ট পরে থাকব।

লেকিন তোমার এমন সুন্দর চেহারা লুকোবে কী করে?

ও ঠিক পালটি হয়ে যাবে। ওর জন্যে ভাবিস না।

তোমার তবিয়ত ঠিক আছে তো ভাইয়া?

খুব ভাল আছে। বল খেলতে গিয়ে এইরকম মাথা অনেকের অনেকবার ফেটেছে। কিন্তু তুই আর দেরি করিস না। এখুনি চল।

থোড়া দের হোগা।

চাঁদু রেগে মেগে বলল, তা হলে আমি একাই যাব।

লছমি হাসল, তুম! বুলানারা যাওগে? অউর অকেলে? ও বহতই নটখটিয়া রাস্তা ভাইয়া। বলে যা বলল তার অর্থ হল, আর এক ঘণ্টা বাদেই ওর ডিউটি খতম হয়ে যাবে। তখন গেলে ওর নোকরি যাবার ভয় থাকবে না। চাঁদু তো একেবারেই যাবে। কিন্তু ওকে যে আবার ফিরে আসতে হবে, তাই।

অগত্যা এক ঘণ্টা বাদেই যেতে রাজি হল চাঁদু। লছমিকে বলল, যাবার সময় তুই আমার মাথা ঢাকবার জন্যে একটা টুপি, আর বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য একটা ছুরি আনিস। তুই-ও ছুরি রাখিস সঙ্গে। বলা যায় না কখন কী হয়।

লছমি ওকে বেড়ে যেতে বলে নিজের কাজে মন দিল।

একটু পরেই ডাক্তার এসে রোগীদের পরীক্ষা করলেন। চাঁদুকেও একবার দেখে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতেই ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল।

লছমির পর বুধবারি নামে একজন এল। সে এলে ডিউটি খতম হল লছমির। ও তখন চাঁদুকে ইশারা করে নিজের মনে গুণগুণিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ির দিকে চলল।

চাঁদুও সকলের নজর এড়িয়ে লছমিকে অনুসরণ করে চলতে লাগল এক-পা এক-পা করে।

বেশ খানিকটা যাবার পর লছমি কথা বলল ওর সঙ্গে। বলল, তুম হিঁয়া ঠারো। আভি হম আ রহে।

যে জায়গায় ওকে থামতে বলল লছমি, সে জায়গাটা খুবই নির্জন। অনুপপুরও পাহাড়ি এলাকা। যদিও পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হওয়ায় এবং জঙ্গল কাটার ফলে বছরে বছরে জায়গাটার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তবুও ফাঁকা। পিছনেই জঙ্গলের শুরু। গভীর নয়, পাতলা। বড় গাছ একটিও নেই। ছোট ছোট গাছ। বনবাদাড়ে ভরা। চাঁদু ওইখানেই একটি বড় পাথরের খাঁজের আড়ালে বসে রইল চুপটি করে। এইসময় ওর কাছে এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ বলে মনে হতে লাগল। লছমি যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ ওর পক্ষে একা বসে থাকাও যেন একটা দায় হয়ে উঠল।

কতক্ষণ বসেছিল ওর ঠিক মনে নেই। ও যখন বসে বসে লছমির জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক সেই সময় দু'জন মানুষের ছায়া লম্বালম্বিভাবে ওর সামনে পড়তে দেখল। সভয়ে পিছনে তাকিয়েই দেখল বলিষ্ঠ চেহারায় দু'জন যুবক শিকারি বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েই বলল, কী চাই তোমাদের?

ওরা হেসে বলল, আমরা তোমাকে চাই। তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছি আমরা। কী কাণ্ড করে যে পুলিশের চোখ ধুলো দিয়ে এসেছি তা আমরাই জানি। কিন্তু তুমি তো হাসপাতালে ভরতি ছিলে, এখানে কী করে এলে?

যেভাবেই আসি না কেন, সেকথা জানবার কোনও অধিকার তোমাদের আছে বলে মনে করি না।

তা না করতে পারো। কিন্তু তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। কোনওরকম চিৎকার চেঁচামেচি না করে আমাদের সঙ্গে চলে এসো।

যদি না যাই?

তা হলে আমরা অন্য উপায়ে নিয়ে যাব।

চাঁদু আড়চোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। অনেক দূরে অবশ্য দু'-একজনকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে হেঁকে তাদের ডাকতে গেলে দুষ্কৃতীরা ওকে শেষ করে পালাতে পারবে। কেউ নাগালও পাবে না ওদের। তাই বুদ্ধিমানের মতো বলল, কোথায় যেতে হবে?

যেখানে আমরা নিয়ে যাব।

আমাকে নিয়ে যাবার দরকারটাই বা কী? তোমরা যদি আমাকে মারবার জন্যই এসে থাক তা হলে মেরে ফেলো। অযথা অপহরণের ঝুঁকি নিচ্ছ কেন?

ওরা হাসল। হেসে বলল, তোমাকে মারব কি মারব না সেটা ঠিক করব পরে। আগে তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হোক। তোমার বাবাকে মোচড় দিয়ে কোনও মালকড়ি আদায় করতে পারি কি না দেখি। তবে তো।

এই যদি তোমাদের মতলব তা হলে এতদূর আসতে গেলে কেন তোমরা? এটা তো পাড়াতেই হতে পারত।

পারত। তবে তখন আমাদের ওইরকম কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ঘটনাচক্রে এইরকম করতে বাধ্য হচ্ছি। তা যাকগে, এখন এসব কথা নয়। আগে তোমাকে কোনও একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখি। তারপর সব ঠিক করব। পুলিশ খুব খোঁজাখুঁজি করছে আমাদের। সন্দীপটা বিশ্বাসঘাতকতা করল তাই। না হলে পুলিশেও আমাদের ধরত না। তোমাকেও সাবাড় করে দিতুম বিলাসপুরে।

কথা বলতে বলতে ওরা জঙ্গলের পথধরে খানিকটা এগোবার পর একটা পাকা রাস্তা দেখতে পেল। পথটি নির্জন, কিন্তু এই পথে মোটর-বাস যাতায়াত করে। একজন এইখানে একটি পাহাড়ের বড় পাথরের আড়ালে চাঁদুকে নিয়ে লুকিয়ে রইল। আর একজন অনেক চেষ্টার পর একটা ভ্যানগাড়িকে হাত দেখিয়ে থামাল। এতে কিছু প্রসাধন সামগ্রী যাচ্ছিল। সেই ভ্যানে ওকে উঠিয়ে একজন ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে বলল, বুলানারা।

ড্রাইভার কঠিন গলায় বলল, উধার হম নেহি যায়েঙ্গে।

লোকটি এবার একটা রিভলভার বার করে ড্রাইভারের ঘাড়ের কাছে ধরতেই গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

বুলানারা নাম শুনেই চমকে উঠেছিল চাঁদু। ও তো সেখানেই যাচ্ছিল। কিন্তু এইভাবে এত সহজে যে সে সেখানে পৌঁছতে পারবে তা ভাবতেও পারেনি। শয়তান রকি গোলাপকে সেখানেই তো নিয়ে গিয়ে রেখেছে। গোলাপের সঙ্গে আর একবার দেখা হবে এই আশাতেই ওর বুকটা ভরে উঠল। কিন্তু রকির সঙ্গে এই লোকদুটোর সম্পর্ক কী? এরা তো বাঙালি। থাকে হাওড়া অথবা কলকাতায় কিম্বা তারই আশেপাশে কোনও শহরতলিতে। অথচ এই মেকল পর্বতের ঘন অরণ্যের সঙ্গে এদের যোগসূত্র কীসের?

বেশ কিছুটা পথ যাবার পর এক জায়গায় ভ্যানটাকে থামাল ওরা। তারপর যা করল তা যেমনই বর্বরোচিত, তেমনই অমানুষিক। ওরা ভ্যান থেকে নেমেই গায়ের জোরে ভ্যানটাকে পাহাড়ের খাদের দিকে ঠেলে দিল। প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠল ড্রাইভার। কিন্তু কে শোনে তার আর্তনাদ। ভ্যানটা গড়িয়ে পড়ল খাদে। সব শেষ।

চাঁদু ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ওরা চাঁদুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ভয় কী! এরকম আমরা অনেক করেছি। ওটাকে না-মারলে ও গিয়ে পুলিশে খবর দিত। তখন বিপদের আর শেষ থাকত না। তাই শত্রুর শেষ আগেই করে দিলাম।

ওরা ওকে বনপথ ধরে এক জায়গায় একটি পুরনো বাড়ির কাছে নিয়ে এল।

বাড়িটাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে একতলা। কিন্তু ভেতরে ঢোকার মুখেই কার্পেটের নীচে যে কবজা আঁটা কাঠের ডালাটা আছে, সেটাকে তুলতেই দেখা গেল নীচে নামার একটা সিঁড়ি আছে। ওরা ওকে সেইখানে নিয়ে এসে বলল, যা। নীচে যা।

চাঁদু কী করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে নীচে নামল। বেশ কয়েক ধাপ নামার পরে দেখল নীচের তলায় মুখোমুখি দু'-তিনটি ঘর। একজন পাহাড়ি সেখানে একটি ঘরের কাছে টুল পেতে বসে আছে। ওকে দেখেই এগিয়ে এসে বলল, আও দোস্ত। বলে একটা ঘরের শিকল খুলে দরজাটা ফাঁক করেই এক ধাক্কায় ওকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিল।

সেই ধাক্কার টাল সামলাতে পারল না চাঁদু। একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ঘরের মেঝেয়। একে মাথার ওই অবস্থা, তার ওপরে ওইভাবে পড়ে যাওয়া। চোখে যেন সর্ষে ফুল দেখল। কী ভাগ্যে মাথাটায় লাগেনি। সেই ঘরে আর একজন যে ছিল তাকে দেখেই চিনতে পারল চাঁদু। সেই লোক। সেই তৃতীয় ব্যক্তি। বলল, এ কী! আপনি এখানে?

তোর জন্যই তো এখানে আসতে হল আমাকে।

কেন?

বাঃ রে। তোকে বাঁচাতে গিয়েই তো এদের হাতে বন্দি হলুম।

আপনি বন্দি?

দেখছিস না হাতদুটো পিছনদিকে মুড়ে বাঁধা।

তা হলে কেন আপনি আমাকে বাঁচাতে গেলেন?

ভুল করলাম। আমার কথা না শুনে তুইও ভুল করলি। এখন তুই, আমি, জুলি তিনজনেই মরব।

জুলি! জুলি কোথায়?

সে আছে, পরে সব বলব। তোকে আমি কত করে বললাম, তুই দূরে কোথাও পালিয়ে যা। কিন্তু কেন একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে এখানে আসতে গেলি? তারপর থানা-পুলিশ করে এমন কাণ্ড করলি যে আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। তোর ওই আততায়ীরা আমারও শত্রু। ওদের মারব বলে এমন ফাঁদ পেতেছিলাম যে পুলিশের চালে নষ্ট হয়ে গেল সব। ওরা এমনই শয়তান যে ওদের না মেরে ধরে রাখা যায় না। হলও তাই। ধরা পড়া মাত্রই ওরা রকির কারসাজিতে ফসকে পালাল। ইতিমধ্যে পুলিশের হইচইতে আমরা সবাই জেনে গেছি অমরকণ্টকের সার্কিট হাউসে উঠেছিস তোরা। রকির তিন সঙ্গী তোদের কপিলধারায় আটকাতে গেলে তোরা তাদের রীতিমতো ঘায়েল করেছিস। কিন্তু তারপরও মেয়েটা ওদের খপ্পর থেকে রেহাই পেল না। তুইও ধরা পড়লি।

অনুপপুর হাসপাতাল থেকে ওরা তোকে নিয়ে এল কী করে?

চাঁদু তখন আগাগোড়া সব বলল তারপর বলল, ওরা একজন সন্দীপের নাম করছিল। আপনিই কি সন্দীপবাবু?

বাবুটাবু কিছু নই। সন্দীপদা বলবি।

আচ্ছা, গোলাপকে ওরা কোথায় রেখেছে? জুলি কোথায়?

গোলাপ কে?

আমার সঙ্গের মেয়েটি।

ওর কথা বলতে পারব না। তবে জুলিকে আমি চম্পায় লুকিয়ে রেখেছি।

চম্পা! সেটা কোথায়?

বিলাসপুরের কাছে। চম্পার ওপর দিয়েই তো এলি।

ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে।

মনে না পড়াটাই স্বাভাবিক। ভোরে ট্রেনটা থেমেছিল। তখন হয়তো ঘুমোচ্ছিলি।

চাঁদু বলল, সন্দীপদা, আমার সব কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। কী থেকে যে কী হল। কোন রহস্যের জালে কীভাবে জড়িয়ে পড়লাম। কিছুই বুঝতে পারছি না। কোথায় ছিলাম আমরা। কোথায় এলাম। কোথায় আমাদের হাওড়া শহর, আর কোথায় এই অমরকণ্টকের মেকল পাহাড়।

এর পিছনে অনেক জটিল রহস্য আছে ভাই।

রাজুর খুন হওয়া, জুলির হারিয়ে যাওয়া, সবই তো রহস্যময়। তা ছাড়া আমি তো কারও কিছুই করিনি। তবু কেন ওরা আমাকে বাঁচতে দিতে চায় না? আপনি তো আমাকে চোনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। আপনি যেসব জায়গায় আমাকে পালাতে বললেন, সেখানে পালালে আমার কোনও বিপদ হত না। শুধু আমার কেন, গোলাপেরও হত না কিছু। কী সুন্দর ফুলের মতো মেয়েটা।

ওরা দুষ্কৃতী। ওদের কাছে ফুলের পাপড়ি ঝরানোও যা, একটা মেয়েকে অপহরণ করে লোপাট করে দেওয়াও তাই। ভাগ্যে জুলিটাকে আমার কাছে রাখিনি। ওকে ওরা হন্যে হয়ে খুঁজছে। এখন যেভাবেই হোক এখান থেকে পালাতে না পারলে আমাদের বাঁচোয়া নেই। জুলিকে বিলাসপুরেই আমি তোর হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু তখন তোরই জীবন বিপন্ন ছিল।

এখন কি এখান থেকে পালানো যায় না?

না। বুলানারার এই বন্দি গুহায় একবার কেউ এসে হাজির হলে মৃত্যুই তার একমাত্র মুক্তি। তবু মরবার আগে মানুষ একবার অন্তত বাঁচবার চেষ্টা করে। আমরাও করব। আর এও বলে রাখি, এখান থেকে পালাবার একমাত্র পথ কিন্তু, যে-পথে এলি সেই দিকেই। বাঁদিকের পথ বিপজ্জনক। ও পথে অবধারিত মৃত্যু।

ওইটাই প্রকৃত গুহামুখ। কিন্তু এই গুহামুখের নীচেই প্রায় সাতশো থেকে হাজার ফুট গভীর খাদ। গুহা থেকে বেরোবার কোনও পথ নেই। অর্থাৎ একটা দেওয়ালের মতো খাড়াই চাঁছা পাহাড়ের গায়ে এই গুহা। গুহার ভেতর থেকে বাইরের প্রকৃতি দেখা যায়। কিন্তু বেরোতে গেলেই শেষ। আর গুহামুখ এমনই পিচ্ছিল যে সেখানে যাবার আগেই শ্যাওলায় হড়কে একবারে মোক্ষধাম।

তা হলে?

তা হলে আর কী? এখন চেষ্টা করে দেখ দেখি আমার হাতকড়াটা কোনওরকমে খুলতে পারিস কি না।

চাঁদু অনেক চেষ্টা করল সে দুটো খোলবার। কিন্তু পারল না। বলল, আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু এই হাতকড়া তো পুলিশের লোকেরা আসামিদের বন্দি করবার জন্যে ব্যবহার করে। ওরা পেল কোথায়?

তা হলেই বুঝতে পারছিস তো লকআপ থেকে শংকর আর অর্জুনের বেরিয়ে আসাটা অত সহজ কী করে হয়েছিল?

শংকর আর অর্জুন!

তোকে যারা এখানে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু তুমি ওদের সবাইকে কী করে চিনলে সন্দীপদা?

সে সব অনেক কথা। আর হয়তো বলবার সময় পাব না! এইবেলা বলে রাখি। বলেও লাভ হবে না। তবু কোনওরকমে যদি এদের খপ্পর থেকে পালাতে পারিস তা হলে হয়তো কাজে লাগবে। তবে আমাকে ওরা মারবেই। রকি এলেই মরতে হবে আমাকে। ও যে রকম নির্দেশ দেবে সেইভাবেই মারবে। কী ভয়ংকর পৈশাচিক মৃত্যু আমার জন্যে অপেক্ষা করছে তা কে জানে?

চাঁদু সবকিছু শোনবার আশায় অধীর আগ্রহে সন্দীপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই ঘনঘোর রহস্যের অন্ধকারে সন্দীপদা নতুন কোনও আলোকপাত হয়তো করতে পারবে না, কিন্তু অতীতের তমসা তো দূর করতে পারবে।

এগারো

এই বন্দি গুহায় চাঁদু অনুভব করল এখানে চারদিকেই মৃত্যুর শীতলতা। বেলা এখন কত তা কে জানে? খিদেও পেয়েছে খুব। লছমির মুখে বুলানারার কথা শুনে ও মনে মনে বুলানারা সম্বন্ধে আলাদা একটা ছবিই এঁকে ফেলেছিল। এখন এখানে এসে বুঝল, কল্পনার সঙ্গে এই বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন। বুলানারা একটা পাতালপুরী বা জ্যান্ত মানুষের কবরখানা ছাড়া কিছুই নয়। এখানে দয়া নেই, মায়া

নেই, করুণা নেই, কিছুই নেই। আছে শুধু নির্মম নিষ্ঠুর নিয়তির হাতছানি। নেহাতই দুর্ভাগ্য না হলে এখানে কেউ এসে পৌঁছয় না।

তবু এই মৃত্যুপুরীতেই জুলির খবর পাওয়া গেল। মেয়েটা জীবিত কি মৃত তা নিয়ে ঘোর সংশয় ছিল ওর মনে। এখন কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারলে, জুলিকে নিয়েই ফিরে যাবে ওর মায়ের কাছে। কিন্তু গোলাপ! গোলাপের কী হবে? সে কোথায়? সে কি এখানে এই বুলানারাতেই আছে? এই মৃত্যুগুহায়? যদি থাকে তা হলে কোথায়? কোনখানে?

চাঁদু বলল, আমি না হয় বোকার মতো নিজের থেকেই ধরা দিয়েছি এদের হাতে। কিন্তু তোমাকে এরা ধরল কীভাবে?

সে অনেক কথা। শোন তবে।

সন্দীপ বলতে লাগল, আমার নাম সন্দীপ সরকার। আমি শালিমারের কাছে ভড়পার রোডে থাকি। শালিমারে রেলের গোডাউনে গুন্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওয়াগন ভাঙার কাজ করি। বিলাসপুর, কাটনি, ঝাড়সুগড়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মাঝে মধ্যে রেললাইনের ফিস প্লেট সরিয়ে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটাই। আগে তোর বাবা তারাপদবাবু আর কেষ্ট মিত্তির ছিলেন আমাদের লিডার। তোদের ওই যে বিশাল বাড়িটা। কেষ্ট মিত্তিরের ওই যে ফ্ল্যাট বাড়িগুলো সব ওই পাপের টাকায়।

সন্দীপদা!

উত্তেজিত হোস না। তুই যে এত বড়টা হয়েছিস, লেখাপড়া শিখেছিস, এই যে ভাল ভাল পোশাক পরছিস সবই কিন্তু ওই পাপের টাকায়। অসৎপথে উপার্জিত অর্থে প্রতিপালিত হওয়া একজন হলি তুই বা তোদের সবাই। তা যাক গে। তোর আর দোষ কী বল? তবে একটা কথা, তুই যেন তোর বাবার মতো হোস না।

তুমি যা বলছ তা সত্যি?

মৃত্যু আসন্ন জেনেও কেউ কি মিথ্যে বলে?

তারপর?

তুই যখন খুব ছোট, তখন আমি কতবার তোদের বাড়িতে গেছি। তোকে কোলে করে আদর করেছি। তোর ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল।

সেইজন্য সেদিন বিলাসপুরে নদীর ধারে তোমাকে দেখার সময় মনে হয়েছিল তুমি আমার কত চেনা। কতবার যেন দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না।

এখনও নিশ্চয়ই মনে পড়েনি। মনে পড়বার কথাও নয়। তা যাক, এই সময় অরিন্দম হাজরা নামে এক ঘুঘু এই লাইনে ভীষণভাবে মাথা চাড়া দেয়। সেই

অরিন্দম হাজরারই দুই ছেলে শংকর ও অর্জুন। শয়তানিতে এদের জুড়ি নেই। সবাই বলে শংকরার্জুন। তা সেই অরিন্দম হাজরা শালিমারের তিন নম্বর গেটের কাছে নৃশংসভাবে খুন হন। খুনটা অবশ্য আমরাই করেছিলাম। চক্রান্তের মধ্যমণি ছিলেন তোর বাবা এবং কেষ্ট মিত্তির দু'জনেই। অনেকদিন পরে ব্যাপারটা যখন ফাঁস হয়, কেষ্ট মিত্তির তখন পুরো দায়টা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে সাধু সাজেন। এবং শংকর-অর্জুনকে দলে রাখেন।

চাঁদু দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, আমার বাবা খুনি?

অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে। যাই হোক, এর পরে নিজেদের মধ্যে হিস্যা নিয়ে বিবাদ এবং অবিশ্বাস দেখা দেওয়ায় বা লাইনে ক্রমাগত নতুন লোকের আমদানি হওয়ার ফলে আমাদের দলটা পুরোপুরি ভেঙে যায়। তোর বাবা এখন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ হয়ে গেছেন। অর্থ প্রতিপত্তি কোনও কিছুরই অভাব নেই তাঁর। কেষ্ট মিত্তিরও এখন এক ঝানু ব্যবসাদার। আর আমি তো চুনোপুঁটি। মাঝে মধ্যে খারাপ কাজ একটু আধটু করলেও মূলত এখন আমি কোল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কাছে একটা ছোট্ট কারখানা করেছি। সম্প্রতি এইখানে বহিরাগত এক অত্যাচারী গুন্ডা এই পাহাড়-জঙ্গলে বেশ পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। জনা কয়েক লোককে নিয়ে সে ওয়াগন ভাঙা থেকে শুরু করে ড্রাগের ব্যবসা পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে ছোট বড় মেয়ে দেখলেই চুরি করে পাচার করছে অন্য শহরে। আমি রকির দলেও কিছুদিন কাজ করেছি। তাই ওর সবকিছু এত ভাল করে বলতে পারলাম।

ওর দল তুমি ছেড়ে দিলে কেন?

একটাই মাত্র কারণে। সেটা হল মেয়েচুরি। ওকে আমি অনেক বারণ করেছি, কিন্তু ও শোনেনি। সেই নিয়ে ওর সঙ্গে আমার দারুণ মতভেদ। পালটা দল আমারও আছে। আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ওকে এই পথ থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু মুশকিল হল কী, ওরই দু'-একজন লোক যে ওর স্পাই হয়ে আমার দলে ভিড়ে কাজ করছিল তা আমি ভাবিনি। না হলে আমি হচ্ছি ফাঁকা মাঠের বেড়াল। আমার হাতে বেড়ি দেবে এমন কেউ ছিল না।

অর্থাৎ তোমার দলের লোকই তোমাকে ফাঁসাল!

ঠিক তাই।

কিন্তু শংকর ও অর্জুনের সঙ্গে রকির সম্পর্ক কী?

স্মাগলিং-এর। ওরা দু'জনেই এখন ওর দলের লোক। পুলিশ যদি না আসত তা হলে ওরা দু'জনেই খুন হত কাল আমার হাতে। শুধু তোকে সতর্ক করতে গিয়েই সব চাল ভেস্তে গেল। উলটে আমিই ওদের প্যাঁচে জড়িয়ে পড়লাম।

চাঁদু সব কিছু শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলল, বুঝেছি। এই কারণেই বাবা

সুজয়দের বাড়ি আসার ব্যাপারে প্রথমে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলেন। উনি চাননি এই বেল্টে আমি কখনও আসি।

ঠিক তাই।

পরে অবশ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উনি আমাকে এখানেই পাঠান। কেন না তিনি হয়তো ভেবেছিলেন কেষ্ট মিত্তিরের কালো হাত এত দূরে পৌঁছবে না।

এবং আমাকেও ফোনে সতর্ক করে বলেছিলেন, ছেলেটাকে একটু দেখিস।

স্ট্রেঞ্জ! বাবা জানতেন তুমি এখানে আছ?

না হলে আমি জানলাম কী করে তুই এখানে আসছিস? শংকর আর অর্জুন যে তোকে খুন করবার জন্যে এখানে আসছে বা আসতে পারে, সে খবরও তোর বাবার কাছ থেকেই পাই?

চাঁদু বলল, সন্দীপদা! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। আমার মরে যাওয়াই ভাল।

তুই কি বাঁচবি? মরতে তোকে হবেই। আমাকেও। রকি এলে আমাদের দু'জনকেই ওই গুহামুখের কাছ থেকে খাদের ভেতর ফেলে দেবে।

চাঁদু শিউরে উঠল।

সন্দীপ বলল, কীরে! মরবার নাম শুনে ভয় পেলি? অথচ একটু আগেই তো মরতে চাইছিলি তুই?

চাইছিলাম। কিন্তু এইরকম মৃত্যুকে চাইছিলাম না।

মরণ সুমনোহর বেশে সবার জীবনে আসে না রে।

এরপর দীর্ঘ নীরবতা।

চাঁদু বলল, সব শুনলাম। সব বুঝলাম। এখন বলো জুলিকে তুমি পেলে কোথায়?

হ্যাঁ, এবার জুলির কথাই বলি। সেই অভিশপ্ত দিনটিতে ফিরে যাওয়া যাক। জুলি আমাকে বলেছে তুই নাকি ওকে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলি মোড়ের মাথার একটা দোকান থেকে কচুরি কিনে আনতে।

হ্যাঁ। জুলি ঠিকই বলেছে। আমিই পাঠিয়েছিলাম ওকে।

বেচারি জুলি। নিষ্পাপ মেয়েটি যখন মোড়ের মাথায় এল ঠিক তখনই...।

এমন সময় বাইরে মস মস শব্দ।

সন্দীপ চুপ করে গেল। কে বা কারা যেন আসছে। চাঁদুও সভয়ে পিছিয়ে এল দরজার কাছে।

ঘরের শিকল খুলে ভেতরে ঢুকল শংকর আর অর্জুন। ওরা এসে সন্দীপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তা হলে সন্দীপবাবু! আমাদের মারতে গিয়ে তুমি নিজেই এই মরণফাঁদে ধরা পড়লে শেষকালে? যাক, ভালই হয়েছে। এখন

আমাদের কোনও শত্রু নেই। এবার বলো তো, সেই মেয়েটাকে কোথায় রেখেছ?

সন্দীপ হেসে বলল, লাভ কী তাতে? বললেও মরব। না বললেও মরব।

মরবে তো নিশ্চয়ই। এই যে কেউটের বাচ্চাটা। এও তো মরবে। একে টোপ দিয়েই তো এর বাবাকে চারে ফেলব। এর বাবা লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের খুন করবার জন্য মদত দিয়েছিল তোমাকে? কেষ্ট মিত্তিরের মুখে সব শুনেছি আমরা। জেনে রেখো বাবার হত্যাকারীদের কিন্তু আমরা সহজে ছাড়ব না। সেই হত্যার বদলা আমরা হত্যা দিয়েই নেব। এতদিন ওত পেতেছিলাম। এবার কাজ শুরু করেছি।

সন্দীপ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, এতই যদি বাবার ওপর দরদ তোমাদের, এতই যদি আদর্শের জোর, তা হলে যে কেষ্ট মিত্তিরের হয়ে এতদিন কাজ করলে সেই কেষ্ট মিত্তিরও তো তাদেরই একজন।

সেটা অবশ্য আগে জানতে পারিনি। যেদিন পারলাম সেদিন থেকেই চেষ্টা করতে লাগলাম ওর ক্ষতি করবার। শুধু রকির দলে জড়িয়ে পড়ায় আর পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়ানোর জন্যই এতদিন তা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই যে মুহূর্তে সুযোগ পেলাম সেই মুহূর্তেই সরিয়ে দিলাম ছেলেটাকে।

তোমরাই তা হলে রাজুর হত্যাকারী?

হ্যাঁ। এবার পালা কেষ্ট মিত্তিরের। তবে এখনও ওর সময় হয়নি। ওকে তিল তির করে শোষণ করে একেবারে ছিবড়ে করে দিয়ে তবেই মারব। অবশ্যই ওর মরণও হবে এই মরণগুহায়।

চমৎকার পরিকল্পনা। কিন্তু এমন আদর্শবাদী যুবক হয়ে তোমাদের বোনের বয়সি একটি নিষ্পাপ কিশোরীর নামে খুনের বদনামটা চাপিয়ে দিতে বিবেকে বাধল না?

বাঃ রে। আমরা কেন বদনাম দেব? পুলিশ দিয়েছে। খবরের কাগজ দিয়েছে। রাজুর বন্ধুরা মেয়েটিকে ওর সঙ্গে যেতে দেখেছে। দোকানদার দেখেছে, আরে! মেয়েটাকে তো আমরা খুন করছি না। হোক না মেয়েটা দাগি। কী যায় আসে তাতে? ও তো এখন আমাদের মূলধন। কিন্তু তুমি আমাদের মুখের গ্রাম কেড়ে নিলে কেন?

তোমরা তো জান ভাই, আমার দুর্বলতাটা কোথায়? আমার মা যখন আমাদের নিয়ে কলকাতার ফুটপাথে বড়লোকের গাড়ি বারান্দার নীচে রাত কাটাতেন, তখন এক গভীর রাতে আমার দশ বছরের আদরের ফুটফুটে বোনটাকে কখন কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেল। সেই শোকে মা আমার হাওড়ার ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। তাই কোনও মেয়ের গায়ে কেউ হাত দিলে বা মেয়েচুরির কাজ করলে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি না।

ঠিক তাই কি?

না হলে তোমাদের কারও সঙ্গে অন্য কোনও ব্যাপারে আমার গরমিল কখনও হয়েছে; এই রকির সঙ্গেও আমার বিবাদ তো সেই নিয়ে। আজ আমি অসহায়। আমি বন্দি। ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর প্রহর গুণছি। কিন্তু একবার তোমরা ভেবে দেখো তো, কেন তোমরা আমাকে মারতে এসেছ? কেন চাইছ এই অসহায় নির্দোষ ছেলেটাকে মেরে ফেলতে? বাবার হত্যার বদলা নিতে। এই তো? এখন আমিও যদি আমার বোনের অপহরণকারীদের না-পেয়ে ওই ধরনের কাজ যারা করে তাদের বিরোধিতা করি তা হলে কী অন্যায়টা করেছি? আমার আপত্তি তো শুধু ওই কাজটিতে। এর বাইরে তো আমরা সবাই এক। আমাদের সবারই তো একই পরিচয়— ওয়াগন ব্রেকার। আমরা সবাই তো একই সূত্রে গাঁথা এক-একটি ক্রিমিনাল। তাই না?

শংকর আর অর্জুন চুপ করে রইল।

সন্দীপ আবার বলল, এখনও সময় আছে ভাই, রকিকে তোমরা বোঝাও। এই সর্বনাশা মেয়েচুরির খেলা ও যেন বন্ধ করে।

অর্জুন বলল, ঠিক আছে। এতসব ব্যাপার আমরা জানতাম না। মেয়েচুরির কাজে ঝক্কি অনেক। টাকাও অনেক। ও কাজ আর করব না। এখন তোমাকে আমরা মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে।

রকির হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু আমি কামনা করি না। এখনও আমি বাঁচতে চাই। মুক্তির বিনিময়ে আমি যে কোনও শর্তে রাজি।

ওই জুলি মেয়েটার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। ও কখনও ওর মায়ের কাছে ফিরে যাবে না। কেন না ও ফিরে গেলে পুলিশের জেরার মুখে যদি সব কথা বলে দেয়, তা হলে কিন্তু খুনের দায়ে ধরা পড়ব আমরা। তার চেয়ে মেয়েটা তোমার কাছেই থাক। তোমার হারানো বোনের অভাব পূর্ণ করুক।

সন্দীপ বলল, ভাল কথাই বলেছ। তবে এও জেনো মেয়েটা বললেই কী, না বললেই কী পুলিশের খাতা থেকে আমাদের ব্ল্যাক লিস্টের নাম তো কেউ মুছে দিতে পারবে না। তা ছাড়া খুন তো আরও হবে। কেষ্ট মিত্তিরের জন্য একটা বুলেট খরচা করতে হবে না? তোমরা ওর ছেলেকে মেরেছ। আমি মারব ওকে। বিশ্বাসঘাতক শয়তান। তোমাদের বাবার হত্যাকারীদের চক্রে আমিও একজন ছিলাম। কিন্তু আমি তখন সাধারণ একজন কর্মী মাত্র। এই ছেলেটির বাবাও ছিলেন নেপথ্যে। কিন্তু আসল ঘুঘু কেষ্ট মিত্তির। ওইসব ঘটনার পর এর বাবা অবশ্য একেবারেই লাইন ছেড়ে সরে যায়। কিন্তু কেষ্ট মিত্তির এখনও সমানে ওর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শংকর বলল, ছেলেটা তো সব শুনল। ও বলে দেবে না?

না। ওর চোখ দেখছ না? ও নিজেও চাইছে ওর অপরাধী বাপের হাতে হাতকড়া পড়ুক। একটু আগে আমার মুখে ওর পিতৃপরিচয় পেয়ে ও নিজেই মরতে চাইছিল।

শংকর আর অর্জুন দু'জনেই সবিস্ময়ে বলল, তাই নাকি? সত্যিই কী বাপের কী ছেলে। অবশ্য আমরা যখন ওকে চুরি করে আনি, তখন কিন্তু ও একটুও বেগ দেয়নি আমাদের।

শংকর ডাকল, মুশা!

সেই বামনাকৃতি দারোয়ান গোছের লোকটা ভেতরে এল।

অর্জুন বলল, হাতকড়াটা খুলে দাও।

নেহি। রকি হামকো বহুত মারেগা।

শংকর এক ঝটকায় ফেলে দিল মুশাকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল, ডিস্যুম ডিস্যুম।

শংকর আর অর্জুনের দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে এলেন এক সর্দারজি। চাঁদুকে দেখেই বললেন, ইয়ে লেড়কা কৌন হ্যায়? কাঁহাসে আয়া?

দারোয়ানটা বলল, উয়ো দোনো বদমাশনে লে আয়া।

সর্দারজি মাথার পাগড়ি, চোখের কালো চশমা আর নকল দাড়ি এক টানে খুলে বললেন, বাহার লে যাও। ফিক দো নীচে। যাও, জলদি করো।

চাঁদুর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা হিমস্রোত নেমে এল। এই কি রকি!

লোকটি ওকে হাত ধরে টেনে আনল ঘরের বাইরে।

চাঁদু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, জল। একটু জল দাও আমাকে।

লোকটির দয়া হল বুঝি। সে হিংস্র চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, হাঁ। মরণে সে পহলে পি লো। বলে পিছন ফিরতেই চাঁদু ওর পায়ের ফাঁকে পা গলিয়ে জোরে একটা টান দিল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। আর সেই মুহূর্তেই চোখের পলকে বন্দিগৃহের দরজাটা টেনেই তাইতে শিকল আটকে দিল চাঁদু।

ভেতরে যারা ছিল দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। চিৎকার করে বলতে লাগল, খোলো খোলো। দরোয়াজা খোলো। এ মুশা!

আর মুশা। চাঁদু তখন আবার নিজমূর্তি ধরেছে। যে টুলটার ওপর বসে বসে চৌকিদারি করছিল মুশা, সেই টুলটার বাড়ি বেশ ঘা কতক দিয়ে ওর নাকমুখ থেঁতো করে দিল। মুশার যখন আর উঠে দাঁড়াবারও শক্তি রইল না চাঁদু তখন ওর বুকের ওপর চেপে বলল, গোলাপ কোথায়? কোন ঘরে রেখেছিস তাকে?

মুশার কথা বলবারও শক্তি নেই। তবু কোনওরকমে বলল, মুঝে না মালুম।

তুমহারা বস এক লেড়কি কো চুরাকে লে আয়া। ও কাঁহা হ্যায়?

মুশার সেই একই উত্তর, মুঝে না মালুম।

চাঁদু সেই টুলের বাড়ি ওর মুখের ওপর আরও এক ঘা দিয়ে বলল, এবার মালুম হয়েছে?

নেহি।

ফের এক ঘা দিয়ে বলল, এবার?

আভি হুয়া।

কাঁহা হ্যায় ও।

মুশা বহুকষ্টে আঙুল দেখিয়ে বলল, উ-উ-উধার।

পাশের একটা ঘরে, মানে যে ঘরে মুশা থাকত, সেই ঘরের দরজার শিকল খুলে মুশাকে টেনেহিঁচড়ে ঢোকাল চাঁদু। ওর যদিও আর নড়বার ক্ষমতা নেই, তবু কথায় আছে সাবধানের মার নেই। তাই ওকে ঘরে ঢুকিয়ে ঘরের ভেতর হাতড়ে একটা টচ আর একটা গুপ্তি ছোরা বার করে দরজায় শিকল দিল। শিকল দিয়ে ফিরে আসতে গিয়েও কী ভেবে যেন আবার শিকল খুলে ঘরে ঢুকে একটা তালাচাবি জোগাড় করে সেই বন্দি ঘরে তালা দিল।

ভেতর থেকে আস্ফালন তখনও সমানে চলছে।

চাঁদু বাইরে থেকেই বলল, সন্দীপদা! আমি যে ভাবেই হোক পুলিশ নিয়ে এখানে আসছি। আর কয়েক ঘণ্টা কষ্ট করো তুমি। আমাকে ভুল বুঝো না যেন।

সন্দীপ ভেতর থেকেই বলল, কিচ্ছু ভুল বুঝব না। খুব চালাকিটা করেছিস তুই। দরজা খুললে তুইও মরবি, আমিও মরব। মাঝখান থেকে এই পাপীরা পার পেয়ে যাবে। তার চেয়ে তুই বাঁচলে অনেকে বাঁচবে। চম্পার দেবীমন্দিরে পূজারিজির ঘরে জুলিকে রেখেছি। ওকে উদ্ধার করিস। আর এই বাড়ির বাইরের দিকে পিছনের অংশে একটা সিঁড়ি দেখতে পাবি। সেই সিঁড়ির নীচে...

ডিস্যুম।

আবার একটা গুলির শব্দে। আর সেই গুলির শব্দের সঙ্গেই সন্দীপের কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেল।

চাঁদু বলল, সন্দীপদা! কী হল তোমার?

ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দরোয়াজা খোল শয়তানকা বাচ্চা। নেহি তো তেরা ভি অ্যায়শা হাল হোগা।

চাঁদু বলল, দরজা খুললে আমার হাল যে কী হবে তা তো জানি। তাই এ দরজা আমি কখনও খুলছি না।

চাঁদু এক-পা এক-পা করে বাইরে এল এবার। তারপর এদিক সেদিক করে অনেক খুঁজেও সিঁড়ি কোথাও দেখতে পেল না। ও যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে কী

করবে ভাবছে তেমন সময় হঠাৎই এক জায়গা থেকে একটা কুকুর ভৌ ভৌ করে ছুটে আসতেই, ও একটা পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারল কুকুরটাকে।

পাথরটার মোক্ষম ঘা কুকুরের মুখে পড়তেই 'ভ্যাক' করে একটা ডাক ছেড়ে পালাল কুকুরটা। আর তখনই চাঁদু দেখতে পেল, ছোট একটা দেড় ফুটের মতো সরু সিঁড়ি একটা কাঠের আগড়ে ঢাকা আছে। সেটা সরিয়ে একটু ঝুঁকে নীচে নামতেই একটা বড়সড় গুহার ভেতরে এসে পড়ল। কিন্তু সেই গুহামুখে জেলখানার মতো মোটা মোটা লোহার গরাদের একটা আটকানো আছে। সেটাও আবার তালা দেওয়া। বেশ ভারী ধরনের মজবুত তালা। ভাগ্যে মুশার ঘর থেকে টর্চটা নিয়েছিল তাই এদিক সেদিক ফেলতেই এক জায়গায় পেরেক ঝোলানো একটা চাবি দেখতে পেল ও। চাবিটা নিয়ে এসে তালা খুলে, তালাটা একপাশে রেখে, চাবিটা পকেটে পুরে নিল। বলা যায় না কেউ যদি দুর থেকে লক্ষ করে থাকে ওকে, তা হলে আবার হয়তো এই তালাতেই বন্দি হবে ও। তালা খুলে ভেতরে ঢুকল চাঁদু। এর ভেতরে শত্রুপক্ষের কেউ নেই। তা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে যদি কেউ থাকে? তাই বেশ কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে বসে রইল। কেউ এসে ওকে আটকাবার চেষ্টা করলেই ও গুপ্তি ছোরার ফলা দিয়ে লড়ে যাবে তার সঙ্গে।

কিন্তু না। প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেলেও কেউ এল না।

ও তখন টর্চের আলোয় পথ দেখে এক-পা এক-পা করে নীচে নামতে লাগল। ওঃ সে কী ভীষণ অন্ধকার। ভাগ্যে টর্চটা এনেছিল। স্যাঁত স্যাঁতে হিমশীতল অন্ধকারের গুহা। আলো নেই, বাতাস নেই, কিছুই নেই। শুধু ওই লৌহদণ্ডের আটকানোর ফাঁক দিয়ে যেটুকু অক্সিজেন ভেতরে ঢোকে। কী ভয়ংকর! কে বা কারা আবিষ্কার করেছিল এই গুহাটাকে তা কে জানে? সেকালের কোনও রাজা রাজড়া হয়তো। দুষ্ট প্রজাদের ধরে এনে হয়তো বা বন্দি করে রাখত এখানে। নয়তো এটাই ছিল তাদের কোষাগার, এখন দুষ্কৃতীরা এটাকে তাদের কাজে লাগাচ্ছে।

চাঁদু ভয়ে ভয়ে আলতো পায়ে সিঁড়ির নীচে নেমে এল।

এখানটা বেশ প্রশস্ত।

আবার একটা জেলখানার মতো ঘর চোখে পড়ল। সেই ঘরের প্রকাণ্ড লৌহদরজায় তালা দেওয়া। ঘরের ভেতরটা অবশ্য তত অন্ধকার নয়। একটা চিমনি লণ্ঠন জ্বলছে একপাশে। তাতেই ও দেখতে পেল সেই ঘরের এক কোণে দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এক সোনার প্রতিমা।

এ নিশ্চয়ই গোলাপ। গোলাপ ছাড়া আর কেউ নয়।

চাঁদু ডাকল, গোলাপ।

কে! কে তুমি!

আমি চন্দ্রকান্ত।

তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে চাঁদুদা? এ আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

ততক্ষণে চাঁদু পাশের একটি খোপে রাখা চাবি নিয়ে তালাটা খুলে ফেলেছে।

আর গোলাপ! সে সবকিছু ভুলে মুক্তির আনন্দে ছুটে এসেই জড়িয়ে ধরল চাঁদুকে। সে কী প্রবল উচ্ছ্বাস। চাঁদুও ওকে যেন একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো লুফে নিল।

গোলাপ বলল, তুমি কি আমাকে উদ্ধার করবার জন্য এখানে এসেছ? কী করে জানতে পারলে আমি এখানে আছি?

পরে তোমাকে সব বলব। শুধু জেনে রাখো লছমি নামের একটি মেয়ের জন্য।

ভাগ্যিস এলে। না হলে ওরা আমাকে কোথায় পাচার করে দিত কে জানে?

চাঁদু বলল, দিলেই হল? ভগবান নেই?

আছে আছে। নিশ্চয়ই আছে। ভগবান আছে বলেই তো তুমি আমার ভগবান হয়ে এখানে এলে। না হলে আমি তো ভাবতেও পারিনি এই অবস্থা থেকে কখনও মুক্তি পাব বলে। দেখছ না সূর্যের আলোও এখানে আসতে ভয় পায়।

চাঁদু বলল, যাক। আর কোনও ভয় নেই। এবার একটা সুখবর শোনো, তোমাকে যারা বন্দি করে রেখেছিল আমি কৌশলে তাদের বন্দি করেছি। আমাকে হত্যা করবার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিল তারা দু'জনেই মরেছে। আর জুলিরও সন্ধান পেয়েছি। তুমি আমি দু'জনেই গিয়ে উদ্ধার করব তাকে।

গোলাপ যেন একটু আহত হয়ে বলল, তবে আর কী। এবার নিশ্চয়ই ভুলে যাবে তুমি আমাকে।

চাঁদু হেসে বলল, এই জাল থেকে একবার কেটে বেরোলে জুলিদের বাড়িই আর কখনও যাব না আমি।

সে কী! তা হলে তো আমাদের বাড়িও যাবে না।

চাঁদু হঠাৎ ছল ছল চোখে বলল, আচ্ছা গোলাপ! তুমি তো তোমার বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। আমি যদি তোমার মা-বাবার কাছে বরাবরের জন্য তাঁদের ছেলের মতো থাকতে চাই, তোমার বন্ধু হিসেবে, তাঁরা কি আমাকে রাখবেন না?

তোমার কথার মানেটা আমি ঠিক বুঝলুম না।

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এটা নয়।

তোমার বাবা-মা আত্মীয়স্বজন, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে তুমি আমাদের বাড়ি কেন থাকবে? পারবে থাকতে?

যদি তোমার মা-বাবা আমাকে থাকতে দেন তা হলে নিশ্চয়ই থাকব। না হলে এই আমাদের শেষ দেখা। আমি কিন্তু আর কখনও ঘরে ফিরব না।

তোমার কী হল তা জানি না। যদি তাই হয় তা হলে জেনো, আমাদের বাড়িতে তোমার অবারিত দ্বার।

চাঁদু গোলাপের একটা হাত ধরে বলল, যদি তুমি আমাকে বন্ধুর মতো ভাবো তা হলে আমি তোমাকে দেখব বোনের মতো।

সেভাবেই বলেই বলল, না। আর দেরি নয়। চলো আমরা অমরকণ্টকে ফিরে যাই। গিয়ে সব কথা সকলকে বলি। তুমিও আমার সব শুনবে।

চাঁদু ও গোলাপ যখন সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এল বাইরে তখন প্রচুর পুলিশ। অমরকণ্টকের সেই ইনস্পেক্টর আছেন। লছমি, বিরজু আছে। আর আছেন সিদ্ধিবাবা।

সিদ্ধিবাবা আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললেন, ওই ওইতো ছেলেমেয়ে দুটো। লছমিবেটির কথাই তো ঠিক দেখছি।

চাঁদু আর গোলাপ সিদ্ধিবাবাকে প্রণাম করল।

লছমি ছুটে এসে চাঁদুর হাতদুটি ধরে বলল, তুম কাঁহা থে দাদা?

চাঁদু বলল, আমার স্বপ্নের বুলানারায়। কিন্তু তুই সেই যে গেলি, আসতে অত দেরি করলি কেন? তাই তো আমি ওই খারাপ লোকদুটোর পাল্লায় পড়ে গেলাম।

মুছে মাফ কর দো।

দিলাম। তবে ওদের পাল্লায় পড়ে আমার খারাপ হয়নি। ভালই হয়েছে।

সিদ্ধিবাবা বললেন, হঠাৎ কীভাবে কী হয়ে গেল আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো শুনি। আমি তো সকালেই তোমার সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর তুমি এখানে এলে কী করে?

চাঁদু সব বলল।

সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে। সবাই তখন হইহই করে ছুটে চলল সেই বন্দিগুহায়।

চাঁদুর কাছে চাবি ছিল। তাতেই তালা খুলে ভেতরে ঢুকেই টেনে বার করল রকি ও তার সঙ্গীদের। সেই সঙ্গে সন্দীপ, শংকর ও অর্জুনের লাশ। সন্দীপের হাতকড়ার চাবি মুশার কাছে ছিল। ওর পকেট হাতড়ে সেই চাবি বার করে হাতকড়া খোলা হল সন্দীপের। এরপর শুরু হল ঘরে ঘরে হানা দিয়ে তল্লাশি। অর্ধমৃত মুশাকেও অ্যারেস্ট করা হল।

চাঁদু সিদ্ধিবাবাকে বলল, বাবাজি, আপনি কীভাবে জানতে পারলেন আমার খবর?

বাবাজি দেখিয়ে দিলেন লছমিকে।

লছমি যা বলল, তা হল এই— ও তো চাঁদুকে বসিয়ে রেখে বাড়ি চলে গেল। সেখানে ওর ঘরের কাজ সামান্য একটু সেরে কিছু লাড্ডু আর চানা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে দেখল চাঁদু নেই। প্রথমটায় ভাবল এদিক সেদিক কোথাও গেছে বুঝি। আবার একবার হাসপাতালেও ফিরে এসে দেখল। কিন্তু কোথায় কে? ও তখন উঁচু একটা গাছের ডালে উঠেই দেখতে পেল দু'জন লোকের সঙ্গে বহু দূরে চাঁদু কোথায় যেন যাচ্ছে। গাছ থেকে নেমে ও যে কী করবে তা ভেবে পেল না। কেন না ও তো চাঁদুর মুখে ওর কথা সব শুনেছে। তাই ও বুঝতে পারল সে নিশ্চয়ই রকির লোকেদের পাল্লায় পড়ে গেছে। ঠিক এই সময়ই এসে পড়েছিল বিরজু। সে এসেছিল চাঁদুকে দেখতে।

লছমি চিনত বিরজুকে। তাই ছুটে গিয়ে ওকে সব কথা বলল। সব শুনেই বিরজু অমরকণ্টককে ফোন করে জানিয়ে দিল সব কথা। অমরকণ্টকও জানাল অনুপপুরকে। বিরজু আর লছমি অনুপপুর পুলিশের গাড়িতে চেপে বুলানারায় এল। সিদ্ধিবাবাও এলেন অমরকণ্টকের দিক থেকে। তিনি যখন ফিরে আসছিলেন ঠিক সেই সময়েই পথে অমরকণ্টকের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেলে তিনিও ওদের সঙ্গেই চলে এলেন। সবে ওনারা নেমে কীভাবে কোনদিক দিয়ে তল্লাশি শুরু করবেন ভাবছেন এমন সময়ই চাঁদু ও গোলাপের দেখা পেলেন ওঁরা।

পুলিশের কাজ পুলিশ করতে লাগল। অন্য একটা জিপে সিদ্ধিবাবা সকলকে নিয়ে অমরকণ্টকে ফিরে এলেন।

বারো

চাঁদু আর গোলাপ আবার যখন সার্কিট হাউসে ফিরে এল দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে দু'জনেরই। লছমি চলে গেছে সিদ্ধিবাবার আশ্রমে। দু'-একটা দিন সেখানে থেকে আবার ও ফিরে যাবে ওর নিজের কাজে, অনুপপুরের হাসপাতালে।

টাকা-পয়সা চাঁদুর কাছে যেমনটি যা ছিল তা ঠিকই আছে। শুধু জিনিসপত্তরগুলোই যা খোয়া গেছে।

চাঁদু বলল, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তুমি কী করে রকির পাল্লায় পড়লে?

গোলাপ বলল, এখনই শুনবে? বড্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু।

তা হলে চলো। খেতে খেতেই গল্প করা যাবে।

অমরকণ্টকের সব হোটেলেই খাওয়াদাওয়া ভাল। এক এক সময় মনে হয়

জায়গাটা কী ভারতের বাইরে? না হলে এই 'নেই নেই'-এর দেশে এরা এত সব ভাল ভাল খাবার পায় কোত্থেকে?

বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে গোলাপ ওর কথা বলতে লাগল, তুমি তো চলে গেলে অনুপপুরে। আমার মনটা কেমন যেন বিষাদে ভরে উঠল। বেশ তো বন্ধুর মতো ছিলুম দু'জনে। তার ওপর সবাই আমাকে জোর করতে লাগল বিলাসপুরে ফিরে যাবার জন্য। আমি আর কী করি, আমার জিনিসপত্তর আনতে যাবার নাম করে সার্কিট হাউসের টাকা মিটিয়ে মালপত্তর নিয়ে সোজা পালাতে গেলুম কপিলধারার দিকে। ভেবেছিলাম বাবাজির আশ্রমে গিয়ে সব কথা বলে ওইখানে থেকে যাব দু'-একটা দিন। তুমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত। তারপর সোজা তোমাকে নিয়ে চলে যাব আমাদের বাড়িতে। আসলে কী জানো, বুদ্ধিভ্রম আমারও হয়েছিল। যেমন ধরো, হাওড়া স্টেশনে, হাওড়া শহরে বা তোমার বাড়ির কাছে তোমার বিপদ হলেও ধানবাদে তো নয়। আর ধানবাদে যেতে হলে যে হাওড়ায় আমাদের যেতেই হত তারই বা কী মানে আছে? টাটানগর থেকেও তো আসানসোল হয়ে সব মুকিলের আসান করা যেত।

চাঁদু বলল, তা যেত। তবে ভাগ্যে এখানে এসে পড়েছিলাম, তাই তো শত্রুমুক্ত হলাম। জুলিটারও খবর পেলাম! ওর মায়ের কী অবস্থা বলো তো?

গোলাপ বলল, সত্যি, এই তীর্থভূমির কিন্তু মহাত্ম্য আছে। জাগ্রত অমরেশ্বর, মা নর্মদা, আমাদের কীভাবে রক্ষা করলেন তা ভাবা যায়? মা নর্মদা চিরকুমারী। তাই বুঝি আমার অবমাননা মা সহ্য করলেন না। আর আমার মতো অসহায় যারা, তাদের যারা উৎপীড়ন করে তাদেরও ধরিয়ে দিলেন তোমার আমার হাত দিয়ে।

চাঁদু বলল, আমিও কী আশ্চর্য উপায়ে বেঁচে গেলাম বলো তো? ওই মুশাটা যদি আমাকে জল খাওয়াতে না গিয়ে সত্যিই ফেলে দিত তা হলে কী করতাম?

গোলাপ বলল, আমি কপিলধারার পথে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় আড়ালে লুকিয়ে যখন খানিকটা এসেছি, তখনই হঠাৎ কয়েকজন লোক আমাকে পিছনদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা জিপে তুলে নিল। তারপর নাকে একটা ক্লোরোফর্ম দেওয়া রুমাল এমনভাবে চেপে ধরল যার ফলে আর কিছুই আমার মনে নেই। জ্ঞান যখন ফিরল, তখন আমি ওই অভিশপ্ত গুহায়। যে গুহায় পাষাণে মাথা খুঁড়ে অনেক মেয়েই একটু আলোর প্রত্যাশা করেছে। অথবা ফুরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে কোথাও কোনও দূর জনপদে।

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা পায়ে পায়ে নর্মদা মায়ের মন্দিরের কাছে এল। আজ আর আরতি না দেখে সার্কিট হাউসে ফেরা নয়। রাতের খাওয়ার তো প্রয়োজন নেই। খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক বাদে হয়তো এক কাপ চা খেতে পারে।

মন্দিরের গায়ে নর্মদাকুণ্ডের সিঁড়িতে বসে গোলাপ বলল, এবার তোমার কথা বলো। এরই মধ্যে এমন কী হল তোমার যে তুমি আর বাড়িতেই ফিরতে চাও না?

চাঁদু বলল, হ্যাঁ বলব। সব কথা খুলে বলব তোমাকে। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার আগে আমার পরিচয়টা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। হয়তো সব শুনলে তুমি এখুনি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তা যাও। তবু আত্মপরিচয় আমি কিছুতেই গোপন করব না।

কী সব আজেবাজে বকছ তুমি?

শোনো গোলাপ, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে আমি নিজেও কিন্তু জানতাম না আমি কে।

কে তুমি?

একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী, ওয়াগন ব্রেকার এবং এক খুনি বেড়ালতপস্বীর ছেলে আমি।

গোলাপ হেসে বলল, এইসব কে মাথায় ঢোকাল তোমার?

চাঁদু তখন লছমির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর থেকে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বলল গোলাপকে।

সব শুনে গোলাপ বলল, হ্যাঁ, এইসব শুনে সত্যিই নিজের ওপর ধারণাটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু চাঁদুদা, তুমি তো শিক্ষিত ছেলে। বাল্মীকির উপাখ্যান পড়নি? সেই যে 'চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর।' মনে আছে, দস্যু রত্নাকর যখন তার পাপের ভাগ নেবার জন্য তার বাবা-মা-স্ত্রী প্রত্যেকের কাছে গেল তখনকার কথা? কী বলেছিলেন তাঁরা? বলেছিলেন, তুমি পুত্র, তুমি স্বামী। আমাদের প্রতিপালন করবার দায়িত্ব তোমার। তুমি সৎপথে উপার্জন করে আমাদের পালন করবে কি দস্যুবৃত্তি করবে তা আমরা কি জানি? আমরা তোমার কর্তব্যের সুযোগ নেব। কিন্তু পাপের ভাগ তো নেব না। আমাদের কি দোষ? তেমনি বাবা-মা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, পালন করেছেন। এই যথেষ্ট। তাঁরা কীভাবে কী করছেন সে দেখবার অধিকার তো তোমার নেই। এখন তুমি বড় হয়েছ, বুঝতে শিখেছ। এখন যদি তুমি সৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হও তবে ওদের মন্দ যা কিছু তার কিছুই তুমি গ্রহণ করো না। দৈত্যকুলেও প্রহ্লাদ জন্মায়। তুমি যদি সৎভাবে জীবন কাটাতে চাও নিশ্চয়ই আমার সহযোগিতা পাবে। তুমি আমাদের কাছেই থাকবে। তোমার বাবা যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে থাকেন, তিনি যদি তাঁর মত এবং পথ পরিবর্তন করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তোমার সাধুবাদ জানানো উচিত তাঁকে। তাই রাগের মাথায় এমন কিছু করো না যাতে তিনি দুঃখ পান বা অপমান বোধ করেন।

কথা বলতে বলতে কখন যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে তা কারও খেয়ালই নেই। শীত পাচ্ছে খুব। আরতি শুরু হচ্ছে। মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বেজেও উঠল। ওরা ভেতরে ঢুকল।

আরতির প্রসাদ নিয়ে যখন ওরা বাইরে এল তখন হঠাৎ বিরজুর সঙ্গে দেখা।

বিরজু বলল, কাঁহা গয়ে থা দোস্ত? তোমাদের ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে হাম তো হয়রান হো গিয়া। চলো থানায় চলো।

চাঁদু বলল, আবার থানা! কী ব্যাপার?

আরে চলো না ইয়ার।

ওরা তিনজনেই থানায় এল।

পুলিশ ইনস্পেক্টর ওদের সস্নেহে বসতে বলে বললেন, দেখো তো ও সামান তুমহারা কি নেহি?

গোলাপ ও চাঁদু দু'জনেই বলল, হ্যাঁ। এই তো আমাদের সবকিছু। কোথায় পেলেন?

বিরজু বলল, ওগুলো সাইকেলে চেপে খুঁজে আমিই উদ্ধার করেছি। ইনাম মিলেগা তো?

গোলাপ বলল, জরুর।

পুলিশ এবার ধীরে সুস্থে ওদের দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সবকিছু জেনে নিল। এমনকী জুলি যে হত্যাকারী নয় সে খবরও পেয়ে গেল চাঁদুর মুখে। মেয়েটি অপহৃতা। এবং সে চম্পায় আছে জেনে অমরকণ্টক-পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ফোনে জানিয়ে দিল বিলাসপুরকে। বিলাসপুর খবর দিল চম্পাকে। মাত্র কয়েকটা মিনিটের ব্যাপার।

চাঁদু আর গোলাপ পরদিন সকালেই চম্পায় যাবার মন করে ফিরে এল সার্কিট হাউসে। এবার বিশ্রাম।

বিছানায় শোয়া মাত্রই ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ল দেহটা। সারাটা দিন যে কীভাবে কেটেছে তা ওরাই জানে। একেই অসুস্থ শরীর চাঁদুর। মাথার মধ্যে তাই টিস টিস করতে লাগল। খুব খারাপ লাগল ওর। এ সময় একটু সেবার প্রয়োজন ছিল। অমরকণ্টকে না এসে অনুপপুরেই ফিরে গেলে ভাল করত বোধহয়। হাসপাতালে ওষুধ, নার্সিং দুই-ই পেত।

পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল তখন অনেকবেলা হয়ে গেছে। রোদ্দুরে ঝলমল করছে চারদিক। কিন্তু চাঁদুর আর ওঠার ক্ষমতা নেই। সারাটা গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

গোলাপ ছুটে গিয়ে বিরজুকে খবর দিতেই, বিরজু ডাক্তার ডেকে আনল। ওর বাবা-মা এল।

ডাক্তারবাবু সব দেখে শুনে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। টিটেনাস দেওয়া আছে। তা ছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রম, ঠান্ডালাগা এবং উৎকণ্ঠার জ্বর এটা। এখন ফুল রেস্ট আর ব্যথা মরার কয়েকটা ক্যাপসুল খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

গোলাপ টাকা দিতে গেলে ডাক্তারবাবু নিলেন না।

বিরজু প্রেসক্রিপসনটা হাতে নিয়ে গোলাপের টাকায় কয়েকটা ক্যাপসুল কিনে এনে দিল।

সিদ্ধিবাবা আর লছমিও এসে হাজির হল একটু পরে।

সার্কিট হাউসের এই ঘরটা ভরে উঠল সকলের আনাগোনায়। এই দূর দেশে চাঁদুর একবারের জন্যও মনে হল না যে সে নিজের বাড়িতে নেই। বিরজুর বাবা কেটলি ভরতি গরম চা এনে খাওয়ালেন সকলকে। লছমি ওদের ঘরটা ঝেড়েমুছে বিছানাটা গুছিয়ে দিল। যেন এখানেও ও ডিউটি করছে।

গোলাপ সিদ্ধিবাবাকে বলল, বাবা! আমাদের যদি আরও দু'-একটা দিন এখানে থাকতে হয় লছমিকে রাখুন না আমাদের কাছে?

সিদ্ধিবাবা বললেন, তা হয় না মা। ও যে লছমি। আর্তের সেবাই ওর ধর্ম। অনুপপুরের হাসপাতালে অনেক রোগী ওর জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। ওকে যেতেই হবে মা। আমি ওকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

চাঁদু ওর পকেট থেকে একশোটা টাকা বার করে লছমিকে দিয়ে বলল, তুই আমার বহিন কা মাফিক। এটা রাখ তুই। কিছু কিনে খাস।

সে টাকা কিছুতেই নেবে না লছমি। অবশেষে চাঁদু ও গোলাপের অনুরোধে, সিদ্ধিবাবা অনেক করে বলতে তবেই নিতে রাজি হল।

গোলাপ বলল, ও আর একটা দুটো দিন এখানে থাকলে আমাদের খুব সুবিধে হত। চাঁদুদার এইরকম শরীর খারাপ। তায় আমি একা।

এমন সময় দরজার বাইরে থেকে কে যেন বলল, কে বলল তুমি একা। আমি আছি না? আমাদের দু' বোনের সেবায় চাঁদুদা শিগগির ভাল হয়ে উঠবে।

কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে উঠল চাঁদু। এ কী জুলি! তুই এখানে কী করে এলি?

জুলি তখন নবসাজে সজ্জিতা হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই মাজা কালো গায়ের রং, ভ্রমরের মতো চোখ, হাসিখুশি মুখ। দেখলেই ভাল লাগে। জুলি ছুটে এসে চাঁদুকে প্রণাম করে ওর পাশে বসে বলল, কেমন আছ চাঁদুদা? মাথা ফাটালে কী করে?

আমি ভালই আছি। দুর্বল শরীরে বেশি উত্তেজনা, তার ওপর কাল আরতি দেখতে গিয়ে ঠান্ডাও লেগেছে। তাই জ্বর হয়েছে একটু। ওষুধ খেয়েছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তুই কার সঙ্গে এলি?

জুলি বলল, যে দেবতা আমাকে দানবদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন

তিনি আমাকে চম্পার মাতৃমন্দিরে রেখেছিলেন। সেখানে মেয়ের মতোই ছিলাম। দেখছ না আমার সাজপোশাক। কী চমৎকার একখানি শাড়ি পরেছি। আমি ওঁদের কাছে দীক্ষা নিয়েছি। তা কাল রাত্তিরবেলা পুলিশ আমাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে বিলাসপুরে। তারপর এখানে। তোমার বাবা, গোলাপদির বাবা সবাই এসেছেন। একই সঙ্গে এসেছি আমরা। উঃ কী বিপদ গেল বলো তো?

গোলাপ বলল, ওঁরা কোথায়।

থানায় আছেন। আসবেন এখুনি। আমি বিরজুদার সঙ্গে এলাম।

চাঁদু বলল, ওরে বাবা। এর মধ্যেই বিরজুর সঙ্গে দাদা পাতিয়ে ফেলেছিস?

বাঃ রে। আমার কত দাদা। তাই তো বোনের কোনও বিপদ হল না। আমার বাড়ির খবর কিছু জান চাঁদুদা?

চাঁদু বলল, কিছুই জানি না রে। আমিও তো ঘর ছাড়া। তবে তোকে হারিয়ে ওদের আর দিন কাটছে না। আমার বাবা, কেষ্ট মিত্তির, সমাজের এই সমস্ত মাথাওয়ালা লোকেরা যতদিন মাথা উঁচু করে থাকবেন ততদিন তোর-আমার মতো অভাগাদের ভাগ্যের আকাশে নিত্যনতুন ধূমকেতু উঠবে।

চাঁদুর কথা শেষ হওয়া মাত্রই তারাপদবাবু ও সোমনাথবাবু ঘরে এলেন। ছোট্টঘরে এত লোক আর ধরে না। সঙ্গে পুলিশের লোক।

তারাপদবাবু বললেন, কেমন আছ তুমি?

চাঁদু কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

গোলাপ ছুটে গিয়ে ওর বাবার বুকে মাথা রাখল।

তারাপদবাবু বললে, আমার কথা তুমি শুনতে পেলে না?

আপনার সব কথাই আমি সন্দীপদার মুখে শুনেছি।

তারাপদবাবুর মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেল, কী শুনেছ শুনি?

শালিমারের সেই অন্ধকার দিনগুলোর সব কথাই শুনেছি। যদি অনুমতি দেন তো সবার সামনেই চেঁচিয়ে বলি।

তারাপদবাবু উত্তেজনা দমন করে বললেন, কোথায় সেই পাজি হতচ্ছাড়া শয়তানটা?

সে একজন সমাজবিরোধীর ছেলের জীবনরক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

গোলাপের বাবা সোমনাথবাবু বললেন, এখন এসব আলোচনা থাক। তোমরা যে বেঁচে ফিরেছ এই ঢের।

গোলাপ বলল, জান তো বাপি, চাঁদুদা আমার জন্য কত করেছে। ওর জন্যই আবার আমি তোমাকে ফিরে পেলাম। আবার আমি বাড়ি যেতে পারব। এই জুলি নামের মেয়েটাও উদ্ধার হল। সবই চাঁদুদার জন্য। চাঁদুদার সঙ্গে আমার

কথা হয়েছে। ও আর হাওড়ার ওই বিষাক্ত পরিবেশে থাকবে না। চাঁদুদা ধানবাদে আমাদের বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করবে।

সোমনাথবাবু বললেন, বেশ তো, ক্ষতি কী? তারাপদবাবু যদি তাঁর ছেলেকে আমাদের কাছে রাখেন তা হলে আমার কোনও আপত্তি নেই।

তারাপদবাবু বললেন, আমি এক কথায় রাজি। আমার প্রথম জীবনের ভুলের মাশুল যে আমাকে এইভাবে দিতে হবে তা আমি কখনও ভাবিনি। আমি তো ওকে দূরে কোথাও বোর্ডিংয়ে রেখে আসব ভেবেছিলাম।

সোমনাথবাবু বললেন, কোনও দরকার নেই। ও ধানবাদে আমার ওখানে থেকে আসানসোল কিম্বা চিত্তরঞ্জনে কলেজে পড়বে।

সিদ্ধিবাবা এতক্ষণ বসে বসে সব শুনছিলেন। এবার লছমিকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে। আমরা যাচ্ছি। এখন আপনারা আয়াস করুন। নর্মদে হর।

চাঁদু দরজা পর্যন্ত উঠে এসে বিদায় জানাল সিদ্ধিবাবাকে।

ওই সার্কিট হাউসে আরও একটি ঘর পাওয়া গেল। সেই ঘরটা সোমনাথবাবু নিলেন। একটা দিনের ব্যাপার। কালই চলে যাবেন সবাই। জুলি, গোলাপ ও চাঁদু একঘরে রইল শুধু গল্প করার জন্য। সবাই চলে গেলেও বিরজু ছিল ওদের কাছে। চাঁদু ওর হাতে টাকা দিয়ে গরম গরম শিঙাড়া, কচুরি, লাড্ডু, জিলিপি ইত্যাদি আনতে দিল। বেশি করেই আনতে বলল। যাতে তারাপদবাবু ও সোমনাথবাবুও ভাগ পান।

বিরজু চলে গেলে চাঁদু জুলিকে বলল, তোর কী ব্যাপার বল তো? কীভাবে কী হল সেদিন। সন্দীপদার সঙ্গে তোর পরিচয় কীভাবে হল?

জুলি বলল, আবার কেন সেই অভিশপ্ত দিনটার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছ চাঁদুদা?

না হলে সবকিছুই যে অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

তোর মুখে তোর বিপদের কথা শুনতে হবে না?

জুলি বলল, তুমি তো আমাকে কচুরি কিনতে পাঠালে। আমিও গেলাম। তখন সন্ধের মুখ। হঠাৎ মোড়ের মাথায় গিয়েই দেখি একজনদের রকে বসে গল্প করছে ওই রাজু শয়তানটা। আমি জানতাম ও নলহাটিতে বোর্ডিং-এ আছে। কিন্তু এইভাবে যে ওকে এখানে দেখব তা ভাবিনি। তাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম।

রাজু আমার ভয় দেখে আড্ডা ছেড়ে উঠে এসে বলল, কীরে কালটি! এত ভয় পেলি কেন? আমি আর আগের মতো নেই। অনেক ভাল হয়ে গেছি। এখন থেকে আমি ভাল ছেলেই হয়ে থাকব। তোর দাদা আর ওই চেঁদোটা একবার আমাকে পিটিয়েছিল মনে আছে?

সেটা তুমি আমাকে বিরক্ত করেছিলে তাই।

ওদের বলিস, আমি আবার ফিরে এসেছি। ওদের সঙ্গে আমি দোস্তি চাই। আগেকার সব কথা যেন ভুলে যায় ওরা।

বেশ বলব। এখন আমার পথ ছাড়ো।

না ছাড়লে?

চেঁচাব।

রাজু একটা শিশি বার করে বলল, এটাতে কী আছে জানিস?

জানি না।

অ্যাসিড আছে। তোর মুখ তো এমনিতেই কালো। ওখানে আর ঢেলে কী হবে? তবে তোর ওই লালটুস চাঁদুদা, ওর বদন আমি বেগড়াবই। অনেকক্ষণ তোদের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে। না হলে তুইও কিন্তু ছাড় পাবি না।

আমি বললাম, পারব না।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখে অ্যাসিডটা ঢালবার জন্য শিশি থেকে ছিপিটা খুলল রাজু। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন আমাকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে গেল। পরক্ষণেই রাজুর আর্তনাদ শুনতে পেলাম। যে আমাকে টেনে নিয়ে গেল সে আমার পেটের কাছে ছোরা ঠেকিয়ে মন্টুদার গ্যারেজে নিয়ে ঢোকাল। অন্ধকার ভাঙা গ্যারেজ ঘর। বলল, খবরদার চেঁচাবি না। আর তুই পালাতে পারবি না। পালালেও বাঁচবি না। এখন থেকে তুই আমাদের। আমরা তোকে যেখানে নিয়ে যাব যাবি। যদি আমাদের কথা না শুনিস, তা হলে কিন্তু তোর মা আর দাদাকে হারাতে হবে। মনে থাকবে?

আমি কেঁদে বললাম, তোমরা যে যা বলবে আমি তাই করব। আমার দাদার কোনও ক্ষতি কোরো না তোমরা।

ঠিক তো? আমাদের কথা শুনলে আমরা কারও ক্ষতি করব না। তোরও না। তা ছাড়া এখন আমরা তোকে ছেড়ে দিলেও তোর বিপদ কিন্তু কমবে না। দেখলি তো রাজুটা কীভাবে খুন হল?

খুন হতে আমি দেখিনি তো?

আঃ। চেঁচানি তো শুনেছিস। এতক্ষণে ওর লাশ চলে গেছে হাওয়াপুকুরের ধারে। ওর বন্ধুরা কিন্তু তোর সঙ্গেই ওকে দেখেছে। তারপরই এই খুন। সবাই কী ভাববে বল তো? তুই-ই খুনটা করেছিস। তার ওপরে ওর বাবা আবার কেষ্ট মিত্তির। তাই বলছি আমরা ছেড়ে দিলেও তোকে কিন্তু সারাজীবন জেলের ঘানি টানতে হবে। নয়তো লটকাতে হবে ফাঁসির দড়িতে। আর আমাদের সঙ্গে এলে তোর হবে সুখের জীবন। তা ছাড়া ও তো অ্যাসিড দিয়েই পুড়িয়ে দিচ্ছিল তোর

মুখটাকে। সারাজীবন এই মুখ নিয়ে কী করতিস? আমরা সেদিক থেকেও তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

আমি বললাম, আমি কোনওরকম গোলমাল করব না। তোমরা যে যা বলবে তাই শুনব।

এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা। তা ছাড়া আর দু'দিন বাদে একটু বড় হলে শ্বশুরবাড়ি তো তোকে যেতেই হত। মনে কর না সেইরকম কোথাও যাচ্ছিস।

আমি দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে অনুসরণ করলাম ওদের।

ওরা সেই রাতে আমাকে খড়্গপুরে নিয়ে গিয়ে রাখল। পরদিন আবার ট্রেনে করে কোথায় যেন নিয়ে চলল ওরা। এইসময় ট্রেনের মধ্যেই দেখা হল সেই দেবতার সঙ্গে। ওদের সঙ্গে আমাকে দেখে অনেকক্ষণ থেকেই নজরদারি করছিলেন তিনি। পরে আমি যখন বাথরুমে গেছি তখন আমার কাছে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন সব কথা। আমি ভয়ে ভয়ে সব বললাম।

উনি বললেন, তোর কোনও ভয় নেই। তুই আমার সঙ্গে আয়। তারপর দেখছি ওদের দৌড় কত।

কিন্তু আপনার সঙ্গে গেলে যদি ওরা আমার মা বা দাদার কিছু করে?

কিছু করবে না। তুই চলে গেলেই ওরা ভুবন অন্ধকার দেখবে। তুই যদি পুলিশকেও বলে দিস ওদের কথা, সেই ভয়ে ওরা আর কোনওরকম গোলমাল করবে না। তুই নির্ভয়ে চলে আয় আমার সঙ্গে।

আমার কেন জানি না মনে হল উনি ঠিকই বলছেন। তাই আমি ভাগ্যের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে তখনকার মতো ওদের নজর এড়াবার জন্যে গাড়ির ভেতরে ভেতরে খানিকটা এগিয়ে নিজেকে আড়াল করলাম। তারপর সেই দেবতার সঙ্গে নেমে পড়লাম পরের স্টেশনে। স্টেশনটার নাম চম্পা। উনি বললেন, দেখ, আমি যে তোকে নামিয়ে নিলাম এটা কিন্তু ওরা বুঝতে পারবে। তাই ওদের যত রাগ পড়বে আমার ওপর। আমি অবশ্য তাতে ভয় পাই না। কিন্তু আমি তোকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি তুই সেখানে সাবধানে থাকবি। একদম ঘর থেকে বেরোবি না। সময়মতো হাওয়া বুঝে তোর বাড়িতেও আমি খবর দেব। তারপর ওই শয়তানদুটোকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আমি নিজে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব তোর বাড়িতে। ইতিমধ্যে পারি তো ওই কেষ্ট মিত্তিরকেও দেখে নেব।

চাঁদু বলল, সন্দীপদা কত মহৎ। যাক, ভগবান রক্ষে যে ওর নজরে পড়ে গিয়েছিলি তুই। আর কালচক্রে ওরা নিজেরাই ফেঁসে গেল বলে তোকে-আমাকেও বেশিদিন বাইরে থাকতে হল না।

বিরজু খাবার নিয়ে এলে, সেই খাবার ভাগ করে খেল সবাই। তারাপদবাবু ও

সোমনাথবাবুও বাদ গেলেন না। খেতে খেতেই ঠিক হল দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটা টাঙ্গায় করে অমরকণ্টকের সবকিছুই ঘুরে দেখে নেবেন ওরা। চাঁদুর ইচ্ছে হলে ওদের সঙ্গে যাবে। না হলে শুয়েবসেই কাটিয়ে দেবে সময়টা। কাল সকাল হলেই চলে যাবার তাড়া। এই তীর্থভূমি যতই রমণীয় হোক, আর এখানে পড়ে থাকা ঠিক নয়। কেন না মুখে কিছু না বললেও জুলির মনটা ওর বাড়ির জন্য ছটফট করছে তো?

সানঘাগরার আতঙ্ক

একেবারে ময়ূরভঞ্জ!

তাই ঠিক হল। ব্রিগেডিয়ার ভার্গব চাকরি থেকে অবসর নেবার পর ঠিক করলেন তাঁর শেষজীবনটা ময়ূরভঞ্জেই কাটাবেন। ময়ূরভঞ্জে যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে। কিছুটা স্বাস্থ্যের কারণও বটে, আবার কিছুটা শৈশবের দিনগুলির কথা ভেবে। চিরটা কাল বাইরে বাইরেই কাটিয়েছেন তিনি, তাই কলকাতার জলহাওয়া তাঁর একদম সহ্য হয় না।

স্ত্রী বিনতা প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু ভার্গবের মন কিছুতেই থাকতে চাইল না এখানে। তিনি অনেক করে বোঝালেন স্ত্রীকে, জীবনের শেষদিনগুলি সত্যিই যদি সুখেশান্তিতে কাটাতে হয় তো কলকাতায় কখনও নয়, ময়ূরভঞ্জেই ভাল।

চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। গভীর অরণ্যানি। সবুজের মেলা যেন চারদিকে। কী রমণীয় পরিবেশ। যদিও আগের সেই পরিবেশ এখন আর নেই। শৈশবে যখন তিনি এইখানে মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছিলেন, তখন প্রকৃতির যে অনবদ্য রূপ ছিল, এখন তা অনেকাংশে হারিয়ে গেছে। তবু অন্যান্য জায়গাগুলোর মতো শহর-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে হৃতশ্রী নয়।

এখনও কত লোক দু'-চারদিনের ছুটি কাটাতে ময়ূরভঞ্জে বেড়াতে যায়।

কলকাতার ধর্মতলা থেকে বাস ছাড়ে।

এখানকার জলহাওয়া এত ভাল যে মানুষের হৃত যৌবন যেন ফিরে আসে।

একটিই মাত্র ছেলে। নাম সৌরভ। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেও কিছু একটা করতে হবে বইকী। বিশেষ করে এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে। ভারী সুন্দর ছেলেটি। মায়ের মতোই চোখমুখের গড়ন। আর গায়ের রং যেন ফেটে পড়ছে। টানা টানা চোখ, টিকলো নাক, মাথায় ঘন চুল। ময়ূরভঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশে সৌরভের আরও সৌন্দর্য হবে। নীরোগ শরীর নিয়ে সুস্থসুন্দর দেহে ঝলমল করবে। এত সব চিন্তা করে তবেই তিনি ময়ূরভঞ্জে যাবার পরিকল্পনা করলেন।

ওড়িশার এই পাহাড়ি অঞ্চলের প্রতি তাঁর বরাবরেরই দুর্বলতা। তা ছাড়া ময়ূরভঞ্জ এখন সব দিক থেকেই উন্নত। ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, বড় বড় বাড়ি, বাজার-হাট কী নেই ময়ূরভঞ্জে?

ছেলেটা সেখানে মন দিয়ে লেখাপড়া শিখবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষা যখন হয়ে গেছে, তখন ওইখানকার কলেজেই ভরতি হয়ে কলেজের পড়াটা পড়ে নেবে।

সৌরভেরও কলকাতার প্রতি টান একদমই নেই।

তাই বাবার সঙ্গে একমত হল সে। কী আছে কলকাতায়? ব্রিটিশ আমলের পুরনো নোংরা শহর আর নোংরা রাজনীতি ছাড়া আছেটা কী?

তাই সৌরভও বাবাকে বলল, দরকার নেই এই শহরে। তুমি ময়ূরভঞ্জেই চলে চলো।

ভার্গব বললেন, অনেক ভেবেচিন্তে আমিও এই সিদ্ধান্তেই এসেছি বাবা। তা ছাড়া আমার আর ক'টা দিন? তবু ওখানকার জলহাওয়া পেলে হয়তো আরও কিছুদিন সুস্থ শরীরে থাকব।

সৌরভ বলল, আচ্ছা বাবা, আমরা যে আসামে ছিলাম ক'বছর, সেখানকার বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতের সঙ্গে এখানকার মিল আছে?

না একদমই নেই। এখানকার মাটি গাছপালার রূপই আলাদা। ময়ূরভঞ্জ আরও সুন্দর। নামের মধ্যেই কেমন একটা মাধুর্য আছে দেখছিস না?

সৌরভ বলল, ওখানেই যদি আমাদের বরাবর থাকা হয় তা হলে তুমি ওখানে গিয়েই আমাকে একটা স্কুটার কিনে দেবে।

অবশ্যই। না হলে ওই পাহাড়ি এলাকায় চলাফেরা করবি কী করে? আজকাল অনেক হালকা ধরনের স্কুটার বেরিয়েছে। তারই একটা কিনে দেব তোকে। আমি আগে নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসি।

বিনতা বললেন, ছেলে পাশ করে কলেজে পড়ে বেরিয়ে এলে ওখানেই চাকরি বাকরি পাবে তা?

না পেলেই বা ক্ষতি কী? আমার যা সঞ্চয় তাতে ওর কি বড় হয়ে চাকরি করার কোনও প্রয়োজন আছে?

আছে। তোমার আছে বলেই যে ছেলে নিষ্কর্মা হয়ে বসে বসে তোমার টাকায় তার দিন কাটাবে এরকম কথা তুমি বললে কী করে? তোমার যত টাকাই থাকুক ওকে ওর পায়ে দাঁড়াতে দাও।

তা দেব। তবে তুমি আমার কথার অর্থ ভুল বুঝেছ। আমি ব্রিগেডিয়ার ভার্গব। আমি কখনওই চাইব না আমার একমাত্র ছেলের ক্যারিয়ার নষ্ট হোক। তবু আমার এই যে পঁচিশ-ত্রিশ লাখ টাকা, এগুলোকে খরচাও তো করতে হবে? এই টাকা খাটিয়ে যাতে ও ব্যবসা করে খেতে পারে সেই কথাই বলছি আমি। অর্থাৎ আমার ছেলের চাকরির প্রয়োজনটা কী?

বিনতা বললেন, তাই বলো।

এখন ময়ূরভঞ্জে গিয়ে একটা মনোমতো জায়গা খুঁজে বার করতে পারলেই হয়।

তুমি তা হলে নিজে একবার ময়ূরভঞ্জে যাও। তবে একটা কথা, সব সময়ে মনে রেখো দেশের মাটির একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। তাই আমার কথাটাও একটু মাথায় রেখো।

কীরকম!

ময়ূরভঞ্জের ব্যাপারে আমারও আপত্তি নেই। তবে কিনা আমি কলকাতার মেয়ে। যদিও কোনও চুলোয় কেউ নেই আমার তবু কলকাতার টান আমার রক্তে আছে। সাত আট লাখ টাকা খরচা করে আমি বলি কী কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখো। মাঝে মধ্যে আসা যাবে। জিনিসপত্তর কিছু রাখব না। একমাত্র খাট বিছানা ছাড়া। ভবিষ্যতের মুখ চেয়েই একথা বলছি।

সৌরভ বলল, মায়ের এই প্রস্তাবটা কিন্তু অযৌক্তিক নয়। তার কারণ ময়ূরভঞ্জ যত ভাল জায়গাই হোক, আমাদের কিন্তু বিদেশ। আমরা বাংলার মানুষ। ময়ূরভঞ্জ ওড়িশায়। আজকাল তো এক দেশের এক ভাষার মানুষের সঙ্গে অন্যদেশের অন্য ভাষার মানুষের বিবাদ লেগেই আছে। তাই সেইরকম পরিস্থিতি কখনও হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাতে পালিয়ে আসতে পারি সেই ব্যবস্থাটা করে রাখতে হবে।

বিনতা বললেন, তা ছাড়া বছরে একবার পুজোর সময় তো আসবই। কলকাতার মতো পুজো কোথাও কি আছে? কলকাতার পুজো ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না আমি।

ভার্গব হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ। কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট রাখার ইচ্ছে আমারও যে নেই তা নয়। একথাটা অবশ্য মন্দ বলনি। ময়ূরভঞ্জে বাংলো, বাগান সব কিছুই থাক। কলকাতায় থাক ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট।

তুমি তা হলে কবে যাচ্ছ ময়ূরভঞ্জ?

অরবিন্দর চিঠিটা কবে আসে দেখি।

চিঠি তো তুমি অনেকদিন দিয়েছ? এখনও উত্তর আসছে না কেন?

আসবে আসবে। ক্যুরিয়ার সার্ভিসের চিঠি। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেছে। এখন একটু খোঁজখবর নেবে, দেখাশোনা করবে, তবে তো।'

সৌরভ বলল, কিন্তু বাবা অরবিন্দকাকুর তো দেখাই ছিল জায়গাটা। উনিই তো পছন্দ করে তোমাকে নিতে বলেছিলেন।

তা ঠিক। তবুও জমি জায়গার ব্যাপার তো। দরদামের প্রশ্ন আছে। তা ছাড়া ময়ূরভঞ্জ এখন অনেক উন্নত মানের জায়গা।

আমার স্কুলের বন্ধুরা গতবছর ধর্মতলা থেকে বাসে কেওনঝোড় গিয়েছিল। ওখান থেকে ময়ূরভঞ্জ কতদূর?

কেওনঝোড়ই তো ময়ূরভঞ্জ। ময়ূরভঞ্জ নামে আলাদা কোনও জায়গা নেই।

ওঁদের এই আলোচনার ফাঁকেই ডাক পিওন এসে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা খামে করে এবং অর্ডিনারি পোস্টে পাঠানো। পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে বোঝা গেল সেটার কেওনঝোড় থেকে আসতে সময় লেগেছে দশদিন। এবং প্রেরকের নাম দেখে বোঝা গেল অরবিন্দ গাঙ্গুলিই পাঠিয়েছেন চিঠিটা।

ভার্গব চিঠিটা খুললেন। তারপর দু'-এক ছত্রে চোখ বুলিয়েই বললেন, যাক, এতদিনে আমার স্বপ্ন বুঝি সফল হতে চলেছে।

বিনতা বললেন, কার চিঠি? অরবিন্দর?

হ্যাঁ।

কী লিখেছে একটু পড়ে শোনাও?

অরবিন্দ লিখেছে, তোমার চিঠি পেয়েছি। একটা জায়গা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। জায়গাটা মেইন রোডের ওপরে সিনেমা হলের দিকে। আর একটা জায়গা আছে সেটা দামে খুব কম, তবে অত্যন্ত লোভনীয়। কিন্তু শহর থেকে সামান্য একটু দূরে পাহাড়ের কোলে।

ভার্গব বললেন, আমি তো ওইরকম জায়গাই খুঁজছিলাম। একেবারে আইডিয়াল জায়গা যাকে বলে।

সৌরভ বলল, থাকতে গেলে ওই রকম জায়গাতেই থাকতে হয়।

বিনতা বললেন, না। তোমাদের বাপ-ব্যাটার দু'জনেরই মাথায় দেখছি ছিট আছে।

ভার্গব বললে, কেন কেন?

তা নয় তো কী? আমরা কি বনবাসে যাচ্ছি? আমরা যাচ্ছি একটা জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। একদিন দু'দিনের জন্য নয়, বরাবরের জন্য। অতএব এমন একটা জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে ডাক্তারবদ্যি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কেনার দোকান বাজার হাট ইত্যাদি সবকিছুই হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়। এ না হলে তো দু'দিনে হাঁফিয়ে উঠবে। তা ছাড়া অন্য ভয়ও আছে। চুরিডাকাতি আজকাল কোন জায়গায় নেই? কাজেই রাত-বিরেতে বিপদ-আপদ কিছু হলে কারও সাহায্য পাবে?

ভার্গব বললেন, আমি যতদূর জানি ময়ূরভঞ্জ কিন্তু এখনও ওই সবের ঊর্ধ্বে।

হোক। তবু আমি ওই রকম পরিবেশে কিছুতেই যাব না। শহরে লোক্যালিটির মধ্যে জায়গা কেনো, আমি যেতে রাজি।

সৌরভ বলল, মায়ের সঙ্গে এই ব্যাপারে আমি একমত। তবে কিনা দুটো জায়গাই দেখা হোক। পাহাড়তলির জায়গাটা যদি সত্যিই লোভনীয় হয় তা হলে সেটাও কিনে রাখলে ক্ষতি কী?

ভার্গব বললেন, কোনও ক্ষতি নেই। ব্যাঙ্কে টাকা রাখার চেয়ে জমি কিনে

সৌরভ বলল, ফেলেই বা রাখব কেন? শহরের জমিতে আমাদের বসতবাড়িটা হোক, আর ওইখানে একটা ছোট্ট বাগান, সেইসঙ্গে ছোটখাটো একটা কুঁড়েঘর।

বিনতা বললেন, তাতে অবশ্য আমার আপত্তি নেই। ব্রিগেডিয়ারসাহেব একটা বাড়ি হাঁকিয়ে পাহাড়ের কোলে থাকবেন, অথচ সে বাড়িতে রাত্রিবেলা ডাকাতি হবে না, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না। আজকাল স্বর্গেও ডাকাতি হয়।

ভার্গব হাসলেন। বললেন, অরবিন্দ লিখেছে আমাদের সবাইকেই যেতে। বিশেষ করে সৌরভকে কবে সেই দু'বছরেরটি দেখেছিল, এখন সে কত বড় হয়েছে সেটা দেখার ইচ্ছেই তার প্রবল। কেন না ওর মেয়েটাও তো ওরই জুড়ি।

তুমি তা হলে কবে যাবে ঠিক করলে?

আমি কেন? তোমরা যাবে না?

শুধু শুধু গিয়ে কী করব।

কী আবার করবে? জায়গা পছন্দ করবে।

ওর ভেতরে আমি নেই। বলে উঠে গিয়ে চায়ের কেটলি নিয়ে চা করতে বসলেন। তারপর পেয়ালায় টুং টাং করতে করতেই বললেন, তোমরা দু'বাপ-ব্যাটায় যাও গিয়ে জমি পছন্দ করে এসো। আমি যাব একেবারে গৃহপ্রবেশের সময়। তবে বাপু একটা কথা। আমার একটা ঠাকুরঘর তোমরা করে দিয়ো।

আমরা চলে যাব, তুমি একা থাকবে?

ক্ষতি কী?

সৌরভ বলল, একা থাকতে মায়ের অবশ্য কোনও অসুবিধেই হবে না।

তা হয়তো হবে না। কিন্তু যাবে না কেন?

ধ্যুৎ। কারও বাড়িতে গিয়ে ওঠা আমার পোষাবে না।

বেশ তো, না পোষায় হোটেলে উঠব। ওখানে কি হোটেল-লজের অভাব আছে? পঞ্চাশ-ষাট টাকায় ভাল ঘর পাওয়া যায়।

সেটা কি ঠিক হবে? যার এত উৎসাহ তার বাড়িতে না উঠলে সে কী ভাববে বলো তো? তাই বলি কী, তোমরাই যাও।

সৌরভ বলল, আমরাই যাব। কিন্তু বাবা, যাব কীসে আমরা?

দু'রকম উপায় আছে। এক হল ধর্মতলা থেকে সরকারি বাসে কেওনঝোড়। অথবা রাতের তিরুপতি এক্সপ্রেসে যাজপুর কেওনঝোড় রোড স্টেশনে নেমে কেওনঝোড়ে যাওয়া। সকাল ছ'টায় ধৌলি এক্সপ্রেসেও যাওয়া যায়। বেলা বারোটা-একটা নাগাদ পৌঁছে সেখান থেকে বাস। যেতে অবশ্য সন্ধে হয়ে যায়।

বিনতা বললেন, আমার কথা যদি শোনো, তা হলে শেষেরটাই করো।

সৌরভ বলল, বাসে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। ট্রেন জার্নির চেয়ে

আরামদায়ক কীসে আছে আর? তবে বাবা ওই সকালবেলার ধৌলিতে যাওয়া নয়। রাতের তিরুপতিতেই যাওয়া ভাল।

বিনতা বললেন, তিরুপতি এক্সপ্রেস? ওটা তো চোরডাকাতের গাড়ি। রোজ কাগজ খুলেই দেখি যত চুরিডাকাতি সব ওই গাড়িতে।

ভার্গব বললেন, সেটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। কপাল ফাঁসলে কালকা মেল অথবা রাজধানী এক্সপ্রেসেও ডাকাতি হতে পারে।

সৌরভ বলল, আমি রাতের গাড়িই পছন্দ করছি। কখন পৌঁছবে গাড়িটা?

এই ধরো না কেন, সকাল ছ'টা সাড়ে-ছ'টা নাগাদ।

এখানে ছাড়ছে ক'টায়?

রাত এগারোটা কুড়িতে।

চমৎকার হবে তা হলে। খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে যাওয়া। তারপর থ্রি-টায়ার স্লিপার কোচে হাত-পা ছড়িয়ে একটা চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়া। সকাল যখন হবে তখন বাথরুমের কলে মুখহাত ধুয়ে স্টেশন এলেই নেমে পড়া।

ভার্গব বললেন, আমারও ওই একইরকম ইচ্ছা। কেন না সারাটা দিন ধরে বসে বসে যাওয়ার চেয়ে রাতের গাড়িতে জার্নি করা অনেক ভাল। ট্রেনের দোলায় ঘুমোতে ঘুমোতে গেলে সময়টা যে কোথা দিয়ে কীভাবে কেটে যাবে তা বোঝাও যাবে না।

তা হলে আমরা যাব কবে?

ভার্গব হাসলেন। বললেন, টিকিট যেদিনের পাব। কাল পেলে কাল, পরশু পেলে পরশু।

বিনতা চা তৈরি করে মাখনটোস্ট সহযোগে চা দিলেন টি-টেবিলে।

ঠিক হল চা-টা খেয়েই ভার্গব টিকিটের জন্য যাবেন।

বিনতা বললেন, সেই যাবেই যখন ঠিক করছ রাতের গাড়িতে, তখন যাও। তাই বলে যেন দয়া করে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেট না। থ্রি-টায়ার স্লিপার ক্লাসেই কেটো। লোকজন থাকবে অনেক।

ভার্গব বললেন, তাই তো কাটব। শুধু শুধু ফার্স্ট ক্লাসে কেটে কতকগুলি টাকা ফালতু নষ্ট করে লাভ কী?

চা খাওয়া শেষ হলে ভার্গব পোশাক পরিবর্তন করে নিউ কয়লাঘাটা বুকিং অফিসের দিকে চললেন।

সৌরভ গেল তার বন্ধুদের কাছে এই সুখবরটা পৌঁছে দিতে। অবশ্য জমি কেনার ব্যাপারস্যাপারগুলো ও বলবে না কাউকে। শুধু বেড়াতে যাওয়ার কথাটাই জানবে সকলে। সবাই জানবে এক অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে কাজলনয়না হরিণীর দেশে সৌরভ যাচ্ছে কয়েকদিনের ভ্রমণবিলাসে।

দুই

ব্রিগেডিয়ার ভার্গব যখন নিউ কয়লাঘাটা বুকিং অফিস থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর চোখেমুখে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছাপ। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে হঠাৎ করেই যেন তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর।

বিনতা স্বামীর ওইরকম অবস্থা দেখে বললেন, কী ব্যাপার! শরীর খারাপ নাকি?

সৌরভ ছাদে ছিল। বাবার উপস্থিতি টের পেয়েই ছুটে নেমে এসে বলল, টিকিট পেয়েছ বাবা?

পেয়েছি।

তা হলে কবে যাব আমরা?

আজই রাতের গাড়িতে যাবি তুই।

আমি যাব?

হ্যাঁ। তুই একা যাবি।

একা কী করে যাব? তুমি যাবে না?

ভার্গব ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

বিনতা বললেন, কারণটা কী? টিকিট ছিল না?

তা নয়।

তা হলে?

ভার্গব সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, বেলা এখন কত হল? এগারোটা? আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারো?

এক কাপ কেন? দু'কাপ করে দিচ্ছি। কিন্তু হল কী তোমার?

ভার্গব বুকেমুখে, কপালে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, ক্যাপ্টেন ঘোষকে তোমার মনে আছে?

তা আবার মনে নেই? কোথায় যেন থাকেন তিনি?

থাকেন নয়, থাকতেন। ল্যান্সডাউন টেরেসে। আমার এক পরিচিত বন্ধুর মুখেই খবরটা পেলাম ওর। আজ সকালে দেশপ্রিয় পার্কে মর্নিং ওয়াকের সময় হার্ট অ্যাটাক হয় তাঁর।

সে কী!

স্পট ডেড।

বিনতার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না।

ভার্গব বললেন, শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মানুষের জীবনের অন্তিম পরিণতি এই। তবু আমরা বাঁচার জন্য কী না করি।

শুধু মানুষের কেন? সকল জীবেরই তো ওই একই পরিণতি।

আমার মনে হচ্ছে ওদের এই বিপদের দিনে এখুনি একবার ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

এ তো খুবই ভাল কথা। তাই বলে তুমি নিজের টিকিট না-কেটে, শুধু ছেলের টিকিট কাটলে কেন?

কারণ আছে। ধরো এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমারও যদি ওই রকম হয়? তখন ওকে একাএকাই তো সব কিছু করতে হবে।

করবে। কিন্তু তা যখন নয়, তখন হঠাৎ এইসব আবোল তাবোল চিন্তাগুলো তুমি কেন করছ?

তা জানি না। মৃত্যুভয় আমি কখনও করিনি তুমি তো জান? কিন্তু ক্যাপ্টেন ঘোষের এই অকালমৃত্যুর খবর শুনে আমি যেন কেমন ঘাবড়ে গেছি। আসলে ও আমি দু'জনেই সমবয়সি। ওরও একটিমাত্র ছেলে। সৌরভের বয়সি। পিতৃহীন হয়ে বেচারি এখন কী করবে বলো দেখি?

কী আবার করবে? নিজের পায়ে দাঁড়াবে। দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া ক্যাপ্টেন ঘোষের স্ত্রীও তো শুনেছি কোথাকার কোন স্কুলের যেন হেড মিসট্রেস?

তা হবে। কিন্তু তবুও ছেলেটার কথাটা একবার ভেবে দেখো তো। সামনে দীর্ঘজীবন, অথচ এই সময়ে কী অবস্থা।

সৌরভ সব শুনে বলল, তোমার যখন মনের অবস্থা এই, তখন আমার টিকিটও না কাটলে পারতে। বিশেষ করে তোমাদের সঙ্গ ছাড়া একা আমি তো কখনও বাইরে বেরোইনি। তাই বলি কী, আমার টিকিট তুমি ক্যানসেল করিয়ে দাও।

সে কী।

আমি যাব না বাবা! এমনিতেই মাকে বাদ দিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না। তার ওপরে তুমি না গেলে যেতে আমার একদমই ভাল লাগবে না।

কেন ভাল লাগবে না?

একা একা আমার খুব ভয় করবে।

বিনতা বললেন, তার চেয়ে আমি বলি কী, চলো আমরা তিনজনেই যাই। তোমার মানসিক অবস্থা ভাল নয় যখন, তখন দু'-চারদিনের জন্য তোমারই প্রিয় জায়গা থেকে একটু ঘুরে এলে তোমার পক্ষেও ভাল হবে।

আমার এখন কোথাও যাওয়া উচিত হবে না।

সৌরভ বলল, তা হলে আমিও যাচ্ছি না।

যেতে তোমাকে হবেই।

বিনতা বললেন, তোমার যখন জেদ ও তখন যাবেই। কেন না যেতে ওকে

হবেই। অতএব আমি বাধা দিয়েও ওকে আটকাতে পারব না। কিন্তু তোমার এই জেদ বজায় রাখতে গিয়ে ছেলেটার বিপদ আপদের কথা একবারও ভেবে দেখলে না তুমি? তা ছাড়া ও নিজে যেখানে যেতে সাহস করছে না, সেখানে তুমি ওকে জোর করে যেতে বল কী করে?

আমি ওকে দিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই।

তা হলে ওর কোনও একজন বন্ধুকে অন্তত সঙ্গে দাও।

না। কোনও প্রয়োজন নেই তার। বন্ধুবান্ধবই যদি সঙ্গে থাকবে তা হলে আমার যেতে আপত্তি কী ছিল? আমি চাই ও এখন থেকেই একা একা ঘর ছেড়ে বেরোতে শিখুক। নিজে নিজেই সব কিছু দেখুক, শুনুক। জীবনের চরম অভিজ্ঞতাটা লাভ করুক। তবেই তো।

তা না হয় হল। হাজার হলেও ছেলেমানুষ তো?

এমন কিছু ছেলেমানুষ ও নয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। চালাকি নাকি? বলে সৌরভকে কাছে টেনে পাশে বসিয়ে বললেন, হ্যাঁ রে! পারবি না একা একা যেতে?

সৌরভ মাথা হেঁট করে বলল, খুব পারব। কিন্তু বাবা...।

এর মধ্যে আর কোনও কিন্তু রাখিস না। ধর, ক্যাপ্টেন ঘোষের মতো হঠাৎ করে আজ যদি আমিও মরে যাই তা হলে কি ঘর থেকে বাইরে বেরোবি না?

তা কেন?

তাই আমি বেঁচে থেকে দেখে যেতে চাই আমার সৌরভ দুগ্ধপোষ্য শিশু নয়। প্রয়োজনে সে সব পারে। সে লড়তে জানে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে জানে, সাহসে ভর করে বীরদর্পে এগিয়ে যেতে জানে।

বাবার কথায় বুক ফুলে উঠল সৌরভের। তার মনে হল সত্যিই তো, সে তো আর শিশুটি নেই। তার অনেক বন্ধু তো একা একা ছুটি কাটাতে দেশের বাড়িতে যায়। মামার বাড়ি যায়। আর সে কি না ময়ূরভঞ্জে যেতে পারবে না? তাই দারুণ উৎসাহিত হয়ে বলল, এই যদি হয়, তা হলে আমি দেখিয়ে দেব আমি কী পারি না-পারি।

সত্যি বলছিস?

তুমি আমার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারো বাবা।

ভেরি গুড।

কিন্তু বাবা, এইভাবে একা একা আমাকে কেওনঝোড় পাঠানোর মধ্যে তোমার উদ্দেশ্যটা কী বলো তো? শুধুই কি আমার সাহসের পরীক্ষা নেওয়া? না অন্য ব্যাপার?

বিনতা ততক্ষণে তিন কাপ কফি করে ফেলেছেন। তারপর সেটা তিনজনে

ভাগ করে মুখোমুখি বসলেন একটা শান্তিনিকেতনি মোড়া নিয়ে।

ভার্গব বললেন, উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা হল আমি এসব করছি কার জন্য? আমার নিজের জন্য নিশ্চয়ই নয়। আমি চাই সুস্থসুন্দর একটা পরিবেশ। যে পরিবেশে আমি শান্তিতে চোখ বুজতে পারব। মরবার সময় আমার একটাই সান্ত্বনা থাকবে যে, আমার স্ত্রী-পুত্রের গায়ে কেউ আঁচড়টিও লাগাবে না এখানে। ময়ূরভঞ্জ হচ্ছে সেইরকমই একটি আদর্শ জায়গা, কাজেই তুমি সেখানে যাবে। অরবিন্দ যে জায়গা আমাদের জন্য দেখে রেখেছে সেই জায়গাটা ভাল করে দেখবে। সেখানে তোমার থাকতে অসুবিধে হবে কি না, মন বসবে কি না, সব কিছুই ভাল করে দেখবে। তারপর তুমি ফিরে এসে বললেই আমি জমি রেজিস্ট্রি করতে যাব। নচেত নয়।

সৌরভ লাফিয়ে উঠল আনন্দে। বলল, তবে তো আমার একটা বন্ধুকে সঙ্গে নিলে সময়টাও কাটত বেশ।

তাতে কি একা যাওয়ার মজাটা পাবে?

না তা অবশ্য পাব না।

অত বই কিনে দিয়েছি তোমাকে। সেসব কিছু সঙ্গে নাও। পাণ্ডব গোয়েন্দার সব ক'টা খণ্ডই তো তোমার আছে। সোনার গণপতি হিরের চোখ, চতুর গোয়েন্দা চতুরভিযান, আরও অনেক বই তোমার আছে।

তা অবশ্য আছে। আমি তা হলে কীভাবে যাব?

প্রথমেই তোমাকে আমি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। রাত এগারোটা কুড়িতে ট্রেন। পৌঁছবে সকাল ছ'টা বাহান্ন মিনিটে। সারাটা রাত আরামে ঘুমিয়ে নিতে পারবে ট্রেনের ভেতর। তারপর সকালটি হলেই নেমে পড়া। মনে রাখবে স্টেশনের নাম যাজপুর কেওনঝোড় রোড। ওখানে ট্রেন থেকে নেমেই কোনও একটা ভাল দোকান দেখে বেশটি করে জলযোগটা সেরে নেবে। কেন না স্টেশন থেকে কেওনঝোড় পর্যন্ত বাসে সময় লাগবে প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টার মতো।

তা হলে তো অনেকদূর।

এইবার তুমি শুধু ওইখানে নেমে অরবিন্দর ঠিকানাটা খুঁজে বার করবে। পারবে না?

খুব পারব।

বিনতা কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, যদি না পারে?

অজস্র হোটেল লজ আছে। সেখানেই কোথাও উঠবে।

এর পরে আর কোনও কথাই নয়। রীতিমতো সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। তাই অল্প এবং হালকা ধরনের শীতবস্ত্রও নিল সঙ্গে।

একটি ব্যাগের মধ্যেই সব কিছু পুরে নিয়ে একটাই লাগেজ করল। আর রাখল একটা ছোট্ট ওয়াটার বটল। এটা না রাখলেই নয়। সেইসঙ্গে লুকিয়ে ধারাল একটা ছুরি। কেন না এখন যা দিনকাল, তাতে শুধু হাতে দূর পাল্লার ট্রেনজার্নি কখনওই নিরাপদ নয়।

তিন

একা যাওয়া যে কত বড় ঝক্কির ব্যাপার সেটা এবার হাড়েহাড়ে টের পেল সৌরভ। চিরটা কাল বাবা-মায়ের সঙ্গেই ঘুরেছে। অবশ্য চিরটা কাল বললে একটু বাড়িয়ে বলা হবে। কেন না কতই বা বয়স ওর? চোদ্দো থেকে পনেরো। যাওয়ার মধ্যে বার তিনেক পুরী, একবার বেনারস, একবার রাজগির ও বুদ্ধগয়া। হ্যাঁ, আর একবার খুব ছোটবেলায় দেওঘরে গিয়ে নাকি একমাস ছিল। তখন ওর দু'বছর বয়স। কাজেই দেওঘরের স্মৃতি কিছুই ওর মনে নেই।

যাই হোক। রাত এগারোটার মধ্যেই সৌরভ হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছল।

বাবা-মা দু'জনেই সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সৌরভ তাতে রাজি হয়নি। যে ছেলেটি জীবনে প্রথম একা একা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোচ্ছে সে যদি বাবা-মা'র সাহায্য নিয়ে স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠল তাতে তো গোড়ায় গলদ রয়েই গেল।

তাই সম্পূর্ণ একা ওর কিট ব্যাগটা নিয়ে ফাঁকা বাসে চেপে হাওড়া স্টেশনে এল।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সমস্ত দূরপাল্লার গাড়িই এখন নিউ কমপ্লেক্স থেকে ছাড়ে। সেই মতো সে নিউ কমপ্লেক্সেই এসে হাজির হল। ভেবেছিল ট্রেন প্ল্যাটফর্মেই থাকবে। ও শুধু ওয়াটার বটলে জলটা ভরে নিয়েই উঠে পড়বে গাড়িতে। তারপর নিজের বার্থ খুঁজে নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আয়াশে একটা ঘুম দিলেই একঘুমে রাত কাবার।

কিন্তু স্টেশনে এসে দেখল ট্রেন তখনও প্ল্যাটফর্মে দেয়নি। না দিক, যখন দেবে তখন উঠবে। এখন জলটা তো ভরে নেওয়া যাক। মা একবাক্স সন্দেশ দিয়েছেন। সেটা খেয়ে জল খেয়েই শুয়ে পড়বে। যদিও বাড়িতে ভালমতোই খেয়ে এসেছে, তবুও ট্রেনে উঠে একটু মিষ্টিমুখ না করলে নয়।

এই ভেবে স্টেশনের কলে জল নিতে গিয়েই মুশকিলে পড়ল। অতগুলো কল, কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা জল নেই।

জল আছে। তবে সেটা বোতলের জল। দশ টাকা দাম। কিনবে তো কেন, না-কিনলে তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরো।

কী জ্বালা। জল ছাড়া কি খাওয়া যায়? যতই কেন এক রাতের জার্নি হোক, তবু জল যে জীবন।

মা অনেক করে বলেছিলেন হাওড়া স্টেশনের জল ভাল না। কোনও স্বাদ নেই। ঘর থেকে জল নিয়ে যেতে। কিন্তু সৌরভ শোনেনি। বলেছিল, খাব তো কত। তার জন্য বাড়ি থেকে জল বইবার দরকারটা কী?

এখন কী করা যায়?

ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ছাড়লে হাতে মাত্র দশ মিনিট সময়।

কয়েকজন ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা আগের স্টেশনে, মানে বড় ঘড়িটা যেখানে আছে সেইখানে গেলেন জল নিতে।

সৌরভও তাঁদের সঙ্গ নিয়ে গেল।

জল নিয়ে যখন ফিরল তখন ট্রেন ছাড়ার একটু সময় বাকি।

আজকাল প্ল্যাটফর্মে এসে ট্রেনে ওঠার আগে চার্টে নাম মিলিয়ে বগি চিনতে হয় না। এখন সেসব ব্যাপারে খুব সুবিধে হয়ে গেছে।

সৌরভের টিকিট ছিল, এস ফোর, সাতাশ।

তার মানে আপার বার্থ। একক যাত্রীর পক্ষে আপার বার্থে জার্নির চেয়ে আরামদায়ক আর কিছুতেই নেই। সৌরভ তাই ট্রেনে উঠেই বার্থের ওপর ওর কিট ব্যাগটা রেখে ওয়াটার বটলটা ঝুলিয়ে দিল লোহার আংটায়।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল।

বেশ ভিড় আছে বগিতে। সৌরভের মনেই হল না ও একা যাচ্ছে। কত কত যাত্রী। বাঙালি যাত্রীও অনেক। বেশির ভাগ কটকের যাত্রী। একটি পরিবার ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠেছেন, তাঁরা যাবেন বহরমপুর গঞ্জাম। সেখান থেকে গোপালপুর অন সি।

সৌরভ ওর বার্থে উঠে প্রথমেই সন্দেশের প্যাকেটটা বের করে দু'-একটা সন্দেশ খেয়ে নিল। মা প্রায় দশ-বারোটা সন্দেশ দিয়েছেন। অত কী খাওয়া যায়? তারপর ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে শোবার ব্যবস্থা করল।

ওর ওপাশের বার্থে একটি মেয়ে শুয়েছিল। কী মিষ্টি আর কোমল মুখখানা। কচি এবং লাবণ্যময়। কেমন যেন ঢল ঢল করছে। চোখদুটো এত ভাল যে, মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই চোখের দিকে চোখের পাতা না-ফেলে চেয়ে থাকে।

মেয়েটি বলল, এই, তোমার জল থেকে আমাকে একটু জল দেবে?

সৌরভ মেয়েটির হাতে ওয়াটার বটল দিয়ে বলল, তুমি জলের জায়গা আনতে ভুলে গেছ বুঝি?

হ্যাঁ।

সৌরভ বলল, আমার কাছে সন্দেশও আছে। তুমি খাবে?

আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

সে তো আমিও। সন্দেশ যখন আছে, তখন শুধু জলটা কেন খাবে?

তোমার কম পড়বে না?

কম পড়বে কেন? দেখলে তো আমি কেমন গপাগপ করে খেলাম। তা ছাড়াও আছে। রাত্রে তো আর খাব না। সেই সকালে। সকালে যাজপুর কেওনঝোড়ে নেমে দোকানে গিয়ে ঢুকব।

মেয়েটি সন্দেশ আর জল খেয়ে বলল, তুমি যাজপুর যাচ্ছ?

তুমি?

আমিও। তোমার সঙ্গে কেউ নেই?

না। তোমারও তো সঙ্গে কেউ নেই দেখছি।

মেয়েটি হাসল। বলল, ওইজন্যই বোধহয় মুখোমুখি সিট পড়েছে আমাদের। কিন্তু তুমি একা যাচ্ছ কেন?

আসলে আমার একা বেরনোর শখ খুব। তাই বাড়িতে বলেকয়ে একটুখানি সাহসে ভর করে বেরিয়ে পড়লাম।

তা বেশ করেছ। কিন্তু এত জায়গা থাকতে তুমি এই জায়গাটাই বেছে নিলে কেন? পুরী, ভুবনেশ্বর, গোপালপুর এইসব জায়গায় যেতে পারতে।

পারতাম। কিন্তু হিলি এরিয়া আমাকে খুব আকর্ষণ করে।

তাই বলো, তার মানে তুমি একজন পর্বত-প্রেমিক?

কিন্তু তুমি একা কেন, তা তো বললে না?

আমি বাড়ি থেকে পালাচ্ছি।

পালাচ্ছ? যাবেটা কোথায়?

জানি না। ভাবছি তোমার সঙ্গে যাজপুরেই নামব। নেমে তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

সর্বনাশ। তোমার টিকিট কোথাকার?

আমার টিকিট নেই। ডব্ল-টি।

সৌরভ ভেবে পেল না বিনা টিকিটের একজন যাত্রী থ্রি-টায়ার স্লিপার কোচে জায়গা পায় কী করে? এখুনি যার বার্থ সে এসে যদি দাবি করে, তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে দেবে মেয়েটাকে।

সৌরভ বলল, তা হলে তোমার রিজার্ভেশনও নেই।

মেয়েটি বলল, আছে বইকী। আমি প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে স্টেশনে এসেছি। তারপর গাড়ির কোচ অ্যাটেনডেন্টকে বলে এই বার্থটা ম্যানেজ করেছি। এবার উনি এলে ঠিক করব কোথায় যাব না যাব, সেইমতো টিকিট হবে। তা তোমার সঙ্গে দেখাটা যখন হয়ে গেল তখন ভাবছি তোমার সঙ্গেই ভিড়ে যাই। কেন না ছেলে হিসেবে তুমি খুব ভাল। তোমাকে দেখতেও সুন্দর। ব্যবহারও ভদ্র। তাই তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

কিন্তু তুমি বাড়ি থেকে পালাচ্ছ কেন?

বাবা-মা দু'জনের ওপরই রাগ করে। আমি একটু মাথামোটা। তাই পড়াশুনায় ঠিকমতো মন বসাতে পারি না। এই নিয়ে দাদা আমাকে যখন তখন মারে। বাবা-মা আমাকে সান্ত্বনা তো দেনই না, উপরন্তু দাদাকেই সমর্থন করেন।

সেই রাগে বাড়ি ছেড়ে চলে এলে?

শুধু তাই নয়, একজন আমাকে সিনেমায় নামিয়ে দেবে বলেছিল। তার জন্য দশ হাজার টাকাও চেয়েছিল। বাবা সেটা দিতে রাজি নন। তাই ঠিক করলাম আর ও বাড়িতেই নয়। বনে-জঙ্গলে যেখানে হোক চলে যাব। তবে বোকার মতো আত্মহত্যা করব না। আত্মহত্যা করে বোকারা। রাম বুদ্ধুরা।

তুমি যে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ তোমার বাবা-মা জানেন?

তুমি তো দেখছি আর এক বোকা। না জানলেও এতক্ষণে জেনেছেন। এখন রাত কত? তার ওপর আমি দুপুর থেকে বাড়ি নেই। অবশ্য আমার টেবিলের ওপর এই মর্মে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি যে, আমার খোঁজ কোরো না। আমি বরাবরের জন্যই যাচ্ছি। এর পরও কি জানতে বাকি থাকে?

সৌরভ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, কাজটা কিন্তু তুমি ভাল করোনি।

খারাপও করিনি। জান তো সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আমার ফেস কাটিং দেখেছ? দেখো ভাল করে, এই মুখ দেখলে ভগবানেরও ভুল হয়ে যাবে। এই তুমিই একটু ভেবে দেখ না, আমি চাইলাম জল, তুমি অমনি জল ছাড়াও সন্দেশ অফার করলে। তা হলেই বোঝো বনে গিয়েও অন্ন জুটবে আমার।

সৌরভ বুঝল মেয়েটি শুধু যে বাকপটিয়সী তা নয়, একটু ছিটগ্রস্তও। তা না হলে সামান্য একটা ব্যাপারে মাথাগরম করে কেউ কখনও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে? বিশেষ করে এই বয়সের মেয়ে! একেবারে টিন এজার যাকে বলে ও তো তাই।

এমন সময় কোচ অ্যাটেনডেন্ট টিকিট চেক করতে এলে, সৌরভ ওর টিকিট দেখাল।

মেয়েটি ওর ছোট্ট মানি ব্যাগ বার করে দুটো একশো টাকার নোট এগিয়ে দিল অ্যাটেনডেন্টের দিকে।

কোথায় যাবে যেন?

প্রথমে কিছু ঠিক করিনি। তবে এখন ভাবছি যাজপুর যাব।

অ্যাটেনডেন্ট মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, টাকাটা রাখো। ওটা তোমার কাজে লাগবে।

মেয়েটি দারুণ খুশি হয়ে টাকাটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর কোচ অ্যাটেনডেন্ট চলে গেলে সৌরভকে বলল, দেখলে তো ম্যাজিক কাকে বলে? আমি তোমাকে বলেছিলাম না সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। ঠিক কি না?

সৌরভ বলল, ঠিক মানে? কাঁটায় কাঁটায় ঠিক। তা তোমার নামটি জানা যেতে পারে কি?

নিশ্চয়ই। আমার নাম খেয়ালি।

বাঃ ভারী সুন্দর নাম তো।

তোমার নাম কী?

আমার নাম সৌরভ।

তোমার নামও ভাল। দু'জনেরই তিন অক্ষর। তা যাক। আর কোনও গল্প নয়। এবার শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। কেন না সকাল হলেই নামতে হবে তো। আর শোনো, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আমাকে তুমি ডেকে নিয়ো কিন্তু। আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

সৌরভ বলল, আচ্ছা।

এরপর দু'জনেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল।

একটু একটু করে ঘুম নেমে আসছে সৌরভের চোখে। ট্রেনের দোলা লাগলে এমনিতেই ঘুম এসে যায় ওর। তার ওপর রাতও হয়েছে। তাই কিছু সময়ের মধ্যেই গভীর ঘুমে মগ্ন হল সে।

তিরুপতি এক্সপ্রেসকে লোকে বাজে গাড়ি বলে। কিন্তু এই গাড়িই ফাঁকা মাঠে পড়ে এমন গতি নিল যে, মনে হল লাইন থেকে ছিটকে যাবে বুঝি।

চার

সকাল যখন হল ট্রেন তখন বালেশ্বরে।

সৌরভ ঘুম ভেঙে চোখ মেলেই দেখল পাখি ফুড়ুত। অর্থাৎ পাশের বার্থে শুয়ে থাকা সেই খেয়ালি নামের মেয়েটি নেই। কোথায় গেল সে? ওর কোনও জিনিসপত্তর ছিল কি না তা ও জানে না। শুধু গায়ে চাপা দেবার মতো একটা চাদর ছিল। সেটাও তো নেই।

তবে কি বাথরুমে গেছে? হয়তো। সৌরভ আর শুয়ে না থেকে উঠে পড়ল। দু'দিকের বাথরুমে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল, না কোথাও নেই। তা হলে গেল কোথায় মেয়েটা?

ও নিজেই তখন কলে গিয়ে মুখচোখ ধুয়ে এসে এক কাপ বিস্বাদ চা কিনে খেল।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ওর।

একটু পরেই নড়ে উঠল ট্রেন।

আর অমনি দেখা গেল একটি বড়সড় সুটকেস টানতে টানতে এগিয়ে আসছে খেয়ালি।

খানিক এসেই হাঁক দিল সে, সৌরভ! সৌরভ! একবার এদিকে এসো।

সৌরভ ছুটে গেল ওর দিকে। বলল, এ কী! এটা কোত্থেকে পেলে? কার এটা?

আমার সাইডের বার্থে যিনি শুয়ে আছেন তাঁর।

কিন্তু এটা তোমার কাছে কী করে এল?

চলো না বলছি।

ওরা দু'জনে মিলে ধরাধরি করে সুটকেসটা নিয়ে এসে ওদের বার্থের কাছে রেখে সাইড আপারে যে ভদ্রলোক শুয়েছিলেন তাঁকে ডেকে তুলল।

সৌরভ বলল, দেখুন তো এটা আপনার কি না?

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ, এটা তো আমারই।

কোথায় ছিল এটা?

কেন আমার পায়ের কাছে!

ওখানেই রাখুন। আর ভেতরটা দেখে নিন জিনিসপত্তর সব ঠিকঠাক আছে কি না।

ভদ্রলোক চাবি লাগিয়ে লক খুলে ভেতরে একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, হ্যাঁ। সবই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু এটা তোমাদের হাতে গেল কী করে?

খেয়ালি বলল, হঠাৎ ভোরবেলা মাকে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। আমার পাশের এই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখি সেও বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি তখন ঘুরে শুই আর চোখ পিটপিটিয়ে সবকিছু দেখতে থাকি। হঠাৎ দেখি আপনার বার্থের নীচে যে টাকলুবাবু শুয়েছিলেন তিনি উঠে বসেছেন। টাক আর ভুঁড়ি আমি দু'চোক্ষে দেখতে পারি না। দেখলে আমার হাসিও পায়, আবার রাগও ধরে। তা আমি দেখি না সেই টাকলুবাবু উঠেই চটপট সবকিছু গুছিয়ে নিলেন। আমি ভাবলাম উনি নেমে গেলেই আমি জানালার ধারটায় গিয়ে বসব। তারপরই দেখি না, উনি এদিক ওদিক তাকিয়ে আপনার

সুটকেসটি নিয়ে হাওয়া। আমি প্রথমটায় ভাবলাম হয়তো এটা ওনারই। তারপরই মনে হল, না তা তো নয়। ওনার সুটকেস হলে সেটা ওনার কাছেই থাকত। অন্যের বার্থে থাকবে কেন? তাই সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে ধাওয়া করলাম আমি। প্ল্যাটফর্মে নেমে লোকটি যখন একটা কুলি ডেকে সেটা তার মাথায় চাপাবার চেষ্টা করছেন আমি তখন শুধুই কাছে গিয়ে বলেছি, এই যে মিস্টার... আর কিছু বলবার আগেই টাকলুবাবু সেই কুলিটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েই কোথায় যে গা ঢাকা দিলেন, তাঁর টিকিটিও দেখা গেল না আর।

সৌরভ হেসে বলল, টাকলুবাবু যদি হয় তো টিকি থাকবে কী করে তাঁর, যে তুমি দেখবে?

খেয়ালি বলল, থাক। খুব হয়েছে। আর ফুট কেটো না তুমি। যেমন ঘুমোচ্ছিলে তেমনি ঘুমোও। কী ঘুম রে বাবা। গাড়িতে এত কেউ ঘুমোয়?

অন্যান্য অনেক যাত্রী জেগে উঠেছেন তখন। সবাই যে যার জিনিসপত্তর হাতড়ে দেখলেন। সবার সব কিছুই ঠিক আছে। একটিই শুধু খোয়া গিয়েছিল, ভাগ্যজোরে পাওয়া গেল সেটাও।

ভদ্রলোক বললেন, তুমি যে আমার কী উপকার করলে না, তা কী বলব। এর ভেতরে অনেক দামি দামি জিনিস ছিল আমার। নগদ টাকা-পয়সাও কিছু ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, আমার ছেলের চাকরির ইন্টারভিউ লেটার, আমার বাড়ির দলিল, আর ইন্টারন্যাশন্যাল পাসপোর্টও ছিল। ওগুলো খোয়া গেলে কী ঝামেলাতেই যে পড়তাম।

সৌরভ বলল, খেয়ালি! তুমি যে কাজ করেছ, তাতে তোমাকে সত্যিই ধন্যবাদ জানানো উচিত। কিন্তু তুমি অতখানি ঝুঁকি না নিয়ে যদি চেঁচিয়ে উঠতে, তা হলে লোকটাকে ধরে আমরা সবাই মিলে আচ্ছা কষে ঘা কতক দিতে পারতাম।

খেয়ালি বলল, আসলে লোকটি আদৌ চোর কিনা বুঝে উঠতেই তো আমার সময় লাগল। তা ছাড়া আমি চেঁচিয়ে উঠলে উনি হয়তো এই সুটকেসটা সঙ্গে নিয়েই পালাতেন।

কিন্তু যদি ও আক্রমণ করত?

তা হলে? বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ওর বুকের কাছে উঁচিয়ে ধরেছে ধারালো একটা ছুরি। সেটা এমনই যে, আর একটু হলেই লেগে যেত সৌরভকে।

কী সাংঘাতিক মেয়ে।

শুধু যে ছুরির ফলা তা নয়। ওর দু'চোখেও তখন ঝকঝক করছে হিংসার একটা শানিত ছুরি। এই যদি ওর দেখানোর ভঙ্গি হয় তা হলে বাস্তবক্ষেত্রে এ তো ডেঞ্জারাস।

সৌরভ সভয়ে একটু পিছিয়ে যেতেই, এক মুখ হেসে ওর ঠিক পাশটিতেই বসে পড়ল খেয়ালি।

একটু পরে আবার চা এলে সেই ভদ্রলোক ওদের দু'জনকেই চা খাওয়ালেন।

কী একটা স্টেশনে ট্রেন থেমে আবার চলতে শুরু করল।

খেয়ালি বলল, তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দা পড়েছ?

সৌরভ বলল, না।

আজকের দিনে যে ছেলে বা মেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দা পড়েনি তার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করি না। পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু কী বলেছে জানো তো, এখন যা দিনকাল তাতে খুনজখম করবার জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যই প্রত্যেকের সঙ্গে একটা-না-একটা অস্ত্র রাখা উচিত। বিশেষ করে তোমার আমার বয়সি ছেলেমেয়েদের। এ যা দিনকাল, এ যা অরাজকতা, তাতে কখন কী হয় কে জানে?

সেইজন্যেই বুঝি তুমি ছুরির খেলা দেখাবে বলে ঘর থেকে ছুরি নিয়ে এসেছ?

আরে না না। এটা কালই সন্ধেবেলা আমি হাওড়া স্টেশনে কিনেছি।

তবে যাই হোক, তুমি যে আর পাঁচটা মেয়ের মতো নও, তা কিন্তু বোঝাই গেছে।

এ সবই পাণ্ডব গোয়েন্দা থেকে শিখেছি।

কিন্তু তুমি চুপি চুপি যে কীর্তিটা করলে, ওটা যে পঞ্চুই করে থাকে সাধারণত।

কী বললে? আমি পঞ্চুর কাজটা করেছি? তার মানে আমি বাচ্চু-বিচ্ছুর মতো না হয়ে পঞ্চুর মতো হয়েছি? এ তুমি বলতে পারলে? বলেই মুখ গোমড়া করে সৌরভের পাশ থেকে একটু সরে গিয়ে বসল এবং ফুলতে লাগল রাগে।

সৌরভ বলল, তুমি রাগ করলে?

খেয়ালি প্রথমে ওর কথায় উত্তর দিল না। তারপর এক সময় বলল, তুমি ভীষণ মিথ্যেবাদী।

কেন?

একটু আগে না তুমি বললে পাণ্ডব গোয়েন্দা তুমি পড়নি। তোমার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে পঞ্চুর কীর্তিকলাপ তুমি জানলে কী করে?

সৌরভ বলল, যাঃ। তোমার কাছে আমি হেরে গেলাম?

ট্রেন এসে যাজপুর কেওনঝোড় রোডে থামল।

সৌরভ ওর কিট ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নামলে, খেয়ালিও নামল ওর সঙ্গে। ছিটেল মেয়েটা কি সত্যিই ওর সঙ্গ নেবে? তা যদি হয় তা হলে তো মুশকিল। মেয়েটি নিঃসন্দেহে ভাল। ওর সঙ্গে কথা বলেও সময় কাটবে। কিন্তু অরবিন্দকাকুর বাড়িতে ওকে নিয়ে উঠলে ওঁরা কী ভাবে নেবেন?

খেয়ালি বলল, কী ভাবছ? আমাকে সঙ্গে নেবে কি না? যদি আপত্তি থাকে এখনও বলো। আমি ঠিক আমার ব্যবস্থা করে নেব।

সৌরভ বলল, না। আমি ভাবছি অন্য কথা।

চলতে চলতে ওরা গেটের কাছে এসে গেল। টিকিট কালেক্টর কালো কোটের ভেতর থেকে শীর্ণ একটি হাত বার করে বললেন, টিকিট?

সৌরভ টিকিট দিল।

কিন্তু খেয়ালি কোথায়? এই তো ছিল মেয়েটা। কোথায় গেল?

খেয়ালি তখন লাইন টপকে স্টেশনের বাইরে। সেখান থেকেই হাত নাড়তে লাগল সে, আমি এখানে। সৌরভ! এদিকে তাকাও।

সৌরভ এতক্ষণে দেখতে পেল খেয়ালিকে।

টি সি বললেন, ওর টিকিট কে দেবে?

সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করুন। আমার টিকিট তো আমি দিয়েছি।

ও তো তোমার সঙ্গেই কথা বলতে বলতে আসছিল।

তাতে কী হয়েছে। আমি তো আপনার সঙ্গেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। তার মানে কি আমিও রেলে চাকরি করি?

টি সি আর কিছু বললেন না।

সৌরভ গেটের বাইরে এল।

আর খেয়ালি দূর থেকে এক চোখটিপে এমন একটা ইঙ্গিত করল টি সি-কে যার অর্থ, বুঝতেই তো পারছেন দাদা, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। অর্থাৎ কিনা প্লিজ, ছোড় দিজিয়ে।

সৌরভ বুঝল, মেয়েটা সত্যিই চমৎকার। অদ্ভুতরকমের একটা ম্যানেজিং টেকনিক জানা আছে ওর। তার মানে পুরোপুরি একটি ম্যানেজ মাস্টারনী। যাই হোক, মেয়েটিকে ও সঙ্গ দেবে। না হলে ওর এই পাগলামির জন্য হয়তো কোনও বিপদও ঘটে যেতে পারে ওর। কেউ হয়তো ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে বিক্রিও করে দিতে পারে। তাই স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসেই হাত ধরল ওর।

খেয়ালি বলল, কী ঠিক করলে?

কীসের কী?

আমি কি তোমার সঙ্গে থাকব? না ছাড়াছাড়ি হবে দু'জনার?

সৌরভ বলল, ছাড়াছাড়ি হবে না বলেই তো হাত ধরলাম। এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে।

তা হলে প্রমিস করো, আমাকে তোমার চেলি করে নেবে।

চেলি। সে আবার কী জিনিস।

বাঃ রে। সাধুসন্ন্যাসীদের চ্যালা থাকে না? আর তুমিও যখন অসাধু নও, তখন আমি তোমার চেলি তো বটেই। দাও তোমার কিট ব্যাগটা। এখন থেকে ওটা আমিই বইব।

তার কোনও প্রয়োজন হবে না।

হবে মশাই হবে। না হলে মানাবে কেন? তুমি হচ্ছ হিরো, আমি হচ্ছি জিরো। আর তোমাকেও যা ফার্স্ট ক্লাস দেখতে না, তাতে সত্যিই যদি কখনও আমি সিনেমায় নামতে পারি তা হলে তোমাকে আমার নায়ক আমি করবই করব।

সৌরভ হেসে বলল, তা তো করবে। কিন্তু তোমার আমার বয়সটার কথা একবারও কি চিন্তা করেছ?

করেছি বইকী। আজকাল তোমার আমার বয়সি টিন এজারদের নিয়েই ছবি খুব ভাল জমে। দেখছ না বম্বের যত বড় বড় ফিল্মস্টারেরা নিজেরা বসে গিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়েই ছবি করছে। শুধু করছে যে তা নয়, দমাদ্দম হিটও করছে সেই সব ছবি। ভাল ছবি করতে গেলে তোমার আমার মতন সুন্দর মুখের ছেলেমেয়েও যেমন দরকার, তেমনি দরকার ভাল লোকেশানের। স্টুডিয়োর অন্ধকার ঘরে নয়, আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ চাই ভাল ছবির জন্য। বাংলা ছবি মার খাচ্ছে শুধু সু-রুচির অভাবে। এক ঘেয়ে প্যানপ্যানানি গান, বম্বের অনুকরণে বোকা বোকা নাচ, অনভ্যস্ত হাতের ঢিসুম ঢিসুম, আর লোকেশান? দিঘা আর পুরী ছাড়া কোনও স্পটই খুঁজে পায় না ওরা। দু'-একজন অবশ্য ভুল করে দার্জিলিং-এ গিয়ে পড়ে।

সৌরভ বলল, তুমি তা হলে সিনেমা দেখ বুঝি খুব?

ইদানীং বাংলা ছবি বাদ দিয়ে সব ছবিই দেখি।

তোমার মতে শ্রেষ্ঠ ছবি কোনটি?

আমার মতের সঙ্গে কারওর মত মেলে না। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলব এ পর্যন্ত ভারতীয় ভাষায় যত ছবি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি হচ্ছে তেলেগু ভাষার একটি ছবি।

সেই ছবির নামটা জানতে পারি কী।

শঙ্করভরণম্। পরে অবশ্য ওই ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে হিন্দিতে আর একটি ছবি হয়েছিল। তার নায়কের ভূমিকায় ছিলেন গিরিশ কারনাড। কিন্তু ছবি বিশ্বাসের কাবুলিওলার পর বলরাজ সাহানির কাবুলিওয়ালাকে যেমন মেনে নেওয়া যায়নি, এ-ও ঠিক তেমনি ব্যাপার হয়েছিল।

সৌরভ অবাক হয়ে বলল, তুমি তো অনেক খবরই রাখ দেখছি। এত খবর কিন্তু আমি রাখি না।

এমন সময় পেছনদিক থেকে কে যেন কাঁই কাঁই করে বলে উঠল, বাট মঝিরে

ছিড়া হইছ কাঁহিকি? সাড়কু যাই কথা কহু না।

খেয়ালি বিরক্তির সুরে বলল, আ মর। মুখের ছিরি দেখ। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব এখুনি।

আর যায় কোথায়? উৎকলমণি তো রেগে লম্ফঝম্প শুরু করে দিল সেখানে, তু কিস কহুচু? তু মতে জুতা মারিবু? তোর এত্ত সাহসঅ? হউ মু ভি ছাড়িবি নাই।

কী কেলেঙ্কারি। মারামারি লাগে বুঝি।

ততক্ষণে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, কী ব্যাপার! ব্যাপারটা কী? কঁহনঅ হেলা?

সৌরভ ওদের অবস্থার কথাটা বুঝিয়ে বলে শান্ত করল সকলকে। তারপর লোকটির কাছে ক্ষমা চাইলে সেও সরে গেল।

সৌরভ বলল, আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী।

তুমি আবার লোকটাকে অত তেলমাখানো কথা বলতে গেলে কেন?

বাঃ রে। ওদেরই দেশে এসে ওদেরকে এইভাবে জুতো মারব বলতে আছে?

না বলবে না। ধরে গাঁট্টা মারলেও রাগ যায় না। বলেই বলল, যাই হোক গে, এবার একটু ফায়ার ব্রিগেডের দিকে যাবে কী?

ফায়ার ব্রিগেড!

হ্যাঁ। আমার পেটে আগুন লেগেছে। সেটাকে নেভাতে হবে। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। ওই সামনেই একটা খাবারের দোকান দেখছি, চলো গিয়ে ঢোকা যাক।

ওরা পায়ে পায়ে দোকানের দিকেই এগিয়ে চলল। সৌরভ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সকাল তখন সাতটা। সূর্যের সোনালি রোদ তখন সোনার মতো গলে গলে লুটিয়ে পড়েছে শহরময়।

পাঁচ

খাবারের দোকানের যিনি মালিক তিনি বেশ সদাহাস্যময় লোক। ওরা যেতেই নিজে এগিয়ে এসে ভাল একটা চেয়ার-টেবিল দেখিয়ে বসালেন দু'জনকে। খেয়ালি দোকানের কলে চোখেমুখে জল দিয়ে এসে সৌরভের মুখোমুখি বসল।

খেয়ালি বলল, তোমার টাকা আছে? না আমি বের করব?

তোমার আছে?

উইদাউট মাল্লু খেয়ালি মুখার্জি রাস্তায় বের হয় না।

কত টাকা আছে তোমার?

দু'হাজার টাকা আছে।

এত টাকা কোথায় পেলে তুমি?

চুরি করেছি। তবে প্রতিবেশীর টাকা নয়। বাবার টাকাই চুরি করেছি।

তুমি দেখছি সব দিকেই এক্সপার্ট!

তুমিও বা কী কম যাও বাছাধন? দিব্যি তো বাপের সুপুত্তুরটি হয়ে বার্থে উঠে শুয়েছিলে। বলি আমার মতন পালিয়ে টালিয়ে আসছ না তো?

তা হলে কি আমার কাছে টিকিট থাকত?

দোকানের একজন কর্মচারী এলে সৌরভ তাকে গরম গরম কচুরি আর দুটো করে রাজভোগের অর্ডার দিল।

খেয়ালি বলল, এখন মন দিয়ে শোনো যা বলি। আমার বহুদিনের স্বপ্ন সিনেমায় আমি নামব। তেলেগু ভাষাটা জানি না, না হলে ওই ছবিতে নেমে দেখিয়ে দিতাম অভিনয় কাকে বলে। বম্বে তো অনেকদূর। তা ছাড়া হিন্দি ছবিতে কমপিটিশনও খুব। না হলে হিন্দিতে চান্স পেলে জয়াপ্রদা আর শ্রীদেবীর হাতে হাত আমি মেলাতামই।

তা যখন হচ্ছে না, তখন কী করবে ঠিক করলে?

সেইজন্যেই তো বেছে বেছে তোমাকেই গুরু করেছি ব্রাদার। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি বম্বে কেন, গোয়াতেও যেতে রাজি আছি। যাবে? এখানে বেশটি করে পেট ঠুসে জলখাবার খেয়ে চলো আমরা বম্বের গাড়িতে চেপে বসি। রিজার্ভেশনের দরকার নেই, দু'জনে লেডিজ কম্পার্টমেন্টে ঢুকে বসে থাকব।

তারপর চেকার এসে যখন আমাকে ধরবে?

লেডিজ কম্পার্টমেন্টে চেকার খুব কম ওঠে। উঠলেও তুমি একটা বাঙ্কে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবে। তা ছাড়া চেকাররা তোমার আমার মতন ছেলেমেয়েদের কিছু বলে না। ধরলে ধাড়িগুলোকেই ধরে।

সৌরভ বলল, তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়। তবে কিনা এটা বম্বের লাইন নয়, আর আমারও সিনেমায় নামার ইচ্ছে নেই।

তুমি একটা ওয়ার্থলেশ। তা এই লাইনে কোথায় যাওয়া যায়?

মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর। কাছাকাছির মধ্যে বিশাখাপত্তনম, হায়দ্রাবাদ।

তাই চলো। ওইখানকার স্টুডিয়ো পাড়ায় ঘুরে তেলেগু ফিল্মেই একটু চান্স নিই চলো। ওখানে নিশ্চয়ই সিনেমায় নামার জন্য বম্বের মতো অত খেয়োখেয়ি হবে না।

সৌরভ খাবার খেয়ে, জল খেয়ে বলল, আমি তো বললাম, সিনেমায় নামা টামার ব্যাপারে আমি নেই।

দোকানদার এতক্ষণ দূরে বসে ওদের কথাবার্তা সব শুনছিলেন। এবার ইশারায় সৌরভকে ডেকে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, মেয়েটি তোমার কে হয়?

সৌরভ চাপা গলায় বলল, আমাদের কথাবার্তা কি আপনি শুনেছেন?

সব শুনেছি।

তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে মেয়েটি। ট্রেনেই আলাপ। সেই থেকে সঙ্গ ছাড়ছে না।

দেখে কিন্তু বেশ ভালঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। তা কোথায় যাবে তোমরা?

আসলে আমি এসেছি কেওনঝোড় যাব বলে। ওখানে একটু পাহাড়-পর্বত দেখব, ঘুরব। শুনেছি ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি চমৎকার।

কোথায় উঠবে ওখানে?

আমার বাবার মামারবাড়ি ওখানে। তাঁরা এখন কেউ নেই। তবে বাবার এক বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়িতেই উঠব। না হলে লজ তো আছেই।

তোমার বাবার বন্ধু? কী নাম বলো তো?

পুরো নাম তো জানি না। আমি তাঁকে অরবিন্দকাকু বলি।

তোমার বাবার নাম কী? তুমি ব্রিগেডিয়ার ভার্গবের ছেলে?

সৌরভ চমকে উঠল। বলল, আপনি কী করে চিনলেন বাবাকে?

আরে আমার বাড়িও যে কেওনঝোড়ে। যেই বলেছ তোমার বাবার মামারবাড়ি ছিল ওখানে, আর অরবিন্দর নাম করেছ, তখনই বুঝেছি তুমি ভার্গবের ছেলে ছাড়া কেউ নও। অরবিন্দ, আমি, তোমার বাবা, সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। আমার নাম শৈলজা।

সৌরভ তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বলল, আরে! আপনার নামও তো বাবার মুখে অনেক শুনেছি।

দেখ কারবার। তা তোমার বাবা আছেন কেমন?

ভালই আছেন। এখন বলুন আমাদের বিল কত হল?

তুমি ভার্গবের ছেলে, আমার দোকানে খাবার খেয়ে দাম দেবে তুমি? সাহস তো কম নয়। তা শোনো, ওই মেয়েটির দেখছি সিনেমায় নামার খুব শখ। আজ একটা ওড়িয়া ছবির শুটিং হচ্ছে বৈতরণীর ওপারে ছোট্ট একটি দ্বীপে, বরাহনাথ মন্দিরের কাছে। ওকে বরং সেখানেই নিয়ে যাও। অমনি বিরজাদেবীর মন্দিরে গিয়ে একটা প্রণামও করে এসো। এখুনি তোমাদের যাবার তাড়া নেই তো। যাও, চলে যাও।

সৌরভ বলল, বিরজামন্দির কোথায়?

যাজপুরে গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দেখিয়ে দেবে।

এটা তা হলে কী? এইটাই তো যাজপুর।

এটা হচ্ছে যাজপুর কেওনঝোড় রোড। যাজপুর শহর এখান থেকে সাতাশ কিমি দূরে। ঘন ঘন ট্রেকার যাচ্ছে। যে কোনও একটাতে চেপে চলে যাও, চমৎকার বেড়ানো হবে। তারপর ফিরে এসে এখানেই যে কোনও হোটেলে খেয়েদেয়ে কেওনঝোড়ের বাসে চেপে বসো। সন্ধের আগেই পৌঁছে যাবে।

দোকানদারকে অভিনন্দন জানিয়ে ওরা দু'জনে রাজপথে এসে দাঁড়াল।

খেয়ালি বলল, দেখলে তো আমি কীরকম লাকি। খাবার খেলুম অথচ এক পয়সাও খরচা করতে হল না। আসলে ওই যে বলেছি সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

এটা সুন্দর মুখের জন্য নয় ম্যাডাম। উনি আমার বাবার বন্ধু তাই।

ছাড় তো ব্রাদার। আমাদের দু'জনকে প্যাঁচাপেঁচির মতন দেখতে হলে কোনও বন্ধুই দরদ দেখাত না। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করত।

ওরা যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে তখন ট্রেকারগুলো একটানা এবং একঘেয়ে সুরে 'যাজপুর যাজপুর' করে মুখের ফ্যানা বের করে ফেলছে।

সৌরভ ও খেয়ালি তারই একটিতে উঠে বসল।

কয়েকজন বাঙালি তীর্থযাত্রীও সেই ট্রেকারে ছিলেন। তাঁরাও যাচ্ছেন যাজপুর। বিরজামন্দিরে পুজো দিতে।

সৌরভ জিজ্ঞেস করল, আপনারা যে পুজো দিতে যাচ্ছেন ওই মন্দির কি খুবই প্রাচীন? পুজো দিয়েই ফিরে আসবেন, না থেকে যাবেন ওখানে? সঙ্গে অনেক মালপত্তর দেখছি।

যাত্রীদের মধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা ছিলেন। উনি বললেন, তোমরা এই প্রথম আসছ বুঝি?

হ্যাঁ।

তা হলে শোনো, কাশীর যেমন অন্নপূর্ণা, কালীঘাটের যেমন কালী, যাজপুরের এই বিরজাও তেমনি প্রসিদ্ধ। একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম পীঠ এটি। বিরজাক্ষেত্র। বিরজা ঔড্রদেশে চ...। সেই বিরজা। দেবীর দুটো হাত এবং সিংহবাহিনী। বহু আগে যযাতি রাজার রাজত্ব ছিল এখানে। তাই যযাতিপুর থেকেই যাজপুর নাম হয়েছে। বৈতরণীর তীরে এক সুপ্রাচীন জনপদ এই যাজপুর।

সৌরভ বলল, ও। আমরা কিন্তু জানতাম না।

তোমাদের সঙ্গে কেউ নেই?

না। আমরা দু'জন। কেওনঝোড়ে যাচ্ছিলাম এক আত্মীয়ের বাড়ি। এখানে যাজপুর স্টেশনে আমাদের পরিচিত একজন বলে দিলেন এই মন্দিরে এসে বিগ্রহদর্শন করে যেতে।

বেশ করেছ বাবা। খুব ভাল কাজ করেছ। মা ভীষণ জাগ্রতা। তোমাদের মঙ্গল করবেন।

খেয়ালি বলল, আচ্ছা মাসিমা, বৈতরণী ওখান থেকে কতদূরে?

দূর আছে। আমরা যেখানে ট্রেকার থেকে নামব সেখান থেকে দুটো পথ দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে বিরজা মন্দিরের দিকে, আর একটা বৈতরণীতে। সেখানে অখণ্ডলেশ্বর, অঙ্গেশ্বর শিব আছে। অনেক শিবেরেই মন্দির আছে শহরময়। বহু পুরনো আমলের মন্দির। বৈতরণীর তীরে আছে বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দির। ওই বৈতরণীর তীরেই যযাতি রাজা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ওখানকার ত্রিলোচনেশ্বর শিবের মন্দিরও বিখ্যাত। অখণ্ডলেশ্বর মন্দিরের গায়ে দেখবে কী সুন্দর জৈন তীর্থংকর আদিনাথের মূর্তি খোদাই করা আছে। তা ছাড়াও দেখবে কালীমন্দির, গণপতি মন্দির। অষ্টমাতৃকা মন্দিরের মূর্তিগুলিও দেখবার। সঙ্গে তোমাদের মা থাকলে খুব ভাল হত। মা এলেন না কেন?

আসলে আমার মা সচরাচর বাইরে কোথাও বেরোতে চান না।

কেওনঝোড়ে কে আছেন তোমাদের?

আমার বাবার বন্ধু ওখানে থাকেন। উনি প্রায়ই যেতে বলেন, কিন্তু যাওয়া আর হয় না। তাই এবারে যাব মন করেই বেরিয়ে পড়েছি।

বেশ করেছ। আমরা অবশ্য কখনও যাইনি কেওনঝোড়ে। তবে শুনেছি খুব নাকি ভাল জায়গা। অনেক পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে। সেইসব পাহাড়ে-জঙ্গলে নাকি ময়ূর আছে খুব।

সৌরভ বলল, জানি না। আমরা তো প্রথম যাচ্ছি। তবে বাবার মুখে শুনেছি এককালে নাকি ময়ূর ছিল খুব।

সেইজন্যেই বুঝি ময়ূরভঞ্জ?

হবে। ঠিক জানি না আমরা।

তোমরা কোন গাড়িতে এলে?

আমরা এসেছি হাওড়া থেকে তিরুপতি এক্সপ্রেসে। আপনারা?

আমরা কাল সন্ধেবেলা ইস্ট কোস্টে এসেছি। রাত্রে একটা লজে ছিলাম। আজ পুজো দিতে যাচ্ছি। ওখানে ট্রাস্টির পান্থশালা আছে। সেখানে দু'দিন থেকে, তারপর আবার কলকাতায় ফিরে যাব।

ট্রেকার একসময় যাজপুর শহরে পৌঁছল। স্টেশন থেকে এই বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ভাড়া ছ'টাকা। ওদের ভাড়া ভদ্রমহিলাই তাঁর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

খেয়ালি একচোখ টিপল সৌরভকে। তারপর চাপা গলায় বলল, দেখলে তো, কী বলেছিলাম? সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

সেই ভদ্রমহিলা তাঁর পরিবারের লোকেদের নিয়ে একটা জিপ ভাড়া করে পান্থনিবাসের দিকে চলে গেলেন। ওরা দু'জনে গল্প করতে করতে বৈতরণীর দিকে চলল।

সৌরভ বলল, ওখানে একটা দ্বীপের মধ্যে ওড়িয়া ছবির শুটিং হচ্ছে জান তো?

বেল পাকলে কাকের কী?

এইবার দেখা যাবে সুন্দর মুখের জয়টা কীরকম হয়। আমি তো সোজা গিয়ে তাদের পরিচালককে বলব তোমাকে একটা চান্স পাইয়ে দেবার জন্য।

সৌরভের কথা শুনে লাফিয়ে উঠল খেয়ালি, রক্ষে করো বাবা। ওই 'ঠাকুর দরশন পাইব কাঁই' ছবিটবির মধ্যে আমি নাই। হিন্দি অথবা তেলেগু ছবি ছাড়া নামবই না আমি।

তারপর হঠাৎ কী ভেবে যেন লাফিয়ে উঠল খেয়ালি। বলল, দেখ, হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। ধরো কেউ যদি কোনও ছবিতে আমাদের চান্স না দেয়...।

এর মধ্যে আবার আমাদের আসছে কোত্থেকে?

আমি একটা কথার কথা বলছি। ধরো কেউ যদি চান্স না দেয় তা হলে আমরা নিজেরাও তো নিজেদের মনের মতো করে সুন্দর একটা ছবি করতে পারি। তা হলে ভাল ছবির নায়ক-নায়িকা হওয়ার জন্য আমাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না।

সেটা কীভাবে হবে?

কথা বলতে বলতে ওরা বৈতরণীর ঘাটে চলে এল। নির্জন নদীতীর। দু'-একজন স্থানীয় লোক ছাড়া কোনও যাত্রী নেই। সেই ঘাটে এসে দু'জনে পাশাপাশি বসে চারদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখতে লাগল।

খেয়ালি বলল, এবারে মন দিয়ে শোনো, আমি কী বলতে চাই। আমাদের ছবির গল্প আমরাই তৈরি করে নেব। সাসপেন্স থাকবে, টিসুম টুসুম থাকবে, পাণ্ডব গোয়েন্দার পঞ্চুর মতো একটা কুকুর থাকবে। আর থাকবে এক অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ। পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে ঝর ঝর করে ঝরনার ধারা গড়িয়ে পড়বে। ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা পাতার ঘরে শুধু তুমি আর আমি থাকব। আমাদের বন্ধু কুকুরটা হবে বডিগার্ড। তুমি বনের ভেতর থেকে হরিণ অথবা ময়ূর অথবা যে কোনও পাখিটাখি শিকার করে আনবে, আর আমি রান্না চড়িয়ে অথবা সেইসবের মাংস আগুনে ঝলসে তোমাকে খেতে দেব। সে যা ছবি হবে না, ভাবতেও পারবে না। তোমার-আমার জুটি এমনটি হবে কোথায়? সেই ছবি দেখে তাক লেগে যাবে সকলের। সবাই আমাদের নিয়ে হই হই করবে।

আর যদি তুমি আর একটু বড় হয়ে আমাকে—। থাক ওসব চিন্তা পরে করব। এখন রাজি কি না বলো।

আগে বলো সেটা সম্ভব হবে কী করে?

হাঃ হাঃ। আমার প্রস্তাবটা মন দিয়ে শুনলে তুমি আমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারবে না। আজকাল বিয়েবাড়ি, পইতেবাড়ি, জন্মদিনে ভিডিয়োতে ছবি তোলা হয় দেখেছ? দেড় দু'হাজার টাকা খরচা করলেই তো কেল্লা ফতে। তা আমরা যদি আমাদের দু'জনের টাকা দিয়ে যৌথভাবে ওইরকম একটা ছবি করি, তা হলে কেমন হয়? এখন আমরা লোকেশানটা দেখে যাই, পরে টাকা-পয়সা জোগাড় করে ভিডিয়ো নিয়ে চলে আসব এখানে। এই বৈতরণী নদীটা কিন্তু থাকবে।

খেয়ালির প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না সৌরভের। বলল, আরে! তুমি বেশ বলেছ তো? তোমাকে এতক্ষণ ধরে আমি একটা খামখেয়ালি মেয়ে ভাবছিলাম। কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি তা নও। তুমি অনেক গভীরে অনেক কিছু চিন্তা করো। অথচ ছেলেমানুষ তুমি।

তুমিই বুঝি বুড়ো ধাড়ি? তুমিও তো ছেলেমানুষ।

সৌরভ এবার খুব আদর করে ডাকল, খেয়ালি!

বলো।

তুমি ভারী মিষ্টি। আমার দিকে খুব ভাল করে একবার তাকাও তো দেখি। সত্যি বলতে কী, তোমার মুখটা এতক্ষণ আমি ভাল করে দেখিওনি।

খেয়ালি ওর মুখের দিকে ডাগর দুটি চোখ মেলে দিয়ে বলল, নাও দেখো। ভাল করে দেখো। দুষ্টু কোথাকার।

সৌরভ ওকে বেশটি করে খুঁটিয়ে দেখে বলল, নাঃ। সত্যিই তোমাকে দেখতে ভাল। কোথাও কোনও খুঁত নেই। তোমার সবচেয়ে বড় গুণ তোমার এই শিল্পচেতনা। তুমি নির্ঘাত বড় হয়ে একজন সত্যিকারের শিল্পী মেয়ে হবে। তোমার এই ভিডিয়ো নাটকের ব্যাপারে আমি কিন্তু এককথায় রাজি।

খেয়ালি আনন্দের উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরল সৌরভকে। বলল, আর দ্বিমত হবে না তো?

না। তা হলে শোনো, আমি এখানে কী জন্য এসেছি। আমার বাবা ব্রিগেডিয়ার ভার্গব। তিনি কেওনঝোড়ের অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চান। আমিও চাই কলকাতার বাইরে থেকে জীবনটাকে উপভোগ করতে। দুটো জমি দেখা হয়েছে আমাদের। পছন্দ হলে দুটোই আমরা কিনব। একটা শহরের মাঝখানে। সেখানে বাড়ি করে থাকব আমরা। আর একটা পাহাড়ের কোলে অরণ্যের হৃদয়ের কাছে। সেখানে একটা

পাতার ঘর করে উইক এন্ড করব আমরা। তা এখন ভাবছি সেই ঘরই হবে তোমার-আমার এই স্বপ্নের ঘর। সব ঠিকঠাক করে, সুন্দর একটা গল্প ফেঁদে দারুণ একটা ভিডিয়োর ছবি তৈরি করে ফেলব আমরা। যে ছবিতে থাকব শুধু তুমি আর আমি। আর থাকবে, বনের হরিণ, ময়ূর, পাখপাখালি আর প্রকৃতির ভুবন ভোলানো রূপ। ঝরনা, জলপ্রপাত ইত্যাদি।

খেয়ালি লাফিয়ে উঠল, হাউ ফ্যানটাস্টিক। চলো, আর এখানে সময় নষ্ট না করে আমরা কেওনঝোড়েই চলে যাই।

সৌরভ বলল, সে কী! ওই দেখো, নদীর ওপারে কী সুন্দর সব দৃশ্য! ওটা বৈতরণীর একটা দ্বীপ। ওই দ্বীপে এখন শুটিং চলছে। বরাহনাথের মন্দিরও দেখা যাচ্ছে। আমরা ওখানে যাই চলো। মনে হচ্ছে খুব নির্জন সুন্দর জায়গাটা। আমাদের ভিডিয়ো ক্যামেরায় ওই দ্বীপও আসতে পারে। বিশেষ করে ওইসব প্রাচীন মন্দিরগুলোকে ছবির দৃশ্যে ধরে রাখা একান্তই দরকার।

যা তুমি বলবে।

ওরা বৈতরণীর বাঁধের ওপর দিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে খেয়াঘাটের দিকে এগিয়ে চলল। খেয়াঘাটে খেয়াতরী যা আছে, তাতে চেপে নদী পার হতে সত্যিই ভয় হয়। অনেকটা নৌকা বাইচ-এর সেই লম্বাটে ডোঙার মতন নৌকো। অনবরত টলমল করছে। একটু এদিক ওদিক হলেই উলটে যাবে বুঝি। যাই হোক ওরা তাতেই খেয়া পার হয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছল।

ছয়

ওপারটা কী ভীষণ নির্জন!

ওরা হেঁটে বরাহনাথের মন্দিরের দিকে চলল। তারপর মন্দির দেখে একটু এদিক সেদিকে যখন ঘোরাফেরা করছে, তখনই এক জায়গায় গিয়ে দেখতে পেল একটি ছবির শুটিং-এর জন্য তোড়জোড় চলছে। ছবির নাম কালিয়া। ওড়িয়া ছবি। ওড়িয়াতে কালিয়া বলা হয় প্রভু শ্রীজগন্নাথকে। হয়তো কোনও পৌরাণিক ছবি। কয়েকজন ফুটফুটে মেয়েকে দেবদাসী সাজিয়ে নাচানো হচ্ছে। কী তাদের সাজপোশাক। দেখলে লোভ হয়।

সৌরভ বলল, কী। তুমিও ওদের মতো নাচবে নাকি?

খেয়ালি বলল, আমি যে ও নাচ জানি না।

নাচ না জানলে বোম্বাই ছবিতে নাচবে কী করে?

খেয়ালি চুপ করে রইল। পরে বলল, এরা কি আমাকে এদের ছবিতে নেবে?

আমি কি কথা বলে দেখব?

খেয়ালি বলল, বলে দেখতে পারো। তবে কিনা কোনও লাভ নেই। এ ছবি রিলিজ করলেও আমি জানতে পারব না।

তবু একটু বলেই দেখি না। এই বলে সৌরভ এগিয়ে গেল কর্মকর্তাদের দিকে। তারপর এই ছবির যিনি পরিচালক তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবটা রাখতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে না করে দিলেন।

খেয়ালি তখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ কী ভেবে যেন খেয়ালির দিকে তাকিয়ে বললেন, এর হবে। হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমাদের এই ছবির আজকের দৃশ্যে তো নেওয়া যাবে না। কেন না খুবই ছেলেমানুষ। বলে পকেট থেকে একটি কার্ড বের করে বললেন, এতেই আমাদের ঠিকানা পত্তর সব দেওয়া আছে। কাল সকালে ভুবনেশ্বরে এই ঠিকানায় যেন দেখা করে। ওকে আমরা চান্স একটা দেবই।

খেয়ালি কার্ডটা হাত পেতে নিল বটে, তবে ওর মুখে খুব একটা আশার আলো ফুটল না।

সৌরভ বলল, তবে আর কী? তুমি তো জিতেই গেলে। আর তোমাকে পায় কে?

খেয়ালি মৃদু হেসে টান দিল সৌরভকে। তারপর খানিকটা এসে বলল, শোনো, এদের প্রস্তাবটা আমি মেনে নিচ্ছি না।

সৌরভ বলল, প্রস্তাব তো ওদের না, আমাদের।

তা হোক। তবু ভুবনেশ্বরে আমি যাচ্ছি না।

কেন যাচ্ছ না?

ওখানে গেলে তো আমাকে একা যেতে হবে। এখন আমরা যাজপুর যাব। সেখান থেকে তুমি চলে যাবে কেওনঝোড়। আমি একা কী ভাবে যাব?

কেন? ওখান থেকেই তো ভুবনেশ্বরের বাস পেয়ে যাবে।

তা যাব। কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকব কোথায়? শুনেছি ওখানকার হোটেল চার্জ অনেক বেশি।

একদিনের তো মামলা। ওঁদের সঙ্গে দেখা করে ওঁদের ছবিতে ভিড়ে গেলে কোনও প্রবলেমই থাকবে না আর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি চান্স না দেয়।

দেবেই। একান্ত না দিলে তুমি কেওনঝোড়ে চলে আসবে। আমি এখন কয়েকটা দিন ওখানে থাকব। গেলেই দেখা পেয়ে যাবে আমার।

ওরা কথা বলতে বলতে নদীর ঘাটে এল। তারপর একইভাবে নৌকোয় চেপে নদী পার হল।

কী ভাল যে লাগল নদী পার হতে। ঠিক যেন স্বপ্নের নদী।

ওপারে গিয়ে দু'জনেই একটু করে বৈতরণীর জল মাথায় ছেটাল প্রথমে। তারপরে ডাঙায় উঠে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল।

খেয়ালি বলল, দেখো সৌরভ, আমি যখন রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তখন আমার মনের অবস্থা একরকম ছিল, এখন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেছে। এখন কোনও কিছুর মোহেই তোমার মতন বন্ধুকে আমি হাতছাড়া করতে পারব না।

তা হলে তো সিনেমায় নামাও হবে না তোমার।

না হোক, তাতে ক্ষতি নেই। তা ছাড়া এইসব ছবির ব্যাপারে উৎসাহও নেই আমার। তার চেয়ে আমরা দু'জনে মনে মনে যেরকম পরিকল্পনা করেছি, সেইরকম হওয়াই ভাল। হাজার পাঁচেক টাকা হলেই হয়ে যাবে। আমরাই আমাদের মনের মতন ছবি করতে পারব।

পাঁচ হাজার লাগবে কীসে?

বাঃ রে। দেড়-দু'হাজার টাকা তো ভিডিয়োওয়ালারাই নেবে। এরপর তাদের গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসা, পৌঁছে দেওয়া এসব বুঝি করতে হবে না? এসবের টাকা কোথা থেকে আসবে?

সত্যিই তো। একথা আমি তো একবারও ভাবিনি।

তাই বলি কী, আর দেরি না করে আমরা যা মন করেছি তাই করিগে চলো।

এই পাঁচ হাজারটা কোথা থেকে আসবে তা হলে?

ফিফটি ফিফটি। আমার কাছে তো দু' হাজার আছেই, বাকিটা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নেব। তুমিও তোমার বাবার কাছ থেকে ম্যানেজ করবে হাফ টাকা, পারবে না?

তুমি যখন বাড়ি থেকে চলেই এসেছ, তখন বাবাকে তুমি পাচ্ছ কোথায়?

আরে আমি কী বরাবরের জন্য এসেছি? রাগ পড়লেই আবার চলে যাব।

তোমার বাড়ি কোথায়?

কৈলাস বোস স্ট্রিটে।

তার মানে কলকাতায়।

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইভাবে কথা বলতে বলতে আসছে সেইসময় হঠাৎ একটি ছেলে বেপরোয়ার মতো স্কুটার চালিয়ে ওদের দিকে এল। এমনভাবে এল যে, আর একটু হলেই ধাক্কা লাগত ওদের।

খেয়ালি বোধহয় একটু রাগি প্রকৃতির মেয়ে। তাই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, জাস্ট লাইক এ মাংকি।

আর যায় কোথা। ঘুরে তাকাল ছেলেটি।

তারপর স্কুটার নিয়ে সবেগে ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল।

সৌরভ আর খেয়ালি দু'জনেই তখন ভয় পেয়ে গেছে। অচেনা জায়গায়, অচেনা পরিবেশে এ কী বিপদ!

ছেলেটি ওদের চেয়ে বয়সেও অনেক বড়। তাকে যুবক বলা উচিত। চেহারা দেখে মনে হয় অত্যন্ত রাফ টাইপের। অর্থাৎ সোজা বাংলায় যাকে বাজে প্রকৃতির বলা হয় তাই।

যুবক স্কুটার থেকে নেমে এসে বলল, কী বললে খুকুমণি?

খেয়ালি বলল, যা বলেছি ঠিকই বলেছি।

আমি মাংকি? তুমি কি নিজেকে ডাকের সুন্দরী মনে করো? এখুনি তোমার ফেস কাটিং আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি। বলে কোমরের বেল্ট খুলে খেয়ালির মুখে, যেই না মারতে যাবে সৌরভ অমনি সজোরে একটা ধাক্কা দিল তাকে।

যুবক সেই ধাক্কা সামলাতে না-পেরে বাঁধের ওপর থেকে গড়িয়ে একেবারে বৈতরণীর জলে।

চারদিক থেকে অনেক লোকজন তখন হই হই করে ছুটে এসেছে।

খেয়ালি বলল, সর্বনাশ! এ কী করলে তুমি? এখন যদি উঠে এসে তোমাকে মারে?

না হলে ও যে তোমাকে মারত। আর ওই মোটা বেল্টের আঘাত তুমি কি সহ্য করতে পারতে? তা ছাড়া মারলে ও তোমার মুখেই মারত।

জলে পড়া যুবক তখন সমানে চেঁচাচ্ছে, ওদের দু'জনকেই ধরে রাখ জয়। ওদের আমি ছাড়ব না।

কে জয় তা কে জানে?

অপর এক যুবক তখন ছুটে আসছে ওদের দিকে।

খেয়ালি বলল, সৌরভ পালাও। আমার যা হয় হোক। তুমি অন্তত বাঁচো।

সৌরভ খেয়ালির একটা হাত ধরে টান দিয়েই তিরবেগে ছোটা শুরু করল।

ওদের পেছনে তখন ধর ধর রবে ছুটে আসছে অনেকেই।

ব্যাপারটা এমনই হয়ে গেল যেন ওরাই দোষী, তাই ওদের ধরবার জন্য তেড়ে আসছে লোকগুলো।

সৌরভ বলল, আর বোধহয় বাঁচলাম না। এবার ধরা পড়লাম বলে।

খেয়ালি বলল, এত সোজা নাকি? সামনের ওই চায়ের দোকানের পাশে একটা সাইকেল রাখা আছে সেটা যারই হোক নিয়ে পালিয়ে এখনকার মতো বাঁচতে হবে। তুমি সাইকেল চালাতে পার তো?

পারি।

ওরা কথা বলতে বলতেই আচমকা সাইকেলটা টেনে নিয়েই চেপে বসল

তাতে। খেয়ালিকে সামনের রডে বসিয়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল দু'জনে। তারপর বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে সাইকেলটাকে এক জায়গায় রেখে একটা অটো দেখতে পেয়ে উঠে পড়ল তাতেই।

অটো চালক জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে তোমরা?

আপাতত বিরজা মন্দিরে। খুব তাড়াতাড়ি যাবেন কিন্তু।

অটো জোরেই চলতে লাগল।

চালক বলল, তোমরা এমন হাঁফাচ্ছ কেন ভাই? কী হয়েছে তোমাদের?

সৌরভ বলল, আমরা বৈতরণীর ওপারে বরাহনাথের মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। মন্দির দেখে ফেরবার সময় একজন বদ লোকের পাল্লায় পড়ে যাই। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই এইভাবে ছুটে এসেছি।

তার কি চাপদাড়ি? স্কুটার ছিল সঙ্গে?

হ্যাঁ। সে একা নয়। মনে হয় দলবলও ছিল তার।

বুঝেছি, তোমরা মেনোগুন্ডার হাতে পড়েছিলে।

মেনোগুন্ডা! চেহারা কিন্তু খুব একটা সাংঘাতিক নয় তো?

গুন্ডামি করতে গেলে কি চেহারার দরকার হয়? দুর্দান্ত সাহস থাকলেই যথেষ্ট।

খেয়ালি বলল, তবে একেবারে দুর্বলও নয়। আমরা ওর কাছে নেহাতই শিশু।

বাপের অফুরন্ত টাকা। দু'-তিনটে কোল্ড স্টোরেজের মালিক। কটকে, ভুবনেশ্বরে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে মোটা টাকা আয় করে ওর বাবা। তা ছাড়া আরও অনেক রকমের ধান্দাবাজি করে। ওর বাবার নাম শ্যাম বিশোয়াল। বিশাল ব্যাপার ওদের। কিন্তু ছেলেটা একেবারেই যা তা। ওর খপ্পর থেকে বেঁচেছ এই ঢের।

সৌরভ বলল, বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না, তবু বেঁচেছি।

এই এলাকার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত এখনও কিন্তু জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না।

খেয়ালি বলল, কী নাম যেন বললেন ওর? মেনোগুন্ডা? খুব অত্যাচার করে বুঝি?

করে মানে? তোমাদের বয়সি মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না ওর জন্যে।

সে কী! প্রতিবাদ করে না কেউ?

কে করবে? তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমরা বাঙালি। কলকাতার ছেলেমেয়ে। তোমাদের ওখানে কেউ প্রতিবাদ করে? আসলে যুগটা এখন এমনই, প্রতিবাদ করার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে লোকে। বলেই একবার পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখে বলল, তোমরা কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকা।

মনে হয় মেনোগুন্ডা তোমাদের পিছু ছাড়েনি।

খেয়ালি বলল, ওরা কী করে জানবে আমরা এদিকে এসেছি?

সৌরভ বলল, হয়তো কেউ বলে দিয়েছে। আমরা যেখানে সাইকেল রেখে অটোয় উঠেছি, সেখানেই কেউ বলে দিয়েছে আমাদের কথা। তাই পিছু নিয়েছে আমাদের।

অটোচালক বলল, মেনোটা একা নয়। সঙ্গে জয়রামও আছে।

জয়রামটা কে?

সে আর এক ধান্দাবাজ। বুধিরাম পতির ছেলে।

খেয়ালি বলল, শনির সঙ্গে রাহুর মিলন।

ঠিক তাই।

মেনোগুন্ডার স্কুটার ঝড়ের গতিতে এসে ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎই ওদের দেখতে পেয়ে সজোরে ব্রেক কষল অটোর সামনে এসে। ওর স্কুটারের চাকা অটোর সামনের চাকায় এমন ধাক্কা মারল যে অটোর সমস্ত ঘড়-ঘড়ানি স্তব্ধ হয়ে গেল।

মেনো আর জয় দু'জনেই নেমে এল স্কুটার থেকে। ওদের দু'জনেরই চোখেমুখে শয়তানের হাসি।

মেনো বলল, পালিয়ে যাবি কোথায়?

অটোচালক বলল, এই সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর তোমাদের বীরত্বটা কী না দেখালেই নয়?

মেনো এক ধাক্কায় ফেলে দিল অটোচালককে। বলল, চোপ বে। একদম ফুটুর ফুটুর করবি না। এই বিচ্ছুদের চিনিস? অতলোকের সামনে আমার গায়ে হাত দেয়, আমার প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়েছে একেবারে।

জয় তখন শক্ত করে চেপে ধরেছে সৌরভকে।

আর মেনো একেবারে পাঁজাকোলা করে খেয়ালিকে তুলে নিয়ে বলল, জয় একটু দেখতরে এখানে রাস্তা তৈরির জন্যে যে গরম পিচের ড্রামটা ছিল সেটা কোন দিকে। ওকে আমি জানে মারব না, তবে গরম পিচে ওর মুখটা শুধু ডুবিয়ে দেব।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল অঘটন।

হঠাৎ একটা প্রাণান্তকর চিৎকার দিয়ে খেয়ালিকে নামিয়ে বসে পড়ল মেনো।

ওর একটা চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে। খেয়ালি বোধহয় তৈরিই ছিল। তাই কোন ফাঁকে যে ছুরিটা বের করে গুঁজে দিয়েছে ওর চোখে, তা কে জানে?

আর এই রকম যখন অবস্থা, তখন সৌরভও একটা চান্স নিতে ছাড়ল না।

জয়ের হাতটা এত জোরে কামড়ে দিল যে চিংড়ির মতন লাফাতে লাগল জয়।

এই সুযোগে তাকেও কবজা করবার জন্য তার চোখেমুখে একরাশ ধুলো ছুড়ে দিতেই ভুবন যেন অন্ধকার।

খেয়ালি তখন আর সেই শান্ত ধীর কিশোরীটি নেই। সেও যেন মত্ত মাতঙ্গিনী।

সে চকিতে মেনোর স্কুটারে চেপেই স্কুটারের মুখ ঘুরিয়ে সৌরভকে বলল, একটুও দেরি না করে বসে পড়ো। যত শিগগির সম্ভব আমাদের পালাতে হবে এখান থেকে।

হতচকিত অটোচালকের চোখের সামনে দিয়ে হাউই-এর মতো উড়ে গেল ওরা। যাবার সময় শুধু অটোচালককে হাত নেড়ে একটা মিষ্টি অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

সাত

পথ নির্জন। মনে লাগে ভয়। কী জানি কী হয়। তবু এক দুরন্ত গতিতে ছুটে যাওয়া।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। সরকারি পথনির্দেশ দেওয়াই আছে। একদিকের পথ চলে গেছে যাজপুর স্টেশন, একদিকের পথ কটক হয়ে বালাশোর। আর এক দিকের পথ গেছে কেওনঝোড় হয়ে রাউরকেলা।

রাউরকেলা ইস্পাতনগরী কতদূর? কে জানে তা?

সৌরভ বেশ শক্ত করে ধরেছিল খেয়ালিকে।

খেয়ালি বলল, ভাগ্যিস স্কুটার চালানোটা শিখেছিলাম। না হলে আজকের এই বিপদে কিছুতেই পার পেতাম না আমরা।

সৌরভ বলল, সত্যি, তোমাকে যত দেখছি ততই বিস্ময় লাগছে আমার।

কেন স্কুটার চালাচ্ছি বলে?

অবশ্যই। আমি সাইকেল ছাড়া কিছুই চালাতে পারি না।

আসলে আমার মামার স্কুটার আছে তো, তাই এটা শিখে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। আমি স্কুটার কেন, মারুতিও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

তুমি তো অসাধারণ।

কিছুই না। দু'দিন চেষ্টা করলে তুমিও পারবে।

ওরা স্কুটার থামিয়ে একবার একটু ভেবে নিল কোনদিকে যাবে।

সৌরভ বলল, কী ভাবছ?

ভাবছি এখন আমরা যাবটা কোথায়? যাজপুরেই ফিরে যাব? না সোজা চলে যাব কেওনঝোড়ে?

আমার মতে যাজপুরে যাওয়াই ভাল। ওখানে সেই খাবারের দোকানে ঢুকে শৈলজাবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে ওনার পরামর্শ নিয়েই যাওয়া উচিত।

আমার মনে হয় সেটা না করাই ভাল। বলেই হঠাৎ গতি বাড়িয়ে ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে চলল স্কুটারটাকে।

সৌরভ বলল, কী ব্যাপার! হঠাৎ এত জোরে এমন করে চালাচ্ছ যে? এখুনি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে। আমার খুব ভয় করছে। একটু আস্তে চালাও।

সম্ভব না। চেয়ে দ্যাখো পেছনে আমাদের কে আসছে।

তার মানে?

একদম কথা বোলো না। শক্ত করে আমাকে ধরে থাকো।

সৌরভ ভয়ে ভয়ে তাই করল।

খেয়ালি আরও জোরে, ঝড়ের চেয়েও দ্রুতগতিতে উড়িয়ে নিয়ে চলল স্কুটারটাকে।

সৌরভ বলল, কারা আসছে বললে?

যম।

সৌরভ ঘুরে তাকিয়েই দেখল প্রায় আট-দশটা স্কুটার ভীষণ গতিতে ছুটে আসছে ওদের দিকে। সর্বনাশ। ওরা নিশ্চয়ই মেনোগুন্ডার লোক। কোনওরকমে খবর পেয়ে পিছু নিয়েছে ওদের। এমনই ভীষণ গতি তাদের, যে ওদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় কিছুতেই পেরে উঠবে না ওরা।

যা ভাবল তাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে হাজির হল ওদের কাছে। সাংঘাতিক চেহারা ওদের। দেখলে যমের বুকও কেঁপে উঠে বুঝি। কিন্তু আশ্চর্য! ওরা ওদের কাছাকাছি এসেও ওদের আক্রমণ করল না, বরং আরও আরও গতি বাড়িয়ে ওদের ফেলে রেখেই চলে গেল।

খেয়ালি বলল, আঃ বাঁচা গেল।

সৌরভ বলল, মনে হয় ওরা ওদের দলের নয়।

এরা তা হলে কারা?

দুর্ধর্ষ কোনও ডাকাতের দল।

এইরকম চেহারার লোকেরাই ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে।

হয়তো তাই করতে যাচ্ছে কোথাও। কেন না যে অসম্ভব গতি ওদের তাতে সেইরকম মনে হয়। কিন্তু আমরা এদিকে কোথায় যাচ্ছি?

তা তো জানি না।

এখানে তো চারদিকেই পাহাড় দেখছি। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। তারই মাঝখান দিয়ে পিচঢালা পথ।

কী সুন্দর, তাই না? আমার এখুনি একটা পাহাড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে।

ওই— ওই দেখো একটা নদী কেমন এঁকে বেঁকে চলেছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। কত গাছপালা। এখানেও আমাদের ভিডিয়ো শুটিং লাগালে হয়।

কিন্তু এদিকে যে বিপদ আমাদের ঘনিয়ে আসছে।

কেন, কী হল আবার?

স্কুটার আর চালানো যাচ্ছে না।

সে কী! কী হল ওটার!

মনে হয়, যা তেল ছিল তা ফুরিয়ে গেছে।

সর্বনাশ! তা হলে কী হবে?

এক সময় সত্যি সত্যিই থেমে গেল স্কুটারটা। অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর চালানো গেল না।

ওরা দু'জনেই স্কুটার থেকে নেমে তখন পথের ধারে বসে হাঁপাতে লাগল।

কী যে করবে ওরা কিছুই ভেবে পেল না।

তবে বেশিক্ষণ নয় একটু পরেই ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল ওরা।

সৌরভ বলল, এবার তা হলে?

খেয়ালি বলল, চরৈবেতি।

তবে যাবার আগে স্কুটারটাকে পথের ধারে খাদের ভেতর নামিয়ে দিল। তারপর সামনের পথ ধরে নতুন উদ্যমে হেঁটে চলল ওরা।

খেয়ালি বলল, সত্যি, কথায় আছে না ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য, আমাদেরও তাই হল।

কী রকম?

এই ধরো না কেন, আমি স্কুটার চালাতে না জানলে কিছুতেই যেমন ওদের খপ্পর থেকে রেহাই পেতাম না, তেমনি স্কুটারটা যদি এইখানে পথের মাঝখানে খারাপ না হত, তা হলে এই রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার হাত থেকেও আমরা বঞ্চিত হতাম।

তোমার এই কথাটা অবশ্য মানতেই হবে।

খেয়ালি বলল, তবে রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা ভুল আমি যা করেছি তা বলবার নয়।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে যে ভুল তুমি করেছ, তার চেয়ে বড় ভুল আর কী হতে পারে?

ওটাকে আমি ভুল বলে মনে করি না। মাঝে মধ্যে বাড়ি পালানো খুবই দরকার।

তা হলে এখন থেকে তোমাকে আর খেয়ালি নয়, পলাতকা বলেই ডাকি আমি?

যে নামেই ডাক, আমি কিন্তু আমিই থাকব।

বেশ তো, তোমার মধ্যেই তুমি থাকো। এখন বলো দেখি বাড়ি পালানোর দরকারটা কী ছিল?

এই যেমন ধরো একটা একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচা।

আর?

আর বাড়ির লোকও বুঝুক ছেলেমেয়ে চোখের আড়ালে গেলে জ্বালা কত। তারা একটু হায় হায় করুক, কান্নাকাটি করুক, তবে তো মনের জ্বালাটা জুড়োবে বন্ধু।

তাই যদি হয়, তা হলে ভুলটা তুমি কী করলে?

ভুল করেছি আমার রিস্ট ওয়াচটা সঙ্গে না এনে। অবশ্য এর জন্য মনে আমার খেদ নেই। কেন না হাত বাড়ালেই যে বন্ধু পাওয়া যায়, তা তো জানতাম না। তুমি আমার সেই বন্ধু। কাজেই ঘর ছেড়ে লাভ হয়েছে এই যে, তোমার মতো বন্ধু পেয়েছি।

তোমার মতো বান্ধবী পেয়ে আমার লাভও কী কম হয়েছে?

তোমার লাভক্ষতি কী হয়েছে আমি জানি না। তবে তুমি না থাকলে আমি মরতাম। এত সাহসও দেখাতে পারতাম না।

সৌরভ এবার অন্য প্রসঙ্গে গেল। বলল, আচ্ছা, এইবার একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমায়, তোমার বাড়ি তো বললে কৈলাস বোস স্ট্রিটে। কিন্তু তোমার মামার বাড়ি কোথায় বললে না তো? যেখানে তুমি এমন চমৎকারভাবে স্কুটার চালানো শিখলে?

আমার মামার বাড়ি অনেক দূরে। গ্রামের দিকে।

কোথায় সেটা?

তুমি চাঁপাডাঙার নাম শুনছ?

বাব্বা! কে না শুনেছে?

সেই চাঁপাডাঙাতেই আমার মামার বাড়ি। সেখানেই দামোদরের বাঁধের ওপর খোলা জায়গায় স্কুটার চালানো শিখেছি প্রথমে। তারপর ফাঁকা মাঠে। চাঁপাডাঙায় তো মাঠের অভাব নেই। শুধু স্কুটার কেন মোটরও চালাতে পারি।

মোটর চালিয়েছ কখনও?

নিশ্চয়ই। তবে কি না ভয় করে খুব।

কথা বলতে বলতেই ওরা সেই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে একটু যেখানে লোকালয় সেইখানে পৌঁছল। এখানে কিছু ছোট ছোট দোকানপত্তর আছে। লোকজনের সংখ্যা কম বলে জমজমাটও নয়। জায়গাটাও ভারী সুন্দর।

ঘড়ি না থাকলেও রোদ্দুর দেখে বোঝা গেল বেলা অনেক হয়েছে। তাই খিদেয় চুঁই চুঁই করছে পেট। করলে কী হবে? একমাত্র মুড়ি তেলেভাজা, বোঁদে মিহিদানার লাড্ডু, আর ছানার গজা ছাড়া খাবার মতোও কিছু নেই।

খেয়ালি পায়ে পায়ে এগিয়ে একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, এই জায়গাটার নাম কী?

উত্তরে সে কী যে বলল কিছুই বোঝা গেল না। তবে এটুকু বোঝা গেল এখানকার মানুষজন খুবই উদার এবং অত্যন্ত সরল প্রকৃতির।

আসলে খুবই অনুন্নত জায়গা। মানুষজন যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই গ্রাম্য লোক। দেহাতি যাকে বলে।

সৌরভ নিজে এবার দু'-একজনের সঙ্গে কথা বলে জানল এই পথ কেওনঝোড় হয়ে সোজা চলে গেছে রাউরকেল্লায়। এ পথে বাসও যায়।

বাস যায় শুনে বুকে বল পেল একটু। খেয়ালিকে বলল, তা হলে আমাদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। যখন হোক একটা-না-একটা বাস পাবই।

বলতে বলতেই দেখা গেল একটা বাস আসছে:

সৌরভ বলল, এই বাসেই উঠব আমরা।

খেয়ালি বলল, কখনও নয়। আগে পেটে কিছু দিই, তারপর। বাস রুট যখন, বাস তখন আরও আসবে। বলে একজনকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এখানে কোনও খানা-খানেকা হোটেল মিলেগা?

লোকটি ওর কথা বুঝল। তারপর কী যেন ভেবে বলল, না, এখানে হোটেল কোথায়? তবে খেতে চাইলে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সৌরভ খেয়ালি দু'জনেই বলল, হ্যাঁ। আমাদের সেই ব্যবস্থাই করে দিন।

লোকটি ওদের গ্রামে একজনদের বাড়িতে নিয়ে গেল। দেখে মনে হল খুবই নিম্নশ্রেণীর লোক এরা। বলল, ভাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ডিমের ঝোল-ডাল-ভাত। দশ টাকা করে কুড়ি টাকা।

ওরা তো এক কথায় রাজি।

দুঃখ শুধু একটাই, পাহাড়ের কোলঘেঁষে এমন সুন্দর একটা নদী তির তির করে বয়ে যাচ্ছে, অথচ সেই নদীতে দু'জনের পক্ষে স্নান করা সম্ভব নয়, কেন না সৌরভের কিট ব্যাগে যা আছে তাতে ওর কোনও অসুবিধে নেই। এক্সট্রা প্যান্টশার্ট, গামছা, কি তোয়ালে সব কিছুই আছে। কিন্তু এই বাঁদরিটা কিছুই আনেনি।

সৌরভ বলল, তুমি যদি কিছু না মনে করো তা হলে আমি একটু স্নান করে নিই।

আমি?

তুমি তো কিছুই আনোনি সঙ্গে, কী করে কী করবে তা হলে?

তোমারটাতেই চালিয়ে নেব। যদি তোমার প্যান্টশার্টগুলো আমাকে ধার দাও।

আমার প্যান্টশার্ট তুমি পরবে?

তাতে কী? মেয়েরা বুঝি ছেলেদের পোশাক পরে না?

তা কেন?

অতএব ওরা একজনের বাড়িতে উঠে পোশাক ছেড়ে তোয়ালে, গামছা ইত্যাদি নিয়ে নদীতে গেল স্নান করতে।

পাহাড়িয়া নদী।

উচ্ছল। চঞ্চল। যেন নৃত্যের ভঙ্গিমায় স্রোতের নূপুর বাজিয়ে বয়ে চলেছে। যেখানে একটা বড় পাথর, সেখানে কল কল শব্দ তুলে লাফিয়ে নেচে কী কাণ্ডটাই না করছে। স্নিগ্ধ শীতল জল। কী মিষ্টি... কত মিষ্টি... আহা মিষ্টি...।

খেয়ালি আপন মনে গুন গুন করে একটা গানই গেয়ে উঠল। মন ভ্রমরার গান।

হঠাৎ সৌরভ চেঁচিয়ে উঠল, ময়ূর! ময়ূর! ওই দেখো, কী সুন্দর ময়ূর। কী মজা!

খেয়ালি বলল, কই, কোথায়?

ওই তো। দেখতে পাচ্ছ না, একেবারে চোখের সামনেই। ওই— ওই দেখো। কত— কত ময়ূর!

আরে সত্যিই তো। একটা-দুটো নয়। অনেক ময়ূর, ময়ূরগুলো এ গাছের ডাল থেকে উড়ে ওগাছে যাচ্ছে। এইরকম মুক্ত পরিবেশে ময়ূর দেখার আনন্দই আলাদা।

যাই হোক, ওরা ময়ূর দেখে নদীর জলে স্নান করে যখন গা মুছে পোশাক পরিবর্তন করল, তখন দেহমন বেশ সতেজ হয়ে উঠল ওদের। সৌরভের প্যান্টশার্টে খেয়ালিকে খুবই ভাল লাগল। ওকেও একটা ছেলে বলে মনে হল তখন। এরপর পেটভরে ভাত খেয়ে একটা বাসে উঠতে পারলেই নিশ্চিন্দি।

আট

খাওয়াটা কিন্তু মন্দ হল না। পরিবেশের জলহাওয়ার গুণেই কি না কে জানে, গরিব লোকের মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে ভাত খেতে কী ভাল যে লাগল, তা ওরাই জানে। দোষের মধ্যে চালে একটু কাঁকর থাকায় খেতে অসুবিধে হয়েছিল খুব।

ভাত খেয়ে ওরা বড় রাস্তায় এল বাসের জন্য।

রোদ্দুরের তেজ আছে বেশ। তাই খেয়ালির ভিজে পোশাকগুলো উঠোনে মেলে দেওয়ায় চট করে শুকিয়ে গেল।

এবার বাস একটা হলেই হয়।

কিন্তু বাস আর আসে না। অনেক পরে বাসের বদলে একটি ট্রাক এল।

একজন দোকানদার বলল, এই ট্রাক কেওনঝোড় হয়েই যাবে। তোমরা এতে চড়েই যেতে পারো।

সৌরভ বলল, কোনও অসুবিধে নেই। আমাদের যাওয়া নিয়ে কথা।

দোকানদার তখন হাত দেখিয়ে থামাল ট্রাকটাকে। তারপর ওদের দিকে দেখিয়ে কী যেন বলতেই রাজি হয়ে গেল ড্রাইভার।

সৌরভ আর খেয়ালি ট্রাকে উঠতে গেলে ড্রাইভার বলল, পঁচিশ টাকা করে পঞ্চাশ টাকা লাগবে দু'জনের।

সৌরভ বলল, পঁচিশ টাকা করে? কতদূর?

দূর আছে। যাবে তো চটপট উঠে পড়ো।

ওরা আর দেরি না করে ড্রাইভারের পাশেই গিয়ে বসল। ড্রাইভারের পাশে যে দু'জন হেলপার ছিল তারা গিয়ে বসল মাল বোঝাই ট্রাকের মাথার ওপর।

পথঘাট এখানকার খুব ভাল।

তাই ঝড়ের বেগে ট্রাক ছুটে চলল কেওনঝোড়ের দিকে। এ পথের দৃশ্য কী মনোরম। তেমনি মনোরম এই ট্রাকবাহন। গতিময় এবং নিরাপদ।

ড্রাইভার একজন সর্দারজি। স্টিয়ারিং ধরে দিব্যি মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে গাড়ি চালাতে লাগল। গাড়ির স্পিড যে কোন দিকে যাচ্ছে তার আর খেয়ালই রইল না। হঠাৎ একটি গোরুর গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়েই নেমে গেল পাশের খাদে।

যাঃ। ফেঁসে গেল গাড়িটা।

হেল্‌পার দুজনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। তারা এমনভাবে ছিটকে পড়ল যে হাত-পা ভেঙে, মাথা ফেটে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। ভয়াবহ ব্যাপার! প্রাণহানি ঘটেনি যে, এই রক্ষে।

ড্রাইভারকেও লেগেছে খুব। দুটো আঙুল গেছে।

সৌরভ ও খেয়ালি দু'জনেই বুকেমুখে চোট পেয়েছে খুব। তাই ভয়ে হাত-পা কাঁপছে থর থর করে। রক্তপাত তেমন একটা ঘটেনি।

ড্রাইভার কাত হয়ে যাওয়া ট্রাকের ভেতর থেকে অতিকষ্টে নামল। তারপর ইশারায় ওদেরও নামতে বলল।

ওরা নেমে বড় রাস্তায় উঠে আসতেই দেখল অনেক লোকজন ছুটে আসছে ওদের দিকে। মোটর লরিও দু'-একটা থেমে পড়েছে রাস্তায়। সবাই উৎসাহ নিয়ে দুর্ঘটনা দেখতে এগিয়ে এল।

কটক থেকে এক ভদ্রলোক আসছিলেন গাড়ি নিয়ে। কেওনঝোড়ে তাঁর একটি হোটেল আছে। নাম ময়ূরী। তিনি তাঁর গাড়িতেই তুলে নিলেন দু'জনকে।

ওরাও লিফট পেয়ে বর্তে গেল।

ভদ্রলোক ওদের পরিচয় জেনে খুশি হলেন খুব। সৌরভকে বললেন, তোমার বাবা যদি সত্যিই বাড়ি করেন এখানে, তা হলে খুবই ভাল হয়। অরবিন্দকাকুকেও তিনি চেনেন।

খেয়ালি বলল, আমাদের যেতে কি সন্ধে হয়ে যাবে?

তা একটু হতে পারে। তারপর ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, নাঃ। মনে হচ্ছে সন্ধের আগেই পৌঁছে যাব।

খেয়ালি বলল, কপালটা কী জ্বালা জ্বালা করছে।

সৌরভ বলল, কই দেখি? কোনখানটা?

এই দেখো।

দেখেই শিউরে উঠল সৌরভ। বলল, এ রাম! তোমার কপাল তো কেটে গেছে। রক্তে ভিজে উঠেছে ওখানটা।

ভদ্রলোক বলেন, কোনও ভয় নেই। কেওনঝোড়ে গেলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

প্রাইভেট গাড়ি তো, তাই চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই এক-এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে লাগল।

অনেকদূর যাবার পর এক জায়গায় দেখল হই হই করছে লোকজন। সে কী অফুরন্ত মানুষের সমাগম সেখানে। চারদিকে লাল শালুর পতাকা উড়ছে। পথের দু'পাশে দোকান। রকমারি দোকান। নিশ্চয়ই কোনও দেবস্থান আছে এখানে। দোকানে দোকানে পূজা সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়াও আছে খেলনাপাতির দোকান। নানারকম মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। কচুরি, শিঙাড়া, জিলিপি ও তেলেভাজার দোকান। আর আছে অজস্র সস্তার হোটেল। আনন্দের বন্যা বইছে সর্বত্র।

গাড়ি এইখানে থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, শোনো, তোমরা এখানে জুতো রেখে চট করে মাকে দর্শন করে এসো।

কোন মা?

তারিণী। খুবই জাগ্রতা। এই পথে যাতায়াত করলে তারিণীকে দর্শন না-করে কেউ যায় না।

ওরা ভদ্রলোকের কথামতো গাড়িতেই জুতো রেখে চলল মাতৃদর্শনে। ওড়িশার এই অঞ্চলে এই দেবীর মহিমা খুব। কত লোকের কত মনোবাঞ্ছা যে উনি পূরণ করেছেন, তার ঠিক নেই। দলে দলে নরনারী তাই চলেছেন মায়ের পুজো দিতে।

দেবীর কোনও মন্দির নেই এখানে। একেবারেই খোলা জায়গায় গাছতলায় দেবীর অধিষ্ঠান।

পূজারিরা ঘিরে রেখেছেন স্থানটিকে। যে যা পুজো দিচ্ছে তাই নিবেদন করছেন মাকে।

ওরা আর কী পুজো দেবে? একটা টাকা দেবীর দানপাত্রে দিয়ে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগল।

এক জায়গায় কী বিশাল একটি ধর্মশালা। ছোটখাটো লজও দু'-একটি আছে।

ওরা সব দেখেশুনে গাড়ির কাছে আসতেই ভদ্রলোক ওদের নিয়ে পাশের একটি ওষুধের দোকানে গেলেন। সেখানে খেয়ালির কপালের ওপরদিকে মাথার ঘন চুলের কাছে যেখানে চোট লেগে রক্ত চুঁইছিল সেখানটায় একটু ওষুধ দেওয়ালেন, তারপর ওদের নিয়ে একটি চায়ের দোকানের সামনে এসে চা আর বিস্কুট খেতে দিলেন ওদের।

ওরা চা-বিস্কুট খেয়ে গাড়িতে বসল।

ভদ্রলোকও এবার সিটে বসে স্টিয়ারিং-এ হাত দিলেন।

হর্ন বাজিয়ে শোঁ শোঁ করে এগিয়ে চলল গাড়িখানা। গাড়ির ভেতরে স্টিরিয়ো বক্স থেকে গান বাজছে। হিন্দি ছায়াছবির সুপার হিট গান। অথচ দেশটা কিন্তু ওড়িশা।

গান শুনতে শুনতে ওরা যত এগোতে লাগল ততই পাহাড় আর জঙ্গল ঘন হতে লাগল। এক সময় তো পাহাড়ের ওপরই উঠে পড়ল গাড়িটা। সে কী নয়নাভিরাম দৃশ্য। অনেক দেখেও যেন মন ভরে না।

তারপর প্রকৃতির লীলাভূমি দেখতে দেখতে একসময় ওরা কেওনঝোড়ে ঢুকে পড়ল। ছোট্টর ওপর বেশ সাজানো শহর। খুবই পরিচ্ছন্ন। ভারী মনোরম এর পরিবেশ! সুন্দর ঘর বাড়ি! চারদিকে দূরে অদূরে পাহাড়ের সারি। জমজমাট জায়গা।

ভদ্রলোক কেওনঝোড়ের রাজবাড়ির সামনে ওদের নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

দুর্ঘটনার পর থেকেই খেয়ালি যেন কেমন একটু মিইয়ে গেছে। ও খুব ভয় পেয়ে গেল নাকি? ও মেয়ে তো ভয় পাবার মেয়ে নয়। তা হলে? কী হল ওর?

যাই হোক, ওরা সুন্দর সুন্দর পথঘাট পেরিয়ে সিনেমা হলের দিকে এগোল। হলের নাম তারিণী। এই অঞ্চলের দেবীর নামেই নাম। সর্বত্রই তারিণী দেবীর জয়জয়কার।

অরবিন্দকাকু এখানে খুবই পরিচিত। তাই তাঁর নাম বলতেই বাড়ি দেখিয়ে দিল লোকে।

অরবিন্দকাকুর একমাত্র মেয়ে শিল্পা তার কাজলকালো চোখদুটি মেলেই অবাক। শিল্পাও ওদের বয়সি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। তা হোক, যেমনই মুখশ্রী, তেমনি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। সর্বোপরি তার মাথার মেঘকালো চুল আর ভ্রমরের মতো চোখের জন্যই সে বেশি সুন্দর।

শিল্পা অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই নাকি সৌরভ! তা এই মেয়েটি কে?

কাকিমা দু'জনের হাত ধরে ঘরে ঢোকালেন।

অরবিন্দকাকু যে আনন্দের আবেগে কী করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

সৌরভ ও খেয়ালি প্রণামপর্ব শেষ করল।

অরবিন্দকাকু এক মিনিটের মধ্যে ওদের সমস্ত খবরাখবর নিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, এ মেয়েটি কে? একে তো চিনলুম না! কে হয় তোমাদের?

সৌরভ বলল, ওর ব্যাপারে পরে বলব। ও আমার সঙ্গে এসেছে।

শিল্পা বলল, তোমার নাম কী বন্ধু?

লাজুক লাজুক মুখে খেয়ালি ওর নাম বলল।

শিল্পার চোখদুটি যেন উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল, ও মা! কী সুন্দর নাম! যাক ভালই হয়েছে। তোমাদের পেয়ে যে কী আনন্দ হচ্ছে তা বলবার নয়। সৌরভদা আসবে জানতাম, কিন্তু তুমি আসবে তা তো জানতাম না।

খেয়ালি বলল, আমারও ভাগ্য যে তোমার মতন এক বান্ধবীকে পেলাম।

কাকিমা সৌরভকে বললেন, আমরা খুব আশা করেছিলাম তোমার বাবা-মা-ও আসবেন।

অরবিন্দকাকু বললেন, হ্যাঁ, ওঁরা এলেন না কেন?

এলেন না দুটি কারণে। এক, বাবার এক বন্ধু দেশপ্রিয় পার্কে মর্নিংওয়াক করবার সময় হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যান। দুই, ওনারা পরখ করে দেখতে চান, আমি একা ঘর ছেড়ে বেরোতে পারি কি না। তবে এখন না এলেও পরে আসবেন।

এই ব্যাপার! যাই হোক। পথে আসতে তোমাদের কোনও কষ্ট হয়নি তো?

কিছুমাত্র না। ভিড়ের জন্য বাসে উঠতে পারিনি বলে একটা ট্রাক ম্যানেজ করেছিলাম। সেটা আবার স্পিড বাড়াতে গিয়ে খাদে পড়ল। তারপর আপনাদেরই এখানকার ময়ূরী লজের মালিক তাঁর মোটরে চাপিয়ে নিয়ে এলেন আমাদের। পথে তারিণীদেবীকেও দর্শন করে এলাম।

খুব ভাল করেছ। মা আমাদের কল্যাণময়ী। মা'র চরণ ভরসা করেই তো আমরা বেঁচে আছি।

কাকিমা ততক্ষণে তাড়া দিয়ে ওদের মুখহাত ধোওয়ালেন।

ওরাও পোশাক পরিবর্তন করল।

শিল্পারই চুড়িদার পরে খেয়ালি এখন খুশিতে ঝলমল করছে। কী ভাল যে লাগছে ওকে!

শিল্পা বলল, এই তো সবে সন্ধে। তোমরা জলটল খাও। তারপর তোমাদের নিয়ে একটু বেড়াতে যাব।

কাকিমা প্রত্যেকের জন্য ভাল রকমের জলখাবার নিয়ে এলেন। সারাটা দিনের পর এই হচ্ছে পরিতৃপ্তির খাওয়া। দেহমন একই সঙ্গে ভরে উঠল যেন।

খাওয়াদাওয়া যখন শেষ হল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চারদিক আলোয় আলো।

আলোর জৌলুসের কারণও আছে। কয়েকদিন আগে কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো গেছে তারই প্রতিমা রয়েছে এখানকার বিভিন্ন মণ্ডপে। দলে দলে লোক তাই প্রতিমাদর্শনে যাচ্ছে।

ওরা তিনজনেই চলল প্রতিমাদর্শনে। ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে আবার ওরা বড় রাস্তায় এল। তারপর এগিয়ে চলল মেইন রোডের দিকে। চমৎকার পথঘাট।

সৌরভ দেখল শিল্পার হাত ধরে কেমন মৃদুমন্দ গতিতে কথা বলতে বলতে চলেছে খেয়ালি। দেখে খুব ভাল লাগল ওর। বাড়ি পালানো একটি মেয়ের এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? সুস্থ সুন্দর নিরাপদ একটা আশ্রয়ের চেয়ে হিতকর আর কিছু কী আছে?

মেয়েটা যেমন খেয়ালি, তেমনই মিশুকে।

এই অল্পসময়ের মধ্যেই কী সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। এমনভাবে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে যেন কতদিনের পরিচয় ওদের। ভাব দেখে মনে হচ্ছে একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্যেই যেন জড়িয়ে যাবে মেয়েটা। অর্থাৎ শুধু এমনই নয়, পরবর্তীকালেও সৌরভ যখন ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে কেওনঝোড়ে বসবাস করবে তখনও ও নিশ্চয়ই আসতে ছাড়বে না এখানে। শুধু সমস্যা এই, মেয়েটা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হত, তা হলে কী ভালই না হত।

এক সময় ওরা রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। শহরের এই জায়গাটা অত্যন্ত জনবহুল। অর্থাৎ কিনা এই ছোট্ট শহরটির ম্যাল বলা যেতে পারে জায়গাটাকে।

সৌরভ বলল, শিল্পা, তোমাদের এখান থেকে আমার বাড়িতে ফোনে যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা আছে?

কী যে বলো? কেওনঝোড়ের মতন শহরে দাঁড়িয়ে তুমি কিনা ফোনের জন্য চিন্তা করছ? ওই দেখো তোমার সামনেই টেলিফোন বুথ।

তা হলে তোমরা এক কাজ করো, দু'জনে পায়চারি করো এখানে। আমি ফোনে বাবা-মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।

খেয়ালি বলল, বেশ তো। আমরা ওই ওদিকের দোকানগুলোর দিকে একবার যাচ্ছি।

ওরা রাস্তা পার হয়ে ওপারে যেতেই সৌরভ বুথে গিয়ে ফোনের লাইন চাইল।

সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেল লাইনটা।

সৌরভ বলল, বাবা আমি সৌরভ বলছি।

ওদিক থেকে উত্তর এল, ঠিক মতো পৌঁছেছিস তো? কোনও অসুবিধে হয়নি?

না বাবা। কোনও অসুবিধে হয়নি। এবার থেকে আমি একা-একাই বেরোতে পারব। একা বেরনোর মজা অনেক। তবে অভিজ্ঞতা যা হয়েছে তা কী বলব...।

অরবিন্দর খবর কী আগে বল? আমরা যাইনি বলে কিছু বলেনি?

একটু দুঃখ করছিলেন অবশ্য। তবে আমি সব বুঝিয়ে বলেছি। এই তো একটু আগে এসে পৌঁছেছি আমরা।

আমরা! আমরা আবার কোত্থেকে হলি। বাড়ি থেকে তো একা গেলি তুই। তা ছাড়া তোর বেলা বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

সেই কথাই তোমাকে বলতে চাই। তার আগে বলি তোমার কি শৈলজাকাকুর কথা মনে আছে?

কেন মনে থাকবে না? একবার সানঘাগরায় গিয়ে চিতাবাঘের খপ্পরে পড়েছিলাম আমরা। উঃ! সেদিনের কথা মনে পড়লে এখনও বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। তা হঠাৎ ওর কথা জানতে চাইছিস যে? ও কী এখনও আছে?

আছে মানে? যাজপুর কেওনঝোড় রোড রেল স্টেশনের সামনেই খাবারের বড় দোকান করে গুছিয়ে বসে আছেন। আমরা তো ওনার দোকানেই খেলাম। উনি আমাদের কাছ থেকে দাম পর্যন্ত নিলেন না। উনিই বললেন, এখানকার বিরজাদেবী নাকি জাগ্রতা। তাই মন্দির দর্শন করে যেতে বললেন।

ঠিকই বলেছে ও। তোরা গেছলি?

হ্যাঁ বাবা। প্রথমে আমরা বৈতরণীতে গিয়েছিলাম। তারপর ওপারের দ্বীপে গিয়ে বরাহনাথ দেখে এসেছি। বরাহনাথ দেখে ফেরবার সময় এমন একটা চক্রে পড়ে গেলাম যা ফোনে বলবার নয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিরজাকে দর্শন না করেই চলে আসতে হল।

ওর জন্য কিছু ভাবিস না। আমরা তো ওই দেশেরই লোক হয়ে যাচ্ছি। তা তোর সঙ্গে আর কে আছে? তুই বার বার আমরা আমরা করছিস কেন?

সেই কথাই বলছি বাবা তোমাকে। আমি তিরুপতি এক্সপ্রেসে যে বার্থ পেয়েছিলাম সেই বার্থের মুখোমুখি বার্থে আমারই বয়সি একটি মেয়ে দেখি কোচ অ্যাটেনডেন্টকে ম্যানেজ করে শুয়ে আছে। কথাবার্তা বলার পর বুঝলাম মেয়েটা বাড়ি থেকে পালাচ্ছে। একটু রাগি, আর ছেলেমানুষিভাবও রয়েছে ওর। অসম্ভব চঞ্চল প্রকৃতির। তারপর একটু হেসে বলল, ছিটেলও আছে।

বলিস কী! তারপর?

মেয়েটি আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইছে না কিছুতেই। দেখে বেশ ভাল এবং ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

বেশ করেছিস। খুব ভাল কাজ করেছিস বাবা। কী ভাল কাজ যে করেছিস তা কী বলব। এইভাবে কত ছেলেমেয়ে বিপথগামী হয়, রসাতলে যায় তার ঠিক নেই।

ওর নাম খেয়ালি মুখার্জি। বাড়ি বলছে কৈলাস বোস স্ট্রিটে। কোনওরকমে খোঁজখবর নিয়ে ওর বাড়িতে একটা খবর দিতে পার?

না পারার কী আছে? ওর বাবার নাম জানিস?

জিজ্ঞেস করিনি।

বাবার নাম আগে জিজ্ঞেস করবি তো।

আসলে কেন করিনি জান? বেশি কথা জিজ্ঞেস করলে যদি পালায় তাই।

এখন কেমন বুঝছিস?

এখন মনে হচ্ছে ওর পালিয়ে বেড়ানোর ঝোঁকটা কেটে আসছে। তবে সিনেমায় নামার মোহ আছে খুব। এখন বলছে কলকাতা থেকে ভিডিয়ো ভাড়া করে এনে এইখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি তুলবে।

তাই নাকি? মনে হচ্ছে মেয়েটা যা তা মেয়ে নয়। ভাবালু। এই ধরনের ছেলেমেয়েরা এমনিতেই একটু আত্মভোলা প্রকৃতির হয়। যাই হোক, নজরে রাখ মেয়েটাকে। ওর নাম আর এলাকা যখন জানা গেছে তখন বাড়ি খুঁজে বের করতে একটুও অসুবিধে হবে না আমার। তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমি ওর বাড়িতে খবর দিচ্ছি।

মাকে একবার দাও।

বিনতা পাশেই ছিলেন।

ভার্গব ফোনটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, ছেলে কথা বলবে তোমার সঙ্গে।

বিনতা ফোনে অনেক কথা বললেন ছেলের সঙ্গে। সাবধানে থাকবার উপদেশ দিলেন।

কথা শেষ হলে টেলিফোনের চার্জ দিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে এল সৌরভ। তারপর রাস্তার ওপারে গিয়ে অপেক্ষমান শিল্পা ও খেয়ালির হাত ধরে ঘুরতে লাগল পথে পথে।

নয়

সেই রাতটা যে কী আনন্দে কাটল তা বলবার নয়। অনেক রাত পর্যন্ত ওদের অনেক পরিকল্পনা হল। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

ময়ূরভঞ্জের মায়াময় প্রকৃতির বুকে ভোর হল।

সে কী অপূর্ব সুন্দর ভোর, কাছেদূরে শুধু ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি। তারই কোলে যে সবুজ বনানী, সেই বনানীর হৃদয় থেকে পাখির কলরব মুখর করে দিল চারদিক।

সৌরভ ঘুম থেকে উঠেই ছাদে উঠে দু'চোখ মেলে দিল দূরের প্রকৃতির দিকে। কত নদী, কত নির্ঝরিণীর উৎস ওই পাহাড়গুলো। সেই অপূর্ব সুন্দরের দিকে তাকিয়ে মন যেন ভরে উঠল।

একটু পরেই খেয়ালি ও শিল্পাও উঠে এল ছাদে। মেয়ে তো নয়, যেন একই বৃন্তে দুটি ফুল।

শিল্পা বলল, সৌরভদা, কেমন দেখছ ময়ূরভঞ্জ?

খুব ভাল। এত ভাল যে চোখ আর ফেরাতে পারছি না।

এই ময়ূরভঞ্জের এমনই মোহ যে, এর মোহের কাজল একবার চোখে দিলে আর একে ভোলা যায় না।

তাই তো দেখছি। সুন্দর ছাড়া এখানে তো কিছুই নেই।

আছে। অসুন্দরও আছে। ওই যে দেখছ পাহাড় বনানী, মরণ ওখানে নিয়তির রূপ ধরে ওত পেতে আছে। হিংসা, মৃত্যু, আতঙ্ক কী নেই ওখানে?

সৌরভ অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

শিল্পা বলল, ওই পাহাড়ের কোলে তোমাদের জন্য একটা জমি দেখে রেখেছেন বাবা। তোমার হয়তো খুবই পছন্দ হবে। তবে কিনা ওটা শুধু অবসর

বিনোদনের জন্যই ভাল। বসবাসের জন্য যেটা, সেটা ওই দেখা যায়।

খেয়ালি এতক্ষণে কথা বলল, ওই যে কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে যেটাতে?

হ্যাঁ। ওরই সংলগ্ন পাঁচ কাঠা জমি।

ওখানে আমার যেন রাত্রিবাসের একটু কিছু থাকে।

সৌরভ বলল, এটাও কি তোমার খেয়াল?

মোটেই না। আমার অন্তর থেকেই বলছি।

শিল্পা বলল, কী মেয়ে তুমি? বাবা-মাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে কী কাণ্ডটাই না করলে বলো তো।

ঠিক করেছি। একটু বুঝুক ওরা। চোখ থাকতে যারা চোখের মর্ম বোঝে না, তাদের চোখে বালি একটু পড়ুক।

তা না হয় পড়ল। কিন্তু তোমার মন কাঁদছে না বাড়ির জন্য? মা-বাবা-দাদা এদের কথা মনে পড়ছে না?

খেয়ালি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, ওই দূরের পাহাড়গুলোর দিকে কি আজ যাওয়া যাবে?

কেন যাওয়া যাবে না? একটু পরে চা-জলখাবার খেয়ে প্রথমেই আমরা জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যাব। সেখান থেকে যাব সানঘাগরায়।

সৌরভ লাফিয়ে উঠল উল্লাসে, সানঘাগরায়? সানঘাগরার নাম আমি বাবার মুখে কতবার শুনেছি। ওইখানে নাকি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একবার চিতাবাঘের পাল্লায় পড়েছিলেন বাবা।

ভালুক, চিতা এখনও আছে। নেই শুধু হরিণ আর অসংখ্য ময়ূর। জঙ্গলের নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিদায় নিয়েছে।

কীভাবে যাওয়া যাবে ওখানে?

অটো আছে, প্রাইভেট ট্যাক্সি আছে, বাস আছে। যাতে ইচ্ছে চলে যাও। তবে ইচ্ছেমতো ঘুরতে গেলে অটো কিংবা ট্যাক্সির বিকল্প নেই।

খেয়ালি বলল, ভুল বললে। তোমার চেনাজানার মধ্যে স্কুটার আছে কারও?

অনেকেরই আছে। কিন্তু চালাবে কে? সৌরভদা?

খেয়ালি হেসে গড়িয়ে পড়ল।

হাসলে যে?

তোমার কথা শুনে। তোমার সৌরভদা হচ্ছে রাঙা মুলো। দেখতেই লাল টুকটুকে। আসলে একটি মাকাল ফল।

তা হলে স্কুটারের খোঁজ করে লাভ কী? চালাবে কে, তুমি?

ধরো যদি আমিই চালাই।

তবে তো কথাই নেই। এসো নীচে এসো। মা বোধহয় এতক্ষণে চায়ের জল

চড়িয়েছেন। চা-টা খেয়ে আমি পরেশদার স্কুটারটা পাওয়া যায় কি না দেখি।

ওরা নীচে এল। তারপর বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে ভোরের তাজা ফসলের মতো ডাইনিং টেবিলে এসে বসল।

অরবিন্দকাকু বললেন, শিল্পা বলছিল তোমরা নাকি আজই সানঘাগরায় যেতে চাও?

হ্যাঁ।

কিন্তু তোমরা তিনজনে একটা স্কুটারে যেতে পারবে?

খেয়ালি বলল, এটা তো অভ্যাসের ব্যাপার কাকু। তা ছাড়া আপনাদের এখানে স্কুটার চালানোর অসুবিধে নেই। এমন সুন্দর পিচঢালা পাকা রাস্তা আমরা কোথায় পাব?

তা অবশ্য ঠিক। তবুও সাবধানে যেয়ো কিন্তু।

কাকিমা বললেন, অমনি ফেরার পথে জগন্নাথদর্শনও করে এসো।

অরবিন্দকাকু বললেন, এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির পুরীর মন্দিরের মতোই বড় সড়। অত বড় না হলেও তার কাছাকাছি। মন্দিরের সামনেই প্রশস্ত রাজপথের ওপর রাখা আছে বিশাল রথ। বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে এখানে।

প্রথমেই চা-বিস্কুট। তারপর লুচি-হালুয়া বেশ দমভোর খাওয়া হল।

শিল্পা বলল, আমি তা হলে দেখছি স্কুটারের কী ব্যবস্থা করতে পারি।

খেয়ালি বলল, না পাও চলে এসো। আমরা একটা জিপ অথবা প্রাইভেট ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে নেব।

সৌরভ বলল, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড তো বাজারের কাছেই। দেখি না কী বলে ওরা, কত টাকা নেয়।

অরবিন্দকাকু বললেন, বেশি নেবে না। খুব জোর আশি থেকে একশো টাকা নেবে। সেদিন কটক থেকে আমার এক বন্ধু পরিবার এসেছিল। ওদের একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিলাম তিনশো টাকায়। ওরা তেমনি গোনাসিকায় গিয়েছিল।

সৌরভ বলল, গোনাসিকা আবার কী?

গোনাসিকা হচ্ছে বৈতরণীর উৎস। পাহাড়ের এক উচ্চস্থানে সেখান থেকে বৈতরণী নেমে আসছে, সেই জায়গাটাকে ঠিক গো-নাসিকার মতো দেখতে। তাই এই নাম।

শিল্পা একটা চটি পায়ে দিয়ে খেয়ালিকে বলল, তুমি আর বসে থেকে কী করবে? এসো আমার সঙ্গে। তোমাকে দেখলে হয়তো পরেশদার মন গলে যাবে। না বলবে না।

খেয়ালি একটু হাসির ঝিলিক তুলে শিল্পার সঙ্গ নিল।

ওরা চলে গেলে সৌরভও পায়ে পায়ে নেমে এল রাস্তায়। তারপর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে।

কাছেই বাজার। ঝাঁকা ভরতি সবজি নিয়ে দেহাতিনী পসারিনিরা দলে দলে চলেছে বাজারের দিকে।

ও যখন বাজারের পাশ দিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগোচ্ছে ঠিক তখনই কে যেন একজন এসে ওর জামার কলার ধরল।

সৌরভ ভয় পেয়ে তাকাল তার দিকে। দেখামাত্রই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। সর্বনাশ! এই পাপটা এখানে কেন?

যে ধরেছিল সে বলল, আমাকে চিনতে পারছিস?

সৌরভ বলল, তা পারছি বইকী।

তোর সেই লালপরিটা কোথায়?

কে লালপরি?

বলামাত্রই ঠাস করে একটা চড়।

এই নরম মিষ্টি রোদের সকালে অমন একটা চড় খেয়ে গালটা জ্বলে উঠল যেন।

পথে এখন লোকজন খুব একটা বেশি না হলেও যারা আছে তারা কেউ কিছুই বলল না। অনেকেই ভাবল হয়তো ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার, তাই।

কাল থেকে তোদের আমি হন্যে হয়ে খুঁজছিরে। বল সেটা কোথায়?

যদি না বলি?

না বললে তোর জান আমি কয়লা করে দেব। বলে টেনেহিঁচড়ে ওকে একটা গলির ভেতর নিয়ে গেল।

সৌরভ বলল, বৃথাই মারধর করছ। আমার মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারবে না তুমি।

আমার নাম জয়রাম পতি। সম্বলপুরের অরণ্য অঞ্চলের ছেলে আমি। আমি পারি না এমন কাজ নেই। বনের পশুও আমার চেয়ে হিংস্র নয়। ওই মেয়েটাকে আমার চাই। মেনোর চোখটায় কী অবস্থা করে দিয়ে এল কাল?

সে দোষ কি মেয়েটার? আগে বলো আমাদের পেছনে লেগেছিল কারা? আমরা তোমাদের কোন ক্ষতিটা করেছিলাম?

আমি কাউকে কৈফিয়ত দিই না।

তা হলে কী করে আশা করো যে আমি তোমার কথার উত্তর দেব?

মেনোর স্কুটারটা কোথায়?

সেটা রাস্তাতেই পড়ে আছে।

কোন জায়গায়?

এখানকার রাস্তাঘাটের নাম আমি জানি না।

জয়রাম ডাকল, বলাই!

একটি ছেলে মোটর মেকানিকের কাজ করছিল, জয়রামের ডাকে এগিয়ে এল।

এটাকে হাপিস করে দে।

সৌরভ দেখল ওদের সঙ্গে পরে উঠবে না। তাই খুব জোরে একবার চেঁচিয়ে উঠল। পরক্ষণেই মুখ চেপে ধরল ওরা।

সেই মেকানিক ছেলেটি কালিঝুলি মাখা হাত নিয়েই সৌরভকে পাশের একটি গ্যারেজঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল।

জয়রামও গেল সঙ্গে। সৌরভের কানের কাছে মুখ এনে সে বলল, আজ রাত্রে সানঘাগরার আতঙ্কর গ্রাস হবি তুই। একটা চিতা বড় বেশি জ্বালাচ্ছে আজ ক'দিন ধরে। পেলে তোকে আর ওই মেয়েটাকে একসঙ্গেই উপহার দেব তাকে। বাঘটা তোদের দু'জনকে খাবে আর আমি খাব বাঘটাকে। অর্থাৎ কিনা ওটাকে গুলি করে ওর চামড়াটা নিয়ে ট্যান করাতে দেব।

সৌরভ বলল, যাই করো না কেন, মেয়েটা কোথায় তা আমি বলব না।

বলবার দরকারও নেই। কান টানলেই যেমন মাথাটা আসে, তেমনি তোর খোঁজে বেরোলেই ওকে ধরব। ও এই কেওনঝোড়েই আছে। কাল রাত্রে কত খুঁজলুম তোদের কিন্তু পেলাম না। বলে সেই মেকানিক ছেলেটিকে বলল, একে শুধু আটকে রাখিস না। ভাল করে বেঁধে রাখ, না হলে পালাবে। মুখটাও বাঁধ শক্ত করে। মুখ না বাঁধলে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করবে হয়তো।

জয়রাম চলে গেল।

ছেলেটি ওর কাজ শুরু করতেই নিজমূর্তি ধরল সৌরভ।

ওর মাথাটা দড়াম করে ঠুকে দিল ছেলেটার নাকের ওপর। প্রচণ্ড আঘাত। সেই আঘাতে গল গল করে রক্ত ছুটতে লাগল নাক দিয়ে। ছেলেটি বাবারে বলে বসে পড়ল।

সেই সুযোগটা নিতে ছাড়ল না সৌরভ। সে গ্যারেজ থেকে বেরিয়েই প্রাণপণে ছোটা শুরু করল।

ততক্ষণে জয়রাম আবার ছুটে এসেছে। এসেই ওপর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কী বেদম প্রহার! একটু পরেই জয়রাম ওকে জোর করে একটা বস্তায় ঢুকিয়ে, বস্তার মুখ বেঁধে গ্যারেজ ঘরে ফেলে রাখল।

অনেক পরে সৌরভের মনে হল কোনও একটা দ্রুতগামী লরি অথবা অন্য

কিছুতে করে ওরা ওকে পাচার করছে। কিন্তু কোথায়? ওর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। এটুকু বুঝল আর এদের হাত থেকে মুক্তি নেই।

দশ

দুশ্চিন্তার কালো মেঘ একটা ঘনিয়ে এল অরবিন্দবাবুর বাড়িতে। আসবে না-ই বা কেন? ছেলেটা সেই গেল অথচ এখনও পর্যন্ত ফেরার নাম নেই।

শিল্পা খেয়ালিকে নিয়ে স্কুটার আনতে গিয়েছিল। স্কুটার নিয়ে ফিরে এসে ওর জন্য বসে থেকে থেকে হতাশ হল।

খেয়ালি বলল, আমার মনে হয় ওর একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। ছোট্ট জায়গা, তাই খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। চলো আমরা বাজারের দিকেই যাই।

অরবিন্দবাবু বললেন, তোরা যদি দেখা না-পাস তা হলে আমাকে এসে বলবি। বেশি দেরি করলে থানাতেই যেতে হবে আমাকে।

শিল্পা আর খেয়ালি দু'জনেই পায়ে পায়ে বাজারের দিকে এল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সৌরভের কোনও খোঁজ তো পেলই না। উপরন্তু ওর ব্যাপারে বলতেও পারল না কেউ কিছু।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা মারুতি ভ্যান যেন গোঁ গোঁ করে ছুটে এল ওদের চাপা দিতে।

ওরা দু'জনেই সভয়ে পিছু হটল। ওরা ভেবে পেল না ভ্যানটা কেন ধেয়ে এল ওদের দিকে। একটু পরেই ভ্যানের ভেতর থেকে যে নেমে এল তাকে দেখেই জ্বলে উঠল খেয়ালি। বলল, অত কাণ্ডর পরও শিক্ষা হয়নি তোমাদের, না? এখান পর্যন্ত ছুটে এসেছ শয়তান?

আমি তো তোরই খোঁজে এসেছি রে বাঘিনী। আয় আমার সঙ্গে। আজ একটা চিতার ক্ষুধা মেটাব তোকে দিয়ে।

খেয়ালি বলল, খুব সাবধান। এক পা-ও এগোবি তো দারুণ বিপদ ডেকে আনবি কিন্তু।

শিল্পা তখন চিৎকার করছে, পুলিশ। পুলিশ!

ওর চিৎকারে পুলিশ এবং পথচারি অনেকেই ছুটে এল। কিন্তু ছুটে যখন এল, মারুতি তখন হওয়া। সেই সঙ্গে জয়রামও।

সবাই জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে খুকি? অমন চেঁচাচ্ছ কেন?

ওরা তখন সব কথা খুলে বলল। এমনকী এও বলল সৌরভের নিখোঁজ

হওয়ার পেছনে ওই লোকটার হাত থাকতে পারে বলে।

এদিকে সেই মেকানিক ছেলেটি দূরে দাঁড়িয়ে এদের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল সব। শিল্পাকে সে চিনত। চিনত, কেন না সে হচ্ছে এখানকারই স্থানীয় ছেলে। তার ওপর কয়েক বছর আগে ওর মা ওদের বাড়িতে কাজ করত। তাই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই সে চুপি চুপি এগিয়ে এসে শিল্পাকে বলল, কী হয়েছে তোমাদের? কাকে খুঁজে পাচ্ছ না?

শিল্পা ওকে সৌরভের ব্যাপারে সব কথা বলে চেহারার বর্ণনা দিতেই ছেলেটি বলল, জয়দা তো ওই ছেলেটাকে মেরে ধুনে দিয়েছে। তারপর একটা বস্তায় পুরে বস্তার মুখ বেঁধে রেখে দিয়েছিল আমাদের গ্যারেজঘরে।

তোর এমন অবস্থা কী করে হল?

আমিই যে ওকে বাঁধতে গিয়েছিলুম। ও তখন মাথা দিয়ে আমার এই নাকের ওপর এমন একটা গোঁত্তা মারল যে আমার এখন এই হল।

শিল্পা ওর পায়ের চটি খুলে মারতে গেল ছেলেটাকে। বলল, আজকাল বুঝি এইসব কাজ করছিস? বলতে লজ্জা করছে না?

আমি কী করে জানব ও তোমাদের কেউ?

যাদেরই হোক, এইরকম কাজ করবি কেন?

আমি তো এটাকে খারাপ কাজ বলে ভাবতে পারিনি। জয়দা মাঝেমাঝে এদিকে আসে। আজও এসেছিল। ওই ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল ও নাকি কার একটা স্কুটার চুরি করে পালিয়েছে। কিন্তু মালটা কোথায় রেখেছে তা কিছুতেই বলতে চাইছে না। সেইজন্য আমাকে বলল, তোদের গ্যারেজে বেঁধে ফেলে রাখ ব্যাটাকে। যতক্ষণ না সত্যিকথা বলে ততক্ষণ ছাড়া হবে না ওকে। আমি তাই মজা পেয়ে ওই কাজ করেছিলাম।

ছেলেটা এখন কোথায়?

ওকে বেদম পিটিয়ে বস্তাবন্দি করে সাতশো আটে তুলে দিয়েছে।

সাতশো আট? সেটা আবার কী?

একটা লরির নম্বর।

লরিটা কোনদিকে গেছে বলতে পারবি?

এই তো এই রোড ধরে গেছে।

শিল্পা বলল, তা হলে হয় গোনাসিকা অথবা সানঘাগরার অরণ্যেই নিয়ে গেছে ওকে।

খেয়ালি বলল, জয়রাম কোনদিকে গেল দেখেছিস?

না। ওকে তো দেখিনি।

ঠিক আছে। এই ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিস না।

শিল্পা বলল, আমাদের উচিত এখুনি বাড়ি গিয়ে বাবাকে সব কথা বলে থানায় যাওয়া।

খেয়ালি বলল, অবশ্যই। তবে আমার ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ চেপে যেতে হবে এখন।

তোমার কোন ব্যাপারটা?

জয়রামের বন্ধু মেনোগুন্ডার চোখে ছুরি মেরেছি কাল। ওদের স্কুটার নিয়ে পালিয়েছি। এসব জানাজানি হলে পুলিশ কিন্তু আগে আমাকেই অ্যারেস্ট করবে। আর এখনই যদি আমি ধরা পড়ে যাই, তা হলে সৌরভকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে অসুবিধে হয়ে যাবে খুব।

শিল্পা বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি খুঁজে বের করবে?

আমি একা তো নয়! তুমিও থাকবে সঙ্গে। আমরা সশস্ত্র সানঘাগরা অথবা গোনাসিকায় চলে যাব। এই দুটো জায়গার একটাতে অন্তত সে থাকবে।

আমার মনে হয় সানঘাগরাতেই ওকে নিয়ে গেছে ওরা।

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় সস্ত্রীক অরবিন্দবাবুই এসে হাজির হলেন সেখানে। বললেন, ব্যাপার কীরে! কোনও সন্ধান পেলি?

শিল্পা বলল, তুমি এখুনি থানায় যাও বাবা। ওর খুব বিপদ। মেনোগুন্ডার সাগরেদরা সম্ভবত ওকে সানঘাগরার দিকেই নিয়ে গেছে।

সে কী! কার মুখের খবর এটা?

যারই মুখের খবর হোক, তুমি আর দেরি কোরো না। সাতশো আট নম্বর প্লেটের লরিতে করে ওকে নিয়ে গেছে ওরা।

বলিস কীরে! আমার যে হাত-পা কাঁপছে। এ কী হল? ওর বাবা-মা এলে তাদের কী কৈফিয়ত দেব আমি?

খেয়ালি বলল, সে চিন্তা পরে করবেন। এখন একদম সময় নষ্ট করবেন না। আপনি যান। আমরা কাকিমাকে নিয়ে ঘরে যাচ্ছি।

অরবিন্দবাবু একটুও দেরি না করে থানায় গেলেন।

ওরাও ঘরে ফিরল।

অরবিন্দবাবুর স্ত্রী মা তারিণীকে ডাকতে লাগলেন।

খেয়ালি শিল্পাকে বলল, পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। আমরা আমাদের কাজ করি। তুমি কি আমাকে সানঘাগরার পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

হ্যাঁ পারব। যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেই পথটাই সোজা চলে গেছে সানঘাগরার দিকে।

তা হলে আর দেরি না করে এখুনি আমাদের পৌঁছতে হবে। চেষ্টা করতে

হবে পুলিশের আগেই যাতে আমরা পৌঁছে যাই।

বাড়িতে কী বলব?

কিছুই বলবে না।

শিল্পা বলল, দাঁড়াও তা হলে, আমি ড্রেসটা একটু চেঞ্জ করে নিই।

আর শোনো, পারলে আত্মরক্ষার জন্য একটা ছুরিটুরি কিছু নিয়ো। একেবারে শুধু হাতে যাওয়াটা ঠিক নয়।

বাবার স্প্রিং-দেওয়া ছুরিটা নিচ্ছি। তোমার কিছু লাগবে?

প্রয়োজন নেই। আমার যা আছে এই যথেষ্ট।

ওরা আর দেরি না করে বাড়িতে একটু আসছি বলে স্কুটার নিয়ে বেরোল।

হাই স্পিডে স্কুটার চালিয়ে ওরা রাজপথ ধরে বনপথের দিকে এগিয়ে চলল।

খেয়ালি বলল, তোমার ভয় করছে না তো?

না।

ভয় একদম করবে না। ভয় করলেই বিপদ। ভয় জয় করো, দেখবে বিপদ একসময় দূরে সরে গেছে।

শিল্পা খেয়ালিকে জড়িয়ে ধরে বলল, সত্যি, কী থেকে কী হয়ে গেল দেখো। সৌরভদার জন্য মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

কেন যে বেরোতে গেল ঘর থেকে।

আমরা স্কুটার না পেয়ে ফিরে এলে তারপর তো একসঙ্গেই যেতাম।

আসলে কী জানো তো, সৌরভ ছেলেটা খুব সহজ সরল। তবে একটা দিকে খুব ভাল হয়েছে। আমরা স্কুটার নিয়ে বেরনোর পর যদি ওদের খপ্পরে পড়তাম তা হলে কিন্তু কেউ কারও জন্যই কিছু করতে পারতাম না। পুলিশেও খবর যেত না। এখন ভয় শুধু একটাই, সৌরভকে ওরা মেরে না ফেলে। কেন না যা করে এসেছি কাল, তাতে আমাদের ওপর ওরা খার হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা কী হয়েছিল আমাকে বলো তো? কাল তোমরা অত কথা বললে, কিন্তু আসলটাই চেপে গিয়েছিলে কেন?

খেয়ালি তখন এক এক করে সমস্ত কথাই বলতে লাগল। এমনকী ওদের ভিডিয়ো শুটিং-এর পরিকল্পনার কথাও বলল।

শিল্পা বলল, ওর জন্য কলকাতা থেকে লোক আনবার দরকার কী? সেটা এখানেও হতে পারে। ভাল লোক আছে এখানে। কটক-ভুবনেশ্বর থেকে পাওয়া যেতে পারে।

সেই একই তো ব্যাপার হল। কলকাতার লোক হলে হয় কী, আমাদের মুঠোর মধ্যে ধরা থাকে।

আমিও থাকব তো তোমাদের ছবিতে?

অবশ্যই। তুমি তো থাকবেই। তুমি না থাকলে আমাদের এমন স্পট চিনিয়ে দেবে কে? তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি হিংসা করছি খুব।

কোন ব্যাপারে?

সৌরভের বাবা-মা যদি বরাবরের জন্য এখানে চলে আসেন তা হলে তুমি ওকে সব সময়ের জন্যই কাছে পাবে। মাঝখান থেকে আমিই দূরে থাকব।

এই যে বললে তোমার জন্যও একটা ঘর করে দিতে, তুমি এখানে থাকবে না?

ওটা তো কথার কথা। ওর বাবা-মা যদি রাজি না হন? বিশেষ করে আমি একটা বাড়ি পালানো বাজে মেয়ে।

যাঃ। কী যা তা বলছ? তুমি বাজে মেয়ে কেন হবে? তুমি তো অভিমান করে ঘর ছেড়ে চলে এসেছ! তা ঠিক আছে। তুমি যদি সত্যিই থাকতে চাও, তা হলে আমাদের বাড়িতেও থাকতে পারো। এখানে থেকেই পড়াশোনা করবে। দু' বন্ধুতে একসঙ্গে স্কুলে যাব আমরা।

ঠিক! তোমার বাবা-মা আপত্তি করবেন না?

তোমার মা-বাবা যদি আপত্তি না করেন।

খেয়ালি স্কুটারের গতি এবার একটু একটু করে কমিয়ে আনল। তারপর এক জায়গায় স্কুটার থামিয়ে বলল, পথটা তো এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে দেখছি। আমরা এখন যাব কোন পথে?

কেন, সোজা। ওই যে পাহাড়টা দেখছ, ওই পাহাড়ের মাথার ওপর সানঘাগরা।

এই পথটা তা হলে কোন দিকে গেছে?

কেল্লার পাশ দিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে।

খেয়ালি কী যেন ভাবল। তারপর বলল, বহুদিনের পুরনো ভাঙা কেল্লা দেখছি। সৌরভকে নিয়ে গিয়ে এখনকার মতো ওখানেই তো রাখতে পারে ওরা?

সানঘাগরা ছাড়া কোথাও যাবে না।

ঠিক বলছ তুমি?

বলাইও তাই বলল।

ওই মেকানিক ছেলেটা?

মেকানিক না ছাই। কাজ শিখছে।

তবু আমার মন বলছে এইখানটা একবার দেখে যাওয়াই ভাল। কথায় আছে যেখানে দেখবে ছাই...।

ওরা আবার স্কুটার নিয়ে এগিয়ে চলল সেই কেল্লাটার দিকে। চারদিকে

গাছপালা আর ঘন জঙ্গল। পাশেই বড় একটি পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়েই সানঘাগরার পথ। কেওনঝোড়ের একটি পিকনিক স্পট। কিন্তু আজ কোনও ছুটির দিন নয়। তাই এই পিকনিক করতেও কেউ আসবে না।

একসময় কেল্লার কাছে গিয়ে পৌঁছল ওরা।

কী ভীষণ জঙ্গল চারদিকে। আগাছায় ভরা।

ওরা এক জায়গায় ঝোপের আড়ালে স্কুটার রেখে একটা গাছের দুটো ডাল ভেঙে লাঠি করে আগাছা ঠেলতে ঠেলতে কেল্লার ভেতরে ঢুকল।

খণ্ডহর।

চারদিকেই কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। অতীতের স্থাপত্য। বর্তমানের স্মৃতি। ভাঙা কেল্লার ফাটল দিয়ে বট-অশ্বত্থের মাথাচাড়া।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা।

খেয়ালি বলল, ওই দেখো।

শিল্পা দু'চোখ মেলে দেখল এক জায়গায় পাতাচাপা দেওয়া বোমা রাখা আছে কতকগুলো।

আর এক জায়গায় দেখল চার-পাঁচটা মেশিনগান।

শিল্পা বলল, এ কোথায় এসে পড়লাম আমরা?

খেয়ালি হঠাৎ হিস্‌স্‌ করে থামতে বলল ওকে। দেখল দূরে এক জায়গায় কয়েকজন ভয়ংকর চেহারার লোক গোল হয়ে বসে কী যেন ফিস ফিস করছে নিজেদের মধ্যে।

খেয়ালি চাপাগলা বলল, এই লোকগুলোকে আমি চিনি। কাল যখন স্কুটার নিয়ে আসছিলাম, তখন দেখি না এরা দুর্দান্ত বেগে স্কুটার চালিয়ে আসছে। কিন্তু স্কুটারগুলো কই?

হয়তো ভেতরেই কোথাও রাখা আছে।

এরা এই জঙ্গলের মধ্যে কেন?

নিশ্চয়ই কোথাও ডাকাতি করতে যাবার পরিকল্পনা করছে এরা।

এই সময়ে পুলিশে একটা খবর দিতে পারলে ঠিক হয়। কিন্তু এ যা জায়গা এখানে ফোন পাব কোথায়?

এখন একটা কাজ করা যাক। এদের এই মেশিনগানগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে রাখি এসো। যাতে ওরা প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে না পায়।

বলামাত্রই কাজ।

দু'জনে চটপট আগ্নেয়াস্ত্রগুলো হাতে নিয়ে কেল্লার পেছনদিকে একটা গর্তের ভেতরে ফেলতে গিয়েই দেখল সেখানেই এক জায়গায় একটি মারুতি ভ্যান রাখা আছে।

শিল্পা বলল, ওই দেখো। সেই ভ্যানটা না? যেটা আমাদের চাপা দিতে আসছিল। এটা তো জয়রামের।

হ্যাঁ, তাই তো। তার মানে রীতিমতো গোলমেলে ব্যাপার।

নির্ঘাত ডাকাতির ষড়যন্ত্র।

আসলে জয়রামের সঙ্গে এই দলটার পুরোপুরি যোগসাজশ আছে। হয়তো জয়রামেরই পোষা গুন্ডা এরা। সম্ভবত কাল যখন আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওদের, তখন হয়তো আমাদের ব্যাপারটা ওরা জানত না।

ওরা আর দেরি না করে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো এত কাছাকাছি না রেখে, জঙ্গলের ভেতরে একটা গাছের ডালে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখল যাতে কারও চোখে না পড়ে।

খেয়ালি ওর ছুরিটা দিয়ে সেই গাছের গুঁড়িতে একটা ক্রশ চিহ্ন দিল। তারপর বলল, যেভাবেই হোক ভ্যানটাকে অকেজো করতে হবে। এই ছুরির ফলা দিয়েই সব চাকার হাওয়া খুলে দেব এখুনি।

ওরা সেই মতলবে যখন মারুতির কাছে এল, তখনই আর এক বিস্ময়। দেখল ভ্যানের মধ্যে বস্তাবন্দি কী যেন।

খেয়ালি বলল, নির্ঘাত সৌরভ। সে ছাড়া আর কেউ নয়।

ওরা আস্তে করে লক খুলে ভেতরে ঢুকে ছুরি দিয়ে বস্তার মুখ খুলতেই পেয়ে গেল সৌরভকে।

সত্যি! কী মারটাই না মেরেছে ছেলেটাকে। ওর চোখেমুখে কালসিটে পড়ে গেছে।

মুক্তি পেয়েই সৌরভ বলল, আমি কোথায়?

কেল্লা পাহাড়ে।

কেল্লা পাহাড়!

শিল্পা বলল, হ্যাঁ। সানঘাগরার নিম্নাচল। ওই পাহাড়ের মাথায় উঠলে তবেই যাওয়া যাবে সানঘাগরায়।

খেয়ালি বলল, তুমি এখানে কী করে এলে? তুমি যে গুম হয়েছ সে খবর আমরা এসেছি।

কিন্তু আমি এখানে আছি তোমরা জানলে কী করে?

আন্দাজে ভর করেই এসেছি এদিকে। তবে গ্যারেজের ছেলেটা আমাদের সবই বলেছে। ওরা তোমাকে একটা লরিতে তুলেছিল না?

হ্যাঁ। পরে লরি থেকে নামিয়ে এই মারুতিতে। এটা হচ্ছে ওই শয়তান জয়রামের।

খেয়ালি বলল, মনে হচ্ছে শয়তানটা কাছাকাছিই আছে।

শিল্পা বলল, ওই লোকগুলোর দলেই হয়তো আছে। আমরা দূর থেকে দেখেছি। কাছে গেলে হয়তো দেখতে পেতাম।

এখন তা হলে করণীয়?

সর্বাগ্রে এখান থেকে কেটে পড়া।

তার আগে মারুতির চাকাগুলোর হাওয়া তো খুলে দিই।

তোমরা কীভাবে এলে?

আমরা স্কুটার নিয়ে এসেছি। সেটা বাইরে একটা ঝোপের আড়ালে রাখা আছে।

সৌরভ বলল, খেয়ালি, তুমি না বলেছিলে তুমি মোটরগাড়িও চালাতে পার? তা যদি হয় তা হলে আমরা এটা নিয়েই তো পালাতে পারি।

শিল্পা বলল, পরেশদার স্কুটারের কী হবে?

যেমন আছে তেমনি থাকবে? আর খারাপ কিছু যদি হয় তখন দেখা যাবে।

খেয়ালি বলল, তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়। তবে কি না মোটর চালানোয় আমার দক্ষতা খুব একটা নেই। অ্যাকসিডেন্ট হবার ভয়। অবশ্য এখান থেকে ওটাকে আমি বের করে নিয়ে যেতে পারব।

সৌরভ বলল, তা হলেই হবে। এখন দেখো গাড়ির চাবিটা লাগানো আছে কি না। যদি চাবি দেওয়া থাকে, তা হলে চাকার হাওয়া খুলে দিতে হবে। আর তা যদি না থাকে তা হলেই গাড়ি নিয়ে সটকান।

খেয়ালি এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গেল মারুতিটার দিকে। গিয়ে দেখে বলল, এই, আছে আছে। চাবিটা লাগানোই আছে। তারপর বলল, তবে আমার মনে হয় আমাদের স্কুটার নিয়েই পালানোই ভাল। তার কারণ ওটা আমার দারুণ কনট্রোলে।

সৌরভ বলল, আসলে কেন আমি মারুতিটা নিয়ে পালাতে চাইছি জানো? আমার মনে হচ্ছে মারুতিটাকে রাস্তায় বের করে এক জায়গায় রেখে কোনওরকমে যদি এদের মৌচাকে একটা ঢিল মারতে পারি, আর ওই শয়তানটাকে যদি বাগে পাই তা হলে ওকেই এই বস্তায় পুরে রেখে আসব সানঘাগরায়।

খেয়ালি আনন্দের উচ্ছ্বাসে নেচে উঠল, ঠিক বলেছ তুমি। বেস্ট আইডিয়া। আ— পারে রাম— পাম, পাম পাম।

ওরা সেই পরিকল্পনা করে যেই না ঢুকে বসেছে গাড়িতে, অমনি দূর থেকে জয়রামের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা, এই! এখানে এই স্কুটার কোত্থেকে এল রে? কে রাখল এখানে?

কেল্লার ভেতরে যে লোকগুলো ছিল তারাও সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল দেখতে।

বাইরে এসে স্কুটার দেখেই বলল, সর্বনাশ! কোনও স্পাই লেগে যায়নি তো?

অসম্ভব কিছু নয়। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে থানা-পুলিশ করেছে। তা ছাড়া মেয়েটার চেঁচানিতে আর একটু হলেই ধরা পড়তাম পুলিশের হাতে।

তুমি যা করলে রাগের মথায় দিনদুপুরে, ওইরকম কেউ করে?

আসলে কী জানিস, মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গেল। মেনোর চোখে ছুরি মেরে মেয়েটা যা করেছে না, বরাবরের জন্য চোখটাই নষ্ট হয়ে গেল ওর।

এখন তা হলে কী করব বলো?

যন্তর নিয়ে রেডি হয়ে যা। কেমন যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

কেল্লার ভেতর থেকে তখন কে যেন একজন চেঁচিয়ে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে জয়দা। সমস্ত যন্তর হাপিস।

বলিস কীরে!

একটাও কিছু নেই।

মারুতির ভেতর থেকে সৌরভ চেঁচিয়ে বলল, হল্ট। যে যেখানে আছ সে সেইখানেই থাকো। একদম নড়বে না।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিক। লোকগুলো যে যেদিকে পারল দৌড়ল। দু'-একজন বোধ হয় লুকিয়েও পড়ল গাছের আড়ালে।

চারদিকে অসীম নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল তখন। যেন হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। খেয়ালি গাড়ি স্টার্ট দিতেই, জয়রামের মনে পড়ল গাড়ির কথা। আর তখনই মনে হল, পুলিশের লোক হলে তো আত্মপ্রকাশ না করে, এইভাবে গাড়ি নিয়ে পালাবে না। তাই সে নিজমূর্তি ধরল এবার।

নিজেরই গুপ্তস্থান থেকে রিভলভারটা বের করে ছুটে এল গাড়ির দিকে।

খেয়ালি ততক্ষণে মারুতিটাকে বের করে এনেছে জঙ্গলের ভেতর থেকে।

সেই না দেখেই তো ফেটে পড়ল জয়রাম। মারুতিটা লক্ষ করেই ট্রিগার টিপল টিসুম।

গুলিটা ওদের না লেগে গাড়ির বডিতে লাগল।

খেয়ালি তখন কী ভেবে যেন বেগে গাড়িটা চালিয়ে দিল জয়রামের দিকে।

জয়রামেরও এবার পালানোর পালা।

কিন্তু ততক্ষণে বিপদ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। অনভ্যস্ত হাতে গাড়ি চালাতে গিয়ে গাড়িটা একটা শাল গাছের গুঁড়িতে গিয়ে জোরে ধাক্কা দিল।

এবার যে অবস্থাটা কী হবে তা ওরা জানে।

জয়রামের হাতে তখন উদ্যত রিভলভার।

সৌরভ বিপদ বুঝেই এক পাশের দরজা খুলে লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে।

নেমেই অব্যর্থ একটা পাথরের টিপ শয়তানের মুখে।

জয়রাম হায় রাম বা রামে রাম বলল না বটে, তবে কিছু একটা বলল। বলেই বসে পড়ল ঘাসের ওপর।

ওরা সবাই তখন ছুটে গিয়ে চেপে ধরল ওকে।

খেয়ালি তো প্রথমেই ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিল। নিয়েই মুখের ওপর জুতোসুদ্ধ এক লাথি।

মেয়েদের লাথিও ঠিক জায়গা মতো পড়লে সুস্বাদু লাগে না। তাই লাথি খেয়েই গাঁক করে উঠল জয়রাম।

সৌরভ বলল, কেমন লাগল দাদা? এটা হল পাটিসাপটা। এবার আসকে পিঠে বা ইডলি কেমন লাগে দেখো। বলেই বলল, আবছা একটু নলেন গুড় মাখিয়ে দিই। সকালে তুমি অনেক খানা খাইয়েছিলে, এখন তোমাকেও অনেক— অনেক খাওয়াব। এই কথা বলেই খানিকটা পিছিয়ে এসে সৌরভ জোড়া পায়ে লাফিয়ে পড়ল ওর গায়ের ওপর।

জয়রাম হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল, সহ্য করতে না পেরে।

খেয়ালি তখন ওর চুলের মুঠি ধরে তুলে বসাল।

সৌরভ বলল, তুমি শোলে দেখছ দাদা?

জয়রাম বলল, হিন্দি সিনেমা আমি দেখি না।

তা হলে এই সমস্ত ফিল্মি টেকনিক তুমি কোত্থেকে শিখলে গুরু? যাক। এবার তোমাকে একটু রাধাবল্লভি খাওয়াই। তার সঙ্গে কষা মাংস। বলেই তার মাথাটা ধরে দুম দুম করে ঠুকতে লাগল একটা গাছের গুঁড়িতে।

এতক্ষণ মাতৃভাষা ফুটে বেরোল মুখ দিয়ে, মরি জীব রে।

সকালে আমাকে যখন মেরেছিলে আমিও তখন মরে গিয়েছিলাম। এখন মরে ভূত হয়ে ভূতের নাচ নাচছি। তুমিও ভূত হয়ে নাচবে।

খেয়ালি সৌরভকে বলল, অনেক হয়েছে। এখন দেব ব্যাটাকে একটা গুলিতে শেষ করে?

জয়রাম সঙ্গে সঙ্গে না না করে উঠল।

সৌরভ বলল, না না মারবে কী? ওর বন্ধু চিতাটা বড়ই ক্ষুধার্ত। ওকে ওই বস্তাতে পুরেই নিয়ে চলো সানঘাগরায়। যেভাবে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেইভাবে।

খেয়ালি হাঁক দিল, শিল্পা! বস্তাটা নিয়ে এসো তো, শিগগির। দেরি কোরো না একদম।

কিন্তু কোথায় শিল্পা? তার কোনও সাড়াশব্দই নেই, এমন কি চিহ্নও নেই কোথাও।

সৌরভ চেঁচাল, শিল্পা—। তুমি কোথায়?

খেয়ালি বলল, তুমি যেখানেই থাকো, চলে এসো শিগগির।

জয়রাম তখন পালাতে যাচ্ছে।

সৌরভ চকিতে একটা পা গলিয়ে দিল ওর পায়ে। যেই না দেওয়া অমনি মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

পড়া মানে মোক্ষম পড়া যাকে বলে। একেবারে নাকমুখ থেঁতো হয়ে গেল। একটা দাঁতও মজবুত হয়ে গেল বোধহয়।

যাই হোক! মারুতির ভেতর থেকে বস্তাটা বের করে ওরা বহু কষ্টে জয়রামকে ঢুকিয়ে দিল তার ভেতর। তারপর বস্তার মুখ বেঁধে বলল, আমাদের উচিত ছিল তোমার হাত পাও বেঁধে দেওয়া। কিন্তু অত দড়ি তো নেই। তবে হাতে লাঠি আছে। ছটফট করলেই কিন্তু তুলো ধুনব।

সৌরভের হাতে লাঠি।

খেয়ালির হাতে রিভলভার। যদিও চালায়নি কখনও, তবুও ধরে রইল এমনভাবে যা দেখলে মনে হবে দিল বুঝি।

ওরা তন্ন তন্ন করে শিল্পাকে খুঁজতে লাগল চারদিকে। কিন্তু কোথায় সে? কতবার নাম ধরে ডাকল। কিন্তু এই নির্জনে ওদের ডাক প্রতিধ্বনিই হয়ে ফিরল। কোনও প্রত্যুত্তর এল না।

সৌরভ হঠাৎ এক পাশে শিল্পার এক পাটি চটি পড়ে থাকতে দেখল। দেখেই বলল, কিডন্যাপড!

তার মানে?

নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়েছিল ধারেকাছে। আমাদের অসতর্কতার মাঝেই নিয়ে পালিয়েছে ওকে।

এই দারুণ বিপদে কী যে করবে ওরা কিছুই ভেবে পেল না। যাদের আশ্রয়ে এসে ওঠা ওদের জন্য তাদেরই যদি ক্ষতি হয় তো, এর চেয়ে লজ্জার আর কী আছে? কিন্তু কখন কীভাবে নিয়ে গেল ওকে? ওদের চোখের সামনে দিয়ে?

এই নির্জন প্রান্তরে ওরা তাই অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

এগারো

খেয়ালি চেয়ে রইল সৌরভের দিকে। সৌরভ খেয়ালির দিকে। এমন প্রকাশ্য দিবালোকে এ কী অঘটন! এও কি সম্ভব?

সৌরভ বলল, শিল্পাকে না নিয়ে বাড়ি ফিরছি না কিন্তু।

খেয়ালি বলল, তাই কি ফেরা যায়? এর চেয়ে ওরা যদি আমাকে নিয়ে যেত তা হলে দুঃখের কারণ ছিল না কিছু। কিন্তু আমরা যে বেনোজল। একটি শান্তসুন্দর পরিবেশে এসে এ কী বিপর্যয় ঘটালাম এক সুখী পরিবারের মধ্যে।

সৌরভ দু'হাতে কপাল চেপে ধরে বলল, ওরা ওকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?

সানঘাগরার জঙ্গল ছাড়া এখানে আর লুকনোর জায়গা কোথায়?

তবে সেখানেই যাই চলো।

খেয়ালি বলল, চলো তবে। বলেই স্কুটারে গিয়ে উঠল।

সৌরভ বলল, আমরা চলে গেলে এই শয়তানটার কী হবে?

ওর জন্যই তো এই বিপদ। দাঁড়াও এখন ওর ব্যবস্থাও করছি। গাড়ির ভেতরে দেখো তো, আর কোনও দড়িটড়ি আছে কি না, যদি থাকে তো নিয়ে এসো।

সৌরভ মারুতি ভ্যানের এদিক সেদিক হাতড়ে অনেক দড়ি পেল।

সেই দড়ি নিয়ে এলে খেয়ালি বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সেটাকে স্কুটারের পেছনদিকে বাঁধল, তারপর স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে খানিকটা নিয়ে এসে বলল, এভাবে নিয়ে গেলে মরে যাবে কিন্তু। সানঘাগরা তো বেশি দূর নয়। ওকে স্কুটারেই তোলো। তারপর তুমি আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াও। দেখি এইভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি কি না।

কিন্তু না, বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই ব্যালান্স রাখা গেল না।

খেয়ালি বলল, এক কাজ করি। একবার চেষ্টা করেই দেখি মারুতিটাকে আনতে পারি কি না। গাড়িটা ধাক্কা লেগেছে ঠিক, কিন্তু আর সব তো ঠিক আছে। বলে একটু পিছিয়ে গিয়ে গাড়িটাতে স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আনল সেটাকে।

তারপর ধরাধরি করে বস্তাবন্দি জয়রামকে ভেতরে ঢুকিয়ে জোরে স্টার্ট দিল গাড়িতে।

গাড়ি স্পিড নিতেই ভয় পেয়ে গেল খেয়ালি। বলল, কেলেঙ্কারি হয়েছে। ব্রেক ধরছে না যে।

কী হবে তা হলে?

ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাব। তবে সাবধান! সানঘাগরার কাছাকাছি গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেব কিন্তু।

তা আর করতে হল না। পাহাড়ে ওঠার মুখেই গাড়িটা টার্ন নিতে গিয়ে আপনিই থেমে গেল।

খেয়ালি বলল, শিল্পা বলেছিল এই পাহাড়ের ঘাটগুলো পেরিয়ে ওপরে উঠলেই সানঘাগরা। তা যদি হয় তা হলে এই আধমরাটাকে টানতে টানতে ওখানেই নিয়ে যাই চলো।

ওরা বহু কষ্টে সেই বস্তাটাকে টেনে টেনে নিয়ে চলল সানঘাগরায়।

বস্তার ভেতর থেকে তখন চাপা একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। ঘর্ষণে ঘর্ষণে জয়রাম তখন রাম রাম করছে।

সৌরভ বলল, খুব লাগছে নাকি দাদা? আহা। মরে যাইরে। এখন একটু কষ্ট করো, এরপরে মরণঘুমে এমন ঘুমোবে যে সে চোখ আর মেলবে না।

একসময় সানঘাগরায় পৌঁছে গেল ওরা। জায়গাটা যে সানঘাগরাই সেটা আর বলে দিতে হল না কাউকে। কেন না একটা ফলকে ইংরেজিতে লেখাই আছে জায়গাটার নাম।

ভারী মনোরম! কিন্তু নির্জন! এমনই নির্জন যে ভয় হয়। কী জানি কী হয়!

সৌরভ বলল, এটাকে এখন রাখি কোথায়?

কোথাও রাখারাখির দরকার নেই। টেনে নিয়েই চলো।

তাই চলল ওরা। যতটা যাওয়া যায়।

একসময় এক বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মধ্যে এসে পৌঁছল ওরা। পাহাড়ের মাথার ওপরে সে এক অনবদ্য প্রকৃতির রূপ। তৃণভূমির চারপাশে বৃত্তাকারে গাছের সারি। আশপাশে শুধু পাহাড়— আর পাহাড়চূড়া। ছোট ছোট অনেক গুহাও আছে। কিন্তু এইসব গুহায় লুকিয়ে থাকার মতো কোনও জায়গা নেই।

ওরা সেখানেই ছোট্ট একটা গুহার জঠরে ঢুকিয়ে রাখল বস্তাটাকে।

খেয়ালি বলল, একদম নড়া চড়া করছে না যে। মরে গেল নাকি?

মরুক। কিন্তু এই যদি সানঘাগরা হয় তা, হলে সেরকম তো ভয়াবহ কিছু নয়।

এমন সময় ওরা একটা জলপ্রপাতের শব্দ শুনে সেইদিকে এগোল।

একটা পাহাড়িয়া নদী জঙ্গলের ভেতর থেকে এঁকেবেঁকে এসে একটি মনোরম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে এখানে।

কয়েকজন আদিবাসী মেয়েপুরুষ সেই নদীর জলে কাপড় কাচছে। ওরা ফিরেও তাকাল না ওদের দিকে।

খেয়ালি তাদের জিজ্ঞেস করল, এইটাই সানঘাগরা তো?

তারা খুব গম্ভীর। তবু বলল, হ।

এখানে একটু আগে কাউকে দেখেছ?

ওরা নিজেদের মধ্যে একবার চোখ চাওয়াচাওয়ি করে ইশারায় ওদের নীচের

দিকে যেতে বলল। বলেই কেমন যেন ভয় পেয়ে কেটে পড়ল ওরা।

সৌরভ বলল, কীরকম হল?

জানি না। তবে এটুকু বুঝছি সানঘাগরা সত্যিই আতঙ্কময়।

সৌরভ তখন জল যেখান থেকে নীচে পড়ছিল সেইখানে গিয়ে উঁকি মেরেই বলল, খেয়ালি! শিগগির এসো! ওই দেখ।

ওর কথা শুনে খেয়ালিও এসে ঝুঁকে দেখল নীচের দিকে। দেখে বলল, উঃ ভগবান।

ওরা দেখল নীচে একটা পাথরের ওপর অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে শিল্পা। ওর চারপাশে চাপ চাপ রক্ত। ও কি এখান থেকে পড়ে গেছে? না ফেলে দেওয়া হয়েছে ওকে? বেঁচে আছে তো?

কিন্তু শিল্পা এখানে কীভাবে এল? ওরা কীসে করে নিয়ে এল ওকে?

হঠাৎই পাহাড়ের খাঁজে এক জায়গায় চার-পাঁচটা মোটর বাইক চোখে পড়ল ওদের।

ওরা আর কোনওদিকে না তাকিয়ে পথ খুঁজতে লাগল কীভাবে ওখানে নামা যায়? একটা পথ সরু হয়ে এক জায়গায় বেঁকে গেছে দেখে ওরা সেইদিকে চলল। কিন্তু খানিক গিয়েই বুঝল পথ এটা নয়। এখানে শুধুই খাদ।

খেয়ালি বলল, পথ নিশ্চয়ই আছে। না হলে ওখানে ও গেল কী করে?

ওপর থেকে ফেলে দেয়নি তো?

অসম্ভব কিছু নয়। না হলে অত রক্ত ওখানে কী করে এল? সবচেয়ে আশ্চর্য! অরবিন্দকাকু থানায় গেলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশের পাত্তা নেই!

হয়তো এসে ঘুরে গেছে। আর সেইজন্যে জনপ্রাণীও নেই এখানে। তাই বোধহয় আদিবাসীরা আমাদের কথা শুনে ভয়ে পালাল।

হবেও বা।

হঠাৎ এক জয়গায় এসে ওরা নীচে নামার পথ পেয়ে গেল।

সৌরভ বলল, এই তো পেয়ে গেছি।

আমরা ভুল করে ওপরের অংশে গিয়ে পড়েছিলাম। এখানে উচিত ছিল ট্যুরিস্টদের জন্য একটু পথনির্দেশ দিয়ে দেওয়া।

ট্যুরিস্ট এখানে আসে বলে মনে হয় না।

কেন আসে না বলো তো? এমন সুন্দর জায়গা!

কী করে আসবে? কোনও গাইডবুকেই তো এর উল্লেখ নেই। অথচ কী সুন্দর একটা বেড়াবার জায়গা।

আমরা যদি ভিডিয়ো নিয়ে এখানে আসি, তা হলে এই সানঘাগরাই হবে আমাদের আসল স্পট। কিন্তু সৌরভ, এ যা জায়গা, এখানে তোমরা বসবাস

করতে পারবে বলে তো মনে হয় না। থাকার জন্য সুন্দর প্রকৃতি হলেই হল না, জায়গাটাও নিরাপদ হওয়া চাই।

জায়গার দোষ কী? এখন আমাদের ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটল এ সবই তো বহিরাগতদের ব্যাপার। যাই হোক, পুলিশ আসুক-না-আসুক আমরা এদের ঘাঁটিটা কিন্তু চিনে যাব।

ওরা ধীরে ধীরে যেখানে নেমে এল, ওপরের জল সেখানে ভয়ংকর গর্জনে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ছে। অজস্র জলকণায় ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে জায়গাটা। কিন্তু ওদের এখন সেইসব দেখার সময় নেই। ওরা দু'জনেই ছুটে গেল শিল্পার কাছে। তারপর ওকে চিৎ করে শুইয়ে ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। কী ঠান্ডা বরফের মতো জল! কিন্তু এত রক্ত কীসের? দেখে মনে হল ওর তো চোটই লাগেনি কোথাও।

অনেক পরে একটু একটু করে চোখ মেলল শিল্পা। চোখ মেলে ওদের দেখেই বলল, এ কী তোমরা! উঃ কী ভয়ানক।

কেন? কী হয়েছে? তুমি এখানে এলে কী করে?

তোমরা যখন জয়রামের সঙ্গে লড়ছ, ঠিক তখনই একটা বড় গাছের আড়াল থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে শক্ত হাতে মুখ চেপে ধরল আমার।

তারপর?

এমনভাবে চেপে ধরল যে আমি চেঁচাতেও পারলাম না। লোকটা আমাকে ওই অবস্থায় পিছু হেঁটে কেল্লার পেছন দিকে নিয়ে গেল। সেখানেই মোটর বাইকগুলো রাখা ছিল ওদের। তারই একটা নিয়ে চলে এল এখানে।

তারপরে কী হল? ওরা কি ওপর থেকে ফেলে দিল তোমাকে? কিন্তু সেরকম বলে তো মনে হচ্ছে না।

না ওরা যখন আমাকে এখানে নিয়ে এল, তখন দেখি না ওদের দলের সেই সব পালিয়ে যাওয়া লোকেরা এখানে বসে বসে নেশা করছে।

তাই নাকি?

তারপর ওরা খুব আজে বাজে আলোচনা করতে লাগল আমাকে নিয়ে। এমন সময়...।

এমন সময় হঠাৎ বড় একটা পাথর এসে পড়ল ওদের একজনের ওপর। লোকটা ধড়ফড়িয়ে মরে গেল।

লাশ কই তার?

বাকি লোকগুলো তাকে আরও নীচে জঙ্গলের দিকে নামিয়ে নিয়ে গেছে। সেই ভয়াবহ দৃশ্য আর রক্ত দেখেই আমি জ্ঞান হারালাম।

তা না হয় হল। কিন্তু পাথর ছুড়ে ওদের মারল কে?

জানি না। তবে আর এখানে নয়, এক্ষুনি পালিয়ে চলো এখান থেকে।

এমন সময় হঠাৎ একটা ছায়া দেখা গেল। ওপর থেকে নীচে।

সৌরভ একটু পিছিয়ে এসে দেখেই বলল, নির্ঘাত পুলিশের লোক, খাঁকি পোশাক। তারপর খেয়ালিকে বলল, তুমি ছুটে ওপরে উঠে গিয়ে পুলিশকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি এর কাছেই আছি।

শিল্পা বলল, আমি যেতে পারব। কাউকেই ডাকতে হবে না আর। এক সঙ্গেই যাই চলো।

তা হোক, পুলিশকে আসতে দাও। ওরা আসুক, দেখুক। তুমি সব কথা বলো। নীচের লোকগুলো ফিরে এলেই যাতে ওদের অ্যারেস্ট করা হয়, সেই ব্যবস্থা করে তবেই আমরা ওপরে যাব।

খেয়ালি দ্রুত উঠে গেল ওপরে।

সৌরভ শিল্পাকে বলল, কী অনবদ্য প্রকৃতি এখানে। অথচ দুঃখের ব্যাপার এই, আমরা এমন জালে জড়ালাম যে কিছুই অনুভব করতে পারলাম না এর।

তাতে কী? আবার আসব আমরা।

হঠাৎ খেয়ালির আর্তস্বর ভেসে এল ওপর থেকে, বাঁচাও— ও— ও—। বাঁচাও— ও—। সৌরভ...।

কী হল। কী হল খেয়ালির?

ততক্ষণে চার পাঁচজন দুর্ধর্ষ শয়তান এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর। এরা তারাই। কিন্তু খেয়ালি অমন চেঁচাল কেন? কী হল তার? সেও কি এদেরই কারও হাতে পড়েছে? হয়তো বা। ওরা তখন ওদের দু'জনকে পাঁজাকোলা করে পাহাড়ি পথ ধরে ক্রমশ নীচের দিকে নামতে লাগল।

বারো

পুলিশ কিন্তু চুপচাপ বসে ছিল না। অরবিন্দবাবুর কথা মতো সব কিছু ডায়েরিতে লিখে নিয়েই বলল, আপনি নিশ্চিন্তে ঘরে যান। আমরা আপনাদের ছেলেমেয়ে উদ্ধার করে পৌঁছে দিয়ে আসব বাড়িতে। তবে কিনা মুশকিল হয়েছে, আমরা গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি একটা দল ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছে এখানে একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি করবার। আর সেইজন্যই খুব বেশি ফোর্স আমরা এই কাজে ব্যবহার করতে পারছি না। আগের দিন আমরা সানঘাগরা তোলপাড় করেছি। কিন্তু কোনও হদিসই পাইনি ডাকাত দলের। আজ ভোরেও একটা দল গিয়ে টহল দিয়ে এসেছে। তাই আমাদের মনে হচ্ছে, সানঘাগরায় নয়, ওরা ওকে

গোনাসিকার দিকেই নিয়ে গেছে। কিন্তু সে জায়গাটা এত দূরে যে সেখানে ফোর্স পাঠালে কেওনঝোড় উইক হয়ে পড়বে। আর সেই সুযোগে ওরাও এখানে এসে অবাধে ডাকাতি করবার সুযোগ নেবে। সেই কারণেই এই চালটা চেলেছে ওরা। না হলে দিনদুপুরে কেউ প্রকাশ্য রাজপথ থেকে ছেলেটাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়?

অরবিন্দবাবু বললেন, যাতে ভাল হয় তাই করুন স্যার।

ঠিক আছে, আপনি যান। আমরা দেখছি।

পুলিশ ইনস্পেক্টর এবার কয়েকজন পুলিশকে পাঠিয়ে দিলেন খোঁজখবর নিতে।

সশস্ত্র পুলিশের ছোট্ট একটি বাহিনী এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে রওনা হয়ে গেল। প্রথমে সানঘাগরায় এল তারা। কিন্তু না, কাউকেই পেল না এখানে। সানঘাগরার গেট সকাল ন'টার আগে খোলে না। তায় আজকে বে-বার। তাই লোকজনও নেই। এখানে গেট খোলবার যে লোক থাকে, কাছেই তার ঘর। সেও বলল সন্দেহজনক কাউকেই সে দেখেনি। এমনকী গত দু'দিনে এখানে বেড়াতেও আসেনি কেউ। তাই তারা জিপ নিয়ে গোনাসিকাতেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পুলিশ ফিরে আসছিল এই পথে।

এমন সময় দেখল গেটকিপার রাজু রাজপথে এসে গামছা নেড়ে নেড়ে গাড়ি থামাবার সংকেত দিচ্ছে।

পুলিশের গাড়ি থামতেই রাজু বলল, হুজুর, আপনারা চলে যাবার পরে আমি গেট খুলে রেখে একটা পাগলকে তাড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি একটা মেয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। আমি তাকে ধরে আমার ঘরে আটকে রেখেছি।

পুলিশের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল সেই ঘরে।

খেয়ালি তখন ঘরের ভেতর থেকে ভীষণ চিৎকার করছে।

ইনস্পেক্টর শিকল খুলতেই বেরিয়ে এল সে। তারপর সামনে পুলিশ দেখেই চুপ করে গেল।

ইনস্পেক্টর বললেন, এ কী! চেঁচাচ্ছ কেন?

এই লোকটার খাকি ড্রেস দেখে আমরা পুলিশের লোক ভেবে ওর সাহায্য চাইতে আসছিলাম। তার জায়গায় লোকটিই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। তাই আমি একে ডাকাতের লোক মনে করেছি।

ইনস্পেক্টর বললেন, মাই গড। তারপর গেট কিপারকে বললেন, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি একদমই লোপ পেয়ে গেছে? কোনও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই এই নৃসিংহ অবতারের মতন চেহারাটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে ওর ওপর।

লোকটি বোকা বোকা মুখে বলল, কেন হুজুর! আপনি তো বলেইছিলেন কাউকে পেলেই আটকে রাখতে।

তোমার মুণ্ডু। তারপর খেয়ালিকে বললেন, তুমি কে মা! তোমার ব্যাপারটা কী?

খেয়ালি তখন সকালের পর থেকে সেই ঘটনার কথা সমস্ত খুলে বলল পুলিশকে।

ইনস্পেক্টর তো লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, বলো কী! আরে! ওই দলটাকেই তো খুঁজছি। আমরা এদিকে সানঘাগরা আর গোনাসিকা করছি অথচ ওরা ছিল চোখের সামনেই ওই ভাঙা কেল্লার ভেতর? তা ওদের সেই প্রধান পাণ্ডা জয়রামের বাচ্চাটা কই?

জয়রামের বাচ্চা কেন? জয়রামই তো।

ওই হল। কোথায় সেটা।

বস্তাবন্দি করে রেখে এসেছি ওইদিকে।

চলো তো দেখি?

আগে আমার বন্ধুদের দেখবেন চলুন।

নিশ্চয়ই দেখব মা। কিন্তু সর্বাগ্রে ওই শয়তানটার হাতে হাতকড়া পরাতে চাই। তারপর রাজুকে বললেন, পাগল তাড়াতে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ওই-ওইদিকে তাড়িয়ে দিয়েছি। পাগলটার অদ্ভুত একটা রোগ এই যে, সে ওই ওপর থেকে দাঁড়িয়ে বড় বড় পাথর নীচে ফেলে।

সর্বনাশ! কোনওদিন তো কোনও ট্যুরিস্টকেই মেরে বসবে।

শুধু তাই নয়। নিজেও এক একসময় লাফিয়ে পড়তে যায়। যেখানে সেখানে নোংরা করে।

খেয়ালি বলল, এইবার বুঝেছি এই পাথরের ঘায়েই মরেছে লোকটা। কী ভাগ্যিস শিল্পাকে লাগেনি।

যাই হোক, পুলিশ গিয়ে বস্তার ভেতর থেকে আহত এবং ক্ষতবিক্ষত সংজ্ঞাহীন জয়রামকে টেনে বের করল। তারপর ওই অবস্থাতেই তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে ফেলে রাখল গাড়ির ভেতর।

ইনস্পেক্টর দু'জন পুলিশকে বললেন, তোমরা বন্দুক নিয়ে রেডি থাকো। না হলে ওর দলের লোকেরা এসে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বলে বাকি দু'জনকে নিয়ে খেয়ালির সঙ্গে নীচে নামলেন।

কিন্তু কোথায় কে? কেউ তো নেই। তবে কী আবার ওরা শত্রুর কবলে পড়ে গেল? নাকি নিজেরাই চলে গেল এখান থেকে?

ইনস্পেক্টর কনস্টেবলদের বললেন, তোমরা খোঁজাখুঁজি করো। আমি

ততক্ষণে হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দিই জয়রাম অ্যারেস্ট হয়েছে বলে।

খেয়ালির দু'চোখ তখন জলে ভরে এল।

কনস্টেবলরা অনেক চেষ্টা করেও আর নীচে নামার কোনও পথই দেখতে পেল না।

এদিকে হয়েছে কী, সেই লোকগুলো শিল্পা ও সৌরভকে নিয়ে তাদের পথ ধরে আরও নীচে নামল। আসলে কয়েক ধাপ পাথরে পা নিয়ে নেমে একটু লাফিয়ে পড়তে হবে জঙ্গলের দিকে। এবার খুব ঢালু পথ বেয়ে একটু নামতে হবে নীচে। নামার কোনও পথ নেই। কিন্তু উপায় আছে। জঙ্গলের পাহাড়িরা এ পথ জানে, তবে পুলিশ বা অন্যান্য বহিরাগতদের এ পথ যাতায়াতের অসাধ্য।

ওদের নিয়ে নীচে নামতে দুষ্কৃতীরা একটুও বেগ পেল না। তার কারণ সৌরভ বা শিল্পা শান্ত-সুবোধ শিশুটির মতন ওদের বাধ্য হয়ে রইল। কেউ কোনওরকম বাধা দিল না।

সৌরভ ছটফট করছে না বা বাধা দিচ্ছে না দেখে, শিল্পাও নিথর হয়ে রইল।

এইরকম থাকার একটাই কারণ এই যে এই অবস্থায় ছটফট করলে একেবারে খাদে গিয়ে পড়তে হবে। ফলে মরতে হবে দু'পক্ষকেই। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে গেলে আস্তানাটাও চেনা হয়ে যাবে।

নীচে নামতে নামতে ওরা এমন একটা জায়গায় এসে পড়ল একসময় যেখানে সানঘাগরার জলধারা একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। কী ভীষণ ব্যাপার সেখানে!

পাশেই একটি গুহামুখ। সেটাকে দেখে মনে হল গুহাটা প্রকৃতির দান হলেও এটিকে ব্যবহারের প্রয়োজনে একটু ঘিরে ঘুরে কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। সামনেই ঘন ঝোপঝাড়। তাই বাইরে থেকে দেখলে কেউ বুঝবেও না গুহার প্রকৃত অবস্থান কী এবং তার মুখটা কোনদিকে।

ওরা ওদের দু'জনকে নামিয়ে রেখে বলল, তোদের মতো ছেলেমেয়ের মায়ের কোল কী করে শূন্য করতে হয় এবার দেখ। এখানেই একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পেট্রল ঢেলে একটা দেশলাই কাঠি ধরিয়ে দেব শুধু। তোরা পুড়ে মরবি। আমরা দেখব।

শিল্পা ডুকরে কেঁদে উঠল এবার। বলল, কেন গো আমরা তোমাদের কোন ক্ষতিটা করেছি?

তোরা আমাদের বিরাট একটা পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছিস। তা ছাড়া তোদের বাঁচিয়ে রাখলেও বিপদ আছে, কেন না তোরা চিনে ফেলেছিস আমাদের।

পাঁচজনের দু'জন রইল ওদের কাছে।

দু'জনেই শক্ত করে ওদের দুটো হাত ধরে রইল।

সৌরভ দেখল পালাবার কোনও পথ নেই এখান থেকে। কিন্তু এইভাবে মৃত্যুকেও তো বরণ করে নেওয়া যায় না।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একদল বাঁদর সে কী ভীষণ দাপাদাপি শুরু করে দিল সেখানে।

লোকদুটো ওদের ছেড়ে যেই না বাঁদরগুলোকে তেড়ে গেল, অমনি তাদের যত রাগ গিয়ে পড়ল ওই লোকগুলোর ওপর।

ততক্ষণে গুহার ভেতর থেকে বাকি তিনজন বেরিয়ে এসেছে হইচই শুনে।

যার হাতে পেট্রলের টিন ছিল, তার হাত থেকে সেই টিন উলটে গিয়ে কী কেলেঙ্কারি। চারদিকে ছড়িয়ে গেল পেট্রল। এদিকে বাঁদরের আঁচড় কামড়ে অবস্থা এমনই শোচনীয় হল তাদের, যে ধুলোয় পড়ে সেই পেট্রল গায়ে মাখামাখি হয়ে একাকার হয়ে গেল।

সৌরভ বলল, এমন সুযোগ আর হবে না শিল্পা। তুমি পালাও। আমি দেখছি কী করা যায়।

পালাবে কী? মেয়েটা তখন সভয়ে জাপটে ধরেছে সৌরভকে।

সৌরভ বলল, এ কী করছ? ছাড়ো ছাড়ো। ভয় পেলে কী করে হবে? আমাকে শুধু একটা কাজই করতে দাও এখন। সেই কাজ সম্পন্ন হলেই সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হব আমরা। সানঘাগরায় কোনও আতঙ্ক আর থাকবে না।

শিল্পা ছেড়ে দিল সৌরভকে।

সৌরভ ওর একটা হাত ধরে বলল, তোমার যদি খুব ভয় করে তবে আমার সঙ্গে এসো। বলেই পেট্রল বাঁচিয়ে গুহার দিকে এগোল ওরা।

শিল্পা বলল, তোমার কী মাথাখারাপ হয়েছে? এই শত্রুপুরীতে কেউ ঢোকে না?

এখন এখানেই ঢুকতে হবে। তারপর দেখোই না কী করি।

সৌরভ শিল্পাকে গুহার মধ্যে রেখে এদিক সেদিক হাতড়াতেই একটা দেশলাই পেয়ে গেল। তারপর সেই কাঠিটা ছড়িয়ে থাকা পেট্রলে ধরিয়ে দিতেই মহা কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপারে যাকে বলে।

বাঁদরগুলো তো লাফিয়ে লুফিয়ে পালালো। শুধু পালাল নয়, একেবারে উধাও হয়ে গেল এই অঞ্চল থেকে। কেন না আগুনে ওদের বড় ভয়।

আর সেই পঞ্চতস্কর?

ছড়িয়ে পড়া আগুনের হাত থেকে তারা কেউই রক্ষা পেল না। লেলিহান অগ্নিশিখা তাদের শরীর স্পর্শ করে জ্বালিয়ে মারতে লাগল তাদের, কিন্তু সেই আগুনকে অতিক্রম করে সৌরভ ও শিল্পাও পালাতে পারল না গুহার ভেতর থেকে। কী আগুন! কী আগুন!

শুকনো লতাপাতায় আগুন ধরে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল একটা।

ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। সেই ধোঁয়ায় দম যেন বন্ধ হয়ে এল। শিল্পা আবার শক্ত করে চেপে ধরল সৌরভকে। ওরা ক্রমশ গুহার শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল। বাইরের বাতাস ভেতরে না আসায় নিস্তেজ হয়ে পড়ল ওরা। একসময় দু'জনেই লুটিয়ে পড়ল সেখানে।

বাঁদরের দাপাদাপি, লোকগুলোর চিৎকার আর এই লেলিহান অগ্নিশিখাই পথ চিনিয়ে পুলিশবাহিনীকে নামিয়ে আনল সেখানে।

জয়রামের গ্রেফতার হওয়ার খবর পেয়েই ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ সেখানে এসে হাজির।

শিল্পা আর সৌরভকে গুহার ভেতর থেকে বের করে যখন ওপরে ওঠানো হল তখন চোখ মেলেই অবাক হয়ে গেল সৌরভ, এ কী! বাবা, মা! তোমরা?

খেয়ালি উল্লসিত হয়ে বলল, আমার মা-বাবাও এসেছেন। কী সাংঘাতিক ছেলে তুমি। ভেতরে ভেতরে তোমার বাবাকে দিয়ে আমাদের বাড়িতে খবর পাঠিয়েছ, একথা একবারও বলোনি তো আমাকে?

ভার্গব বললেন, ভাগ্যিস একা পাঠিয়েছিলুম, তাই কত বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে পারলি বল তো?

বিনতা বললেন, থাক। খুব হয়েছে। আর একটু হলেই মরে যেত ছেলেমেয়েগুলো।

খেয়ালির বাবা-মাও সৌরভকে অনেক আদর করলেন। করবেন নাই বা কেন? মেয়েটার জন্য কী দুর্ভাবনাই না হয়েছিল তাঁদের।

অরবিন্দকাকুও শিল্পাকে টেনে নিলেন বুকে।

ভার্গব বললেন, কাল রাতে তোর ফোন পেয়ে খেয়ালিদের বাড়িতে গিয়ে ওর বাবা-মায়ের কাছে খবর দিয়ে আজ ভোরেই একটা গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছি আমরা। এসেই শুনি এই কাণ্ড।

শিল্পা বলল, বাবা, পরেশকাকুর স্কুটারটা কিন্তু কেল্লার ওখানে রয়ে গেছে।

ইনস্পেক্টর বললেন, ওর জন্য কোনও চিন্তা নেই। ওটা তোমাদের বাড়িতেই পৌঁছে যাবে একসময়।

তাবড় তাবড় পুলিশ অফিসাররা তখন ওদের দিকে অভিনন্দনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ওরা আর দেরি না করে পুলিশের গাড়িতেই ফিরে এল।

সব্যসাচীর গোয়েন্দাগিরি

এক

ধীর শ্লথগতিতে শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেস যখন পুরীতে এসে পৌঁছল আকাশ তখনও অন্ধকার। ভোরের আলো একেবারে ফুটে না উঠলেও ফুটিফুটি করছে। পাখির কলরব শোনা যাচ্ছে চারদিক থেকে। সেই সঙ্গে শত শত যাত্রীর চরণের ছন্দ ও কুলিদের হাঁকডাক। সমুদ্রের ডাকে আসা শহরের মানুষগুলোর কয়েকটি দিনের জন্য উদ্দাম হবার সে কী অসীম চঞ্চলতা। এ হল রোজের ব্যাপার। সমুদ্রের ঊর্মিমালার মতো যাত্রীর ঢেউ জলতরঙ্গে জনতরঙ্গ হয়ে দিবারাত্রই আছড়ে পড়ে পুরীর সৈকতে। আসে আর যায়। যায় আর আসে।

এখন জানুয়ারি মাস।

যদিও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল বলে পুরীতে শীতের কামড় কলকাতার চেয়ে অনেক কম, তবুও স্নেহাংশুবাবু সবকিছুই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে পুরীতে এলেন তিনি। এর আগে যখন এসেছিলেন তখন বিয়ে করেননি। ছাত্র ছিলেন। বাবা-মা ছিলেন সঙ্গে। এখন তাঁরা কেউ নেই। স্ত্রী এবং ছেলে আছে। একমাত্র ছেলে, সব্যসাচী। বড়ই আদরের।

প্রতিবছর এই সময়টায় স্নেহাংশুবাবু দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বাইরে বেড়াতে যান। কখনও রাজগির, কখনও বিন্ধ্যাচল, কখনও বারাণসী। তবে বারাণসীতেই বেশি যান। কেন না ওখানে গেলে কেমন যেন একটা মাটির টান অনুভব করেন স্নেহাংশুবাবু। তার কারণ ছেলেবেলায় বেশ কয়েকটা বছর বারাণসীতেই কেটেছিল তাঁর। কিন্তু স্ত্রী সরমা এবং ছেলে সব্যসাচীর সাধ মেটাতেই এই বছর তিনি পুরীতে এলেন।

সব্যসাচীর স্কুলের বন্ধুরা বছর বছর পুরী আসে। সমুদ্রের ঢেউ খায়, কত গল্প করে। তাই সমুদ্রের ডাক কলকাতার ঘরে বসেও যেন শুনতে পায় সব্যসাচী। সমুদ্র ওকে ডাকে। বারে বারে। হাতছানি দিয়ে। সেই সমুদ্রের ডাকে সাড়া দিতে সব্যসাচী ওর বাবার গলা জড়িয়ে আবদার করে বলে, এবারে আর কোথাও নয় বাবা। এবার আমাকে পুরী নিয়ে চলো। আমার অনেকদিনের সাধ। একমাত্র ছেলের আবদার স্নেহাংশুবাবুর মতো সহৃদয় বাবা কি না রেখে থাকতে পারেন? তাই এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে স্ত্রীর মনটাও যাচাই করে নিলেন

একবার। স্ত্রীও মত দিলেন পুরী যাওয়ার পক্ষে। বললেন, বিশ্বনাথকে তো বছর বছর দর্শন করি। এ বছরে বরং শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথেরই দর্শন হোক। ছেলেটারও এত আশা যখন।

তাই অনেক জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে পুরীতে আসাই ঠিক হল। দাঁইহাটের ব্যানার্জিদা পুরীতে একটি হলিডে হোম দেখাশোনা করেন। তিনিই ব্যবস্থা করে দিলেন একটা ঘরের। তাঁর সহকর্মী মৃগেনবাবু নিউ কয়লাঘাটা বুকিং অফিস থেকে রেলের স্লিপার কোচে তিনটে বার্থও রিজার্ভ করিয়ে আনলেন। শুধু রিটার্ন রিজার্ভেশনটা কনফর্ম হল না বলে, আসবার সময় ক্যানসেল করিয়ে এলেন টিকিটটা।

ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্মে পা রেখেই সরমা বললেন, ওমা! এখানে একদম শীত নেই দেখো। অথচ সারারাত গাড়িতে কী শীত।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে শীত একটু কমই হয়। গরমও বেশি হয় না।

সরমা বললেন, শীত যে বেশি হয় না, তার প্রমাণ এখনই পাচ্ছি। কিন্তু গরমের কথা বোলো না। ছোটবেলায় একবার বাবার সঙ্গে দ্বারকা গিয়েছিলাম। সেও তো সমুদ্রতীর। আরব সাগরের তীরে রণছোড়জির বিশাল মন্দির। সকাল আটটার পর বালি এমন তেতে উঠত যে সমুদ্রের ধারেকাছেও যেতে পারতুম না।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, বালি তো তাতবেই। কিন্তু ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম কি টের পেয়েছ? গায়ে ঘামাচি?

না তা অবশ্য পাইনি। পেলেও মনে নেই।

এমন সময় কানের কাছে কে যেন এসে বলল, আপনমানঙ্কর পণ্ডা কেএ? বৃন্দাবন খুনটিয়া নয়তো?

হঠাৎই আলোচনায় ছেদ পড়ল। একজন নয়, একাধিকজন এসে ছেঁকে ধরল ওঁদের, পণ্ডা কেএ বাবু?

স্নেহাংশুবাবু বললেন, আমাদের পাণ্ডা হচ্ছেন লিঙ্গরাজ মিশ্র।

কেউঁঠু আসুছন্তি? রহিবে কেউঁঠি?

আমরা গৌরবাটশাহীতে হলিডে হোমে উঠব।

আবার একজন এগিয়ে এলেন, পণ্ডা কেএ বাবু?

স্নেহাংশুবাবু বললেন, মোটা ভীম।

সরমা বললেন, কী যা তা বলছ? মুখে কিছু আটকাচ্ছে না? ওরা রেগে যাবে যে!

স্নেহাংশুবাবু বললেন, রাগ করবেন কেন? পাণ্ডার নামই যে ওই। ভাল নাম তাঁর অবশ্য নিশ্চয়ই আছে। তবে স্থানীয়দের কাছে উনি ওই নামেই পরিচিত।

আসলে ব্যানার্জিদা আমাকে বলে দিয়েছেন।

সরমা যেতে যেতে বললেন, প্রত্যেককে এইভাবে কথার জবাব দিতে দিতে যেন বিরক্ত ধরে যায়। এত পাণ্ডার অত্যাচার কিন্তু আর কোথাও নেই।

স্নেহাংশুবাবু হেসে বললেন, অত্যাচার। অত্যাচার কোথায় দেখলে? অত্যাচার করেনি তো কেউ। শুধু জানতে চেয়েছে কোথা থেকে আসছি, পাণ্ডা কে?

তাই বলে সবাই মিলে এইভাবে একসঙ্গে?

তুমি কতদিন কালীঘাট আর তারকেশ্বরে যাওনি?

সরমা আর কিছুই বললেন না। একেবারে মুখের মতন জবাব।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, এরা নিশ্চয়ই তাদের চেয়ে বেশি কিছু করছে না?

কথা বলতে বলতেই সকলে গেট পেরিয়ে বাইরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেঁকে ধরল রিকশাওয়ালার দল।

স্নেহাংশুবাবু আট টাকায় একজন রিকশাওয়ালাকে রাজি করিয়ে, তাতেই চেপে বসলেন। একটা রিকশাতেই ধরে গেল তিনজনকে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসলেন। সব্যসাচী কোলে। একটা চামড়ার সুটকেশ, সেটা রইল পা-তলায়।

রিকশা তির তির করে এগিয়ে চলল।

কিছু পথ আসার পরই জগন্নাথমন্দিরের চূড়া চোখে পড়ল।

সরমা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন।

এত সকালেও পুরীর পথঘাট কিন্তু নির্জন নয়।

ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে। পথের ধারে চা-দোকানগুলোতে স্থানীয় লোকজনদের ভিড় হচ্ছে। পুরী যে শুধু তীর্থক্ষেত্র বা ট্যুরিস্ট স্পট তা তো নয়, পুরী এখন মস্ত শহর। রাজধানী ভুবনেশ্বরের পাশেই মহাপ্রভুর পদরেণুধন্য এই নীলাচলে সমুদ্রের ডাকে সারা ভারতবর্ষই হাজির।

যেতে যেতে এক জায়গায় হঠাৎ এমনভাবে ব্রেক কষল রিকশাটা যে, বাবা-মায়ের কোল থেকে একেবারে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল সব্যসাচী। পড়ামাত্রই রাস্তার খোয়ায় কপালের একটা পাশ কেটে গেল ছোট্ট করে। টপ টপ করে রক্ত ঝরতে লাগল ক্ষতস্থান দিয়ে।

ততক্ষণে হই হই করে অনেক লোকজন ছুটে এসেছে। তার পরে যা হয়। সব্যসাচীকে তুলে দাঁড় করিয়ে মারমুখি হয়ে রিকশাওয়ালাকে ধরে মারতে গেল সবাই।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, না না। মারবেন না। ও বেচারার কী দোষ?

অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। হঠাৎ একটা ষাঁড় এসে পড়ায় ব্রেক কষতে গিয়ে উলটে গেছে রিকশাটা।

ঘটানাটা তাই। সব্যসাচী রুমাল দিয়ে ওর ক্ষতস্থানটা চেপে ধরল শক্ত করে।

রিকশাওয়ালা নিজেই তখন কাঁচুমাচু মুখে পাশের একজনদের বাড়ি থেকে কয়েকটা গাঁদা গাছের পাতা এনে দু'হাতে কচলে সেটা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল। গাঁদাপাতার রস অ্যান্টিসেপটিক। এতে অল্পস্বল্প রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়।

রিকশা আবার চলতে শুরু করল।

একটু পরেই সকল ব্যথা ভুলে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল সব্যসাচী, মা! ওই—ওই দেখো, সমুদ্র।

সত্যই তো! জগন্নাথ স্বামী, নয়নপথগামী। এই সমুদ্রই তো সাক্ষাৎ জগন্নাথ।

আকাশ তখন বেশ ভালরকম ফর্সা হয়ে গেছে।

রিকশা স্বর্গদ্বারের পথ ধরে ভেঁপু বাজিয়ে এগিয়ে চলল। কত লোক— কত লোক—এখন সমুদ্রতীরে।

সামুদ্রিক বাতাসে মনপ্রাণ যেন ভরে উঠল।

নীল সমুদ্র সাদা-ফেনার রাশি নিয়ে বালির বুকে আছড়ে পড়ছে। পায়ের পাতা ডুবিয়ে, হাঁটু ডুবিয়ে, এই শীতকালেও সমুদ্রের স্বাদ নিচ্ছে কত লোক।

সব্যসাচী বলল, সত্যি, আর যেন তর সইছে না। আমার মনে হচ্ছে এখুনি ছুটে যাই সমুদ্রের কাছে।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, আর তো এসে গেছি। এবার সমুদ্র আর ঘর এই করতে হবে।

সব্যসাচী বলল, মন্দির! মন্দিরে যাবে না?

মন্দিরে যাব বইকী। তবে রোজ তো নয়। একদিন যাব পুজো দিতে।

সরমা বললেন, আমি অবশ্য রিকশায় বসেই বাবার মন্দির দর্শন করে নিয়েছি।

সব্যসাচী বলল, কই! কখন? আমাকে দেখালে না?

দেখাব কী? সেই মুহূর্তেই যা হয়ে গেল।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, কেন এমন হল বলো তো? এতদিন বাইরে বেরোচ্ছি, কই কখনও তো এমন হয়নি।

সরমা বললেন, ওইজন্যই দিনক্ষণ দেখে ঘর থেকে বেরোতে হয়।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, আমি না হয় দিনক্ষণ দেখে বেরোই না। যে সব ট্রেনের যাত্রী দুর্ঘটনায় পড়ে তাদের কেউ-ই কি দিনক্ষণ দেখে বেরোয় না? আসলে যখন যেটা হবার সেটা হবেই।

সব্যসাচী বলল, আমি বলব কেন হল? আমি প্রথম আসছি তো, তাই জগবন্ধু আমার রক্তেই তাঁর পূজা নিলেন।

সরমা বললেন, থাম তুই। বাজে বকিস না। আসতে না আসতেই কী বিপদ। পরে না জানি কী হবে।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, সক্কালবেলাতেই মেজাজটা বিগড়ে গেল।

সরমা বললেন, আমি বাপু এর পর আর ওকে সমুদ্রে নামতে দেব না।

রিকশাওয়ালা বলল, এবার একবার আপনাদের নামতে হবে বাবু। একটু খাড়াই আছে এখানটা। খানিক উঠে আবার চাপবেন। মা বসে থাকুন, আপনারা নামুন।

সরমা বললেন, হলিডে হোমটা কতদূরে?

এসে গেছি মা, আর একটুখানি। শ্মশান পার হয়ে হরিদাস মঠ, তারপরই ডানদিকে।

স্নেহাংশুবাবু আর সব্যসাচী রিকশা থেকে নামলে রিকশাটাকে টেনে খাড়াই পথে একটু ওঠানো হল। শুধু ওদের রিকশা নয়, সব রিকশারই যাত্রীদের নামতে হল এখানে।

হলিডে হোমের আরও যাত্রী এসেছেন। দুটো রিকশা বোঝাই। ছোট বড় মিলিয়ে মোট ছ'জন। কুচোকাচাগুলো আনন্দে পাখির মতো কল কল করছে সব। কী আনন্দ তাদের। তারাও নেমে হাঁটা শুরু করল। বাঁদিকে নীল সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ তখন বালুচরে লুটিয়ে পড়ছে।

সব্যসাচী সমুদ্রের রূপ দেখে অধীর হয়ে উঠল।

জীবনে প্রথম শীতের সোনালি রোদে নীল সমুদ্রের হাতছানি যে পেয়েছে তার মনের অবস্থা যে কী কাউকে কি বোঝানো যায়? ওর মনের অবস্থাও তাই, কাউকেই বলা যাবে না।

ওরা আবার রিকশায় চেপে বসলে, রিকশা তির তির করে এগিয়ে চলল।

একটু পরেই রিকশা যেখানে এসে থামল সেই জায়গাটাকে এক কথায় হলিডে হোমের পাড়া বলা চলে।

রিকশাওয়ালা বলল, এই আপনার হলিডে হোম। বাঁদিকের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সমুদ্রের দিকে।

স্নেহাংশুবাবু রিকশা থেকে নেমে রিকশার ভাড়া দিলেন। রিকশাওয়ালা বেশ চকচকে নোট পেয়ে খুশি হয়ে চলে গেল।

এখানে চারদিকেই তো হলিডে হোম। তাই দলে দলে রিকশা এসে থামতে লাগল তাদের নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে। ডানদিকে, বাঁদিকে, সামনে, পেছনে, সর্বত্র।

স্নেহাংশুবাবু ঠিকানা লেখা কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। রিকশাওয়ালা ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছে। এই তো বাড়ির গায়ে লেখা আছে

কৃষ্ণানন্দধাম। গৌরবাটশাহী। ওপরে হলিডে হোমের বোর্ড।

হলিডে হোমের লাগোয়া একটা গুমটি ঘরের মতো দোকান। এই দোকানটা হল সাধন তালুকদারের।

সাধনবাবু ফটোগ্রাফার। সমুদ্রতীরে যাত্রীদের কুইক সার্ভিসে ফোটো তুলে দেন। আর কয়েকটি হলিডে হোম দেখাশোনা করেন।

এই হলিডে হোমেরও উনি একজন কেয়ার টেকার।

দোতলার বারান্দায় একজন মাসি দাঁড়িয়েছিল।

স্নেহাংশুবাবুকে হাতের কাগজে সব কিছু মিলিয়ে নিতে দেখে বলল, ওপরে উঠে আসুন।

স্নেহাংশুবাবু সুটকেস হাতে সপরিবারে ওপরে উঠলেন। খুব একটা উন্নতমানের না হলেও হলিডে হোমের অবস্থান এবং পরিবেশটা খুবই ভাল লাগল স্নেহাংশুবাবুর।

তখন ভালভাবে সকাল হয়ে গেছে। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। সামনের রাস্তায় তাই সূর্যোদয় দেখে ফিরে আসা লোকজনের ভিড়। দলে দলে লোক এমনভাবে আসছে যেন কোনও মিছিলে গিয়েছিল তারা।

ওরা ওপরে উঠতেই মাসি ঘর খুলে দিল। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি ব্যানার্জিবাবুর লোক?

স্নেহাংশুবাবু বললেন, হ্যাঁ।

তা হলে এই ঘর।

সরমা বললেন, আপনি আমাদের চিনলেন কী করে?

ব্যানার্জিবাবুর চিঠি পেয়েছিলাম। তাতেই উনি লিখেছিলেন আজকের তারিখে আপনাদের আসবার কথা। স্বামী-স্ত্রী একটা বাচ্চা।

সব্যসাচী বলল, উনি লিখলে কী হবে? আমি কিন্তু আর বাচ্চা নই।

ওর কথায় হেসে উঠল সবাই।

মালপত্তর নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সাধনবাবু উঠে এলেন ওপরে। স্নেহাংশুবাবুর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে বললেন, ব্যানার্জিবাবুর চিঠি পেয়েছি। আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না যেন। এই মাসিই আপনাদের সব কাজকর্ম করে দেবে, জল এনে দেবে। কোনওরকম কিছু অসুবিধে হলে আমাকে বলবেন।

কথা শেষ হতে-না-হতেই অন্য ঘরের যাত্রীরা এসে পড়ল। এনারা এক নম্বরের বড় ঘরটা নিয়েছেন।

সাধনবাবু ওঁদের নিয়ে ব্যস্ত হলেন এবার।

বাইরে তখন একদল যাত্রীর সঙ্গে একটি ট্যুরিস্ট বাসের ড্রাইভার-কন্ডাক্টারের তুমুল বচসা শুরু হয়ে গেছে।

দুই

জানুয়ারি মাসের নির্মেঘ আকাশ থেকে নরম রোদ যখন গলে গলে পড়ে, চারদিক তখন ঝলমল করে। কী সুন্দর, কী মিষ্টি, কী অপূর্ব। হলিডে হোমের বারান্দা থেকে পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে দূরের সমুদ্রের দিকে তাকাল সব্যসাচী। সমুদ্র এখান থেকে দেখা যায়, তবে বালুচরে ঢেউ ভেঙে পড়ার দৃশ্য নজরে আসে না। অথচ হলিডে হোমের সামনে দিয়েই সমুদ্রে নামার পথ। কিন্তু অদূরে একটি একতলা বাড়ি এমনই বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে-সেটার জন্য ঢেউ দেখা অসম্ভব।

সব্যসাচী সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল।

এবার সমুদ্রকে বহুদূর পর্যন্ত আরও ভাল করে দেখা যাচ্ছে। নজরে আসছে আশপাশের অনেক গাছপালার সবুজ দৃশ্য। আর দূরে একটা মন্দির। দুরন্ত হাওয়ায় পত পত করে লম্বা ফিতের মতো ধ্বজা উড়ছে তার। ওটা নিশ্চয়ই পুরীর মন্দির। টি ভি-তে সিনেমায়, খবরের কাগজে, ক্যালেন্ডারের পাতায় কত ছবিই তো দেখেছে ওই মন্দিরের। ও মন্দির কি চিনিয়ে দিতে হয়?

সব্যসাচী দু'হাত জোড় করে প্রণাম করল।

ছাদের মাঝখানে সতরঞ্চি বিছিয়ে পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জিপরা এক যুবক কতকগুলো খাতাপত্তর নিয়ে কী যেন লেখালিখি করছিলেন। যুবকের গায়ের রং ফর্সা। চাপ দাড়ি। একটু ছিপ ছিপে লম্বাটে ধরনের চেহারা। যুবক একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন সব্যসাচীকে। তারপর নস্যির ডিবে থেকে নস্যি বার করে এক টিপ নিয়ে আবার কাজে মন দিলেন।

সব্যসাচী ভাল করে লক্ষ করল যুবককে। কেমন যেন গম্ভীর আর ভারিক্কি বলে মনে হল। তবুও সে যুবকের কাছে গিয়ে বলল, আপনি নিশ্চয়ই দু'নম্বর ঘরে আছেন?

তোমরা তিন নম্বরে উঠেছ তাই না?

আপনি কী করে জানলেন?

সাধন বলছিল।

সাধন কে?

সাধন নয়, সাধনদা। এখানকার কেয়ার টেকার।

সব্যসাচী জিভ কেটে বলল, স্যরি। উনি তো আমার সাধনদাই হবেন।

খুব ভাল ছেলে।

কে? আমি, না সাধনদা?

তুমি ভাল ছেলে একথা এখনই বলি কী করে? দু'চার দিন থাক। দেখি, তবে তো! ক'দিন থাকবে তোমরা?

জানি না। বাবার তো এক সপ্তাহের ছুটি। ফেরার রিজার্ভেশন পাইনি আমরা, তাই যে কোনওদিন চলে যেতে পারি।

আসতে-না-আসতেই চলে যাবার কথা বলতে নেই। কোনারক, ভুবনেশ্বর যাবে নিশ্চয়ই?

ঠিক বলতে পারব না।

যদি যাও, বাবাকে বলবে মিশ্রজির ছেলের দোকানে যোগাযোগ করতে। সামনেই গুমটি ওদের। ওরাই বাসের ব্যবস্থা করে দেবে।

সব্যসাচী ছাদের চারপাশ একবার ঘুরে নিয়ে বলল, আপনি একা এসেছেন বুঝি?

যুবক মুখ মুচকে সামান্য একটু হেসে বললেন, পৃথিবীতে সবাই একা আসে, একাই যায়।

কে বলল! যমজ ভাইরা তো একা আসে না। আর বাস খাদে পড়লে সবাই তো একসঙ্গেই যায়।

যুবক কিছুক্ষণ অবাকচোখে তাকিয়ে রইলেন সব্যসাচীর দিকে। তারপর বললেন, তুমি অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে তো! কী নাম তোমার?

আমার নাম সব্যসাচী।

থাক কোথায়?

কলকাতার বেহালায়।

আমি তো ম্যানটনে থাকি।

আমরা থাকি পড়ুই দাস পাড়া রোডে। নবপল্লীর কাছে।

এমন সময় দোতলা থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, খোকা! খোকা!

সব্যসাচী সাড়া দিল, যাই মা। তারপর বলল, মা ডাকছেন। এখন আসি, কেমন? পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। বলেই তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দোতলায়।

মা বললেন, কীরে! ওপরে কী করছিলি?

কিছু না। চারদিকের দৃশ্য দেখছিলাম।

নে। কিছু খেয়ে নে। নিয়ে চল সমুদ্রের ধার থেকে একটু ঘুরে বাজার করে নিয়ে আসি।

মাসি কাছেই ছিল। বলল, না না। রান্না করে যদি খেতে চান, তা হলে আগে বাজার করে নিয়ে আসুন। তারপরে যেখানে ইচ্ছে যান। আর যদি হোটেলে খান, তা হলে আলাদা কথা। ছোট্ট বাজার এখানকার। এখুনি সব শেষ হয়ে যাবে।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, আমার মতে আজ আর রান্নার ঝামেলা না করে হোটেলে খেলেই হয়।

সরমা বললেন, হোটেলে খাব কেন? এখানে যখন এমন চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে, তখন শুধু শুধু হোটেলে বেশি পয়সা দিয়ে বাজে খাবার খেয়ে লাভ কী? আগে ঘুরে গিয়ে দেখি চলো, কোথায় কী পাওয়া যায়, তারপর যা হয় হবে।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, যা তোমার ইচ্ছা।

এরপর সবাই মিলে জলযোগ পর্ব শেষ করে বাইরে এলেন।

হলিডে হোম থেকে বেরিয়ে ডানদিকে দু'পা যেতেই চোখে পড়ল জমজমাট বাজার। কত আনাজপত্তর, শাক-সবজি কত কী। মাছ-মাংস-ডিম সবই পাওয়া যায়। প্রত্যেক দোকানে কেরোসিনও আছে। তাদের কাছ থেকে চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা কিনলেই তারা প্রয়োজন মাফিক কেরোসিন দেবে।

সরমা প্রথমেই একটা ভাঙড় মাছ কিনলেন। একদম টাটকা। তারপর কিছু কাঁচা আনাজ। একটা টাকা দিতেই মাছ কেটে বেছে দিল ওরা।

স্নেহাংশুবাবু সেগুলো চট করে হলিডে হোমে রেখে এসে সরমা ও সব্যসাচীকে নিয়ে বেড়াতে চললেন সমুদ্রের দিকে।

সমুদ্রের ঢেউ যত না তোলপাড় করে, সব্যসাচীর মন তার চেয়েও অনেক বেশি তোলপাড় করে সমুদ্রের কাছে যাবার জন্য। যদিও রিকশায় বসেই সমুদ্রদর্শন হয়ে গেছে, তবুও পায়ের পাতায় সাদা সাদা ফেনাগুলো মাখবার জন্য মনপ্রাণ যেন উতলা হয়ে উঠল।

যেতে যেতে একসময় একটি ভাঙা বাড়ির আড়াল সরে যেতেই চোখে পড়ল সমুদ্র। একটা পিচ বাঁধানো রাস্তা দূরের দিকে চলে গেছে। সেখানে সারি সারি কতকগুলো স্তম্ভের ওপর পাখা লাগানো। সব্যসাচী বাবাকে জিজ্ঞেস করল, ওগুলো কীসের পাখা?

স্নেহাংশুবাবু বললেন, আমিও ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, এগুলো ঘোরার ফলেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এখানে।

ওরা রাস্তাটা পার হয়ে সমুদ্রবেলায় নামল। সেখানে বালির ওপর কত পরিত্যক্ত নৌকো রয়েছে দেখল। সেগুলোর মধ্যে কোনও কোনওটিতে মেরামতির কাজও চলছে।

সব্যসাচী হঠাৎ একটি ঢেউকে বালুচরে আছড়ে পড়তে দেখে 'হুররে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর একছুটে একেবারে জলের কাছে।

সরমা চেঁচিয়ে বললেন, বেশি জলে যাস না খোকা। তোর অভ্যেস নেই।

সব্যসাচী সে কথার উত্তর না দিয়ে অল্প জলেই তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাগল।

হঠাৎ একটি মেয়ে ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, জাস্ট লাইক এ মাংকি।

রাগে মাথাটা গরম হয়ে উঠল সব্যসাচীর। ওর চেয়েও কম বয়স মেয়েটির। এত সাহস তার! সেও তাই চেঁচিয়ে বলল, তুমি একটি আউলনী।

মেয়েটি এবার ফিরে এসে রেগে ওর মুখোমুখি হয়ে বলল, তার মানে? আউলনীটা আবার কোন শব্দ? কোনও ডিকসেনারিতে তো নেই।

আউল মানে কী? প্যাঁচা তো? তা হলে আউলনী মানে?

প্যাঁচানী।

তুমি একটি প্যাঁচানী।

আমি প্যাঁচানী? আমাকে প্যাঁচার মতন দেখতে? জান সবাই আমার ফেস কাটিং-এর কত প্রশংসা করে?

তুমি জান, আমাকেও সবাই রাজপুত্তুর বলে।

তুমি রাজপুত্তুরই তো।

তা হলে কেন আমাকে তুমি বাঁদরের সঙ্গে তুলনা করলে?

কেন করব না? তোমার কি বোঝা উচিত ছিল না, আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই?

কী করে বুঝব? আমি কি তোমাকে কখনও দেখেছি?

আমি কিন্তু দেখেছি তোমাকে।

কী করে দেখলে?

একটু আগে তুমি যখন এই রাজপুত্তুরের মতো চেহারা নিয়ে বোকা বোকা মুখ করে ছাদে ঘুরছিলে, তখনই দেখেছি। আমি তোমার সামনের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম। কিন্তু তুমি একবারও আমার দিকে তাকালে না। এতে আমার মনে দুঃখ হয় না বুঝি?

সব্যসাচী হেসে ফেলল এবার। বলল, ওঃ এই কথা? তা হলে ঠিক আছে, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

আমার কথাও আমি ফিরিয়ে নিলাম তা হলে। যাকগে, তোমরা তো এই একটু আগে এলে। ঢেউ খেতে আসবে কখন?

এখন বাড়ি ফিরে মা রান্নাবান্না শেষ করলেই আসব।

আমরাও তাই। বারোটা-একটা হবে। ওই সময়ে এসো, আমরা দু'জনে একসঙ্গে ঢেউ খাব কেমন? আমার এখন খুব সাহস হয়ে গেছে। আমরা তিনদিন এসেছি। কত ঢেউ যে খেয়েছি তার ঠিক নেই। তোমাকে আমি ঢেউ খাওয়া শিখিয়ে দেব।

কিন্তু আমার যে খুব ভয় করবে। জলকে আমার দারুণ ভয়।

সাঁতার জান না বঝি?

না। তা ছাড়া সাঁতার জানলেও এই মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটবে কে?

আমিও সাঁতার জানি না। একদিন শুধু নুলিয়া ধরে নেমেছিলাম। তারপরেই ভয়টা কেটে গেছে। কোথা থেকে এসেছ তোমরা?

বেহালা থেকে। তুমি?

তানপুরা থেকে।

তানপুরা! সেটা আবার কোথায়?

সেটাও আছে মশাই। লিলুয়ার পরে যেমন হালুয়া আছে, বেহালার পরেই তেমনি তানপুরা আছে। বড়িশার নাম শুনেছ? বড়িশা চণ্ডীতলা? আমি সেই চণ্ডীতলার মেয়ে। সবাই আমাকে রণচণ্ডী বলে।

বলো কী! আমরা তো প্রতিবছর মেলার সময় ওখানে ঠাকুর দেখতে যাই।

আমিও প্রতিবছর মেলার সময় ওখানে আমার বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ভলেন্টিয়ার হই। ফাংশনে গান গাই। যাকগে, আমার মামা, মামি, দিদিমা ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমি এখন আসি, কেমন?

বেলায় আসছ তো?

বয়ে গেছে। ল্যাদারুশ ছেলেদের সঙ্গে আমি মিশি না। বলেই একটা ভেংচি কেটে দৌড়ে পালাল মেয়েটা।

ততক্ষণে স্নেহাংশুবাবু ও সরমা এসে পড়েছেন।

সরমা বললেন, কেরে মেয়েটা?

জানি না। ও বলল, ও নাকি একটা রণচণ্ডী। বড়িশায় থাকে।

কী বলছিল তোকে?

কিছুই না। এমনি আলাপ হল। আমাদের সামনের হলিডে হোমে উঠেছে ওরা।

বেশ দেখতে তো মেয়েটিকে। ভারী ফুটফুটে। ঠিক যেন প্রজাপতির মতো পাখা মেলে উড়ে গেল, তাই না?

স্নেহাংশুবাবু বললেন, প্রজাপতি, চামচিকে কত কী-ই তো দেখলে। এখন ঢেউ দেখো, ঢেউ দেখো। যা দেখলে কাজ হবে। ওই দেখো, কত বড় একটা ঢেউ কীভাবে ছুটে আসছে।

বলতে বলতেই একরাশ ফেনা নিয়ে ঢেউটা এসে এমন ভাবে আছড়ে পড়ল পায়ের কাছে যে জামাকাপড় সব ভিজে গেল। শুধু কী তাই, কত লোক যে উলটে পালটে পড়ল তার আর হিসেব নেই। সব্যসাচীও তিড়িংবিড়িং করছিল। কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কায় বালির ওপর এক আছাড়। তারপর জলের টানে হড় হড় করে নেমেও গেল খানিকটা। ভাগ্যে স্নেহাংশুবাবু সময়মতো ধরে ফেলেছিলেন। না হলেই হয়েছিল আর কী।

এমন সময় হঠাৎ এক জায়গা থেকে প্রচণ্ড একটা শোরগোল উঠল। কী হল কে জানে? সবাই ছুটল সেইদিকে। সব্যসাচীও ছুটল।

সরমা চেঁচিয়ে বললেন, খোকা ফিরে আয়। যাস না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

সব্যসাচী গিয়ে দেখল এক জায়গায় এক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা বালির ওপর আছাড়কাছাড় করছে। বহু লোক জড়ো হয়ে তাঁদের ঘিরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

কয়েকজন নুলিয়া হই হই করে ছুটল জলের দিকে।

ব্যাপার কী? না, এই পরিবারেই একটি ছোট ছেলে সমুদ্রতীরে কয়েকজনের সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলা করছিল। হঠাৎ করে একটি বড় ঢেউ এসে পড়ায়, সবাই বেসামাল হয়ে গেলে ছেলেটি হাতছাড়া হয়ে যায়। তারপর আর দেখা যাচ্ছে না তাকে। তার মায়ের সে কী কান্না। সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে সেই কান্নার স্বর যেন বালুচর কাঁপিয়ে দেয়।

নুলিয়ারা জলে নেমে জল তোলপাড় করে।

অন্যান্য স্নানার্থীরাও শুরু করে খোঁজাখুঁজি। কিন্তু না, সকলের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

সমুদ্র যে চোখের পলকে কোথায় নিয়ে গেল তাকে, তা কে জানে?

ভিড় বাড়ে। পুলিশ আসে।

জেলেরা নাও নিয়ে জলে নামে। কিন্তু নিখোঁজের খোঁজ দিতে পারে না কেউ। ফলে বাধ্য হয়েই আশা ছেড়ে দিতে হয়।

এমন একটা মর্মান্তিক খবর শুনে কারই বা মাথার ঠিক থাকে? সরমা তাই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন সব্যসাচীকে।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, সময়মতো না-ধরলে আমার ছেলেটাও তলিয়ে গিয়েছিল আর কী!

সেই ছেলেটির মা তখন চিৎকার করছেন, বাবা জগন্নাথ! কৃপা করো। হে সমুদ্রনারায়ণ! আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। ও তো কোনও দোষ করেনি বাবা। আনন্দে নেচে নেচে তোমার কোলে খেলা করছিল। দয়া করে ওকে ফিরিয়ে দাও। তুমি অনন্ত—তুমি অপার— তুমি মহৎ— তুমি উদার। তুমি তো কারও কিছুই নাও না। তবে কেন ওকে অমন করে টেনে নিলে? হয় তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও, না হলে আমাকেও তুমি নাও।

শোকার্ত জননীর বিলাপ কি এইভাবে কান পেতে শোনা যায়? তাই সব্যসাচীকে নিয়ে সমুদ্রতীর থেকে আবার হলিডে হোমে ফিরে এলেন স্নেহাংশুবাবু ও সরমা। কারও মুখে কথা নেই। কী কথাই বা বলবেন?

অনেক পরে স্নেহাংশুবাবু বললেন, এবারের জার্নিটাই আমাদের খারাপ। এক তো সকালে রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে ছেলেটা একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল। তার ওপর এই এক দৃশ্য। প্রথম দিনেই মনটা গেল বিষিয়ে।

তাই না তাই।

সব্যসাচী বলল, বাবা! আমরা আজ সমুদ্রে স্নান করতে যাব না?

না বাবা। এইসব দেখেশুনে আজ আর নয়।

কত লোক তো স্নান করছে।

করবেও। দিঘায়, পুরীতে এসব হামেশা হয়। তবে কিনা আজই স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখার পর মন চাইছে না।

ওই ছেলেটাকে আর পাওয়া যাবে না?

নিশ্চয়ই যাবে। তবে জীবিত অবস্থায় নয়। তাও কখন কোনখানে যে ডেড বডি মিলবে ওর, তা কে জানে?

সরমা বললেন, আমার কিন্তু আর একদমই মন চাইছে না এখানে থাকতে। আজকের দিনটা এখানে থেকে কাল একটা রিকশা নিয়ে যা যা দেখবার দেখে পরশু সকালেই নীলাচল ধরে চলে যাই চলো।

সব্যসাচী ব্যথা পেয়ে বলল, সে কী মা। এত আশা নিয়ে এখানে এসে চলে যাবে তোমরা?

সরমা বললে, হ্যাঁ বাবা। কেন জানি না, আমার মনটা কেবলই কু-গাইছে।

স্নেহাংশুবাবু দু'হাতের ভরে মাথা রেখে চুপ চাপ বসে রইলেন।

ছোট্ট ঘটনা। হামেশাই হয়।

তবু ছেলেটির সমুদ্রগ্রাসের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র।

মুহূর্তের জন্য, কিছুসময়ের জন্য, হয়তো বা দু'চার ঘণ্টার জন্য সাবধান হবে সবাই। তারপর সবাই সব কিছু ভুলে যাবে। আবার আনন্দে উদ্দাম হয়ে, উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে সবাই। এই সমস্ত ঘটনা তুচ্ছ মনে হবে তখন। এই বিষাদের সুর রেখাপাতও করবে না কারও মনের কোণে। হঠাৎ কানে এলে কেউ হয়তো বলে বসবে, অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। কী আর করা যাবে। অমন কত হয়।

সময়ের নিয়মই এই। সময়ের ধর্মই এই।

স্নেহাংশুবাবু বাথরুমে গেলেন। সকাল সকাল স্নানটা সেরে নিতে হবে।

সরমা ঢুকলেন রান্নাঘরে।

সব্যসাচী অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে এক-পা দু'-পা করে নীচে এল। সেই দামাল মেয়েটা তখন ওর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে হলিডে হোমে ফিরছে। এই মুহূর্তে কী স্মার্ট মেয়েটি। আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখল বটে,

তবে এমন ভান করল যেন চেনেই না।

সব্যসাচী মনে মনে ভাবল এর জবাব ও অবশ্যই দেবে। পাশাপাশি হেঁটে গেলে ফিরেও তাকাবে না ওর দিকে।

তিন

সাধারণত যা হয় অর্থাৎ কিনা দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সবাই একটু শুয়ে ঘুমোয়। বিশেষ করে সারারাত ট্রেন জার্নির পর ঘুম একটু আসেই চোখে। কিন্তু সব্যসাচীর চোখে ঘুম নেই।

মা-বাবা দু'জনেই শুয়ে ঘুমোচ্ছেন দেখে, ও একটু এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ল। আসলে দিবানিদ্রা ওর হয় না। হবেই বা কেন? সারাটা দুপুর তো স্কুলেই সময় কাটে। ছুটির দিন ঘরে বসে বই পড়ে। বুক সেলফ ঠাসা বই ওর। পাণ্ডব গোয়েন্দার সব ক'টি খণ্ডই ওর আছে। আর আছে দুর্দান্ত একটা অ্যাডভেঞ্চারের বই, সোনার গণপতি হিরের চোখ।

সব্যসাচী বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে এসে দরজা খুলে বারান্দায় এল। তারপর আলতো করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে এক্কেবারে ছাদের ওপর।

শীতের ঝলমলে রোদ্দুরে কী ভাল যে লাগল ছাদটা। ওই তো দূরে সমুদ্রের নীল জলরাশি কী সুন্দর দেখতে লাগছে। সব্যসাচী একভাবে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ মুখের ওপর কীসের একটা আলো এসে পড়ল।

কী জোরালো সেই আলো। মনে হল কাচ বা অন্যকিছুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে আলোটা ওর মুখে এসে লাগছে।

ও চোখদুটো বুজে একটু সরে দাঁড়াল।

সাময়িক বিরতি। তারপরে আবার। বেশ বোঝা গেল কেউ ইচ্ছে করেই করছে এই কাণ্ডটা। কিন্তু সব্যসাচী বার বার চেষ্টা করেও দেখতে পেল না তাকে। আয়নায় রোদ্দুর ধরে অপরের মুখের ওপর ফেলা, এটা একটা দারুণ অসভ্যতা। অমার্জনীয় অপরাধ এটা। কিন্তু কী আর করা যাবে? যে করছে সে করেই লুকিয়ে পড়ছে।

আবার—আবার সেই প্রতিফলন।

সব্যসাচী দেখল এ সেই পাকলুর কাণ্ড। সেই ডানপিটে মেয়েটির কীর্তি। সামনের হলিডে হোমের ছাদে দাঁড়িয়ে এই কাজ করছে, আর লুকিয়ে পড়ছে। শুধু এইবারেই যা লুকিয়ে পড়ল না।

সব্যসাচী রেগে ওর দিকে তাকালে ও দুষ্টুর মতো মিষ্টি হাসল।

মেয়েটির ব্যবহারের উপযুক্ত জবাব দেবার এই সুযোগ। এ সুযোগ হেলায় হারাল না সব্যসাচী। সে কোনওরকম প্রশ্রয় না দিয়ে বারান্দায় নেমে এল। ওর মুখের দিকেও তাকাবে না সে।

কিন্তু কী জ্বালা। বারান্দাতেও সেই একই উপদ্রব।

ও এবার দারুণ রেগে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর হঠাৎ কী মনে হতেই সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নীচে নেমে রাস্তা পার হয়েই সামনের হলিডে হোমে। কাউকে কোনও কথা না বলে তর তর করে একেবারে ছাদে।

মেয়েটি তখনও আলশের ধারে ঝুঁকে ওকে খুঁজছে।

ও একেবারে পেছনদিক থেকে গিয়েই শক্ত করে চেপে ধরল ওর হাতদুটো।

মেয়েটি দারুণ ভয় পেয়ে ঘুরে তাকাল ওর দিকে।

সব্যসাচী বলল, ঘুঘু দেখেছ, কিন্তু ফাঁদ দেখনি। এইসব বদ অভ্যাস তোমার কতদিনের?

হাত ছাড়ো বলছি। আমার গায়ে হাত দেবার সাহস তোমার কী করে হল?

ঠিক যেমন করে আমার মুখের ওপর আলো ফেলার দুঃসাহস হয়েছে তোমার।

মেয়েটি আর কোনও উত্তর দিতে পারল না। কিছু সময় নীরব থেকে বলল, তুমি খুব শক্ত করে ধরেছ আমাকে, ছাড়ো।

সব্যসাচী হাত ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

মেয়েটি বলল, তুমি সমুদ্রে এলে না কেন?

কী করে যাব? আমার বাবা-মা কেউ যে গেলেন না।

কেন গেলেন না?

আসলে ওই ছেলেটির ব্যাপারে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই। কিন্তু তুমি তখন আমাকে চিনেও অমন না চেনার ভান করে চলে এলে যে?

তুমি একটা রামবুদ্ধু। আমার মামা ছিলেন না? মামা অত্যন্ত কড়া লোক। কারও সঙ্গে বেশি কথা বলা একদম পছন্দ করেন না। বিশেষ করে সমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে কথা বললে মামা মারাত্মক খাপচুরিয়াস।

তোমার বাবা-মা আসেননি?

না। আমার মা নেই। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। তাই আমি মামার বাড়িতে মানুষ।

সব্যসাচী এবার একটু নরম হয়ে স্নেহভরা গলায় বলল, আমার ব্যবহারের জন্য তুমি কিন্তু কিছু মনে কোরো না। আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম তোমার ওপর।

রাগটা হঠাৎ পড়ে গেল কেন? আমার মা নেই, বাবা থেকেও নেই, এই সব শুনে?

উঁহু। তা হলে তো তোমাকে দয়া দেখাতে হয়। আসলে তুমি খুব সহজ, সরল। আর—।

আর কী?

ভীষণ ছেলেমানুষ।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, তুমি আর থেক না এখানে। আমার মামা যদি ওপরে উঠে আসেন আর তোমার সঙ্গে কথা বলছি দেখতে পান তা হলে কিন্তু রেগে যাবেন খুব। তুমি বরং তোমাদের ছাদে চলে যাও, আমি এখানে থাকি।

সব্যসাচী বলল, যা তুমি বলবে। বলেই চলে আসতে যাচ্ছিল।

মেয়েটি হঠাৎ ছুটে এল ওর দিকে। বলল, কী বললে তুমি? যা আমি বলব? এখন যদি আমি বলি তুমি সমুদ্রের ধারে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো, তাই তুমি করবে?

সব্যসাচী বলল, নিশ্চয়ই করব।

তোমার মা-বাবা বকবে না?

ওরা এখন ঘুমোচ্ছেন।

তা হলে এক কাজ করো, তুমি এই পাশের রাস্তাটা দিয়েই সমুদ্রে চলে যাও। আমি এদিকটা একটু ম্যানেজ করেই যাচ্ছি। দেরি হলে রাগ কোরো না যেন। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।

মেয়েটির কথায় ঘাড় নেড়ে সব্যসাচী হলিডে হোমের বাইরে এল। তারপর গৌরবাটশাহীর পথ ধরে সোজা সমুদ্রতীরে। শীতকাল হলে কী হয়, কী চড়া রোদ এখানে। তবুও ও বালিয়াড়ির ওপরে পড়ে থাকা একটা কালো রঙের আধভাঙা জেলেডিঙির পাশে গিয়ে চুপ করে বসে রইল।

এই মেয়েটিকে কেন কে জানে খুব ভাল লেগেছে ওর। কী সুন্দর গোলাপি আভা মেয়েটির। আর ভারী মিষ্টি ওর মুখ। শুধু একটু যা চঞ্চল প্রকৃতির।

তা হোক, এমন একটি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে ক্ষতি কী?

সব্যসাচী অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন মেয়েটি এল না তখন সে মনে মনে অত্যন্ত রেগে গেল। এত ফাজিল কেউ হয়? নিশ্চয়ই ওকে সমুদ্রে পাঠিয়ে ওর ধৈর্য পরীক্ষা করবার জন্য এই কীর্তি করেছে সে। এরপর হতাশ হয়ে, বিরক্ত হয়ে যখন ও ফিরে যাবে তখন আবার হয়তো আয়নার রোদ ওর মুখে ফেলে খিল খিল করে হাসবে।

খুব রেগে গেছ তো ল্যাদারুশবাবু?

সব্যসাচী ঘুরে তাকিয়ে দেখল মেয়েটি ওর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে ওকে এই কথা বলছে।

সব্যসাচী বলল, এত দেরি হল যে?

ওমা দেরি কোথায়? তুমি চলে আসার পরই তো আমি এলাম।

মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পাওনি? আমি ঠায় ওইদিকে চেয়ে বসে আছি।

মাঝে মাঝে সমুদ্রও দেখছিলে। বালিতে হিজিবিজি কাটছিলে।

কিন্তু এর ফাঁকে তুমি এলে কখন?

অনেকক্ষণ। আমি তো ওইপথে আসিনি। এসেছি হরিদাস স্বামীর সমাধিমন্দিরের পাশ দিয়ে। আমি কখন যে এসে এখানে দাঁড়িয়েছি তা তুমি টেরও পাওনি।

কেন ওদিক দিয়ে এলে কেন?

তুমি যখন বোকার মতো এদিকে তাকিয়ে থাকবে, আমি তখন অন্যদিক থেকে এসে তোমাকে চমকে দেব বলে।

সব্যসাচী বলল, তুমি একটি হাড়বজ্জাত মেয়ে।

মেয়েটি বলল, তুমি খুব রেগেছ। নাও, আমার দিদিমার তৈরি কুলের আচার খাও।

মেয়েটি একটা পলিপ্যাকের মধ্যে করে আনা কুলের আচার বের করে সব্যসাচীকে দিল। তারপর দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে একটু একটু করে সেই আচার খেতে লাগল।

সব্যসাচী বলল, এবার বলো কেন ডেকেছিলে। তুমি না বলেছিলে আমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কী সে কথা?

মেয়েটি বলল, তার আগে বলো তোমার নাম কী? নামটাই তো জানা হল না।

আমার নাম সব্যসাচী। তোমার নাম?

আমার নাম আন্নাকালী।

ধ্যাত। তোমার মতো মেয়ের ওই নাম হয় নাকি? ঠিক করে বলো।

আমার নাম জয়া।

হ্যাঁ। এই তোমার ঠিক নাম। আমি যতগুলো এই নামের মেয়ে দেখেছি তারা সবাই ভীষণ খেয়ালি হয়। ডানপিটে হয়।

সব্যসাচীর কথা শেষ হতেই ফোঁস করে উঠল জয়া। বলল, ওরে চোরাবালি। তুমি তা হলে অনেক মেয়ের সঙ্গেই মিশেছ। যাও খোকন ঘরে যাও। যে সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেশে আমি তাদের পাত্তা দিই না।

সব্যসাচী বলল, বাঃ রে। আমার কাকিমার মেয়ের নাম জয়া। সে ড্যাং-গুলি খেলে মাথা ফাটিয়েছিল। আমার পাশের বাড়ির বকুলদির ছোট বোন জয়া। সে

একবার পেয়ারাগাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে পা ভেঙেছিল। আর আমার মামার বাড়ি হরিপালের যে কাজের মেয়েটা, সে পাড়ার একটা ছেলেকে ঝাঁটা দিয়ে এমন পিটিয়েছিল যে সেই থেকে তার নামই হয়েছিল রায়বাঘিনী।

জয়া তখন আপন মনেই কোনওদিকে না তাকিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সব্যসাচী যেতে যেতে বলল, কী ব্যাপার! কথা বলছ না কেন? তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে? আমি কিন্তু জয়া নামের আরও একটি মেয়েকে জানি, যে খুব কথায় কথায় মাথাগরম করে, যে খুব ভ্যাংচায়, যে আয়নায় রোদ্দুর ধরে ছেলেদের মুখে ফেলে।

জয়া রাগত অথচ হাসি হাসি মুখে ঘুরে তাকিয়ে বলল, উঃ। একটানা কী সব বকে চলেছ পাগলের মতো? তোমার টেপ রেকর্ডারটা একটু থামাবে?

টেপ রেকর্ডার?

হ্যাঁ। তোমার ওই মুখটা একটু বন্ধ করো। সমুদ্রের ডাক শোনো। জলের ভাষা বোঝো।

ও আমি বুঝতে পারব না। কিন্তু তুমি আমাকে কী জন্যে ডেকেছিলে সেটা তো কই বললে না?

জয়া এবার থমকে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে সব্যসাচীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর ওর চোখে চোখ রেখে বলল, ওঃ হো। কেন ডেকেছিলাম বলো তো?

সেটা তুমিই জানো।

জয়া উল্লসিত হয়ে বলল, হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবে?

কোথায়?

সেখানে একা যেতে আমার সাহস হচ্ছে না।

কতদূরে সে জায়গাটা?

জানি না। তবে দূর আছে। এই যে দেখছ পথটা সোজা দূরের দিকে চলে গেছে—সারিবদ্ধ পাখার সারি, ওই দিকে।

সব্যসাচী সেইদিকে চেয়ে থেকে বলল, এই পথটা সকাল থেকে কেন জানি না আমাকেও টানছে।

কাল থেকে আমাকেও। ওই দেখো, দূরে বহুদূরে আবছা কালো মতো কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওটা একটা পাহাড়। কে যেন একজন সকালেই বলছিল ওই জায়গাটা নাকি ভারী সুন্দর। ওখানে একটা নদী এসে মিলেছে সমুদ্রে।

তার মানে মোহানা।

তাই হবে। যাবে ওদিকে? আমার সকাল থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল মনের মতো একজন সঙ্গী পেলে ওখানেই যাই।

সব্যসাচী বলল, ফিরতে দেরি হয় যদি?

কী আর হবে? না হয় একটু বকুনি খাব।

চলো তবে।

কুলের আচার খাওয়া শেষ হয়েছে। ওরা দু'জনেই তখন চটচটে এঁটো হাতটা সমুদ্রের জলে ধুয়ে ভিজে বালি মাড়িয়ে জোর কদমে দূরের দিকে এগিয়ে চলল।

পশ্চিমি রোদ তখন ওদের মুখের ওপর।

চারদিকে তখনও কত লোক। কত স্নানার্থী।

কত জেলে জাল ফেলে মাছ ধরছে।

কত সামুদ্রিক পাখি ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ওপর।

মরা কাছিমের পচা গন্ধ নাকে আসছে।

জগৎ পারাবারের তীরে এই দুই কিশোরকিশোরী তখন প্রাণের জোয়ারে যেন ভেসে চলেছে এক অজানার উজানে। ওদের মনে আনন্দ আর ধরে না।

চার

ভিজে বালির ওপর দিয়ে পথ চলতে চলতে একসময় ওরা বালিয়াড়ি পার হয়ে পাকা রাস্তায় উঠল।

নির্জন পথ। মাঝে মাঝে দু'-একটা পোড়ো বাড়ি চোখে পড়ল।

কোনও কোনও জায়গায় অবশ্য হলিডে হোম অথবা ওই ধরনের কিছু যাত্রীনিবাস গড়ে উঠছে।

কিন্তু পথের যে শেষ হয় না।

সব্যসাচী বলল, আর কতদূর?

জয়া বলল, কী করে জানব? আমি কি গেছি কখনও? সেই জন্যই তো ডেকে আনলাম তোমাকে। এত দূরের পথ কি একা আসা যায়?

আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।

কীসের ভয়! ভূতের?

না, তা নয়। কী নির্জন দেখছ না। মাঝি, মাল্লা, নুলিয়া, জেলে কেউ নেই এখানে। কাউকে যে কিছু জিজ্ঞেস করব সে সম্ভাবনাও নেই।

না থাক। এসেছি যখন জায়গাটা না দেখে ফিরছি না।

যেতে যেতে একসময় পিচ ঢালা পাকা রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল। তখন ওরা

এমন এক জায়গায় এসে পড়ল যে জায়গাটাকে একটা মরুভূমি বললেও ভুল হয় না। বাঁদিকে সমুদ্রকে বাদ দিলে সত্যি সত্যিই সেটা যেন একটা মরুভূমি।

এইখানে হঠাৎ কয়েকজন কাঠুরিয়ার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল। তারা মাথায় ঝাউকাঠের বোঝা নিয়ে স্বর্গদ্বারের দিকে যাচ্ছিল।

সব্যসাচী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, নদী যেখানে সাগরে মিশেছে সে জায়গাটা আর কতদূরে গো?

তারা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এমন অবেলায় সেখানে গিয়ে কী করবে? আর একটু পরে সূর্য ডুবলেই তো সন্ধে হয়ে যাবে।

কেন যাওয়া যাবে না?

যাবে না কেন? যাবে আর আসবে। একদম দেরি কোরো না। জায়গাটা খুব খারাপ।

জয়া বলল, কিন্তু কতদূরে?

এই তো এসে গেছ।

ওরা বালির ওপর দিয়ে খানিক এগোতেই দেখতে পেল কী সুন্দর ঘন নীল জলের একটা নদী সমুদ্রে এসে মিশেছে।

সব্যসাচী লাফিয়ে উঠল, ওঃ কী সুন্দর এই জায়গাটা।

জয়া বলল, কেন যে লোকে স্বর্গদ্বারের বালি কামড়ে পড়ে থাকে তা কে জানে? এই তো বেড়াবার উপযুক্ত জায়গা।

সব্যসাচী বলল, জয়!

জয় নয়, জয়া।

ওই হল। ওই দেখো তোমার পাহাড়।

পাহাড় কোথায়? ওটা তো দেখছি উঁচু বালিয়াড়ির ওপরে একটা ঘন ঝাউবন।

যদি সকালের দিকে আসতাম তা হলে যেভাবেই হোক নদী পার হয়ে চলে যেতাম ওখানে।

জয়া হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করে উঠল, সব্যসাচী! পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি।

কী পেয়েছ?

যা কেউ পায় না। আস্ত একটা শাঁখ। তাও আবার জ্যান্ত।

সব্যসাচী ছুটে গেল, কই দেখি?

জয়া শাঁখটাকে হাতে করে ছুড়ে দিল ওর দিকে। বলল, সাবধানে দেখবে কিন্তু। এরা খুব কামড়ে দেয়।

পঞ্চমুখী শাঁখ। খুব একটা বড় নয়। তবে নেহাত ছোটও নয়। খুঁজতে খুঁজতে আরও অনেক ছোট ছোট শাঁখ মিলল। সেই সঙ্গে রংবাহারি অজস্র ঝিনুক। ওরা

যে কী করবে তা ভেবে পেল না। সমুদ্র তার এত সম্পদ যে ওদের জন্যে থরে থরে সাজিয়ে রাখবে এখানে তা কে জানত? কিন্তু মুশকিল হল এত সব ওরা নিয়ে যাবে কী করে? ওরা যে কিচ্ছু আনেনি। এমনকী কারও কাছে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই।

জয়া বলল, কী করি বলো তো? এ জিনিস ছেড়ে গেলে সারারাত আমি ঘুমোতে পারব না।

আমিও কি পারব ভেবেছ?

যদি তুমি কিছু মনে না করো, একটা কথা বলব?

বলো।

তুমি তো ছেলে। ভেতরে গেঞ্জি একটা পরে আছ নিশ্চয়ই। তা এক কাজ করো না, তোমার জামাটা খুলে ওর মধ্যেই মুড়ে নাও। আমি মেয়ে। আমার পক্ষে ওই ভাবে কিছু নেওয়ার অসুবিধে আছে। তাও যদি বুদ্ধি করে চুড়িদারটা পরে আসতাম তা হলেও না হয় হত। কিন্তু ফ্রক পরেই যে কাল করেছি।

সব্যসাচী বলল, ঠিক আছে। আমি আমার জামার মধ্যেই সব নেব। তুমি আরও কুড়োও। আমি বরং ওই বালিয়াড়ির ওপরটায় উঠে গিয়ে একটু দেখি ওগুলো নিয়ে যাবার মতো কোনও কিছু পাই কিনা।

কী পাবে ওখানে?

দেখে মনে হচ্ছে এখানে মড়াটড়া পোড়ানো হয়। কোনও কলসি বা পলিপ্যাক জাতীয় কিছু যদি পাই তো মন্দ কী?

দেখো তবে। কিন্তু মড়াদের জিনিসপত্তর কিছু যেন নিয়ো না। ওরা ভারী বদ। স্বপ্নে দেখা দিয়ে সব কিছু ফেরত চায়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে ভয় দেখায়।

সব্যসাচী ওর কথায় হেসে উঠে বলল, তোমার মুণ্ডু। বলেই একটা কলসি নিয়ে এসে কুড়নো ঝিনুক শামুক শাঁখ কড়িগুলো তার মধ্যে পুরে নিল।

তারপর নদীর একটা খাড়ি যেখানে বালিয়াড়ির মধ্যে ঢুকেছে সেইখানে উঁচু একটা বালির ঢিবিতে উঠে চারপাশ দেখেই কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে নেমে এল।

জয়া তখনও এক মনে ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছে।

সব্যসাচী বলল, জয়া! একবার ওই বালির ঢিবিতে ওঠো।

কেন, কী আছে ওখানে?

ওখানে কিছুই নেই। যা আছে তা এই নদীটার ওপারে। কী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সেখানকার। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না।

তুমি কি ওপারে যেতে চাও?

যদি তুমিও যাও।

জয়া এবার মিলনমুখী নদীর জলধারার দিকে তাকিয়ে বলল, নদীর এখানে

গভীরতা খুব কম। হয়তো হাঁটু জল। কিন্তু মোহানার নদী। পার হতে পারবে তো?

খুব পারব। এতদূর যখন এসেছি তখন ওপারটা না দেখে কি যাওয়া ঠিক? ওপারে গিয়ে ওই বালিয়াড়ির উঁচুতে উঠে আরও ওপারে কী আছে দেখে তবেই ফিরব।

বেলা পড়ে আসছে কিন্তু।

আসুক না। যাব আর আসব।

আর কথা নয়।

দু'জনেই তখন নেমে পড়ল জলে। ওঃ সে কী টান জলের। তেমনি ঠান্ডা।

দু'জনে দু'জনকে ধরে টলমল করতে করতে বহু কষ্টে নদীটা পার হল।

ওপারে গিয়ে যখন পৌছল তখন যেন বিশ্বজয়ের আনন্দ ওদের মনে।

নদীটা এইদিক দিয়েই বয়ে আসছে।

এখানে একটা বাঁক আছে। সেই বাঁকের মুখে গিয়ে ওরা দেখল কী দারুণ নির্জন আর অনবদ্য প্রকৃতির বুক চিরে বয়ে আসছে নদীটা। ঘন নীল তার জলের রং। কত সামুদ্রিক পাখি উড়ছে সেই নদী আর বালিয়াড়ির মাঝখানে।

ওরা দু'জনে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই নদীর গতিপথের দিকে। তারপর বালিয়াড়ি পার হয়ে ওপরের ডাঙায় উঠতে লাগল।

খানিক এসেই ওদের চক্ষুস্থির। কত ঝিনুক-কড়ি যে এখানে ছড়ানো আছে, তা কে জানে। দেখে চোখ কপালে উঠল ওদের।

জয়া তো সব ভুলে আবার শুরু করল ঝিনুক কুড়োতে।

সব্যসাচী বলল, শোনো জয়া, বেশি লোভ কোরো না। কাল বরং আমরা আবার আসব। সঙ্গে একটা ব্যাগ নিয়ে আসব। আর তখনই আমরা লুটে নেব এই কুবেরের ভাণ্ডার।

জয়া বলল, কালকের কথা কাল। আজ আমি এগুলোকে ছেড়ে যেতে পারব না।

প্লিজ। আর দেরি করলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। এখনই সন্ধে হয়ে আসছে কিন্তু।

তা হলে চলে এসো তুমি।

আমি যে ওপরে উঠে একটু দেখতে চাই।

আমিও যে এগুলো সব কুড়োতে চাই।

তুমি তা হলে তোমার কাজ করো, আমি বরং প্রকৃতি দেখি।

সুবুদ্ধি হোক তোমার।

সব্যসাচী ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। চারদিকে কত কাঁটাগাছ এখানে।

ছোটখাটো ঝোপঝাড়। ওপরটা ঠিক যেন পাহাড়ের মতো উঁচু।

ওপরে উঠেই মুগ্ধ হয়ে গেল সব্যসাচী। সে কী অনন্ত সৌন্দর্য সেখানে। কী বিশাল ঝাউবন। ঘন থেকে ঘনতর হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। আর কী ভয়াবহ নির্জনতা চারদিকে।

সব্যসাচী মুগ্ধ চোখে চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ কী দেখে যেন চমকে উঠল। সে চোখদুটো বড় বড় করে অবাক বিস্ময়ে সেইদিকে চেয়ে থেকে ডাকল, জয়া! শিগগির একবার এদিকে এসো। খুব তাড়াতাড়ি।

কিন্তু আমার এই জিনিসগুলো?

ওগুলো ওখানে পড়ে থাক। আগে এসো তুমি।

এক মিনিট। এখুনি যাচ্ছি।

সব্যসাচীর ডাক শুনে দ্রুতপায়ে বালিয়াড়ির ওপরে উঠল জয়া। খুব তাড়াতাড়ি কি ওঠা যায়? বালিতে পা হড়কে ওপরে ওঠার সে কী কষ্ট।

সূর্য তখন অস্তাচলে।

লাল রঙের সূর্যটা সমুদ্রের জলের ওপর বসে পড়েছে তখন।

দিগন্তে তখন সে কী রঙের খেলা।

রংবাহারি মেঘ। রঙিন আকাশ। রঙে রাঙা চারদিক।

সেই সঙ্গে দিগন্ত জুড়ে বিভীষিকা।

কেন না সন্ধে হয়ে আসছে তখন। সমুদ্রের গর্জন দ্বিগুণ হচ্ছে। সেই জনমানবহীন প্রান্তরের নিস্তব্ধ নির্জনতায় ওরা যা দেখল তা রীতিমতো ভয়ের এবং বিস্ময়ের।

কী দেখল ওরা?

ওরা দেখল ঝাউবনে নয়, নদীগর্ভে নয়, নদী আর বালিয়াড়ির মাঝামাঝি একটা অংশে যেখানে অনেক বুনো ঘাস, শন, কাঁটাঝোপ ঠিক সেইখানে, দশ বারো বছরের একটি বালকের দেহ অনড় হয়ে পড়ে আছে। দেখে বেশ ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হল।

সব্যসাচী বলল, এ নিশ্চয়ই সে।

জয়া বলল, কে ও?

সকালবেলা সমুদ্রতীর হতে নিখোঁজ হয়েছিল যে ছেলেটি।

কী করে জানলে?

মনে হয়।

কিন্তু সে কী করে এখানে আসবে?

জানি না। শুনেছি সমুদ্র নাকি যাদের টেনে নেয় তাদের মৃতদেহ ফেলে দেয় অনেক দূরে।

তাই বলে এতদূরে?

এই তো নিয়ম।

আমার খুব ভয় করছে কিন্তু। চলে এসো এখন থেকে।

সে কী! ছেলেটার কাছে গিয়ে একবার দেখবে না?

কী দেখব? দেখবার কী আছে? ওটা তো একটা মড়া।

আমরা ফিরে গিয়ে ওর মা-বাবার খোঁজ করে খবর তো একটা দিতে পারব।

জয়া দারুণ ভয় পেয়ে বলল, আমি যাব না। তুমি যাও।

সব্যসাচী এক-পা দু'-পা করে এগিয়ে গেল ছেলেটির কাছে। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা ছেলেটিকে চিৎ করে দিতেই, ওর মনে হল ছেলেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যেন।

শুধু তাই নয়, একবার একটু চোখ মেলে তাকিয়েই চোখটা বুজে নিল।

জয়া ওপর থেকেই হেঁকে বলল, সব্যসাচী! তোমাকে এখনও বলছি তুমি চলে এসো। না হলে কিন্তু তুমি মরবে।

সব্যসাচী ছেলেটির কাছ থেকে সরে না এসেই বলল, তুমি মিছেই ভয় পাচ্ছ জয়া। ছেলেটা মরেনি।

ভীত সন্ত্রস্ত জয়া বলল, কী করে বুঝলে?

তুমি একবার এসে দেখো।

আমার দারুণ ভয় করছে, আমি যাব না। উঃ কী বিপদেই যে পড়লাম।

ভয় পাবার কিছু নেই। এখানে তুমি একা নও। আমি তো আছি। ছেলেটা একটা শ্বাস ফেলল।

সে কী!

চোখ মেলে তাকাল।

মানে!

তার মানে ও বেঁচে আছে।

কেমন যেন কান্নাধরা গলায় জয়া বলল, ও বেঁচে নেই সব্যসাচী। এই রকম অবস্থায় ও যে কী তা কি তোমাকে বলে দিতে হবে?

ওসব কিছু নয়, তুমি কি ভাবছ ও মরে ভূত হয়েছে? পাগলি কোথাকার। এসো, নেমে এসো এখানে। এসে হাত লাগাও।

কী করতে চাও তুমি ওকে নিয়ে?

কিছু না। আমরা দু'জনে মিলে ওকে ধরাধরি করে একটু পরিষ্কার জায়গায় বালির ওপর শোয়াব।

তুমি কী! তোমাকে কি দানোতে ভর করেছে?

সব্যসাচী মনে মনে হেসে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে আর ভালও

করে পরীক্ষা করতে লাগল। যদি আবার একবার ওর দিকে চোখ মেলে চায় সেই আশায়। ওর বুকের জামা সরিয়ে বুকে হাত দিয়ে দেখল গা ঠান্ডা কি না। মড়াদের গা তো ঠান্ডা হয়। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না ও।

জয়া হেঁকে বলল, সব্যসাচী! এখনও বলছি তুমি চলে এসো।

একটু দাঁড়াও।

তা হলে থাকো তুমি ওকে নিয়ে। আমি পালাই। এই বলেই পিছু ফিরল সে।

সব্যসাচী ব্যাকুল হয়ে বলল, না না, এরকম কোরো না। আজ সকালে ওর মা-বাবার কান্না শোননি তো? বাবা জগন্নাথের অসীম দয়া যে, ছেলেটা বেঁচে আছে। এসো আমরা দু'জনে মিলে ওকে সুস্থ করি।

কিন্তু কাকে বলা? জয়া তখন বালিয়াড়ির ওপর থেকেই উধাও।

সব্যসাচী চিৎকার করে বলল, জয়া, তুমি যেয়ো না। তুমি চলে গেলে একা একা আমারও এখানে ভয় করবে। তা ছাড়া এইভাবে কাউকে ফেলে রেখে চলে যেতে নেই। তুমি চলে গেলে একা আমি বিপদে পড়ে যাব। মনে রেখো তোমাকে একটা নদী পার হতে হবে।

সব্যসাচীর সে কথার কোনও উত্তরই দিল না জয়া।

সব্যসাচী খুব ভয় পেয়ে গেল তখন।

হাজার হলেও সেও ছেলেমানুষ তো। এই অন্ধকারে সে যে কী করবে তা ভেবে পেল না।

এমন সময় ছেলেটি একবার মা বলে ডেকে উঠল যেন।

ছেলেটি কি সত্যিই জীবিত? না, মরে ভূত হয়ে অমন করছে? কে জানে তা।

সে তখন খুব জোরে জোরে চেঁচাতে লাগল, জয়া! জয়া! জয়া ফিরে এসো, জয়া!

এমন সময় ঝাউবনের দিক থেকে দুটো টর্চের আলো এসে গায়ে পড়ল ওর।

কারা যেন হেঁকে বলল, কে? কে ওখানে?

সব্যসাচী ভয়ে ভয়ে বলল, আমি।

আমিটা কে?

আপনারা আমাকে চিনবেন না। আমি সব্যসাচী। একবার আসুন না এখানে। আমার খুব ভয় করছে।

দু'জন লোক দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে বলল, কে তুমি! এমন অসময়ে এখানে তুমি কী করছ?

সব্যসাচী বলল, আমি এখানে এসেছিলাম মোহানা দেখতে। জয়া নামে একটি মেয়েও ছিল আমার সঙ্গে। মেয়েটি হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল।

ভয় পেয়ে?

হ্যাঁ, ভয় পেয়ে।

লোক দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল, কেন ভয় পেল কেন? কিছু কি দেখেছ তোমরা?

সব্যসাচী তখন সকালের ঘটনাটা বলল ওদের। তারপর দেখিয়ে দিল ছেলেটাকে। দিয়ে বলল, মনে হয় ও বেঁচে আছে। কিন্তু মেয়েটা ভাবল ও বুঝি মরে ভূত হয়েছে, তাই ভয়ে পালিয়ে গেল।

আর কিছু দেখনি তো? বলে ওরা এগিয়ে গেল ছেলেটির কাছে। গিয়ে কী সব দেখেটেখে বলল, রাখে হরি তো মারে কে? সমুদ্রের গ্রাস থেকে এইভাবে কেউ বাঁচে না। তবে মজার ব্যাপার এই, ছেলেটি প্রাণে বাঁচলেও ওর বডি তো এখানে আসবার কথা নয়। আসেও যদি সে-দেহে প্রাণ থাকবে না। মনে হয় দেহটা কেউ বয়ে এনেছে।

সব্যসাচী বলল, সে কী! কে আনবে?

কে আনবে বা আনতে পারে সেটা তদন্তের ব্যাপার। হয়তো ছেলেটি সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে জেলেদের জালে আটকে যায়। তাই জাল ধরে জ্ঞান হারিয়েও প্রাণে বাঁচে। পরে জেলেরা ওকে এইখানে নিরাপদ জায়গায় এনে মড়া মনে করে ফেলে রেখে চলে যায়।

এটা কি ওদের উচিত হল?

কখনই না। হয়তো পুলিশি ঝামেলার ভয়ে ওরা এড়িয়ে গেছে ব্যাপারটাকে। তা ছাড়া এমনও হতে পারে, ছেলেটি আদৌ সমুদ্রে তলায়নি। জলে পড়ার পরই সুকৌশলে ওকে অপহরণ করেছে কেউ।

কী বলছেন আপনারা? অপহরণ!

হ্যাঁ, অপহরণ। ছেলেটির বাবা-মায়ের ওপর হয়তো রাগ ছিল কারও। তাই কিডন্যাপ করে জলে জলেই টেনে আনার পর ছেলেটির অবস্থা খারাপ দেখে এইখানেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

সব্যসাচী বলল, উঃ, কী সাংঘাতিক।

ঠিক আছে, তুমি বসো। আমরা দেখছি ওর কী ব্যবস্থা করতে পারি। এই বলে ওরা দু'জনে নানারকম কসরত করল ছেলেটিকে নিয়ে। ওর পেট থেকে জল বার করে ওকে সুস্থ করবার চেষ্টা করতে লাগল।

আর সব্যসাচী? সে উঁচু একটা বালিয়াড়ির ওপর বসে কত কী ভাবতে লাগল। বেশি করে ভাবতে লাগল জয়ার কথা। মড়া দেখে ভূতের ভয় পেয়ে যে মেয়ে পালাতে পারে, সে এই আবিল অন্ধকারে একা এই দীর্ঘপথ কী করে যাবে, তা সে ভেবে পেল না। তবু দুঃখ এই, মেয়েটা কী স্বার্থপর। সঙ্গীকে এইভাবে

একা রেখে কেউ পালায়? ওর কি হৃদয় বলেও কিছু নেই? নাকি ওর প্রকৃতিই এইরকম? আর এই লোক দু'জন? এরাও তো রহস্যময়। এই নির্জনে অন্ধকারে কী করছিল এরা? এমন পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে যে বোঝাই যাচ্ছে এরা বাঙালি। তা হলে? ওই অন্ধকার ঝাউবনে এই অসময়ে কেউ থাকে? তাও এই গভীর নির্জনে?

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা ডাকল, এই যে খোকা! কী যেন নাম বললে তোমার? সব্যসাচী না কী! এদিকে এসো।

সব্যসাচী ওদের কাছে যেতেই বলল, যা ভেবেছি তাই। ছেলেটি সমুদ্রগ্রাসে পড়েনি। ওকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। ওর গলায় ঘাড়ে চারদিকে মানুষের নখের দাগ। ওর গলা টিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল কেউ। কিন্তু পারেনি।

সব্যসাচী শিউরে উঠল, তা হলে?

তা হলে আর কী, এ যাত্রায় বেঁচে গেল ছেলেটি। কিন্তু মুশকিল হল। এই দীর্ঘ পথ ওকে তুমি নিয়ে যাবে কী করে?

ওর জ্ঞান ফিরেছে?

হ্যাঁ। কিন্তু পথ হাঁটার ক্ষমতা ওর নেই।

একটা কিছু উপায় আপনারা বার করুন।

তাই তো ভাবছিরে ভাই। ওকে আর তোমাকে নিয়েই যে এখন সমস্যা। কী করা যায়।

আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক যেতে পারব। কিন্তু আপনারা কি পারবেন দূরের ওই পাখাগুলোর কাছ পর্যন্ত আমাদের একটু পৌঁছে দিতে?

অসম্ভব। আমরা এখুনি চলে যাব। ওই দেখো আমাদের ডিঙি বাঁধা। সাগরে এখন জোয়ার এসেছে। তাই উজান বেয়ে চলে যাব এখুনি।

আমরা!

কিছু তো করার নেই আমাদের। চলেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় তোমরা এলে। আমরা দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলাম তোমাদের। সন্ধের জন্যও অপেক্ষা করছিলাম। মেয়েটা তোমাকে ফেলে রেখে কীভাবে চলে গেল তাও দেখলাম। এখন বিদায় নিতে হবে আমাদের।

সব্যসাচী বলল, আমি তা হলে একা থাকব?

তোমরা তো দু'জন। এই দেখো উঠে বসেছে ছেলেটা।

সব্যসাচী বলল, বেশ। ও একটু সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত বসেই থাকি তা হলে।

বেশিক্ষণ বসতে হবে না। লোকজন এখুনি এসে যাবে।

সব্যসাচী সবিস্ময়ে বলল, কোথা থেকে আসবে লোকজন?

ওরা হেসে বলল, দেখই না কোথা থেকে আসে। তোমার সঙ্গী সেই মেয়েটি

নিশ্চয়ই কিছুদূরে গিয়ে চেঁচামেচি করে তোমার এবং এই ছেলেটির কথা বলবে সকলকে। আর তখনই লোকজন ছুটে আসবে হই হই করে।

সব্যসাচী হতাশার সুরে বলল, তা হলে তো ভালই হয়। কিন্তু ও মেয়ে কি আমাদের কথা বলবে কাউকে? হয়তো চেপেই যাবে ব্যাপারটা।

ওরা হাসল, তা কেন? ওই—ওই আসছে। ওই দেখো দূরে, বহু দূরে বহুলোক। কতকগুলো টর্চ একসঙ্গে নিভছে জ্বলছে।

সব্যসাচী সেইদিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাই তো।

ওরা বলল, তা হলে চলি আমরা? বিদায় বন্ধু বিদায়।

কিন্তু আপনাদের পরিচয়? এই বিপদে এইভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন আপনারা, অথচ আপনাদের পরিচয় তো জানা হল না।

ওরা হো হো করে হেসে বলল, পরিচয় জানবার দরকার নেই আমাদের। আমরা খুব খারাপ লোক। আমাদের কথা কিন্তু কাউকে বোলো না।

বেশ বলব না।

লোক দু'জন ডিঙি নিয়ে জোয়ারের স্রোতে ভেসে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আর সব্যসাচী দেখল একদল লোক টর্চের আলো ফেলে ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ওদের সঙ্গে জয়াও আছে নিশ্চয়ই।

হঠাৎ জয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দূর থেকেই চেঁচিয়ে ডাকছে সে, স—ব্য—সা—চী—ই—।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সেই স্বর কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে যেন।

সব্যসাচীও মুখের দু'পাশে হাত রেখে ওর ডাকে সাড়া দিল, আমি এ—খা—নে—এ।

কোথায় তুমি—ই—ই।

এই তো এ—খা—নে—।

সব্যসাচী ছেলেটিকে বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে একটু আসতে পারবে ভাই?

কতদূরে?

সামান্য একটু পথ। ওই যে ওরা যেখান থেকে ডাকছে আমাদের।

তুমি আমাকে ধরে থাকলে পারব।

সত্যসত্যই ছেলেটির তখন উঠে দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই। তবু সব্যসাচী ওকে হাত ধরে টেনে তুলল। কিন্তু দু'-এক পা গিয়েই ধপাস।

সব্যসাচী বলল, এক কাজ করো ভাই, আমার গলাটা আঁকড়ে ধরো তুমি। আমি তোমাকে এইটুকু পথ পিঠে করেই বয়ে নিয়ে যাই।

ছেলেটি বলল, তোমার কষ্ট হবে না?

হলেই বা করবটা কী? তোমাকে তো এইভাবে এখানে ফেলে রেখে আমি চলে যাব না। গেলে অনেক আগেই যেতে পারতাম।

সব্যসাচী ছেলেটিকে বহু কষ্টে তুলে দাঁড় করাল। তারপর ওর হাত দুটি কাঁধের দু'পাশ দিয়ে টেনে ধরে বয়ে নিয়ে চলল ওকে। কিন্তু সামান্য পথ এসেই হাঁফিয়ে পড়ল। এসব কী ওর মতো ছেলের কাজ? কত শক্তি রাখতে হয় দেহে।

ছেলেটি বলল, এভাবে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না ভাই। তোমার কষ্ট হবে।

তা হলে তুমি যাবে কী করে? এইখানে এইভাবে তো সারারাত থাকা যাবে না। তা ছাড়া আমারও মা-বাবা চিন্তা করবেন।

সারারাত হয়তো থাকব না। কেন না সমুদ্রের হাওয়ায় এখন আমি একটু যেন সুস্থ বোধ করছি।

তা হলে এক-পা দু'-পা করে এগিয়ে এসো।

ছেলেটি সব্যসাচীর কাঁধে ভর করে, হাত ধরে কাঁপা কাঁপা পায়ে এগোতে লাগল।

কী জোরে হাওয়া বইছে তখন।

গভীর সমুদ্র অন্ধকার।

অথচ আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র মহানীলে চুমকির মতো চিকমিক করছে।

প্রকৃতির এ এক অনবদ্য রূপ।

দূর থেকে স্বর্গদ্বারের আলোর রোশনাই দেখে ওদের মনে হল ওখানে যেন আজ উৎসবের রাত।

সব্যসাচী যেতে যেতেই বলল, আর একটু কষ্ট করে এসো। ওই দেখো, কারা সব আসছে।

অনেকগুলো টর্চের আলো তখন এসে পড়েছে ওদের গায়ে। জয়ার সঙ্গে প্রায় দশ বারোজন লোক।

জয়া তো ছুটে এসেই জড়িয়ে ধরল সব্যসাচীকে।

সব্যসাচীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। এত লোকের সামনে এ কী! মেয়েটা কি হাফ পাগলি, না ফুল ম্যাড?

সব্যসাচী ওর হাত ছাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, ছাড়ো ছাড়ো। কী হচ্ছে। লোকে কী বলবে?

জয়া বলল, সব্যসাচী! তুমি আমাকে ভুল বোঝনি তো?

না। তবে তোমার ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছি। আমাকে ওই ভাবে একা ফেলে পালিয়ে গেলে কেন?

তার আগে বলো তুমি কি আমার কথা শুনেছিলে?

আমি ছেলেটার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখেছিলাম।

আমি দেখেছিলাম ভূত। আসলে ভূতকে আমার দারুণ ভয়। আমি মড়া বয়ে নিয়ে যাওয়াও দেখতে পারি না।

সে কী!

তাই তুমি যেই বললে, ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, চোখ মেলে তাকাল, তখন আমার কী ভয় যে হল, তা তোমাকে কী বলব। তোমাকে আমি বার বার বললাম পালিয়ে আসতে, কিন্তু তুমি এলে না।

তোমার ডাকে চলে গেলে পালাতে হয়তো পারতাম! কিন্তু ছেলেটাকে তো বাঁচাতে পারতাম না।

অন্যান্য লোকজন যারা এসেছিল, মানে জয়া ডেকে এনেছিল যাদের, তারা বলল, এই বুঝি সেই ছেলেটি?

হ্যাঁ। এই সেই।

একজন ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী ভাই?

আমার নাম পার্থ।

তুমি এখানে এলে কী করে?

জানি না। সমুদ্রে পড়ে গিয়ে হঠাৎ ভেসে গেলাম। তারপর কীভাবে যে কী হল, কিছুই আমার মনে নেই।

একটু কিছু মনে পড়ছে না?

না। চোখ মেলেই আমি আমার এই বন্ধুটিকে দেখলাম।

তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে?

না। আপনারা আমাকে একটা গাড়ি করে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমার যে কী হচ্ছে তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। আমাকে আমার মা-বাবার কাছে নিয়ে চলুন।

সবাই তখন অসুস্থ ছেলেটিকে বয়ে নিয়েই চলল লোকালয়ের দিকে।

বেশিদূর অবশ্য যেতে হবে না।

খানিক যাবার পর পাকা রাস্তায় উঠলে কিছু-না-কিছু মিলবেই।

সবার পেছনে পরস্পরের হাত ধরে চলল জয়া ও সব্যসাচী।

জয়া বলল, আজ যা বাড়িতে হবে না।

সব্যসাচী বলল, আমারও।

এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজে চারদিক তোলপাড় করছে। পুলিশে খবর দিয়েছে।

মনে হয় তাই। আমার বাবা-মা, আর তোমার মামা-মামি সবাই একজোট হয়ে হয়তো ঘরবার করছেন।

এই ভাবে কথা বলতে বলতে ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর, এখানকার ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের একটি গাড়ি দেখতে পেল। ওদের সহযোগী মানুষজন যারা ছিল তারা সবাই গিয়ে ওদের বিপদের কথাটা খুলে বলল গাড়ির ড্রাইভারকে।

এক কথায় কাজ।

ড্রাইভার সব্যসাচীকে, জয়াকে, পার্থকে এবং সেই সঙ্গে আরও দু'জনকে তুলে নিলেন গাড়িতে। তারপর বললেন, যাবার আগে থানায় একটা ফোন করে যাই। তা হলে স্বর্গদ্বারে পৌঁছলেই ছেলেটির বাবা-মায়ের সন্ধান পেয়ে যাব। এই বলে ড্রাইভার ফোন করে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

সঙ্গে আরও যেসব লোকজন ছিল তারা হাত নেড়ে বিদায় জানাল সবাইকে।

ফাঁকা রাস্তা ধরে কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছল স্বর্গদ্বারে।

শুধু পুলিশ নয়, পার্থর বাবা-মা, জয়ার মামা, সব্যসাচীর মা-বাবা সবাই হাজির সেখানে।

সরমা তো হারানিধি ফিরে পাওয়ার মতো বুকে জড়িয়ে ধরলেন সব্যসাচীকে।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, কী চিন্তা যে হয়েছিল আমার। তবে তোমরা যে একটি ছেলের জীবন রক্ষা করতে পেরেছ তাতে তিরস্কার নয়, তোমাদের দু'জনকেই পুরস্কার দেব আমি। কী চাই বলো।

জয়ার মামা বললেন, আমার তরফ থেকেও একটা পুরস্কার ঘোষণা করলাম আমি।

পার্থর বাবা-মা বললেন, না না। ওদের দু'জনকে তো আমরাই পুরস্কার দেব। এই ছেলেকে যে ফিরে পাব তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। বাবা জগন্নাথ আমাদের ডাক শুনেছেন।

কিন্তু কীভাবে কী হল?

সব্যসাচী দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথাই বলল সকলকে।

পুলিশও সব শুনল।

সব্যসাচী কিন্তু ভুলেও সেই দু'জনের কথা বলল না কাউকে।

পুলিশ যখন পার্থর মা-বাবা ও পার্থকে নিয়ে ব্যস্ত, ওরা তখন যে যার ঘরে ফিরে এল।

সবার মনেই আনন্দ। বিশেষ করে এই সময়টুকুর মধ্যে জয়ার মামা ও স্নেহাংশুবাবুর রীতিমতো বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠায় সব্যসাচী খুশি হল খুব। কেন না এরপর থেকে ওদের মেলামেশায় বা ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারে মনে হয় কোনও বাধা-বিপত্তি আর আসবে না।

পাঁচ

সে রাত্রে বাবা-মায়ের কোলের কাছে শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোলেও ভোরবেলা সাগর যাত্রীদের কলরবে ঘুমটা ভেঙে গেল। সব্যসাচী ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বারান্দায় আসতেই দেখল কত লোক চলেছে দলে দলে।

বারান্দায় আলো জ্বলছে।

ওদের পাশের ঘরেই সেই চাপদাড়ি যুবক, তাঁর ভাইঝিকে নিয়ে সূর্যোদয় দেখতে যাবেন বলে বেরোচ্ছেন। সব্যসাচীকে এইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, আরে! কী ব্যাপার! গুড বয় যে! এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ? যাবে তো চলো।

সব্যসাচী বলল, বাবা-মা দু'জনেই ঘুমোচ্ছেন।

তুমি তো ঘুমিয়ে নেই।

সব্যসাচী যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে এক মিনিট। বলেই ঘরে গিয়ে সোয়েটারটা গায়ে দিয়ে, গলায় মাফলার জড়িয়ে মাকে ডাকল, মা।

সরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, কী হল?

আমি সমুদ্রে যাচ্ছি।

না। সাহস তো কম নয়! আমাদের সঙ্গে ছাড়া কোথাও যাবে না তুমি।

আমি একা একা যাচ্ছি না। পাশের ঘরের দাদাও যাচ্ছেন, ওনার সঙ্গেই যাচ্ছি।

স্নেহাংশুবাবু পাশ ফিরে শুতে গিয়ে বললেন, যাচ্ছ যাও। বেশি দেরি করবে না কিন্তু। আর জলে নামবে না একদম।

সব্যসাচী জুতোটা পায়ে দিয়েই বেরিয়ে এল।

সরমাও এলেন।

যুবক হাসিমুখে বললেন, ভয় নেই। আপনার ছেলে আমার সঙ্গেই যাচ্ছে। ভাইঝি আছে সঙ্গে। রোদ উঠলেই ফিরে আসব আমরা।

সরমা বললেন, আসলে দস্যি ছেলে তো। তাই কোথাও যেতে চাইলে ভয় করে। তবে আপনি যখন আছেন...।

আমার ভাইঝি লিপিও আছে।

পিঠের ওপর লম্বা বেণী দোলানো কিশোরী লিপি মিষ্টি করে হাসল সরমার দিকে চেয়ে।

সরমাও হেসে বললেন, সাবধানে যেয়ো।

ওরা তিনজনে নীচে নেমে এল।

একদল গোরু তখন টুং টাং করে গলার ঘণ্টি নেড়ে চরতে যাচ্ছে।

গোরুগুলো চলে গেলে ওরা ধীর পায়ে এগোতে লাগল।

ওরা স্বর্গদ্বারের পথ না ধরে হলিডে হোমের সামনের পথ ধরেই চলল।

একেবারে নবনির্মিত রাজপথের ওপর এসে দাঁড়াল তিনজনে।

ডানদিকের পথটা চলে গেছে সেই পাখাগুলো ছাড়িয়ে মোহানার দিকে। বাঁদিকের পথ স্বর্গদ্বারে। সামনে সমুদ্র।

এতক্ষণ তিনজনেই চুপচাপ ছিল। এবার তিনজনেই সরব হল।

যুবক বললেন, তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে হে?

সব্যসাচী বলল, কেন?

আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? কী কীর্তিটা করলে বাবা কাল?

কী করেছি? কিছুই না।

কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথাই বলেই বুঝেছি তুমি সাধারণ ছেলে নও।

তা হলে কি অসাধারণ?

লিপি বলল, শুধু তাই নয়, অসামান্য। তুমি তো এখন হিরো।

সব্যসাচী হেসে লিপির দিকে তাকিয়ে বলল, বলো কী!

ছিপছিপে পাতলা চেহারার শ্যামাঙ্গী কিশোরী বলল, কাল সারাটা দুপুর আর বিকেল আমরা তোমাদের কথাই আলোচনা করছিলাম। তোমার সঙ্গে ওই যে মেয়েটি ছিল, কী যেন নাম?

জয়া।

ভারী মিষ্টি মেয়েটি।

তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?

না। দেখেছি এইমাত্র।

আজই আলাপ করিয়ে দেব।

কথা বলতে বলতেই ওরা স্বর্গদ্বারের দিকে এগোতে থাকল। স্বর্গদ্বার এই সময়ে বেশ জমজমাটি হয়। অবশ্য এই সময় বললে ভুল হবে। সর্বক্ষণ। আসলে ওই জায়গাটার আকর্ষণই আলাদা।

খানিক গিয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল ওরা।

চায় কফি বাবু।

ছোট্ট একটি চায়ের দোকান। সামনের বেঞ্চিতে এক নববিবাহিত তরুণ-তরুণী বসে আছে।

চা-ওয়ালা ওদের দেখতে পেয়েই বলল, চায় কফি—।

যুবক বললেন, চা না কফি, কোনটা?

লিপি বলল, আমরা কী বলব?

যা হোক বলো।

সব্যসাচী বলল, কফি।

যুবক বললেন, ঠিক বলেছ। কফির গন্ধ ছাড়া সি-বিচে বসে এইসব দোকানের চা খেলেই বমি উঠে আসবে।

লিপি নাক সিঁটকে বলল, ছোটকা!

যুবক হেসে আর একটি বেঞ্চি টেনে নিয়ে লিপি ও সব্যসাচীকে দু'পাশে বসিয়ে নিজে মাঝখানে বসলেন।

চা-ওয়ালা কফি করতে লাগল।

আকাশ তখনও অনন্ত নক্ষত্রে ভরা।

সমুদ্রের নীল জল অবিরাম ঢেউ নিয়ে তোলপাড় করছে। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক মানুষ, কখনও বা দু'-একজন, লঘু পায়ে চলে যাচ্ছে সামনে দিয়ে।

যুবক দূরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় বললেন, সব্যসাচী, কাল তুমি যা করেছ তার তুলনা হয় না। তবে একটা কথা, তুমি কী এর মধ্যে অন্য কিছুর গন্ধ পাওনি?

সব্যসাচী বলল, রহস্যের গন্ধ পেয়েছি।

কীরকম একটু শুনতে পারি কি?

এই যেমন ধরুন, ছেলেটিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দুষ্কৃতীদের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা ভেবে পাচ্ছি না।

আর কিছু?

অত লোকের চোখের সামনে ওরা কীভাবে কিডন্যাপ করল ছেলেটাকে? জলে জলে অতদূর নিয়ে যাওয়াও বড় সহজ কথা নয়, আর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে নিয়ে গেলেও লক্ষ জনতার ভিড়ে ধরা পড়বার ভয় ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, ছেলেটিকে অপহরণ করেও তাকে ওরা ওইভাবে ফেলে রেখে গেল কেন? ওকে ওরা গলা টিপে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু সে কাজেও ওরা সফল হয়নি।

তুমি ঠিক জান?

আমি স্বচক্ষে দেখেছি ওর গলার পাশে কালসিটে আর নখের দাগ।

এমনও তো হতে পারে, মারতে গিয়ে মমতার বশে হয়তো না-মেরে ছেলেটাকে মৃত ভেবেই ফেলে রেখে চলে গেছে ওরা।

অসম্ভব। খুন যারা করে আর অপহরণ যাদের পেশা, ওইসব মায়ামমতার ব্যাপার স্যাপারগুলো তাদের ভেতরে থাকেই না।

ব্যাপারটা তা হলে রহস্যের অন্ধকারেই রইল?

হয়তো। তবে রহস্য এখানে একটা নয়। আরও আছে।

কীরকম?

যেমন ধরুন...।

সাসপেন্সে রেখ না, বলে ফেলো।

চা-ওয়ালা কফি নিয়ে এল, আপনাদের কফি।

ওরা তিনজনেই কফি নিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কফি খেতে লাগল। খেতে খেতেই সব্যসাচী বলল, আমার মনে হয় ওই জায়গায়, ওই নির্জনতার আড়ালে অপরাধ জগতের কালোছায়াও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে।

তার মানে নিশ্চয়ই তুমি আরও এমন কিছু দেখেছ বা অনুভব করেছ যাতেই তোমার এইরকম ধারণা হয়েছে।

ঠিক তাই। অবশ্য এই ব্যাপারে আমি এখনও কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারব না, তবে ওই জায়গাটায় পুলিশের একটু নজর রাখা উচিত।

যুবক বললেন, কাল সি-বিচ থেকে ছেলেটি উধাও হবার পর, ওর মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে আমি জেনেছি, ওদের কোনও শত্রু ছিল না। ফলে আমিও এটাকে দুর্ঘটনা বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু তুমি যা বলেছ, তাতে তো মনে হচ্ছে এটা একটা সংগঠিত দলের কাজ।

সব্যসাচী বলল, দলের কাজ তো বটেই। না হলে এইরকম দুঃসাহসিক অপহরণ কী করে সম্ভব।

অপহরণে পরের ব্যাপারটাই তো রহস্যময়।

আমার মনে হয় রং টার্গেট!

লিপি এতক্ষণে কথা বলল, রং টার্গেট?

হ্যাঁ, যে কারণে মারতে গিয়েও ওরা মারেনি ছেলেটাকে। যখনই বুঝতে পেরেছে শিকার গ্রহণে গলদ রয়ে গেছে। তখনই ওরা বিদায় নিয়েছে। কিন্তু ওরা কারা? আর ওদের শিকারই বা কে ছিল? সেটা না জানতে পারলে...।

যুবক বললেন, তোমার ভেতরে দেখছি ঝানু গোয়েন্দার বীজ রয়েছে।

লিপি হেসে বলল, তুমি তা হলে এই ব্যাপারে একটু গোয়েন্দাগিরি করবে নাকি?

সব্যসাচী হেসে বলল, থাকব ক'দিন তাই জানি না।

যুবক কফি খাওয়া শেষ করে বললেন, একটু বেলায় রোদ উঠলে তুমি আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে?

সব্যসাচী বলল, ওরে বাবা। সে অনেকদূরের পথ।

ভয় নেই। হাঁটতে হবে না। একটা অটো করব।

তা হলে আমি রাজি।

শুধু তুমি আর আমি যাব। কেমন?

লিপি বলল, ওই দেখো ছোটকা, আকাশটা কেমন লাল হচ্ছে।

যুবক বললেন, চলো, স্বর্গদ্বারে যাওয়া যাক। বলে কফির দাম মিটিয়ে এগিয়ে চললেন দু'জনের মাঝখানে।

ওরা ভোরের অস্পষ্টতায় পথ হাঁটতে লাগল।

সব্যসাচী যেতে যেতেই বলল, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনার সঙ্গে এমন পরিচয় হল, অথচ আপনার নামটাই জানা হল না। এরপরে আবার দেখা হলে কী বলে ডাকব আপনাকে?

যুবক হেসে বললেন, ঠিক। নামটা তো জানা দরকার। আমার নাম হচ্ছে বি রায়। অর্থাৎ বিজয় রায়। সবাই আমাকে বিজুদা বলে ডাকে। তুমিও তাই ডাকবে।

সব্যসাচী বলল, আচ্ছা বিজুদা, আপনি যে অত খাতাপত্তর দেখছিলেন, ওগুলো কীসের খাতা?

ওসব আমার ক্লায়েন্টদের হিসেবনিকেশের খাতা।

আপনি কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট?

বিজুদা হেসে বললেন, ঠিক ধরেছ। বলে একটা সিগারেট বার করে ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রচণ্ড সামুদ্রিক হাওয়ায় দেশলাইয়ের কাঠি কিছুতেই যখন জ্বলল না। তখন হঠাৎ কোথা থেকে একটা লাইটারসুদ্ধু হাত এগিয়ে এল তাঁর মুখের দিকে।

বিশাল শরীর এক বীভৎস চেহারা লোক, বয়সে বিজুদারই মতন, সেই লাইটার বিজুদার মুখের কাছে ধরে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

বিজুদা সিগারেট ধরিয়ে কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ব্যাপাররে! তুই এখানে?

শুনলাম তুই পুরী বেড়াতে এসেছিস। তাই বেনারসে গিয়ে কী করব বল?

তার মানে আমার খোঁজেই এসেছিস?

তাই তো মনে হয়।

কোনও লাভ হবে না কিন্তু।

লাভ লোকসানের হিসেব পরে হবে। এখনও সময় আছে, ওটা ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দে।

তোর কি ধারণা ওটাকে আমি সঙ্গে করে এনেছি?

শুধু তাই নয়, হয়তো এখনও তোর কাছেই আছে!

বিজুদা হাসলেন। বললেন, বুদ্ধু কোথাকার। রাস্তা ছাড়।

এটা কিন্তু আমার কথার জবাব হল না।

বিজুদা সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়াটা লোকটার মুখের ওপর ছেড়ে বললেন, এই তোর জবাব।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা বিজুদার চোয়াল লক্ষ্য করে মারল এক ঘুসি। কিন্তু বিজুদা তৈরিই ছিলেন। তাই ঘুসিটা চোয়ালের কাছ পর্যন্ত আসবার আগেই

শক্ত মুঠিতে ধরে ফেললেন কবজিটাকে। তারপর সজোরে একটা মোচড় দিয়ে বললেন, ক্রাইম করতে গেলে হাতটাকে একটু ভাল করে তৈরি করতে হয়। এমন মেয়েলি হাতে কী করে কী করবি?

ঠিক সেই সময় আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন এসে ঘিরে ফেলল ওদের। কোথা থেকে একটি মারুতি গাড়িও এসে হাজির হল সেখানে।

একজন চোখের পলকে লিপিকে উঠিয়ে নিল সেই গাড়িতে।

আর একজন বলল, এবার দিবি নিশ্চয়ই?

বিজুদা বললেন, যদি ভাল চাস তো মেয়েটাকে নামিয়ে দে।

ওরা হেসে বলল, গিভ অ্যান্ড টেক।

ওদিকে লিপি ভয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠতেই ওরা শক্ত করে ওর মুখ চেপে ধরল।

একজন বলল, টুঁ শব্দটি কোরো না। তা হলে এই ননীর শরীর খাস্তার গজা হয়ে যাবে। যেমন আছ তেমনি থাকো।

সব্যসাচী সেই মুহূর্তে জনারণ্যে ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড হাঁকডাক শুরু করেছে, কে কোথায় আছেন, শিগগির আসুন। ডাকাত ডাকাত।

হই হই করে অনেক লোক ছুটে এসেছে তখন। কিন্তু এলে কী হবে? ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

অর্থাৎ লিপিকে নিয়ে মারুতি হাওয়া।

আর দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়েছেন বিজুদা।

সব্যসাচী ছুটে গিয়ে বিজুদাকে ধরল, কী হল বিজুদা! কী হল আপনার? ছুরিটুরি মেরেছে নাকি ওরা?

বিজুদা কী একটা জিনিস চকিতে সব্যসাচীর হাতে দিয়ে বললেন, এটাকে সাবধানে রাখিস। কাউকে কিছু বলিস না। এখানে না থেকে ঘরে যা তুই। না হলে তোর বাবা-মা চিন্তা করবেন।

কিন্তু আপনার কী হল?

তেমন কিছু না।

আরও অনেক লোক যারা এসেছিল, সবাই মিলে ধরাধরি করে তুলল বিজুদাকে।

দুষ্কৃতীদের একজন বিজুদার তলপেটে বুট দিয়ে এমন একটা লাথি মেরেছে যে মারাত্মক লেগেছে সেটা। তারই যন্ত্রণায় ছটফট করছেন বিজুদা।

জনতার ভেতর থেকে কেউ কেউ বলল, আপনাকে কী আমরা বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসব দাদা?

বিজুদা বললেন, আমি নিজেই যেতে পারব। তারপর সব্যসাচীর দিকে

তাকিয়ে বললেন, লিপিকে ওরা কোনদিকে নিয়ে গেল রে?

মোহানার দিকে।

একটা সাইকেল রিকশা আসছিল। সেটাকে দাঁড় করিয়ে বিজুদা সব্যসাচীকে ধরে অতিকষ্টে উঠে বসলেন তাইতে। তারপর সকলের কাছে বিদেয় নিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন রিকশাটাকে।

আকাশ তখন ফর্সা হয়েছে।

সমুদ্রস্নান সেরে রক্তিম সূর্য একটু একটু করে উদয় হচ্ছে। হাজারও জনতার জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টি তখন সেই উদয় মুহূর্তের দিকে। আকাশ জুড়ে তখন রঙের খেলা।

হঠাৎ ও কী!

একটা অ্যামবাস্যাডার যেন দ্রুত ছুটে আসছে ওদের দিকে। হ্যাঁ তাই তো। গতিবেগ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় মতলব ভাল নয় ওটার।

রিকশাওয়ালাও ভয় পেয়ে গেল তাই দেখে।

বিজুদা চেঁচিয়ে বললেন, সব্যসাচী লাফিয়ে পড়।

শুধু বলার অপেক্ষা। সব্যসাচী চলন্ত রিকশা থেকেই লাফিয়ে পড়ল বালির ওপর।

বিজুদা নামতে পারলেন না।

মোটর এসে রিকশার একদিকের চাকায় ধাক্কা দিতেই পথের ধারে ছিটকে পড়ল রিকশাটা। বিজুদাও কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়লেন।

বিজুদার মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। প্রচণ্ড আঘাতে বিজুদা প্রাণহীন কি সংজ্ঞাহীন তা বোঝা যাচ্ছে না।

মোটর থেকে নেমে দু'জন লোক গিয়ে সার্চ করতে লাগল বিজুদাকে।

পথচারী যারা ছিল তারা সবাই তখন ছুটে এল বিজুদাকে সাহায্য করতে।

দুষ্কৃতীরা বীরবিক্রমে জনতার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েই রিভলভার তাগ করল। ব্যস। ওতেই যথেষ্ট। একেবারে ভিড় ফাঁকা। সবাই পেছু হটল ভয়ে।

জনতা পেছু হটলে দুষ্কৃতীরা গাড়ি নিয়ে চলে গেল পুরী হোটেলের দিকে।

আর সব্যসাচী কী করবে কিছুই ভেবে পেল না। রিকশা থেকে লাফিয়ে পড়ায় ওকেও লেগেছে খুব।

ও দেখল কয়েকজন লোক পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বিজুদাকে। তারপর বাবুনি পার্কের বেঞ্চিতে নিয়ে গিয়ে শোয়াল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে আনন্দ দেবার জন্য এই বাবুনি পার্কটা সম্প্রতি গড়ে উঠেছে এখানে। একেবারে স্বর্গদ্বারের গায়ে সুন্দর পরিবেশে।

কয়েকজন লোক পাশের একটি লজ থেকে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করল।

পুলিশও এল একটু পরে।

পুলিশের একজন ইনস্পেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, এনার সঙ্গে কেউ ছিল না?

সব্যসাচী বলল, আমি ছিলাম।

ইনস্পেক্টর বললেন, গাড়িটার নম্বর মনে আছে?

হ্যাঁ। এ বি সি ডি এক দুই তিন চার...।

এইরকম আবার নম্বর হয় নাকি?

এইসব গাড়ির নাম্বার প্লেট থাকে?

বুঝেছি। কোথায় উঠেছ তোমরা?

কৃষ্ণানন্দ ধাম, হলিডে হোমে।

উনি তোমার কে হন?

কেউ না। বেড়াতে এসে এখানেই পরিচয়। ভদ্রলোকের নাম বি রায়। ওনার ভাইঝিকে দুষ্কৃতীরা নিয়ে গেছে।

ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে।

পুলিশের সাহায্য নিয়ে সবাই মিলে ধরাধরি করে স্ট্রেচারে শুইয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিল বিজুদাকে।

সব্যসাচী ফিরে এল হলিডে হোমে।

এই দুঃসংবাদটা যে কী করে দেবে লিপির বাবা-মাকে তা সে ভেবে পেল না। ওদের সঙ্গে তো ভাল করে পরিচয়ই হয়নি। ওরা কতজন এসেছেন তাও জানে না। শুধু পাশের ঘরে আছেন এইটুকুই জানা আছে।

চারদিক রোদে ঝলমল করছে। এখন সাগর ফেরা যাত্রীদের ঘরে ফেরার, বাজার করার পালা।

স্বর্গদ্বারের ওই ঘটনাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে তখন।

মা-বাবা দু'জনেই অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। আরও কারা যেন আছে।

সব্যসাচী কারওদিকে না তাকিয়ে দোতলায় উঠে সোজা ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর বসে পড়ল।

সরমা বললেন, কী হল! তুই একা এলি যে?

স্নেহাংশুবাবু বললেন, কী সব যেন গোলমাল শুনলাম। তুই কিছু শুনেছিস?

তোমরা কী শুনেছ তা জানি না। তবে খুব একটা খারাপ ব্যাপার ঘটে গেছে।

কীরকম।

সব্যসাচী সব কথা খুলে বলল বাবা-মাকে।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, সে কী! তোর কোনও চোটটোট লাগেনি তো?

সব্যসাচী বলল, না। তবে অল্পবিস্তর ব্যথা পেয়েছি।

সরমা বললেন, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়, আজই আমি চলে যাব এখান থেকে।

স্নেহাংশুবাবু বললেন, আর থাকলে আরও বিপদ হবে। তবে এই খবরটা তো এখনি পৌঁছে দিতে হবে ওদের। পাশাপাশি ঘর যখন, ওদের সঙ্গে থেকে খোঁজখবরও নিতে হবে একটু।

আমি কিন্তু আজই যাব।

যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রাথমিক ব্যবস্থাটা তো করি আগে।

স্নেহাংশুবাবু পাশের ঘরের যাত্রীদের ডেকে সব বলতেই সেখানে কান্নার রোল উঠল। বিজুদার দাদা-বউদি মেয়ের শোকে দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। চরম এক বিপদের আশঙ্কায় কী যে করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

বিজুদার বৃদ্ধা মা ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন।

কেয়ার টেকার সাধনবাবু ছুটে এলেন। নীচের তলার যাত্রীরা এল। আরও অনেকে এলেন। সবাই একজোট হয়ে বিজুদার খোঁজে এবং ঘটনার বিবরণ জানাতে থানায় চললেন প্রথমে।

কী থেকে কী হল, কেন হল, কেউ কিছুই ভেবে পেলেন না।

সব্যসাচীও সব কথা সকলকে খুলে বললেও সেই গোপন জিনিসটা যেটা বিজুদা ওর কাছে গচ্ছিত রেখেছেন সেটার কথা বলল না কাউকেই। সেটা যে কী, তা সে ও জানে না। বিজুদার মতন লোকের সঙ্গে ওই দলটার যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে পেল না ও। সবকিছুই যেন ঘন রহস্যের ধোঁয়াশায় ভরে যেতে লাগল।

ও মুখহাত ধুয়ে বারান্দায় এসে বসতেই, মা চা-জলখাবার এনে ওকে দিলেন।

সামনের হলিডে হোমের বারান্দা থেকে জয়া ওকে ইশারা করতে লাগল।

সব্যসাচী একবার এদিক সেদিক তাকিয়ে হাতছানিতে ডাকল ওকে।

জয়াও বিষয়টার গুরুত্ব বুঝে আর ওকে বাইরে আসতে বলল না। ইশারায় ওকে ছাদে যেতে বলে সরে গেল বারান্দা থেকে। তার মানে একটু পরেই ও আসবে। ওর এখন সত্যিই আসা দরকার। না হলে যে হাঁফিয়ে উঠবে ও। একেবারে চুপচাপ এই অস্বস্তিকর পরিবেশে কি থাকা যায়?

ছয়

জয়া এল। লঘু ছন্দে ধীর পায়ে। এখন ওকে দেখে একবারও মনে হল না এই মেয়েটা সেই দস্যি-দামাল বা রণচণ্ডী মেয়ে বলে। কত শান্ত এবং ধীর। ওর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। জানার আগ্রহ।

ও আসতেই সব্যসাচী বলল, চলো, ছাদে চলো। অনেক কথা আছে।

ওরা পা টিপে টিপে ওপরে উঠল।

সিঁড়ির দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে সব্যসাচী বলল, শুনেছ তো?

শুনেছি। তবু তোমার মুখেও শুনতে চাই। কী ব্যাপার বলো?

সব্যসাচী এক এক করে সব কথা খুলে বলল জয়াকে।

জয়া চোখদুটো কপালে উঠিয়ে বলল, মেয়েটাকে ওরা নিয়ে গেল অথচ তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে একটুও বাধা দিতে পারলে না?

সেই পরিস্থিতি ছিল না। তা ছাড়া আমি তখন চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করার চেষ্টা করছিলাম।

তোমার সামনে থেকে আমাকেও যদি কেউ ওইভাবে তুলে নিয়ে যেত, তুমি তা হলে চেয়ে চেয়ে দেখতে?

না। মেরে মুখ ফাটিয়ে দিতাম। অবশ্য তার আগেই যদি ওরা আমাকে কবজা করতে না পারে।

এখন তা হলে কী করবে ঠিক করেছ?

কিছু ভেবে পাচ্ছি না। তার কারণ আমার মা আর একমুহূর্ত থাকতে চাইছেন না এখানে। হয়তো আজই চলে যাব আমরা।

জয়া হতাশ হয়ে বলল, সে কী!

অথচ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এখন আমার এখানে থাকাটা খুবই দরকার।

তার চেয়েও যেটা বেশি দরকার সেটার কথা তো বললে না?

লিপিকে উদ্ধার করা। এই তো?

নিশ্চয়ই। তুমি যখন বলছ লিপিকে নিয়ে দুষ্কৃতীদের গাড়িটা মোহানার দিকে গেছে তখন মনে হয় সেই ঝাউবনেই ওকে ওরা নিয়ে গিয়ে রাখবে। কালকের সেই লোক দু'জন, নিশ্চয়ই এদেরই দুষ্টচক্রের লোক।

ঠিক বলেছ তুমি। তবে জয়া, আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! আমার মনের মধ্যে নিম্নচাপ উঠেছে একটা। কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটে গেল তাতে কোনও ঘটনার সঙ্গেই কোনওটাকে আমি সাজিয়ে উঠতে পারছি না। ওই ছেলেটির উবে যাওয়া, হঠাৎ করে তাকে মোহানার কাছে আবিষ্কার করা,

সবই যেমন রহস্যময়, তেমনি রহস্যময় তাকে হত্যার চেষ্টা করেও হত্যা না করা। আজকের ভোরে বিজুদার ওপর আক্রমণ, লিপিহরণ, তার চেয়েও বেশি রহস্যময় যেটা, সেটা হল বিজুদা একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কিন্তু ওই নোংরা জঘন্য স্বভাবের দুষ্কৃতীদের তিনি চিনলেন কী করে? কথাবার্তা শুনে মনে হল যেন কতদিনের পরিচিত। তা ছাড়া এইসব ক্রাইমের ব্যাপারেও তাঁর কৌতূহল খুব। আমার কাছ থেকে কুরে কুরে অনেক কথাই জানতে চাইছিলেন। এমনকী একটু বেলায় কালকের ওই ঘটনাস্থলে যেতেও চাইছিলেন তিনি।

বলো কী!

এবার বলো তো, বিজুদার সম্বন্ধে আমি কোন ধারণাটা করব?

তা হলে শোনো, তোমার ওই বিজুদা লোকটিও কিন্তু খুব একটা সুবিধের নয়। চাপদাড়ির আড়ালে ওর চেহারাটা দেখেছ? দেখলেই একটা রগচটা গুন্ডা বলে মনে হয়।

তা হয়। কিন্তু...।

কোনও কিন্তু নেই এর মধ্যে। তিনি তোমাকে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছেন। তা ছাড়া এমন কী জিনিস ওনার কাছে থাকতে পারে, যেটার জন্য ওরা হন্যে হয়ে পুরী পর্যন্ত এসেছে? নিশ্চয়ই কোনও স্মাগলিং-এর ব্যাপারে জড়িত আছেন উনি।

জিনিসটা যে কী তা কিন্তু আমিও দেখিনি। সেটা আমার কাছেই আছে।

বার করো তো, দেখি। তা হলেই বুঝব ব্যাপারটা কী।

সব্যসাচী ওর প্যান্টের পকেট থেকে যে জিনিসটা বার করল তা দেখে অবাক হয়ে গেল দু'জনেই। কী আশ্চর্য! এর জন্যে এত?

সব্যসাচী জিনিসটা জয়ার হাতে দিল।

জয়া সেটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর সব্যসাচীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু বুঝতে পারলে?

না।

আমার মনে হয় এইটাই হচ্ছে ওই দুষ্কৃতীদের তুরুপের তাস।

কিন্তু এর তো কোনও আর্থিক মূল্যই নেই।

তা হয়তো নেই। তবু ওটা খুব যত্নে রাখো তোমার কাছে। জিনিসটার মূল্য তোমার আমার কাছে না থাকলেও ওদের কাছে আছে। তাই তো বিজুদা ওটা সুকৌশলে পাচার করেছেন তোমার হাতে।

এমন সময় ছাদের দরজায় ঠক ঠক শব্দ।

সব্যসাচী দরজা খুলে দিতেই সরমা উঠে এলেন ছাদে। তারপর জয়াকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, ওমা! তুমি কখন এলে?

এই একটু আগে এসেছি মাসিমা।

ছাদের দরজায় শিকল দিয়ে কী করছিলে তোমরা?

সব্যসাচী বলল, কিছু না। কালকের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। দরজাটা হাওয়া লেগে বার বার খুলে যাচ্ছিল তাই—।

যাকগে। নীচে এসে যদি কিছু খেতে চাস তো খেয়ে নে। পাণ্ডা ঠাকুর এসেছেন। তোর বাবা ফিরে এলেই মন্দিরে যাব একবার। তারপর আর এখানে নয়।

জয়া ও সব্যসাচী মুখ চাওয়া-চায়ি করল। তারপর দু'জনেই নেমে এল দোতলায়।

পাণ্ডা লিঙ্গরাজ মিশ্র বারান্দার বেঞ্চিতে চুপচাপ বসেছিলেন।

ওপাশের এক নম্বর ঘরের যাত্রীরা এত কাণ্ডর পর আজ মন্দিরে যাবেন কি যাবেন না ভেবে পা ঘষতে লাগলেন। কেন না পাশাপাশি দুটি ঘরের বাসিন্দাদের নিয়ে যা হয়ে গেল, তারপরে কোথাও আর যাবার ইচ্ছে নেই। বিশেষ করে লিপির ব্যাপারটায় বিচলিত সবাই।

সরমা মিশ্রজিকে চা করে দিলেন।

সব্যসাচী ও জয়াকেও খেতে দিলেন হালুয়া, টোস্ট।

মিশ্রজি বললেন, আপনারা কি সত্যিই চলে যাবেন মা?

হ্যাঁ বাবা। মাস ছয়েক বাদে যাত্রা পরিবর্তন করে আবার আসব।

কিন্তু পুরীতে এসে জগবন্ধুকে দর্শন না করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

কখনওই না। সত্যিকারের মহাপাতক না হলে এমন দুর্মতিও হয় না কারও।

তবু যাবেন?

হ্যাঁ। মন আমার এখানে আর একদম মানছে না।

মিশ্রজি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মন যদি না চায় তা হলে অবশ্য থাকার কথা বলব না। কিন্তু কী করে যাবেন তাই ভাবছি। রিজার্ভেশন তো পাবেন না। অথচ এমনি সাধারণ বগিতে বসে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না।

কেন, নীলাচলে যাই যদি?

তা হলে তো আজ নয়, কাল যেতে হবে। নীলাচল তো এখনই ছাড়বার সময় হয়ে গেছে। আর একটা গাড়ি অবশ্য আছে, ধৌলি এক্সপ্রেস। ভুবনেশ্বর থেকে দুপুর দুটোয় ছাড়ে। সেটায় গেলে আজই রাত্রি দশটার মধ্যে হাওড়ায় পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু সে গাড়িতে গেলেও এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয়।

সরমা বললেন, দেখি ওর বাবা আসুক, কী বলেন।

কোথায় গেছেন উনি?

থানায়। সেখান থেকে হাসপাতালে।

মিশ্রজি বললেন, দেখুন, আমরা এতদিন এখানে বাস করছি কিন্তু এই ধরনের উপদ্রব কখনও দেখিনি। শুনিওনি কখনও। আপনাদের নিয়ে যা কিছু হচ্ছে সবই কিন্তু বাইরের লোকেদের কাজ কারবার। মাঝে মধ্যে এখানেও যে ঝুট ঝামেলা কিছু হয় না তা নয়, সে সব চ্যাংড়া মস্তানদের ব্যাপার। ওরকম সব জায়গাতেই হয়। আবার মিটেও যায়।

দরজার সামনেই সিঁড়ির গায়ে একটি ছোট্ট ঘর আছে। সেই ঘরে থাকে এই বাড়ির মালিকের বড় ছেলে। ডাক নাম বাপি। ভাল নাম অমরনাথ। অত্যন্ত রূপবান সুশ্রী, বিনয়ী যুবক। ওর ছেলেবেলাটা কেটেছিল অন্ধ্রের পুত্তাপর্তিতে সত্য সাইবাবার আশ্রমে। সে এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার এগিয়ে এসে সব্যসাচীকে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটিকে নিয়ে ওরা কোনদিকে গেল বলতে পারবে?

হ্যাঁ। সব্যসাচী বারান্দা থেকেই পথ দেখিয়ে দিল।

মিশ্রজি গুম হয়ে কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

বাপি বলল, এবার বুঝেছি ওরা কোথায় গেছে।

মিশ্রজি বললেন, ওই ঝাউবনেই ঢুকবে ওরা। না হলে ওই যে পুরনো ভাড়া বাড়িগুলো আছে ওরই যে কোনও একটাতে গিয়ে জুটবে। আমি দশ-বারোটা ছেলেকে সঙ্গে দিচ্ছি। যাও তো একবার দেখো তো গিয়ে কী ব্যাপার।

বাপি বলল, ওইদিকেই যাবে না ওরা। গেলে ওরা লোকনাথের দিকে যাবে। ওখানকার জঙ্গলই ওদের উপযুক্ত পরিবেশ।

তাই যাও। গিয়ে একটা খোঁজখবর নাও।

বাপি বলল, এক মিনিট। আমাকে একবার আসতে দিন। বলেই জামাটা গায়ে দিয়ে নীচে নামল।

সব্যসাচী বলল, আমি আপনার সঙ্গে যাব বাপিদা?

সরমা ছুটে এলেন, খবরদার বলছি। একদম বেরোবি না ঘর থেকে।

মিশ্রজি বললেন, আপনি কেন অযথা ভয় পাচ্ছেন মা? কোনও ভয় নেই। আর কোনও বিপদ হবে না। ওসব যখন হয় তখন আপনা থেকেই হয়। এখন সব জানাজানি হয়ে গেছে। সবাই সতর্ক। থানা-পুলিশ হচ্ছে। ওরা এখন প্যাঁচার মতো লুকোবে। এখন আমরা ওদের দেখে ভয় পাব না, ওরা ভয় পাবে আমাদের দেখে।

সব্যসাচী তখন একদম নীচে।

জয়াও আর ওপরে না-থেকে পিছু নিল ওর।

বাপি বলল, সাইকেল চাপতে পার?

সব্যসাচী বলল, হ্যাঁ।

জয়া বলল, আমিও পারি।

বাপি বলল, তুমিও যাবে নাকি?

তবে না তো কী? আপনারা দু'জনে যাবেন আর আমি বসে থাকব এখানে? ওটি হচ্ছে না।

বাপি নিজের সাইকেলটা নিয়ে আর একটা সাইকেল জোগাড় করে আনল।

সব্যসাচী বলল, না জয়া, তুমি এসো না। আবার যদি নতুন করে কোনও বিপদ এসে হাজির হয় তা হলে কিন্তু যা তা ব্যাপার ঘটে যাবে তোমাকে নিয়ে।

অভিমানিনী জয়া তখন এক কথাতেই চুপ। একবার শুধু ক্রুদ্ধ চোখে সব্যসাচীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, বেশ, তোমরাই যাও। বলে আর কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা ওদের হলিডে হোমে ঢুকে গেল।

বাপি বলল, দারুণ রেগেছে মনে হচ্ছে।

সব্যসাচী বলল, এই মেয়ে বড় হলে দিনকে রাত করে দেবে।

ওরা সাইকেল নিয়ে ওদের হলিডে হোমের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা ডানদিকে সোজা চলে গেছে, সেই পথে খানিক গিয়েই বাঁদিকে বাঁক নিল। তারপর আবার ডানদিকে বেঁকে কিছু পথ যেতেই কী সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেল ওরা। কত যে ছোট ছোট ঘরবাড়ি হয়েছে সেখানে, তার যেন শেষ নেই।

বাপি বলল, তোমার বাবাকে বলো না এইখানে একটা বাড়ি কিনতে। এক-দু'কাঠা জায়গার মধ্যে কী সুন্দর সব বাড়ি দেখেছ?

সব্যসাচী বলল, ভারী মনোরম! তবে কিনা আমরা বছরে একবার কি দু'বার হয়তো আসব। তার জন্যে স্টেটের বাইরে একটা প্রপার্টি রাখার কোনও যুক্তি আছে কি?

ওরে ব্বাবা। তুমি এইটুকু ছেলে অথচ তোমার খুব বৈষয়িক জ্ঞান রয়েছে দেখছি।

যেতে যেতেই হঠাৎ এক জায়গায় ব্রেক কষল বাপি।

সব্যসাচী বলল, কী হল?

ওই যে দেখছ ডানদিকের পথটা মাঠের দিকে নেমে গিয়ে ঘন সবুজের মধ্যে মিশে গেছে, ওই পথেই লোকনাথ। এখন এইখানেই একটু খোঁজখবর নিতে হবে। তবে খুব সাবধান। আমি যাকে যা জিজ্ঞেস করবার করব। তুমি কিন্তু কারও কথার কোনও উত্তর দেবে না। কেমন?

সব্যসাচী বলল, ঠিক আছে।

বাপি বলল, চলো, ওই দোকানটায় গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক। কিছু খবরাখবর ওইখান থেকেই পাব।

ওরা সাইকেল থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। মাটির ঘর। পাতার ছাউনি। জায়গাটা নিরিবিলি বলে খদ্দেরও কম। তাই ভিড় নেই।

ওরা সাইকেল রেখে দোকানে ঢুকেই সর্বাগ্রে প্লাস্টিকের ওয়াটার পটে রাখা জল নিয়ে ঢক ঢক করে খেল। তারপর বাপি বলল, তোর সেই ছেলেটাকে দেখছি না কেন রে বুলবুল?

চা-ওয়ালার নাম বুলবুল। বলল, আর বলিস না ভাই। সেই যে দু'দিনের ছুটি নিয়ে গেল আর এল না।

অসুখবিসুখ করেনি তো?

কে জানে? তবে শুনেছি ওর বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

বাপি বলল, তোর এখানে খাবার কী আছে? পিঁয়াজিটিয়াজি হবে কিছু? লঙ্কার বড়া?

গরম চপ হবে। দেব?

দে। আর দু'কাপ চা।

বুলবুল দুটো করে চপ ওদের দিকে এগিয়ে চা করতে লাগল। চা ছাঁকতে ছাঁকতেই বলল, এদিকে কোথায় যাবি?

ভাবছি একবার লোকনাথে গেলে কেমন হয়? ভাগনাটা এসেছে কাল, তাই ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।

আর একটু সকালে আসতে পারতিস।

সকালবেলা ওদিকে একটু ঝামেলা হয়ে গেল।

ওঃ হো। শুনেছি কাদের নাকি একটা মেয়ে চুরি হয়েছে।

কার মুখে শুনলি?

এই তো একটু আগে কে যেন বলল, ভোরে আমি যখন সবে উনুনে আঁচ দিচ্ছি, তখন হঠাৎ দেখি একটা লাল রঙের মারুতি এইদিক দিয়ে ছুটে গেল। একটা অল্পবয়সি মেয়েকে সবাই মিলে শক্ত করে চেপে ধরে আছে। তা আমি ভাবলাম বোধহয় কোনও ট্যুরিস্টের মেয়ে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাই হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরই শুনি এই কাণ্ড। এমন ব্যাপার জানলে তো বাধা দিতাম। তবে মুখে বলছি বটে, কাজে হয়তো পারতাম না। যা জোরে এল ওরা, কিছু ভাবনা চিন্তা করবার আগেই উধাও হয়ে গেল।

বাপি বলল, তা হলে ঠিকই দেখেছ তুমি।

তার আধ ঘণ্টা পরেই এল একটা পুলিশের গাড়ি। ওরা খোঁজখবর নিলে আমি কিন্তু ঝামেলার ভয়ে বলেই দিলাম কিছু দেখিনি।

কী ভুল করলে বলো তো?

কী করি ভাই, কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ধরলে অগুণতি। তা ছাড়া সত্যিকথা বলতে কী, কোলাব্যাঙ আর পুলিশ এই দুটোকেই আমি ভয় পাই। একবার হল কী আমার দিদিশাউড়ির একটা—।

বাপি চপে কামড় দিয়েই বলল, বাঃ। বেড়ে হয়েছে তো?

দেব নাকি আর একটা?

দাও দাও।

সব্যসাচী বলল, আমাকে নয়, আমার এতেই হবে।

চপ খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে ওরা দোকানের বাইরে এসে দূরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রইল।

বুলবুল বলল, যাবে তো যাও। সাইকেল যখন আছে, তখন বেশি সময় লাগবে না। কত লোক পুরী আসে, কিন্তু জানে না বলে অনেকেই লোকনাথ না দেখে ফিরে যায়। তোমরা যাও, দর্শন করো। প্রার্থনা করো বাবার কাছে। বাবা সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

সব্যসাচী চাপা গলায় বাপিকে বলল, তা হলে যাওয়া যাক চলো।

গিয়ে আমরা কী করব?

একটু খুঁজেপেতে দেখব কোথাও যদি কোনও হদিস পাওয়া যায় ওর।

আমি বলি কী, আমরা বরং কিছু লোকজন নিয়েই ওদিকে যাই। মিশ্রজি তো কয়েকজনকে সঙ্গে দেবেন বলেছেন। দলবল দেখলে ওরাও ঘাবড়ে যাবে খুব। আমাদেরও সুবিধে হবে।

সব্যসাচী বলল, লোকজন দেখলে ওরা যদি সতর্ক হয়ে যায়? তার চেয়ে চলো যেমন আমরা যাচ্ছি তেমনি দু'জনেই যাই।

বাপি কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, এসো তা হলে। তোমার কথাই থাক!

ওরা সেই অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে লোকনাথের দিকে চলল। আজ বে-বার। তাই যাত্রী সংখ্যা অনেক কম। নেই বললেই হয়। যাই হোক, ওরা একসময় প্রশস্ত রাজপথে এসে পড়ল। এখানটাও নির্জন। বাপি বলল, এই পথটা জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে মিশেছে। অনেকে মন্দিরের কাছ থেকেও রিকশায় চেপে এখানে আসে।

ওরা সেই রাজপথ ধরে বাঁদিকে খানিকটা যেতেই দেখতে পেল, পথটা সেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকের পথ গেছে লোকনাথে। ডানদিকেরটা ল্যাংটা বাবার আশ্রমে। মস্ত সাধক তিনি। এখন দেহাবসান হয়েছে। নির্জন জায়গায় ছোট্ট একটি টিলা পাহাড়ে তাঁর আশ্রম। চমৎকার পরিবেশ।

বাপি সব্যসাচীকে বলল, চলো, আগে আমরা লোকনাথে যাই। সেখানে

কোনও খোঁজখবর না-পেলে তারপর ল্যাংটা বাবার আশ্রমে যাব।

যা আপনি বলবেন।

ওরা দ্রুত সাইকেল চালিয়ে লোকনাথের পথ ধরল। খানিক যাবার পরই দেখতে পেল একদল ভিখারি পথের দু'ধারে সারিবদ্ধ ভাবে হাত পেতে বসে আছে।

সামনেই একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে। লোকনাথ মহাদেবের মন্দির। দর্শনার্থী নেই বললেই হয়। একদম ফাঁকা।

ওদের দেখে দু'-একজন পাণ্ডা কোমড় বেঁধে এগিয়ে এলেও, বাপিকে চিনতে পেরে পিছিয়ে গেল।

একপাশে সাইকেল আর জুতো রেখে বাপি বলল, মন্দিরে যখন এসেছি আর তুমিও প্রথম এলে তখন দর্শন না করে ফিরে যাওয়া নয়। আগে মন্দিরের কাজটা সেরে নিই, তারপর শুরু হোক খোঁজখবর নেওয়া।

ওরা মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে পাশের কুণ্ডে হাত-পা ধুয়ে সামান্য একটু পূজার ডালি নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল। কী অপূর্ব রম্যস্থান। মন্দিরে প্রবেশ মাত্রই ভক্তিতে যেন দেহমন আপ্লুত হয়ে ওঠে। শুধু কী বাবা লোকনাথ? কত দেবতাই তো রয়েছে এখানে।

হঠাৎ একদল যাত্রী কোথা থেকে এসে ফাঁকা জায়গাটা ভরিয়ে দিল। সেই যাত্রীদের মধ্যে এমনই একজন ছিল যাকে দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না সব্যসাচীর।

নাটমন্দিরে যে বিশাল পেতলের ঘণ্টাটা ছিল, সেটার চেন ধরে টেনে টেনে বাজিয়েই চলেছে সে। তার দুটো চোখেই যেন আগুন। আগুন শুধু চোখে কেন? মনে হল সে নিজেই যেন স্ফুলিঙ্গ একটি।

বিস্মিত সব্যসাচী বলল, এ কী জয়া! তুমি এখানে? তুমি কী করে এলে?

জয়া সে কথার কোনও উত্তরই না দিয়ে হাতের ফুলমালাটা নিয়ে ঢুকে গেল মন্দিরের ভেতরে। শুধু যে গেল তা নয়, সব্যসাচীর দিকে ফিরেও তাকাল না একবার।

সব্যসাচী তখন ওর মান ভাঙাতে না গিয়ে খুঁজতে লাগল বাপিকে।

বাপিদা! বাপিদা!

বাপি মন্দিরের বাইরের কলে একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে জল খাচ্ছিল। বলল, কী হল! ভয় পেল নাকি? আসলে ভিড় দেখে আমি বেরিয়ে এলাম।

সে বেশ করেছ। কিন্তু এদিকে যে এক কাণ্ড হয়েছে।

কী হয়েছে?

সেই মা চণ্ডী এসে হাজির হয়েছেন এখানে। ভীষণ রেগেছে।

কে! কার কথা বলছ তুমি?

জয়া। জয়া এসেছে।

জয়া এসেছে! কোথায় সে?

মন্দিরের ভেতরে। তুমি যাও বাপিদা, ওর মান ভাঙাও। আমাকে দেখলেই ফেটে পড়বে ও।

বাপি কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা ঢুকে গেল মন্দিরের ভেতরে। তারপর একসময় রাগি মেয়েটার হাত ধরে টানতে টানতে যখন বেরিয়ে এল, তখন সব্যসাচীর পাত্তা নেই। কোথায় গেল ছেলেটা!

ওরা মন্দিরের বাইরে এল। কুণ্ডের পাশের সিঁড়ি বেয়ে চত্বরের বাইরে যেখানে ওদের জুতো, সাইকেল রাখা ছিল, সেখানেও এল। কিন্তু না, সব্যসাচীর পাত্তা নেই।

বাপি-জয়া দু'জনেই চেঁচিয়ে ডাকল, স-ব্য-সা-চী-ই। তুমি যেখানেই লুকিয়ে থাক চলে এসো।

কিন্তু আসবে কে?

ঘণ্টা কাবার হল। মন্দির দর্শনার্থী শূন্য হল। শুধুমাত্র ওরা দু'জন আর দু'-চারজন পাণ্ডা ছাড়া কেউ কোথাও নেই। চোখের পলকে যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল ছেলেটা।

ওদের দু'জনেরই চোখেমুখে আতঙ্ক একটা ঘনিয়ে এল।

সাত

ওরা যখন সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা নিয়ে ফিরে এল, ওদিকে তখন আর এক নাটক। পার্থ নামের সেই ছেলেটা, মোহানার বালিয়াড়ি থেকে যাকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তাকে ঘিরে তখন দারুণ রহস্য জমে উঠেছে।

পুলিশ অফিসাররা বারবার জেরা করেও কোনও সদুত্তর পাচ্ছেন না তার কাছ থেকে।

একজন অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক করে বলো, কীভাবে ওরা কিডন্যাপ করল তোমাকে?

পার্থ বলল, বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু মনে করতে পারছি না।

মিথ্যে কথা। আসলে তুমি মনে করবার চেষ্টাই করছ না। সত্যি করে বলো, তুমি কি আদৌ জলে পড়েছিলে?

পার্থ কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে থেকে বলল, জলে তো পড়েছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সবই মনে আছে তোমার। কিন্তু তুমি যে কোনও কারণেই হোক চেপে যাচ্ছ। সত্যি কথাটা বলতে চাইছ না। পরে অবশ্য তুমি সংজ্ঞাহীন হয়েছিলে ঠিকই, তখনকার কথা তোমার মনে না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগের কথা ভুলে যাবার কারণটা কী?

পার্থর বাবা-মা বললেন, শুধু শুধু ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন স্যার? আমাদের তো কোনও অভিযোগ নেই। আজ রাতের গাড়িতে আমাদের রিজার্ভেশন করা আছে। আমরা চলে যাব।

রিজার্ভেশন করা থাকলে সেটা ক্যানসেল করে দিন। আজ আপনাদের কোনও অবস্থাতেই যাওয়া হবে না।

সে কী! তা হলে আমরা থাকব কোথায়? খাব কী? টাকা-পয়সা যা এনেছিলাম তার সবই তো শেষ।

বেশ তো, আপনার যদি এইরকম অবস্থা হয়ে থাকে তা হলে চলে যান আপনারা। ছেলেটাকে রেখে যান পুলিশের হেফাজতে।

বাবা-মা দু'জনেই অফিসারের হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, প্লিজ, আপনি আমাদের এর থেকে অব্যাহতি দিন।

সম্ভব নয়। কারণ ছেলের জবানবন্দির ওপর আমাদের তদন্তের অনেক কিছু নির্ভর করছে। ইতিমধ্যে আমরা এই সমস্ত অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনওরকম সন্দেহজনক কিছু পাইনি। এর পরেও আজ ভোরে প্রকাশ্য রাজপথ থেকে একটি কিশোরী উধাও গেল। একজনকে হত্যার চেষ্টা করা হল। কিন্তু কেন? কী উদ্দেশে? এটা একটা পর্যটন কেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ নরনারী এখানে আসেন অবসর বিনোদনে। অপরাধ সব সময় সর্বত্র ঘটতে পারে। কিন্তু তাকে দমন করবার জন্যই তো আমরা। আপনারা যাদের শিকার, আপনাদের কাছ থেকে তাদের কথা যদি কিছুমাত্র জানতে না পারি তা হলে ধরব কাদের? আর অপরাধী যদি ধরা না পড়ে, তা হলে তো এইভাবে রোজই এক-একজন করে উধাও হতে থাকবে। চুরি ছিনতাই খুন রাহাজানি ঘটতে থাকবে দিনের পর দিন।

পার্থর বাবা-মা তখন পার্থকে বললেন, ঠিক করে বল, কী থেকে কী হল। কোনও ভয় নেই তোর। তুই সত্যি কথা না বললে হয়তো তোকে এখানে রেখে দিয়েই চলে যেতে হবে আমাদের। না হলে এঁরা তোকে ছাড়বেন না।

পার্থ জড়িয়ে ধরল ওর মাকে, আমি কিচ্ছু জানি না মা, সত্যি বলছি আমার পক্ষে কোনও কিছুই বলা সম্ভব নয়।

পুলিশ অফিসার গর্জে উঠলেন, তার মানে তুমি সব জান। এবার বলো তো বাছাধন কাদের পাল্লায় তুমি পড়েছিলে?

পার্থ বলল, আমি যখন সমুদ্রের ধারে অল্প অল্প ফেনার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি

করছিলাম তখন হঠাৎই একটা বড় ঢেউ এসে পড়ায় আরও অনেকের সঙ্গে আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। আর ঠিক তখনই মনে হল কে যেন আমার গলা টিপে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। আমার ঘাড়ে গলায় নখের দাগ বসিয়ে দিচ্ছে।

তারপর?

আমি দু'হাত দিয়ে তার গলাটা ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ দেখি আমার চুলের মুঠি ধরে টানছে কে। আমি ক্রমশ গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললাম। কয়েক ঢোক জলও ঘিটে ফেলেছি তখন। তারপরই জীবনের আশা আর নেই দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছি।

কিন্তু তুমি ওখান থেকে অতদূরে গেলে কী করে?

একসময় আমার মনে হল আমাকে যেন একটা জেলে ডিঙিতে উঠিয়ে নিয়ে এল কেউ।

পুলিশ অফিসার বললেন, তার মানে জ্ঞান হারিয়েও তুমি মনে করতে পারলে তোমাকে কেউ জেলে ডিঙিতে উঠিয়ে নিল। এরপরে অজ্ঞান অবস্থায় থেকে আর কী মনে করতে পারলে শুনি?

আর কিছু মনে করতে পারছি না।

এইবার পুলিশ অফিসার একটু নরম সুরে বললেন, শোনো পার্থ। আমাদের মনে হচ্ছে তুমি ইচ্ছে করেই কিছু গোপন করছ। ভয় কী তোমার? তোমার শত্রুদের যদি আমরা ধরি তাতে কি তুমি খুশি হবে না? তোমাকে নিয়ে যা হচ্ছিল তাতে তোমার জীবন চলে যাচ্ছিল। আমরা কথা দিলাম, তাদের সবাইকে আমরা ধরব, আর কঠিন শাস্তি দেব।

পার্থ বলল, না। আমি আর কোনও কিছু লুকব না। সব বলব আপনাদের।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে লাগলেন পার্থর কথা!

পার্থ বলল, সেদিন জলে আমি নিজের থেকে পড়ে যাইনি। খুব বড় ঢেউটা যখন আসে ঠিক তখনই হুড়মুড়িয়ে অনেকে পড়ে গেলেও, আমার মনে হল কে যেন আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল। তারপর হঠাৎই মনে হল কেউ আমাকে ঢেউয়ের তালে তালে উঠিয়ে নামিয়ে দূরে কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চেঁচাতে গিয়েও পারলাম না। ঢক ঢক করে খানিকটা লোনা জল খেয়ে ফেললাম। এরপর লোকটা আমাকে টেনেহিঁচড়ে একটা জেলেডিঙিতে উঠিয়ে নিল। লোকটা সাধারণ লোক নয়, নুলিয়াও নয়। মাঝি বা জেলে বলেই মনে হল। ডিঙিতে উঠিয়ে আমার ঘাড়-গলা টিপে ধরে রইল, আর নৌকোটা চলে গেল মাঝসমুদ্রে। অনেক পরে নৌকো যখন ডাঙায় ফিরে এল তখন আমি ক্লান্ত, অবসন্ন। আমাকে নিষ্ঠুরভাবে টেনেহিঁচড়ে ওরা একটা নদীর মোহানার কাছে নিয়ে এল। কী নির্জন সেই জায়গাটা। সেখানে চারজন লোক বসে বসে জটলা

করছিল। আমাকে তাদের সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ওরা। তারপর কিছু টাকা নিয়ে চলে গেল। লোকগুলো নেশাগ্রস্ত ছিল। ওদেরই একজন আমার গলা টিপে মারতে এল সেখানেই। আর একজন বলল, এখনই মারিস না একে। দুধের বাচ্চা। ক্ষীর-ননী খেয়ে মানুষ। পারাদ্বীপের কাছে কোথাও নিয়ে গিয়ে রেখে আসি চল। তারপর ঠিকমতো তালিম দেওয়া যাবে। বাবা পুলিশ অফিসার। ছেলে হোক পকেটমার। মাঝে মধ্যে ছেলেকে দিয়ে একটা করে চিঠি লিখিয়ে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব। আর একজন বলল, অত ঝক্কি ঝামেলা পোহাবে কে? ছেলেকে মেরেই বাপের প্রতিশোধ নিতে হয়। মার, মেরে ফেল শয়তানের বাচ্চাকে। লোকটা এমনভাবে আমার গলা টিপে ধরল যে আর একটু হলেই আমি মরে যেতাম। এমন সময় হঠাৎ একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে উঠল, এই এই, করছিস কী? কাকে মারছিস? রং টার্গেট। এ তো সে নয়। এ যে পার্থ।

পুলিশ অফিসার সবিস্ময়ে বললেন, স্ট্রেঞ্জ! লোকটা তোমার নাম বলল! তার মানে তোমাকে চেনে?

হ্যাঁ। বলল, অপদার্থ শ্যামাটা করেছে কী! কাকে ধরে এনেছে! এ যে পার্থ, আমার—।

পুলিশ অফিসার বললেন, চুপ করলে কেন? বলো? বলো কে সে? বলে ফেলো?

আমার মেজমামা সন্দীপ।

ঘরের মধ্যে বোমা ফাটলেও বুঝি এতটা চমকাত না কেউ।

পার্থর বাবা বললেন, সন্দীপ! সে এখানে কী করে এল? তুই ভুল দেখিসনি তো বাবা? আজ পাঁচ বছর ধরে পুলিশ তাকে খুঁজছে। সদর স্ট্রিট এলাকার একটি ব্যাঙ্ক-ডাকাতির কেসে সে ফেরার। তোর দিদা ওই ছেলের জন্য আত্মঘাতী হল।

পুলিশ অফিসার বললেন, তারপর কী হল?

ওরা বলল, তোর ভাগনা! তা হলে তো আরও বিপদ। এ যদি তোর কথা বলে দেয়, তা হলে সবাই আমরা ধরা পড়ে যাব। একে কোনওমতেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ওকে মরতে দে সন্দীপ। মামা বললেন, না। প্রাণ থাকতেও একাজ আমি করতে দেব না। আমি কথা দিচ্ছি ও আমাদের কথা কাউকে বলবে না। আমিও কথা দিলাম, সত্যি বলছি, আমার মা-বাবা ভাই-বোনেদের সবাইকার দিব্যি, আমি প্রাণ থাকতে একথা কাউকে বলব না, দয়া করে আমাকে মেরো না তোমরা। ওরা তবুও বলল, শত্রুর শেষ রাখতে নেই রে। আমাদের মনেও মায়ামমতা থাকতে নেই। আমরা শ্মশানের কুকুর। মড়ার মাংস ছিঁড়ে খাওয়াই আমাদের পেশা। বলেই আমার গলায় এত জোরে চাপ দিল যে আমাতে আর আমি নেই তখন। একজন আমাকে মৃত ভেবে ছুড়ে নদীর খাড়িতে ফেলে দিল।

আমার মামা তখন বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছে তাদের একজনের গলা। কিন্তু ধরলে কী হবে। ওরা তিনজন, মামা একা। পারবে কেন ওদের সঙ্গে?

তারপর কী হল?

ওরা আমার চোখের সামনেই মামাকে খুন করে ওইখানেই পুতে ফেলল। তারপর চলে যাবার সময় বলে গেল, যদি ছেলেটা বেঁচে থাকে আর পুলিশের কানে তোলে এইসব কথা তা হলে যে যেখানে আছে ওর, সব ক'টারই এই হাল করব। এই দৃশ্য দেখার পর সেই যে আমি জ্ঞান হারালাম তারপরে আমাকে উদ্ধার করল সব্যসাচী। ওর ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।

পার্থর জবানবন্দি শেষ হতেই স্নেহাংশুবাবু এসে উদ্বিগ্ন হয়ে পুলিশ অফিসারকে বললেন, আমার সব্যসাচীও ওদের শিকার হয়েছে স্যার। প্লিজ, একটু কিছু করুন। আমার ওই একটিই মাত্র ছেলে।

স্নেহাংশুবাবুর সঙ্গে বাপিও ছিল।

ওর মুখে সব কথা শুনে পুলিশ সব কিছু লিখেটিখে নিয়ে পার্থকে সঙ্গে করে মোহানার দিকে গেলেন। এক গাড়ি পুলিশ সহ।

পার্থর বিবরণ যে মিথ্যে নয় তা বোঝাই গেল। শুধু ওর কথা মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্য দুষ্কৃতীরা সন্দীপের লাশ শেষরাতেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে। বালির অবস্থান দেখেই তা বোঝা গেল। কিন্তু কোথায় লুকল ওরা লাশটাকে? বুকে বালির বস্তা বেঁধে গভীর সমুদ্রে ফেলে দিল? কে জানে? আরও রহস্য এই, সে কোন পুলিশ অফিসার? যার ছেলেকে হত্যার জন্য দুষ্কৃতীরা এতবড় একটা ফাঁদ পেতেছিল? কিন্তু এ কথার উত্তর কে দেবে? সমুদ্রে তরঙ্গ আছে। গর্জন আছে। মহা প্রলয়ের দুর্বার শক্তিও আছে তার, কিন্তু সমুদ্রের তো ভাষা নেই। মানুষের পাপপুণ্যের সাক্ষী হতে পারে সে, সাক্ষী দিতে পারে না। বালুচরও তাই। মূকবধির হয়ে তরঙ্গের আঘাত সয়, কাউকে আঘাত করতে পারে না।

আট

এইদিন দুপুরের পর বিজুদা ছাড়া পেলেন হাসপাতাল থেকে। মাথায় আঘাত পেয়ে কিছু সময়ের জন্য সংজ্ঞাহীন হলেও পরে ঘোরটা কেটে গেলে সুস্থ হন। তবে মাথায় চোট লাগার জন্য ব্যান্ডেজ একটা বাঁধতেই হল। এরজন্য তিনি অবশ্য কাতর নন।

হলিডে হোমে ফিরে এসে সব্যসাচীর খবরটা শুনে দারুণ উত্তেজিত হলেন

বিজুদা। তাঁরই ভাইঝির খোঁজে গিয়ে ছেলেটি দুষ্কৃতীদের কবলে পড়েছে শুনে যেমনি বিচলিত হলেন তেমনি আশঙ্কিত হলেন অন্য ব্যাপারে। অর্থাৎ সেই যে সেই জিনিসটা, যেটাকে পাবার জন্য এত কিছু সেটা কি সব্যসাচীর কাছেই ছিল? নাকি রেখে গেছে অন্য কোথাও? কে জানে? তবু স্নেহাংশুবাবুকে বললেন, আচ্ছা, বাইরে যাবার আগে ও কি কোনও কিছু রেখে গেছে আপনাদের কাছে?

স্নেহাংশুবাবু বললেন, আমি তো কিছু বলতে পারব না ভাই, আমি ছিলামই না বাড়িতে। আপনাদের জন্যই হাসপাতাল-পুলিশ এইসব করছিলাম।

ওর মাকে একবার জিজ্ঞেস করুন তো?

সরমা বললেন, না, সেরকম কিছুই রেখে যায়নি ও। জিনিসটা কী?

বিজুদা বললেন, যদি অনুমতি দেন তা হলে আমি একবার ঘরের ভেতরটা দেখব? ওটা খোয়া গেলে কিন্তু আমার সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে।

বেশ তো দেখুন। কিন্তু আমাদের ছেলেটাকে আমরা কি আর কখনও ফিরে পাব?

আমার ভাইঝি লিপির সম্বন্ধেও ওই একই দুশ্চিন্তা আমার। ওকেও কী ফিরে পাব আমরা?

এমন সময় পাণ্ডা লিঙ্গরাজ মিশ্র এসে হাজির হলেন।

এলেন সাধনবাবুও। বললেন, ওইখানে ওদের যাওয়াটাই ভুল হয়েছে। এই ঘটনার পর ওদিকে কেউ যায়?

বাপি ম্লানমুখে দাঁড়িয়েছিল অদূরে। বলল, আমরা তো গেছি লোকনাথে। মনে করুন আমরা না জেনেই গেছি। বিপদ হবে বুঝব কী করে?

বাঃ। মেয়েটাকে নিয়ে মারুতিটা যে ওইদিকে গেছে তা তোমরা জানতে না?

কেন জানব না? মারুতিটা ওই পথেই গেছে। কিন্তু লোকনাথে গেছে এমন কোনও প্রমাণ কি ছিল আমাদের কাছে? তা ছাড়া লোকনাথ দেবস্থান। তার ধারেকাছে কোনও মারুতিকে আমরা দেখিওনি।

মিশ্রজি বললেন, আমি তো বলেছিলাম কয়েকজন ছেলেকে সঙ্গে দিচ্ছি। কিন্তু যেমন তোমরা শুনলে না তার ফল ভোগ করো এবার। বেশি লোকজন সঙ্গে থাকলে এই কাণ্ডটা হত না!

স্নেহাংশুবাবু বললেন, আর এখন এইসব বলে লাভ নেই। মিশ্রজি আমার ছেলেও বড় অবাধ্য। এত জেদ যে তা বলবার নয়। বুকের ভেতর একফোঁটা ভয়ডর নেই।

মিশ্রজি বললেন, তবু আপনি কিন্তু ঘাবড়াবেন না বাবু। আমার বেশ কিছু লোকজনকে আমি নজর রাখতে বলেছি ওইসব অঞ্চলে। যত দূরেই ওরা হোক না কেন, পুরী ছেড়ে পালাতে হচ্ছে না বাছাধনদের।

সরমা বললেন, কিন্তু যদি ওরা মেরেই ফেলে ছেলেটাকে?

শুনুন মা, শুধু শুধু খুনের ঝুঁকি গুন্ডাবদমাশরাও নেয় না। ওরা ওর কাছ থেকে ওদের জিনিস পেয়ে গেলেই ছেড়ে দেবে।

সাধনবাবু বললেন, আমিও আমার দু'জন ছেলেকে পাঠিয়েছি। ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। তা ছাড়া এখানকার পুলিশও খুব একটা অলস নয়। মুখে ভান দেখায় যেন কোনও কিছু করবার অবকাশই নেই তাদের, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দারুণ সক্রিয়।

সরমা বললেন, তাই যেন হয়। ছেলেটাকে যেন ওরা উদ্ধার করতে পারে।

বাপি বলল, আসলে আমার মনে হয় ওরা ওকে ধরবার জন্য অনেকক্ষণ থেকেই ওত পেতে ছিল। হয়তো ভেবেছে ও বিজুদারই কেউ।

হতে পারে।

এদিকে বিজুদা ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেলেন না সেই জিনিসটা, যেটা তিনি বিপদ বুঝে সব্যসাচীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তাই ম্লানমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আচ্ছা বাপি, সেই মেয়েটাকে একবার ডাকিয়ে আনা যায় না?

কার কথা বলছেন?

ওই যে সেই মেয়েটা, যে কাল ওর সঙ্গে মোহানার দিকে গিয়েছিল।

বাপি বলল, জয়ার কথা বলছেন? ওই ওদিকে সামনের বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখুন, মেয়েটা আপনমনে কী যেন ভাবছে। বলেই একটা হাঁক দিল, জয়া! একবার এইদিকে আসবে?

জয়া বিষণ্ণ বদনে বাপির দিকে তাকিয়ে বলল, কেন?

বিজুদা একবার ডাকছেন তোমাকে।

জয়া এলে বিজুদা বললেন, জয়া, আমরা সবাই জানি সব্যসাচীর সঙ্গে তোমার একটা দারুণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই জিজ্ঞেস করছি ও তোমার কাছে কোনও কিছু জমা রেখেছে কী? বা কোনও কিছুর ব্যাপারে কিছু কি বলেছে তোমায়?

বলেছে।

তুমি কি জানো সেটা কোথায় আছে?

জানি। ওর কাছেই আছে সেটা।

বিজুদা হতাশ হয়ে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে তা হলে।

সরমা বললেন, আমার ছেলের জীবনের চেয়েও আপনার কাছে ওই জিনিসটার গুরুত্ব দেখছি খুব।

আমাকে ভুল বুঝবেন না প্লিজ, আমার কাছে দুটোরই গুরুত্ব অনেক।

তাই যদি হয়, তা হলে ওই মূল্যবান জিনিসটাকে নিয়ে অত ভোরে আপনি পথেই বা নেমেছিলেন কেন?

আসলে কলকাতা থেকে আমার পিছু নিয়ে ওরা যে এখান পর্যন্ত আসবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

জয়া বলল, এবার আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পারো।

সব্যসাচীর মুখে সকালের ঘটনাটা শুনে আমার যা মনে হয়েছে তা হল এই, ওই দুষ্কৃতীরা আপনার পূর্ব পরিচিত।

অবশ্যই।

শুধু তাই নয়, আপনার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল তাদের।

তাও ঠিক।

আপনি তা হলে কে? আপনি তা হলে কী?

আমি আমিই।

না। নিশ্চয়ই ওই দলের লোকেদের সঙ্গে আপনার কোনও হিচ হওয়ায় আপনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, অথবা কোনওকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ওদের সঙ্গে। তাই ওরা ছায়ার মতো অনুসরণ করছে আপনাকে। আসলে আপনি নিজেই একটি বাজে লোক। আপনার কুকর্মের জন্য একটি ছেলে এবং মেয়ের জীবন এখন বিপন্ন।

জয়ার মতো অল্পবয়সি একটি মেয়ের কাছে এইরকম জেরার মুখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন বিজুদা। তাই ওর কথার কী যে উত্তর দেবেন কিছু ভেবে পেলেন না। তবে তিনি চটলেন না, বা উত্তেজিতও হলেন না। শুধু হেসে বললেন, আমার সম্বন্ধে তুমি অনেক কিছুই ধারণা করেছ দেখছি।

সরমা বললেন, ওই একই ধারণা তো আমারও। ও যা বলল তার পরিষ্কার উত্তর আপনার কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকেই আশা করছি।

বিজুদা বললেন, তা হলে শুনুন, ব্যাপারটা যখন থানা-পুলিশের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে তখন কোনও রহস্যই আর গোপন থাকবে না। তবুও এখনই এই ব্যাপারে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন না বিষয়টি ক্রমশ প্রকাশ্য।

বিজুদার এই কথার উত্তরে কেউ কিছু না বললেও জয়া বলল, চালাকি করে আপনি কিন্তু পার পাবেন না। আপনার মুখোশ আমি খুলবই। বলে কারও দিকে না তাকিয়ে রাগি-রাগি মুখে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

জয়ার তেজস্বিতায় হতবাক সকলেই।

বিজুদাও ওর ব্যবহারে এবং কথাবার্তায় একটু অপমান বোধ করলেও অন্তরের দৃঢ়তায় তা প্রকাশ করলেন না। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কারও সঙ্গে কোনও

কথা না বলে, একবার নিজের ঘরে ঢুকে কী সব খুটখাট করে পোশাকটা পরিবর্তন করলেন। তারপর বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক-পা এক-পা করে নেমে এলেন নীচে।

বিজুদার মা বারান্দার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বললেন, এই অবেলায় কোথায় চললি বিজু?

বিজুদা বললেন, তুমি আবার বেরিয়ে এলে কেন? ভেতরে যাও। আমার আসতে দেরি হবে।

সরমা তখন এতই রেগেছেন যে আস্তে করে বললেন, আর তুমি এসেছ! তবে পালিয়ে বাঁচবে না তুমি। আমি ঠিক গিয়ে পুলিশকে বলব সব কথা। কী এমন জিনিস, যেটার জন্য এত?

হঠাৎ একটি পুলিশের গাড়ি এসে থামল হলিডে হোমের সামনে। একজন সাব ইনস্পেক্টর ওপরে উঠে এসে স্নেহাংশুবাবুকে বলেন, আপনাকে এখুনি একবার থানায় আসতে হবে স্যার।

স্নেহাংশুবাবু আশান্বিত হয়ে বললেন, কোনও খবরটবর?

ইনস্পেক্টর সরমার দিকে একবার তাকিয়ে স্নেহাংশুবাবুকে বললেন, নীচে আসুন, বলছি।

স্নেহাংশুবাবুর বুক কাঁপতে লাগল।

সরমা বললেন, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? যা বলার আমাকেও বলুন।

ইনস্পেক্টর সে কথায় কান না দিয়ে চাপা গলায় স্নেহাংশুবাবুকে কী যেন বললেন ফিস ফিস করে। তারপর দু'জনেই গাড়িতে উঠে বসলেন।

সরমা একবার সব্যসাচী বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে বারান্দাতেই জ্ঞান হারালেন। কী যে হল ব্যাপারটা কেউ কিছু বুঝতেও পারল না।

নয়

কৈশোর আর যৌবনের এই যে সন্ধিক্ষণ, এই বয়সটাই কিন্তু মারাত্মক। এই বয়সটায় মন চঞ্চল হয়। রক্তে উত্তেজনা থাকে। তার ওপর একটু যদি জেদি হয়তো কথাই নেই।

সব্যসাচীর এই ব্যাপারটায় জয়ার মন এমনভাবে তোলপাড় করছিল যে, তা বলবার নয়। বিশেষ করে বিজুদাকে কতকগুলো অপ্রিয় কথা বলে এসে মন ওর আরও বেশি উত্তাল হয়ে উঠল। সে ঠিক করল কেউ কিছু করুক-না-করুক সে নিজেই খুঁজে বার করবে সব্যসাচীকে। কিন্তু কীভাবে?

বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করতে করতেই মনস্থির করল জয়া।

বাড়ির সবাই সি-বিচে বেড়াতে যাচ্ছে।

জয়া বলল, আজ আর আমি কোথাও যাব না। শুধু ছাদে বসে সমুদ্র দেখব। তোমরা যাও।

মামি বলেন, ঘরের চাবিটা তা হলে রাখ তোর কাছে?

না না। ও তোমরা নিয়ে যাও। আমি কোথায় হারিয়ে ফেলব তার ঠিক কী? তা ছাড়া এখন ভাল লাগছে না, একটু পরে যদি মন চায় তো যেতেও পারি।

মামা বললেন, তা হলে ঘরে থেকেই বা করবিটা কী? সবাই যেমন একসঙ্গে যাই তেমনিই যাই চল।

না মামা, আমার কিছু ভাল লাগছে না। তা ছাড়া আমার যেন কেমন ভয় করছে।

তা হলে থাক। দেখিস যেন অন্য কোনও মতলব করিস না।

মামা, মামি, দিদিমা সবাই চলে গেলে জয়া ধীরে ধীরে নীচে নামল। প্রচণ্ড জেদের কাছে ওর ভয়ভীতি সবকিছুই হার মেনেছে। সূর্য অস্ত যেতে এখনও অনেক দেরি। ও ঠিক করল এই সুযোগে ও একাই চেষ্টা করবে সব্যসাচীকে খুঁজে বার করতে। এই তদন্তের কাজ শুরু করবে সেই মোহানার দিক থেকে। জয়া তৈরিই ছিল।

সবাই চলে গেলে ও ধীরে ধীরে পথে নামল। তারপর আপন মনেই এগিয়ে চলল মোহানার দিকে।

সমুদ্রের গা বেয়ে দীর্ঘ পথ চলে গেছে সেই পাখাগুলো পার হয়ে দূরে বহুদূরে। সেইপথে ও খানিক যেতেই দেখল এক জায়গায় দুটি ছেলে নতুন একটি সাইকেল রেখে একপাশে বালিয়াড়িতে বসে কীসব গল্প করছে।

জয়া মতলব একটা এঁটে সেই ছেলেগুলোর পাশ দিয়ে একবার সমুদ্রে নামল। তারপর পায়ের পাতাদুটি ভিজিয়ে বালিতে পা ঘষে উঠে এল ওপরে। এদিক সেদিক ঘুরল।

অল্পবয়সি ছেলেদুটি এই নির্জন সৈকতে এমন একটি ফুটফুটে কিশোরীকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই চোখ মেলে তাকাল তার দিকে। হয়তো বা ভালও লাগল ওকে।

জয়াও ওদের দিকে তাকাল। তাকিয়ে হাসল একটু।

ছেলেদুটিরও অল্প বয়স। তাই জয়ার সৌজন্যতায় অভিভূত হল।

একটি ছেলে খুব ভদ্রভাবেই বলল, তুমি একা কেন? তোমার সঙ্গে আর কেউ নেই?

জয়া হেসে বলল, কে বললে আমি একা? আমার দুই বন্ধুও তো আছে এখানে।

কোথায় তারা?

এই তো আমার সামনেই বসে আছে। আমার সঙ্গে কথা বলছে।

ছেলেদুটি আরও খুশি হল, তুমি খুব ভদ্র মেয়ে তো। কোনও মেয়ের কাছ থেকে এমন মার্জিত ব্যবহার আমরা কখনও পাইনি। কোথায় উঠেছ তুমি?

জয়া একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে, ওই বাড়িটাতে।

ওরে ব্বাবা। ওদের তো গলাকাটা রেট। তা পুরীতে এত জায়গা থাকতে ওখানে উঠলে কেন?

তা বলতে পারব না। আমার দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে এসেছি।

একজন বলল, বাদাম খাবে? যদি খাও তো নিয়ে আসি।

জয়া বলল, কোথায় কতদূরে আনতে যাবে?

ওই তো। ওই চা-দোকানটায় পাওয়া যায়।

যাও। তবে ভাই একটা কথা। তোমাদের এই সাইকেলটার ওপর আমার কিন্তু দারুণ লোভ। আসলে আমি সাইকেল ছাড়া একদম থাকতে পারি না। আর পুরীতে এসে ওই দূরে কত কী দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যেতে পারছি না, তাই খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেশ তো, এ আর এমন কথা কী? কোথায় কতদূরে যেতে চাও বলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

ডবল ক্যারি করতে পারবে?

আমরা তো দু'জনে একই সাইকেলে এসেছি।

তা হোক, আমি একা একটু চেপে দেখতে চাই। একা সাইকেলে বসে প্যাডেল করতে দারুণ ভাল লাগে আমার।

যা তোমার ইচ্ছা।

তোমরা তা হলে বাদাম কিনে আনো, আমি ততক্ষণে একপাক একটু ঘুরে আসি।

একজন বাদাম কিনতে গেল।

অন্যজন জয়ার সঙ্গে এল পিচ রাস্তায়। এসে বলল, তুমি কিন্তু বেশিদূরে যেয়ো না। এক পাক ঘুরেই চলে এসো। তারপর আমি তোমাকে সাইকেলে চাপিয়ে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে গেলে আর তুমি ফিরতেই চাইবে না।

জয়া চোখদুটো বড় বড় করে বলল, সত্যি! বলেই সাইকেলে চেপে বসল। তারপর বলল, শোনো, আমার যদি ফিরে আসতে দেরি হয়, তা হলে কিন্তু আমার খোঁজ কোরো তোমরা।

দেরি হবে কেন? বেশিদূর যেয়ো না। ওই মুখ পর্যন্ত গিয়েই চলে এসো।

বলা যায় না, যদি কোনও বিপদে পড়ি।

এখানে কারও কোনও বিপদ হয় না। এ তোমাদের কলকাতা নয়। তুমি নির্ভয়ে যেতে পারো।

না। ওই মোহানার দিকটা খুব নির্জন তো।

তুমি মোহানায় গেছ? ওদিকে মোহানা আছে তুমি জানলে কী করে?

নদীর ওপারে যে উঁচু বালিয়াড়িটা আছে ওখানটা কিন্তু ভীষণ নির্জন।

তুমি তো সবই জান দেখছি।

তারও ওপারে যে ঝাউবন সেটা কিন্তু আরও রহস্যময়।

ওদিকে খবরদার যেয়ো না। শোননি কাল ওখানে কী হয়েছে?

সেইজন্যই তো ওইদিকে যাচ্ছি। আমি চাই কারও কোনও হিম্মত থাকে তো আমার কিছু করুক।

শোনো, ওরকমটি কোরো না। প্লিজ, কী নাম তোমার?

আমার নাম মহিষাসুরমর্দিনী। ছাড়ো, পথ ছাড়ো। বলেই ছেলেটিকে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত সাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে গেল জয়া।

ছেলেটি চেঁচাতে লাগল, এই শোনো— শোনো—।

ওর অপর বন্ধুটি ততক্ষণে বাদাম নিয়ে ফিরে এসেছে। বলল, কী হল রে ঘণ্টা?

হবে আর কী? দিব্যি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমার ঘণ্টায় বারোটা বাজিয়ে চলে গেল।

সে কী!

এ তো দেখছি আর এক ফুলনদেবী।

এখন তা হলে উপায়?

যেভাবেই হোক, মোহানা অব্দি যেতেই হবে আমাদের। বারোশো টাকার সাইকেল, এটাকে তো উদ্ধার করতেই হবে।

কিন্তু সে তো অনেক দূরের পথ।

তবুও যেতে হবে ভাই।

ওরা দ্রুত পা চালিয়ে মোহানার দিকে যেতে যেতেই একটা অটো দেখতে পেল।

জয়া তখন অনেক অনেক দূরে চলে গেছে।

ওরা অটোর চালককে বলল, শোনো ভাই, ওই যে মেয়েটা যাচ্ছে, তুমি যত শিগগির পারো আমাদের দু'জনকে ওর কাছে পৌঁছে দাও। একদম দেরি কোরো না।

চালক ওদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, ওইসব ধান্দাবাজির কাজ

আমি করি না ভাই। মতলবটা কী তোমাদের?

সে তুমি বুঝবে না। যা টাকা লাগে আমরা দেব।

তোমাদের মতন ফুটো ক্যাপ্তেন আমি অনেক দেখেছি। পঞ্চাশটি টাকা আগে বার করো, তারপর যাচ্ছি।

পঞ্চাশ টাকা আমরা এখনই কোথায় পাব? আমাদের বাড়ি চলো, আমরা ঠিক দেব। ওই মেয়েটা আমাদের সাইকেল নিয়ে পালাচ্ছে।

ওইসব মেয়েটেয়ের ঝামেলায় আমি নেই। তোমরা অন্য রাস্তা দেখো। না হলে আমি পুলিশ ডাকব। ভাগো এখান থেকে।

ছেলেদুটি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অটো চলে গেল অন্যদিকে।

সূর্য তখন জলে নামলেও মেয়েটি একেবারেই ডুব।

ওরা দু'জনে জোরে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে চলল। পাখাগুলো যেখানে শেষ হয়েছে তার ওধারে আর পথ নেই। শুধু বালি বালি আর বালি। ওরা দেখল সেই বালির ওপর একটি পোস্টের গায়ে ওদের সাইকেলটা রয়েছে বটে, কিন্তু মেয়েটির কোনও চিহ্নও নেই।

তবুও ওরা মোহানার দিকে এগোল। খানিক যাবার পর এক জায়গায় বালির ওপর মেয়েটির সোনালি চটির একপাটি পড়ে থাকতে দেখল। আরও খানিকটা গিয়ে দেখতে পেল আর এক পাটি।

নদীর কাছে গিয়ে ওরা দেখল মোহানার নদী সমুদ্রের জোয়ারে ফুলছে। সে কী ভীষণ বেগ তার। জলও যে কত তা কে জানে? কিন্তু মেয়েটি! মেয়েটি কোথায় গেল? সে কী সত্যিই মেয়ে? না কোনও জাদুকরী? তা যদি না হয়, তা হলে এই ভয়ংকর নির্জনে সে অমন ভোজবাজির মতন অদৃশ্য হয় কী করে?

ঘন্টার সঙ্গে ওঁর যে বন্ধুটি ছিল তার নাম কাঁসর। সে চিৎকার করে বলল, আরে ও চাঁদবদনি! তুমি যেখানেই থাক ফিরে এসো। আমাদের সাইকেল আমরা পেয়েছি। আমরা তোমাকে কিছুটি বলব না। তুমি না এলে আমরা কিন্তু বিপদে পড়ে যাব। তোমার সঙ্গে যদি কেউ আমাদের কথা বলতে দেখে থাকে তা হলে সে কিন্তু পুলিশের কাছে আমাদের নামই বলবে।

ঘন্টা আর কাঁসর চেঁচিয়েই সারা হল। ওদের কথাতে সাড়াও দিল না কেউ, এলও না।

ওরা তখন ভয়ে ভয়ে পিছু হাঁটল।

যেতে যেতে ঘন্টা বলল, ভয় তো অন্য কাউকে নয়, কাল করলাম অটো ডেকে।

কাঁসর বলল, এখন মানে মানে কেটে পড়ি চল।

ওরা খানিক এসেই অন্য পথ ধরে অন্য দিকে উধাও হয়ে গেল।

ওরা চলে যাবার পর একটি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জয়া। তারপর ওর চটিদুটো হাতে নিয়ে নদী পার হবার বৃথা চেষ্টা না করে ধীরে ধীরে বালিয়াড়ির গা বেয়ে এগিয়ে চলল, নদীটা যেদিক থেকে বয়ে এসেছে সেইদিকে। খানিক যাওয়ার পর নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানে আসতেই দেখল কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর মেয়েপুরুষ এক জায়গায় বসে জটলা করছে। একপাশে বাঁশের একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে ছোট্ট একটি পানসি। ও ধীরে ধীরে সেটার ওপর উঠে বাঁধনটা খুলে দিতেই পানসিটা স্রোতের বেগে ভেসে চলল তির তির করে। বেশিদূরে অবশ্য গেল না। খানিক গিয়ে পানসিটা একটু কাত হতেই ও লাফিয়ে পড়ে জলে। তারপর ভিজে সপ সপ করে হাঁটু জল পার হয়ে যখন ডাঙায় উঠল তখন মনে হল এ কী করল সে? এখানে সে কেন এল? সব্যসাচীর খোঁজে এইখানে আসার দরকারটাই বা ছিল কী তার? সে কী পাগল হয়ে গেছে? এখন এই অন্ধকারে সাপ-শেয়াল, নয়তো কোনও বন্যজন্তুর পেটে যেতে হবে তাকে। চারদিকে সামুদ্রিক বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। ঘন ঝাউবনের কান্না। নিশাচর পাখিদের ডাক। শুধু অন্ধকার— অন্ধকার— আর অন্ধকার।

হঠাৎ সেই অন্ধকারে ঝাউবনের ভেতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে এল এক এক করে।

ওরা এসে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওকে। একসঙ্গে অনেকগুলো টর্চের আলো ওর ওপরে পড়ল।

জয়া সভয়ে তাকাল তাদের মুখের দিকে। কিন্তু এই অন্ধকারে কারও মুখই ভাল করে দেখতে পেল না সে।

ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, কে তুমি! এখানে কী জন্য এসেছ?

জয়া বলল, আমি এখানে আত্মহত্যা করতে এসেছি।

আত্মহত্যা করতে? এতদূরে? কেন সমুদ্রে কী জলের অভাব ছিল?

না। যদি কেউ আমাকে উদ্ধার করে সেই ভয়ে আমি এইখানে চলে এসেছি। কিন্তু এখানে নদীতে ঝাঁপ দিয়েও মরণ হল না। ওপার থেকে একটা পানসি নিয়ে ভেবেছিলাম মাঝসমুদ্রে ভেসে যাব। কিন্তু ফল হল উলটো। পানসিটা ভেসে চলল অন্যদিকে।

তা তো যাবেই। এখন তো জোয়ারের সময়।

তাই আমি মনের দুঃখে নদীতে ঝাঁপ দিই। কিন্তু এমনই কপাল যে নদীতে জল বেশি নেই। তাই বেঁচে গেলাম।

জল আছে। তবে কিনা তুমি নিশ্চয়ই ডাঙার কাছে উলটে ছিলে। বলে জয়ার পোশাকে হাত দিয়ে বলল, আরে সত্যিই তো। তুমি তো দেখছি ভিজে গেছ।

এইবার ভারিক্কি চেহারার একজন এগিয়ে এসে বললেন, কিন্তু কেন তুমি আত্মহত্যা করতে চাও। এমন ফুটফুটে চেহারা তোমার। টাটকা ফুলের মতো মেয়ে তুমি। এ জীবন নষ্ট করবে কেন?

জয়া বলল, আমি জীবনে সুখী নই। আমার মা নেই, বাবা নেই। মামা-মামির কাছে মানুষ। তারা আমাকে দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতেও দেয় না। আমার লেখাপড়া ছাড়িয়ে দিয়েছে। এখন শুনছি একটা আধবুড়ো লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে দলের একজন রুখে দাঁড়াল, নেভার। বলেই বলল, নিয়ে আসব ওর মামা-মামিকে?

কখনও না। এই দুনিয়ায় যারা পিতৃমাতৃহীন তাদের সবার জীবনেই এই একই নাটক। কতজনকে টেনে আনবে? আজ আমরাও যদি বাবা-মায়ের আশ্রয়ে থেকে সৎ শিক্ষা পেয়ে নিজেদের মানুষ করতে পারতাম তা হলে কী এই জীবন বেছে নিতে হত আমাদের? আমরা খুনি, আমরা ডাকাত, পুলিশের ভয়ে আমরা বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি। এর মূলেও তো সেই একই ভবিতব্য। রাস্তার ছেলে আমরা, রাস্তায় মানুষ হয়েছি। বাবা-মা কে তাও জানি না। চোখেও দেখিনি তাদের।

মেয়েটাকে নিয়ে তা হলে কী করবে?

আর যাই করি মরতে ওকে দেব না।

কিন্তু ওকে রাখবে কোথায়?

এমন সময় টর্চের আলো ফেলে দু'জন লোক সেখানে এসেই জয়াকে দেখে চমকে উঠল, এ কী! তুমি এখানে?

জয়া কিন্তু চিনতে পারল না তাদের। বলল, আপনারা?

তুমি আমাদের চিনবে না। তোমার নাম তো জয়া?

ঠিকই বলেছেন আপনি।

তুমি এখানে কী করতে এসেছ? কে পাঠিয়েছে তোমাকে? সঙ্গে আর কে আছে?

ভারিক্কি চেহারা বললেন, রঘু! তুমি একে চেন? মেয়েটা এখানে আত্মহত্যা করতে এসেছিল।

বাজে কথা। ও যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে হবে নাকি? বলেই বলল, পুলিশকে তোমরা কী বলেছ আমাদের নামে?

আপনাদের তো চিনিই না। কাজেই বলবটা কী?

সেই ছোকরাকে তো চেন? সে নিশ্চয়ই বলেছে? বলো হ্যাঁ কি না?

জয়া বলল, বুঝেছি। সব্যসাচী তা হলে আপনাদের কথাই বলছিল কাল। সেই রহস্যময় দু'জন।

কিন্তু তুমি এখানে কেন?

আমি সব্যসাচীর খোঁজে এসেছি। বলুন তাকে আপনারা কোথায় লুকিয়েছেন?

ভারিক্কি চেহারা দারুণ রেগে বললেন, ওরে শয়তান মেয়ে। তুমি তা হলে স্পাইগিরি করতে এসেছ এখানে? এই কে আছিস, এখুনি এই বালির মধ্যে দশ হাত গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফ্যাল মেয়েটাকে।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা গুলির শব্দ হতেই একজন লোক বুকে হাত চেপে লুটিয়ে পড়ল সেখানে। মুহূর্তের মধ্যে সব ফাঁকা। জয়াও সেই সুযোগে দৌড় দিল গভীর জঙ্গলের দিকে।

ছুট— ছুট— ছুট।

ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় বালিতে পা হড়কে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জয়া। তারপরই যা দেখল তা দেখেই মূর্ছা গেল সে। জয়া দেখল বালির স্তূপের মধ্য থেকে ধড়হীন একটা মুণ্ড উঁকি মারছে। কী করুণ সেই মুখ। মুখটা ভাবলেশহীন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে একবার শুধু বলল, জল। একটু জল।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নর মধ্যে থাকার পর আবার যখন সংবিৎ ফিরে পেল জয়া, লোকটি তখনও বলছে, জল। আমাকে একটু জল দেবে? বড্ড তেষ্টা।

জয়া প্রথমে খুব ভয় পেল। লোকটাকে ভূত ভেবে শিউরে উঠল সে। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কে আপনি?

আমি জয়শংকর প্রসাদ। আমাকে তুমি উদ্ধার করো। ওরা আমাকে হাত-পা বেঁধে বালির সঙ্গে পুঁতে রেখেছে।

জয়া হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়েই বালি সরাতে লাগল। তারপর একসময় যখন টেনেহিঁচড়ে উদ্ধার করল তাকে তখন দেখল, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক রূপবান যুবক সে।

জয়শংকর জয়াকে আদর করে বলল, আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন। কী নাম তোমার?

আমার নাম জয়া।

তবে তো ভালই হল। জয়া আর জয়শংকর। কী চমৎকার নামের মিল দেখেছ? কিন্তু এই অন্ধকারে তুমি এখানে কীভাবে এলে? ওরা কি তোমাকে চুরি করে এনেছিল?

জয়া বলল, আমার কথা পরে বলব আপনাকে। আপনার তো খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। এখন চলুন কোথাও যদি একটু জল পাই তো দেখি।

জয়শংকর জয়াকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে এগিয়ে চলল।

একটু পরেই একদল পুলিশ এসে তোলপাড় করতে লাগল চারদিক। তাদের সঙ্গে সেই কাঁসর-ঘণ্টাও ছিল। তারাই পুলিশে খবর দিয়ে ডাকিয়ে এনেছে পুলিশকে।

পুলিশ অফিসার সঙ্গের কনস্টেবলদের বললেন, আর খুঁজে লাভ নেই। আপাতত ডেড বডিটাকে মর্গে পাঠাও। কাল সকালে এসে দিনের আলোয় আর একবার দেখা যাবে।

হঠাৎ একজন কনস্টেবল ছুটে এসে বলল, ওই দেখুন স্যার, ওখানকার বালিটা কীরকম খাবলানো। তার মানে ওখানে নিশ্চয়ই কিছু লুকনো ছিল।

সেই যে সেই ছেলেটা, কী যেন নাম? পার্থ না কী? ওর মামার ডেড বডিও থাকতে পারে। শেয়াল-কুকুরে টেনে তুলেছে হয়তো।

একবার একটু দেখব নাকি স্যার?

কোনও লাভ নেই। তবু বলছ যখন দেখো।

কয়েকজন কনস্টেবল টর্চের আলোয় চারদিক দেখে বলল, নাঃ। কিছুই পাওয়া গেল না এখানে।

তা হলে আর সময় নষ্ট না করে ফিরে চলো।

সবাই চলে গেলে জায়গাটা কেমন যেন এক শূন্যতায় ভরে উঠল। একটা শেয়াল গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে এমন একটা হাঁক দিল যে একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়াল ডেকে উঠল একজোটে, হু-হু-হুক্কা-হুয়া-হুয়া-হুয়া-হুয়া। সেইসঙ্গে তীব্র থেকে তীব্রতর হল সমুদ্রের ডাক। ওঃ সে কী গর্জন। যেন কান পাতাও দায়।

দশ

এবারে সব্যসাচীর কথায় আসা যাক। বেচারি সব্যসাচী। বাপিকে জয়ার মান ভাঙাবার জন্য ভেতরে পাঠিয়ে মন্দিরের বাইরে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। হঠাৎ মনে হল পেছন দিক থেকে কে যেন মুখে একটা রুমাল চাপা দিয়ে টেনে নিল ওকে। তারপর চোখের সামনে সবই যেন অন্ধকার।

না। ক্লোরোফর্ম বা ওই জাতীয় কোনও রাসায়নিকের প্রভাবে ও চোখে অন্ধকার দেখেনি। আসলে কালো কাপড় দিয়ে ওরা ওর মুখ ঢেকে দিয়েছিল। আর সেই রুমালের মিষ্টি গন্ধ নাকে যেতেই নিশ্বাস বন্ধ করেছিল সে। গোয়েন্দা গল্প পড়ে পড়ে ওর ভেতরটা এমনই তৈরি ছিল যে ও জানত এই অবস্থায় কী করতে হয়। পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বিলু ভোম্বল কিংবা বাচ্চু বিচ্ছু অথবা সোনার গণপতি হিরের চোখের বিল্টু তিন্নি শুভঙ্কর মউ ওর আদর্শ হয়ে উঠেছে।

তাই দম বন্ধ করে দু'-একবার ছটফট করার ভান করে স্থির হয়ে রইল।

ওরা ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলল কোথায় যেন। মন্দিরের পেছন দিকের একটা মাঠে সকালের সেই মারুতিটা রাখা ছিল। ওরা তাইতে করে নিয়ে চলল ওকে।

সব্যসাচীর প্যান্টের পকেটে তখনও ছিল সেই মূল্যবান জিনিসটা। ও ভাবল, এবার নিশ্চয়ই ওরা সার্চ করে কেড়ে নেবে জিনিসটা। কিন্তু সেটা যে ওর কাছেই আছে তা কি জানতে পেরেছে ওরা?

কিন্তু না। ওরা কিছুই করল না ওর।

সব্যসাচী সজ্ঞানে থেকেও অজ্ঞান হওয়ার ভান করে শুনতে লাগল ওদের কথাবার্তা।

মারুতিতে দু'জন ছিল। একজন বলল, তোমরা কি ভুলের পর ভুল করে যাবে? আমি বারবার বলেছিলাম এটাকে স্টেটের বাইরে পাচার করে দাও, কিন্তু শুনলে না। এখন—।

এখন কী? পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে এই গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে যাব, পুলিশও টেরও পাবে না।

ওইরকম চালাকি করতে গেলে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে হয়। কিন্তু এইসব ফাঁকা জায়গায় বিপদের সম্ভাবনা যে কত তা কি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে?

সেটা অবশ্য ঠিক। এখন ছেলেটাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েই এটাকে একটা ট্রাকে উঠিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে পাচার করা হবে।

কিন্তু ছেলেটাকে কিডন্যাপ করার আদৌ কি কোনও প্রয়োজন ছিল?

না। তবে যে মুহূর্তে শুনতে পেলাম ছেলেটি এইদিকে এসেছে তখনই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

তার মানে পুলিশ এবং তদন্তকারী গোয়েন্দাদের ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে আমরা এই অঞ্চলেরই আশপাশে আছি।

এছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

কেন, আসল মালটিকে ধরে আনলে ক্ষতিটা কী ছিল?

ক্ষতি ছিল বইকী। তার কাছ থেকে ওই জিনিসটা কি উদ্ধার হত তা হলে? এখন এই ছেলেমেয়েদুটোকে আটকে রেখে ওকে বাধ্য করাব জিনিসটা আমাদের হাতে তুলে দিতে।

প্রথম লোকটি এবার দারুণ রেগে বলল, তা হলে কেন ওই দুর্ঘটনা ঘটালে। লোকটা যদি মরেই যেত?

আপদ চুকে যেত তা হলে।

ও। লোকটা মরে গেলে জিনিসটার পা গজাত আর সেটা হেঁটে এসে আমাদের পকেটে ঢুকত, তাই না?

দ্বিতীয় লোকটি এ কথার কোনও উত্তর দিল না। গাড়ি এসে থামল একটা বনময় প্রান্তরে।

গাড়িতে দু'জনই মাত্র লোক ছিল। একজন ছিল চালকের আসনে, আর একজন সব্যসাচীর কাছে। ওরা গাড়ি থেকে নেমে ছোট্ট একটি টিলার পাশ দিয়ে ওকে কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলল। তারপর একটি পুরনো ধরনের বাড়ির কাছে এসে থামল।

ভেতর থেকে কে যেন একজন বেরিয়ে এসে বলল, এটা আবার কে?

সম্ভবত বিজুর ভাইপোটাইপো কেউ হবে।

সবই তা হলে আন্দাজের ওপর চলছে? এদিকের খবর জানো তো, বীর সিং শ্যামাকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে।

ওর অপরাধ?

সামান্য একটু ভুল। তদন্তকারী অফিসার মি. ভারতীর ছেলে শুভমের বদলে অন্য একটি ছেলেকে ধরে এনে সমস্ত পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেওয়ার ফল।

শ্যামা নেই!

না। তার চেয়েও মারাত্মক খবর, বীরাপ্পানের দল আইনজীবী জয়শংকরপ্রসাদকে কিডন্যাপ করেছে এবং পুলিশের সন্দেহ ওটা আমাদেরই কাজ।

সেই মেয়েটা এখন কোথায়?

ওকে এখানেই রাখা হয়েছে।

ছেলেটাকে তা হলে কী করব?

আপাতত জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত এইখানেই রাখো, দিনের বেলা কিছু করতে যেয়ো না। রাত্রিবেলা ওর পরিচয় জেনে ছেড়ে দিয়ে এসো দূরে কোথাও।

সব্যসাচী কানখাড়া করে শুনল সব। ওর অভিনয়ে কেউ জানতেও পারল না ও সচেতন আছে বলে। ওরা ওকে নীচের তলার একটি ঘরে তক্তাপোশের বিছানায় শুইয়ে মুখের ঢাকা সরিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। অবশ্য যাবার আগে দরজায় শিকল দিয়ে যেতে ভুলল না।

ওরা চলে যেতেই উঠে বসল সব্যসাচী। যা ভেবেছে তাই। তক্তাপোশেই একপাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে লিপি। মেয়েটা কেমন বিশ্রীরকমের বেঁকে কাত হয়ে শুয়ে আছে। দেখে মনে হয় ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন ভাবটা হয়তো একবার কেটেছিল, পরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

সব্যসাচী উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে দেখতে লাগল এখান দিয়ে পালাবার

কোনও পথ পায় কি না। কিন্তু না। এই ঘরটি এতই ছোট যে, এই ঘরে দেওয়াল ছাড়া কিছু নেই।

একটা আলোবাতাস আসার মতন ব্যবস্থা আছে। দেওয়ালের উপরিভাগে মোটা মোটা লোহার রড দিয়ে ভেন্টিলেটারের মতো করা। তাতে পাল্লা নেই। কিন্তু সেটা এমনই উঁচুতে যে সব্যসাচী চেষ্টা করেও তার নাগাল পেল না। তাই প্রাকৃতিক অবস্থান চোখে না দেখেও অনুমান করা গেল। অর্থাৎ ঘরটা নীচের তলায় হলেও ঠিক আন্ডারগ্রাউন্ডে নয়। জায়গাটা উঁচুনিচু হওয়ার জন্য সামনের দিক থেকে যেটা একতলা বলে মনে হয় আসলে সেটাই দোতলা। এটা হল নীচের তলায়। বাড়িটা বহু পুরনো। এককালে হয়তো কোনও বড়লোকের বাগানবাড়ি ছিল। এই ঘরটা এত ছোট যে এখানে হয়তো ঘুঁটেকয়লা ইত্যাদি রাখা হত। কিন্তু মুশকিল যেটা, সেটা হল, ওই একটি মাত্র দরজাকে ভেঙে না বেরোতে পারলে এখান থেকে পালানো অসম্ভব।

সব্যসাচী অকারণেই ঘরময় পায়চারি করল। একপাশে ছোট একটি টি-টেবিলে কয়েকটা মাখনটোস্ট রাখা ছিল। আর ছিল এক কলসি জল। লিপির জন্যই রেখেছিল নিশ্চয়ই। ও খায়নি। ওষুধের প্রভাবে ও এখনও আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বেলা তো এখন অনেক হয়েছে। ওরা কি ওর জন্যও কিছু আনবে না? খিদেও পেয়েছে ওর। কলসিটা তুলে দেখল জল বেশ ভরতি আছে। ও দ্বিধা না-করে দুটো টোস্ট চিবিয়ে খেয়ে ঢক ঢক করে জল খেল এক গেলাস। তারপর পকেটের জিনিসটা বার করে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সেটাকে। কী এটা? কী আছে এর ভেতরে? বিজুদা কেন এটাকে লুকিয়ে রাখছেন। ওই দলের সঙ্গে কী সম্পর্ক বিজুদার? দুর্ঘটনায় বিজুদার আঘাত কতটা মারাত্মক? জয়া আর বাপিদা কি ওর খোঁজ করছে? নাকি ফিরে গিয়ে খবর দিয়েছে ওর বাবা-মাকে? কিছুই ভেবে পেল না সব্যসাচী।

দরজার পাল্লার কাঠ পুরনো। তবে বেশ মজবুত। ও দু'-একবার টেনে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু না। ওদিক থেকে শিকল থাকার জন্য একটুও ফাঁক করতে পারল না।

ও আবার লিপির কাছে এল। ওকে একটু টেনে ধরে সোজা করে শুইয়ে দিল। কী জ্বালা। মেয়েটা যদি সজ্ঞানে থাকত, তা হলেও ওর সঙ্গে কথা বলে সময় কাটত। কিন্তু এমনই আচ্ছন্ন যে—।

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেহটাকে টান করে পাশ ফিরে শুল লিপি।

সব্যসাচী ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে আস্তে করে ডাকল, লিপি! লিপি!

তন্দ্রার ঘোরেই লিপি একবার সাড়া দিল, উঁ।

একবার উঠে বসো। চেয়ে দেখো আমি কে? আমি সব্যসাচী।

লিপি অবচেতন মনেই একটু হেসে আবার ঘুমোতে লাগল।

সব্যসাচী ওর হাতদুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করল একটু। চোখ টেনে দেখল। কপালের ওপর হাত বুলিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করে দিল। তবুও লিপির ঘুম আর ভাঙে না। সত্যি, কারা পাপ করে, কারা শাস্তি পায়।

হঠাৎ বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ।

সব্যসাচী এক মুহূর্তও দেরি না-করে তক্তপোশের বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে ঘুমের ভান করল। কে যেন একজন এল। চোখটা বুজে থাকায় চেহারাটা দেখা গেল না। সে এসে ওদের গায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখল। অর্থাৎ ওরা সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে দেখল তাই। তারপর টেবিলের ওপর কী সব নাড়াচাড়া করে আবার চলে গেল দরজায় শিকল দিয়ে।

সে চলে যেতেই সব্যসাচী উঠে বসল। তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে দেখল দুটো প্লেটে ওদের দু'জনের জন্য সামান্য কিছু ভাত আর বেগুনপোড়া রেখে গেছে। রাগে সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কচুপোড়া খাও অনামুখোরা।

হঠাৎ ওর কানে দূরাগত কিছু ঘণ্টার ধ্বনি ভেসে এল। তার মানে এই নির্জনে নিশ্চয়ই কোথাও কোনও আশ্রম অথবা দেবস্থান আছে।

সব্যসাচীর মাথায় এবার বুদ্ধি এল একটা। কলসি থেকে এক গেলাস জল নিয়ে একটু একটু করে ঝাপটা দিতে লাগল লিপির মুখে।

এই ওষুধেই কাজ হল। দু'-একবার জলের ঝাপটা দিতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল লিপি। কেমন যেন ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, আমি কোথায়? তোমরা আমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছ? আমাকে ছেড়ে দাও।

সব্যসাচী হঠাৎ ওর মুখ চেপে ধরে বলল, চু—উ—প।

এতক্ষণে ঘোর কাটল লিপির। চোখের সামনে সব্যসাচীকে দেখে সবিস্ময়ে বলল, সব্যসাচী তুমি! তুমি এখানে কেন? ওরা কী তোমাকেও ধরে এনেছে এখানে?

হ্যাঁ। তবে বলতে পারো আমি নিজেই ধরা দিয়েছি।

তুমি ধরা দিয়েছ?

ওরা তোমাকে গুম করল। তোমার কাকা, বিজুদাকে হত্যার চেষ্টা করল। আমি এই খবর হলিডে হোমে পৌঁছে দিলে তোমার বাবা-মা সবাই ছুটোছুটি করছেন। থানা-পুলিশ হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাপিদা আর আমি তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। লোকনাথ মন্দিরের কাছে ওরা আমাকে আচমকা তুলে নিল। তারপর এইখানে এই ঘরে—।

লিপি এবার উঠে বসল।

সব্যসাচী বলল, শোনো, ওরা আমাদের দু'জনের জন্য সামান্য কিছু খাবার রেখে গেছে। আগে খেয়ে নিই এসো। পরে এখান থেকে পালাবার একটা মতলব করা যাবে।

কীভাবে কী করবে?

সেটা ঠিক করব পরে। আপাতত পেটায় নমো করা যাক।

ওরা আর বাক্যব্যয় না করে বেগুনপোড়া দিয়ে মোটা চালের ভাত বেশ গোগ্রাসেই খেয়ে নিল। তারপর কলসির জলেই মুখহাত ধুয়ে সেই জল আকণ্ঠ পান করে তক্তপোশে এসে বসল দু'জনে।

সব্যসাচী বলল, দেখো লিপি, এই মুহূর্তে তোমার আমার দু'জনেরই জীবন বিপন্ন। কয়েকটি কথার তুমি ঠিক ঠিক উত্তর দাও। তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ নও। আগে বলো কোন ক্লাসে পড় তুমি?

আমি ক্লাস নাইনে পড়ি।

এবার বলো তো, তোমার কাকা অর্থাৎ বিজুদা লোকটি কেমন? কী করেন? তাঁর সঙ্গে এই দলের এত বিরোধ কেন? তোমার কাকার দেওয়া একটা মূল্যবান জিনিস আমার কাছে এখনও আছে। এটার ব্যাপারে তুমি কী কিছু জান?

লিপি বলল, সব বলব তোমাকে। কিন্তু এত কাণ্ডর পরও ওই জিনিসটা তোমার কাছ থেকে খোয়া যায়নি কী ভাগ্যিস।

আসলে ওদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল আমাদের দু'জনকে আটকে রেখে মুক্তিপণ হিসেবে ওই জিনিসটা ওরা তোমার কাকার কাছ থেকে আদায় করতে চায়।

সেজন্য তো আমাকে ওরা গুম করেছে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে এল কেন?

হয়তো ওরা আমাকেও তোমাদের পরিবারের কেউ বলে মনে করেছিল। তা যাকগে, এখন আসল কথাটা বলো।

লিপি বলল, শোনো তবে—

আমার কাকা বরাবরই একটু ডানপিটে এবং একরোখা ধরনের। বাবার মুখে শুনেছি কাকার মনের মধ্যে সবসময়ই কেমন যেন একটা বিদ্রোহী সত্তা কাজ করত। অন্যায় উনি কখনও বরদাস্ত করতেন না। এখনও করেন না। কারও মধ্যে কোনও বেয়াদপি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দিতেন। আসলে কাকার চেহারাটাও তো ভারিক্কি।

সব্যসাচী বলল, বিশেষ করে চাপ দাড়ির আড়ালে ওনাকে অত্যন্ত কঠিন পুরুষ বলেই মনে হয়।

অথচ ভেতরে উনি শিশুর মতো সরল।

এই ধরনের লোকেরা এইরকমই হয়।

তবে কাকার একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

কোন ব্যাপারে?

কাকা বরাবরই লেখাপড়ায় খুব ভাল। আমার কাকা ইংলিশে অনার্স এবং একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট।

বলো কী!

হ্যাঁ। সত্যিই উনি একজন আদর্শবাদী যুবক। বিয়ে করেননি। আমাকেও অত্যন্ত ভালবাসেন। বলতে গেলে ওই কাকার আদরেই আমি মানুষ। তা কাকা একসময় যে দলের সঙ্গে মিশতেন সেটা একটা রাজনৈতিক দল। সেই দলের জন্য উনি নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন বুঝলেন দল বিভ্রান্ত এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এমন কোনও জঘন্য কাজ নেই, যা তারা করতে পারে না, তখনই উনি সতর্ক হন এবং ওদের এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। কাকা আমার কাছে এক বিস্ময়। একজন ব্যাড টেম্পারমেন্টের মানুষ লেখাপড়ায় কী করে যে এত ভাল হয়, তা আমার ধারণারও বাইরে।

তারপরে বলো।

এইবারে যা বলব সেটা তুমি মন দিয়ে শোনো। তোমার কি মনে আছে বেশ কিছুদিন আগে রামেরাম আগরওয়ালা নামে কলকাতার একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি খুন হন?

হতে পারে। আমার মনে নেই।

ওই দলটি এই শিল্পপতিকে নানাভাবে ব্ল্যাকমেল করে। ইতিপূর্বে নিজের ব্যবসার সুরক্ষার খাতিরে মাঝেমধ্যেই প্রচুর টাকা ডোনেশান হিসেবে ওই দলটির হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। পরে বিরক্ত হয়ে তিনিও হাত গুটিয়ে নেন। ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার কাকার যোগাযোগ ছিল। কাকা রামেরামবাবুর ব্যবসার কাগজপত্তর দেখতেন। ইনকাম ট্যাক্সের হিসেব রাখতেন। আর এই দলকে কীভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কেও পরামর্শ দিতেন। ইতিমধ্যে ওই দলের পাণ্ডারা আমার কাকাকে বেশ কয়েকবার হুমকি দিয়েছে। আর ওই ব্যবসায়ীকেও শাসিয়েছে তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করলে পরিণাম ভাল হবে না বলে। হলও তাই।

উঃ কী সাংঘাতিক।

আমার কাকা ওদের চেয়েও সাংঘাতিক। তাঁর বুদ্ধির চালে ফেঁসে গেল ওরা। দলের যারা রাঘববোয়াল তারা বুদ্ধি করে কোনওরকমে টিকে থাকলেও ছুটকোছাটকারা গা ঢাকা দিল। কাকা বুদ্ধি করে ওই ব্যবসায়ীকে সবসময় তাঁর ঘরে আসা-যাওয়া করত যারা তাদের কথাবার্তা টেপ করে রাখার পরামর্শ দিতেন। ফলে যে যখন যা বলে হুমকি দিত সবই ধরা আছে তাতে। বিশেষ করে

সমাজে প্রতিষ্ঠিত এমন কিছু মানুষের কথাবার্তা টেপ করা আছে যা প্রকাশ হলে অনেকেরই মুখোশ এমনভাবে খুলে যাবে যে কেলেঙ্কারি রাখবার জায়গা থাকবে না। সেইসব টেপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অবশ্য আর একটি ক্যাসেটে বন্দি হয়ে আমার কাকার কাছে আছে। এবং সেই ক্যাসেটই এখন তোমার কাছে রয়েছে। ওই ক্যাসেট আদালতে পেশ করলে কী হবে আর কী যে হবে না তা কল্পনাও করা যাবে না। বিশেষ করে ওই ক্যাসেটে রামেরামজির মৃত্যুকালীন জবানবন্দিও ধরা আছে। দুষ্কৃতীরা সেদিন রাতে যখন তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তখনই উনি তাদের চিনতে পারেন এবং টেপ চালিয়ে কয়েকজনের নাম ধরে চেঁচান। ওরা তাঁকে গুলি করে পালায়। আর রামেরামজি তাঁর শেষ কথাগুলো টেপ করে রাখেন। ঘটনাক্রমে আমার কাকা সে রাতে সেখানে গিয়ে পড়লে সেই ক্যাসেটটি তিনি উদ্ধার করেন। ইতিমধ্যে ওই ব্যবসায়ীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে দু'জন জেল পলাতক। এরাও আবার এদেরই আর একটি বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

সব্যসাচী সবিস্ময়ে বলল, এ যে দেখছি রীতিমতো গোয়েন্দা গল্পের প্লট।

ইতিমধ্যে ওই মামলার তদন্তকারী ইনস্পেক্টর মি. ভার্গবকে ওরা টাকা দিয়ে কেনবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি ওদের টোপ গেলেন না। ওই মামলার প্রখ্যাত আইনজীবী জয়শংকরপ্রসাদও ওদের আক্রমণের বলি হন। সম্প্রতি এই জয়শংকরের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

স্ট্রেঞ্জ। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না এই পুরীতে কলকাতার ওই হত্যাকাণ্ড বা তার পরবর্তী ঘটনাবলীর বদলাবদলির ব্যাপারস্যাপারগুলো এমন নাটকীয়ভাবে ঘটছে কী করে?

আসলে ওই ব্যবসায়ী রামেরাম আগরওয়ালার একটি হোটেল আছে রাজধানী ভুবনেশ্বরে। সেইটার ব্যাপারেও কিছু কাজ ছিল। সম্বলপুরের কাছে টিটলাগড় এবং বেরহামপুরের কাছে পলাশাতেও তদন্তের ব্যাপার ছিল একটু। আমাদের পুরী আসার আর এক কারণ ছিল আমার কাকার এই ব্যাপারে কিছু তদন্ত এবং খাতাপত্তরের কাজ করা। সেই তদন্তকারী ইনস্পেক্টর মি. ভার্গবও তাঁর ছেলেবউ নিয়ে এখানে এসেছেন। এসেছিলেন জয়শংকরপ্রসাদ। তবে ভুবনেশ্বরে না থেকে তাঁদের কাজকর্ম এই পুরীতে বসেই করতে চেয়েছিলেন। আমাদের এই হলিডে হোমে থাকার মেয়াদ শেষ হলে আমরা অন্যত্র চলে যেতাম। সেই মর্মে ঘরও বুক করা আছে।

সব্যসাচী ওর পকেট থেকে চামড়ার খাপে মোড়া বস্তুটা বের করে বলল, বুঝেছি। এই তা হলে সেই ক্যাসেট, যার জন্য এত। ভগবান রক্ষে যে এতকাণ্ডতেও হাতছাড়া হয়নি জিনিসটা।

এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে এটা যেন কোনওরকমেই হাত ছাড়া না হয়।

সব্যসাচী বলল, তোমার মুখে সব শুনে আমার ভুল ধারণাটা ভাঙল। আমি কিন্তু তোমার কাকাকে অন্যরকম ভেবেছিলাম।

স্বাভাবিক। কিন্তু সব্যসাচী, এখন আমাদের এখান থেকে পালাবার কী হবে?

সব্যসাচী বলল, আক্রমণ। আক্রমণ ছাড়া পথ নেই।

কীভাবে আক্রমণ করবে? কাকে করবে?

যে লোকটা আমাদের খাবার দিতে আসবে তাকে। ওই লোককে কবজা করতে না পারলে এখান থেকে আমাদের পালানো অসম্ভব।

আমরা কি পারব ওকে কবজা করতে?

পারতেই হবে। একাজে আশাকরি সফল হব আমরা। কেন না লোকটা একাই আসে এবং দু'হাতে খাবার নিয়ে। ও যখন ঘরে ঢুকবে তখন ওর দু'হাতে থাকবে খাবার। আমরা শিকল খোলার শব্দ পেলেই দু'জনে দরজার দু'পাশে লুকিয়ে পড়ব। তারপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে।

লিপির মুখে হাসি ফুটল এবার।

সব্যসাচী বলল, আর দু'চার ঘণ্টা। বেলা গড়িয়ে আসছে। সন্ধেবেলা কিংবা সন্ধের পর রাতের খাবার নিয়ে আসবে ও। তখনই পালাব আমরা।

তুমি পথ চেন? কোথায় কোনদিকে যাব কিছু ঠিক করতে পারবে?

এই ঘরের বাইরে যদি একবার যেতে পারি তা হলে আর আমাদের ধরে কে? কিন্তু মুশকিল হল আমরা কোথায় আছি কীভাবে আছি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি যদি হেঁট হই তুমি আমার কাঁধে পা দিয়ে উঠে বাইরেটা একবার দেখে নিতে পারবে?

লিপি বলল, যদি পড়ে যাই? তার চেয়ে তুমি বরং আমার কাঁধে ওঠো।

সব্যসাচী বলল, আমার ভার তুমি রাখতেই পারবে না।

যদি তোমাকে সামান্য একটু চাগিয়ে ধরি?

তা হলে অবশ্য হতে পারে।

বলেই কী মনে হতে সব্যসাচী বলল, দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। এই টি-টেবিলটাকে কাজে লাগানো যাক। বলে টেবিলটাকে টেনে আনল সব্যসাচী। কিন্তু না। তাতে উঠেও কোনও লাভ হল না। ওপরের ফাঁকটা তখনও নাগালের বাইরে।

লিপি বলল, তুমি আমাকে একটু তুলে ধরো। তা হলেই বাইরেটা দেখতে পাব আমি।

সব্যসাচী তাই করল। লিপিকে একটু তুলে ধরতেই লোহার রডগুলো ধরে ওর কাঁধে ভর করে উঠে দাঁড়াল লিপি। তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে

বলল, কী নির্জন। চারদিকে বন-জঙ্গল। আর বালির পাহাড়।

সমুদ্র নেই?

না। সমুদ্র তো দেখতে পাচ্ছি না।

এবার তা হলে নেমে এসো।

লিপি নামলে সব্যসাচী বলল, তুমি কি পারবে একটু কষ্ট করে আমাকে একবার তুলে ধরতে?

এ আর এমন কী? খুব পারব।

সত্যিই পারল। ছিপছিপে চেহারা হলে কী হবে। শরীরে শক্তি রাখে বেশ। সব্যসাচীকে ধরে সামান্য একটু চাগিয়ে তুললেই বিপর্যয়। সবসুদ্ধু হুড়মুড়িয়ে পড়ল দু'জনে। পুরনো টেবিলের পায়াটা ভেঙে গিয়েই এই কেলেঙ্কারি।

আর ঠিক তখনই দরজা খোলার শব্দ।

সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই লিপি আর সব্যসাচী দু'জনেই ছুটে এল দরজার দু'পাশে। দিনের আলো এখনও আছে। তাই পালাতে অসুবিধে হবে না ওদের। কোনওরকমে একবার শুধু বেরোতে পারলে হয়। যদিও পড়ে গিয়ে দারুণ চোট পেয়েছে দু'জনেই। তবু ওরা তৈরি।

একজন নয়, দু'জন এল ওরা।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই ওদের সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল সব্যসাচী। তারপর লিপিকে নিয়ে বাইরে বেরিয়েই ঘরের দরজায় শিকল দিয়ে ছোট্ট একটা পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়ল পাশের বালিয়াড়িতে।

কাজুবাদামের বন যেখানে আরও গভীর, ওরা দু'জনে প্রাণপণে ছোটা শুরু করল সেইদিকে। ছুটতে ছুটতে সন্ধে হয়ে এল। কতদূরে একটা পাতার ঘর দেখা যাচ্ছে। ওরা সেই ঘরখানাই ওদের নিরাপদ আশ্রয় ভেবে এগিয়ে চলল।

ঘরের কাছে গিয়ে দেখল বালির ওপরে তালপাতার ছোট্ট একটা ঝোপড়ি এটা। কোনও ভিখিরির ডেরা ছিল বোধহয়।

এখন এ ঘর কাজে লাগে না, তাই পরিত্যক্ত। তবে আপাতত একটা রাত এখানে কাটানো যায়।

লিপি বলল, সব্যসাচী! আর আমি পারছি না। আমার মনে হয় আজকের রাতটা আমাদের এইখানেই কাটিয়ে দেওয়া উচিত।

সব্যসাচী বলল, এখানে এক রাতও নয়। সাময়িকভাবে কিছুটা সময় আমরা এখানে বিশ্রাম নিতে পারি। কেন না বনের মধ্যে ঘর। ওরা যদি রাতের অন্ধকারে আমাদের খুঁজতে বেরোয় তা হলে সহজেই ধরা পড়ে যাব আমরা। তাই বলি একটু বিশ্রাম নিয়ে অন্ধকারেই পালাই চলো।

লিপি বলল, যা তুমি বলবে। এখন তুমিই আমার বন্ধু, আমার অভিভাবক।

আমার সব। তোমার দেখা না পেলে এই বিপদে কী যে করতাম, কিছু ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু সব্যসাচী, ওই বেগুনপোড়া দিয়ে দুটো শুকনো ভাত খেয়ে পেট তো ভরেইনি, উপরন্তু তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু জলের কি ব্যবস্থা করা যায়?

এখন চোখের জলই আমাদের একমাত্র সম্বল। এই সৈকতমরুতে জল কোথায়? তবে দূরে কয়েকটা ছোট ছোট নারকোলগাছ দেখা যাচ্ছে। দেখি যদি কোনও একটা গাছে উঠে হাত বাড়িয়ে দু'-একটা ডাব পাড়তে পারি।

তাই যাও। আমি বরং এইখানে বসে হাঁফ ছাড়ি একটু। এই বলে ঘরের ভেতর থেকে একটা ধুলো পড়া ময়লা শতরঞ্জি নিয়ে এসে বালির ওপরে পেতে বসে রইল লিপি।

সব্যসাচী গেল ডাব পেড়ে আনতে।

লিপি বসে বসে বালিতে কত আঁকিবুকি কাটল। নাম লিখল দু'জনের। বালির ঘর করল। ও যখন এইসব নিয়ে ব্যস্ত তখন হঠাৎই বুকটা কেঁপে উঠল ওর। দেখল ভারী বুট পায়ে দীর্ঘদেহী একজন একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। লিপি তার মুখের দিকেও তাকাতে পারল না। মনে হল ওর মধ্যে ও যেন আর নেই।

এদিকে কিছু সময়ের মধ্যে ডাব নিয়ে যখন ফিরে এল সব্যসাচী তখন লিপিকে না দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেল। সূর্য তখন অস্তাচলে। প্রকৃতির যবনিকা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে। চারদিকে আবছায়া। কিন্তু যার জন্য আনা সে কই? ও দেখল বালির ওপর বেশ বড় বড় হরফে ওদের নাম লেখা। একটা বালির ঘর অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ও ছুটে সেই ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু না, লিপি সেখানেও নেই। তা হলে গেল কোথায় মেয়েটা? ও চিৎকার করে ডাকল লিপি। তুমি কোথায়?

কেউ সাড়া দিল না। ওর ডাকের কোনও প্রত্যুত্তরও ভেসে এল না কোথাও থেকে। ও বালির ওপরে লক্ষ করে দেখল মোটা সোলের জুতোর ছাপ। আর সেই সঙ্গে বালির ওপর দিয়ে কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো একটা দাগ। ডাবগুলো বালির ওপর ফেলে দিয়ে সেই পদচিহ্ন ধরেই এগিয়ে চলল সব্যসাচী। শেষপর্যন্ত লিপিটা আবার ধরা পড়ে গেল?

সব্যসাচীর বুকের ভেতরটা যেন ক্ষোভে ফেটে পড়তে লাগল। একসময় অন্ধকার এমন ঘনিয়ে এল যে পদচিহ্নও আর নজরে এল না। শুধু বন-জঙ্গল আর তারই বুক চিরে বয়ে আসা এক নদী ওর নজরে এল। এটা সেই নদী নয়তো? যে নদীর মোহানায় এই কাহিনির প্রথম পর্বর সূত্রপাত হয়েছিল? সব্যসাচী

নিঃশব্দে নদীর ধারে ধারে এগিয়ে চলল। একবার কোনওরকমে মোহানায় পৌঁছতে পারলে হলিডে হোমের পথ ঠিকই খুঁজে নেবে ও।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ আসার পর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ও। দেখল চার-পাঁচজন লোক চারদিকে টর্চের আলো ফেলে কী যেন খুঁজছে। নিশ্চয়ই সব্যসাচীর খোঁজ করছে ওরা। সব্যসাচী ধরা পড়বার ভয়ে একটা কাজুগাছের মোটা ডালে বসে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল। ভাগ্যে এই গাছগুলো একটু বেঁটেখাটো হয়।

সব্যসাচী অনেকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে বসে থেকে সেই লোকগুলোর গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। ও যখন বসে বসে নিজেকে আড়াল করে ওদের কীর্তিকলাপ দেখছে ঠিক তখনই দেখতে পেল একটা ছোট নৌকোয় চেপে মুখে কালো কাপড় বাঁধা দু'-চারজন সশস্ত্র লোক এইদিকে আসছে। ওদের প্রত্যেকেরই হাতে পাইপ গান, পিস্তল ইত্যাদি।

ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল ওর। তার চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার যেটা সেটা হল ওরা একে একে সবাই এসে হাজির হল ও যে গাছে ছিল সেই গাছেরই নীচে।

ওদের চাপা কথাবার্তা ও শুনতে পেল।

জল্লাদের মতো চেহারার একজন বলল, বীরাপ্পান আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেরে ভাল্লা। সমস্ত সোনা নিয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে। আমি নিজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই সোনার হদিস পাইনি।

তা হলে জানেমন, ওর জন্যে একটা বুলেট আমাদের খরচ করতেই হবে, এই তো?

ইয়া আল্লা। মার কা বদলা মার হ্যায়, খুন কা বদলা খুন। দেখলে না জয়শংকরপ্রসাদের হাল ক্যায়শা কর দিয়া হামনে? একেবারে গলা পর্যন্ত বালিতে পুঁতে এমনভাবে রেখে এসেছি যে সারারাত ধরে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে ওকে। শিবেটা বেশি দরদ দেখাচ্ছিল বলে একটা গুলিতে ওরও মুখ আমি বন্ধ করে এলাম।

কিন্তু এদিককার খবর?

বীরসিংও পুলিশের তাড়া খেয়ে ভাগছে। ওর লোকজনরা লুকোবার জন্য ইঁদুরের গর্ত খুঁজছে। আমরাও অবশ্য না-লড়ে বাঁচব না। হয়তো আজকের রাতই আমাদের শেষরাত। শয়তান বিজুটা নিজেই এবার ফিল্ডে নেমেছে। ইনস্পেক্টর ভার্গবকে নিয়ে শিকার করতে আসছে আমাদের। কিন্তু ও জানে না যে ওরাই এখন আমাদের শিকার।

সব্যসাচী সব শুনে শিরদাঁড়া টান করে স্থির হয়ে রইল। তা হলে একটু আগে

যাদের উপস্থিতি ওর ভয়ের কারণ হয়েছিল তারা তা হলে পুলিশের লোক? আর তাদের পুরোভাগে ছিলেন ইনস্পেক্টর ভার্গব ও বিজুদা! ভগবান রক্ষে যে ওর সঙ্গে ওদের দেখা হয়নি। তা যদি হত, তা হলে কিছুতেই এই গাছের আশ্রয়ে ওকে থাকতে হত না আর টেরও পেত না এই দুষ্কৃতীদের মতলব। কিন্তু এখন কীভাবে কী করা যায়?

হঠাৎই ওরা সতর্ক হল। দেখা গেল সেই টর্চের আলো ঘুরেফিরে আবার এইদিকেই আসছে।

ওরা বলল, রেডি হো যাও। আর এক কদম এগোলেই আলোর মুখ লক্ষ্য করে ফায়ার। তার আগে গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ো সবাই।

সব্যসাচী যে গাছের পাতার আড়ালে ছিল ঠিক তার নীচেই ছিল একজন। লোকটার হাতে ছিল পাইপগান। সেটা সে চাগিয়ে ধরে আলোর দিকে তাগ করতেই সব্যসাচী নিজের জীবনে পরোয়া না-করে আচমকা লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে।

লোকটা বিকট চিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই ওর পাইপগান চলে এল সব্যসাচীর হাতে। জীবনে কখনও এই যন্ত্র হাতে নেয়নি সে। তবুও সেটাকে বাগিয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, হ্যান্ডস আপ। বলেই একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

ওদিক থেকে তখন ছুটে এসেছে পুলিশের গুলি।

একজন আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

সব্যসাচী ওর আক্রমণে পড়ে যাওয়া লোকটার পেটে পাইপগানের নল ঠেকিয়ে বলল, নড়েছ কী মরেছ।

ওদিক থেকে বিজুদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এখনও যদি বাঁচতে চাস তো ধরা দে ভাল্লা। এখানে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে চারদিকে আমরা ছড়িয়ে আছি। আর তোদের পালাবার কোনও পথই খোলা নেই।

গাছের আড়াল থেকে কে যেন বলল, আমরা তোদের মেরে নিজেরা মরতে এসেছি বিজু। কাজেই পালানোর প্রশ্নই ওঠে না।

বিজুদা সত্যিই সাংঘাতিক। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চতুর বেড়ালের মতো এসে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন একজনের ঘাড়ে। বাকি ছিল একজন। সে তখন উপায়ন্তর না দেখে বিজুদাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল ঢিস্যুম।

চাপা একটা আর্তনাদ ভেসে এল বিজুদার দিক থেকে। তবে সে আর্তনাদ বিজুদার নয়। বিজুদা শুধু হেসে বললেন, তোদের দলের লোককেই শেষ পর্যন্ত খুন করলি? আমি তো জানি, এই ভুলটাই করে বসবি তোরা, তাই ওকে ধরেই আমার বুকের কাছে রেখেছিলাম।

অন্যান্য পুলিশ গিয়ে তখন সেই লোকটিকে ধরে ফেলল।

সব্যসাচী তখন গাছের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে বলল, বিজুদা! আমি একটাকে ধরে আছি। মরা ইঁদুরের মতো পড়ে আছে ব্যাটা। ধরো একে।

সব্যসাচীর গলা শুনেই ছুটে এলেন বিজুদা, সব্যসাচী তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে? লিপি কোথায়?

আমি লিপিকে নিয়ে পালিয়ে আসছিলাম। লিপি আবার ওদের খপ্পরে পড়ে যায়।

পড়লেও পালাতে পারবে না। এখন চলো, আগে তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। আর একটা কথা, সেই জিনিসটাকে তুমি কি রক্ষা করতে পেরেছ?

নিশ্চয়ই। সেটা এখনও আমার কাছে।

বিজুদা সানন্দে সব্যসাচীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দারুণ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, মি. ভার্গব! এই সেই সব্যসাচী। ওর কাছে এখনও আছে সেই অমূল্য ধন।

সব্যসাচী ক্যাসেটটা বিজুদাকে দিয়ে দিল।

পুলিশ তখন হত-আহত চারজন দুষ্কৃতীকে বেঁধে ফেলেছে।

এমন সময় হঠাৎ একজন কনস্টেবল ছুটতে ছুটতে এসে বলল, স্যার, ওই দেখুন কারা আসছে।

সবাই দেখল মশালধারী একজন মাল্লার সঙ্গে বীরদর্পে এগিয়ে আসছেন প্রখ্যাত আইনজীবী জয়শংকরপ্রসাদ ও সেই দস্যিদামাল ভীষণ জেদি ও একরোখা মেয়েটা, যার নাম জয়া। জয়া এসেই অন্তরের আবেগে সব্যসাচীর হাত দুটো মুঠো করে ধরল। তারপর সে কী কান্না তার।

অনেক পরে কান্না থামলে বালিয়াড়ি ও বনাঞ্চল পেরিয়ে ওরা একসময় পুলিশের গাড়িতে চেপে যখন থানায় এল তখন আর এক চমক। দেখল লিঙ্গরাজ মিশ্রর একজন পোষাগুন্ডা লিপিকে উদ্ধার করে জমা দিয়েছে পুলিশের হাতে।

সব্যসাচীর বাবা-মা, জয়ার মামা সবাই ছিলেন থানায়।

স্নেহাংশুবাবু সব্যসাচীকে বুকে জড়িয়ে বললেন, কাল দুপুরে পুলিশের গাড়িতে করে একটি কিশোরের লাশ সনাক্ত করতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যে সেটা তুই নয়। ওঃ কী ভয় যে পেয়েছিলাম।

বিজুদা বললন, আপনার এই ছেলেটি কিন্তু বড় হলে একজন ঝানু গোয়েন্দা হবে।

সকলের শুভেচ্ছায় তাই যেন হয়।

লিপি বলল, জানো তো কাকা, আমরা যেখানে বন্দি ছিলাম সব্যসাচী

না-থাকলে সেখান থেকে কখনওই বেরোতে পারতাম না।

জয়শংকরপ্রসাদ বললেন, আর এই যে মেয়েটি, জয়া! এ না-থাকলে আমিও প্রাণে বাঁচতাম না।

বিজুদা বললেন, এখন তা হলে আর কোনও ভয় বা আতঙ্ক নেই। অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। দুষ্কৃতীরা যে যেখানেই থাকুক ধরা পড়বে।

পুলিশ অফিসার বললেন, এখন একটু চা-পর্ব সেরে বাসায় ফিরতে চান নিশ্চয়ই?

বিজুদা বললেন, কখনওই না। চা-পর্ব এখন থাক। আপনারা আমাদের স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দিন। আজ আমরা মনের আনন্দে এবং নির্ভয়ে নতুন দিনের সূর্য ওঠা দেখব।

বিজুদার প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে সবাই পুলিশের গাড়িতে স্বর্গদ্বারে এলেন। ভোর হতে তখনও একটু দেরি ছিল। তবু সমুদ্রসৈকতে যাত্রীর অভাব ছিল না।

লালবাজারে রাহাজানি

এক

সেদিন সকালে খবরের কাগজের পাতায় একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ দেখে চমকে উঠল হিরণ। পর পর ক'দিন ধরেই এইরকম ঘটনার কথা ছাপা হচ্ছে কাগজে। কিন্তু আজকের খবরটা মারাত্মক। আজকের কাগজে যে খবরটি ছাপা হয়েছে তা শুধু চমকপ্রদই নয়। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

হিরণ যখন কাগজের পাতার ওপর ঝুঁকে খবরটা পড়ছে, তেমন সময় মা এসে ঘরে ঢুকলেন, কীরে! মুখহাত ধুয়েছিস? আমি এদিকে কখন থেকে চা নিয়ে বসে আছি। জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে।

হিরণ বলল, কাল রাতে বাপি কখন বাড়ি ফিরেছেন মা?

তুই ঘুমিয়ে পড়বার পর।

হিরণ কাগজটা মাকে দেখিয়ে বলল, খবরটা পড়ে দেখো।

মা একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, কী দুঃসাহস!

হিরণ বাথরুমে গিয়ে ভাল করে দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। তারপর চা-টেবিলে বসে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট আর চা খেতে খেতে বার বার পড়ে যেতে লাগল খবরটা।

এমন সময় বাপি এসে পিছনে দাঁড়ালেন। বললেন, কীরে! আজ এত সকালে কাগজ দিয়ে গেল যে? এই তো সবে সাতটা। ও তো ন'টার আগে আসে না।

হিরণ বলল, এই ক'দিন কেন জানি না, একটু সকালসকালই কাগজ দিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। কিন্তু বাপি, কী হচ্ছে এসব তোমাদের ওখানে?

হিরণের বাবা বাসব মজুমদার একজন পদস্থ গোয়েন্দা অফিসার।

বললেন, কাগজে বেরিয়েছে বুঝি?

হিরণ বলল, এই দেখো?

বাসববাবু কাগজের খবরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। খবরের শিরোনামে ছিল, লালবাজারে চুরি। গোয়েন্দারা অতিষ্ঠ। সংবাদটা ছিল এইরকম, লালবাজারের ভেতর থেকে চুরির ঠেলায় খোদ গোয়েন্দা বিভাগই অতিষ্ঠ। চোরের হাত থেকে বাঁচতে এখন মোটর বাইক, স্কুটার, এমনকী অন্যান্য মূল্যবান জিনিসও দোতলায় তুলে রাখতে হচ্ছে। গোয়েন্দা বিভাগের দোতলায় সিঁড়ির

মুখ এবং একতলার সিঁড়ির পাশের খোলা জায়গাটা নানারকমের মোটর বাইকে বোঝাই। গোয়েন্দা বিভাগের এক পদস্থ অফিসার বলেন, কোনও জিনিসই আর নীচে রাখা যাচ্ছে না। চোরেরা হেডলাইট, ব্যাটারি—সবই খুলে নিচ্ছে। খুলে নেওয়া যায় এমন সব কিছুই চুরি হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে তাঁর ঘরের সামনের অত্যন্ত সুরক্ষিত বারান্দা থেকে একটি আটক করা দামি মোটর বাইকের হেডলাইট ও ব্যাটারি চুরি হয়ে যায়। সবটা পড়ে একটু গম্ভীর হয়ে যান বাসববাবু। তারপর একসময় বললেন, হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন ধরেই এইসব উপদ্রবগুলো হচ্ছে।

হিরণ বলল, এরপর হয়তো কাগজওয়ালারা বিদ্রূপ করে সম্পাদকীয়ও লিখবে।

লিখবেই তো। আর সে লেখার হেডিং হবে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

তা যদি হয়, তা হলে এই যে কাগজে সব ফাঁস হয়ে গেল, এতে সাধারণ মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়াটা হবে? সবাই তো বলবে, গোয়েন্দারা যদি নিজেদের ঘর নিজেরা সামলাতে না পারেন, তা হলে সাধারণ মানুষের বিপদে কী করে তাঁরা পাশে এসে দাঁড়াবেন?

মা বললেন, তাই বলে গোয়েন্দারা তো অন্তর্যামী হবেন না।

বাসববাবু বললেন, ওকথা বললে তো জনগণ শুনবে না। কেন না এই কাজের জন্যই যে আমরা মোটা টাকা মাইনে পাচ্ছি। গাড়ি চাপছি। নানারকম সুযোগ সুবিধে পাচ্ছি। এখানে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে না?

হিরণ বলল, আসলে আমার মনে হয় বাপি, তোমরা এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোর দিকে গোড়ায় খুব একটা নজর দাওনি। তাই এমন হচ্ছে।

ঠিক। এবার থেকে মনে হচ্ছে কোনও কিছুই আর কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কেন না এত বেশি ক্রিমিন্যালের আবির্ভাব হয়েছে এই শহরে যে, সবসময় চারদিক থেকে যেন ব্যতিব্যস্ত করে মারছে। আর তারই ফলে অবস্থা এখন এমনই যে কাছা দিতে গিয়ে কোঁচা খুলে যাচ্ছে আমাদের। এককালে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি এইসবগুলো হত বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা গোয়েন্দারা যেতাম, তদন্ত করতাম। উপযুক্ত প্রমাণ বা সূত্রসন্ধান পেলে অপরাধীকে ধরতাম। কোনও কিছু না পেলে ব্যর্থ হতাম। কিন্তু এখনকার অপরাধীরা অপরাধ করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং প্রশাসনকে বিরক্ত এবং বিভ্রান্ত করে মজা পাচ্ছে বেশি। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চেয়েও ওরা যে অনেক বেশি শক্তিশালী আকারে ইঙ্গিতে সেই কথাটাই যেন বুঝিয়ে দিতে চাইছে।

হিরণ বলল, এটা তা হলে চুরির জন্যে চুরি নয় বলো, রসিকতার জন্যে চুরি!

অবশ্যই! না হলে পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে চুরি হয়? এই তো সেদিনের

খবর। দেখেছিস নিশ্চয়ই? ওরা জানে এইসব করলেই কাগজওয়ালারা রসিয়ে রসিয়ে লিখবে আর জনসাধারণ চায়ের পেয়ালায় তুফান উড়িয়ে হাসাহাসি করবে। ধিক্কার দেবে পুলিশকে। এগুলো স্রেফ বদমায়েশি।

হিরণ বলল, আমার মনে হয় বাপি তোমার ধারণাটা যেমন ঠিক, তেমনি এও ঠিক, ওরা আসলে কোনও বড় দলের খুচরো লোক। যারা কি না চাইছে পুলিশ যদি এইসব ছিঁচকে চোরেদের ধরবার জন্যে সব সময় নিজেদের কেন্দ্রে ব্যস্ত থাকে তা হলে নিরাপদে, নিরুপদ্রবে ওরা অবাধ লুণ্ঠন, ব্যাঙ্কডাকাতি ইত্যাদি করতে পারবে।

মা বললেন, তবে যাই বলো বাপু, আমার তো মনে হয় তোমাদেরই ভেতর থেকে কোনও নিচুস্তরের দুষ্ট প্রকৃতির কেউ এইসব করছে। না হলে চোরেদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তারা যাবে লালবাজারে চুরি করতে। ধরা পড়লে মার খেয়ে মরবে তা কি তারা জানে না?

বাসববাবু বললেন, তোমার সন্দেহটাও অমূলক নয়। কেন না ভূত তো সর্ষের ভেতরেও থাকে।

এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই বাসববাবু এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন, হ্যালো! কে বলছেন?

মি. মজুমদার নাকি?

হ্যাঁ, বলছি।

আজকের কাগজে খবরটা দেখেছেন?

এইমাত্র দেখলাম।

লালবাজার অঞ্চলে রাহাজানির ঘটনাটা মনে আছে আপনার?

আপনি কে বলছেন?

আপনার একজন পুরাতন বন্ধু, কার্লস জ্যাকল।

রাগে লাল হয়ে উঠল বাসববাবুর মুখ। বললেন, তুমি জেল থেকে ছাড়া পেলে কবে?

আরে! আমি তো উমর কয়েদের আসামি। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আমার। জেল খাটতে ভাল লাগল না বলে জেলভেঙে পালিয়ে এলাম। তাই ভাবলাম আমার এই শুভমুক্তির খবরটা আপনাকেই প্রথম জানানো উচিত। এবার তো মাঝেমধ্যেই দেখাসাক্ষাত হবে। তাই হঠাৎ দেখে ভূত ভেবে যাতে চমকে না ওঠেন সেইজন্যেই ফোন করে জানিয়ে দিলাম। একটা চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎই খবরটা চোখে পড়ল। লালবাজারে চুরি! হাঃ হাঃ। আমি লালবাজার অঞ্চলে রাহাজানি করে ধরা পড়েছিলাম খড়্গপুরের গোলবাজারে। আর খোদ লালবাজারের ভেতরে আপনারই দপ্তরের মধ্যে

চোরেরা দিনের পর দিন দিব্যি চুরি করে বহাল তবিয়েতে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এ কেমন রসিকতা মি. মজুমদার?

বাসববাবু কঠিন গলায় বললেন, তোমার আর কিছু বলার আছে?

বলবার তো অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে আমার পুনরাবির্ভাবে আপনি মোটেই সন্তুষ্ট নন। ঠিক আছে। পরে বরং একদিন একটু ভাল করে আলাপ আলোচনাটা করা যাবে। কী বলুন?

বাসববাবু সশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

হিরণ বলল, কার ফোন বাপি?

বাসববাবু নিরুত্তর।

লোকটা কি মোস্ট ডেঞ্জারাস? না হলে তুমি অমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

মা বললেন, কে ও? কোনও খুনের আসামি বুঝি?

বাসববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, লালবাজারে রাহাজানির সেই নায়ককে তোমার মনে আছে?

সেই সাংঘাতিক লোকটা? কী যেন নাম, কার্লস জ্যাকল না কী?

হ্যাঁ। শেয়ালের মতো মুখ। হায়নার মতো চোখ। আর চিতার মতো হিংস্র।

সেই লোকটাকে তুমিই তো কোনও একটি কুখ্যাত অঞ্চল থেকে ধরে এনে জেলে ঢুকিয়েছিলে। লোকটা এত তাড়াতাড়ি জেল থেকে ছাড়া পেল কী করে?

না। ছাড়া সে পায়নি। জেলভেঙে পালিয়ে এসেছে।

হিরণ বলল, কার্লস জ্যাকল! এ নাম আমি তোমার মুখে অনেকবার শুনেছি। শুধু মজা দেখবার জন্যেই মেয়েদের মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুড়ে মজা দেখত লোকটা। গ্রামগঞ্জ থেকে ছেলেমেয়ে চুরি করে এনে কলকাতার ফুটপাথে ছেড়ে দিত। আর সবচেয়ে বড় কথা—।

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

বাসববাবু ফোন ধরেই জিজ্ঞেস করলেন, হ্যালো! কে বলছেন?

স্যার আমি লালবাজার থেকে ফোন করছি নীহার তালুকদার।

কী ব্যাপার বলো।

এই একটু আগে একটা প্যাকেট পেলাম। তাইতে মোড়কের ভেতরে একটি কাটা মুণ্ডু পাওয়া গেছে। তার কপালে লেখা আছে বাসব মজুমদার।

তুমি রসিকতা করছ না তো?

না স্যার। তবে প্রেরকের নাম দেখে বিস্মিত হয়েছি।

কী নাম তার।

কার্লস জ্যাকল।

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমরা গাড়ি পাঠাও।

মা বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

লালবাজার। আবার সেই শয়তানের খেলা শুরু হয়ে গেছে। কত নিরীহ লোকের মাথা যে যাবে এবার তা কে জানে? আজই একজনের কাটা মুণ্ডু উপহার পাঠিয়েছে লালবাজারে।

মা শিউরে উঠলেন, কার?

জানি না। তবে আমার নাম লেখা আছে তাতে।

হিরণ সবিস্ময়ে বলল, তোমার নাম লেখা আছে কেন বাপি?

হয়তো বোঝাতে চাইছে কার্লস জ্যাকেলের পরের শিকার আমি।

মা বললেন, তুমি তা হলে যাবে না, কিছুতেই যাবে না ওখানে।

বাসববাবু বললেন, যেতে আমাকে হবেই। যাওয়াটাই আমার কাজ। চাকরি তো ছাড়তে পারব না। তা ছাড়া গায়ে নোংরা মাখলে যেমন যমে ছাড়ে না, তেমনি চাকরি ছেড়ে বনে গেলেও ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে না। বরং এইখানেই আমার চ্যালেঞ্জ।

সারাজীবন ধরে শুধু চ্যালেঞ্জই নাও তোমরা, আর আমরা শাঁখাসিঁদুর খোয়াবার ভয়ে ঘরের কোণে বসে ভগবানকে ডাকি। এই ধরনের ক্রিমিন্যালদের ধরার সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলতে পার না?

বাসববাবু তৈরি হতে হতেই বললেন, গোয়েন্দা বা পুলিশের কাজ তো প্রাণ নেওয়া নয়। অপরাধীকে হাতেনাতে ধরে শাস্তি দেওয়া। এতেই তাদের আনন্দ।

তার চেয়েও বেশি আনন্দ বোধহয় আমাদের মতো নিরীহ মানুষগুলোর জীবন উৎকণ্ঠায় ভরিয়ে দেওয়ায়। এই যে জেল ভেঙে পালিয়ে এল লোকটা, অকারণে প্যানিক সৃষ্টির জন্যে একজন নিরীহ মানুষের মাথা নিল, এর জন্য দায়ী কে? তোমাদের ভুল সিদ্ধান্ত আর আইনের প্রতি আনুগত্য নয় কী? কত কষ্ট করে দিনের পর দিন নিজের জীবন বিপন্ন করে কী ভাবে লোকটাকে ধরেছিলে সে কথা কি ভুলে গেছ? কার্লস জ্যাকল হল ফাঁকা মাঠের বেড়াল। একবার যখন ও বেড়া টপকে পালিয়েছে আর কখনও ওকে ধরতে পার? এখন আমার একটাই ভয়, ও তোমার না কিছু করে বসে।

বাসববাবু বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন, আমার ব্যাপারে এখুনি খুব বেশি চিন্তাভাবনা না করলেও চলবে। শুধু ছেলেটাকে সাবধানে রেখো। একা যেন অকারণে বেশি ঘোরাফেরা না করে। আমার ভয় ওকে নিয়ে। তোমারও ক্ষতি করতে পারে তবে থাবা যখন বাড়িয়েছে তখন প্রথম কোপটা ওরা ওকেই দেবে।

মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

একটু পরেই গাড়ি এল। বাসববাবু স্ত্রী-পুত্রকে সাবধানে থাকতে বলে দারুণ

উত্তেজনা নিয়ে চলে গেলেন। একজন লোক মোড়ের মাথার চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। পুলিশের গাড়ি চলে যেতেই লোকটি দোকান থেকে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর সিগারেটে দু'-একটা টান দিয়ে সেটা আধখাওয়া করে ফেলে দিল রাস্তায়। জুতো দিয়ে চেপে আগুনটা নিভিয়ে দিল। দিয়ে বাসববাবুর বাড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পথের বাঁকে হারিয়ে গেল সে।

দুই

কর্মব্যস্ত, কলকাতা মহানগরীর বুকে ডালহৌসি অঞ্চলে লালবাজার শুধু কলকাতার নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানকার পুলিশ ও প্রশাসনের সুমহান ঐতিহ্য আজও অটুট আছে। কিন্তু কালে কালে নদী যেমন তার গতিপথের পরিবর্তন করে, তেমনি অপরাধীরাও তাদের অপরাধের ধারাকে ভিন্নমুখী করে তোলে। ফলে দুই আর দুইয়ে চার না হয়ে, বারো মাইনাস আট হয়ে যায়।

বাসব মজুমদার একজন পদস্থ গোয়েন্দা অফিসার। তাঁর নির্দিষ্ট সময়সূচির মধ্যে বা বাইরেও জীবনের নানান ঝুঁকি নিয়ে জলের তলায় ডুব দিয়েও অপরাধীদের খুঁজে বার করেছেন। কলকাতার পুলিশ প্রশাসন তাই বাসববাবুর অবদানে মুগ্ধ। বাসববাবু তাঁর চাকরি জীবনের দিনগুলিতে কখনও কোনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি। এমনকী নিজেও কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি। শুধু বাসববাবু কেন, তাঁর সহকর্মী নীহার তালুকদার, রঞ্জন বসু এঁরাও অতি সজ্জন লোক। নীহার এবং রঞ্জনের তুলনা হয় না। একই দিনে পরপর কয়েকটি খুন ও রাহাজানিকে কেন্দ্র করে যখন তিন বছর আগে কার্লস জ্যাকলের পিছু ধাওয়া করেছিলেন, তখন এই দুই অসমসাহসী যুবকের অবদানের কথা তিনি কখনও ভুলবেন না। এরা পাশে না থাকলে হয়তো বেঘোরে মরতে হত সেদিন।

খিদিরপুর এবং ওয়াটগঞ্জ অঞ্চলের সন্ত্রাস ছিল এই কার্লস জ্যাকল। লোকটা আগে ছিল রিপন অঞ্চলের গুন্ডা। ছিপছিপে দোহারা চেহারা। মা বাঙালি। বাবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ওকে চার বছরের রেখে ওর বাবা এক ভয়ংকর পথদুর্ঘটনায় মারা যান। তারপর মা কোনওরকমে ভিক্ষেদুঃখু করে মানুষ করেন ওকে। মানুষ অবশ্য হয় না ছেলে। আলিজান আর দুলিয়াজান নামে দুই কুখ্যাত সঙ্গীর সংস্পর্শে এসে চুরি, ছিনতাই, স্মাগলিং প্রভৃতিতে হাত পাকায়। বাপও নেহাত

ভাল মানুষ ছিলেন না। তাই শরীরের বদরক্ত অ্যালকোহলের মতো মিশে থাকে। সেই রক্তে শুধু একটি দেশলাই কাঠি ধরিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। আলিজান আর দুলিয়াজান সেই কাজটাই করে দিল ওর। রক্তের আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

মধ্য কলকাতার একটি সিমেনা হলে টিকিট ব্ল্যাকের সময় সাধারণ একটি খুন নিয়ে ওর অপরাধজীবনের শুরু। এবং ছেলের জন্যে ভাবনায় চিন্তায় অর্ধাহারে অনাহারে ওর দুঃখিনী মায়ের মৃত্যু ওকে অপরাধজগতের সিঁড়ি বেয়ে অনেক নীচে নামাতে থাকে। কলকাতা-পুলিশের ব্রহ্মতালুতে বিষফোঁড়ার মতো টন টন করতে থাকে কার্লস জ্যাকল। ওর ডাক নাম ছিল ডেভিড। কিন্তু কার্লস জ্যাকল নামটা যে কে চাপাল ওর ঘাড়ে তা কে জানে? পুলিশের খাতায় এই নামেই ও এখন প্রসিদ্ধ। বাংলার আতঙ্ক, কলকাতার আতঙ্ক, লালবাজারে রাহাজানির অন্যতম নায়ক কার্লস জ্যাকল আবার ফিরে এসেছে অপরাধজগতে। সে দেখিয়ে দিয়েছে একমাত্র মৃত্যুদণ্ড ছাড়া, আর কোনও দণ্ডেই তাকে দমিয়ে রাখা যাবে না। লোহার খাঁচায় বনের বাঘকে আটকে রাখা যায় কিন্তু কার্লস জ্যাকলকে নয়। কার্লস জ্যাকল জাদু জানে। সে পালাব মনে করলে লোহার খাঁচাও তার কাছে তারের খাঁচা হয়ে যায়।

লালবাজারের বিশাল চত্বরে গাড়ি থেকে নেমে গম্ভীর মুখে দোতলায় নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন বাসববাবু। কর্মব্যস্ত এই মহানগরী এত খুন, এত দাঙ্গা, এত কিছু সত্ত্বেও কেমন স্বাভাবিক। মানুষের চলাফেরায় এতটুকু অসাচ্ছন্দ্য নেই। অথচ বাসববাবুর মনের মধ্যে এখন দুশ্চিন্তার ঊর্মিমালা ভয়ানক তোলপাড় করছে।

কার্লস জ্যাকলের নোটিশ পেয়েছেন বাসববাবু। ওই কাটা মুণ্ডটাই সেই নোটিশ বহন করে এনেছে। তিনি দ্রুত ঘরে যেতেই বেয়ারারা সেলাম ঠুকল তাঁকে। তারপর যে যার চেয়ারে গিয়ে বসল। প্রতিটি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এখন চেয়ারের মর্যাদা পেয়েছেন। এটি খুবই সম্মানজনক ব্যবস্থা। তবে বাপের বয়সি কর্মচারীদের তরুণ পদস্থ অফিসাররা অনেকেই নাম ধরে ডাকেন, এটা অবশ্য বাসববাবুর পছন্দ নয়। বয়স্ক পিওন বেয়ারাকেও উনি আপনি আজ্ঞে করেন। বাসববাবু ঘরে গিয়ে সিটে বসতেই বৃদ্ধ আর্দালি গোকুল দাস কাছে এসে দাঁড়াল।

বাসববাবু বললেন, আমাকে এক গেলাস জল দিয়ে একবার নীহারবাবুকে ডাকুন তো।

গোকুল দাসকে অবশ্য ডাকতে হল না। নীহারবাবু নিজেই এসে হাজির হলেন। বয়সে তরুণ নীহারবাবু বললেন, কী ভয়ানক ব্যাপার! তাজা একটি মানুষের মুণ্ডু কখন যে রেখে গেছে তা কে জানে?

বাসববাবু বললেন, বাইরের লোক এখানে আসে কী করে?

সেটাই তো রহস্য।

বিশেষ করে এত সব ঘটনার পরেই বহিরাগতদের ওপর নজর রাখা হয় না কেন, আমি তো কিছুই বুঝছি না। আজকের কাগজটা দেখেছ? যে খবরটা ছেপে বেরিয়েছে তা কতখানি লজ্জার তা জানো? এইরকম হতে থাকলে লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না যে। গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ওপর মানুষের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে।

নীহারবাবু বললেন, কাটা মুণ্ডুটা আপনি একবার দেখবেন স্যার?

অবশ্যই। তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন।

কীরকম!

ওই প্যাকেটটা প্রথমে কার নজরে পড়ে। পিয়ন বেয়ারারা সেই সময় কী করছিল? ওটা হাতে করে খুলেছিল কে? খোলবার আগে অন্য কোনওরকম সন্দেহ কী হয়নি? মানে ওর ভেতরে বিস্ফোরক কিছুও তো থাকতে পারত। এই ঘটনার কথা কে কে জানে? সি পি-র কানে উঠেছে কি কথাটা? খবরের কাগজের সাংবাদিকদের কাছে খবর পৌঁছে যায়নি তো?

নীহারবাবু বললেন, ব্যাপারটা কিন্তু আর চাপা নেই স্যার। আমার আর্দালি রজনীই প্রথম দেখতে পায়। তখন অন্যান্য পিয়ন-বেয়ারারাও হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ওতে হাত দেওয়ার আগে আমরা মেটাল ডিটেক্টর লাগিয়ে পরীক্ষা করে নিই। যখন বিপদ সংকেত কিছু পাই না তখনই হাত দিই ওতে। ভুল অবশ্য একটু হয়েছিল। অনেকের সামনেই খুলে দেখা হয়েছিল ওটা। তবে সবাই চুপচাপ আছে। কেন না, সি পি-র কানে গেলে উনি নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন। সকলকেই তলব করবেন। কর্তব্যে অবহেলার জন্য বকুনিও খাবেন কেউ কেউ। তবে খবরের কাগজের লোকেদের জানানো হয়নি কথাটা।

এমন সময় বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার দু'জন সাংবাদিক এসে হাজির হলেন সেখানে, কই স্যার! কোথায় সেই কাটা মুণ্ডু। দেখি, দু'-একটা ছবিটবি তুলি।

বাসববাবু এবং নীহারবাবু দু'জনেই অবাক হবার ভান করলেন।

কাটা মুণ্ডু! কই কোথায়?

একজন সাংবাদিক বললেন, ব্যাপারটা চেপে যাবেন না স্যার! সব কাজ ফেলে ছুটে এলাম। রগরগে খবর হবে কালকের কাগজে। চায়ের টেবিলে বসে লোকে চেটে চেটে খাবে। জিভ দিয়ে নয় অবশ্য, চোখ দিয়ে।

বাসববাবু বললেন, সেই সঙ্গে আবার নতুন করে প্রমাণ হবে প্রশাসনের ব্যর্থতা, আর আমাদের অকর্মণ্যতা, এই তো? আচ্ছা মশাই, কারও বাড়ির ছেলেমেয়ে যদি সুইসাইড করে তা হলে তার বাপ-মা কী করতে পারে বলুন?

এত মানুষ, এত ভিড় এর ভেতরে হঠাৎ দু'-একটা খুন হলে আমরাই বা কী করতে পারি? আমাদের কাজ হল অপরাধীকে ধরা এবং তাদের শাস্তি দেওয়া। কিন্তু অপরাধ কেউ করবে না এমন গ্যারান্টি তো দিতে পারি না। আজ শুধু কলকাতায় নয়, পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তাকিয়ে দেখুন ভারতের বাইরের দেশগুলোর দিকে, দেখবেন সর্বত্র অপরাধ করবার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। আসলে ওই একটা কথা আছে না, মা যা হতে চাইছেন। তেমনি প্রকৃতিও যা হতে চাইছেন তাকে না হওয়ার হাত থেকে আমরা আটকাব কী করে? সারা বিশ্বের মানুষের কাছে আজ অনেক সমস্যা। সারা বিশ্বের মানুষ আজ উচ্ছৃঙ্খল। এর জন্যে কে বা কারা দায়ী তা জানি না। তবে আমি বলব এর জন্য মানুষই দায়ী। আমরা সৎ থাকব কি না বা আমরা আইনশৃঙ্খলাগুলো মেনে চলব কি না সে তো আমরাই ঠিক করব। যাক চা খাবেন?

কিন্তু ওই কাটা মুণ্ডু?

ওটা নেহাতই উড়ো খবর।

সাংবাদিকরা হেসে বললেন, কার্লস জ্যাকলকে চেনেন?

বাসববাবু ম্লান হয়ে গেলেন। বললেন, না চেনবার কী আছে? আমি নিজে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে জেলের ঘানি টানতে পাঠিয়েছি তাকে।

তিনি এখন কোন জেলে আছেন জানতে পারি কি?

বাসববাবু বললেন, তা ঠিক বলতে পারব না।

আজ কয়েকদিন হল জেলপলাতক হয়ে এই শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। উনিই আমাদের ফোন করে জানিয়েছেন তাঁর দেওয়া উপহার সেই নরমুণ্ডুর কথা। একবার দেখান না স্যার একটা ফটো তুলি।

বাসববাবু বললেন, কার্লস জ্যাকল জেল ভেঙে পালিয়েছে আপনারা ঠিক জানেন?

আপনিও জানেন।

বাসববাবু বললেন, শুনুন ওই রকম একটা ফোন আমরাও পেয়েছি। জেল কর্তৃপক্ষও এতক্ষণে এই সংবাদ পুলিশকে নিশ্চয়ই জানিয়েছে বা জানাবে। কিন্তু যতক্ষণ না সরকারিভাবে আমরা কোনও রিপোর্ট পাচ্ছি, ততক্ষণ সাংবাদিকদের কাছে কী করে মুখ খুলি বলুন।

মুখ আপনাদের খুলতে হবে না। কাল সকালে কাগজ খুললে সবাই তা জেনে যাবে।

বাসববাবু সাংবাদিকদের মুখের দিকে তাকালেন।

সাংবাদিকরা বললেন, পুলিশ ছাড়া আমরা অনেক সূত্র থেকেই খবর পাই। জেল কর্তৃপক্ষই আমাদের জানিয়েছেন। আর জানিয়েছে স্বয়ং কার্লস জ্যাকল।

না হলে ওই কাটা মুণ্ডের কথা আমরা কি জানতে পারতাম?

বাসুববাবু বললেন, সব কিছু জেনেই যখন এসেছেন তখন আর কিছু লুকোব না। তবে মশাই, যা লিখবেন একটু বুঝেশুনে। অযথা মানুষকে উত্তেজিত করবেন না। আসলে সত্যি কথা বলতে কী, আমি নিজেও দেখিনি এখনও। ফোনে খবর পেয়ে এই সবে আসছি।

একটু পরেই রঞ্জনবাবু এবং আরও কয়েকজন অফিসার ঘরে এসে ঢুকলেন।

যাই হোক, ব্যাপারটা আর চাপা রইল না। কাটা মুণ্ডটা যেখানে রাখা ছিল সেইখানে গিয়ে সকলেই দেখলেন, মৃতের কপালে একটি পিনগোঁথা কাগজে নাম লেখা আছে বাসব মজুমদার। কী ভয়ংকর সেই দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না। বাসববাবু এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন।

একজন সাংবাদিক বললেন, লোকটা কী সাংঘাতিক।

আর একজন সমবেদনার সুরে বললেন, আপনার ভয় করছে না স্যার?

করছে না তা কী করে বলি? কেউ কাউকে মারব মনে করলে তাকে কি রোখা যায়? কাজেই সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয়?

এখন তা হলে কী করবেন?

চিড়িয়াখানা থেকে হঠাৎ করে পালিয়ে যাওয়া কোনও জন্তুকে যেমন আবার ধরে এনে খাঁচায় পোরে, ঠিক সেই ভাবেই কার্লস জ্যাকলকেও খুঁজে বার করে আবার পুরতে হবে হাজতে।

কাজটা কি খুব একটা সহজ হবে?

না। এ হচ্ছে সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতন। উত্তরটা জানা আছে। শুধু প্রসেসটা ঠিকমতো করে নিয়ে হবে। অপরাধী আমাদের পরিচিত। অপরাধও প্রমাণিত। শুধু খোঁজার ব্যাপারটা নিখুঁতভাবে চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। আর বিশেষ করে আত্মরক্ষার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে আমাকে।

সাংবাদিকরা ফটো তুলে বিদায় নিলেন।

অফিসাররা বসলেন গোপন বৈঠকে। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁরা জানতে পারলেন একজন অচেনা পুলিশ অফিসার আজ সকালে এসেছিলেন এখানে। সঙ্গে তাঁর একজন বেয়ারাও ছিল। এছাড়া আর কোনও আগন্তুকের পাদস্পর্শই হয়নি। এই অফিসারকে আগে কখনও দেখেনি কেউ। তবে তাঁর সাজপোশাক দেখে সকলে সমীহ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তিনি যদি সত্যিকারের পুলিশ অফিসার না হন তা হলে—

যারা দেখেছিল তারা বলল, উচ্চতায় প্রায় ছ'ফুটের ওপর। গায়ের রং কালো। চাপদাড়ি। মাথায় টুপি। তবে মুখের দিকটা কালো হলেও হাতের আঙুলগুলো ফর্সা।

বাসববাবু বললেন, আর বলবার দরকার নেই। কার্লস জ্যাকল!

এত সাহস লোকটার? একেবারে পুলিশের ছদ্মবেশে এসে ঢুকে পড়ল!

নীহারবাবু বললেন, কেসটার ব্যাপারে কীভাবে এগনো যাবে সে বিষয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন স্যার?

না। তবে একটা ব্যাপারে আমি তোমার একটু সাহায্য চাই।

বলুন, কী করতে পারি?

আচ্ছা, তোমার দিদিমা তো কাশীবাস করেছেন, তোমাদের একটা বাড়িও আছে সেখানে, তাই না?

বাড়িটা আমাদের না। ডা. দীপঙ্কর ঘোষের বাড়ি।

আমি যদি কিছু দিনের জন্যে ওই বাড়ির একটা ঘর চাই দিতে পারবে?

এ আর এমন কী? বাড়িটা তো ফাঁকাই পড়ে আছে।

তা হলে আমি আশা করতে পারি?

নিশ্চয়ই। কিন্তু এই সময়ে আপনার বেনারসে চলে যাওয়াটা কী ঠিক হবে?

মোটেই না। আমি আমার জন্যে বলছি না। ভাবছি ছেলেটাকে সরিয়ে দেব এখান থেকে। ওর মা-ও যাবে। কিন্তু খুব সাবধান। কাকপক্ষীতেও যেন জানতে না পারে একথা। এমনকী হিরণ বা ওর মা-ও জানবে না ওরা কোথায় যাচ্ছে। দু'-একটা মাস। তার ভেতরে ওই শয়তানটার হেস্তনেস্ত একটা করবই আমরা। ঠিক এই সময়ে ওদের এখানে রাখা খুব একটা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে করছি না। তার কারণ এখানে থাকলে কার্লস জ্যাকলের এক একবারের ফোনের চমক ওদের ভয় পাইয়ে দেবে। ওরা যত ভয় পাবে আমিও ততই দমে যাব। কিন্তু আমি যদি একা থাকি তা হলে ভাবনাচিন্তা করে একটা কিছু করবার সুবিধে হবে আমার।

এটা অবশ্য মন্দ যুক্তি নয়। ঠিক আছে, আমি গোপনে সব কিছুরই ব্যবস্থা করছি। আশা করছি ট্রেনের টিকিটও পেয়ে যাব।

বাসববাবু জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, চলো, কার্লস জ্যাকলের পুরনো পাড়া খিদিরপুর গার্ডেনরিচ আর ওয়াটগঞ্জের দিক থেকে একটু ঘুরে আসি।

নীহারবাবু, রঞ্জনবাবু এবং বাসববাবু তিনজনেই যথারীতি তৈরি হয়ে সাদা পোশাকে একেবারে সম্পূর্ণ অন্য রকম চেহারায় বেরিয়ে পড়লেন অফিস থেকে। বেলা তখন দশটা। সারাটা দিনের এখনও কত বাকি।

তিন

হিরণ ছাদে বসে গভীর মনোযোগে কী একটা বই পড়ছিল। এমন সময় পাশের বাড়ির ছাদে ওরই বয়সি ফুটফুটে একটি ফ্রকপরা মেয়ে একটা পলিথিনের বালতিতে করে কতকগুলো ভিজে জামাকাপড় রোদ্দুরে শুকোতে দিতে এল। মেয়েটির নাম স্বপ্না। হিরণ এ বছর মাধ্যমিক দেবে। ও দেবে পরের বছর। হিরণকে ওইভাবে এক মনে বই পড়তে দেখে স্বপ্না আলশের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বলল, কী বই পড়ছ হিরণদা, অত মন দিয়ে?

হিরণ ওর দিকে চোখ মেলে বলল, 'লালবাজারে রাহাজানি'। স্বপ্না হেসে বলল, ওই নামে আবার বই হয় নাকি?

বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখো।

স্বপ্না বই দেখে হেসে বলল, যাঃ। এটা তো পাণ্ডব গোয়েন্দা।

হলেই বা! খুব শিগগিরই এই নামে একটা বই বেরোবে। যার নায়ক কার্লস জ্যাকল নামে এক জেলভাঙা কয়েদি। তার গোয়েন্দা হবেন হিরণ মজুমদার।

সে বইতে কোনও নায়িকা থাকবে না?

নিশ্চয়ই। নায়িকার নাম হবে স্বপ্না বোস।

সে বই লিখবে কে?

ভাবছি পাণ্ডব গোয়েন্দার লেখককে দিয়েই লেখাব।

তোমার যত সব উদ্ভট চিন্তা। তা হঠাৎ লালবাজারে রাহাজানির কথাটা মনে এল কেন? তা ছাড়া তুমি তো সচরাচর স্কুল কামাই করো না, আজ হঠাৎ ঘরে যে?

আজ সকালে খুব একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেছে।

স্বপ্না কৌতূহলী হয়ে বলল, কীরকম শুনি তবু একটু?

তুই আয় না দুপুরবেলা আমাদের বাড়ি, সব বলব।

আজ আমার একটুও সময় নেই। চিত্তরঞ্জন থেকে আমার মামাতো বোন এসেছে। ওকে ছেড়ে যাই কী করে বলো?

বেশ তো, ওকে নিয়েই চলে আয়।

আজ হবে না।

এমন সময় ওবাড়ির সিঁড়ির দরজায় একটি ফুটফুটে কিশোরীর মুখ উঁকি দিয়েই আড়াল হয়ে গেল। হিরণ পলকের দেখাতেই খুশি হল। কী সুন্দর মেয়েটি, সোনার প্রতিমা যেন। বলল, ও বুঝি?

স্বপ্না বলল, ও মানে।

এই মাত্র সিঁড়ির দরজায় কে যেন একজন উঁকি দিয়েই নীচে নেমে গেল।

তুমি নিশ্চয়ই রিয়ার কথা বলছ। আমার মামাতো বোন। ছাদে আসছিল। আসলে তোমাকে দেখে লজ্জায় নেমে গেছে। ও না ভীষণ লাজুক।

হিরণ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, তাই নাকি? আজকের দিনে এমন মেয়েও আছে?

কেউ না থাক, রিয়া আছে। আসলে ওকে দেখতে তো খুব সুন্দর। সামনে এসে দাঁড়ালে অনেকেই ওকে দেখে চোখের পাতা ফেলতে ভুলে যায়। তাই ওর এত লজ্জা।

হিরণ কিছুক্ষণ স্বপ্নার দিকে চেয়ে রইল একভাবে। তারপর বলল, বেশ। সময় মতো আসিস তা হলে। বলে আবার গল্পের বইতে মনোনিবেশ করল। এমন সময় স্বপ্নার গলা শুনতে পেল, আয় না। চলে আয়, লজ্জা কী? ও আমাদের হিরণদা। খুব ভাল ছেলে।

স্বপ্নার ডাকে সিঁড়ির দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রিয়া। তারপর অভ্যস্থ হাতে স্বপ্নার কাজের সহযোগিতা করল।

হিরণ বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে দেখতে লাগল রিয়াকে।

একসময় বই মুড়ে আলশের ধারে এসে দাঁড়িয়ে বলল, এই তোমার মামাতো বোন রিয়া?

স্বপ্না বলল, হ্যাঁ। প্রায় ছ'-সাত বছর পরে এল। এর আগেও তুমি ওকে দেখেছ। তখন অবশ্য ও আরও ছোট ছিল।

আমিও সাত বছরের ছিলাম। তুইও ছ' বছরের ছিলি। কাজেই সেই সময় ওরও বয়স তো তাই। ও কি তোরই সঙ্গে পরীক্ষা দেবে?

হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই আগামী বছর মাধ্যমিক দেব।

হিরণ বলল, ওরা কোথায় যেন থাকে?

চিত্তরঞ্জনে।

চিত্তরঞ্জন শুনেছি খুব ভাল জায়গা। চিত্তরঞ্জনের কোথায় থাকে ওরা?

এতক্ষণে রিয়া মুখ খুলল। স্বপ্নাকে বলল, ওকে জিজ্ঞেস কর, ও কি চিত্তরঞ্জনে গেছে কখনও? বললে চিনতে পারবে?

বলল, না। তা অবশ্য পারব না। আমি যাইনি কখনও। তবে আমার বাপি কয়েকবার গেছেন সরকারি কাজে সুন্দর পাহাড়িতে।

রিয়া এবার সরাসরি হিরণকে বলল, আমরা উত্তর সুন্দর পাহাড়িতে থাকি।

ওই জন্যই বোধহয় তোমাকে এত সুন্দর দেখতে।

রিয়া বলল, যারা সুন্দরপাহাড়ির বাইরে থাকে তারাও তো দেখছি কম সুন্দর নয়।

এমন সময় মা উঠলেন ছাদে। হিরণকে গল্প করতে দেখে বললেন, ওমা, তুই

এখানে? আমি তো ভরে মরি। চারদিক খোঁজাখুঁজি করছি। তারপর হঠাৎ নজর পড়ল রিয়ার দিকে। স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললেন, তোর সেই মামাতো বোনটা না? কত বড় হয়ে গেছে রে? কবে এল?

স্বপ্না বলল, কাল রাত্তিরে।

কার সঙ্গে এল? ওর মা এসেছে?

মা-বাবা সবাই এসেছেন। ওনারা অবশ্য আজ বিকেলেই চলে যাবেন। ও থাকবে।

তা বেশ বেশ। মা নীচে গেলেন।

হিরণ আর রইল না ওপরে। ধীরে ধীরে নেমে এল নীচে। মনটা ওরও আজ ভাল নেই। কেন না খবরের কাগজ খুললেই যা সব দেখছে তাতে সাধারণ মানুষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী কারও কোনও নিরাপত্তাই আর নেই। কে যে কখন একটা খবর হয়ে যাবে তা কে জানে? বিশেষ করে ওই শয়তান লোকটা সত্যিই যদি বাপির কোনও ক্ষতি করে এই আশঙ্কাতেই ও মনমরা হয়ে গেল। কী দুঃসাহস। জলজ্যান্ত একজন মানুষকে খুন করে দিব্যি ওর বাপির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে গেল। হিরণের মনে হচ্ছে ও যদি ওর বাপির মতন হত তা হলে এই মুহূর্তে ওই দুষ্কৃতীকে খুঁজে বার করে ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিত ওর। কিন্তু বাপি কেন যে তা করেন না তা ও কিছুতেই বুঝতে পারে না। কথায় আছে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একথা যে কতখানি সত্য তা আজ মর্মেমর্মে বুঝতে পারছে ও। কিন্তু বাপি কেন বোঝেন না?

দুপুরে স্নান-খাওয়ার পর সবে একটু শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে এমন সময় স্বপ্না ও রিয়া এসে হই হই করে ওর ঘরে ঢুকল। ওদের মায়েরাও এসেছেন। হিরণের মায়ের সঙ্গে পাশের ঘরে গল্পে মাতলেন তাঁরা। স্বপ্না আর রিয়া এসে বিরক্ত করতে শুরু করল হিরণকে।

স্বপ্না বলল, এ কী! আর ক'মাস বাদে যে ছেলে মাধ্যমিক দেবে সে কিনা এই ভরদুপুরে ঘুমোতে শুয়েছে?

হিরণ উঠে বসে বলল, না না। দিবানিদ্রা আমার ধাতে সয় না। এমনি একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম আর কী।

রিয়া আর স্বপ্না দু'জনেই এসে খাটের ওপর ওর বিছানায় বসল।

স্বপ্না বলল, এই হচ্ছে হিরণের ঘর। কেমন সুন্দর সাজানো-গোছানো বল দেখি?

তুই এটাকে ঘর বলছিস স্বপ্না? আমি তো স্টুডিয়ো বলতে যাচ্ছিলাম।

হিরণদার বাবা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের একজন বড় অফিসার। তাঁর ছেলের ঘর, কেন হবে না বল?

সেটাই বড় কথা নয়, ঘর সাজানোটা হচ্ছে রুচির ব্যাপার।

হিরণ বলল, এই ঘরে যা কিছু দেখছ সবই আমার মায়ের পরিকল্পনায়।

স্বপ্না হলল, সে যাই হোক। কিন্তু হিরণদা, তুমি তো স্কুল কামাই করে ঘরে থাকবার ছেলে নও।

হিরণ বলল, আমি কখনও অপ্রয়োজনে স্কুল কামাই করি না। খুব একটা জরুরি কাজ না থাকলে বা শরীর খারাপ না হলে রোজই আমি স্কুলে যাই। তবে আজ সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যে ভীষণ একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি আমরা।

কী রকম?

হিরণ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একবার স্বপ্নার দিকে তাকাল।একবার দেখল রিয়াকে। ঢল ঢল কচি কিশোরীর মুখদুটোতে কৌতূহল ফুটে উঠেছে যেন।

হিরণ বলল, আমাদের সকলেরই জীবন বিপন্ন।

স্বপ্না অবাক হয়ে বলল, সে কী! তোমার বাবা অতবড় একজন গোয়েন্দা অফিসার, আর তুমি এই কথা বলছ?

হিরণ বলল, শুনবে? কিন্তু কথা দাও কাউকে এসব কথা বলবে না?

স্বপ্না-রিয়া দু'জনেই বলল, কথা দিলাম।

হিরণ তখন এক এক করে সব কথা খুলে বলল ওদের।

ওরা সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলল, তা হলে তো যে কোনও মুহূর্তে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওরা এসে হাজির হতে পারে এখানে।

তাই চুপচাপ শুয়েছিলাম। আর ভাবছিলাম কত কিছু।

রিয়া বলল, কিন্তু এইভাবে কতদিন ঘরে বসে থাকবে?

জানি না। তবে আগামী দু'-একটা দিন হয়তো যাব না। তার মধ্যে আশা করি কিছু একটা হয়ে যাবে। যতক্ষণ না কিছু হয় ততক্ষণ ঘরেই পড়াশোনা করি।

স্বপ্না বলল, ঘরের পড়াশোনা মানে তো গল্পের বই।

হিরণ বলল, তখন পড়ছিলাম বলে? আরে না না। গল্পের বই পড়ি সময় কাটাবার জন্যে। স্কুলের বই পড়তে আমি কিন্তু একদম ফাঁকি দিই না।

রিয়া হঠাৎ বলল, আচ্ছা হিরণদা, তুমি ওই কার্লস জ্যাকল না, কী যেন নাম বললে, যতদিন না লোকটা ধরা পড়ে ততদিনের জন্যে তুমি দূরে কোথায় চলে যেতে পার না?

কোথায় যাব? কার কাছে যাব? কেউ তো নেই আমাদের।

ধরো না কেন, আমাদের সুন্দর পাহাড়িতেই যদি যাও?

হিরণ হেসে বলল, তা হলে তো খুব ভালই হয়, তবে কি না জেনেশুনে

অকারণে তোমাদের শান্তির নীড়ে অশান্তির বীজ পুঁতে আসব কেন?

অশান্তির বীজ!

তা নয়তো কী? কার্লস জ্যাকলের নজর এড়িয়ে আমি বাঁচব কোথায়? জলের তলায় লুকোলে ও সেখানে থেকেও খুঁজে বার করে আনবে আমাকে। লোকটা এতবড় শয়তান যে অত কড়া প্রহরা সত্ত্বেও সকলের নজর এড়িয়ে একটা কাটা মুণ্ডু ঠিক গিয়ে রেখে তো এল।

তাতে কী?

তাতে কী মানে? আমার ওপর বদলা নিতে গিয়ে তোমাকেই তুলে নিয়ে যাবে যখন, তুমি কী করবে?

এত সস্তা নাকি? ছুঁয়ে দেখুক না একবার আমাকে।

স্বপ্না বলল, তুই যে দেশলাই কাঠির বারুদের মতো ফস করে উঠলি। ব্যাপারটা কী? তোর সেই লজ্জা কোথায় গেল?

রিয়া বলল, হিরণদাকে দেখে ওর কথা শুনে কেন জানি না আমার আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেছে। শুধু তাই নয়, আমার কী মনে হচ্ছে জানিস, কেউ হিরণদার গায়ে হাত দিতে এলে তার দুটো হাতই কেটে দিই।

বলিস কীরে! খুব সাহস দেখছি।

আজকাল সাহসী না হলে বাঁচার উপায় আছে? মেয়েরা যদি মেয়েই হয়, আর ঘোমটা টানা বউ হয় তা হলে কিন্তু অশেষ দুর্গতি তাদের।

হিরণ বলল, আমি কিন্তু এই ব্যাপারে এক মত। সরকার এক সময় আইন করে বাঙালির হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিলেন! কিন্তু সেই দিন আসছে যেদিন আবার আইন করে সকলকেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র নিতে বাধ্য করা হবে। বিশেষ করে মেয়েদের।

রিয়া হ্যান্ডসেক করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল হিরণের দিকে।

হিরণ ওর হাতে হাত মেলাল। আর ঠিক তেমনি সময় টেলিফোন বেজে উঠল তার মতো করে। ক্রিরিরিং... ক্রিরিরিং—। হিরণ ছুটে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানের কাছে ধরে অভ্যস্ত গলায় বলল, হ্যালো।

কে হিরণ নাকি?

বলছি। আপনি কে?

তুমি আজ স্কুলে গেলে না কেন?

আমি আর কখনও স্কুলে যাব না।

না, না। স্কুলে যাবে, লেখাপড়া শিখবে। পাস করে কলেজে ভরতি হবে। তবে না? তোমার বাবা কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গেছেন। আমি বলি ভয় কী? মরতে তো একদিন হবেই। দু'দিন আগে, না হয় পরে।

হিরণ উত্তেজিত গলায় বলল, কিন্তু আপনি কে? আপনার নাম বলছেন না কেন?

আরে আমি কি তোমার বাবার মতন সি আই ডি অফিসার, যে নাম বললেই তুমি চিনবে। আমি একটা ফালতু লোক।

তা হলে তুমি বিদেয় হও। বলেই সশব্দে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

মা পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, কে ফোন করেছিল রে? সেই শয়তান লোকটা নয় তো? কী বলল সে?

পরিচয় দিল না। শুধু জানতে চাইল আমি স্কুলে যাইনি কেন?

শিউরে উঠলেন মা, সে কী!

স্বপ্না ও রিয়ার মা পাশেই ছিলেন। বললেন, কী ঝামেলা বাবা। আবার ছেলেপুলের ওপর নজর দেওয়া কেন?

ওকে আমি পই পই করে বলেছিলাম শয়তানটাকে ধরেই শেষ করে দিতে। কিন্তু কেন যে শুনল না ও আমার কথা।

এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা ফাটল বাইরের দরজার কাছে। পরক্ষণেই একটা গুলির শব্দ। কে যেন আর্তনাদ করে উঠল, আ-আ-আ। ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল চারদিক। হিরণ দরজা খুলে দেখতে যাচ্ছিল। স্বপ্না আর রিয়া দু'দিক থেকে দুটো হাত টেনে ধরল ওর।

মা বললেন, যাচ্ছিস কোথায়? এই অবস্থায় কেউ বাইরে যায়?

বাইরে তখন প্রচণ্ড হট্টগোল।

হিরণ বলল, আমাকে বাইরে যেতে না দাও ছাদে উঠে দেখতে দাও অন্তত। দরজার সামনে বোমা, গুলি। কী থেকে কী হল দেখতে হবে না?

অতএব সবাই ছাদে উঠল। ছাদে উঠে যে দৃশ্য দেখল, সেই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেল সকলেই। দেখল ডোরা কাটা লুঙ্গিপরা নিম্নশ্রেণীর এক মুসলমান যুবক পথের ওপর উপুড় হয়ে ছটফট করছে। তাকে ঘিরে জনতার ভিড়। এই যুবকই বাড়ির সামনে বোমা ফাটিয়েছিল। কিন্তু ওর কী হল? হিরণের মনে হল নীচে নেমে এসে একবার ভাল করে সার্চ করে দেখে লোকটিকে। কিন্তু না। তা সে করল না। এ কাজের জন্যে বাপি তো আছেন।

চার

রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বাসববাবু স্ত্রীকে বললেন, তোমাদের ভালই জন্যেই এই ব্যবস্থা আমি করছি। বিশেষ করে ছেলেটাকে এখান থেকে সরাতে না পারলে আমার কোনও কাজে মন লাগবে না।

বুঝলাম। কিন্তু এই রাহুর গ্রাসের মুখে তোমাকে একা ফেলে রেখে আমরাই বা যাই কী করে? আমাদেরও কি মন টিকবে? সবই বুঝি! তবে এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। ওই দুর্ধর্ষ শত্রুর মুখোমুখি আমাকে হতেই হবে। ওর বিষদাঁত যদি ওপড়াতে না পারি তা হলে জেনে রেখো জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কোথাও আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারব না।

তুমি যেখানে পাঠাচ্ছ আমাদের, সেখানেই যে আমরা নিরাপদে থাকব তারই বা প্রমাণ কী?

ওটা স্টেটের বাইরে। তা ছাড়া কাকপক্ষীতেও টের পাবে না কোথায় যাচ্ছ তোমরা। তোমাদের নিরাপত্তার জন্য ওখানেও সাদা পোশাকের নজরদারি পুলিশ থাকবে!

ভুলে যেয়ো না ওর নাম কার্লস জ্যাকল। এই মুহূর্তে আমরা যে কী আলোচনা করছি সেটাও হয়তো সে জানতে পারছে।

সে ভয় করলে আমাকে এখনই হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। জানি বিপদ আমাদের পদে পদে। তবে যতটা পারি সতর্ক থাকি। সাবধানের মার নেই! আজ বাড়ির সামনে ওরা বোমা ছুড়েছে। কাল যে আরও কোনও বড় ধরনের বিস্ফোরণ কিছু ঘটাবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

কিন্তু ওই লোকটা কে? ওর পরিচয় কিছু পেলে?

ওর নাম রহমত। মানিকতলার মোড়ে ফল বিক্রি করে। বাড়ি রাজাবাজারের বস্তিতে। লোকটা গুলি খেয়ে পুলিশ-হাসপাতালে এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। কার্লস জ্যাকলের হয়ে কাজ করতে এসেছিল লোকটা।

তা হলে ওকে গুলি করল কে?

বাসববাবু হেসে বললেন, যারা ওকে দিয়ে বোমা ছুড়িয়েছে হয়তো প্রমাণ লোপের জন্য তারাই করেছে এই কাজ। তাড়াতাড়িতে অথবা ধোঁয়ার জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলিটা বুকে না-লেগে কোমরে লেগেছে।

তুমি গিয়েছিলে পুলিশ-হসপিটালে?

গিয়েছিলাম বইকী। লোকটি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়বে কতক্ষণ তা কে জানে? তবু পুলিশি-জেরার কাছে যেটুকু মুখ খুলেছে

তাতেই ওর নাম আর ঠিকানাটা জানা গেছে।

আর ওই লোকটার ব্যাপারে কোনও খোঁজ পেলে?

কার কথা বলছ তুমি?

যার কাটা মুণ্ডুটা এনে কার্লস জ্যাকল উপহার দিয়েছিল তোমাদের।

হ্যাঁ। কালীঘাট স্টেশনের কাছে আজ ভোরের দিকে একজন লোক ট্রেনে কাটা পড়ে। তার মুণ্ডুটা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ধড়টা পড়েছিল লাইনের ধারে।

এমন সময় পাশের ঘর থেকে হিরণ এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। বলল, বাপি, লোকটা কাটা পড়েছে ঠিকই। এমনও তো হতে পারে লোকটাকে কেউ মেরে লাইনের ওপর ফেলে রেখেছে। না হলে কার্লস জ্যাকল সঙ্গে সঙ্গে নরমুণ্ডু পায় কী করে? ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডুটা কি মিলিয়ে দেখেছ তোমরা?

দেখেছি। আর সেই জন্যই তো পোস্টমর্টমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা আসলে কী? তবে ইতিমধ্যে মৃত-র বাড়ির লোকেরাও সনাক্ত করছে দেহটিকে। এই লোকটি যে খুন হতে পারে, এমন সন্দেহ ওর বাড়ির লোকেদেরও কারও হয়নি। এমনকী মৃতের পকেটে আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে কোনও চিঠিপত্তরও ছিল না। অতএব ধরা যেতে পারে কার্লস জ্যাকলের লোকেরা খেলাচ্ছলেই ঠান্ডামাথায় খুন করেছে লোকটিকে।

কিন্তু এত লোক থাকতে ওই লোকটাকেই বা বেছে নিল কেন কার্লস জ্যাকল?

যাকে হোক একজনকে নিতে তো হতই। হয়তো এই লোকটির ওপর পুরনো কোনও কিছুর হিস্যা নিয়েছে। লোকটা কোর্টের মুহুরি ছিল।

লোকটি খুন হয়েছে রবিবার ভোরে। সেই সময় নিশ্চয়ই কোর্ট খোলা ছিল না।

বাসববাবু বললেন, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। উনি একটা কাজে শিয়ালদহ হয়ে বনগাঁ যাবার জন্যে স্টেশনে আসছিলেন। শর্টকাট করবার জন্য রেলপথ ধরেই হাঁটছিলেন! আর কোনও প্রশ্ন কোরো না। এবার শুয়ে পড়ো। কালই আমি এখান থেকে সরিয়ে দেব তোমাদের!

হিরণ বলল, আমরা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

তোমার ভালর জন্যেই বলছি বাবা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো রাত বারোটা। যাও শুয়ে পড়ো।

হিরণ আর কোনও কথা না-বলে নিজের বিছানায় এসে শুল। শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ করেও যখন ঘুম ধরে না, তখন এক সময় উঠে বসল। তারপর ছাদের সিঁড়ি বেয়ে এক-পা এক-পা করে উঠে গেল ওপরে। খোলা আকাশের বুকে নক্ষত্রমালার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেল সে।

অসংখ্য চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে এখন। পরিস্থিতি ক্রমশ এমনই জটিল হয়ে উঠছে যে, কোনও কিছুই আর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না! কার্লস জ্যাকল থাবা বাড়িয়েছে যখন, শিকার না-নিয়ে সে পিছু হটবে না। বাপি অত্যন্ত ভালমানুষ। মানুষকে কত সহজে বিশ্বাস করেন। উনি কি পারবেন এই শয়তানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে? নাকি কার্লসের প্রথম শিকার ও নিজে? রহমত নামের লোকটা প্রকাশ্য দিবালোকে ওদের বাড়ির সামনে বোমা ছুড়তে এল কেন? লোকটা চাইছিল কী? প্যানিক সৃষ্টি করতে? না অপহরণ করতে? ও যদি কার্লস জ্যাকলেরই হয়ে কাজ করতে এসে থাকে তা হলে ওকে গুলিটা করল কে? বাপি ওদের দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন, হয়তো ভালই জন্যই। কিন্তু দূরে গিয়ে বাপির চিন্তায় গুমরে গুমরে মরার মতো কষ্টকর আর কিছু কি আছে। বাপিকে একা পেয়ে সত্যিই যদি কিছু করে ওরা।

হিরণ কতক্ষণ যে নিজের মনে এইসব চিন্তা করল, তার ঠিক নেই। তারপর এক সময় ভাবল, মৃত্যু যখন শিয়রে, জীবনের যখন কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই, তখন ওই কার্লস জ্যাকলের মুখোমুখি সে নিজেও কি হতে পারে না? আর সেইজন্য ওকে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। কারও কোনও বাধা আর ও মানবে না। কাল থেকে ও নিয়মিতই স্কুলে যাবে। কখনও একা, কখনও বা বন্ধুদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে। আর সেই সময় কার্লস জ্যাকল যদি ওর দিকে থাবা বাড়ায় তা হলে—।

মতলবটা মাথায় আসা মাত্রই ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল ও। বাপির ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বাপি তখন ঘুমোচ্ছেন। ঘরের ভেতর ডিম লাইটটা জ্বলছে। ও পা টিপে ঘরে ঢুকল।

তারপর—?

সকালবেলা স্ত্রীর কান্নাকাটিতে ঘুম ভেঙে গেল বাসববাবুর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, কী ব্যাপার! হয়েছেটা কী?

সর্বনাশ হয়ে গেছে। হিরণকে কোথাও দেখছি না।

সে কী! গেল কোথায় সে?

জানি না, শুধু দেখছি সে নেই।

পাশের বাড়ির স্বপ্নাকে জিজ্ঞেস করেছ? যদি ওদের বাড়িতে গিয়ে থাকে? তুমি যে বললে ওর মামাতো বোন না কে যেন এসেছে?

করেছি। ওদের বাড়িতেও নেই। মেয়েদুটো তো ছাদেই ঘুরছে দেখলাম।

তা হলে তো ভয়ের ব্যাপার। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ একটা ঘনিয়ে এল বাসববাবুর মুখে। উনি নিজেও তন্ন তন্ন করে চারদিক খুঁজলেন। হঠাৎ এক সময় বললেন, ছেলেটাকে কেউ এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়নি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত।

কী করে বুঝলে?

ও বাসি জামাপ্যান্ট ছেড়ে অন্যটা পরেছে। জুতোও পরেছে দেখতে পাচ্ছি। কাজেই কেউ ওকে নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই জামাজোড়া পরিয়ে নিয়ে যেত না। তার মানে ও নিজে থেকেই কোথাও গেছে। হয়তো ফিরতে দেরি হবে। অথবা বাইরে বেরিয়েই বিপদে পড়েছে।

কী হবে তা হলে?

কখন গেছে, কীভাবে গেছে, কেন গেছে, এইসব না জেনে তো কিছু বলা যাবে না। আপাতত আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

এমন সময় হঠাৎ কী দেখে যেন বাসববাবু এগিয়ে গেলেন টেবিলের দিকে। দেখলেন ড্রয়ারটা ঠিকমতো বন্ধ হয়নি। কেউ যেন খুলেছিল ওটা। তারপর ঠিকভাবে না-এঁটেই চলে গেছে। এমনকী চাবিটাও সরিয়ে রাখতে ভুলে গেছে সে। চাবিটা লাগানোই ছিল। বাসববাবু ড্রয়ারটা খুলেই অবাক। ভেতরের জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখলেন। কী যেন না-পেয়ে অস্ফুট উচ্চারণ করলেন, স্ট্রেঞ্জ!

মা বললেন, কী হল! কী দেখলে তুমি?

বাসববাবু সে কথার উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের নম্বর ডায়াল করে কথা বললেন নীহারবাবুর সঙ্গে।

ওদিক থেকে সাড়া আসতেই বললেন, ভাই! খুব একটা যা তা কাণ্ড হয়ে গেছে। ছেলেটাকে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাচ্ছি না। আর সেই সঙ্গে খুঁজে পাচ্ছি না একটা মূল্যবান জিনিস।

কী জিনিস?

একটা পিস্তল।

সর্বনাশ। পিস্তল শুটিং জানে ও?

শুধু জানে বললে ভুল বলা হবে। অব্যর্থ টিপ ওর। কিন্তু এটা ও কেন নিল তা ভেবে পাচ্ছি না।

মনে হয় কাউকে ও ফলো করেছে।

তা যদি হয় তা হলে তো ভয়ের ব্যাপার। একেবারে শিকারির মুখেই গিয়ে শিকার হয়ে ধরা দেবে।

ওদিক থেকে উত্তর এল, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমি ওর খোঁজে লোক লাগাচ্ছি।

বাসববাবু ফোন রেখে হিরণের ঘরে ঢুকে বইপত্তর ঘেঁটে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন যদি কোথাও একটুকু চিরকুটও রেখে দিয়ে থাকে ও। কিন্তু না। সেইসব কিছুই পেলেন না তিনি।

এমন সময় স্বপ্না আর রিয়া এসে ঘরে ঢুকল, হিরণদা ফিরেছে কাকিমা?

না না। কোথায় যে গেল ছেলেটা কে জানে?

স্বপ্না বলল, ও পাড়ার বংশীদার সঙ্গে বাবার দেখা হয়েছে। বাবা বংশীদার মুখে শুনেছেন হিরণদা নাকি ভোরবেলা খুব জোরে হেঁটে কোনদিকে যাচ্ছিল। এটাকে মর্নিং ওয়াক ভেবে হিরণদাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

বাসববাবু বললেন, দেখলে তো, আমার ধারণাটা ভুল নয়। কিন্তু এইভাবে কাউকে কিছু না-বলে কোথায় গেল ও? কোথায় যেতে পারে? কেনই বা গেল?

মা বললেন, কাল সারাদিন ও ঘর থেকে বেরোয়নি। চুপচাপ শুয়ে-বসে ছিল। ছাদে বসে বই পড়ছিল।

বাসববাবু বললেন, অনবরত গল্পের বই পড়ে পড়ে এই রকমটা হয়েছে ওর। যত্ত সব গাঁজাখুরি গল্প পড়েই মাথাটা গেছে। এখন নিজেকেই ও একজন হিরো ভেবে নিয়েছে। আর সেই ভেবেই পিস্তলটা নিয়ে কোনও কিছুর মোকাবিলা করতে গেছে নির্ঘাত।

রিয়া বলল, তা কেন, হিরণদা ওটা আত্মরক্ষার জন্যও তো কাছে রাখতে পারে।

স্বপ্না বলল, তা অবশ্য পারে। কিন্তু এইভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরোবার দরকারটা কী ছিল। জানে তো বাড়িতে ভাববে।

মা বললেন, উঃ। কী সাংঘাতিক ছেলে। কী যে করি আমি।

বাসববাবু বললেন, কী আর করবে? বসে বসে কপাল চাপড়াও।

স্বপ্না আর রিয়া দু'জনেই তখন হিরণের শোবার ঘরে ঢুকে ওর বইপত্তর ঘেঁটে কাগজপত্তর খুলে দেখতে লাগল কোথাও কোনও চিরকুট বা ওই জাতীয় কোনও চিঠিপত্তর কিছু রেখে গেছে কি না। ওরাও হতাশ হল। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় বলেই মনে হল ওদের কাছেও। ওরা এ-ঘর ও-ঘর করে ছাদে উঠল। ছাদে উঠে এদিক সেদিক করে তাকিয়েই ওরা দেখল মোড়ের মাথায় একজন লোক দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে বাড়িটার দিকে।

রিয়া স্বপ্নাকে বলল, দেখেছিস সপু, লোকটা কেমন বাড়িটার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে?

স্বপ্না বলল, আরে তাই তো! মনে হচ্ছে কোনও মতলব আছে ওর। শুধু তাই নয়, আমরা যে ওকে দেখছি সেটা টের পেয়েই ও চোখ নামিয়ে অন্য কোনও কিছুর দিকে মন দিচ্ছে।

তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কেমন পটলচেরা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে দেখ। চল তো নীচে গিয়ে লোকটাকে একটু চেক্ক করি।

ওরা যখন নীচে নেমে এল তখন দেখল বাসববাবু ইউনিফর্ম পরে বাইরে

যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। ওরা একবার ভাবল বাসববাবুকে লোকটির কথা বলে। কিন্তু তা না বলেই বাইরে এল ওরা। তারপর দ্রুত পায়ে মোড়ের মাথায় এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখল কোথায় কে? সেই বিশেষ লোকটির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

স্বপ্না বলল, অবাক কাণ্ড তো?

রিয়া বলল, মোটেই অবাক কাণ্ড নয়। লোকটা আসলে বুঝতে পেরেছে আমরা ওর মতলব বুঝে ফেলেছি। তাই আমরা ছাদ থেকে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গা ঢাকা দিয়েছে।

আমার মনে হয় ব্যাপারটা কাকাবাবুকে একটু জানিয়ে রাখা ভাল।

কী হবে জানিয়ে? একেই ছেলের জন্যে ওঁর মন খারাপ তার ওপরে এইসব শুনিয়ে ওনাকে বিব্রত করে লাভ কি?

ওরা আবার যখন ফিরে এল বাসববাবু তখন একদৃষ্টে সেদিনকার খবরের কাগজের হেডিংগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। এক জায়গায় বড় বড় হরফে লেখা আছে, আবার কার্লস জ্যাকল! অপরাধজগতের কুখ্যাত নায়ক এখন কলকাতায়। জেলপলাতক কার্লস জ্যাকলের নতুন শিকার একজন নিরীহ নাগরিক। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে গোয়েন্দা হানা।

স্বপ্না আর রিয়া দু'জনেই এসে কাকাবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

বাসববাবু কাগজের পাতা থেকে চোখ তুলে বললেন, কিছু বলবি মা?

স্বপ্না বলল, একজন লোক অনেকক্ষণ থেকে এই বাড়িটার দিকে নজর রাখছিল। আমরা ছাদ থেকে নেমে লোকটাকে ধরব বলে যেই গেলাম, অমনি দেখি লোকটা ভ্যানিস হয়ে গেছে।

কতক্ষণ আগে?

এই তো। এইমাত্র।

লোকটাকে কী রকম দেখতে বলো তো?

ওরা দু'জনেই চেহারার বর্ণনা দিল।

বাসববাবু বললেন, লোকটাকে আবার কখনও দেখলে আমাকে জানাবি।

কথা বলতে বলতেই অফিসের গাড়ি এসে গেল। বাসববাবু রিয়া আর স্বপ্নাকে বললেন, তোমাদের কাকিমাকে একটু দেখো। আর ছেলেটা যদি ফিরে আসে আমাকে একটা ফোন কোরো কেমন? কাকিমার কাছ থেকে নাম্বারটা জেনে নিয়ো।

স্বপ্না বলল, আজ কি আপনার না গেলেই নয়?

বাসববাবু বললেন, আজই তো আমি বেরোব মা। ছেলেটা যদি কোনও বদ লোকের খপ্পরে পড়ে থাকে তা হলে সেখান থেকে ওকে উদ্ধার করে আনতে হবে তো।

অবশ্যই। আপনি যান, আমরা দেখছি কাকিমাকে।

বাসববাবু যাবার জন্যে যে মুহূর্তে এক পা এগিয়েছেন অমনি নীহারবাবু এসে হাজির। বললেন, এবার বোধহয় চাকরিটা ছেড়ে দিতে হল স্যার।

বাসববাবু মুখ কালো করে বললেন, কেন কী হল আবার?

কার্লস জ্যাকলের কাছে আমরা হেরে গেলাম।

আবার নতুন কিছু?

হ্যাঁ, অত প্রহরা সত্ত্বেও আমার বাড়ির বাথরুমের ভেতর থেকে—।

একটা কাটা মুণ্ড উপহার পেয়েছ। এই তো?

ঠিক তাই।

এবং তার কপালে পিনআঁটা কাগজে তোমার নামও লেখা আছে।

ভয়ে আমার বুক কাঁপছে স্যার।

ভয়ে পেয়ো না। সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে এসো, দেখবে ভয় কেটে গেছে। তা ছাড়া এখন ভয়কে জয় না-করলে সমূহ বিপদ। আমাদের জীবনই এই। লোকে তো বোঝে না, তারা ভাবে গোয়েন্দাদের হাতে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ আছে। তাই দিয়েই তারা গল্পের গোয়েন্দাদের মতো অপরাধীদের পটাপট ধরে ফেলবে। আমরা যে কত অসহায়, কী কঠিন মূল্য যে দিতে হয় আমাদের, তা কে বোঝে? কাজেই সমস্ত সংশয় মন থেকে দূরে সরিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে এসো।

নীহারবাবু বললেন, আরও খারাপ খবর আছে।

আমার হিরণকেও ওরা...।

না না, তা নয়। একটু আগে পুলিশ-হাসপাতালে ঢুকে রহমতকে ওরা শেষ করে দিয়ে গেছে।

বাসববাবু রেগে বললেন, ওখানে ওরা ঢোকে কী করে? সিকিউরিটি কী করছিল?

পুলিশের দু'জন লোক পাহারায় ছিল। একজন বাথরুমে গেলে অপরজনকে ওরা কবজা করে ভেতরে ঢোকে। দলে ওরা তিনজন ছিল। সেই তিনজনের একজন অবশ্য এক অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছে। পিছনদিক থেকে কেউ যেন গুলি করেছে তাকে।

লোকটাকে চিনতে পেরেছে?

না। তবে চেহারা দেখে মনে হয় পেশাদার খুনে একজন।

ডেড বডি মর্গে পাঠানো হয়েছে?

যথারীতি।

এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠতেই বাসববাবু রিসিভার তুলে বললেন, হ্যালো, মি. মজুমদার বলছি।

ওদিক থেকে উত্তর এল, গুড মর্নিং।

গলাটা খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

সে তো চিনবেনই। আমি যে আপনার পুরাতন বন্ধু।

কার্লস জ্যাকল!

ঠিক ধরেছেন। নীহারবাবু আপনার ওখানেই আছেন নিশ্চয়। আর খুব ভয় পেয়ে গেছেন। আমার লোক যে একেবারে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বে এটা উনি ভাবতেও পারেননি। আসলে এও এক ধরনের খেলা। বুঝলেন কিনা, চোর-পুলিশ খেলা যাকে বলে। আজকের কাগজ দেখেছেন? কী সব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিগুলো ছাপা হয়েছে আপনাদের?

রাগে বাসববাবুর মুখ দিয়ে একটা খারাপ কথা বেরিয়ে এল। ওদিক থেকে উত্তর এল, আপনি কিন্তু বড় বেশি রেগে যাচ্ছেন। আসলে আমি এখন চাইছি আপনার সঙ্গে আমার একটা দোস্তির সম্পর্ক গড়ে তুলতে। আসুন না আমার এখানে, একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান। তবে যাই বলুন না কেন, ছেলেটাকে কিন্তু খাসা তৈরি করেছেন। ওই রকম একটা ছেলে আমার খুব দরকার।

ছেলেটা কোথায়?

যাঃ বাব্বা। তা আমি কী করে জানব?

তুমি সব জানো শয়তান।

আপনি অকারণে এইসব যা তা বলছেন আমাকে। তাই তো বলছি একবার একটু পায়ের ধুলো দিন। আজ দুপুরে একটা-দেড়টা নাগাদ বাবুঘাটে আসুন। অবশ্যই নিরস্ত্র এবং পুলিশবাহিনী না নিয়ে। আমার লোক সসম্মানে সেখান থেকে নিয়ে আসবে আপনাকে।

বাসববাবু ফোন রেখে নীহারবাবুকে সব বললেন। তারপর বললেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে নাকি?

প্রশ্নই ওঠে না।

বাসববাবু বললেন, আমার এখন মনে হচ্ছে কী জান? ওর দলের লোকই বোধহয় এখন ওর পেছনে লেগেছে। না হলে কাল আমার বাড়ির সামনে রহমত বোমা ফাটাতে এলে ওকে গুলিই বা করল কে, আর আজ ওকে যারা হত্যা করতে এল তাদেরও একজনকে সরিয়ে দিল কে? কে করেছে এই কাজ? আমার মনে হয় একই লোকের কাজ এটা।

নীহারবাবু বললেন, না। রহমতকে গুলি করেছে আমারই পাঠানো একজন লোক। সে সব সময় আপনার বাড়ির দিকে গোপনে নজর রাখত। আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি তাকে নিযুক্ত করেছিলাম এই কাজে। ওর উচিত ছিল রহমতকে গুলি না করে হাতেনাতে ধরা। হয়তো বা বোমার শব্দে উত্তেজিত

হয়েই গুলি করেছে। আর সেই রাগেই সম্ভবত কার্লস জ্যাকল আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে একটা কাটা মুণ্ডু উপহার পাঠিয়েছে কাউকে দিয়ে। তবে যাই হোক, লোকটার কিন্তু হিম্মত আছে। কিন্তু আজকের ঘটনার নেপথ্যে যে কে আছে তা কে জানে?

নীহারবাবুর কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিরণ এসে ঘরে ঢুকল। বলল, আমি জানি।

বাসববাবু ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। মা ছুটে এসে ধরলেন হিরণকে।

স্বপ্না আর রিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলল, তুমি কী বলো তো হিরণদা? এইভাবে না বলে কেউ যায়? একটা চিঠি অন্তত লিখে রেখে যাবে তো?

হিরণ বলল, আরে বাবা, আমি তো একেবারেই চলে যাব বলে যাইনি। কাজেই চিঠি লেখার প্রশ্ন ওঠে না।

বাসববাবু বললেন, তোমার জন্যে আমরা কত ভাবছিলাম জানো? এখন তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই কে গুলি করেছে লোকটাকে।

হিরণ বলল, আমি।

তুমি গুলি করেছ?

হ্যাঁ। আমি ওকে গুলি করেছি। আমি তো তোমারই ছেলে, কাজেই তোমার কোনও কাজে সহযোগিতা করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে?

আছে। কিন্তু এ যে আগুন নিয়ে খেলা। এই চক্র বড়ই সাংঘাতিক। আমাদের এই পুলিশবাহিনী এক প্রচণ্ড সংগঠিত শক্তি। শয়তানের মারপ্যাঁচে আমরাই যেখানে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। সেইখানে কিনা তুমি গিয়ে ওদের ক্রোধানলে ঘি দিয়ে এলে?

মা বললেন, যাবার আগে তোর কি উচিত ছিল না বাড়িতে বলে যাওয়া?

বললে কি তোমরা যেতে দিতে?

বাসববাবু বললেন, ঠিক ওই সময়েই পুলিশ-হসপিটালে তুমিই বা গিয়ে হাজির হলে কী করে?

এটা একটা মিরাক্যাল বলা যেতে পারে। কাল রাত থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ঝড় তোলপাড় করছিল। আর এও বুঝতে পারছিলাম তোমার সঙ্গে শত্রুতা মানেই ওদের টার্গেট আমিও। এবং সেইজন্যেই তুমি আমায় ঘর থেকে বেরোতে দিচ্ছ না। আজ হোক, কাল হোক, ওদের খপ্পরে পড়তে আমাকে হতই। আমাকে মেরে অথবা কিডন্যাপ করেই ওরা প্রতিশোধ নিত। তাই মরবার আগে ওদেরও একটা মরণকামড় আমি দিতে চেয়েছিলাম। কাল রাতে চুপি চুপি তোমার ঘরে ঢুকে সরিয়েছিলাম পিস্তলটা। তারপর ভোরবেলা ওটা সঙ্গে নিয়েই পথে বেরিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল ওদের সতর্ক চোখ এই বাড়ির দিকে সব

সময় তাকিয়ে থাকবে। তাই আমি বাইরে বেরোলেই আমাকে কিডন্যাপ করতে এগিয়ে আসবে ওরা। কিন্তু অনেকক্ষণ পথ চলার পরও যখন তেমন সন্দেহজনক কাউকে আমার পিছু নিতে দেখলাম না, তখন কেন জানি না, আমার মনে হল একবার রহমতের সঙ্গে দেখা করে আসি। যদি ওর মুখ থেকে কার্লস জ্যাকলের কোনও ঠিকানা আদায় করতে পারি, তা হলে যেভাবেই হোক লুকিয়ে ওকে খতম করে আসব।

হিরণের কথায় শিউরে উঠল সকলে।

মা বললেন, তার মানে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনবে।

হিরণ বলল, আমি যখন জানতে পেরেছি আমরা এখন কার্লস জ্যাকলের শিকার, তখন এই কাজ কেন করব না বলো? প্যাঁচার মতো ওর ভয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা বা পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে ওর সঙ্গে সংঘর্ষের পথেই চলে যাওয়াটা ঠিক নয় কি?

বাসববাবু হিরণের পিঠ চাপড়ে বললেন, আমার ছেলের উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো? কার্লস জ্যাকল সাধারণ ক্রিমিন্যাল নয়। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই ও তোমাকে শেষ করে দেবে।

হিরণ বলল, বেশ, তুমি তা হলে আমার স্কুলের নাম কেটে দিয়ে এসো, আমি আজ থেকেই আর ঘরের বাইরে যাব না। নন্দলাল হয়ে চুপ করে বসে থাকব।

মা বললেন, হ্যাঁ তাই করবে। আমি সব সময়ে তোমাকে চাবি দিয়ে রাখব ঘরের ভেতর। ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাবার বয়স তোমার হোক, তখন যা-ইচ্ছে করবে, এখন নয়।

আমার প্রথম অভিযানেই আমি কিন্তু একটাকে চিরতরে সরিয়ে দিয়ে এসেছি।

মা বললেন, ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।

বাসববাবু বুকে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। বললেন, তুমি যে ভেতরে ভেতরে কতটা বড় হয়েছ তা আমি বুঝিনি বাবা। তোমার গলায় আমি জয়ের মালা পরিয়ে দেব। পুলিশের চাকরি করছি বলে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করবার দায়িত্ব শুধু আমার একার তা তো নয়। এ অধিকার সবার। শুধু আমার ছেলে হিসেবে যে তোমার তা নয়, তোমার মায়েরও আছে। আছে একজন সাধারণ নাগরিকেরও। বেশি সংখ্যক মানুষ যখন অসৎ হয়, বিভ্রান্ত হয়, তখন দেশের সামনে এমন এক সংকট পাহাড়ের মতো বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে তাকে ঠেলে সরানোর কাজে এগিয়ে আসতে হয় সকলকেই। পুলিশ প্রশাসন বা একজন সরকারি কর্মচারীর ওপর যেমন অনেক দায়দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, তেমনি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক একই দায়িত্ব সমানভাবে বর্তায়। আলাদাভাবে নয়,

সকলকে এক হয়ে একজোটে কাজ করতে হয়। একতাবদ্ধ না হলে এ দেশকে রক্ষা করা অসম্ভব।

মা ফোঁস করে উঠলেন এবার, তোমার লেকচার থামাও তো। কুখ্যাত দাগি আসামিগুলোকে ধরে আনছ, একদিন দু'দিন আটকে রাখছ, আর ছেড়ে দিচ্ছ। এই এলাকার মধ্যেই তোমার বাড়ির আশপাশে ওইরকম কত ঘুরে বেড়াচ্ছে তা তুমি জান না?

কেন জানব না? সবই জানি। আমরা কাজ করি বলেই তো ওদের টুঁটিটিপে লকআপে পুরি। জানি বলেই তো নিজের জীবন বিপন্ন করেও ধরে আনি ওদের। তারপর তাদের ছেড়েও দিই। দিতে বাধ্য হই। সব চেষ্টা বিফল হয়ে যায়। অত পরিশ্রম, অত হানাহানি, মারামারি, দাপাদাপি সবই নাটক হয়ে যায় একসময়।

এই নাটক তোমরাই তো সৃষ্টি করো।

করতে বাধ্য হই। না করে উপায় আছে? আজ তুমি যাকে কুখ্যাত সমাজবিরোধী বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছ, কাল সকালে তাকে যদি অ্যারেস্ট করি তখন দেখবে তোমার পাশের বাড়িরই অমুকবাবু, তমুকবাবুরা তার সুনজরে থাকবার জন্যে দল বেঁধে তাকে ছাড়াতে যাবে। এ ছাড়াও সমাজের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তো যাবেনই, অথবা আবেদন নিবেদন করে তাঁদের যেতে বাধ্য করা হবে। তা হলে? তোমাকে, আমাকে, অমুকবাবুকে, তমুকবাবুকে নিয়েই তো আমরা। এবার বুঝেছ তো আমাদের ক্ষমতা কতটা সীমিত? যাক, ওসব কথা বুঝিয়ে বলতে গেলে সাতকাহন হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ যতদিন না একজোট হয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হবে, পরস্পর পরস্পরের পাশে এসে না দাঁড়াবে, ততদিন কিচ্ছু হবে না, চলতেই থাকবে এইসব। তা ছাড়া মানুষের অভাব অনটন দারিদ্র যত প্রবল হবে, শিক্ষার প্রসার যত কম হবে, ততই বাড়বে অপরাধের মাত্রা। একে রোধ করবে কে?

নীহারবাবু বললেন, হিরণ, তুমি আজ যেভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে এক ভয়ংকর শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়েছিলে, তা তোমার মতো সব ছেলেরই আদর্শ হোক।

হিরণ বলল, হওয়া উচিত। তবে, ভাগ্যিস আমি পিস্তল শুটিংটা শিখেছিলাম আর আমার বাবা একজন পুলিশ অফিসার, তাই হয়তো আমি এতটা দুঃসাহসী হতে পেরেছি।

তাও ঠিক নয়। তুমি সাহসী ছেলে বলেই পেরেছ। না হলে পারতে না। অনেক পুলিশ অফিসারের অনেক ছেলেই আছে, তারা কি সবাই পারে তোমার মতন সাহসে ভর করে এগিয়ে যেতে? তোমার ভেতরে যে ওই বীজ ছিল বাবা।

বাসববাবু বললেন, এবার আমাকে বেরোতে হবে। যে পর্যন্ত তুমি বলেছিলে তার পর থেকে বলো কীভাবে কী হল।

হিরণ বলল, হ্যাঁ, আমি তো রহমতের সঙ্গে দেখা করব বলে গেলাম, যেই না গেছি অমনি দেখি সন্দেহভাজন দু'-তিনজন ঘোরাফেরা করছে সেখানে। দেখেই বুঝলাম গতিক সুবিধের নয়, একটু আড়ালে লুকিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করলাম। টুকরো টুকরো কথা যা দু'-একটা কানে এল তাতেই বুঝলাম ওরা রহমতকে খুন করবার মতলব নিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় আমি কী করব যখন ভাবছি, তখন হঠাৎ দেখি ওদের একজন চোখের পলকে হাসপাতালে ঢুকে গেল। তারপরই শোনা গেল গুলির শব্দ, আর হই-হট্টগোল। বুঝলাম অপারেশন সাকশেসফুল। রাগে তখন আমার হাত-পা কাঁপছে। লোকটা বেরিয়ে আসতেই আমি আড়াল থেকে গুলি করলাম লোকটাকে। ইচ্ছে ছিল পায়ে গুলি করবার। তা হলে লোকটা ধরাও পড়ত, ওকে মোচড় দিয়ে অনেক কথাও বার করা যেত। কিন্তু এই প্রথম টার্গেট তো আমার। আর গুলি ছিল মাত্র একটাই। পায়ে গুলি করতে গিয়ে যদি গুলিটা ফসকে যায়, তাই বডি লক্ষ্য করেই গুলি করেছি।

বেশ করেছ। কিন্তু তুমি ভয়ানক রিস্ক নিয়েছ। যদি ওরা পালটা গুলি করত তোমাকে, তা হলে তুমি কী করতে?

হয় পালাতাম, নয় মরতাম।

স্বপ্না আর রিয়া চোখদুটো বড় বড় করে বলল, ওরে বাবা! তুমি যে দেখছি ক্ষুদে রবিনহুড।

মা বললেন, তাই তো দেখছি। নাও, এবার হাতমুখ ধুয়ে একটু কিছু মুখে দাও।

বাসববাবু বললেন, হ্যাঁ, সেই কোন সকালে বেরিয়েছ। এবার জলটল খেয়ে বিশ্রাম নাও। আমি না বলা পর্যন্ত এখন স্কুলে যাবার দরকার নেই। এই বলে নীহারবাবুকে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হলেন।

মা বললেন, দুটো খেয়ে গেলে হত না?

দেরি হয়ে যাবে।

বাসববাবু চলে গেলেন। যেতে তো হবেই। অপরাধীদের ধরার ব্যাপারে এখুনি তৎপর না হলে মুখ দেখানো যাবে না। এমনিতেই রাজ্যের বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিগুলো নিয়ে পুলিশ দফতর হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। শুধু বাজে কাজ করতে গিয়েই সময় নষ্ট হচ্ছে কত। এরপর আছে ফুটপাত হকারমুক্ত করা। সকালে তাড়াও, বিকেলে আবার ঠিক বসে যাবে। পাবলিক যদি সাপোর্ট করে তো, রাজনৈতিক নেতারা বিরোধিতা করে। ঠিক কোনও-না-কোনও দাদা দাঁড়িয়ে যাবে ওদের হয়ে। তারপর আছে বেআইনি বাড়ি ভাঙা, যেখানে সেখানে

গজিয়ে ওঠা মন্দির ভাঙা। মন্দির একটা গজাল তো পুজো দেবার সে কী ধুম। প্রতিরোধ করতে কেউ এগিয়ে আসবে না। কিন্তু গালাগালি দেবার সময় চায়ের দোকানে বসে ধুয়ে দেবে প্রশাসনকে। সব ক্ষেত্রে সকলের যেমন করবার কিছু থাকে না, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই তো এগিয়ে আসা যায়। দুঃখের বিষয় আসবে না কেউ। আর এই সব ডামাডোলের ভেতর দিয়েই চলতে থাকবে আরও অন্য অসামাজিক কার্যকলাপ। মাথাচাড়া দেবে মগ্ন মৈনাকের মতো কার্লস জ্যাকলের দল। জীবন বিপন্ন হবে বাসববাবুদের। ওদের কথা কেউ ভেবেও দেখবে না। ওরা হবে যূপকাষ্ঠের বলি। অপরাধ? ওরা যে পুলিশ।

পাঁচ

বাসববাবু চলে গেলেন। মা যে কখন কোন ফাঁকে ঠাকুরের মানসিক করে ফেলেছিলেন তা কে জানে? হিরণের কপালে একটা টাকা ঠেকিয়ে ঠাকুরের জায়গায় রেখে এসে মেতে উঠলেন ছেলেকে নিয়ে। তারপর স্বপ্না আর রিয়ার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ছেলের জন্য এটা ওটা সেটা কত কী করতে লাগলেন।

হিরণ বাথরুমে ঢুকে ভাল করে মুখহাত ধুয়ে, ধপাস করে ওর বিছানায় এসে দেহটা এলিয়ে দিল। কুখ্যাত লোকগুলোর একটাকেও যে খতম করতে পেরেছে, এতেই ওর আনন্দ।

রিয়ার মা কাল সন্ধ্যাবেলা চলে গেছেন।

স্বপ্নার মা এলেন একটু পরে। সব শুনেটুনে কত বোঝালেন হিরণকে। বললেন, তুমি এখন ছেলেমানুষ বাবা। বড়দের কাজ কি তোমাকে সাজে?

হিরণ বলল, ছেলেমানুষ হলেও বালক তো নই। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। তা ছাড়া আমার বাবা যেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন, সেখানে তাঁর ছেলে হয়ে আমি কী করে নীরব থাকি?

বুঝলাম। কিন্তু তোমার বাবা এইসব কাজে অভ্যস্ত। তুমি তো নও। তা ছাড়া যে কাজ তোমার বাবা করে থাকেন সে কাজ করার আইনগত অধিকারও তোমার নেই।

আজ আমার হাতেখড়ি হল।

মা বললেন, শুনেছ ছেলের কথা, এতটুকু ভয়ডর নেই।

হিরণ বলল, ভয় কী। আঘাতের পালটা আঘাত না করলে ওরা আমাদের দুর্বল ভাববে।

রিয়া বলল, এর বদলাও তো নিতে পারে ওরা।

তা অবশ্য পারে। কিন্তু ওদের কিছু না করেও আমরা ওদের টার্গেট হয়ে গেছি বলেই অতটা রিস্ক নিয়েছিলাম। বাপি সব সময় আইন মোতাবেক কাজ করেন। কিন্তু তাতে করে আইনের অনেক ফাঁকও থেকে যায়। ফলে ওই সব কালপ্রিটদের সহজে টিট করা যায় না। ওদের জন্যে যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হওয়া দরকার। কার্লস জ্যাকলটাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল। না হলে ও ভেবেছিল যা খুশি তাই করে যাবে।

মা বললেন, এবার তোমাকেও একটু শিক্ষা দেওয়ার দরকার। দিন কতকের জন্যে তোমাকে মামার বাড়িতে না পাঠালে দেখছি চলছে না।

রিয়া বলল, ওর মামার বাড়ি কোথায়?

চন্দননগরে।

তাতে আর লাভ কী হবে, একটু দূরে বরং কোথাও সরিয়ে দিন।

দূরে কোথায় পাঠাব? ওর বাবা অবশ্য বলছিল কিছুদিনের জন্যে কাশী চলে যেতে। কিন্তু এখানকার যা অবস্থা তাতে ওর বাবাকে ছেড়ে এক-পাও যেতে আমার মন চাইছে না।

রিয়া উল্লসিত হয়ে বলল, হিরণদাকে তা হলে আমাদের চিত্তরঞ্জনেই নিয়ে যাই না কেন?

স্বপ্না বলল, সেটা হলে কিন্তু মন্দ হয় না। হিরণদাও ওদের জিম্মায় রইল, আর আপনিও কাকাবাবুর দেখাশোনা করতে পারবেন। হিরণদা চিত্তরঞ্জনে থাকলে ইচ্ছামতো ফোনেও যোগাযোগ করতে পারবেন।

মা রিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ফোন আছে?

আমাদের নেই। তবে পাশের বাড়িতে আছে। ওরা খুব ভাল লোক।

স্বপ্নার মা বললেন, সেই ভাল। হিরণকে ওদের ওখানেই পাঠিয়ে দিন। ওর বাবা এলে আলোচনা করে দেখুন, উনি কী বলেন।

উনি এক কথায় রাজি হয়ে যাবেন। কেন না, উনি মোটেই চান না ছেলেটা এখানে থাকুক। তবে কথাটা যেন পাঁচকান না হয়।

না না কেউ জানবে না।

রিয়ার আনন্দ ধরে না। হিরণদাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যাবার আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সে। আনন্দের আতিশয্যে বলল, তুমি কিন্তু এই ব্যাপারে গোঁয়ার্তুমি কোরো না যেন।

হিরণ বলল, চিত্তরঞ্জনে হলে যেতে রাজি আছি। অন্য কোথাও নয়। শুনেছি তোমাদের চিত্তরঞ্জনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি খুব ভাল। মনে মনে ওই জায়গায় বেড়াতে যাবার স্বপ্নও দেখেছি কত।

তুমি যদি যাও, তোমাকে নিয়ে চারদিক ঘুরে বেড়াব আমি। তোমাদের কলকাতার চেয়ে ঢের ভাল জায়গা। এমন দম বন্ধ হয়ে আসে না!

সবই তো বুঝলুম। কিন্তু তুমি এখানে কতদিন পরে এলে, আসতে-না-আসতেই চলে যাবে, তা কি ঠিক? স্বপ্নারা কী ভাববে?

স্বপ্না বলল, তাতে কী হয়েছে। তোমার এমন বিপদ। এই বিপদে যদি কিছু দিনের জন্যে তোমাকে একটু সেল্টার দেওয়া যায় তো মন্দ কি? তা ছাড়া তুমি তো আজই যাচ্ছ না।

রিয়া বলল, সত্যি বলতে কী, এখানে আমার একটুও ভাল লাগে না। স্বপ্নাকে দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল, অনেকদিন দেখিনি বলেই এসেছিলাম। এখন দেখাশোনা হয়ে গেছে তাই আজ গেলেও ক্ষতি নেই, কাল গেলেও না।

স্বপ্না বলল, বেশ মেয়ে তুই।

আমাকে ভুল বুঝিস নারে। আসলে কী জানিস, আমাদের বাড়িতে কেউ যাবে বললে আমার খুব আনন্দ হয়। তুইও তো যেতে পারিস আমাদের সঙ্গে।

আমি আবার কেন তোদের মাঝখানে বাধা হই!

এটা তোর অভিমানের কথা।

হিরণ বলল, ঠিক আছে বাবা আমি কোথাও যাচ্ছি না। ঘরেই থাকছি আমি। কারও মান-অভিমানের দরকার নেই।

স্বপ্না বলল, মান-অভিমানের কী আছে?

নেই যদি তো বাধা হই কথাটা বললে কেন?

ও এমনি কথার কথা।

রিয়া বলল, মোটেই না। তুই এমনভাবে বললি যেন মনে হচ্ছে তোর হিরণদাকে আমি কেড়ে নিচ্ছি।

সে ভাবে আমি বলিইনি।

তোর কথার তো তাই মানে হয়। হিরণদা আমাদের ওখানে কতদিন থাকবে বল? খুব জোর পনেরো দিন কি একমাস। আরও বেশি হলে আর একটা মাস। তার বেশি তো নয়। তুই হিরণদাকে সব সময় পাবি। পাশাপাশি বাড়ি তোদের। রোজ দেখবি, কথা বলবি, যেখানে খুশি যাবি। আমি দূরে থাকব। কিছুদিন পরে তোরা আমার কথা ভুলেই যাবি।

ওদের রকম দেখে মায়েরা হেসেই অস্থির।

চিত্তরঞ্জনে যাবার প্রসঙ্গ আসতেই হঠাৎ করে যেন আবহাওয়ার মোড়টাই ঘুরে গেল। খুন, জখম, ডাকাতি, রাহাজানি, ফোনাতঙ্ক, কাটা মুণ্ডু, কার্লস জ্যাকল সব উড়ে গেল কোথায়। এক লহমায় নিম্নচাপের ঘূর্ণিঝড়ে যেমন গুমোট গরম কেটে যায়, তেমনিই ঠান্ডা হয়ে গেল আবহাওয়াটা।

মা বললেন, এদিকে মুখে সব বড় বড় কথা। আমরা কি আর ছোটটি আছি? অথচ ঝগড়া করছে দেখো, ঠিক ছেলেমানুষের মতন।

স্বপ্নার মা বললেন, আসলে রিয়াকে ও দারুণ ভালবাসে। ওকে পেয়ে মেয়েটা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল।

রিয়া বলল, সেই জন্যেই তো বলছি ওকেও আমাদের সঙ্গে যেতে। সবাই মিলে বেশ হইচই করে ঘুরে বেড়াব।

মন্দ কী? তবে আমাকে ছেড়ে এক রাতও কখনও থাকেনি ও। যদি থাকতে পারে যাক।

মা বললেন, ওমা, সে কী! বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তা হলে কী করবে? এখন থেকে অভ্যেস করুক।

হিরণ বলল, আপনিও তা হলে সঙ্গে চলুন?

আমি! আমি কী করে যাব বাবা? আমি কখনও হুট করতেই ঘর-সংসার ফেলে রেখে যেতে পারি? আমার যাওয়া হবে না!

রিয়া স্বপ্নাকে বলল, কীরে! যাবি তুই?

স্বপ্না ছোট্ট করে বলল, দেখি।

হিরণ বলল, দেখি কেন? মায়ের জন্যে মন কেমন করবে? ওই একই প্রবলেম আমারও। তুই তো জানিস, আমিও কখনও মাকে ছেড়ে থাকিনি।

স্বপ্নার মা বললেন, এদিক থেকে রিয়া কিন্তু অন্যরকম। ও সবাইকে ছেড়ে থাকতে পারে। স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে তো প্রায়ই এখানে ওখানে চলে যায়। একবার তিনদিনের জন্যে গিরিডি যাচ্ছি বলে সেই যে গেল, এক সপ্তা কাটিয়ে এল। ওর মা-বাবা তো ভয়েই মরে। ওর ওসবে হেলদোল নেই।

স্বপ্নার মা এরপর আরও অনেকক্ষণ রইলেন এ বাড়িতে। তারপর চলে গেলেন।

স্বপ্না ও রিয়াও গেল। যাবার সময় হিরণ ওদের দু'জনকেই বলল, দুপুরে এলে কিন্তু খুশি হব। যাওয়ার ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা করা যাবে।

স্বপ্না একটা ভেংচি কাটল।

রিয়া বলল, ভাল দেখে একটা গল্পের বই রাখবেন।

মা বললেন, বেশ মেয়েটি।

হিরণ বলল, কার কথা বলছ মা?

রিয়ার কথা বলছি। মেয়েটা যেমন দেখতে তেমনি মিশুকে। ওর মা-টাও খুব ভাল। এখন দেখি তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে, উনি রাজি হন কি না।

রাজি না হবার কী আছে? তুমিই তো বললে বাপি চান আমি কিছুদিন দূরে কোথাও থাকি। সেই হিসেবে চিত্তরঞ্জন কিন্তু আইডিয়াল প্লেস। যাই না,

দিনকতক ঘুরেই আসি। তোমরা একটু সাবধানে থেকো।

মা বললেন, থাক, আর পাকামো করতে হবে না। আসলে যা শত্রু পেছনে লেগেছে তাতে ওরা যে চিত্তরঞ্জনেও গিয়ে হাজির হবে না তাই বা কে বলতে পারে? ভয়টা তো সেইজন্যেই। তার ওপরে আজ যা করে এলি তুই—।

তবে মা, হাত আমার খুলে গেছে। ফের যদি ওইরকম কিছু দেখি তো সব ক'টাকে শেষ করে দেব।

খুব বাহাদুর। বেঁচে যদি থাকি, তোমাকে তোমার বাবার মতন পুলিশের চাকরি আমি করতে দেব না।

হিরণ হেসে বলল, তুমিও জেনে রেখো, বড় হয়ে চাকরিই যদি আমি করি, তা হলে পুলিশের চাকরিই করব।

পুলিশের চাকরির ওপর তোমার এত দুর্বলতার কারণটা একবার জানতে পারি কি? সরকারি ক্ষমতা হাতে নিয়ে দুর্বল মানুষের মাথায় ডান্ডা মারবার অধিকারটা অর্জন করবে বলে নিশ্চয়ই?

হিরণ বলল, তুমি ভুল বুঝেছ মা। পুলিশের লোক কি সবাই খারাপ? আমার বাপিও তো একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার। তাঁর সম্বন্ধেও কি তোমার ওই একই ধারণা? স্বীকার করছি পুলিশের ভেতর অনেক খারাপ লোক আছেন, কিন্তু আমরা জনসাধারণও কি সবাই খুব ভাল? সাধুর দলে কি চোর নেই? কোনও কিছুর মধ্যেই শুধু খারাপ দিকটা দেখো না, ভাল দিকটাও দেখো। একজন ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'পয়সা ঘুষ খেলে সেই অন্যায়টা তোমরা দেখো, কিন্তু জ্যৈষ্ঠের দুপুরে 'লু' মাথায় নিয়ে তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টটা তোমরা দেখো না।

মা বললন, তুই থামবি? ভাল কাজ করলেও পুলিশের কাজে জীবনের ঝুঁকি কত তা কি তুই জানিস না?

জানি বলেই তো বলছি মা, জনগণের সেবা করবার এত বড় মাধ্যম আর কোন কাজে আছে বলো? তাই, আমি শুধু পুলিশ অফিসার না, পুলিশ কমিশনার হবার স্বপ্ন দেখি। তোমাদের আশীর্বাদে তা যদি হতে পারি, তা হলে দুর্নীতি কী করে দমন করতে হয়, আমি দেখিয়ে দেব।

মা বললেন, কী যে আছে আমার কপালে, তা কে জানে? বলে গৃহকর্মে মন দিলেন।

হিরণও আর কোনও কথা না বলে ওর বহুবার পড়া পাণ্ডব গোয়েন্দার একটা খণ্ড নিয়ে পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তেই মনটা আবার অন্যরকম হয়ে গেল তার। কত কী যে মনে এল, তার আর শেষ নেই। মনে মনে নানারকম ফন্দিফিকিরও আঁটল। তারপর একসময় ঘুম নেমে এল দু' চোখ জুড়ে।

ছয়

স্বপ্না আর রিয়া এল দুপুরবেলা। হিরণ তখন ক্যাসেটে গান শুনছে। আজ খুব জোর খাওয়াদাওয়া হয়েছে। মা ছেলের জন্যে কত কী যে করেছিলেন তার ঠিক নেই। আসলে হিরণ যে আবার ফিরে আসবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। বিশেষ করে বাবা-মা অশুভ আশঙ্কাটাই করেছিলেন বেশি। তাই ছেলেকে ফিরে পেয়ে মায়ের আনন্দের কি শেষ ছিল? ছেলে যা যা খেতে ভালবাসে মা তার সব কিছুই করেছিলেন।

স্বপ্না আর রিয়া ঘরে আসতেই হিরণ উল্লসিত হয়ে বলল, এই ক্যাসেটটা ক'দিন হল কিনেছি। কেমন? ভাল না?

রিয়া বলল, খুব ভাল। তা বলছিলাম কী হিরণদা, তুমি তো গল্পের বইয়ের পোকা। কিন্তু তুমি যে এমন সংগীতরসিক তা তো আগে জানতাম না।

হিরণ হেসে বলল, সংগীতরসিক মানে ফিল্মি সংগীতের রসিক, অন্য গানের নয়।

সে যাই হোক, গান গানই। কিন্তু তোমাকে যে বলেছিলাম আমার জন্য বই রাখতে, রেখেছ?

উঁহু। বই তুমি বেছে নেবে। বলেই বুক সেলফের কাছে গিয়ে চাবিটা খুলে বলল, এই দ্যাখো কত বই।

বই দেখে তো অবাক হয়ে গেল রিয়া।

স্বপ্না অবশ্য চোখ কপালে তুলল না। কেন না ও তো সবই জানে। হিরণের কেনা প্রায় সমস্ত বই-ই ওর পড়া।

রিয়া বলল, এত বই তোমার।

এর ভেতর থেকে তোমার যে বই ইচ্ছে নাও।

স্বপ্না বলল, পাণ্ডব গোয়েন্দা পড়।

পাণ্ডব গোয়েন্দা আমার সব পড়া। শুকতারায় পড়েছি, আনন্দমেলায় পড়েছি, বই কিনেছি, প্রাইজ পেয়েছি, এক একটা বই দশবার করে পড়েছি। বলেই বইয়ের তাক থেকে দুটো বই টেনে বার করে নিল। একটা হল 'সেরা রহস্য পঁচিশ' আর একটা 'সোনার গণপতি হিরের চোখ'।

স্বপ্না বলল, এই বইদুটো তুমি কবে কিনলে?

এই তো পয়লা বৈশাখে।

স্বপ্না রিয়ার হাত থেকে সোনার গণপতি টেনে নিয়ে পড়তে বসে গেল।

রিয়া বলল, তা হলে হিরণদা, যাবার ব্যাপারে আর কোনও দ্বিমত নেই তো?

আছে। স্বপ্না না গেলে আমি যাব না।

স্বপ্না বলল, আমি কোন দুঃখে যাব? আমার পেছনে কি কার্লস জ্যাকল ছুরি নিয়ে ঘুরছে?

হিরণ বলল, দ্যাখ স্বপ্না, ঘুসি মেরে তোর পিঠ আমি ভেঙে দেব। একসঙ্গে দু'জনে পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। দু'দিন বাদে বদলি হলে কোথায় চলে যাবি তার ঠিক কি? হইহুল্লোড় করবার এখনই তো সময়। এমন মওকা কিন্তু আর আসবে না। তাই বলি এই চান্স ছাড়িস না কিন্তু। তা ছাড়া তুই গেলে ভালই হয়। মনে একটু জোর পাই।

দেখি বাড়িতে বলে। ছাড়ে কি না, দু'-একদিনের জন্য তো নয়।

বেশ তো অসুবিধে থাকে দু'-একদিনই থাকবি।

তুমি তো বললে, তারপর দিতে আসবে কে?

আমি না হয় পৌঁছে দিয়ে যাব?

স্বপ্না হাসল।

রিয়া বলল, ও না যাক। তুমিই চলো হিরণদা। যাবার আগে একটু গোছগাছ করে নাও। তোমার জামাপ্যান্ট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যা কিছু সব নিয়ো। তার সঙ্গে এই সব গানের ক্যাসেট আর বাছাই করা খানকতক বই। আমাদের পরিবেশে কিছুদিন থাকলে আর তোমার এখানে আসতে ইচ্ছে করবে না।

হিরণ বলল, তোমাদের ওখানে পাহাড় আছে?

ছোটখাটো টিলা আছে দু'-একটা। তবে পাহাড় আছে কাছাকাছিই। গিরিডি, দেওঘর, শিমুলতলা, চারদিকে পাহাড়। ওখান থেকে বহুদূরে পাহাড়ের রেখা দেখা যায়।

হিরণ বলল, আমি যাব। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। আর এও জেনে রেখো, আমি বেশ তৈরি হয়েই যাব। কার্লস জ্যাকলের ছায়াও যদি ওখানে গিয়ে হাজির হয় তা হলে তাকেও আর ফিরে আসতে হবে না।

রিয়া বলল, মধুপুরে আমার মাসিমার বাড়ি। সেখানে গেলে বাগান দেখবে কাকে বলে। কত যে ফুলগাছ রয়েছে সেখানে, তার যেন শেষ নেই। তুমি আপনমনে ঘুরবে অর আমি লক্ষ করব কেউ তোমাকে টার্গেট করছে কি না। যদি করে তুমি অমনি তাকে ডিস্যুম করে দেবে। আচ্ছা হিরণদা তুমি আমাকে ওটা শিখিয়ে দিতে পারো না? ওই পিস্তল চালানোর ব্যাপারটা।

নিশ্চয়ই পারি। ও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। পিস্তল চালাতে যে কেউ পারে। তবে বাপি কি ওটা সঙ্গে রাখতে দেবেন?

কেন, দেবেন না কেন? তোমার আত্মরক্ষার জন্য ওটা তো অবশ্যই দেওয়া উচিত।

হিরণ বলল, ও জিনিস কাছে থাকলে আমি যমকেও ডরাই না।

রিয়া বলল, তুমি গেলে আমার বাবা-মা দারুণ খুশি হবেন। কবে যাবে তুমি?

যেদিন তুমি নিয়ে যাবে।

তোমার বাবা যদি ছাড়পত্র দেন তা হলে কালই আমি নিয়ে যাব তোমাকে।

কাল কখন যাব আমরা?

যখন মনে করবে। সকালে ব্ল্যাকডায়মন্ড ধরে আসানসোলে নেমে আমাদের ওখানে যেতে পারো। যে কোনও লোক্যাল ট্রেনে বর্ধমান হয়েও চিত্তরঞ্জন যাওয়া যায়। একটু বেলায় দশটা নাগাদ তুফান আছে। আর আছে অজস্র গাড়ি।

স্বপ্না তখন একমনে 'সোনার গণপতি হিরের চোখ' পড়ছিল। এবার বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে বলল, আর কাকাবাবু যদি মত না দেন?

তা হলে যাব না। অবশ্য সেইসঙ্গে রিয়াবাবুকেও যেতে দেব না।

রিয়া তো হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, কী কাণ্ড! আমি আবার বাবু হলাম কবে থেকে?

আজ থেকেই। চিত্তরঞ্জনে যাওয়া যদি না হয় তা হলে এখন থেকেই তুমি আমার সহকারী হিসেবে কাজ করবে। অবশ্য তোমার হাতেও একটা পিস্তল যাতে তুলে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থাও আমি করব। কার্লস জ্যাকল লালবাজারে কী রাহাজানি করেছে, তার ডবল রাহাজানি আমি ওর ওপরেও করব।

রিয়া বলল, সত্যিই তুমি আমাকে পিস্তল ধরাবে?

নিশ্চয়ই। তোমাকে আমি কিশোরী ফুলনদেবী করে ছাড়ব। বাপি রাজি না হলেও নীহারকাকুকে ধরে তোমার আমার জন্যে দুটো পিস্তল আমি জোগাড় করবই।

আনন্দে যেন খুশির বন্যা বয়ে গেল রিয়ার হৃদয়ে। আর স্বপ্না?

হঠাৎ সে বই মুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আসি রে। তোরা গল্প কর। বলেই দ্রুত চলে গেল ঘর থেকে।

রিয়ার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, কী হল হিরণদা? সপুটা ওইভাবে চলে গেল কেন? মনে হল যেন ওর খুব রাগ হয়েছে?

হিরণ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আসলে ব্যাপারটা কী জানো? ও বোধহয় মনে মনে চায় না, আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের ওখানে যাই।

রিয়ার চোখদুটো জলে ভরে এল। বলল, এই যদি হয় তা হলে আর আমার এখানে না থাকাই ভাল। আমি আজই চলে যাব এখান থেকে।

সে কী! আমাকে নিয়ে যাবে না?

তোমার জন্যই তো এত কাণ্ড। তোমাকে নিয়ে গেলেই ওর চোখ টাটাবে। যখন থেকে তোমাকে নিয়ে যাব বলেছি, তখন থেকেই ও উলটোপালটা বকছে।

ও এত সেন্টিমেন্টাল তা জানতাম না।

রিয়া এবার ছুটে গিয়ে হিরণের বিছানায় উপুড় হয়ে ওর বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল।

হিরণ বলল, আর কাঁদতে হবে না। আমি কালই যাব তোমাদের বাড়ি। তুমি এক কাজ করো, তোমার মনের মতন কতকগুলো বই আর প্রিয় গানের ক্যাসেট কিছু আমার এই সুটকেসে গুছিয়ে নাও দেখি? বলে একটা চামড়ার সুটকেস এগিয়ে দিল ওর দিকে।

এতক্ষণে কাজ হল। চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল রিয়া। ওঃ। কী মেয়েরে বাবা। এরই মধ্যে ফর্সা মুখ কেঁদে লাল করে ফেলেছে।

রিয়া সুটকেসটা টেনে নিয়ে বই আর ক্যাসেট গোছাতে গোছাতে বলল, নেহাত তুমি যাচ্ছ তাই। না হলে এখুনি আমি চলে যেতাম।

একা তুমি যেতে পারতে?

না পারবার কী আছে? কাল যখন তোমাকে নিয়ে যাব, তখন দেখবে পারি কি না।

হিরণ একদৃষ্টে রিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ওর কর্মতৎপরতা। স্বপ্না একটু আগে অভিমান করে চলে গেছে। দরজাটা খোলা আছে তাই। ও সেটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল, মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু এ কী! ছাদে ওঠার সিঁড়ির ধাপে পরম নিশ্চিন্তে গালে হাত দিয়ে বসে থাকা গোঁফ-দাড়ি ভুরুহীন ন্যাড়া মাথা বানরাকৃতি ওই লোকটা কে? চার ফুটের একটুও বেশি হবে না লোকটা। পরণে হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি। হিরণের চোখে চোখ পড়তেই কুতকুতে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। কী সাহস! একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু কী হিংস্র ওর চাহনি। মুখে হাসি, চোখে বিষ।

হিরণ বলল, কে তুমি?

লোকটি তেমনই হেসে বলল, বন্ধু। তারপর আবার খিক খিক হাসি। ভয় নেই, ডর নেই। যেন এটা ওর নিজেরই বাড়ি।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল হিরণের। বলল, কার হুকুমে তুমি বাড়ির ভেতর ঢুকেছ?

রিয়া তখন দরজার কাছে। ওর দু'চোখে বিস্ময়। বলল, ও কে হিরণদা?

জানি না। মাকে একবার ডাকো তো?

লোকটি ধূর্তর হাসি হেসে বলল, মাকে এখন হাজার ডাকলেও উঠবে না। এ ঘুম সহজে ভাঙবে না ভাই।

তার মানে ঘরে ঢুকেই ক্লোরোফর্ম ইউজ করেছ তুমি, তাই না?

লোকটি আবার সেই গা জ্বালানো হাসি হাসতে লাগল।

হিরণ বলল, শয়তান!

লোকটি বলল, কোথায় পালাবার মতলব হচ্ছিল?

সে জেনে তোমার লাভ।

লাভ আছে বইকী ভায়া। তোমার ওপর নজর রাখার ডিউটিই যে আমার। তুমি স্বর্গে গেলেও আমাকে তোমার পিছু পিছু যেতে হবে, আবার নরকে গেলেও তাই।

সেই জন্যেই বুঝি তুমি এখানে এসেছ?

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিক তাই। অনেকক্ষণ ধরেই বাড়ির ভেতর ঢোকবার চেষ্টা করছিলুম। হঠাৎ সুযোগ মিলল। একটি মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই আমিও সুট করে ঢুকে পড়লাম। ভাগ্যে তোমরা দরজায় খিল দাওনি। না হলে কী অসুবিধেই যে হত।

কিন্তু তুমি কি জানো, বাঘের ঘরে ঢুকেছ তুমি?

কই না তো। বাঘের ঘর তো চিড়িয়াখানায়। তা ছাড়া বাঘের ঘরে বাঘের গায়ের বোঁটকা গন্ধ ছাড়ে। এখানে তো মিষ্টি গন্ধ। ফুলদানিতে ফুল। এমন একটি মিষ্টি মেয়ে। কী নাম গো তোমার? মিষ্টি মেয়েটি? ভারী মিষ্টি মিষ্টি গোলাপি গন্ধ ছাড়ছে তোমার গা থেকে।

হিরণ বলল, ওর নাম যাই হোক, তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদেয় হও মি. মাংকি। না হলে ফল কিন্তু ভাল হবে না।

লোকটি হেসে বলল, আরে আমাকে বাঁদরের মতন দেখতে হলে কী হবে, আমার নাম মি. মাংকি নয়। মংপু।

আই সে ইউ গেট আউট।

এত সহজে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না ব্রাদার।

যাবে না?

না। আমি যে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

ভুল করেছ। তুমি কি করে ভাবলে যে, আমি তোমার মতন একটা কিম্ভূতকিমাকারের সঙ্গে আলাপ করব?

লোকটির চোখদুটো এবার জ্বলে উঠল দপ করে। কঠিন গলায় সে বলল, আমার হাতে সময় খুব কম। আর আলাপ করবার মতো পরিবেশও এটা নয়। আমার গাড়ি আছে। চলো, দু' বন্ধুতে কাছাকাছি কোনও পার্কে বসে একটু দোস্তি করে আসি।

হিরণ বলল, বেশ, তা হলে একটু দাঁড়াও জামাটা ছেড়ে আসি আমি।

মংপু শয়তানের হাসি হেসে বলল, বেশি দেরি করো না কিন্তু।

রিয়া ভয়ার্ত স্বরে বলল, না তুমি যেয়ো না। যেতে পাবে না। ওর চোখদুটো

দেখছ না। ও নিশ্চয়ই কার্লস জ্যাকলের লোক। তোমাকে ও দোস্তি করবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে না। তোমাকে খুন করবার মতলব নিয়েই ও এসেছে।

হিরণ বলল, আমি জানি। তুমি আর এখানে থেকো না রিয়া। আমার জন্যে তুমিও কেন বিপদে পড়বে। তাই আমি বলি কী, তুমি এখুনি ঘরে যাও। বলেই রিয়াকে ইশারা করল হিরণ।

রিয়া আর কোনও কথা না বলে মাথা হেঁট করে দরজার কাছে যেতেই মংপু বাধা দিল ওকে। বলল, যাচ্ছো কথায় মিষ্টিমুখী। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ওকে নিয়ে বাইরের দরজায় শিকল দিয়ে চলে গেলে লোকজন ডেকে দরজা খুলিয়ে যা ইচ্ছে করবে। এখন এক-পাও এগোবে না।

হিরণ ততক্ষণে জামা ছাড়বার অছিলায় ঘরে ঢুকেই পিস্তলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। শুধু পিস্তল নয়, গুলিও নিয়েছে একাধিক। যে ভাবেই হোক মনুষ্যরূপী এই মর্কটটাকে খুন না-করে ও ছাড়বে না। কিন্তু ট্রিগারে হাত দিয়েই চমকে উঠল ও। দেখল সেই বেঁটেখাটো পিশাচটার হাতেও একটা রিভলভার রয়েছে। সাপের চোখের মতো তাকিয়ে লোকটা এমন হিস হিস করে হাসছে যা দেখে গা জ্বলে গেল। তার ওপরে লোকটা রিয়াকে এমনভাবে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তার গায়ে রিভলভারের নলটা ঠেকিয়ে রেখেছে যে কোনও ভাবেই ওকে গুলি করা যাবে না।

হিরণকে আশাহত দেখে মংপু বলল, রং টার্গেট হয়ে গেল বন্ধু। ভেবেছিলে তুমি খুব চালাক, জামা ছাড়বার অছিলায় ঘরে ঢুকে পিস্তলটা বার করে এনে আমাকে সাবাড় করে দেবে। হাতের কাছে ভাগ্যিস মেয়েটা ছিল, না হলে হয়েছিল আর কী। হিরণ বলল, তোমার অনুমান ঠিক। তবে তুমিও দেখছি ধড়িবাজ কম নয়।

মংপু বলল, যদি এই মেয়েটার কোনওরকম ক্ষতি না চাও তা হলে এখুনি ফেলে দাও ওটা।

রিয়া চিৎকার করে বলল, না। কখনও ও কাজ করো না হিরণদা। ও আগে আমাকে ছাড়ুক। তারপর দেবে।

মংপু বলল, ঠিক আছে। আজ হাতে বেশি সময় নেই। আর রিস্কটাও একটু বেশি রকম নেওয়া হয়েছে। আজ এই মিষ্টিটাকেই নিয়ে যাই। কাল তোমাকে নিয়ে যাব। কখন কোথায় তুমি থাকবে সেটা ফোনেই জানাব। বলে রিয়াকে শক্ত করে ধরে এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে লাগল মংপু।

হিরণ বললে, ওকে ছেড়ে দাও। ও আমাদের বাড়ির মেয়ে নয়। আমাদের পরিবারেরও কেউ নয়। আমি আজই যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

পিস্তলটা তা হলে আমার দিকে ছুড়ে দাও।

এর ভেতরে গুলি পোরা আছে মূর্খ। যদি ফসকায় তো আমাদের তিনজন এখুনি দু'জন হয়ে যাব। বলে পিস্তলটা ও মেঝেয় শুইয়ে রাখল।

আর সেই মুহূর্তেই মংপু এক ধাক্কায় রিয়াকে ফেলে দিয়ে বাঁহাতে হিরণের জামার কলারটা ধরে ডান হাতে ওর গালে টেনে একটা চড় মারল। তারপর ওকে শক্ত করে টিপে ধরে ওর নাকে একটা রুমাল চাপাতেই একটুক্ষণ ছটফটানি। পরক্ষণেই সব স্থির।

মংপুর ধাক্কার বেগ সামলাতে না-পেরে দেওয়ালে চোট লেগে মাথাটা ফুলে উঠেছে রিয়ার। যা জোর লেগেছে তাতে ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। কী ভাগ্যিস ফেটে যায়নি এই ঢের। কিন্তু এই মুহূর্তে ও যে কী করবে, তা ভেবে পেল না। তবুও বিপদকালে উপস্থিত বুদ্ধিটা হারাল না ও। মেঝের ওপর নামিয়ে রাখা হিরণের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে গেল। বেঁটে শয়তানটা পা দিয়ে সরিয়ে দিল পিস্তলটা। এত জোরে সরাল যে সেটা সিঁড়ির ধাপে লাগতেই সশব্দে একটা গুলি ছিটকে এসে পায়ে লাগল রিয়ার। রিয়া আর্তনাদ করে উঠল। হিরণ এতক্ষণ অজ্ঞান হওয়ার ভান করে নেতিয়ে পড়েছিল মংপুর কাঁধের ওপর। এইবার দু'হাতে ওর গলা টিপে এমনভাবে ঝুলে পড়ল পেছন দিকে যে, ওর পক্ষে তা শ্বাসরোধকারী হয়ে উঠল।

ততক্ষণে রিয়াও বুঝে গেছে এবার ওকে কী করতে হবে। সে ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে টেবিলের ওপর থেকে ফুলদানিটা পেড়ে এনে সজোরে এক ঘা মাথার ওপর বসিয়ে দিতেই রক্তাক্ত মংপু লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

রিয়া বলল, হিরণদা তুমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে! তুমি কী করে গলায় চাপ দিলে ওর?

হিরণ বলল, ওর হাতের চড় খেয়ে বদনচন্দ্র বিগড়ে গিয়েছিল অবশ্য, তবে যে মুহূর্তে ও আমার নাকে রুমাল চেপে ধরেছিল সেই মুহূর্তে আমি নিশ্বাস বন্ধ করে অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, আর আমিও ওর সঙ্গে গিয়ে ঘাঁটিটা ওদের দেখে আসব। কিন্তু তোমার পায়ে গুলি লাগায় আর আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। এখন এসো এটাকে দু'জনে মিলে সজোরে বেঁধে ফেলি।

তারপর?

তারপর জ্ঞান ফিরলে মারের চোটে ভুবন অন্ধকার করে দেব ওর। কার্লস জ্যাকলের ঘাঁটির সন্ধান ওর কাছ থেকেই পাব। সব জেনে নিয়ে ওরই কাটা মুণ্ডু উপহার পাঠাব কার্লস জ্যাকলকে। ওকে বুঝিয়ে দেব চোরের ওপর বাটপাড়ি কী করে করতে হয়। হিরণ আর একটুও দেরি না করে রিয়ার সাহায্য নিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল মংপুকে।

রিয়া বলল, দেখো হিরণ, এর ওপর বলপ্রয়োগ করতে আর আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। তবে কিনা এর কাটা মুণ্ডু কাউকে উপহার পাঠাবার তো দরকার নেই। যে অপরাধের জন্যে কার্লস জ্যাকল কুখ্যাত হয়েছে সেই একই অপরাধ আমরা কেন করব? তার চেয়ে বরং তোমার বাপির হাতেই তুলে দেব একে। উনি একে জেলের ঘানি টানাবেন।

হিরণ বলল, এদের আটকে রাখবে এমন কোনও জেলখানা এখনও তৈরি হয়নি রিয়া। এদের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে একেবারে নাশ করা। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। আপাতত চলো একে কয়লা-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখি।

সিঁড়ির নীচেই একটা ঘরে ঘুঁটে কয়লা ইত্যাদি রাখা হয়। জ্বালানি গ্যাস কমে গেলে ওগুলোর তো প্রয়োজন, তাই ওরা সেই রক্তাক্ত মংপুর ছোট্ট শরীরটাকে টানতে টানতে সেখানে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক। দেখল একটা ডেড বডি কে বা কারা যেন শুইয়ে রেখেছে তার ভেতরে।

শিউরে উঠল হিরণ।

রিয়া চিৎকার করে সভয়ে পিছিয়ে এল। ওর গুলিবিদ্ধ পায়ের যন্ত্রণাও নিমেষের মধ্যে ভুলে গেল যেন। কেমন যেন এক গভীর আতঙ্কে থমথম করে উঠল ওর মুখ। কেন না এই লোকটাকেই তো স্বপ্না আর ও এই বাড়ির দিকে নজর রাখতে দেখেছিল। কিন্তু ওর এমন মর্মান্তিক পরিণতিটা করল কে? এ নিশ্চয়ই মংপুর কাজ?

হিরণ বলল, তুমি এঁকে চেনো?

রিয়া কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলেই বসে পড়ল সেখানে। ও কেমন যেন হয়ে গেল। এমন চটপটে মেয়ে ও কি শেষকালে ভয় পেয়ে গেল?

হিরণ একাই কয়লা-ঘরের ভেতর মংপুকে টেনেহিঁচড়ে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিল দরজায়। তারপর বাথরুমে ঢুকে এক আঁজলা জল এনে ওর চোখেমুখে দিয়ে ছাদে উঠে গেল। দ্রুত আলশের কাছে গিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে ডাকল, স্বপ্না! স্বপ্না!

ওর মা উঠে এলেন ছাদে, ও তো তোমাদের বাড়িতে।

আমাদের বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ চলে গেছে ও।

সে কী! গেল কোথায় মেয়েটা! বাড়ি আসেনি তো?

দেখুন ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে বোধহয়।

আমি নিজে খিল দিয়েছি। ও এলে দরজা তো আমিই খুলতাম।

তা ছাড়া রিয়াও আছে তোমাদের বাড়ি।

হিরণ বলল, হ্যাঁ, ও আছে। বলে একটু থেমেই হিরণ বলল, আপনি একবার শিগগির আমাদের বাড়ি আসুন। খুব বিপদ হয়ে গেছে আমাদের।

স্বপ্নার মা আতঙ্কিত হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

আমার মা অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছেন। রিয়াও কেমন যেন হয়ে গেছে। আর স্বপ্না যখন ঘরে ফেরেনি, তখন সেটাও তো খুব ভয়ের ব্যাপার।

ওমা! সে কী! কী করব আমি? বলেই দ্রুত ছাদ থেকে নেমে চলে এলেন ওদের বাড়ি।

কিন্তু রিয়া কোথায়? ক্লান্ত রিয়া যে কয়লা-ঘরের সামনেই উদাস হয়ে বসে পড়েছিল। কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। এরই মধ্যে কোথায় গেল সে?

হিরণ মায়ের ঘরে ঢুকল। মা তেমনিই শুয়ে আছেন। পাশের ঘরে, মানে যে ঘরে হিরণের সব কিছু থাকে রিয়া সেখানেও নেই। তা হলে? তা হলে কোথায় গেল রিয়া?

স্বপ্নার মা বললেন, রিয়া কই? স্বপ্না কোথায়? কী হয়েছে বলো না বাবা? এখানে এত রক্ত কেন? তোমার মায়ের কী হয়েছে?

এতগুলো কথার উত্তর একসঙ্গে কী করে দেবে হিরণ? ওর মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। রিয়ার পায়ে গুলি লেগেছে। এই অবস্থায় সে কোথায় যেতে পারে? স্বপ্না! স্বপ্নার কী হল? ও ঘরে ফিরল না কেন?

স্বপ্নার মায়ের হাঁকডাকে ততক্ষণে অন্যান্য প্রতিবেশীরাও ছুটে এসেছেন সবাই মিলে। হিরণের মায়ের চোখেমুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হিরণের এবার কেমন যেন সন্দেহ হল। সে কোনওরকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে কয়লা-ঘরের কাছে এসেই দেখল দরজার শিকল খোলা। এমন তো হবার কথা নয়। সে নিজে শিকল দিয়ে গিয়েছিল দরজায়। তাই সন্দেহটা প্রকট হল। আতঙ্কিত হয়ে চমকে উঠল সে। রিয়া তো নেই। সেইসঙ্গে মংপুও উধাও হল কী করে? শুধু সেই ডেড বডিটা তেমনিই পড়ে আছে ঘরের ভেতর। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে মংপুর পেছনেও লোক ছিল। হয়তো বা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল দূরে কোথাও। পরে দেরি দেখে বাড়িতে আসে, আর ওর ছাদে ওঠার সুযোগ নিয়েই কিডন্যাপ করে রিয়াকে। তারপর রক্তের দাগ দেখেই হোক বা রিয়াকে ভয় দেখিয়েই হোক মংপুকে কয়লা-ঘরের ভেতর থেকে খুঁজে বার করে এবং ওকে নিয়ে যাবার সময় রিয়াকেও সঙ্গে নিতে ভুল করে না।

হিরণ আর একটুও দেরি না-করে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ডায়াল করল, হ্যালো লালবাজার...হ্যালো...হ্যালো...।

সাত

বাসববাবু টেলিফোনে খবর পেয়েই বাড়ি চলে এলেন। তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নীহারবাবু, রঞ্জনবাবু এবং আরও কয়েকজন গোয়েন্দা অফিসার সঙ্গে এসেছেন। এসেছে এক গাদা পুলিশ। কয়লা-ঘরের ভেতর থেকে যে ডেড বডিটা উদ্ধার করা হল তাকে হিরণ না চিনলেও সে ছিল সাদা পোশাকের পুলিশ। নীহারবাবু তাকে এই বাড়ির দিকে নজরে রাখার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। সেইমতো সে গোপনে কাজও করছিল। কিন্তু কার্লস জ্যাকলের লোকেরা যে তাকে চিনতে পেরে হঠাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

বাসববাবু বাড়িতে এসে দেখলেন হিরণ কেমন মনমরা হয়ে বসে আছে। স্ত্রীর জ্ঞান ফিরেছে একটু আগে। ডাক্তারের ওষুধ আর ইঞ্জেকশানের প্রভাবে তিনি এখন স্বাভাবিক। কী থেকে কী যে হয়ে গেল তার কিছুই টের পাননি তিনি। তাঁর ঘুমিয়ে থাকার সময়েই মংপু শয়তানটা একটু বেশিমাত্রায় ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করেছিল তাঁর ওপর। ফলে সেই ঘুম ভাঙতে দেরি হল অনেক।

স্বপ্নার ব্যাপারেও দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেছে। কেন না এই বাড়ির নাটকীয় সব ঘটনাগুলোর পরই সে ফিরে এসেছে। আসলে হিরণ ও রিয়ার অন্তরঙ্গ কথাবার্তা শুনে ওর কেবলই নিজেকে অপাংক্তেয় মনে হচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল নেহাতই ওকে দলে না-রাখলে খারাপ দেখায় তাই বুঝি ওকে চিত্তরঞ্জনে যাবার কথা বলা হচ্ছে। তাই ওর অভিমান হয়েছিল খুব। এবং যদি মা কিছু বলেন তাই ঘরে না-গিয়ে কাছাকাছি ওর এক বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিল। তখন কি ও ঘুণাক্ষরেও জানত যে ও দরজা খুলে চলে যাবার পরই ওই বাড়িতে অমন একটা রোমহর্ষক ঘটনা হয়ে যাবে বলে? অবশ্য দরজা ও না খুললেও মংপু এ বাড়িতে ঢুকতই। লালবাজার অঞ্চলে সেই ভয়াবহ ডাকাতি ও রাহাজানির কুশীলবদের মধ্যে মংপুও তো একজন ছিল। কলকাতার কুখ্যাত ক্রিমিন্যালদের মধ্যে নৃশংতায় মংপুর নামও ছিল ব্ল্যাক লিস্টের বিশেষ তালিকায়। তা মংপুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও সেই মুঠো ফসকে যাওয়ায় পুলিশমহল ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তবে উৎকণ্ঠা যেটুকু রইল তা হল রিয়ার ব্যাপারে। ওরা যখন ওকে কিডন্যাপ করেছে তখন নিশ্চয়ই অকথ্য অত্যাচার করবে ওর ওপর। তার ওপর মেয়েটার পায়ে গুলি লেগেছে। সেই গুলিতে ক্ষতস্থান কত গভীর বা গুলি বিঁধে আছে কি না তাও তো দেখা দরকার। গুলি যদি ভেতরে থাকে সেটাকে বারও করতে হবে। কিন্তু এসব করবে কে?

বাসববাবুর আদেশানুযায়ী পুলিশের লোকেরা থানায় খবর পাঠিয়ে যেখানে

যত বদের আখড়া ছিল সর্বত্র তোলপাড় শুরু করে দিল। কেন না পুলিশের কাজের পদ্ধতিই এই, যেখানে দেখিবে ছাই—। এইভাবে কাজও হয়। অভাবিত সাফল্য নেমে আসে। এখন কার্লস জ্যাকলের চেয়েও রিয়াকে খুঁজে বার করাটা একান্তভাবে দরকার। পুলিশের কাছে এ এক মস্ত চ্যালেঞ্জ।

স্বপ্নার বাবা বাসব মজুমদারের দুটি হাত ধরে বললেন, দেখুন মশাই! আপনি আমার প্রতিবেশী। পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। তাই বলতে দ্বিধা নেই, আমার স্বপ্নার কিছু যে হয়নি এর চেয়ে সুখের আর কিছুই নেই। কিন্তু রিয়া পরের মেয়ে। ওর বাবা-মায়ের কাছে আমি কী করে মুখ দেখাব? আপনি যেভাবেই হোক উদ্ধার করুন ওকে।

বাসববাবু বললেন, আমার দিক থেকে ওই মেয়েটিকে খুঁজে বার করবার ব্যাপারে কোনও ত্রুটিই হবে না। বিশেষ করে ও যখন আমারই বাড়ি থেকে গুম হয়েছে তখন বিরাট দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ তো একটা থেকেই যায়। তা ছাড়া ও বুদ্ধি করে ফুলদানি এনে মংপুকে ঘায়েল না করলে হিরণ একা কিছুই করতে পারত না। অতএব আপনি একটু ধৈর্য ধরুন এবং নিশ্চিত থাকুন।

যদি ওরা ওকে মেরে ফেলে?

না এইরকম কেসে চোদ্দো-পনেরো বছরের একটা মেয়েকে অপহরণ করলে শত্রুপক্ষ তাদের মারে না। বরং মোটা টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে দেয়। সেইরকমটা যাতে হতে না পারে আমি সেই ব্যবস্থাই করছি। ওরা সেই ভুলটাই করতে যাবে এবং ধরা পড়বে।

তবু আমার হাত-পা যেন কাঁপছে। ওর মা-বাবা খবর পেলে কী যে করবে তা ভেবে পাচ্ছি না।

এখুনি ওর মা-বাবাকে খবর দেবার দরকারটা কী?

সে কী! যাদের মেয়েকে হারালাম তাদের একটা খবর দেব না?

না দেবেন না। একটু দেখুন না দু'-একটা দিন।

কিন্তু ওকে কি আমরা সত্যিই ফিরে পাব? মেয়েটার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন? কী সুন্দর মুখ। গায়ের রং দেখেছেন? যেন দুধে-আলতায় গোলা। মেয়ে বড় হচ্ছে। আর হয়তো দু'-চার বছর বাদেই ওর বিয়ে দিতে হবে, এখন এই অবস্থায়...।

মেয়েটাকে আগে উদ্ধার করি। তারপর ওইসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যাবে।

আপনি তো বললেনই মশাই। আপনার তো মেয়ে নেই, থাকলে বুঝতেন মেয়ের বাপেদের জ্বালা কত।

বাসববাবু হেসে বললেন, সব বুঝি আমি। আরে আমার মেয়ে নাই বা থাকল,

আমার স্ত্রী তো একজনের মেয়ে। আমার স্বর্গগতা মা-ও তো একজনের মেয়ে ছিলেন। তা ছাড়া ভুলে যাবেন না, আমার কিন্তু একটা ছেলেও আছে। অতএব মেয়েটাকে যদি ফিরে পাই, তা হলে কিন্তু ওর ব্যাপারে সব দায়িত্বই আমার। হিরণের মুখে যা শুনলাম তাতে বুঝতে পেরেছি, মা আমার যা তা মেয়ে নয়। অবশ্যই হিরণই বা আমার কম কীসে? মংপুর মতন ওইরকম একজন ঘোড়েল গুন্ডাকে ওইভাবে কাবু করা কি যা তা কাজ? আমার তো এখনও ওর মুখে শোনা ঘটনাগুলো ছায়াছবির দৃশ্য বলেই মনে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমি কী ভাবছি জানেন? চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এবার বই লেখা শুরু করব।

বই লিখবেন?

হ্যাঁ, এই লালবাজারকে নিয়ে, লালবাজারের রাহাজানি নিয়ে, কার্লস জ্যাকলকে নিয়ে, মংপুকে নিয়ে। এই লেখার মধ্যে কোনও গোঁজামিল থাকবে না। একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনি। কম দেখলাম এ জীবনে? লালবাজারের চৌহদ্দিতেও কখনও পা না দিয়ে কষ্টকল্পিত কাহিনি লিখে পুলিশের ঘাড়ে ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে শখের গোয়েন্দার বাহাদুরি দেখিয়ে কত লেখক লালে লাল হয়ে গেল। আর আমি লিখলে সে বই চলবে না?

রঞ্জনবাবু বললেন, নিশ্চয়ই চলবে। পুলিশের কাব্য পুলিশে লিখলে ভালই তো হয়। তবে হিরণবাবুর কৃতিত্ব কিন্তু অবিস্মরণীয়। ও যেভাবে মংপুকে ফাঁদে ফেলেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। আমরা হলে বোধহয় এমনটি পারতাম না।

হিরণ এতক্ষণ স্থিরভাবে ওর মায়ের পাশে বসে সব শুনছিল। এবার থাকতে না পেরে বলল, এখন কি এই সব আলোচনার সময়? তা ছাড়া আপনারা পারতেন না, এমন কথা বলছেন কেন? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করে কার্লস জ্যাকলের হাতে হাত কড়া তো একদিন আপনারাই পরিয়েছেন। শুধু একটু অসাবধানতার জন্যে লোকটা পালিয়েছে জেল ভেঙে।

নীহারবাবু রঞ্জনবাবুকে বললেন, শুনেছি জেলারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

মা বললেন, তাতে আর লাভটা কী?

বাসববাবু বললেন, লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয়। সরকারি কাজকর্মের একটা বিধিনিষেধ তো আছে।

রঞ্জনবাবু বললেন, আর আমাদের কপালেও আছে অযথা ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি। হিরণবাবু যেভাবে মংপুকে কবজা করেছিল, তাতে ওই লোকটাকে নিংড়েই কার্লস জ্যাকলের ঘাঁটিতে হানা দেওয়া যেত।

হিরণ বলল, দেখুন, মংপুকে ধরার মধ্যে সত্য সত্যই আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। ওটা অ্যাকসিডেন্ট। মাথা মোটা মংপু আমাকে নেহাতই ছেলেমানুষ ভেবে

সিন ক্রিয়েট করতে গিয়েই ওর বিপদ ডেকে এনেছিল। আমরাও আত্মরক্ষার খাতিরে একটু কৌশল প্রয়োগ করেছিলাম মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। তাও তো শেষরক্ষে হল না।

নীহারবাবু বললেন, তোমরা সবই করলে সেই সঙ্গে একটু ভুল করে ফেলেছিলে তোমরা। মংপুর হাত-পা বেঁধে আগেই যদি বাইরের দরজায় খিলটা দিয়ে দিতে তা হলে আর অন্য কেউ ভেতরে ঢুকে ওদের অপহরণ করতে পারত না।

আসলে এই রকম যে ঘটবে তা ভাবতেও পারিনি। তাই মাথার ঠিক ছিল না।

রঞ্জনবাবু বললেন, ঠিক আছে, ধরা ওরা পড়বেই। হয় আজ, নয় কাল। তবে আজ থেকেই এই বাড়ির সামনে একদল পুলিশ সদা সতর্ক থাকবে।

মা বললেন, এই ব্যবস্থাটা আগে করলে তো এমনটি হত না। মাঝখান থেকে নিরীহ একটা মেয়ে ওদের কবলে পড়ে কোথায় যেন লোপাট হয়ে গেল। খুনও হল একজন। কী দরকার ছিল একা বেচারিকে দিয়ে নজরদারি করবার? ওই দুর্ধর্ষ শত্রুর মোকাবিলা কখনও একা একজনকে দিয়ে হয়? আমার তো মনে পড়লেও গা শিউরে উঠছে।

বাসববাবু বললেন, ভুল যা হবার তা হয়ে গেছে। আসলে ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা ভাবতেও পারিনি।

এর পরে আর কোনও কথাবার্তা নয়। বাসববাবু সকলকে নিয়ে একটু চা-পান করেই আবার বিদায় নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, ফিরতেও পারি, নাও পারি! আমার জন্য চিন্তা করো না। তোমরা সাবধানে থেকো।

স্বপ্নার বাবাও বিদায় নিলেন।

হিরণ দরজা বন্ধ করে ওর বিছানায় উপুড় হয়ে শুল। কিছু ভাল লাগছে না ওর। রিয়ার জন্য ওর ভীষণ মন কেমন করছে। সত্যি, কী যে করছে মেয়েটা। ওর বদলে যদি ওরা তখন ওকে তুলে নিয়ে যেত তা হলে আর যাই হোক কার্লস জ্যাকলের মুখোমুখি হতে পারত সে।

হিরণ যখন বিছানায় শুয়ে রিয়ার ব্যাপারে নানারকম ভাবছে ঠিক তখনই—।

ক্রিরিরিং...। ক্রিরিরিং... ।

হিরণ উঠে গিয়ে রিসিভার ধরল, হ্যালো।

কার্লস জ্যাকল।

গলাটা গম্ভীর করে হিরণ বলল, বাসব মজুমদার বলছি।

আওয়াজটা একটু অন্যরকম ঠেকছে। খুব রেগে আছেন নিশ্চয়ই তা যাকগে, আমার লোকেরা আপনার ছেলের বদলে কাদের একটা মেয়েকে তুলে নিতে এসেছে। মেয়েটার ভারী মিষ্টি চেহারা কিন্তু। ওর পায়ের গোড়ালির কাছে একটা

গুলি লেগেছিল। সেটা ডাক্তার দেখিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি। ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। আসলে আমার খুব দেখবার ইচ্ছে ছিল আপনার ছেলেকে।

হিরণ বলল, মেয়েটা এখন কোথায়?

কোথায় বলি বলুন তো? এখুনি নিয়ে যাবেন?

অবশ্যই।

খুব ভাল হয় তা হলে। কেন না খুন জখম চুরি ডাকাতি রাহাজানি আমি এই সব কাজে সত্যিই আনন্দ পাই। তবে ওই সব ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারে আমি নেই। তাই বলছিলাম...

কোথায় দেখা করব বলুন?

কে আপনি?

বাসব মজুমদার।

গলা শুনে প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। বাসব মজুমদার আমাকে ভুলেও কখনও আপনি বলেননি। তুমি নিশ্চয়ই তাঁর সেই সুযোগ্য পুত্র যে কিনা মংপুর মতন একজন কুখ্যাত গুন্ডাকে আর একটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে।

হিরণ বলল, হ্যাঁ আমিই সেই।

তুমি নির্ভয়ে চলে এসো। মেয়েটাকে নিয়ে যাও। তুমি এলে ভালই হবে। কেন না তোমাকে একবার দেখবার ইচ্ছে আমার বহু দিনের।

হিরণ হেসে বলল, বলেন কী! আপনাকে দেখবার সাধও আমার কম নয় কিন্তু। হাজার হলেও আপনি আমার বাবার বন্ধু তো?

ওদিক থেকে হা হা করে একটা হাসির সুর শোনা গেল। তারপরই শোনা গেল, তুমি তা হলে এখুনি একবার চলে এসো বাবুঘাটে। আমার গাড়ি তোমার জন্যে ওইখানেই অপেক্ষা করবে। আর হ্যাঁ, কোনওরকম চালাকি করবার যেন চেষ্টা কোরো না।

না। চালাকি কিছু করব না। তবে আশা করি মেয়েটাকে সুস্থ শরীরেই ফেরত পাব।

দেরি না করে চলে এসো।

ওদিক থেকে ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা গেল।

মা হিরণকে টেলিফোনে কথা বলতে শুনে এগিয়ে এলেন এবার, কে ফোন করেছিল রে?

রঞ্জনকাকু।

কী বলছিল?

বলছিলেন বাপি চলে যাওয়ার পর আর কেউ কোনওরকম ঝামেলা পাকাতে এসেছিল কি না।

তুই কিন্তু ঠিক বলছিস না হিরণ। ফোনে অন্যরকম কথাবার্তা শুনছিলাম।

তুমি সব তাতেই এত সন্দেহ কর কেন বলো তো মা?

মা বললেন, কী জানি বাবা। ভয় করে।

হিরণ একবার অকারণেই এ-ঘর ও-ঘর করে ছাদে উঠে এল। তারপর আলশের কাছে গিয়ে ডাকল, স্বপ্না। স্বপ্নারে!

স্বপ্না উঠে এল ছাদে।

হিরণ চাপা গলায় বলল, একটু আগে একটা ফোন এসেছিল।

আবার ফোন!

হ্যাঁ, রিয়ার ব্যাপার! কার্লস জ্যাকল ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলছে।

সত্যি!

হ্যাঁ।

কিন্তু কে যাবে? তুমি?

সেইরকমই কথা হয়েছে।

যদি ওরা তোমাকে আটকে দেয়।

সে কী আর না-দেবে ভেবেছিস? তবে মুশকিল হচ্ছে একটাই, আমাদের বাড়ির সামনে যেরকম পুলিশ পাহারা রয়েছে তাতে এখান থেকে বেরোব কী করে তাই ভাবছি।

স্বপ্না বলল, ফোনে কী কী কথা হল শুনি?

হিরণ সব বলল।

শুনে স্বপ্না বলল, তুমি যেয়ো না হিরণদা। ওদের মতলব ভাল নয়। বরং তোমার বাবা এলে সব কথা খুলে বলো তুমি তাঁকে। এমন ভুল কখনও কোরো না।

তা না হয় না-করলাম। এদিকে বাপির কানে উঠলে, বাপি যদি অন্য কোনও স্টেপ নিতে যান, তা হলে যে মেয়েটাকেই খুন করে ফেলে দেবে। তখন কী হবে?

তা হলে তুমি যাবে?

হ্যাঁ, আর যদি আমি আজ রাত্রের মধ্যে না-ফিরি, কাল সকালে বাপিকে তুই সব বলবি।

ওরা তোমাকে কোথায় যেতে বলেছে যেন? বাবুঘাটে?

হ্যাঁ।

তুমি এক কাজ করো হিরণদা, একেবারে তৈরি হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের বাড়ি চলে এসো। আর শোনো, আসবার সময় তোমার একস্ট্রা প্যান্টজামা একটা নিয়ে এসো।

প্যান্টজামা কী হবে?

নিয়েই এসো না, এলে সব বলব। আপাতত একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। তবে পিস্তলটা যেন রেডি থাকে।

ও বুঝেছি। তার মানে তুইও যেতে চাস আমার সঙ্গে?

আঃ। এসোই না তুমি।

স্বপ্নার কথামতো হিরণ বেশ ভালভাবেই তৈরি হয়ে নিল। প্যান্টের হিপ পকেটে ছুরি, পকেটের ভেতর পিস্তল, আলাদা কিছু বুলেট ইত্যাদি। তারপর স্বপ্নার কথামতো এক্সট্রা একটা জামাপ্যান্ট নিয়ে মাকে বলল, মা, আমি একটু সপুদের বাড়ি যাচ্ছি।

ভেতর দিয়ে যা।

তা নয় তো কি এই রাতদুপুরে বাইরে দিয়ে যাব?

স্বপ্না তৈরিই ছিল। হিরণ যেতেই ওকে নিয়ে ওর পড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। বলল, শোনো হিরণদা, একা তোমার কখনওই যাওয়া চলবে না ওখানে। তোমার জামা প্যান্ট পরে আমিও যাব। আমার একটা প্যারেড করতে যাওয়া টুপি আছে, সেটা পরে থাকলে আমাকে কখনই মেয়ে বলে মনে হবে না। আমরা দু'জনেই যাব। একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা ভাবে। আমি তোমার হয়ে দেখা করব ওদের সঙ্গে। তোমাদের ব্যাপারে সব কিছুই তো আমি জানি, তাই উত্তরও দিতে পারব যথাযথভাবে। তুমি হবে আমার বডিগার্ড। দূর থেকে সব কিছু লক্ষ করবে, পিছু নেবে, দরকার হলে ফাইট করবে রীতিমতো। একান্ত না পার ফোনে তোমার বাবাকে জানাবে।

হিরণ লাফিয়ে উঠল আনন্দে, দি আইডিয়া। প্ল্যান একটা যা করছিস তা কিন্তু ভারী চমৎকার। এ যে একেবারে পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযান হয়ে গেল। আমরা শুধু পাঁচের বদলে তিন আর পঞ্চু নামের কোনও কুকুর আমাদের সঙ্গে নেই, তফাত এইটুকুই।

স্বপ্না বলল, এইটুকু সময়ের মধ্যে আমি কীভাবে তৈরি হয়েছি জান? এই দেখো।

হিরণ দেখল স্বপ্না ওর কোমরে কাল রঙের কী যেন একটা জড়িয়েছে।

কী ওটা?

নাইলনের ফিতে। বিশ ফুটের মতো।

কোথায় পেলি তুই?

কিনে আনলাম। যদি ওরা কোনওভাবে আমাকে চিনে ফেলে বা আটকে রাখে তা হলে এটা হয়তো কাজে লাগবে। আর নিয়েছি আগুন ধরাবার জন্যে একটা সিগারেট লাইটার।

আর?

আর কী নেব? ছুরি, ব্লেড এসব তো আছেই।

হিরণ ওর প্যান্টসার্ট দিলে স্বপ্না সেটা পরে তৈরি হয়ে নিল।

মা ডাকলেন, সপু, খাবি আয়।

যাচ্ছি মা।

ঘরে কে রে?

হিরণদার সঙ্গে একটু কথা বলছি।

হিরণ বলল, আমি তা হলে আসি?

স্বপ্না এক চোখ টিপে বলল, হ্যাঁ, এসো।

ওরা দু'জনেই তখন এক এক করে পথে নামল। বাইরে এসে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল হিরণ, সেখানে কী দারুণ পুলিশি ব্যবস্থা। ওরা ছায়ান্ধকারে দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটু একটু করে এগিয়ে পথের বাঁকে হারিয়ে গেল। তারপর বড় রাস্তায় এসেই একটা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে উঠে বসল তাতে।

ট্যাক্সির ড্রাইভার একজন সর্দারজি। বললেন, কিধার যানা হোগা বাবুসাব?

হিরণ বলল, ধরমতল্লা।

ধরমশালা তো নেহি?

হিরণ বলল, কে তুমি?

সর্দারজি হাসতে হাসতে বললেন, হুকুমত সিং। হুকুম তামিল করাই আমার কাজ।

হিরণ তখন পকেটে হাত দিয়েছে।

সর্দারজি সামনের আয়নায় সেটা দেখে বুঝতে পেরেই বললেন, ইয়ে বুরা কাম মাত করো ভাই। পিছে দেখো।

হিরণ দেখল ওদের ঠিক পেছনেই একটা ট্যাক্সি ওদেরকে অনুসরণ করে আসছে। আর সেই ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসে আছে দু'জন শক্ত-সমর্থ লোক। দানবের মতো চেহারা। কী ভীষণ। দেখেই বোঝা গেল এরা দু'জনেই হচ্ছে পেশাদার কোনও গুন্ডা। যারা নাকি কার্লস জ্যাকলের হয়ে কাজ করে।

হিরণ বলল, তুমি তা হলে কার্লস জ্যাকলের লোক?

সর্দারজি হেসে বললেন, সন্দেহ আছে না কি?

আমাদের তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

নিয়ে গেলেই দেখতে পাবে।

এটা তো বাবুঘাটের পথ নয়, আমাদের মেয়ে কই?

তার কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে দেখছি ভুল করেছি।

কথার খেলাপ করেই ভুল করেছ। তোমার একা আসবার কথা ছিল, তুমি সঙ্গে একজনকে এনেছ। তোমার সঙ্গে কথা ছিল কোনওরকম চালাকি করবে না কিন্তু, তুমি রিভলভার অথবা পিস্তল যা হোক কিছু একটা বার করতে যাচ্ছিলে। তা হলেই বুঝলে তো কথার খেলাপটা তুমিই করেছ? আসলে পুলিশের লোককে কখনও বিশ্বাস নেই। ওরা হল কেউটে সাপের জাত। আর সেই পুলিশের ছেলে হল সাপের বাচ্চা। তাই শত্রুর শেষ আমরা রাখব না। মেয়েটা মুক্তি পাবে, কিন্তু তুমি পাবে না। আর বাসব মজুমদার...। ওর যা অবস্থা হবে তা শুনলেও তুমি শিউরে উঠবে।

কী করবে আমার বাপির?

'শোলে' দেখেছ?

মেট্রোয় দেখেছি, জ্যোতিতে দেখেছি।

গব্বর সিং-এর অভিনয় মনে আছে?

ও কি ভোলবার?

আমরাও গব্বর সিং হয়ে তোমার বাপির দুটো হাতই কেটে নেব। তারপর সেই হাত দুটো লালবাজারের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে বরাবরের জন্য চলে যাব আমরা।

কোথায় যাবে?

আমাদের লালমহলে।

সেটা আবার কোথায়?

সে এমনই এক দেশ সেখানে লালবাজারের বাসব মজুমদারের দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছবে না।

বাপির হাত কেটে নেবে শুনেই হিরণ তখন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে! ও মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটা বার করে তাইতে গুলি ভরে নিল।

সর্দারজির হাতেও তখন রিভলভার। হিরণের দিকে তাগ করে বলল, খবরদার। কোনওরকম বেয়াদপি করবে তো এখুনি শেষ করে দেব।

হিরণ বলল, গাড়ি থামাও। মেয়েটাকে নেমে যেতে দাও।

সর্দারজি একটা অশ্রাব্য গালাগালি করল।

পর মুহূর্তেই যা হয়ে গেল তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

স্বপ্না এইসব কথাবার্তার ফাঁকেই কখন যে ওর ছুরিটা বার করে ফেলেছিল কেউ দেখেনি। সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে দিল সর্দারজির গলাটা। গাড়ি তখন দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাছে এসে ক্যাঁ-ক্যাঁচ্ করে ব্রেক্ কষল। টার্গেট একটু রং হয়ে গেছে। হয়তো বা বরাতজোর। তাই গলার নলিটা দু'ফাঁক

না হয়ে তার পাশ থেকেই ঘাড় অব্দি চিরে গেল ভীষণভাবে। রক্তে ভেসে গেল সারা শরীর।

পরক্ষণে অপর ট্যাক্সি থেকে গুন্ডা দু'জন নেমে এসে জাপটে ধরল ওদের। ওরই মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করেছে হিরণ। গুলিটা ওর বাঁদিকের কাঁধে গিয়ে লাগল।

আহত লোকটি ডান হাতে বাঁ কাঁধটা চেপে ধরে হিরণকে এক ঝটকায় ফেলে দিল রাস্তার ওপর।

এতেই যথেষ্ট। হিরণের আর নড়বারও শক্তি রইল না।

স্বপ্না ও হিরণকে পেছনের ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে ওরা সকলে যখন দ্রুত সেই পথ ধরে এগোতে লাগল, তখন দেখল পুলিশের একটা টহলদারি জিপ ওদের পিছু নিয়েছে।

হরিণ শিকার করে শিকারিরা যেভাবে মৃত পশুগুলোকে নিয়ে যায়, ওরা ঠিক সেইভাবে স্বপ্না ও হিরণকে নিয়ে চলল।

স্বপ্না তারই মধ্য থেকে চিৎকার করতে লাগল, বাঁচাও-বাঁচাও-বাঁচাও।

গাড়ি খিদিরপুর পার হতেই জ্যামে আটকাল। ততক্ষণে একটা ট্রাফিক সিগন্যালে ধাক্কা দিয়ে দু'-একজন পথচারীকে চাপা দিয়ে একটা গলির মুখে এসে থামল ট্যাক্সিটা।

পুলিশের গাড়ি অবশ্য অতদূর এল না। আসবেই বা কি করে? ওরই মধ্যে চারদিক থেকে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কে বা কারা যে একাজ করছে তা কে জানে? হয়তো বা কার্লস জ্যাকলের সংগঠিত শক্তি অথবা অন্য কোনও দুষ্কৃতীর দল পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে বাধা দিচ্ছে। পুলিশের গুলিও হার মানল সেই বোমাতঙ্কের কাছে। কাজেই পিছু হটতে হল তাদের। অনেক পরে যখন সমস্ত এলাকাটা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেল অপারেশন তখন সাকশেসফুল। বাড়ি বাড়ি তল্লাসি চালিয়ে হিরণ এবং স্বপ্নার হদিসও পাওয়া গেল না কোথাও।

আট

হাঙ্গার ফোর্ট স্ট্রিট থেকে লালবাজার কতটুকুই বা পথ। ঠিক পার্ক স্ট্রিটের মুখের কাছে আসতেই একটা বেপরোয়া লরি এসে ধাক্কা মারল বাসববাবুর জিপটাকে। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাসব মজুমদার ছিটকে পড়লেন চৌরঙ্গি রোডের ওপর। জিপের ড্রাইভার হরকিষণ গুরুতর আহত অবস্থায় স্টিয়ারিং

ধরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। জিপটাও ভেঙে চুরে পড়ে রইল রাস্তায়।

এই রকম অবস্থায় যা হয়, পথচারীরা হই হই করে ছুটে গেল সেই দিকে। বাসববাবু সংজ্ঞাহীন না হলেও প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন তিনি। হরকিষণের কী হবে তা কে জানে?

কয়েকজন লোক ধরাধরি করে তুলে বসাল বাসববাবুকে। ডান পায়ের হাঁটুতে অসহ্য যন্ত্রণা। মাথাতেও আঘাত লেগেছে প্রচণ্ড। দুর্ঘটনার ঘোর তাই কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল একটু। প্রথমত তিনি কোনও কথা বলতে পারলেন না। অনেক পরে একটু যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন দেখলেন খবর পেয়ে সাহায্যকারী পুলিশবাহিনী এসে গেছে। কেউ নিশ্চয়ই কোথাও থেকে ফোনে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে এই দুর্ঘটনার কথা। যাই হোক, পুলিশের অনেক হোমরাচোমরা অফিসারও ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে।

বাসব মজুমদার এবং হরকিষণ দু'জনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। বাসব মজুমদারকে ছেড়ে দেওয়া হল ফার্স্ট এড দিয়ে। কিন্তু হরকিষণের অবস্থা এখনতখন। স্যালাইন, ব্লাড প্রয়োজনীয় সবকিছুই দিতে হল তাকে।

এদিকে ঠিক ওই দুর্ঘটনার সময়টিতেই ভবানীপুরের পিনাকী গুপ্ত নামে এক যুবক হঠাৎ করেই এসে পড়েছিল সেইখানে। ডালহৌসি এলাকার একটা নামী ব্যাঙ্কের কর্মচারী সে। ওর এক বন্ধুকে সি অফ করবার জন্য হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিল। তারপর ধর্মতলায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দু'-একটা টুকিটাকি জিনিস কেনাকাটা করে ওই পথ দিয়ে ফিরছিল। পিনাকী গুপ্তকে দেখতে সুন্দর। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। মাথায় হেলমেট পরে থাকায় তাকে সৈনিকের মতো দেখাচ্ছিল। একটা লাল রঙের স্কুটারে চেপে ঝড়ের বেগে আসছিল সে। তার চোখের সামনেই ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটা ঘটতে দেখে বারেকের তরে থমকে দাঁড়াল। তারপর এই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত, তা ভেবে স্থির করে নিল। অর্থাৎ আহত পুলিশ অফিসারের দিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে সে সামান্য একটু দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নিল ধাবমান লরিটির। যেতে যেতেই লরির নাম্বারটা নোট করে নিল। যদিও সে জানে এইসব গাড়ির নাম্বার প্লেট কখনও থাকে না তবু নিজের সুবিধের জন্যেই এই কাজ করল।

লরিটির পিছনে ধাওয়া করে পিনাকীর একটা কথাই বার বার মনে হতে লাগল নিছক অসাবধানতার ফলে এই দুর্ঘটনা নয়, হত্যার উদ্দেশেই ঘটানো হয়েছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে।

লরিটি চলছে তো চলছেই, থামবার আর নাম নেই। অবশেষে কালীঘাট স্টেশনের কাছে একটু নির্জনে এক জায়গায় গিয়ে থামল লরিটা। পিনাকী

সেটাকে অতিক্রম করে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে স্কুটারটাকে এক জায়গায় দাঁড় করাল। তারপর দেখতে লাগল ওদের গতিবিধি।

একজন স্যুটেডবুটেড লোক ছায়ান্ধকারে নেমে এলেন লরির ভেতর থেকে। ড্রাইভারও নামল।

লোকটি পাশের একটি সুদৃশ্য ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে গেল। আর কয়েকজন লোক এসে সেই ট্রাক থেকে কিছু মালপত্তর নামিয়ে গাদা করতে লাগল টিনের শেড দেওয়া একটি ঘরের ভেতর। মাল খালাস হতে সময় লাগল অনেক। তারপর লরিটি ধীরে ধীরে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

পিনাকী দেখল লরির নাম্বার প্লেট আবার বদলে দেওয়া হয়েছে। দুটো নাম্বারই সে তার নোটবুকে লিখে রেখে যখন আবার স্কুটারে এসে বসতে যাবে, তখনই পেছন দিক থেকে ঘাড়ে একটা রদ্দা। পিনাকী দেখল বানরাকৃতি একটা লোক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক করে হাসছে তার দিকে চেয়ে। লোকটার মাথায় ব্যান্ডেজ। মারধর খেয়েছে বোধহয় কোথাও।

পিনাকী চোখে অন্ধকার দেখল যেন। পরক্ষণেই বলল, কে তুই?

বানরাকৃতি বলল, তুমি কে?

পিনাকী বলল, তোর বাবা। বলেই লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে মারল এক ঘুসি।

আকৃতি বানরের মতো হলেও প্রকৃতিও তাই। লোকটা ওই অবস্থাতেই এমন একটা লাফ দিল যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল পিনাকীর।

ততক্ষণে লোকটা একটা শিস দিয়েছে। আর অমনি মালখালাস করা সেই লোকগুলো এসে ঘিরে ধরল পিনাকীকে।

পিনাকী বুঝল আর বাঁচার কোনও উপায় নেই। তাই কৌশলে সেই অন্ধকারে নোটবুকটা টুক করে ঘাসের ওপর ফেলে দিল। তারপর কাউকে আক্রমণ করবার কোনওরকম চেষ্টা না করে স্থির হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

লোকগুলো এসেই বলল, ইয়ে আদমি কৌন হ্যায় মংপু?

হম না জানে। সি আই ডি মালুম হোতা। ইসকো আভি লে যাও অন্দরমে।

সেই সুদৃশ্য বাড়ির ভেতরেই পিনাকীকে নিয়ে গেল ওরা। ছ'-সাত জন লোক। ওর জামার কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। রাত এখন কত তা কে জানে? কিন্তু এই ঘরের বাসিন্দারা যে কেউ ঘুমিয়ে নেই, তা সে ভালই বুঝতে পারল।

বাড়ির ভেতর সন্দেহভাজন লোকজন সব।

একটি ঘরের ভেতর ভয়ংকর চেহারার একজন বসেছিল। কী অমানুষিক মুখ। খারাপ লোকগুলোকে দেখতে সত্যিই কি একইরকম হয়? চোখের দিকে

তাকালে বুক যেন শুকিয়ে আসে। যারা পিনাকীকে সেই ঘরে নিয়ে গেল তারা এক ধাক্কায় ঘরের ভেতর ফেলে দিল পিনাকীকে। অন্ধকার রাতে বাঘের চোখ যদি কেউ দেখে থাকে সে-ই তা হলে অনুমান করতে পারবে সেই লোকটির চোখের চাহনি কী ভীষণ!

লোকটি পিনাকীর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তুমি কী করছিলে?

পিনাকী বলল, তার আগে জানতে পারি কি আপনি কে?

লোকটি হাসল। বলল, আমার আসল নাম আমিই ভুলে গেছি। তোমাকে কী বলব? তবে সবাই জানে আমি।... যাক তোমার নাম কী বলো?

আমার নাম পিনাকীরঞ্জন গুপ্ত।

বাড়ি কোথায়?

ভবানীপুরে।

তার মানে কলকাতার ছেলে। বয়স তো খুব একটা বেশি নয়।

এখানে কী করছিলে?

একটা বেপরোয়া লরি পার্ক স্ট্রিটের কাছে এসে পুলিশের জিপে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমি সেই লরির পিছু নিয়ে এখানে এসেছি।

বলো কী! তুমি তো বেশ বাহাদুর ছেলে দেখছি। লরিটা এখন কোথায়?

এইমাত্র আপনার বাড়ির সামনে কিছু মাল খালাস করেই চলে গেল। আর তারপরই আপনার লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে এল এখানে।

ওই লরির ভেতরে তো আমিও ছিলাম।

পিনাকী বলল, আপনি ইচ্ছে করেই তা হলে জিপটাকে ধাক্কা দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। বাসব মজুমদারকে একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।

হয়তো মারা যাননি উনি।

জানি। ওনাকে কই মাছের মতো জিইয়ে রেখে তিল তিল করে মারব আমরা। একেবারে তো মারব না।

আমি এসব কিছুই জানতাম না। শুধু দুর্ঘটনা দেখে উত্তেজিত হয়ে লরিটার পিছু নিয়েছিলাম।

লরির ভেতর থেকে আমি সব দেখেছি। তুমি সেটা বুঝতে পারনি।

যাই হোক, তোমার ঠিকানাটা দাও। স্কুটার তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

পিনাকী বলল, ধন্যবাদ। ওটা এখন আমি নিজেই নিয়ে যেতে পারব।

পিনাকীর কথা শুনে ঘর ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। তারপর

বলল, এই বাড়িতে ঢোকবার মুখে কোনও কিছু অদ্ভুত জিনিস তুমি লক্ষ করেছ?

না। আসলে আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম।

মস্ত একটা ভিমরুলের চাক তোমার চোখে পড়েনি? পড়লে বুঝতে ওটা আসল নয়। সিমেন্ট বালি জমিয়ে করা হয়েছে। তা সেই ভিমরুলের চাকে তুমি শুধু হাতই দাওনি, একেবারে তার ভেতরে ঢুকে পড়েছ। এখান থেকে তুমি বেরোবে কী করে?

পিনাকী মনে সাহস এনে বলল, যেভাবে আপনার লোকেরা এখান থেকে বেরোয়, আমিও ঠিক সেইভাবেই বেরুব।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। অর্থাৎ আমি কিছু দেখিনি, শুনিনি, জানি না। তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল। যেমন ছিলাম তেমন হয়ে যাব।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি কী করো?

ডালহৌসি পাড়ায় একটি ব্যাঙ্কে চাকরি করি।

আমার সঙ্গে হাত মেলাবে তুমি?

আপত্তি কী?

যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো?

আপনার মতো লোকের কি শাস্তি দিতে একটুও আটকাবে তা হলে?

লোকটি পিনাকীর পিঠ চাপড়ে বলল, সাব্বাস। এইরকম একজন স্মার্ট ইয়ংম্যানকেই আমি খুঁজছিলাম।

এমন সময় মংপু এসে ঘরে ঢুকল। তারপর কী যেন একটা লোকটির হাতে তুলে দিতেই লোকটি ভুরু কুঁচকে বলল, এটা কী?

একটা নোটবুক। এই ছোকরা এটা ঘাসের ওপর ফেলে এসেছিল।

কী আছে এতে?

পিনাকী বলল, বিশেষ কিছুই না, হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল ওটা। আমার প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি এর মধ্যে নোট করে রাখি। এতে আমার বাড়ির ঠিকানাও আছে। অফিসের ফোন নম্বরও আছে। আর ওই বেপরোয়া লরির দুটো নম্বরই নোট করে রেখেছি, আপনার সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো আজ রাতে অথবা কাল সকালেই আমি পুলিশকে জানিয়ে আসতাম।

কিস্যু লাভ হতো না তাতে। লরির দুটো নম্বরই ফলস। আমার লরির নম্বর অন্য। তা ছাড়া এই বাড়ির মধ্যে সন্দেহজনক কোনও কিছুই পেত না পুলিশ। আমার আসল যা কিছু তা আছে...। কার্লস জ্যাকলের নাম শুনেছ?

পিনাকী বলল, সে কোথায় থাকে? কার্লস জ্যাকল তো শুনেছি খুব নামকরা স্মাগলার। জেলপলাতক দাগি আসামি।

এবং সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ। কিন্তু ওর স্টিয়ারিং আমার হাতে। যাই হোক, এটা জেনে রেখো আমার খাতায় নাম একবার লেখালে মৃত্যুই কিন্তু তার একমাত্র মুক্তির পথ। যদি বিশ্বাসঘাতকতা না কর, তা হলে আমার দিক থেকে ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমার হয়ে যারা কাজ করে আমি তাদের হয়ে লড়াই করি। পারলেন কী বাসব মজুমদার জেলের গরাদে কার্লস জ্যাকলকে বেশিদিন আটকে রাখতে? জেলারের একমাত্র ছেলেকে কিডন্যাপ করতেই সে ফাঁদে পা দিল। কার্লসকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতেই ফেরত পেয়ে গেল ছেলে।

কাগজে দেখেছিলাম জেলার নাকি সাসপেন্ড হয়েছেন?

সে তো হবেনই। তবে আমরাও ওঁকে এত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে আমাদের উপকার করতে গিয়ে খেতে না-পেয়ে মরে না যান উনি।

কিন্তু বাসব মজুমদারের ওপর আপনার এত রাগ কেন?

অনেক লোভ দেখিয়েও ওনাকে আমরা বাগে আনতে পারিনি তাই। শুধু বাসব মজুমদার নয়, ওনার সাগরেদ দু'জনও ভয়ানক জেদি। এই লোকগুলোর জন্যে কোনও ডাকাতি রাহাজানিতেই আমরা সাকশেসফুল হতে পারছিলাম না। কার্লস জ্যাকলকে ধরবার জন্য ওনারা খড়্গপুর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন। তবে সহ্যশক্তি বটে কার্লসের। পুলিশের মার কী জিনিস তা তো জানো না, সেই মার খেয়েও ও মুখ খোলেনি। ভুলেও বলেনি আমার নাম। তোমাকে অবশ্য এখুনি এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। তবে তোমার কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি তুমি পুলিশের স্পাই নও। তা ছাড়া সকলকেই তো সন্দেহ করলে চলে না, কোনও কোনও মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। না হলে দল চলবে কী করে? তোমার অল্প বয়স, তুমি দুঃসাহসী, স্পষ্টবক্তা এবং জেদি। তাই তোমাকে দলে নিলাম।

পিনাকী বলল, কী করতে হবে আমাকে?

তুমি রাইফেল শুটিং জানো? পিস্তল, রিভলভার চালিয়েছে কখনও?

না।

শিখে নিতে হবে। তারপর অকারণেই একটু পায়চারি করে বলল, বিয়ে করেছ? বাড়িতে কে কে আছে তোমার?

বিয়ে করিনি। দলে নাম লেখালে করবও না। বাড়িতে বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই আছে।

বোনের বয়স কত?

আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।

দেখাশোনা চলছে?

হ্যাঁ।

ওর বিয়ের দায়িত্ব আমাদের। ব্যবস্থা করেই জানাবে, সব টাকা আমরা দেব।

পিনাকী বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল লোকটির মুখের দিকে।

রহস্যময় লোকটি বলল, বিয়ে যখন করনি তখন ও চেষ্টা আর কোরো না। এখন শুধু দলের হয়েই কাজ করো।

যা আপনি বলবেন।

শোনো, পার্ক স্ট্রিট, সদর স্ট্রিট আর লালবাজার এই তিনটি এলাকাই আমাদের। লালবাজার অঞ্চলে আমাদের কাজ হল নানারকম ঝুট ঝামেলা পাকিয়ে, উড়ো চিঠি দিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করা। আর আচমকা খুন জখম ডাকাতি রাহাজানি করে পুলিশকে খেপিয়ে তোলা। বড় ধরনের দাঁও মারতে গেলে আমাদের আসরে নামতে হবে ডালহৌসিতে। তুমি যখন ওই এলাকাতেই আছ তখন তোমার ব্যাঙ্কের সমস্ত খবরাখবর তুমি আমাকে দেবে। কেন না ওইটাই হেড অফিস তো। এরপর আমি যখন যেমন নির্দেশ দেব তখন ঠিক তেমনটিই করবে তুমি।

আপনার হুকুম তামিল করতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত।

লোকটি এবার ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর বলল, রাত অনেক হল। মংপু! ওকে একটু এগিয়ে দাও।

পিনাকী বলল, প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।

মংপু তবুও খানিকটা পথ সঙ্গে এল।

পিনাকী ওর স্কুটারে স্টার্ট দিতেই মংপু বলল, বিদায় দোস্ত। তখনকার ব্যাপারটা নিয়ে যেন মন খারাপ কোরো না। ওটা ভুলে যেয়ো।

পিনাকী হেসে বলল, ব্যথাটা না-কমলে কিন্তু ভুলছি না।

মংপু আবার সেই রকম গা জ্বালানো খি খি হাসি হাসল।

পিনাকী বিদায় নিল ওর কাছ থেকে। তারপর স্কুটারে চেপে দ্রুত এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে।

ওর গন্তব্য কিন্তু ভবানীপুর নয়।

ও সোজা লালবাজারে এসে দোতলায় উঠে গেল। নীহার তালুকদার এবং রঞ্জন রায় দু'জনেই ছিলেন। কার্লস জ্যাকলের অশুভ আবির্ভাবের ফলে ওঁদের রাতের ঘুম চলে গেছে। তার ওপর বাসব মজুমদারকে এইভাবে হত্যার চেষ্টা। রিয়ার অপহরণ এবং স্বপ্না ও হিরণের অন্তর্ধান ওদের দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে। খিদিরপুরে টহলদারি পুলিশের গাড়িতে হামলা আরও একটি দুঃসংবাদ। তাই পুলিশের কাজের ব্যস্ততা সত্যিই চরমে। এর ওপর আছে সমস্ত এলাকার ওপর কড়া নজরদারি। সব সময়েই গভীর উৎকণ্ঠা, কী হয়, কী হয়।

ডালহৌসি পাড়ার একটি নামী ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী হিসেবে নীহারবাবু,

রঞ্জনবাবু, বাসববাবু এবং আরও অনেক পদস্থ পুলিশ অফিসারের সঙ্গেই যোগাযোগ আছে পিনাকীর। কার্লস জ্যাকলকে ঘিরে যে সব কাণ্ড-কারখানাগুলো চলছে তা কারও অজানা নয়, তাই ভিমরুল চাকের খবরটা পুলিশকে দেবার জন্যই পিনাকী ছুটে এল এখানে।

বিস্মিত রঞ্জন রায় জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর পিনাকী! এত রাতে তুমি এখানে?

পিনাকী বলল, আই অ্যাম ইন গ্রেট ডেঞ্জার।

নীহারবাবু বললেন, কেন! হলটা কী? তুমি তো ভবানীপুরে থাক, এত রাতে এখানে কী করে এলে?

সে অনেক কাণ্ড করে এসেছি। ট্রাফিক পুলিশকে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে দিতে। মি. মজুমদার কেমন আছেন?

ভালই আছেন। ওনার ডান পায়ের হাঁটুতে চিড় ধরেছে। প্লাস্টার করে হসপিটাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওনাকে। উনি বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে হরকিষেণটা মারা গেল এইমাত্র।

হরকিষণের হত্যাকারীর সন্ধান আমি পেয়েছি।

পিনাকীকে ঘিরে তখন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সমস্ত পুলিশ অফিসাররা।

পিনাকী এক এক করে সব কথা খুলে বলল। তারপর বলল, আমি জানি। এরপর ওরা আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখব না। তবু খবরটা আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম। কার্লস জ্যাকলকে যিনি পরিচালনা করছেন তিনি এমন একজন...

নীহারবাবু সঙ্গে সঙ্গে খবরটা জানালেন বাসব মজুমদারকে।

ফোন পেয়েই বাসব মজুমদার বললেন, এখুনি তোমরা আমার বাড়িতে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দাও। আর শোনো, ভবানীপুর পি এসকে বলে পিনাকীর বাড়ির দিকে সাদা পোশাকের কিছু পুলিশকে নজর রাখতে বলো। একাধিক লোক যেন বাড়ির চারপাশে পাহারায় থাকে।

সে ব্যবস্থা এখুনি করছি। কিন্তু স্যার! আপনি এই অবস্থায় কেন আসবেন?

আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। জানো তো, পুলিশের চাকরি বিছানায় শুয়ে থাকবার জন্য নয়। কষ্ট হলেও আমি ঠিকই যেতে পারব।

আচ্ছা স্যার, আমি গাড়ির ব্যবস্থা করছি।

ফোন রেখে আবার রিসিভার তুলে নতুন করে নাম্বার ডায়াল করলেন নীহারবাবু, হ্যালো, ভবানীপুর...

নয়

মংপু পিনাকীকে বিদায় দিয়ে এসেই ঘরের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, এটা কী হল মি. ডলফিন?

ভয়ংকর লোকটি তখন নিশ্চিন্তে বসে তাঁর রিভলভারের নলগুলি পরীক্ষা করছিল। যেন কিছুই বুঝল না এমনভাবে বলল, কীসের কী হল?

ওই লোকটাকে আপনি অতটা বিশ্বাস করলেন কেন?

তোমাকেও তো একদিন বিশ্বাস করেছিলাম।

এই কথা শুনে মংপু চুপ করে গেল। তারপর বলল, হ্যাঁ করেছিলেন, তার আগে আপনি জেনেছিলেন আমি কী। আর এই লোকটা...। এ যদি পুলিশের লোক হয়, তা হলে...?

তা হলে কী?

ও তো এখুনি থানায় খবর দিয়ে আমাদের দলবল সমেত ধরিয়ে দেবে।

দিক না। ক্ষতি কী? একদল গবেট নিয়ে কাজ কারবার করার চেয়ে দল উঠিয়ে দেওয়াই ভাল।

আপনার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝলাম না।

আজ দুপুরে বেশি চালাকি করতে গিয়ে তুমিই যে কাণ্ডটা করেছিলে তাতে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে যদি উদ্ধার করতে না পারতাম, তা হলে তোমাকে নিংড়ে এতক্ষণে পুলিশ তো আমাদের সব ঘাঁটিই দখল করে নিত। তোমার মতো একটা দুর্ধর্ষ শয়তান যদি একটা বাচ্চা ছেলের কাছে হেরে যায়, তা হলে কার ওপরে ভরসা করব? তাই বাধ্য হয়েই আমাকে নতুন লোক দেখতে হচ্ছে।

মংপু মাথা হেঁট করল। বলল, এর জন্য আমি লজ্জিত বস। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু পুলিশ এখন যেভাবে খেপে আছে তাতে এই লোকটা যদি পুলিশের স্পাই হয়, তা হলে তো ভয়ের ব্যাপার।

জয় তো ভয়ের ভেতর দিয়েই হয়। যেখানে ভয় নেই সেখানে জয়ও নেই।

আমি কিন্তু ব্যাপারটা ভাল বুঝছি না।

ডলফিন হেসে বলল, তোমার কি ওকে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ হচ্ছে?

অবশ্যই। ছোকরার তেজ দেখলেন না? আমি ওর ঘাড়ে একটা রদ্দা দিতেই এমন একটা ঘুসি ছুড়েছিল যে লাগলে আমি মরে যেতাম। তা ছাড়া ওর উদ্ধত কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ভিমরুলের চাকে এসেও ওর ভয় নেই। আপনার সামনে দাঁড়িয়েও বুক কাঁপেনি ওর। এতেও কি মনে হচ্ছে না ও পুলিশের লোক ছাড়া কেউ নয়?

ধরো তাই যদি হয় তা হলে? পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় একটা করতে হবে তো?

অবশ্যই। আমাদের এখুনি গা ঢাকা দেওয়া দরকার।

না। আজ এখানে মরণবাঁচনের লড়াই হবে। ওই ছোকরা যে পুলিশের স্পাই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে এক মত। আমার দু'জন লোক ওর পিছু নিয়েছে তারা জানালেই আমি সতর্ক হব। ডালহৌসি পাড়ার অতবড় একটি ব্যাঙ্কের কর্মচারী, অথচ তার সঙ্গে লালবাজারের পুলিশদের চেনা-পরিচয় থাকবে না, এ হতে পারে না।

ব্যাঙ্কে চাকরি করে না ছাই। এ পরিচয়টাও মিথ্যে হতে পারে।

না ওর নোটবুক দেখে বুঝেছি ও মিথ্যে বলেনি।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

ডলফিন রিসিভার উঠিয়ে সব কথা শুনেই বললেন, আমার অনুমান তা হলে মিথ্যে নয়। ঠিক আছে তোমরা ওকে আক্রমণ করনি তো?

ওদিক থেকে কী যেন উত্তর হল।

চলে এসো তোমরা। বলে ফোন নামিয়ে রাখল ডলফিন।

মংপু বলল, কার ফোন?

ওই ছোকরার ব্যাপারে। ও লালবাজারের সদর দপ্তরে এই রাতেই গিয়ে ঢুকে পড়েছে।

মংপু চিৎকার করে উঠল। বলল, একবার শুধু আদেশ করুন বস, ওর বাবা, মা, ভাই বোন যে যেখানে আছে সব ব্যাটাকে কেটে বাড়িটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি। এই মুহূর্তে ওই ছোকরার মাথাটা আমার চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে।

শান্ত হও বৎস। অত বেশি উত্তেজিত হোয়ো না। মাথা গরম করে এখন কখনও ওইসব করতে যায়? পুলিশ এত বোকা নয়, এখন ওর বাড়ির চারপাশেই কড়া নজর পুলিশের। গেলেই ধরা পড়বে।

কিন্তু ওই লোকটাকে লালবাজার অব্দি পৌঁছতে দেওয়া হল কেন? তার আগেই তো ওকে সরিয়ে দেওয়া যেত। আমাকে বললে, আমিই ওর পিছু নিয়ে একটি গুলিতে দিতাম ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে।

ডলফিন হেসে বলল, পুলিশের গতিবিধির ওপর তোমার কোনও ধারণা নেই বলেই তুমি এই কথা বলছ। বাসব মজুমদারকে আঘাত করার পর ওই একই এলাকায় আজ কখনও খুন-জখমের ঝুঁকি নেয় কেউ?

তা হলে কী হবে বস?

ওদেরকে আসতে দাও। আমার অনেক দিনের পাতা ফাঁদ। সেই ফাঁদে পা দিতে দাও ওদের।

ওরা এলে তো একা আসবে না। আসবে বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে। ওদের সঙ্গে লড়ে আমরা পেরে উঠব কেন?

শোনো, ছোকরা চলে যাওয়ার পরমুহূর্তেই আমি ঠিক করে ফেলেছি এই তাসের ঘর আর রাখব না।

মংপু হাঁ করে তাকিয়ে রইল ডলফিনের মুখের দিকে।

ডলফিন বলল, মাথায় ঢুকল না তো কিছু?

মংপু বলল, না।

পুলিশ এলে গোডাউনের ভেতর আর এই বাড়ির মধ্যে পরম সমাদরে ঢুকিয়ে নিতে হবে তাদের। তারপর শুরু হবে খেল। একটু দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে...

তার আগে বাড়িটা ফাঁকা করতে হবে তো?

বাড়িতে আছেটা কী? আছেই বা কে? সবাই বাইরে গা ঢাকা দিয়ে আছে। এবার আমরাও চলে যাব এখানকার পাট চুকিয়ে।

কখন যাব?

সংকেত এলেই। নীচের দরজাটা বন্ধ থাকবে। আমরা বারান্দা টপকে পালাব। ঘরের ভেতর আলো জ্বলবে, যদি লোডশেডিং হয়, এমার্জেন্সি কাজ করবে। গোডাউনের দরজাও খোলা থাকবে আমাদের। পুলিশ এসে ওর ভেতরে ঢুকে পড়লেই...

বলুন, থামলেন কেন?

দুটো প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা রাখা আছে দু'জায়গায়। আর এই হচ্ছে ডিটোনেটর। এর মধ্যে দুটো বোতাম আছে। ওপরের বোতামটা টিপলে এক নম্বরটা ফাটবে। আর নীচেরটা টিপলে ফাটবে দু'নম্বরটা।

মংপু দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, পায়ের ধুলো দিন বস।

এমন সময় দরজার সামনে রেড এলার্ম বেজে উঠল। উত্তেজিত ডলফিন বলল, কুইক। পুলিশ এল বলে।

মংপু বলল, আপনি এত তাড়াতাড়ি কী করে এই ব্যবস্থাটা করলেন?

তাড়াতাড়ি নয় তো? এ আমার অনেক দিনের পরিকল্পনা। সব রেডিই ছিল। শুধু ওই ছোকরাকে আমার লরির পেছনে ধাওয়া করতে দেখেই মনস্থির করলাম নাটকটা আজই শেষ করে দেব বলে।

কিন্তু ধরুন যদি ও আপনার প্রস্তাবে রাজি হত?

তা হলেও নজরে রাখতাম ওকে। তারপর ডালহৌসির ওই ব্যাঙ্কে অপারেশন শেষ হলে ওকেও সরিয়ে দিতাম। তবে কিছু টাকা অবশ্য পেত ওর বাড়ির লোকেরা।

ডলফিন আর সময় নষ্ট না করে কৌশলে চলে এল বাড়ির বাইরে। মংপুও সঙ্গে এল।

এক বিরাট পুলিশবাহিনী তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ভিমরুলের চাকের দিকে। ওরা জানেই না কি নিদারুণ মরণফাঁদ ওদের জন্য পেতে রেখেছে দুষ্কৃতীরা। এই নিষ্ঠুর চক্রান্তে ভগবানও শিউরে উঠলেন বুঝি।

দশ

মাঝেরহাট ব্রিজের কাছে একটি বাড়িতে কাল দুপুর থেকে রিয়াকে বন্দি করে রেখেছিল ওরা। কী থেকে কী হয়ে গেল রিয়া ভেবেও পেল না। হিরণ ছাদে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জন লোক কাল কাপড়ে ওর মুখ বেঁধে নাকে রুমাল চেপে ধরল। তারপর নিয়ে এল এই বাড়িতে। পা থেকে গুলি বার করে ইঞ্জেকশান দিয়ে পায়ে ব্যান্ডেজ করে এই বাড়ির দোতলার একটি চিলেকোঠায় ওকে আটকে রাখল। হাত-পা বাঁধেনি, কিন্তু বাইরে থেকে দরজায় শিকল দিয়ে রেখেছে। ঘরের ভেতরে আছে গেলাস ঢাকা খাবার-জলের একটা কলসি। আর কোনও কিছু নেই। ঘরের পেছনদিকের দেওয়ালে আছে ছোট্ট একটি জানলা। সেখান দিয়ে সে অনবরত ট্রেনের যাতায়াত দেখেছে সারাদিনে। আর দেখেছে একজনকে। সে হল কার্লস জ্যাকল। লোকটা নামেও যেমনি ভয়ংকর, চেহারাতেও তেমনি। হিরণের মুখে ওর অত্যাচারের কাহিনি আর চেহারার বর্ণনা তো শুনেই ছিল, এখন চাক্ষুস দেখে বুঝল হিংস্র পশুর প্রকৃতি নিয়ে মানুষ কীভাবে ঘুরে বেড়ায়।

ওকে নিয়ে এসে ওরা যখন এই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, ঠিক তখনই অশুভ আবির্ভাব হল কার্লস জ্যাকলের।

কার্লস জ্যাকল ঘরে ঢুকেই বলল, মংপুর ওইরকম হাল কে করেছে?

রিয়া ওর মূর্তি দেখে কাঁপতে লাগল ভয়ে। বলল, আমরা।

আমরা মানে? আর কে ছিল?

রিয়া সভয়ে মুখটা নামিয়ে নিল।

বুঝেছি, সেই শয়তানের বাচ্চাটা। ওটাকে আমি জ্যান্ত কবর দেব।

রিয়া বলল, ওর তো কোনও দোষ নেই। তোমার মংপুই তো বাড়ির ভেতর ঢুকে বেয়াদপি আরম্ভ করেছিল। আমরা তার প্রতিফল হাতে হাতে দিয়েছি।

আর আমি তার প্রতিদান মুখে মুখে দেব। তোর এই সুন্দর মুখে যখন অ্যাসিডের বোতলটা উপুড় করে দেব তখন যা দেখতে লাগবে না তোকে। আমি

কম করেও একশোটা মেয়ের মুখে অ্যাসিড ঢেলেছি। আসলে কারণ কী জানিস, সুন্দর মুখ আমি সহ্য করতে পারি না। আমি চাই সবার মুখই আমার মতন কুৎসিত হোক। ভগবান আমাকে যেমন কুৎসিত করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তেমনি তাঁর সৃষ্টিতেও সব কিছুই কুৎসিত হয়ে যাক। ভগবানকে পেলে তার মুখেও আমি অ্যাসিড ঢেলে দিতাম।

রিয়া বলল, তার মানে আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন?

আরক্ত চোখে কার্লস জ্যাকল বলল, একটু একটু। তবে ভগবানকে ভয় পাই না। কেন না তিনি কখনও আমার সঙ্গে থাকেন না।

তা হলে আপনার গলায় ওই যিশুক্রশটা রেখেছেন কেন?

ফর শো।

এমন সময় যে লোক দু'জন রিয়াকে এনে এখানে রেখেছিল তারা চাপা গলায় ফিস ফিস করে কী যেন বলতেই, চলে গেল কার্লস জ্যাকল।

অল্পবয়সি বামনাকৃতি একজন দরজার কাছে পাহারায় রইল। দরজার পাশেও ছোট্ট একটি জানলা। রিয়া সেখান দিয়ে উঁকি মেরে দেখল বামনটিকে। বামনটিও রিয়ার মুখের আকর্ষণে বার বার তাকাতে লাগল।

রিয়া কাছে ডাকল বামনকে, এই শোনো।

বামন এগিয়ে এসে বলল, কী?

নাম কী তোমার?

আমার নাম বেঁটে বাঁটুল।

তুমি বাঙালি?

হ্যাঁ।

তোমার বাড়ি কোথায়?

মছলন্দপুর নাম শুনেছ? ওইখানে। আমার ঘরবাড়ি সবই এখন এখানে। আমি একা। কেউ নেই আমার।

এদের হয়ে কাজ করছ কতদিন?

তা ধরো না কেন বছর দশেক।

এইসব খারাপ লোকেদের সঙ্গে কাজ করে নিজের জীবনকে নষ্ট করছ, যদি ধরা পড় ফল কী হবে জানো?

কী হবে? কিচ্ছু হবে না। ধরা পড়লে খুব জোর দু'-চার বছর জেল হবে। তার বেশি কিছু নয়। আমরা তো চুনোপুঁটি। পেটের দায়ে চাকরি করছি। তা ছাড়া আমাকে ধরতে এলে পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে পালাব আমি।

তুমি যখন একা, তখন পেটের দায়ে এই কাজই বা করছ কেন? ভাল কাজ করতে পারো না? তা হলে তো পায়ের ফাঁক দিয়ে পালাতে হয় না।

আমি খারাপ কাজটা কী করছি? তুমি ঘরে আছ, আমি বাইরে থেকে তোমাকে পাহারা দিচ্ছি। এর বেশি তো কিছু নয়।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যেতেই বামন বলল, চুপ। আর কোনও কথা বোলো না আমার সঙ্গে। জানলা বন্ধ করো।

রিয়া জানলা বন্ধ করে পিছিয়ে এল।

একটু পরেই দেখল একজন লোক একটা শালপাতার ঠোঙায় গোটাকতক কচুরি আর একটা মিষ্টি রেখে চলে গেল।

রিয়ার খিদে পেয়েছিল খুব। সে খাবার খেয়ে, কলসি থেকে জল পান করে জানলা খুলে আবার ডাকল, এই।

বামন কাছে এসে বলল, কী বলছ?

রিয়া বলল, আমাকে কেমন দেখতে বলো তো?

বামন সরল হেসে বলল, খুব সুন্দর দেখতে।

কার্লস জ্যাকল কি সত্যিই আমার এই মুখটাকে অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেবে?

বামন চুপ করে থেকে বলল, ওর অসাধ্য কিছুই নেই। তবে আমাদের ডলফিনসাহেবের আদেশ না-পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করবে না ও।

ডলফিনসাহেব! তিনি আবার কে?

আমাদের বিগ বস। অর্থাৎ গড ফাদার যাকে বলে।

ও নাম তো শুনিনি কখনও?

উনি গভীর জলের মাছ। ওনার নির্দেশেই সব কিছু হয়। কিন্তু সম্ভ্রাসের নাম কার্লস জ্যাকল। এই যে এত খুন, জখম, ব্যাঙ্কডাকাতি সবই হচ্ছে ওনার পরিকল্পনায়। নিজে উনি মঞ্চে আসেন না। তবে সকলকে মদত দেন।

রিয়া বলল, শোনো, আমার এই সুন্দর মুখটা যদি পুড়িয়ে দেয় ওরা, তা হলে কী হবে বলো তো? তাই বলি তুমি এক কাজ করো না ভাই—।

বামন ভয়ে ভয়ে বলল, কী কাজ?

আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যাবার একটা উপায় বলে দাও না।

তারপরে আমার অবস্থা কী হবে জানো? তা ছাড়া পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়? ওরা ঠিক তোমাকে খুঁজে বার করবে।

রিয়া বলল, আরে পালিয়ে কি আমি একা যাব? তোমাকেও সঙ্গে নেব। তুমিও তো যাবে আমার সঙ্গে।

আমি যাব তোমার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই। আমি একা যাব কেন? আমি কি এখানকার পথঘাট কিছু চিনি? পালিয়ে গেলে হবে কী, আমারও মুখ পুড়বে না, তুমিও প্রাণে মরবে না। এই তো পাশেই রেলপথ, চলো না আমরা দু'জনে ট্রেনে চেপে কোথাও পালিয়ে যাই।

বামন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর বলল, শোনো, আমারও যে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না তা নয়। কিন্তু সেরকম সঙ্গী পাইনি বলে যাইনি। তা ছাড়া এরাও শুনছি বেশিদিন থাকবে না এখানে। বাসব মজুমদার নামে যে পুলিশ অফিসার আছে তাকে আর অন্য দু'জনকে খুন করেই ওরা চলে যাবে। বিহারের দলমা পাহাড়ের কোলে ডিমনা লেকের কাছে কোথায় যেন পাঁচ তারা হোটেল করেছে ওরা সেইখানে যাবে। নাম দিয়েছে লালমহল।

তাই না কি? তবে তো ভালই হল। ওরা যদি বিহারে যায়, আমরা যাব উত্তরপ্রদেশে। কিছু টাকা-পয়সা হাতিয়ে আমাকে নিয়ে পালাও না তুমি।

তোমার মা-বাবা যদি পুলিশে খবর দিয়ে থাকেন, পুলিশ যদি পিছনে লাগে আমাদের?

আমার মা-বাবাই নেই তো পুলিশে খবর দেবে কে? আমি তো বাসব মজুমদারের বাড়ি কাজ করি।

তুমি মিথ্যে কথা বলছ। কাজের মেয়ের চেহারা তোমার নয়।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা, আমার যদি মা থাকত তা হলে কী আমি এতক্ষণ তাদের জন্যে একবারও কাঁদতাম না? আমার চোখে কি একটুও জল দেখেছ? তবে আমার মুখ পুড়িয়ে দেবে শুনে আমি দারুণ ভয়ে পেয়ে গেছি।

বামন বলল, না না, তোমার এমন সুন্দর মুখ কখনও নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া এইভাবে বেঁচে থাকতে ভালও লাগছে না আমার। ডলফিনসাহেবের গোডাউনে বেশ ছিলাম। কিন্তু এই কার্লস জ্যাকলটা ফিরে আসার পর থেকেই হতচ্ছাড়া জায়গায় ডিউটি পড়েছে আমার। বাসব মজুমদার খুন না-হওয়া পর্যন্ত ওরা এখানে থাকবে। শুধু বাসব মজুমদার নয়, ওর ছেলেটাও নোটিশে আছে ওদের।

রিয়া বলল, ওর অপরাধ?

আমরা আদার ব্যাপারী। অত খোঁজে আমাদের দরকার কী?

রিয়া বলল, ঠিক বলেছ। এখন আমাদের আসল কাজ হল এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। তুমি সেই ব্যবস্থাই করো। তুমি গোলাগুলি ছুড়তে পার তো?

বামন হেসে বলল, কী যে বল। এই দ্যাখো একটা পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলভার। যা তা জিনিস নয়। এটা সব সময় আমার সঙ্গে থাকে।

রিয়া বলল, ঠিক আছে। তবুও তুমি আমাকে ধারালো ছোরা একটা এনে দেবে। পালাতে গিয়ে যদি কোনও বিপদ হয় তা হলে নিজেকে রক্ষা করতে পারব। আমাকে কেউ মারতে এলে তুমি রুখবে, তোমাকে কেউ মারতে এলে আমি রুখব।

বামন বলল, ভারী মজার ব্যাপার তো। যাক, তোমাকে নিয়ে আমি পালাবই।

কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। তবে এখনই নয়, সন্ধের পর। এখন গেলে জানতে পারবে ওরা। তুমি জানলা বন্ধ করে চুপচাপ থাকো। আমি সব ব্যবস্থা করছি। তোমার নামটা তো আমার জানা হল না।

রিয়া বলল, আমার আবার নাম। আমার নাম খুকুমণি।

বাঃ, বাঃ। কী সুন্দর নাম। কিন্তু খুকুমণি, তুমি আমাকে ফেলে পালাবে না তো? তা হলে কিন্তু মনে আমি খুব দুঃখু পাব।

ছিঃ ছিঃ। কী যে বলো, আমাকে তা হলে দেখবে কে? আমার বুঝি কেউ আছে?

তা ঠিক, তা ঠিক। আমি বরং কোথাও একটা দোকানটোকান দেখে কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়ে চালিয়ে নেব দু'জনের, কী বলো?

তবে? তোমার মতন সুন্দর মানুষ কি হয়?

কী বললে? আমি সুন্দর? সবাই আমাকে বেঁটেবাঁটুল বলে, আর তুমি আমাকে সুন্দর বলছ?

নিশ্চয়ই। যার মন সুন্দর, তার সবই সুন্দর। চেহারাটাই কী সব? যে অন্যের ভাল করতে চায় তার ভালই হয়। তুমি যখন আমার ভাল করতে চেয়েছ তোমার ভাল তখন হবেই।

বামন বলল, আমি তোমার জন্যে জীবন দিয়ে দেব খুকুমণি। তুমি চুপ করে বসে থাকো, আমি এখুনি একবার এলুম বলে।

বামন চলে গেল দরজায় তালা দিয়ে।

রিয়া বুঝল টোপ গিলেছে বামনটা। একে দিয়েই কাজ হবে।

খানিক বাদেই বামন আবার ফিরে এল। তার হাতে এক প্যাকেট ভাল ভাল খাবার। বলল, নাও। তুমি পেট ভরে এগুলো খেয়ে নাও দেখি, আর এই টাকাগুলো তোমার কাছে রেখে দাও। আমি আরও টাকা নিয়ে আসছি। অনেক টাকা লাগবে তো আমাদের।

কিন্তু আমার ছোরা? আমার যে-একটা ধারালো ছোরা চাই।

বামন বলল, সে ব্যবস্থা হবে।

রিয়া বলল, তা হলে ঠিক সন্ধের সময়। মনে থাকবে?

মনে থাকবে না মানে? এই সুযোগ কখনও ছাড়ি? দরকার হলে কার্লস জ্যাকলকেও আমি খতম করে দেব। শত্রুর শেষ আমি রাখব না।

রিয়া অভিনয় করল, খবরদার ও কাজ করতে যেয়ো না। কার্লস জ্যাকলকে মারতে গিয়ে যদি তুমি মরো, তা হলে কিন্তু এই জগতে আমার আর কেউ থাকবে না।

বামন বলল, আচ্ছা, আচ্ছা। সে দেখা যাবে। তুমি ততক্ষণে মনে মনে ঠিক

করো আমরা কোথায় যাব। কেন না দূরের পথঘাট আমি চিনি না।

রিয়া বলল, আমি চিনি। আমি অনেকবার চিত্তরঞ্জনে গেছি। প্রথমে আমরা সেইখানেই চলে যাব। তারপর সেখানে গিয়ে ঠিক করব কোথায় কোন দূরদেশে যাওয়া যায়।

বামন বলল, আর কোনও কথা নয়। আমি শুধু তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থাটা পাকা করে আসি। সন্ধে হলেই লোডশেডিং হবে আর সেই সুযোগে আমরাও পালাব।

রিয়া জানলার পাল্লা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল। পা-টা জখম তাই। না হলে মুক্তি পেলে ছোটা কাকে বলে দেখিয়ে দিত। তবু কোনওরকমে একবার যদি পালাতে পারে এখান থেকে সেই আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ও।

সন্ধের পরই লোডশেডিং হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে রিয়া মনে মনে অনেকরকম পরিকল্পনা করে ফেলেছে। কিন্তু বামনটা আসছে না কেন? তার কোনও সাড়াশব্দও নেই। কী হল তার?

অনেক পরে রিয়া জানালাটা একবার ফাঁক করতেই দেখল অন্য একজন লোক বসে আছে সেখানে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল ওর। বোকাটা নিশ্চয়ই কার্লস জ্যাকলকে কোনওভাবে টেক্কা দিতে গিয়ে গোলমাল বাধিয়ে বসে আছে। নইলে তো এমন হবার কথা নয়। অথচ বুদ্ধি করে একটা ছোরা যদি আগে ভাগে দিয়ে যেত ও, তা হলে যেভাবেই হোক একটু কৌশলে ওই লোকটাকে জখম করে পালাতে পারত। কিন্তু এখন আর তা হবার নয়। রিয়ার চোখে যেন জল এসে গেল।

অন্ধকার ক্রমশ ঘন হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে পায়ের ব্যথাও। হাতে একটা ইঞ্জেকশানও করেছে ওরা। সেখানেও ব্যথা লাগছে। কিন্তু জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে এসব ব্যথা কিছুই নয়। এত অন্ধকার, অথচ একটা চিমনির ব্যবস্থাও করল না ওরা। তার ওপর কী সাংঘাতিক কুটকুটে মশা। যেখানে কামড়াচ্ছে সেখানটাই ফুলে উঠছে।

এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হবার পর রিয়ার মাথায় একটা পরিকল্পনা এল। অন্ধকার হাতড়ে জলের কলসিটা নিয়ে সে সরে এসে দাঁড়াল দরজার একপাশে। তারপর আচমকা একটা চিৎকার দিতেই যে লোকটি পাহারায় ছিল সে ছুটে এল, ক্যা হুয়া? কাহে চিল্লাতা?

রিয়া বলল, কী একটা কামড়ে দিল আমার পায়ে।

লোকটি দরজা খুলে যেই না টর্চ ফেলে দেখতে গেল ভেতরটা, অমনি রিয়া

সেই জলপূর্ণ কলসির বাড়ি তার মাথায় বসিয়ে দিল এক ঘা। দিয়েই বাইরে এসে শেকল তুলে দিল দরজাতে।

লোকটি তখন ভীষণ চিৎকার করছে। আর লাথি মেরে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে দরজাটা।

রিয়া দেখল মহা বিপদ। এখুনি তো লোকজন ছুটে আসবে এই হাঁক ডাকে। সে তখনই মন স্থির করে এদিক ওদিক তাকিয়েই ছাদের এক কোণে একটা মরচে ধরা শাবল দেখতে পেল। শাবলটা কুড়িয়েই সে সশব্দে খুলে দিল দরজার শেকলটা।

লোকটি তেমনিই চেঁচাতে চেঁচাতে ভিজে জামাকাপড়ে বেরিয়ে এল, আরে ভাগারে ভাগারে ভাগা। পাকড়ো... পাকড়ো...

আর চেঁচাতে হল না, রিয়া শাবলের বাড়ি সজোরে এক ঘা দিতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা।

ও তখন কোনদিক দিয়ে যে পালাবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে বিপদ। আবার ছাদের আলশে ধরেও লাফিয়ে পড়া যায় না! এই বাড়ির পাশেই ছাদ আছে। কিন্তু উচ্চতা যা তাতে সেখানেও লাফিয়ে পড়া অসম্ভব। এখানে ঘিঞ্জি গলির ভেতর গায়ে গায়ে বাড়ি। কোনও গাছপালার ডাল ঝুঁকে নেই যে সেটা ধরে পালাবে। ততক্ষণে লোকটির রিভলভার ও টর্চ ও হাতে নিয়েছে। এদিকে সিঁড়িতেও ধুপধাপ শব্দ। পালানোর রাস্তা একদম নেই দেখে রিয়া ছুটে এসে সিঁড়ির দরজায় শেকল দিল। এইভাবে কিছু সময়ও যদি লোকগুলোকে আটকে রাখা যায় তো মন্দ কী?

ওরা এসে ধাক্কা মারতে লাগল দরজায়। আর রিয়া আলশের কাছে এসে পাশের ছাদেই লাফিয়ে পড়বার মন করল। এমন সময় হঠাৎই সে দেখতে পেল একটা লম্বা দড়ি পিলারের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় নীচের দিকে ঝুলছে। এ নিশ্চয়ই বামনটার কাজ। এইভাবেই ওদের পালাবার পথ সুগম করে রেখেছিল সে, কিন্তু কোনওকারণে সেই সুযোগ আর পেল না বেচারি। ও আর একটুও সময় নষ্ট না করে, সেই দড়ি ধরেই ঝুলে পড়ল। তারপর সুড়সুড় করে নেমে এল পাশের ছাদে। সেখান থেকেও ওই একই কায়দায় গলির মুখে।

পথ যে কোন দিকে তা সে জানে না। গলি থেকে বড় রাস্তায় যেই পৌঁছল, অমনি কোথা থেকে যেন বামনটা তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। বলল, এ কি খুকুমণি! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

আমি তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

কী আশ্চর্য! তুমি ওই ঘর থেকে বেরোলে কী করে?

রিয়া সব বলল।

বামন বলল, কাজটা তুমি ভাল করোনি খুকুমনি। এখন আর কিছুই করা যাবে না। আমি ভেবেছিলাম একটু বেশি রাতে তোমাকে নিয়ে পালাব।

কিন্তু তুমি তো আমাকে বলেছিল সন্ধের পর।

কী করব। হঠাৎ একটা কাজের জন্যে ডলফিনসাহেবের লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল যে। আমি এক ধরনের প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা তৈরি করতে পারি। সেটা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটানো যায়। সেই বোমা তৈরির কাজে আমাকে যেতে হয়েছিল।

রিয়া বলল, উঃ। কী সাংঘাতিক।

তুমি ভয় পাচ্ছ খুকুমণি? কী করব, এদের দলে এই তো আমার কাজ। ছোটবেলা থেকে এরা আমাকে চুরি করে এনে এই কাজই শিখিয়েছে। আমার চেহারা এমন মর্কটের মতো হলে কী হয়, এই সব কাজে আমি কিন্তু সিদ্ধহস্ত। তেমনি অব্যর্থ আমার হাতের টিপ। ওদের নির্দেশে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে কত খুন করেছি আমি তার ঠিক নেই। এসব কাজ আমি করতে চাই না। তোমাকে নিয়ে পালিয়ে গেলে আর এসব করব না আমি। তোমার গা ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি আমি।

রিয়া চোখদুটো বড় বড় করে বলল, ওই বোমার সাহায্যে কাকে মারবে ওরা?

শুনলাম ফোর জিরো নাইন টু'র একটা হেভি ওয়েটের ট্রাক নিয়ে বস নিজেই গেছেন আজ বাসব মজুমদারের মোকাবিলায়। বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটাবার পরিকল্পনা আছে। শুধু তাই নয়, উড়ো টেলিফোনে পুলিশকে ডাকিয়ে এনে ওই ঘাঁটির ভেতর ঢুকিয়ে সব কিছু উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনাও হয়েছে।

রিয়া বলল, তুমি কী? মানুষের এমন সর্বনাশ কেউ করতে পারে?

বামন এবার হেসে বলল, তা হলে শোনো, আমি যখন তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ঠিক করেছি ঠিক সেই সময় ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল বলে আমি কী করেছি, জানো? রাগের মাথায় আমি এমন বোমা তৈরি করেছি যার ভেতরে ধুলো ছাড়া কিছুই নেই।

রিয়া উল্লিসিত হয়ে বলল, সত্যি বলছ তুমি?

তবে না তো কী? আমি চাই ওরা সবাই এবার ধরা পড়ুক। ওরা ধরা না-পড়লে পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব না। এখন কার্লস জ্যাকলটাকে একটু শিক্ষা দিতে হবে। কেন না বস বারণ করা সত্ত্বেও ও ঠিক করেছিল আজ রাতের মধ্যেই তোমাদের তিনজনের গলা কেটে মুণ্ডুগুলো তোমাদের বাড়ির সামনে রেখে আসবে। তাই...

রিয়া বিস্মিত হয়ে বলল, আমাদের তিনজনের? আমি তো একা। আর দু'জন কোথায়?

তোমাদের আরও একটা ছেলে আর মেয়েকে তো এইখানেই অন্য একটা বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে ওরা।

কোথায়? কোনখানে? শিগগির চলো, আগে তাদের উদ্ধার করি। আর দেরি হলে যদি ওদের মেরে ফেলে?

বামন বলল, তুমি কোথায় যাবে? তুমি গেলে বিপদ। আমিই বরং যাই। কার্লস জ্যাকলের মুখোমুখি হলে আমি অবস্থাটা সামাল দিতে পারব। কিন্তু তোমাকে দেখলেই ওরা সন্দেহ করবে আমাকে।

আমি তা হলে কোথায় থাকব?

এসো তুমি আমার সঙ্গে।

অন্ধকার গলিপথে খানিকটা গিয়ে একটা জীর্ণ পুরাতন বাড়ির কাছে এসে বামনটা বলল, এর পেছনে ড্রেনের ধারে তুমি লুকিয়ে থাকো। আমি না-আসা পর্যন্ত কোথাও যেয়ো না যেন।

রিয়া বলল, আচ্ছা।

বামনটা একটু পরেই ঘুরে এসে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে খুকুমণি। ওরা তো এখানে নেই।

তা হলে ? তা হলে কী হবে?

এতক্ষণে ওদের ধড়গুলো বোধহয় হাইড্রেনের নীচে।

রিয়া যেন চোখেমুখে অন্ধকার দেখল। এমন সময় হঠাৎ কাদের পদশব্দ শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে, এই তো, এই তো এরা এখানে। পালাবে কোথায় বাছাধন।

জোড়া জোড়া টর্চের আলো এসে পড়েছে তখন ওদের ওপর।

কার্লস জ্যাকল।

হ্যাঁ কার্লস জ্যাকলও ছিল ওদের দলে। শক্ত হাতে বামনটার গলা টিপে ধরে কার্লস বলল, বিশ্বাসঘাতক! তোর গায়ে গরম তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারব আজ। কী বোমা করে এসেছিস তুই? বলেই এক আছাড়।

বামনটা আর্তনাদ করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলির গর্জন ডিস্যুম।

এগারো

বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে বাসব মজুমদার অন্যান্য পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে যখন ভিমরুলের চাকের সামনে এলেন চারদিকে তখন থমথম করছে।

পিনাকী বলল, এই বাড়ি।

বাসব মজুমদার বললেন, এই বাড়ি? ঠিক বলছ তুমি?

ওই দেখুন ভিমরুলের চাক।

জানো এই বাড়িটা কার?

তা তো জানি না। তবে এই সেই বাড়ি।

এই বাড়ির মালিকের নাম রসময় রায়। আমার বিশেষ পরিচিত এবং বন্ধু লোক। অত্যন্ত সৎ এবং সজ্জন তিনি।

রঞ্জনবাবু বললেন, সেই সৎ সজ্জনের ভেতরেই হয়তো কোনও দুর্জন বাসা বেঁধে আছে।

এ অসম্ভব। আমার মনে হয় কেউ তাকে ব্ল্যাকমেল করে সাময়িকভাবে এই বাড়িটাকে দখল করে নিয়েছে। হয়তো এই বাড়িরই গুপ্তকক্ষে বন্দি আছেন তিনি। আমরা রেড করতে ঢুকে তাঁকে অ্যারেস্ট করে হাতকড়া পরাব, আর আসল অপরাধী সমস্ত অপরাধের বোঝা ওই নিরীহ ভদ্রলোকের ঘাড়ে চাপিয়ে পার পেয়ে যাবে।

রঞ্জনবাবু বললেন, এত লোডশেডিংয়েও যখন বাড়ির ভেতরে এমার্জেন্সি আলো জ্বলছে, তখন নিশ্চয়ই লোকজন আছে এর ভেতর। চলুন ঢুকে পড়া যাক। আর গুদাম ঘরেরও তালা ভাঙা হোক।

বাসববাবু বললেন, খবরদার নয়। কোনওভাবেই ঢোকা নয় ওর ভেতর। মনে রেখো এটা রিমোট কনট্রোলের যুগ। চারদিক থেকে এলাকাটাকে ভালভাবে ঘিরে রাখো। আর মাইকে ঘোষণা করো ওদের আত্মসমর্পণ করবার। ভুলেও কেউ ভেতরে ঢুকো না।

বাসববাবুর আদেশ মতোই কাজ হল।

একটু পরেই কারেন্ট এসে যাওয়ায় আশেপাশের ঘরবাড়ির আলোও জ্বলে উঠল। অনেক গৃহস্থের বাড়ি আশেপাশে। রাতদুপুরে পুলিশ দেখে ছাদে-বারান্দায় তাই লোকে লোকারণ্য।

মি. ডলফিন আর মংপু ডিটোনেটার হাতে বেশ কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়েছিল। ডিটোনেটারটা ছিল মংপুর হাতে। ডলফিন ছিল আরও দূরে। কিন্তু পুলিশ যখন বাড়ির কাছে এল অথচ বাড়িতে ঢুকল না, ঠিক তখনই প্রমাদ গনল দু'জনে। সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হতে বসেছে দেখে ডলফিন

সংকেত দিল মংপুকে। মংপু এক নম্বর এবং দু'নম্বর বোতাম দুটোই একসঙ্গে টিপে দিল। কিন্তু কোথায় কী? একটা পটকা ফাটার শব্দও শোনা গেল না যে। সে বার বার টিপেও যখন যখন সফল হল না, তখন এক-পা এক-পা করে পিছু হটল। ডলফিন কোনওরকমে পালাতে সক্ষম হলেও মংপু ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। অবশ্যই জীবিত অবস্থায় নয়। কেন না আশপাশ থেকে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বৃষ্টি হচ্ছে। তারই একটিতে মংপুর খেল খতম।

অনেক পরে পুলিশ বাড়ির ভেতরে ঢুকে উদ্ধার করলেন রসময়বাবুকে। স্ত্রী-পুত্র সহ তিনি ওষুধ ও ইঞ্জেকশনের প্রভাবে গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু সারা বাড়ি তোলপাড় করেও স্বপ্না-রিয়া বা হিরণের দেখা পেলেন না কেউ। সেই সঙ্গে খোঁজ পেলেন না কার্লস জ্যাকলেরও। কিন্তু আশ্চর্য! সেই লোকটি কোথায়? সে কি আগেই পালিয়েছে? কোথায় গেল পিনাকী গুপ্তর বর্ণনায় সেই গড ফাদার? পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের গুলির লড়াই তখন তুঙ্গে উঠেছে! এই অভিযানে পুলিশ এখানে। এসেছে দলবল সহ কয়েক ব্যাটেলিয়ান। সেই সঙ্গে এসেছে চার-পাঁচটি বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কুকুর। তারাই আশপাশে লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র দু'জন দুষ্কৃতীকে আঁচড়ে কামড়ে ধরিয়ে দিল। তাদের ধরে ঘা-কতক দিতেই সব কিছু ফাঁস করে দিল তারা। তাদেরই কথামতো তাদের সঙ্গে নিয়েই পুলিশের গাড়ি ছুটে চলল মাঝের হাটের দিকে। যেখানে কার্লস জ্যাকলের হেফাজতে ছেলেমেয়েগুলো বন্দি আছে।

এই পথ খুব একটা দীর্ঘ নয়। তবু বাসব মজুমদারের এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি ঘণ্টা বলে মনে হতে লাগল।

এক সময় পুলিশ যখন যথাস্থানে এসে পৌঁছল তখন কেউ কোথাও নেই সেখানে। শুধু গলির মুখে নর্দমার ধারে যে মৃতদেহটা পড়েছিল, তার মুখে টর্চের আলো ফেলেই চমকে উঠলেন বাসববাবু। সিংহগর্জনে চিৎকার করলেন, কার্লস জ্যাকল।

এরপরে শুরু হল চিরুনি অভিযান। পুলিশ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে শুরু করল সে কী দারুণ তল্লাসি! বাড়ি বাড়ি ঢুকে চলতে থাকল তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ।

এই তিন কিশোর-কিশোরীর অনিষ্ট আশঙ্কায় সকলেরই বুক কেঁপে উঠল। বাসব মজুমদারের বার বারই মনে হল কার্লস জ্যাকলের কাছে তিনি হেরে গেলেন। তাঁর একমাত্র ছেলেই যদি হারিয়ে যায়, তো কার্লস জ্যাকলের ডেড বডিতে তাঁর প্রয়োজনটা কী? কিন্তু কোথায় গেল ওরা? ওদের কাটা লাশ কি এখন গঙ্গার স্রোতে ভাসছে? নাকি পচন ধরার অপেক্ষায় ঘুমিয়ে আছে কোনও ম্যানহোলের গর্তে? বাসব মজুমদার কোনও কিছুই তাই ভাবতে পারলেন না আর।

রহস্যের মায়াজাল ছেঁড়া যাক এইবার।

এই চক্রের গড ফাদার মি. ডলফিন কোনওরকমে পালিয়ে এসে গোপন সংবাদপ্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে কার্লস জ্যাকলকে জানিয়ে দেয় বেঁটেবাঁটুলের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। আর কার্লস তখুনি দলবল নিয়ে খুঁজতে বেরোয় বামনটাকে। ইতিমধ্যে রিয়ার অন্তর্ধানে কার্লস জ্যাকল খুবই চিন্তিত ছিল। তাই স্বপ্না ও হিরণকে আগের জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে ওত পেতে ছিল ওইখানেই। সে জানত এর মধ্যে বামনটার কোনও কারসাজি থাকলে সে নিশ্চয়ই ওদের উদ্ধার করতে ওইখানে আসবে। এবং এলও তাই। চাল ভুল একটুও হয়নি কার্লস জ্যাকলের। কিন্তু ক্ষুদেটাকে যে আছাড় মারবার সঙ্গে সঙ্গে ওই ওইভাবে লাফিয়ে পড়ে ওকেই গুলি করবে তা সে ভাবতেও পারেনি। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। অমন বৃহৎ শক্তি যাকে লোহার খাঁচায় রেখেও ধরে রাখতে পারল না, একটা ক্ষুদে বামন তাকে এক লহমায় মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিল।

কার্লস জ্যাকল খুন হতেই দলের লোকেরা যে যেদিকে পারল পালাল। লোক অবশ্য খুব একটা বেশি ছিল না। পাঁচ-ছ'জন। বামনটাকে লক্ষ্য করে ওরাও কয়েকটা গুলি চালাল। কিন্তু ক্ষুদেটা তুড়ুকতুড়ুক করে লাফিয়ে ডিগবাজি খেয়ে এদিক সেদিকে লুকিয়ে পড়ায় সব ক'টা গুলিই ফসকাল। অতএব ওরা আর অযথা গুলি নষ্ট না-করে পুলিশের মোকাবিলার জন্য কিছু সঙ্গে রেখেই কেটে পড়বার সিদ্ধান্ত নিল।

ওরা চলে গেল। কিন্তু খুকুমণি কোথায়? তাকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে কি ওরা সঙ্গে করে নিয়ে গেল খুকুমণিকে? বামনের চোখে যেন জল এল। এরই মধ্যে খুকুমণিকে ঘিরে কত মধুর স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল সে। খুকুমণির জন্যই ভাল হতে চেয়েছিল। ভেবেছিল কোনও একটা দূরদেশে চলে যাবে। সেখানে একটা ভদ্র পল্লীতে ঘর ভাড়া নিয়ে খুকুমণিকে রাখবে। ও তো একটা বেঁটেবাঁটুল। ওকে নিয়ে মজা করবে লোকে। তাই লোকের খোশামোদ করে চা জল বয়ে দিয়ে কোনও দোকান-টোকানে কাজও জুটিয়ে নেবে একটা। আর নির্ভীক সৈনিকের মতো পাহারা দেবে খুকুমণিকে। ওকে ও দিদিভাই বলে ডাকবে। আর সারাজীবন অতন্দ্র প্রহরীর মতো ছায়ার মতো, সঙ্গে থাকবে ওরা। খারাপ কাজ ও করবে না। কিন্তু কোনও দুষ্টু লোক কখনও খুকুমণিকে বিরক্ত করলে, তখনই দেখিয়ে দেবে ওর পয়েন্ট থ্রি এইটের খেল। এটাকে ও কখনও হাতছাড়া করবে না। সবসময় রক্ষাকবচের মতো এটাকেও রেখে দেবে মাথার বালিশের নীচে। অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গকে যেমন বিনাশ করতে হয় তেমনি দুষ্ট লোকেদেরও শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিতে নেই।

বামন খুকুমণির শোকে মুহ্যমান হয়ে কার্লস জ্যাকলের পরিত্যক্ত ঘাঁটিতেই

আবার এসে ঢুকল। শূন্য খাঁচার মতো বাড়িটার ভেতরে ঢুকে প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল সে। আর পাগলের মতো ডেকে চলল, খুকুমণি... খুকুমণি...। কিন্তু না। ওর ডাকে কেউই সাড়া দিল না। ও ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে লাগল। ছাদে উঠেই দেখল চিলেকোঠার সামনে কে যেন একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সম্ভবত খুকুমণি এই লোকটাকে জখম করে ওর পালাবার পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল। কিন্তু ওকে গুলি করল কে? এ নিশ্চয়ই ক্রোধে উন্মত্ত কার্লস জ্যাকলের কাজ। যাই হোক, এখন থেকে আর একটি লোকও কার্লস জ্যাকলের শিকার হবে না। কিন্তু খুকুমণি...?

হঠাৎ দূরের দিকে লক্ষ পড়ায় কী যেন দেখে চমকে উঠল বামন। ও আলো-অন্ধকারের বুক চিরে স্থির হয়ে পড়ে থাকা রেলের লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে যখনই ভাবছিল খুকুমণিকে ওরা ওইখান দিয়েই কোনও দূরদেশে নিয়ে চলে গেছে কি না, তখনই ওর নজরে পড়ল। কী একটা যেন। দেখেই লাফিয়ে উঠল সে। আর এতটুকু দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখুনি ওখানে যেতে না-পারলে খুকুমণিকে আর বাঁচানো যাবে না।

ও তুর তুর করে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এসে যেই না নীচের ধাপে পা দিয়েছে, অমনি দেখল কাতারে কাতারে পুলিশ এসে ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতর। তাই না দেখে বোকার মতো আবার উঠে এল ছাদের ওপর। তারপর ওরই বেঁধে রাখা সেই দড়ি ধরে ঝুলে পড়েই পাশের ছাদে মারল এক লাফ। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল ওর গায়ে। ও তাতে ভ্রূক্ষেপও করল না। কেন না এখুনি একটা মালগাড়ি আসবার সময় হয়ে গেছে। তাই ছাদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েই ওই অবস্থাতেই আবার ছুটে চলল রেল লাইনের দিকে।

পেছনদিক থেকে একদল পুলিশও তাড়া করল ওকে! তারা সমানে চেঁচাতে লাগল, হল্ট— হল্ট—।

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

এমন সময় কে যেন বলে উঠল, ফায়ার।

নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে একটা গুলির শব্দ। বামনের দেহটা একবার বলের মতো লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তারপর ক্রমশ স্থির হয়ে আসতে লাগল সব কিছু।

বাসববাবু, রঞ্জনবাবু আর নীহারবাবু ছুটে এলেন বামনটার কাছে।

নীহারবাবু ওর জামার কলার ধরে মাটি থেকে টেনে তুললেন ওকে। বললেন, কে তুই?

বামনের চোখে জল।

সে অতিকষ্টে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, খু-কু-ম-ণি।

তোর নাম খুকুমণি?

বামন ঘাড় নেড়ে না বলল। তারপর দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, খু-কু-ম-ণি!

তুই কার্লস জ্যাকলের লোক?

বামন ঘাড় নাড়ল।

আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে ওরা কোথায় রেখেছে জানিস? বামন আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাতে গেল। কিন্তু পারল না। কেন না তার আগেই স্থির হয়ে গেল সে।

বাসববাবু বললেন, চলো তো সামনের দিকে। মনে হচ্ছে ওইদিকেই ওরা নিয়ে গেছে ওদের। লোকটা বারবার ওইদিকেই যখন দেখাচ্ছে...। পুলিশ, কুকুর, কনেস্টবল এবং অফিসাররা সবাই ছুটলেন রেললাইনের দিকে। খানিকটা যাবার পরই কুকুরের চিৎকারে ছুটে গেলেন সবাই। দেখলেন সে এক রোমহর্ষক দৃশ্য। অন্ধকার রেলপথের একটু নির্জনে তিনটি ছেলেমেয়েকেই দুষ্কৃতীরা লাইনের সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে এমন করে বেঁধে ফেলে রেখেছে যে কোনও একটা ট্রেন যদি হঠাৎ এসে পড়ত তা হলে কী যে হত ভাবা যায় না।

পুলিশ ওদের সকলকেই মুক্ত করলে হিরণ বলল, আমরা যে এখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলাম তোমরা কী করে জানলে বাপি? বাসববাবু বললেন, আর বলিস না। একটা ক্ষুদে বামন...।

বাসববাবুর কথা শেষ হবার আগেই রিয়া বলে উঠল, কই কোথায়? কোথায় সে?

বিস্মিত বাসবাববাবু বললেন, তুমি তাকে চেনো?

চিনি মানে? আমাদের এই চরম বিপদে সেই তো একমাত্র বন্ধু। ও না থাকলে সব শেষ হয়ে যেত আজ। আপনারাও বাঁচতেন না, আমরাও না।

সে কী! কিন্তু...।

রিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কথা খুলে বলল সকলকে।

সব শুনে সকলেরই মাথা হেঁটে।

এই চরম মুহূর্তে যে মানুষ নিস্বার্থভাবে জীবনরক্ষা করে গেল সকলের তাকেই কিনা শত্রু ভেবে...

গুলির আদেশ রঞ্জনবাবু দিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রাণেই আঘাতটা লাগল বেশি।

বাসববাবু বললেন, ওই জন্যই ও বার বার খুকুমণি খুকুমণি করছিল। রিয়া কেঁদে ফেলল ঝর ঝর করে। বলল, আমাকে শিগগির ওর কাছে নিয়ে চলুন আপনারা। ওকে একবার শেষ দেখা আমি দেখব।

হিরণ ও স্বপ্না বলল, আমরাও যাব। ওই মহৎপ্রাণকে শেষবিদায় আমরাও জানিয়ে আসব সবাই।

একটা মালগাড়ি তখন গম গম করে মাটি কাঁপিয়ে বজবজের দিকে চলে গেল। আর একটু দেরি হলে এই গাড়ির চাকার তলাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত ওরা। খুব সময়ে ওদের তিনজনকেই উদ্ধার করা গেছে। সবই ঠাকুরের কৃপা এবং বামন অবতারের দয়া। ওই ক্ষুদ্র মানুষটি না-থাকলে এই কাহিনিটিই অন্য রকম হয়ে যেত আজ।

ওরা বামন অবতারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

ক্লান্ত অবসন্ন বাসববাবু সোফায় দেহটা এলিয়ে দিতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল, ক্রি রিং রিং। ক্রি রিং রিং।

বাসববাবু রিসিভার কানে দিয়ে বললেন, হ্যাঁলো, মি. মজুমদার স্পিকিং...।

গুড মর্নিং মি. মজুমদার। আশা করি ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরেছেন।

কে! কে তুমি?

সে কী! আমার গলা চিনতে পারছেন না?

কার্লস জ্যাকল।

কার্লস জ্যাকল মৃত। কিন্তু আমার মৃত্যু নেই। আমি ডলফিন জ্যাকল। অপরাধজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমি ঘুণপোকার মতো মিশে থাকব। চি-র-কা-ল। তবে আপাতত আমি দূরে— অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। লালবাজারে রাহাজানি করে কার্লস জ্যাকলের নামে একদিন আমিই কলকাতার আতঙ্ক ছিলাম। এখন আমার লালমহলে গিয়ে আপনারাই রাহাজানি করুন। বিদায়, বন্ধু বিদায়!

শয়তান! এতদিন তুমিই তা হলে নাম ভাঁড়িয়ে আমাকে ধোঁকা দিয়ে এসেছ?

ওদিক থেকে কী যেন উত্তর ভেসে এল ঠিক বোঝা গেল না। বাসববাবু দু'বার-তিনবার হ্যালো হ্যালো করলেন। তারপর বললেন, ইডিয়ট। বলেই সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ছেলেমেয়েদের ফিরে পেয়ে পাশাপাশি দুটি বাড়িতেই তখন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

অভিশপ্ত তিড্ডিম

এক

আমি তখন শ্রীপতি নাট্য কোম্পানি নামে একটা পেশাদার যাত্রাদলে চাকরি করি। আমাদের দল কোলিয়ারি অঞ্চল এবং আসামে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেবার আমরা হাফলঙে এলাম আমাদের দল নিয়ে। বড় মনোরম জায়গা। সেখানে গিয়ে আমাদের দল একেবারে জেঁকে বসল প্রায়। ওইটুকু জায়গায় পর পর কয়েকদিন ধরে আমাদের একটানা অভিনয় হল। এবং প্রায় প্রতিদিনই আমরা সেখানকার দর্শকদের মনজয় করে ঘন ঘন করতালি ও অভিনন্দন গ্রহণ করতে লাগলাম।

এইখানে যে বাংলোতে আমরা থাকতাম সেখানে বাহাদুর নামে একজন নেপালি দারোয়ান ছিল। তার সঙ্গে কয়েক দিনের মধ্যেই আমার খুব ভাব জমে উঠল। বাহাদুর এক একদিন আমার অভিনয় দেখে আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। একদিন কথায় কথায় বাহাদুর আমাকে বলল, আচ্ছা বাবু, আপনি তো অনেক দেশ ঘুরেছেন। সত্যি করে বলুন তো, আপনাকে কোন দেশটা সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে?

আমি কিছুক্ষণ ভাবলাম। এর কী উত্তর দেব বাহাদুরকে? তবু বললাম, দেখো বাহাদুর; জীবনে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি একথা সত্যি। তবে কী জান, যখন যেখানে গেছি তখন আমার সেইখানটাই ভাল লেগেছে। তবুও ভালর চেয়েও ভাললাগা বলে একটা কিছু তো আছে, তা আপার হাফলং-এর এই সৌন্দর্য আমি জীবনে ভুলব না। এত ভাল আমাকে কোনও জায়গা লাগেনি। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সত্যিই আমি মুগ্ধ।

বাহাদুর বলল, সত্যি বলছেন, বাবু?

সত্যি বলছি। এমনিতেই পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল আমাদের শহরের লোকেদের প্রত্যেকেরই ভাল লাগে। তবে আমার কথা আলাদা। আমার ভাল লাগাটা আবার অন্যের চেয়েও একটু বেশি। কেন না ছোটবেলা থেকেই পাহাড়-পর্বতের ওপর আমার একটা সহজাত টান আছে।

সব শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বাহাদুর বলল, তা হলে আমাদের এই হাফলং, আপার হাফলং আপনার খুবই ভাল লেগেছে বলুন?

খু-উ-ব ভাল লেগেছে। দেখছ না, আমি কেমন ফাঁক পেলেই এদিক ওদিক কেটে পড়ি।

হ্যাঁ, আমি সেটা লক্ষ করেছি বাবু। তবে আপনি যদি চান তো, এই আপার হাফলঙের চেয়েও হাজার গুণ ভাল একটা জায়গায় আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারি। যাবেন আপনি সেখানে?

বাহাদুরের আগ্রহ দেখে বুঝতে পারলাম, আমার অজানা নিশ্চয়ই এমন এক মনোরম জায়গা এখানে আছে, যার হদিস আমি কোনও দিনই পাব না। একে আমি ভ্রমণরসিক লোক, প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখবার জন্য আমার মনপ্রাণ সবসময়ে ব্যাকুল হয়ে থাকে, তার ওপরে বাহাদুরের এই আহ্বান, এ সুযোগ আমি ছাড়ি কখনও? বললাম, যাব না মানে? কিন্তু কোথায়?

বাহাদুর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি তিড্ডিমের নাম শুনেছেন?

না। তবে নামটা শোনামাত্রই বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। বেশ ভাবগম্ভীর নাম। তিড্ডিমটা কোথায়? আমাদের মানচিত্রে আছে?

আছে কি না-আছে তা বলতে পারব না। তবে যে কেউ ইচ্ছে করলেই সেখানে যেতে পারে না।

আমার মন আনন্দে নেচে উঠল।

যে জায়গায় ইচ্ছে করলেই কেউ যেতে পারে না, সেই জায়গায় আমি যাব। বাহাদুর যখন আছে তখন সে জায়গায় যাওয়া আমার আটকায় কে?

বাহাদুর বলল, যেমন মনোরম জায়গা, তেমনি বিপদসংকুল। মরণ যেন পায়ে পায়ে ঘনিয়ে আসে। প্রাণ হাতে নিয়ে যেতে হয়।

বলো কী!

হ্যাঁ বাবু। যদি আপনার সাহস থাকে, আর যাবার ইচ্ছে থাকে, তবেই আমি সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে গেলে এমন সব দৃশ্য আপনি দেখতে পাবেন, যা দেখলে মাথাখারাপ হয়ে যাবে। তবে একটা কথা—

কী কথা বলো?

শুধু আপনি আর আমি যাব। আর কেউ নয়। কার ভাগ্যে কী ঘটে কে জানে? আমরা কেন নিমিত্তের ভাগী হব?

আমি বললাম, না না। গেলে তোমাতে আমাতে যাব। ওসব সঙ্গীসাথি আমি জড়াই না। ওরা হল পথের কাঁটা। তা যাক। কবে যাবে? কাল তো আমাদের শো বন্ধ। কাল গেলে হয় না?

বাহাদুর হেসে বলল, না বাবু। সে অনেক দূরের পথ। ওখানে তো হেঁটে যাওয়া যায় না। টাঙ্গা করে যেতে হয়। অনেক টাঙ্গাওলা হয়তো রাজিই হবে না যেতে। সেসব ব্যবস্থা করে তারপর যাওয়া। অন্তত দিন পাঁচেক আমাকে সময় দিতে হবে।

আমি হিসেব করে দেখলাম দিন পাঁচেক পরে আবার একদিন আমাদের শো বন্ধ আছে। ভালই হল। সেই দিনটাই আমরা তিব্বিম যাবার জন্যে স্থির করলাম।

কয়েকটা দিন যে আমার কীভাবে কাটল, তা ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। অধীর আগ্রহে আমি সেই দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। কতক্ষণে আসবে সেই দিন। কখন যাবার সেই ক্ষণটুকু এসে উপস্থিত হবে?

যাবার আগের দিন রাত্রে বাহাদুর হতাশ হয়ে এসে বলল, নাঃ। অনেক চেষ্টা করেও কোনও টাঙ্গাওলাকে রাজি করাতে পারলাম না।

শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল, তা হলে উপায়?

উপায় একটা বের করছি। যাওয়া আমাদের হবেই। আমার বন্ধুর একটা টমটম আছে। তাতে করেই যাব। বন্ধুও যেতে রাজি নয়। অগত্যা আমাকেই টমটম চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাল খুব ভোরে উঠে আমরা দু'জনে রওনা হব। আপনি খাবারদাবার বেঁধে ঠিক করে রাখবেন, কেমন?

যাক! আমার মনটা এতক্ষণে হালকা হয়ে গেল। যেই শুনেছি টাঙ্গা পাওয়া যায়নি, অমনি মনটা যে কী ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল তা কী বলব। চোখফেটে যেন জল আসছিল। এখন যাবার আনন্দে কল্পনার পাখি হয়ে উড়ে চলল মন। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি? সেই কতটুকুর এতটুকুও তো জানতে পারব কাল?

পরদিন খুব ভোরে উঠে আকাশের তারা থাকতে থাকতে রওনা হলাম দু'জনে। আমি আর বাহাদুর। বাহাদুর নিজেই টমটম চালাতে লাগল। আপার হাফলঙের পথে ছুটে চলল আমাদের টমটম।

ক্রমে আমরা লোকালয় ছেড়ে এক ঘন অরণ্যভূমির মধ্যে এসে পড়লাম। কত ছোট ছোট নদী ও ঝরনার পাশ দিয়ে যে আমাদের টমটম ছুটে চলল তার ঠিক নেই। আমার মনে হল যেন রূপকথার রাজপুত্র আমি। রথে চড়ে দিগ্বিজয়ে চলেছি। আর বাহাদুর আমার সারথি। ওঃ! সে যে কী আনন্দ!

আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রচুর খাবার। আর দু'জনের জন্যে দুটো ধারালো কুড়ুল। আত্মরক্ষার জন্যে এ-দুটো সঙ্গে নিয়েছি আমরা। যদিও জানি সত্যিকারের বিপদ এসে সামনে দাঁড়ালে হাতের কুড়ুল হাতেই থাকবে। তবুও নিয়েছি।

যেতে যেতে ভোরের আলো মুছে গেল এক সময়।

তরুণ রবির অরুণ আলোয় বনভূমি ঝলমলিয়ে উঠল। আহা কী অপরূপ। ফুলের গন্ধে অপরিচিত গাছগাছালির গন্ধে মনপ্রাণ ভরে উঠল। কত পাখির কণ্ঠস্বর কানে এল। কত সুন্দর হরিণ যে চোখে পড়ল, তা বলে বোঝাতে পারব না।

যাই হোক। এইভাবে যেতে যেতে বেলা প্রায় দশটা নাগাদ টমটম এসে এক জায়গায় থামল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিড্ডিম আর কত দূরে বাহাদুর?

বাহাদুর বলল, এই তো এসে গেলাম। এই হল তিড্ডিম। অবশ্য এবার আমাদের হাঁটাপথে আরও কিছুটা যেতে হবে। আমি যেখানে নিয়ে যেতে চাই, সেটা আরও গভীরে।

বললাম, এটাই তো ফরেস্ট। আরও গভীরে?

হ্যাঁ বাবু। এখানে সচরাচর কেউ আসে না।

আর বাক্যব্যয় না করে দু'জনেই নেমে পড়লাম টমটম থেকে।

বাহাদুর একটা শাল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে টমটম বাঁধল। তারপর ঘোড়াটাকে মুক্ত করে অপর একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে খেতে দিল তাকে।

আমি বললাম, বাহাদুর! এবার আমাদেরও একটু জলযোগ সেরে নেওয়া যাক, কী বলো?

হ্যাঁ। বেলা তো হয়েছে অনেক। এখনও হাঁটাপথ বাকি আছে।

আমাদের সঙ্গে কলা, পাউরুটি, ডিম, সন্দেশ ইত্যাদি ছিল। পেট ভরে খেয়ে নিলাম দু'জনে। খাওয়া হলে দু'জনে দুটো কুড়ুল ঘাড়ে করে টর্চ ও খাবারের জায়গা নিয়ে এগিয়ে চললাম। একটা পিস্তলও ছিল আমার সঙ্গে। তবে সেটার কথা বাহাদুরকে বলিনি। খুব বিপদে না-পড়লে সেটা ব্যবহার করব না।

যাই হোক, হাঁটাপথে যেতে যেতে নয়ন-মনোহর সৌন্দর্যে অন্তর ভরে উঠল। এ পথে যে বিপদ আছে, এই পথের প্রতিটি পদক্ষেপে যে মরণ হাতছানি দিয়ে ডাকে, তা আমার মনেই হল না।

বাহাদুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

প্রকৃতির এমন সালংকারা রূপ এই প্রথম দেখলাম আমি।

বেশ কিছু পথ এসেছি। হঠাৎ হাতে একটা হেঁচকা টান। এমন মারাত্মক টান যে, আর একটু হলেই ছিটকে পড়েছিলাম। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল। হল কী?

বাহাদুর হিসস, করে উঠল। তারপর আঙুল দিয়ে দেখাল সামনের দিকে।

আমি দেখলাম আমার ঠিক চোখের সামনেই সবুজ লতার মতো কী যেন একটা দুলছে। যেন কোনও লতানে গাছের শাখাগ্র একটি।

বাহাদুর বলল, সাপ।

সাপ?

হ্যাঁ বাবু। পাহাড়ে যে কত রকমের সাপ আছে। নাম জানি না। আর একটু

হলেই ওটা আপনার গায়ে ঠেকে যেত। আর ঠেকলেই সর্বনাশ। নিমেষের মধ্যে চুটিয়ে দিত একেবারে।

আমার হাত-পা তখন হিম হয়ে গেছে। বললাম, ভাগ্যে ধরলে? যাক। ওর তলা দিয়ে না-গিয়ে বরং পাশ দিয়ে চলে যাই চলো।

বাহাদুর বলল, এখন যাবেন কী বাবু? ওর কাছ দিয়ে গেলেই ও চুটিয়ে দেবে।

বাহাদুরের কথা শেষ হতে-না-হতেই সেই লতার মতো সাপটা তিরের মতো সাঁত করে ছিটকে গেল একটা ঝোপের দিকে।

যাক। আপদ গেল।

বাহাদুর বলল, খুব সাবধান। ভাল করে চারদিক দেখে পথ চলবেন। তাড়াতাড়ি করবেন না। অযথা বেশি কথা বলবেন না। আসুন, যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছে তখন।

বাহাদুরকে আগে দিয়ে আমি ওর পিছু পিছু পথ চলতে লাগলাম।

খানিকটা পথ আসার পরই দেখি পথ রুদ্ধ। একটা মস্ত গাছকে বেড় দিয়ে কতকগুলো পাহাড়ি-ময়াল সোঁ সোঁ শব্দ করছে। গাছের ডালে পাকিয়ে কোনও ময়ালের মুখ নীচের দিকে দুলছে। একটা ময়াল শিকার ধরেছে। সম্ভবত হরিণ শিশু। তার আধখানা গিলেছে, আর বাকি আধখানা গেলবার চেষ্টা করছে।

আমরা পাশ কাটিয়ে একটু বাঁকা পথে সে রাস্তা পরিত্যাগ করলাম।

এইভাবে অনেক পথ হেঁটে এক সময় এক জলাশয়ের ধারে পৌঁছলাম আমরা।

আমি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না। বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য যেন এক সঙ্গে জমা হয়েছে এখানে। প্রকৃতির সে কী রূপ। চারদিকে পাহাড়—পাহাড় আর পাহাড়ের চূড়া। দূরদূরান্তেও পাহাড়ের রেখা। তারই গায়ে গায়ে পুষ্পিত বনভূমি। কত রঙের সমারোহ। আর যে জলাশয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা, সেই জলাশয় পদ্মবনে ভরে আছে। জলাশয়ের আশেপাশে গোলাপের বন। আর জলাশয়ের মধ্যে বড় বড় অতিকায় পদ্মপাতার ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় পদ্মকুঁড়ি ও পদ্মফুলগুলি ফুটে আছে। কত পাপড়ি ঝরে জলের ওপর ভাসছে। যেন ছোট ছোট পাল তোলা নৌকো। দেখে মোহিত হয়ে গেলাম।

সেই জলাশয়ের ধারে একটি পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি গুহা ছিল। গুহার মুখ এত সংকীর্ণ যে, হামাগুড়ি দিয়ে না-ঢুকলে এর ভেতরে ঢোকার কোনও উপায় নেই।

বাহাদুর বলল, এই গুহার ভেতরেই আমাদের আশ্রয় নিতে হবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তা তো নিতে হবে। কিন্তু যদি এর ভেতরে কোনও জীবজন্তু বাসা নিয়ে থাকে তা হলে?

যতদূর জানি গুহাটা নিরাপদ। তবু ঢোকার আগে একবার দেখে নেব বইকী। এই বলে গুহামুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখের দু'পাশে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে একটু চেঁচিয়ে উঠল বাহাদুর—আ—হু—আ—।

বাহাদুরের সেই কণ্ঠস্বর পাহাড়ে-পর্বতে ধ্বনিত হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু গুহামুখ থেকে কোনও প্রত্যুত্তর এল না। বাহাদুর তখন আমার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল গুহার ভেতর। একটু পরেই হাসিমুখে আবার বেরিয়ে এল সে। এসে বলল, না। ভয় নেই। আসুন ভেতরে আসুন।

আমি বাহাদুরের সঙ্গে গুহার ভেতরে ঢুকলাম। গুহামুখ সংকীর্ণ হলেও ভেতরটা প্রশস্ত। ভেতরে ঢুকে বেশ ভালভাবে গুছিয়ে বসলাম দু'জনে।

একটু পরে আবার কী মনে করে গুহার বাইরে গেল বাহাদুর। তারপর দু'-একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে বড় বড় পাথরের চাঁই গুহামুখে জড়ো করে ভেতরে এসে বলল—এবার নিশ্চিন্তে বসে বাইরের দৃশ্য দেখুন। একটু পরেই দেখবেন বুনো হাতির দল জল খেতে আসবে। সে যে কী দৃশ্য, তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। সেই দৃশ্য দেখাবার জন্যই আপনাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি।

গুহার ভেতরে বসে বাইরের জলাশয়ের দিকে চেয়ে রইলাম আমি। বুনো হাতির দল কখন জল খেতে আসবে কে জানে? ততক্ষণে আমরা আমাদের সঙ্গের বাকি খাবারগুলো উদরস্থ করতে লেগে গেলাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, এক সময় বুনো হাতির দলকে দেখা গেল। সামনের একটা খাড়াই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দলে দলে বুনো হাতি সারিবদ্ধভাবে নেমে আসছে দেখলাম। কী চমৎকার তাদের আসবার ভঙ্গি। প্রথমে প্রকাণ্ড চেহারার একটা হাতি, তারপরে তার চেয়ে আকারে একটু ছোট একটি হাতি, তারপরে আরও একটি ছোট হাতি। এইভাবে ঠিক আকৃতি অনুযায়ী পরের পর লাইন দিয়ে আসছে সব। সবার পিছনে একেবারে ছোট্ট হাতিটি। শুঁড় দুলিয়ে সকলে সেই জলাশয়ে নেমে এল। মস্ত জলাশয়। জলে নেমে শুঁড়ে করে জল নিয়ে এ ওর গায়ে ফোয়ারার মতো ছিটোতে লাগল।

এইভাবে সারাক্ষণ ধরে চলতে লাগল তাদের জলক্রীড়া।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে এল।

আমি বললাম, বাহাদুর, এবার ফেরা যাক।

বাহাদুর বলল, এখন কী করে যাবেন? হাতির দল না-যাওয়া পর্যন্ত বেরোবার

উপায় আছে নাকি? ওরা বড় সাংঘাতিক। একবার যদি দেখতে পায় তো শেষ না-করে ছাড়বে না।

বলো কী!

হ্যাঁ।

হঠাৎ বনভূমির ভেতর থেকে একটি ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল। সে এমন এক ভয়ংকর ডাক যে রীতিমতো হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল আমাদের। অমন সাহসী বাহাদুরেরও বুক কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াল হাতির দল। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে দু'পা তুলে শুঁড় উঁচু করে প্রত্যুত্তর দিল, হ্যাররো—ও—ও—ও।

বাহাদুর বলল, মনে হচ্ছে সাংঘাতিক একটা বিপদ ঘটবে এবার। জন্তুটা যদি গুহার ভেতরে আশ্রয় নিতে আসে তা হলে তো বিপদের শেষ থাকবে না।

কেন, আমরা তো বেশ নিরাপদ আশ্রয়েই আছি। তা ছাড়া গুহার মুখও তো গাছের ডাল আর পাথর দিয়ে ঘেরা।

তা হলেও ভেতরে ঢুকতে না-পেলে ও কি সহজে চলে যাবে ওর আশ্রয় ছেড়ে? আমরা বেরোলেই আমাদের আক্রমণ করবে।

এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম আমি। বললাম, তা হলে উপায়?

উপায় আর কী? লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে হবে।

এমন সময় আবার সেই ডাক।

হাতির দলও তখন রণং দেহি হয়ে তার প্রত্যুত্তর দিল। রাগে শুঁড় দুলিয়ে, অঙ্গ দুলিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি চালাতে লাগল।

বাহাদুর হঠাৎ বলল, ওই—ওই—ওই দেখুন।

আমি দেখলাম পাহাড়ের এক উচ্চস্থানে একটা ভয়ংকর জন্তু দাঁড়িয়ে। বৃহদাকৃতির জানোয়ার সেটা। ঘন কালো গায়ের রং। খাড়া খাড়া লোম। চক্ষু রক্তবর্ণ।

বাহাদুর বলল, বাঘ।

বাঘ? বাঘ ওইরকম হয় নাকি?

হ্যাঁ। হিমালয়ের ভয়ংকর অনেক রকমেরই হয়। বাঘের অনেক রকম জাত আছে।

বাঘটা তখন চোখের পলকে সেই উচ্চস্থান থেকে সবচেয়ে বড় হাতিটার পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ভেসে গেল হাতির দেহটা। লাল হয়ে উঠল জলাশয়ের জল।

শুরু হল প্রচণ্ড দাপাদাপি আর আর্তনাদ। লেগে গেল ভয়ানক যুদ্ধ। বড় হাতিটা শুঁড়ে করে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করল বাঘটাকে। কিন্তু পারল না।

অন্যান্য হাতিগুলো তখন ছুটে এল। বাঘটা বেড়ালের মতো থাবা গেড়ে হাতির পিঠে বসে ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করতে লাগল।

উঃ। সে কী ভয়ংকর দৃশ্য।

বাঘটা ততক্ষণে হাতিটাকে চিরে ফালা ফালা করে ফেলেছে।

মাঝারি সাইজের একটা হাতি এসে ততক্ষণে শুঁড়ে করে জড়িয়ে ফেলল বাঘটাকে। তারপর পাকিয়ে ধরে বড় একটা পাথরের ওপর মারল এক আছাড়। সঙ্গে সঙ্গে অপর একটা হাতি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘটার ওপর। তারপর সবাই মিলে লাথির পর লাথি।

বাঘটা প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়ল একসময়। এবং অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করল।

বড় হাতিটাও ক্ষতবিক্ষত দেহে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

হাতির দল অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল তাদের দলপতির প্রাণহীন দেহটার দিকে। তারপর সবাই মিলে শুঁড় উঁচিয়ে শেষ প্রণাম জানিয়ে, আবার সারিবদ্ধভাবে চলে গেল যে যার।

আমরাও আর দেরি করলাম না। গুহামুখ থেকে বেরিয়ে আবার সেই পাহাড়িপথ বেয়ে টমটমের কাছে পৌঁছলাম। কিন্তু কে জানত যে এক বিপদ কাটিয়ে এলেও আর এক বিপদ অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে? গিয়ে দেখলাম শুধু টমটমটাই পড়ে আছে সেখানে। ঘোড়াটা নেই।

বাহাদুর বলল, সর্বনাশ হয়েছে বাবু। ঘোড়াটাকে বাঘে খেয়েছে।

বাঘ!

হ্যাঁ দেখছেন না রক্তের দাগ আর পায়ের ছাপ?

তা হলে ফিরব কী করে?

কী করে আর ফিরব? এই বনের ভেতরেই কোনও একটা নিরাপদ জায়গা দেখে রাত্রিটা কাটাতে হবে। ফেরার কথা ভাবা যাবে কাল।

আমি হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। সত্যি বলছি, এরকম বিপদে পড়ব জানলে এখানে আমি কোনও মতেই আসতাম না।

দুই

সূর্য তখন কাছেরই একটা পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। সন্ধ্যা আসন্ন হলেও দিনের আলো একেবারে মুছে যায়নি। সমস্ত পার্বত্য-প্রকৃতি তখন কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি বাহাদুরকে বললাম, এইভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বাহাদুর? আর একটু পরেই তো রাতের অতিথিদের আবির্ভাব ঘটবে। এবার একটা আশ্রয়ের চেষ্টা দেখো।

বাহাদুরকে একটু চিন্তিত দেখাল। বলল, হ্যাঁ। তাই তো ভাবছি। কোথায় যাওয়া যেতে পারে! সেরকম নিরাপদ আশ্রয় এই বনের ভেতর কোথায় পাব?

আমার তখন সত্যি বলতে কী, ভয় ভাবটা কেটে গেছে। শুনলে হয়তো মিথ্যে বলে মনে হবে, তবুও বলছি, আমার বেশ আনন্দ হচ্ছিল তখন। সে আনন্দ যে কী, তা কথায় প্রকাশ করে বলতে গেলে এই কথাই বলা যায় যে, আমি এক ধরনের রোমাঞ্চকর আনন্দ উপভোগ করছিলাম। এই রকম অবস্থায় সাহস যে আমার কী করে এল তা আমিই জানি না। সাহসে বুকটা ভরে উঠল। ভাবলাম জীবনের এতগুলো বছর দিব্যি তো নিরাপদে কাটালাম। এবার দেখিই না একটু ভয়ের মুখোমুখি হয়ে। এ সুযোগ আর তো আসবে না। তাই বেশ ঠান্ডামাথায় বাহাদুরকে বললাম, আচ্ছা বাহাদুর, আবার আমাদের সেই গুহায় ফিরে গেলে হয় না?

বাহাদুর চমকে উঠল। বলল, আপনার মাথাখারাপ হয়েছে নাকি?

কেন?

দেখছেন না অন্ধকার হয়ে আসছে। সেই দুর্গম পথে এখন কী যাওয়া যায়?

তা হলে কি বলতে চাও এখানে দাঁড়িয়ে বাঘের মুখেই বেঘোরে প্রাণটা দেব?

না না। তা নয়।

তবে আর দেরি করছ কেন? এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? আশ্রয় তো পাব না কোথাও। শেষমেশ গাছের ডালে বসে রাত কাটাতে হবে। কিন্তু সেটা করার চেয়ে সেই গুহাতেই ফিরে যাওয়াটা ভাল নয় কি?

বাহাদুর একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। যত দুর্গমই হোক। আমাদের সেইখানে ফিরে যাওয়াটাই ভাল। একটু সতর্ক হয়ে রাত্রিটা কাটাতে পারলে কাল সকালে রওনা হওয়া যাবে। না হলে এভাবে এখানে থাকলে বেঘোরে মরব।

আমরা আর বিলম্ব না করে দ্রুত পা চালিয়ে আবার ফিরে চললাম সেই গুহার দিকে।

ছোট গুহা। গুহামুখও বড় নয়। কোনওরকমে পাথর-টাথর দিয়ে মুখটা বুজিয়ে রাখলে একেবারে নিশ্চিন্তে রাত্রিটা কাটানো যাবে। এই ভেবে আমরা আরও একটু বাঁকা পথে বড় বড় পাথরে পা দিয়ে কিছুটা লাফিয়ে লাফিয়েই সেই গুহার কাছে পৌঁছলাম। একটু বাঁকা পথে এসেছিলাম বলে গুহার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে সেই ভয়ংকর কালো বাঘটা আক্রমণ করেছিল হাতিটাকে, সেই দিকে এসে পড়লাম।

মস্ত বাঘটা দেখলাম মৃত পড়ে আছে। আর কিছু দূরেই রক্তাক্ত কলেবরে মরে আছে অতিকায় হাতিটা। আমি প্রথমে বাঘের পিঠের ওপর উঠে দাঁড়ালাম। তারপর উঠলাম হাতির ওপর। বাহাদুরকে বললাম, কাল সকালে যাবার আগে এই বাঘের ছালটা কিন্তু ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। আর সেই সঙ্গে নিয়ে যাব হাতির দাঁতদুটো। কী বড় বড় দাঁত দেখেছ? ও-দুটোর কিন্তু অনেক দাম।

বাহাদুর বলল, কিন্তু এত সব বইবেন কী করে বাবু?

যেমন করেই হোক, বইতে হবে।

এক একটা দাঁতের ওজন জানেন? তা ছাড়া কাল সারাটা পথ আমাদের হেঁটেই যেতে হবে। কী করে নিয়ে যাব?

উপায় একটা বার করতেই হবে বাহাদুর। না হলে এগুলোকে তো ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। একান্ত না নিয়ে যেতে পারি, ওই গুহার ভেতরেই যত্ন করে লুকিয়ে রেখে যাব। পরে বরং একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে নিয়ে যাব এসে।

সে পরের কথা পরে আছে।

পরের কথা নয়। আমাদের কাছে কুড়ুল আছে। ছুরি আছে। ছালটা ছাড়াতে, আর দাঁতদুটো কেটে নিতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

অবশেষে রাজি হল বাহাদুর। হেসে বলল, বেশ। আপনি যখন বলছেন তখন নেব। দাঁতদুটো এখুনি কেটে নিচ্ছি। ছালটা ছাড়াব কাল সকালে। কেন না ছাল ছাড়াতে সময় লাগবে তো। এই বলে ঝপাঝপ করে কয়েকটা কোপ মেরে দাঁতদুটো কেটে ফেলল বাহাদুর।

হাতির দাঁত পেয়ে আমার খুব আনন্দ হল। কিন্তু আমার চেয়েও বেশি আনন্দ দেখলাম বাহাদুরের। তবে সে আনন্দ দাঁত পাওয়ার জন্য নয়। সে আনন্দ অন্য রকমের। সে করল কী হাতির গায়ে কোপ বসিয়ে থাবা থাবা মাংস কেটে নিতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ও কী হচ্ছে বাহাদুর! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন?

বাহাদুর হেসে বলল, হাতির মাংস খেয়েছেন বাবু?

না। হাতির মাংস আবার খায় নাকি কেউ?

পায় না তাই খায় না। যখন পেয়েছি তখন ছাড়ি কেন? আমি তো খাবই। আপনিও খাবেন।

আমার দরকার নেই ভাই। তুমিই খাও। কিন্তু রাঁধবে কীসে?

রাঁধব কেন, আগুনে ঝলসে খাব।

বেশ, যা ইচ্ছে করো। এখন তাড়াতাড়ি চলো, আগে গিয়ে গুহায় ঢুকি।

বাহাদুর বলল, চলুন। বলে হাতির দাঁতদুটো কাঁধে নিয়ে কুণ্ডুলটা বাগিয়ে ধরে চলল।

আর আমি সেই তাল তাল মাংস যতটা পারলাম নিয়ে বাহাদুরের পিছু পিছু গুহার কাছে চলে এলাম।

গুহার ভেতরটা তখন ঘন অন্ধকারে ঢাকা। একেই তো গুহা এমনিতে অন্ধকার, তার ওপর সন্ধ্যার অন্ধকারে সে আঁধার আরও ঘনীভূত। আরও জটিল।

বাহাদুর প্রথমেই করল কী, আশপাশ থেকে যত শুকনো ডালপালা এনে জড়ো করল গুহামুখে। তারপর দু'-একটা মোটা কাঠকে চেলা করে কাটল।

গুহামুখে বাহাদুর আর আমি যতটা পারলাম বড় বড় পাথর এনে জড়ো করলাম। পাথরগুলো এমনভাবে সাজালাম যাতে গুহার ভেতরে ঢুকে সেগুলো অনায়াসে ভেতর থেকে টেনে নিয়ে গুহামুখে বন্ধ করে দিতে পারি।

বাহাদুর গুহার ভেতরে ঢোকার আগে আবার সেই বিচিত্র সুরে মুখের দু'পাশে দুটো হাত রেখে চিৎকার করে উঠল, আ—হু—আ—। পরে আমার হাত ধরে এক পাশে সরে দাঁড়াল। এরপর গুহার ভেতর থেকে কোনও প্রত্যুত্তর আসে কি না শোনবার জন্য অপেক্ষা করলাম। কিন্তু না। কোনও উত্তর এল না ভেতর থেকে। শুধু বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে তিড্ডিমের সেই প্রেতপুরীর মতো অন্ধকার গুহা ও পার্বত্য বনভূমি কেঁপে উঠল একবার। তারপর প্রতিধ্বনির ঢেউ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরান্তরে।

বাহাদুর গুহামুখে বসে প্রথমেই শুকনো ডালপালা ও কাঠ ধরিয়ে মাংসটাকে ঝলসে নেবার ব্যবস্থা করল। আমি গুহার ভেতরে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে গুহাটাকে বেশ ভাল করে ঘুরেফিরে দেখতে লাগলাম।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রির অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেছে তখন। সেই অন্ধকারে গুহামুখের লাল অগ্নিশিখায় চারদিক রাঙা হয়ে উঠল।

কিছুটা আলো গুহার ভিতরেও গিয়ে পড়ল।

আর সেই আলোয় দেখতে পেলাম গুহাটা ভেতরে প্রশস্ত হয়ে কিছুদূরে গিয়ে আবার সংকীর্ণ হয়ে বেঁকে গেছে। বাইরে থেকে ঢুকে টর্চের আলোয় সেই বাঁক

সহসা চোখে পড়বে না। মনে হবে বাঁকটা একটা দেওয়ালের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে বুঝি।

আমি টর্চের আলো ফেলে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। সে কী ভীষণ অন্ধকার।

কালো পাথরের বুকচিরে গুহাটা ক্রমশ ভেতর দিকে চলে গেছে। নেহাত কৌতূহলের বশেই আমি এগোতে লাগলাম সেই পথে।

কিছুদূর যাবার পর বাঁকের মুখে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ একটা শব্দ আমার কানে এল।

শব্দটা অন্য কিছুর নয়। মনে হল কোথায় যেন ছর ছর করে জল পড়ছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে সেই জল পড়ার শব্দটা শোনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। শব্দটা একটানা। যা শুনে মনে হল এটা কোনও ঝরনা বা জলপ্রপাতের শব্দ। কিন্তু ঠিক কোন দিক দিয়ে যে শব্দটা আসছে তা কিছুতেই অনুমান করতে পারলাম না।

যেদিকে কান পাতি সেদিকেই শব্দ।

হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে দেখি রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে। আর যাবার কোনও পথ নেই। শুধু দেওয়াল আর দেওয়াল। শব্দটা কিন্তু সেখানেও শোনা যাচ্ছে।

পথ না পেয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় দেখি, আমার ঠিক বাঁদিক দিয়ে ওইরকম সরু কোনওরকমে একজন লোক যেতে পারে এমন একটি গর্ত অন্ধকারের সঙ্গে মিশে রয়েছে। আমি টর্চের আলো ফেললাম তার ভেতর। দেখলাম এ গর্তটা লম্বা হয়ে দুরে বহু দূরে হারিয়ে গেছে।

আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

সেই পথ ধরে আরও এগিয়ে যাবার পরই দেখলাম ডাইনে বাঁয়ে ওইরকম সুড়ঙ্গপথ অন্তত আরও দশ পনেরোটি গুহার অন্দরে অন্দরে চলে গেছে। ওরই মধ্যে যেটি একটু বড় আমি সেইটির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিছুটা আসার পর দেখলাম সেটা এত প্রশস্ত হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে সমস্ত পর্বতটাই বুঝি ফাঁপা।

আরও কিছু পথ আসতে দেখলাম শীতল জলে ডুবে যাচ্ছে পায়ের পাতা।

কি ঠাণ্ডা সেই জল।

তবে জলটা স্থির বা জমা জল নয়। বেশ টান আছে।

ছর ছর শব্দটা তখন আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব কাছ থেকে আসছে শব্দটা। কিন্তু সেই শব্দের উৎস যে কোথায় তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না। চারদিকে টর্চের আলো ফেলতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় কি?

জল মাড়িয়ে আমি আরও একটু সামনের দিকে এগোলাম। দেখলাম ক্রমশ জলে ডুবে যাচ্ছে পা। অর্থাৎ বেশি জলের দিকে চলে যাচ্ছি। তখন হঠাৎ আমার

খেয়াল হল এ আমি কি করছি? বদ্ধ গুহার অভ্যন্তরে এই জলে আমি দাঁড়িয়ে আছি কোন সাহসে? যদি কোনও সাপ অথবা অন্য কোনও জলজ জন্তু আমাকে আক্রমণ করে? তখন? তখন কি হবে?

এই জলরাশি হয়তো পাতালপুরীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। একা তো এ পথে অভিযান চালানো যায় না। তাই ফিরে যাওয়াই উচিত। বিশেষ করে বাহাদুর ওখানে একা আছে। যদি গুহার ভেতরে ঢুকে আমাকে দেখতে না পায় তা হলে ভয়ানক চিন্তায় পড়ে যাবে সে। আমি কোথায় গেলাম কি করলাম ভেবে কিছুই কূল পাবে না। তাই আস্তে আস্তে আবার যে পথে এসেছি সেই পথে ফিরে চললাম।

এমন সময় হঠাৎ দেখি কোনও এক গুহামুখ আলোয় ভরে উঠল।

তারপর দেখি আর একটা।

তারপর আরও একটা।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম আমি।

তাড়াতাড়ি জল পার হয়ে শুকনো জায়গাটায় উঠে দাঁড়ালাম।

তখন গুহার ভেতরটা একেবারে আলোয় আলোয় ভরে গেছে।

দেখি না সেই অগুনতি গুহামুখ থেকে শত শত প্রদীপ জলের স্রোতে ভেসে আসছে। প্রদীপের পর প্রদীপ। আলোর পরে আলো।

সেই জ্বলন্ত প্রদীপ গাছের ছালে কলার পেটোয় ভেসে জলস্রোতে এগিয়ে চলেছে।

যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। সেই সঙ্গে প্রদীপের আলো। সেই অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় যেন হীরা মাণিক জ্বলছে।

আলোর ছটায় চোখের তারা নেচে উঠল আমার। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য।

হঠাৎ ও কি!

একটা অতিকায় ভয়ঙ্কর পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সেই জলরাশির বুকের ওপর দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি ভয়ে দ্রুত ছুটতে লাগলাম।

কিন্তু যাব কোন দিকে? কোথায় আমার পথ? চারদিকে শুধু সংখ্যাতীত গুহামুখ। সেই গুহামুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুল হয়ে গেল আমার।

ওদিকে পাখিটাও তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। পাখি তো নয়, যেন মরণ দূত।

আমি তখন কি যে করব কিছু ঠিক করতে পারলাম না। হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এল। টর্চের আলোটা সরাসরি তার মুখের ওপর ফেললাম! কিন্তু সে কৌশল ব্যর্থ হল আমার। সে আলোতে অন্য প্রাণীর চোখ ধাঁধাতে পারে কিন্তু সেই ভয়ঙ্করের

চোখ ধাঁধাবে কেন? আলো লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসতে লাগল সে।

পাখিটা এত জোরে আসছে যে তার ডানা ঝাপটানিতে সমস্ত গুহাটা কেঁপে উঠছে।

আমি প্রাণের ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম—বা-হা-দু-র।

আমার চিৎকারে গুহাটা ঝমঝম করে উঠল।

আমার ডাক সিংহনাদের মতো ছড়িয়ে পড়ল গুহাময়। তারপর দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে গহ্বর বিদীর্ণ করে হারিয়ে গেল দূরে—বহু দূরে—।

আমার চেঁচানিতে ভয়ে থমকে গিয়ে পাখিটা ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার ওপর। তবে ঘুরপাক খেলেও তার আসল লক্ষ্য যে আমি তা বুঝতে পারলাম।

ততক্ষণে আমি ছোট্ট একটু গুহামুখে ঢুকে পড়েছি।

আর পাখিটা তখন নিষ্ফল আক্রোশে গুহামুখ আগলে বারবার ডানা ঝাপটাতে লাগল এবং চিৎকার করতে লাগল ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁক্

ক-র-র-র।

আমি গুহামুখে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর এগিয়ে চললাম ভেতর দিকে। হামাগুড়ি দিয়ে শামুকের মতো গুটি গুটি এগিয়ে চললাম। সেই ভাবে খানিক যাবার পর সোজা হয়ে চলতে শুরু করলাম আবার।

চলতে চলতে হঠাৎ আর এক গোলক ধাঁধায় আটকে গেলাম। সেখানেও দেখি সেই একই ব্যাপার। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ। ভয়ে আমার হাত পা অবশ হয়ে গেছে তখন। আমি চিৎকার করতে লাগলাম—বাহাদুর...বাহাদুর...

সত্যি বলতে কী, তখন আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি। কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও যেখানটা একটু প্রশস্ত সেখানে ছুটে গিয়ে দিশেহারার মতো বেরোবার পথ খুঁজতে লাগলাম। আর চিৎকার করতে লাগলাম—বাহাদুর...বাহাদুর...। যদি কোনও রকমে বাহাদুর আমার ডাক শুনতে পেয়ে ছুটে আসে তাই।

আমার ডাক হঠাৎই থেমে গেল। মুখ দিয়ে বাহাদুরের বা-টুকুই বেরুল শুধু। বাকিটা বেরুল না।

এই পাতালপুরীতে এসে এ কী দেখছি! এ স্বপ্ন না সত্যি?

দেখলাম আমার চোখের সামনে দু'দুটো মানুষের কঙ্কাল উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কবে, কতদিন আগে যে এই দুই হতভাগ্য আমারই মতো এর ভেতরে এসে পড়েছিল তা কে জানে? আমারই মতো তারাও হয়তো বেরোবার পথ খুঁজে পায়নি।

এই গুহাভ্যন্তরে আমার দশাও ওদেরই মতো হবে হয়তো।

ওদের মাথার কাছে মাঝারি সাইজের একটা ব্যাগ মলিন অবস্থায় পড়েছিল।

ব্যাগটা কুড়িয়ে নিলাম আমি। তারপর সেটার চেন টানতেই দেখলাম নীল রঙের একটা মস্ত কাগজে কীসের যেন একটা ম্যাপ আঁকা। দেখে বুঝলাম ম্যাপটা এই গুহারই। ম্যাপের উলটো পিঠে ছোট ছোট অক্ষরে কি যেন লেখা আছে।

আমি ঝুঁকে পড়ে সেই লেখাগুলো পড়বার চেষ্টা করছি এমন সময় পিছন দিক থেকে একটা সাঁ সাঁ শব্দ কানে এল। ফিরে তাকিয়েই দেখি এক অতিকায় পাইথন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি আর কালবিলম্ব না করে ছুটে চললাম।

ম্যাপটা গুঁজে নিলাম পকেটে।

সোজা সামনে না ছুটে আমি করলাম কি, বাঁদিকের একটা গুহামুখে ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু কে জানত তখন সে অনাদি অনন্তকাল ধরে এমন ঘন শ্যাওলার আস্তরণ জমে ছিল এর ভেতর! তাই ঢোকা মাত্রই সজোরে আছাড় খেয়ে পড়লাম পাথরের ওপর। তারপর হড় হড় করে পিছলে যেতে লাগলাম নিচের দিকে। উঃ কি অসম্ভব ঢালু সেই জায়গাটা। পিছলে যেতে যেতে এক সময় ঝপাং করে পড়ে গেলাম আবার সেই জলরাশিতে।

কি অসম্ভব জলের টান সেখানে।

মাথার উপরটা একটু ফাঁকা। এক পাশ দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেখা গেলে কি হবে, সেই মুক্তির জগতে আমি কি করে পৌঁছুব?

শব্দের উৎস এইখানেই। কোন পাহাড়িয়া নদী বা ঝর্ণা ওপরে পাথরের প্রান্তর বেয়ে যেতে যেতে এইখানে ঢালু পেয়ে জলপ্রপাতের মতো হুড় হুড় করে পড়ছে। জলপ্রপাতের শব্দের উৎস এখানে হলেও জলের উৎস কিন্তু এখানে নয়। বেশ ধীর মেজাজে অপরাপর গুহামুখ থেকেও স্তনেক জলস্রোত এখানে এসে মিলছে।

যাই হোক। মাথার ওপর আকাশ নক্ষত্র দেখতে পেলেও সেখানে আমি পৌঁছুতে পারলাম না। কেননা প্রপাতের জল আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল সেই জলরাশির দিকে।

আমি জলের তোড়ে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

কিছুটা এই ভাবে ভেসে আসার পর জলের স্রোতের বেগ কম অনুভব করলে কোনও রকমে পাথরের দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালাম।

তারপর যেদিকটা একটু শুকনো সেই দিকে আবার এগোতে লাগলাম।

এমন সময় আবার শুনতে পেলাম সেই ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ। দেখলাম সেই জলরাশির ওপর দিয়ে আবার তেড়ে আসছে সেই সাংঘাতিক পাখিটা।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমার। হঠাৎ মনে পড়ল, আরে! আমার কাছেই তো

পিস্তল রয়েছে একটা। তবে আর ভয় করি কেন পাখিটাকে?

পাখিটা তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

উঃ কী বিরাট। কী ভয়ংকর।

ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে।

আমি পিস্তলটা বার করবারও সময় পেলাম না। পাখিটা তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। তারপর চিল যেমন ছোঁ মেরে কোনও কিছু তুলে নেয়, আমাকেও ঠিক সেই ভাবেই তুলে নিয়ে উড়ে চলল জলরাশির ওপর দিয়ে। দূরে অনেক দূরে সেই জ্বলন্ত প্রদীপ ভেসে চলেছে। আমি চিৎকার করতে লাগলাম, বা-হা-দু-র...বা-হা-দু-র...।

তিন

ভগবান আমাকে আর কিছু দিন বা না-দিন বিপদে সাহস হারাতে দেননি কখনও। তাই এত বড় বিপদেও ঘাবড়ে গেলাম না।

এক হাতে টর্চ যেমন ধরা ছিল, তেমনি ধরাই রইল। অপর হাতে পিস্তল বার করে গুলি করবার জন্য তৈরি হলাম।

এই পাখিটা যে পথে আমাকে নিয়ে চলেছে, সেই পথই হয়তো আমার মুক্তির পথ। এই পথে গেলেই হয়তো গুহার বাইরে আমি যেতে পারব। কিন্তু এই বিশাল গহ্বরের শেষ কোথায়?

পাখিটাকে তাগ করে পিস্তল উঁচিয়ে সবে গুলি করতে যাচ্ছি, এমন সময় পাখিটা আমাকে বড় একটা পাথরের ওপর নামিয়ে দিয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ করে একবার এ দেওয়াল, একবার ও দেওয়ালে বসতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য! আমাকে সে আক্রমণই করল না।

আমি টর্চের আলো ফেলে চারদিক দেখতে লাগলাম।

দেখলাম সেই জলরাশি কতকগুলো বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু সে ফাঁক এত সংকীর্ণ যে, সেখান দিয়ে জল গলতে পারে, কোনও মানুষ নয়।

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

এই রহস্যময় গুহার ভেতরে বন্দি হয়ে যত না ভয় পেলাম তত বিস্মিত হলাম। কেন না এই বিশাল গহ্বরে যেখানে পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে আছে, সেখানে এই অতিকায় পাখি এলই বা কী করে, আর ওই অজস্র প্রদীপ জ্বেলে

এই স্রোতে ভাসাচ্ছেই বা কারা? সবচেয়ে আশ্চর্য এই, পাখিটা আমার ক্ষতি না করে চিৎকারই বা শুরু করল কেন? ভূতপ্রেত মানি না। কাজেই ব্যাপারগুলো ভুতুড়ে ভাবতেও ইচ্ছে হল না। অথচ এ যা ঘটল তাকে ঠিক ভৌতিক অঘটন ছাড়া কী-ই বা বলতে পারি?

আমি পাখিটার গায়ে আলো ফেলে দেখলাম পাখিটা একটা পাথরের খাঁজ নখে করে আঁকড়ে বসে বসে হাঁফাচ্ছে। যখন বুঝলাম তার দিক থেকে আমাকে আক্রমণের কোনও আশঙ্কাই নেই, তখন একটু নিরাপদ স্থান দেখে যেখানে জল নেই, এমন একটা শুকনো জায়গায় বসে পকেট থেকে সেই ম্যাপখানা বার করলাম। যে ম্যাপ কিছুক্ষণ আগে সেই কঙ্কালদুটোর ব্যাগ থেকে বার করেছি।

ম্যাপটা মেলে ধরে দেখলাম তার পিছন দিকে খুব ছোট ছোট অক্ষরে কতকগুলো কথা লেখা আছে। অনেক চেষ্টার পর সেই লেখাটা আমি পড়তে পারলাম।

পরিষ্কার বাংলায় লেখা, 'অভিশপ্ত তিড্ডিমে'র গুহার জঠরে অন্ধ্রের শাতবাহন সাম্রাজ্যের রাজা শাতকর্ণি আশ্রয় নিয়েছিলেন। মণি-মাণিক আর হিরা জহরতে গুহার গোপন কক্ষ ঠাসা। অতিকায় পাইথন আর বিষধর সাপেরা সেই গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে। এই গুহা সাধারণ মানুষের কাছে একটা গোলকধাঁধা। এই গুহার ভিতর একটি ঝরনা ও সপ্তনদীর অসংখ্য গতিপথ আছে। গুহার পশ্চিমদিকে জংলিদের বাস। দেবী নাগেশ্বরীর উপাসনা করে তারা। সন্ধ্যায় মায়া নদীর জলে প্রদীপ ভাসায়। এই প্রদীপ ভাসানোকে ওরা দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের প্রতীক বলে মনে করে। এই প্রদীপ নদীর গতিপথ ধরে ভেসে ভেসে শাতকর্নি গুহায় প্রবেশ করে এবং জলস্রোতে প্রপাতে পড়ে। এই জলপ্রপাত ইতিহাস বিখ্যাত নয়। তবে এই প্রপাতের জল নদীর আকারে প্রবলপ্রবাহ ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশেছে। রাজা শাতকর্ণির এই গুপ্তধনের সন্ধানে এসে বহু প্রাণ বিষধর সাপের দংশনে অথবা পাইথনের গর্ভে লীন হয়ে গেছে। জংলিদের হাতে ধরা পড়েও মরেছে অনেকে। পরিপূর্ণভাবে মানচিত্রজ্ঞান না-রেখে এই গুহায় প্রবেশ করা কারও উচিত নয়। যদি কোনও ভাগ্যবান এই ম্যাপ ধরে ঠিক পথে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পায়, তবে সেই ভাগ্যবান নিজেই যে শুধু ধন্য হবে তা নয়, ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও সে আবিষ্কার করতে পারবে। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা নগরীর ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারকের মতো তার নামও অমর হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়। — জনৈক হতভাগ্য অভিযাত্রী। পাশে তারিখ দেওয়া আছে ২।৯।১৯৪০।

আমি একাগ্রচিত্তে সেই লেখাটা একাধিকবার পড়লাম।

তারপর ম্যাপটার ওপর টর্চের আলো ফেলে খুঁজতে লাগলাম আমার

পালাবার পথ। দরকার নেই গুপ্তধনের। প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু পালাব কী করে? এই জলরাশি কী করে পার হব?

এমন সময় হঠাৎ আমার গায়ের ওপর কী যেন একটা এসে পড়ল। আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম। তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটলে দেখলাম খুব মোটা একটা শক্ত দড়ি। দড়িটা টেনে দেখলাম। বুঝলাম ছেঁড়বার ভয় নেই। এই দড়ি ধরে আমি ওপরে উঠতে পারব। কিন্তু উঠব কোথায়। ওপরে তো ছাদ। অথচ দড়িটা যে কীভাবে এল, তাও বুঝতে পারছি না।

যাক। মরেছি না মরতে বাকি আছি। উঠে তো পড়ি। এই ভেবে দড়ি ধরে আমি ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগলাম।

কিছুটা ওঠার পরই দেখলাম এক জায়গায় বারান্দার মতো চওড়া একটু অংশ রয়েছে। সেইখানে দেখলাম একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও ঝাঁকড়া চুলের বাঘছাল পরা একজন বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বলছে। যেন বিভীষিকার মতো থম থম করছে চারদিক।

আমি তাকে কিছু বলার আগে সে-ই ইশারায় আমাকে চুপ করতে বলল। তারপর আমার হাত ধরে মৃদু একটু টান দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে।

আমি তাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেলাম যদিও, তবুও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকেই অনুসরণ করলাম। কেন জানি না তার হাবভাব দেখে মনে হল, এ আমার কোনও ক্ষতি করবে না।

তার পিছু পিছু খানিক যাবার পর দেখলাম এক জায়গায় ধাপে ধাপে কয়েকটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে আগুপিছু আমরা নামতে লাগলাম।

কয়েক ধাপ নামার পরই দেখলাম দূর থেকে আলোর রেখা ভেসে আসছে। নামতে নামতে আলোটা স্পষ্ট হল। একটা প্রশস্ত ঘরের ভেতর ঢুকলাম। তারপর আর একটা। তারপর আরও একটা।

একেবারে শেষঘরে গিয়ে লোকটি বলল, এই ঘরে আপনি থাকবেন। আপনি নিশ্চয়ই একা এসেছেন?

না দু'জন। অবশ্য এখন আমি একা।

লোকটি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, যাক। ভালই হয়েছে। বাইশ বছর এই গুহার ভেতর আছি। একটিও কথা বলবার লোক পাইনি। বাকি জীবনটা দু'বন্ধুতে কোনওরকমে গল্প করতে করতে কাটিয়ে দেব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তার মানে?

আপনাকে মরতে আমি দিচ্ছি না। শুধু আমার কথামতো যদি চলেন, আর পালাবার চেষ্টা যদি না করেন, তা হলে বেঘোরে প্রাণ হারাবার কোনও ভয় নেই।

আমার হাত-পা যেন অবশ হয়ে এল। বললাম, কী বলতে চান, আপনি?

বলতে চাই যে এর ভেতর একবার যখন এসে ঢুকেছেন, তখন আর আপনার মুক্তি নেই। তিব্বিমের অভিশাপ হচ্ছে এই গুহা। এখানে ঢুকলে হয় মৃত্যুকে বেছে নিতে হবে, নয় সারাজীবন বন্দি হয়ে থাকতে হবে আমার মতো।

আমি মৃত্যুকেই বেছে নেব। এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

লোকটি যেন চমকে উঠল, সে কী!

হ্যাঁ। ঠিকই বলছি।

আপনি গুপ্তধন নেবেন না? আপনার মতো আমিও গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছিলাম। এখন আমি গুপ্তধনের মালিক। রাজা শাতকর্ণির সমস্ত ধন এখন আমার হাতের মুঠোয়। আমি এখন রাজা, বুঝেছেন?

আমি বুঝতে পারলাম না লোকটার মাথা খারাপ কি না।

লোকটি হঠাৎ বলল, ওঃ হো। আপনার তো কিছুই খাওয়া হয়নি। নিন, রাত অনেক হয়েছে। আপনি যা হোক দুটো খেয়ে নিন। কিন্তু সাবধান। আমি না বললে এখান থেকে নড়বেন না। আমি কথা না বললে কথা বলবেন না। ওরা জানতে পারলে একেবারে শেষ করে ফেলবে।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কারা?

ওরা হল এই পাহাড়পুরীর যক্ষ। আপনার আমার মতো গুপ্তধনের লোভে যারা আসে, ওরা তাদের বন্দি করে। যারা পালাতে যায় তারা মরে। যারা কথা শুনে টিকে থাকে, তারা বাঁচে। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন? আজ পর্যন্ত কেউই এখানে টিকে থাকেনি। কেউ বাঁচেনি, বহুকষ্টে আমিই টিকিয়ে রেখেছি নিজেকে। এই পাহাড়পুরীর যক্ষ হয়ে আছি আমি। তবেই আমি জানতে পেরেছি সেই ধনরাশি কোথায় কীভাবে আছে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কোথায় আছে?

দেখাব দেখাব সব দেখাব। বলতে বলতে লোকটা চলে গেল ঘর থেকে।

আমি অসহায় ভাবে একা বসে রইলাম ঘরের ভেতর। ভাবতে লাগলাম আকাশপাতাল। এখান থেকে তবে কি সত্যিই আমার মুক্তি নেই? তা যদি হয় এর মতো এই আজীবন বন্দিদশা আমি মেনে নেব না। যেমন করেই হোক আবার বাইরের জগতে পালাবার চেষ্টা করব। একান্ত না পারি...।

হাতের পিস্তলটা একবার কপালে ঠেকালাম। প্রত্যেকটি গুলিই এখনও অবশিষ্ট আছে। কয়েকটি নিজেকে বাঁচাবার জন্য খরচ করে শেষেরটি নিজের মৃত্যুর জন্য খরচ করব। তাড়াতাড়ি কিছু করতে যাব না। দেখিই না ঘটনার গতি কোনদিকে যায়। বাহাদুর আমাকে বাঁচাতে পারে কিনা। হাফলঙে ফিরে গিয়েও

সে কী আমাকে উদ্ধার করবার জন্য লোকজন নিয়ে আসবে না?

লোকটি আবার ঘরে ঢুকল। এই লোকটাকেই এখন মূর্তিমান বিভীষিকা বলে মনে হচ্ছে। ঝাঁকড়া চুল, গোঁফ-দাড়ি। উঃ কী ভয়ংকর। তার ওপর একটা বাঘের ছাল পরে আছে। লোকটির হাতে কয়েকটা রামকলা আর একটা পাত্রে দুধ। সেগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, নাও। খেয়ে নাও। তোমাকে আর আপনি আজ্ঞে নয়। এবার থেকে তুমিই বলব।

আমি হেসে বললাম, বেশ, তাই বলবেন। আপনি তো আমার চেয়ে অনেক বড়।

অনেক মানে, তোমার ছাব্বিশ-সাতাশ, আমার বাহান্ন।

আজ্ঞে আমার আঠাশ বছর বয়স।

ওই একই হল। ভাগ্য ভাল যে ওদের হাতে পড়নি। আমার যেতে আর একটু দেরি হলেই এসে পড়ত ওরা। পাখিটার চিৎকার শুনেই বুঝেছি শিকার জুটেছে। তাই তো এগিয়ে গেলাম। ভগবান রক্ষে যে ওরা ছিল না এই সময়।

আমি বললাম, খুব বাঁচিয়েছেন আপনি। কিন্তু কী পাখি বলুন তো ওটা?

তা কি আমিও জানি? তবে ও পাখি এখন আর দেখা যায় না। ওই পাখিটাও আমার মতো মুক্তি চাইছে। কিন্তু কে দেবে ওকে মুক্তি? কত বছর যে এখানে আছে ও, তাও জানি না। আমাকে ঠিক তোমাকে যেভাবে এখানে নিয়ে এসেছে সেই ভাবেই এনেছিল। শুধু দুধ আর ফল খায়। কবে কোন শিশুকালে এর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল কে জানে? দেহটা এখন অসম্ভব বড় হয়ে গেছে। মানুষ দেখলেই চিৎকার করে। হয়তো বা ওর ভাষাতে বলে তোমরা আমাকে মুক্তি দাও।

আমি কলা খেয়ে, দুধে চুমুক দিলাম। কী দুর্গন্ধ দুধে। খেতেই গা গুলিয়ে উঠল।

তিনি বললেন, খাও। দু'-একদিন অমন লাগবে। তারপর সয়ে যাবে। পাহাড়ি গাইয়ের দুধ তো। তাই একটু গন্ধ।

দুধ আর কলায় পেট বেশ ভরে উঠল।

আমার তৃপ্তি দেখে উনি হাসলেন। মৃদু, প্রসন্ন হাসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তা হলে বাইশ বছর আছেন এখানে?

হ্যাঁ। দু'মাস সতেরো দিন বেশি। ক্যালেন্ডার না থাকলেও পাথরের গায়ে দাগ দিয়ে আমি হিসেব রেখেছি।

আপনি দেখছি অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট। কী নাম আপনার?

আমার নাম রামদুলাল সেন। বাড়ি ছিল রানিগঞ্জে।

কে কে আছে বাড়িতে?

কী করে জানব? মা ছিল, বাবা ছিল, দাদা ছিল। বিয়ে তো করিনি। কাজেই এখন আর কেউ-ই নেই।

আপনি এখানে কী করে এলেন?

সে অনেক কথা। শুনতে চাও?

বলুন না?

আমার বয়স তখন তিরিশ বছর। আমার এক বন্ধু ছিল। তার নাম দীপঙ্কর। দীপঙ্করের বাবা কোলিয়ারির মালিক ছিলেন। ভদ্রলোক হঠাৎ কীভাবে যেন জানতে পারেন তিড্ডিমের এই গুহার কথা। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে এখানে গুপ্তধনের সন্ধানে আসেন। কিন্তু সেই আসাই শেষ আসা। তাঁকে আর ফিরে যেতে হয়নি। দীপঙ্কর ও আমি তাঁর পুরনো ডায়েরি পড়ে সেকথা জানতে পারি। এবং আমরাও তাঁদের খোঁজে গুপ্তধনের সন্ধানে এখানে আসি। কিন্তু এখানে এসে আজপর্যন্ত ফিরে যেতে তো পারেনি কেউ। তাই আমরাও পারলাম না। বেরোবার পথ না-জেনে এখানে এসেছিলাম। তাই গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে বন্দি হয়েছি। ওই পাখিটাই ওদের হাতে তুলে দিয়েছে আমাদের। জংলিদের কথা শুনে আমি বাধ্য হলাম, তাই বাঁচলাম। দীপঙ্কর পালাতে গেল, তাই মরল। কথাগুলো শেষ করে রামদুলালবাবু আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, খবরদার পালাতে যাবে না।

এমন সময় হঠাৎ দ্রিম দ্রিম দামামার শব্দে ভেতরটা গমগমিয়ে উঠল। উঃ! সে কী দারুণ শব্দ! সেই সঙ্গে এক বিদঘুটে জংলি গান। আলোয় ভরে উঠল চারদিক।

রামদুলালবাবু ঠোঁটে তর্জনী রেখে 'হিসস্' করে আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর বললেন, আমি না-আসা পর্যন্ত তুমি এখানে দেওয়াল ঘেঁসে লুকিয়ে থাকো। একদম বেরিয়ো না। বেরোলেই মরবে।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কারা?

ওরা এই গুহার যক্ষ। রাজা শাতকর্ণির গুপ্তধন ওরা পাহারা দেয়। এমনি কারও ক্ষতি করে না। কিন্তু কেউ গুপ্তধন নিতে এলে তাকে ফিরে যেতে দেয় না। ওদের দেবী নাগেশ্বরীর কাছে তাকে বলি দেয়। প্রতি রাত্রে ওদের সর্দার আসে গুহায় আরতি করতে।

দামামার শব্দ আরও কাছে এগিয়ে এল।

আমি বললাম, তাই যদি হয় তবে ওরা আপনাকে বলি দেয়নি কেন?

আমি ওদের বিশ্বাস উৎপাদন করেছি। এবং এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করিনি তাই।

কেন করেননি?

ওদের নজর এড়িয়ে পালাতে পারতাম না বলে। যাক, ওসব কথা পরে হবে। এখন নয়। এখন পালাবার সুযোগ পেলেও আর আমি পালাচ্ছি না। গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছিলাম। গুপ্তধন পেয়ে গেছি। এই অতুল ধনরাশি, এই কুবেরের ঐশ্বর্যের আমি এখন মালিক। এসব ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারি?

দামামার শব্দে ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই সঙ্গে ভেসে আসছে বিচিত্র সুরের বিদঘুটে জংলি গান।

ওরা যত এগিয়ে আসছে আমার বুকের স্পন্দন ততই দ্রুত হচ্ছে। উঃ, কী দারুণ সর্বনাশের পথেই না পা দিয়েছি। কেন যে ঢুকতে গেলাম এই পাপ-গুহার ভেতরে। এদের হাত থেকে কতদিন আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখব?

রামদুলালবাবু ইশারায় আমাকে লুকিয়ে থাকতে বলে চলে গেলেন জংলিদের কাছে। তারপর একটা মশাল হাতে ওদের সঙ্গেই এগিয়ে চললেন।

আমি পিস্তলটা বার করে হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরলাম। তারপর খুব সন্তর্পণে চুপি চুপি আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলাম ওদের।

চেহারা দেখেই বুক শুকিয়ে গেল। যেন মূর্তিমান যমদূত সব। কালো কালো বেঁটে বেঁটে চেহারা। কিম্ভূতকিমাকার। মাথায় পালকের টুপি। পরণে বাঘ অথবা হরিণের ছাল। ভালুকের চামড়াও পরেছে কেউ। গলায় বিভিন্ন ধরনের তবলকির মালা। মালার মাঝখানে একটি করে নরমুণ্ডের করোটি।

জনা-বিশেক জংলি রয়েছে। কারও হাতে মশাল! কারও হাতে বর্শা। কেউ দামামা বাজাচ্ছে। কেউ নেচে নেচে গাইছে। চারজনে একটা পালকিও কাঁধে নিয়েছে। ওর ভেতরেই বসে আছে ওদের সর্দার। একবার একটু দেখতে পেলাম। তাতেই দেখলাম কী বিচ্ছিরি চেহারা ব্যাটার।

রামদুলালবাবুর নিষেধ সত্ত্বেও আমি আড়াল থেকে সরে এসে ওদের পিছু নিলাম। দেখিই না কোথায় যায়! কোনখানে গুপ্তধন আছে? হাতে যখন পিস্তল আছে তখন ভয়টা আমার কী?

যেমন করেই হোক এদের খপ্পর থেকে পালাতে হবে। সঙ্গে যখন ম্যাপ আছে তখন পালাবার রাস্তা পাবই পাব। আমি নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করতে লাগলাম। এমনভাবে দেওয়ালের গা ঘেঁষে চললাম যাতে কেউ না টের পায়।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে জংলিরা থেমে পড়ল। গান বন্ধ হয়ে গেল। দামামার শব্দও থেমে গেল। চোখের পলকে একটা জংলি ভয়ংকর মূর্তিতে ছুটে এল আমার দিকে। তারপর বর্শার তীক্ষ্ণ ফলাটা আমার বুকে ঠেকিয়ে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল হোঃ হোঃ করে। আমার হাত-পা থর থর করে কাঁপতে লাগল। কী করে যে কী হয়ে গেল তা ভেবেই পেলাম না। বর্শার খোঁচাটা বড্ড লাগছে। বুকের ভেতর গিঁথে যাবে নাকি?

চার

ততক্ষণে সবাই এসে ঘিরে ফেলেছে আমাকে। সেই কালো কালো বিচ্ছিরি চেহারার জংলিগুলোর চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। পালকি থেকে নেমে এল ওদের সর্দার।

রামদুলালবাবুও এগিয়ে এলেন। যেন আমাকে চেনেনই না, এমন ভান করে মশালটা আমার দিকে তুলে ধরে আমার মুখে আলোকপাত করতে লাগলেন।

জংলিসর্দার এগিয়ে এল আমার কাছে। আমার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল। তারপর শুরু হল তল্লাসি। আমার কোমরে গোঁজা ছুরি-টর্চ যা ছিল সব কেড়ে নিল। যে আমার বুকে বল্লম ঠেকিয়ে রেখেছিল সর্দার কী যেন বলতেই বল্লমটা সরিয়ে নিল সে।

সর্দার এবার আমার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আমার জামার কলার ধরে একটু টান দিয়েই ঠাস করে মারল আমার গালে এক চড়। কী সাংঘাতিক সেই চড়। গাল যেন জ্বলে উঠল।

এবার রামদুলালবাবুকে কী যেন বলল সর্দার।

রামদুলালবাবু কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, কে তুই?

আমি তো বুঝতেই পারছি রামদুলালবাবু আমার সঙ্গে অভিনয় করলেন। উঃ। কী ভুলই না করেছি ওনার কথা না শুনে। বললাম, আমি পথ ভুলে এসে পড়েছি। আপনাদের গুপ্তধনের সন্ধানে আসিনি।

রামদুলালবাবু সেই কথাটা বুঝিয়ে বললেন সর্দারকে।

সর্দার সব শুনে কিছুক্ষণ ধরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর আবার কী যেন বললেন রামদুলালবাবুকে।

রামদুলালবাবু বললেন, সর্দার বলছেন অভিশপ্ত তিড্ডিমে কেউ শখ করে বেড়াতে আসে না। কাজেই পথ হারিয়ে এখানে প্রবেশ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে তোমাকে পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তুমি গুপ্তধনের সন্ধানে আসনি এই কথা বলেছ। তার মানে এখানে যে গুপ্তধন আছে তা তুমি জান।

আমি আর উত্তর দিতে পারলাম না।

সর্দার নিজে আমাকে সার্চ করতে লাগল এবার। অত যত্নে গুঁজে রাখা সেই ম্যাপটা টেনে বার করল। ম্যাপটা হাতে পেয়েই রাগে ফেটে পড়ল সর্দার। তারপর রামদুলালবাবুকে চিৎকার করে কী যেন বলতেই রামদুলালবাবু বললেন, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ সর্দারকে। এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। কেন না যারা মিথ্যে কথা বলে তারা বিশ্বাসঘাতক হয়।

সর্দার এবার দলের লোকদের কী যেন বলল।

বলতেই সবাই এসে একটা বড় পাথরের থামের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল আমায়। তারপর আবার ওদের যাত্রার জন্য তৈরি হল। দামামা বেজে উঠল দ্রিম দ্রিম করে। আর দামামার তালে তালে শুরু হল সেই অসভ্য নাচ। নাচ আর গান। সর্দার আবার গিয়ে বসল পালকিতে। বাহকরা পালকি বয়ে নিয়ে চলল।

সবাই চলে গেলে একা আমি বন্দি অবস্থায় রয়ে গেলাম সেখানে। আমার ভুলের জন্যই সব কিছু ভেস্তে গেল। পিস্তল, ছুরি, ম্যাপ, টর্চ সব কিছু খোয়ালাম। নিজেও পড়লাম জংলিদের খপ্পরে। এখন আর আমার নিস্তার নেই।

রামদুলালবাবুর কথা শুনলে তাঁর সাহায্যেই গুপ্তধনের সন্ধানও পেয়ে যেতাম। এখন একমাত্র মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমার। এখন আমি নিরস্ত্র। আমি অসহায়।

ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? কী করবে? কীভাবে রাখবে? তার কিছুই আমি জানি না। এদের অসাধ্য যে কিছু নেই শুধু এইটুকুই জানি আমি।

এমন সময় হঠাৎ দূর থেকে একটা ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ ভেসে এল। সেই পাখিটার কণ্ঠস্বর। পাখিটা চিৎকার করছে। একটানা একঘেয়ে। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম দু'জন জংলি বল্লম উঁচিয়ে তিরবেগে ছুটে গেল আমার পাশ দিয়ে। তাদের সঙ্গে মশাল হাতে রামদুলালবাবুও গেলেন। যাবার সময় একবার শুধু আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, কেমন হয়েছে? এবার মরো। বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুই হচ্ছে উপযুক্ত পুরস্কার।

আমি মাথা হেঁট করলাম।

খানিকবাদেই দেখলাম একটা লোককে টেনেহিঁচড়ে মারতে মারতে নিয়ে আসছে ওরা। কে ও? আরে, এ যে বাহাদুর! বাহাদুরকে দেখে আমার বুকে যেন হাজার গুণ বল ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, বাহাদুর!

বাহাদুরও আমাকে দেখে চমকে উঠল, বাবু! আপনি এখানে?

আমি বন্দি।

জংলিদুটো ততক্ষণে বাহাদুরকে নিয়ে এসে আর একটা থামের সঙ্গে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলল।

রামদুলালবাবু আমাদের সামনে এসে মশালের আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে হো হো করে হেসে উঠে বললেন, কী ভায়ারা, গুপ্তধন নেবে নাকি?

আমি বিনীত ভাবে বললাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন রামদুলালবাবু। আপনার কথা না-শুনেই এই কাল ঘটিয়েছি আমি।

রামদুলালবাবু বললেন, আমি তোমাকে একবার সুযোগ দিয়েছি। আর নয়।

অভিশপ্ত তিড্ডিমে শাতকর্ণি গুহায় গুপ্তধন নিতে এসে আজ পর্যন্ত কেউ ফিরে যায়নি। তোমরাও ফিরবে না। তোমরা মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।

বাহাদুর ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে তখন। বলল, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। আমাদের ছেড়ে দিন। আপনি বিশ্বাস করুন আমরা গুপ্তধনের ব্যাপার কিছুই জানি না। গুপ্তধন নিতেও আসিনি আমরা।

রামদুলালবাবু আবার গুহা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন, তোমরা গুপ্তধন নিতেই এসেছ। তোমরা না বললে কী হবে। তবে জেনে রাখো, এই গুপ্তধন তোমরা পাচ্ছ না। পাবে না। আমি এর মালিক। আমি একে বাইশটা বছর ধরে আগলে রেখেছি। আমি মরে গেলেও যক্ষ হয়ে এর ভেতরে বসে এই গুপ্তধন আগলাব। তোমাদের মতো আরও যারা এই গুপ্তধন নিতে আসবে, আমি তাদের প্রত্যেককে গলা টিপে মারব।

আমরা সব শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রামদুলালবাবু জংলিদুটোকে নিয়ে চলে গেলেন।

রামদুলালবাবু চলে গেলে বাহাদুরকে বললাম, কী কুক্ষণেই না তিড্ডিমে এসেছিলাম।

এ দোষ আপনার নয় বাবু। আমার। আমিই তো আপনাকে এখানে এনেছিলাম। তবে আমি কিন্তু এই গুহার বিপজ্জনক পরিণতির কথা জানতাম না। এটাকে একটা সাধারণ গুহা বলেই জানতাম। কখনও ঢুকিওনি এর ভেতর।

না এর ভেতরে ঢুকতে যাব, না এই কাণ্ডটা হবে। আমার জন্যে তুমিও বিপদে পড়লে।

আমি আপনাকে খুঁজতে এসেই গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাই।

এইটাই তো এ গুহার রহস্য।

তারপর এক জায়গায় আসতেই দেখি শুধু জল আর জল। এমন সময় কোথা থেকে একটা হতচ্ছাড়া সর্বনাশা পাখি, উঃ কী ভীষণ তার চেহারা। অমন পাখি আমি জীবনে দেখিনি। পাখিটা আমার ছোঁ মেরে তুলে নিল। তারপর এক জায়গায় নামিয়েই শুরু করল তার চিৎকার। অমনি জংলিদুটো এসে ধরে ফেলল আমাকে।

আমিও ঠিক ওইভাবেই এসেছি বাহাদুর। তবে আমার অবশ্য বাঁচবার উপায় ছিল। কিন্তু আমি নিজেই তা নষ্ট করেছি। আমি বাঁচলে তোমাকেও বাঁচাতে পারতাম। এখন আমরা দু'জনেই মরব।

বাঁচতে আমাদের হবেই বাবু। যেমন করেই হোক। এভাবে বেঘোরে প্রাণ দেওয়াটা মোটেই উচিত হবে না।

কী করে বাঁচবে?

বুদ্ধির জোরে। বাঁচবার কৌশল একটা বার করতেই হবে।

অসম্ভব।

আমার কোমরে একটা ছুরি আছে। সেটা যে করেই হোক বার করে ওরা আসবার আগেই আমাদের বাঁধন খুলে ফেলতে হবে। তারপর আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। যেমন করেই হোক পালাতে হবে।

কোথায় পালাবে বাহাদুর? এ গোলক ধাঁধার রাস্তা তো আমাদের জানা নেই। তা ছাড়া আমরা নিরস্ত্র। ওদের সঙ্গে পেরে উঠব কেন?

বাহাদুর হতাশ হয়ে বলল, সবই জানি। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? ধরা যখন পড়েছি মরতে তখন হবেই। তবুও বিপদের মুখোমুখি হয়ে বাঁচার চেষ্টা করব না কেন?

সবই বুঝলাম। কিন্তু তোমার কোমরের ছুরি কী করে বার করব? দু'জনেই তো বাঁধা।

আপনি এক কাজ করুন।

কী করব বলো?

হাত দুটোই বাঁধা আছে আমাদের। পা তো বাঁধা নেই। কোনওরকমে পায়ে করে আমার কোমর থেকে ছুরিটা বার করার চেষ্টা করুন।

বাহাদুরের যুক্তিটা আমার নেহাত মন্দ বলে মনে হল না। আমি অতিকষ্টে পাদুটো তুলে বাহাদুরের কোমর থেকে ছুরিটা বার করবার চেষ্টা করলাম। বৃথা চেষ্টা। পায়ের আঙুল কোনওরকমে ওর কোমরের কাছ অবধি গেল বটে, কিন্তু আসল জিনিসের নাগাল পেলাম না। আবার চেষ্টা করলাম। বার বার করলাম। বাহাদুরকে বললাম, তুমি একটু কাত হয়ে বেঁকে দাঁড়াও তো।

বাহাদুর একটু সরবার চেষ্টা করল। তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে প্রাণপণে দেহটা টান টান করে আমার দিকে যতটা সম্ভব নিজেকে এগিয়ে দিল।

আমি আমার পায়ের আঙুলে করে ওর ছোরার বাঁটটা একটু টেনে ধরলাম। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ওর হাতে দিতে পারলাম সেটা।

ততক্ষণে দূর থেকে আবার সেই দামামার শব্দ ভেসে আসছে।

বাহাদুর! কুইক। আর দেরি কোরো না।

বাহাদুর সত্যিই দেরি করল না। পিছন থেকে অদ্ভুত কায়দায় নিজের বাঁধন কেটে নিল।

দ্রিম দ্রিম শব্দ তখন কাছের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে ভেসে আসছে জংলিদের বর্বর ভাষায় বিচিত্র সুরের গান।

নিজের বাঁধন কেটেই বাহাদুর আমাকে বাঁধন মুক্ত করল। বাঁধন মুক্ত হয়ে যে পথে আমরা এসেছিলাম সেই পথেই দৌড় দিলাম দু'জনে। ছুটতে ছুটতে আবার

সেই বারান্দার কাছে এসে পড়লাম। কিন্তু পথ কোথায়! কোন দিকে পথ?

এদিকে আমাদের দেখতে পেয়েই সেই ভয়ংকর পাখিটা আবার চিৎকার শুরু করে দিয়েছে।

বাহাদুর বলল, বাবু সাঁতার জানেন তো?

জানি।

তা হলে আর কোনও কথা নয়। এখুনি এই জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তারপর স্রোতে ভেসে যতদূর পারি চলে যাব।

আমি অত বিপদেও হাসলাম। বললাম, কোনও লাভ হবে না বাহাদুর।

কেন!

যাবার পথ নেই।

সে কী! এত জল তা হলে যাচ্ছে কোথায়! এই জল নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও জায়গা দিয়ে পাশ করছে।

করছে। খুব সামান্য ফাঁক আছে এক জায়গায়। সেইখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জল। আমি আসবার সময় দেখেছি। কিন্তু সে ফাঁক এতই সামান্য যে, সেখান দিয়ে জলই শুধু বেরোতে পারে কোনও মানুষ নয়।

পাখিটা সমানে চিৎকার করছে তখন।

আর পাখির চিৎকারকে ছাপিয়েও শোনা যাচ্ছে দ্রিম দ্রিম দামামার শব্দ। সেই সঙ্গে দ্রুত ছুটে আসা কতকগুলো পায়ের আওয়াজ।

মশালের আলোয় অন্ধকারও ফিকে হয়ে আসছে।

বাহাদুর হঠাৎ একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, বাবু! ওই দেখুন—।

চেয়ে দেখি বারান্দার এক কোণে বহুদিনের পুরনো বড় বড় ঢাকের মতো কতকগুলো দামামা সারি দেওয়া আছে।

বাহাদুর বলল, আপাতত এর ভেতরেই আত্মগোপন করা যাক।

তাই চলো।

আমরা আর কাল বিলম্ব না করে একটা দামামার ভেতর ঢুকে পড়লাম দু'জনে। ভেতর থেকে বাইরের অবস্থা কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু অনুমানে বুঝতে পারলাম ওরা এসে চারদিকে ছুটোছুটি করছে সকলে। মশালের আলোয় লাল হয়ে উঠেছে চারদিক। এমন সময় হঠাৎ আমার চুলের মুঠিটাকে ধরে কে যেন টান দিল।

সোজা উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম আগুনচোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে জংলিসর্দার। যাঃ। এত কাণ্ড করেও ধরা পড়ে গেলাম। বাহাদুরও ধরা পড়ল। আমরা সেই ভাঙা দামামার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম দু'জনে।

জংলিসর্দার কী যেন বলল বিড় বিড় করে।

রামদুলালবাবু এগিয়ে এসে বললেন, তোমাদের মুক্তি নেই। সর্দারের আদেশ।

সর্দার আবার কী যেন বলল।

রামদুলালবাবু বললেন, আজ থেকে তিন দিন পরে দেবী নাগেশ্বরীর কাছে বলি দেওয়া হবে তোমাদের।

বাহাদুর, আমি দু'জনেই কাঁপছি তখন। আমাদের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

সর্দারের ইঙ্গিতে দু'জন জংলি এগিয়ে এল এবার। তারপর আমাদের চোখ বেঁধে পিছন মুড়ে হাত বাঁধল। বাহাদুরের কাছে যে ছুরিটা ছিল সেটাও কেড়ে নিল ওরা।

আমি এবার ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত সচেতন হলাম। কেন না আবার যদি কোনওরকমে এদের খপ্পর থেকে পালাতে পারি, তা হলে পালাবার পথ খুঁজে বার করতে মানে আবার ঠিক এইখানেই যাতে ফিরে আসতে পারি, সে সম্বন্ধে সজাগ রইলাম। এরা যে ভাবে আমাদের নিয়ে যাবে প্রতিটি পদক্ষেপ ঠিক সেই ভাবে স্মরণে রাখতে হবে! অর্থাৎ কীভাবে কতটা পথ যাচ্ছি মনে রাখতে হবে সেটা।

ওরা আমাদের যেতে বলল।

প্রথমেই ডানদিকে ঘুরলাম। তারপর চললাম পা মেপে বিশ পা। বুঝলাম বারান্দা ধরেই চলেছি। এবার ঘরঘর শব্দ করে কী যেন সরে গেল একটা। একটু শীতল হাওয়া বয়ে গেল শরীরের ওপর দিয়ে। এক-পা এক-পা করে নীচে নামতে লাগলাম। নামছি তো নামছিই। একেবারে একশো ধাপ নামলাম। বাঁদিকে ঘুরলাম। বিশ পা গেলাম। একটা ঘরের ভেতরে ঢোকাল ওরা। সর্দার কী যেন বলল। কথাটা বুঝতে পারলাম না। একজন এসে আমাদের বাঁধন খুলে দিল।

দেখলাম একটা ছোট্ট ঘরে ওরা নিয়ে এসেছে আমাদের। ঘরের বাইরে গিস গিস করছে একদল কালো ভূতের মতো চেহারার জংলি। গায়ের গন্ধে ভূত পালাবে এমন বোটকা গন্ধ তাদের। বিটকেল বিচ্ছিরি বিদঘুটে।

সর্দার আমাদের দিকে উল্লসিত চোখে তাকাল। তাতে আর সেই আগুনের হলকা নেই। যা আছে তা হ'ল অনাবিল আনন্দ। হাতের শোল ফসকে গিয়ে আবার ধরা পড়লে যে আনন্দ হয়, ঠিক সেইরকম আনন্দ।

আমরা ভয়ে ভয়ে তাকালাম।

চিড়িয়াখানায় আমরা যেমন জন্তু-জানোয়ার দেখি—ওরাও ঠিক সেইভাবে দেখছে আমাদের। সর্দার হাতে তালি দিতেই একজন এসে দাঁড়াল। তাকে কী যেন বলল সর্দার। জংলিটা একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই দুটো পাত্রে দুধ আর একছড়া কলা নিয়ে এসে আমাদের সামনে

ধরে দিল জংলিটা। সেই বড় বড় রামকলা। দেখলে লোভ হয়। কিন্তু একটা কি দুটোর বেশি খাওয়া যায় না।

আমি তো রামদুলালবাবুর কাছে আগেই খেয়েছিলাম। তাই আর খেলাম না। বাহাদুরকে বললাম, তুমি খেয়ে নাও বাহাদুর। আমি আগেই খেয়েছি।

বাহাদুর কোনও কথা না বলে খেতে শুরু করে দিল।

আমাদের ঘরটা এতক্ষণ মশালের আলোতে উদ্ভাসিত ছিল। এবার একটা বড় প্রদীপ জ্বালানো হল ঘরের ভেতর। প্রদীপের ভেতর একজন পাতলা চ্যাটচেটে কী একটা জিনিস ঢেলে দিল। তেল কি ঘি, কি অন্য কিছু তা এরাই জানে। আমরা শুধু বলির মানুষ দু'জন সবকিছু দেখতেই লাগলাম।

গুহার এমন গভীর প্রান্তেও কী করে যে অক্সিজেন আসছে তা ভেবে পেলাম না। সকাল না হলে রাতের অন্ধকারে বোঝা যাবে না কিছুই। তবে ভেতরটা বেশ ঠান্ডা। যেন শান্তির শীতলতা বিরাজ করছে সর্বক্ষণ।

বাহাদুরের খাওয়া হলে দু'জন জংলি এসে আমাদের বেঁধে ফেলল।

সর্দার এবার হাত তুলে আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'আখোবা'। অর্থাৎ ওদের ভাষায় শুভরাত্রি। তারপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল সকলে।

বাহাদুর আর আমি অসহায় বন্দি দু'জন সকালের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। তিনদিন পরেই তো আমাদের ছিন্ন শির লুটিয়ে পড়বে দেবী নাগেশ্বরীর পায়ে। তাই কানখাড়া করে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনবার আশায় রইলাম। মনে মনে ভগবানকেও ডাকতে লাগলাম। এই তিনদিনের ভেতর অভিশপ্ত তিড্ডিমের এই গুহা থেকে মুক্তি কি আমরা সত্যিই পাব না?

পাঁচ

রাত এখন কত তা জানি না। বাহাদুর বা আমার কারও চোখেই ঘুম নেই। দু'জনেই অসহায়। দু'জনেই বন্দি। কী কঠিন সেই বন্ধন। কিন্তু সে বন্ধনও আমরা শেষ পর্যন্ত খুলে ফেললাম। ওরা আমাদের বেঁধে রেখেছে বটে, তবে শুধু পা বেঁধেই ফেলে রেখেছে। অন্য কিছুর সঙ্গে বেঁধে রাখেনি। তার ওপর ঘরের ভেতর একটা প্রদীপও জ্বেলে রেখে গেছে।

চারদিক যখন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল আমরা দু'জনে তখন গড়িয়ে গড়িয়ে সেই প্রদীপের কাছে গেলাম। প্রদীপের শিখার মুখে হাতের বন্ধনটা তুলে দিতেই সেটা জ্বলে উঠে ছিঁড়ে গেল। পায়ের বাঁধন অনায়াসে খুলে ফেললাম এবার। তারপর নিজে মুক্ত হয়ে বাহাদুরকেও বাঁধনমুক্ত করলাম।

বাহাদুর বলল, সব তো হল, কিন্তু ঘর থেকে বেরোব কী করে?

আমি আস্তে আস্তে দরজার কাছে গেলাম। গিয়ে দরজাটা টানতেই দেখলাম সেটা একটু ফাঁক হল। ফাঁক হতে দেখলাম দরজার কড়াতে দড়ি বাঁধা। তাড়াতাড়ি প্রদীপটা এনে শিখাটা সেই দড়ির মুখে ধরতেই জ্বলে উঠল সেটা। এবং পরে দরজায় টান দিতেই দরজাও খুলে গেল।

আমরা দু'জনেই সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু এ কী! বাইরে বেরোতেই দেখি চোখের সামনে এক মূর্তিমান যম দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে তার কালো রং এমনভাবে মিশেছিল যে তা লক্ষই করিনি। জংলিটা বল্লম হাতে পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের দেখেই বল্লমটা উঁচিয়ে ধরল সে। অন্ধকারে তার কালো মুখে সাদা দাঁতের সারিগুলো ঝিকমিক করে উঠল। অর্থাৎ হাসল।

আমি বাহাদুরের দিকে তাকালাম। বাহাদুর আমার দিকে তাকাল। ইশারা হয়ে গেল চোখে চোখে। বাহাদুর চোখের পলকে একবার উবু হয়ে বসেই লাফিয়ে উঠে বল্লমের মুখটা চেপে ধরে সেটা ওপর দিকে করে দিল। আর আমি সেই ফাঁকে জোড়া পায়ে মারলাম এক লাথি জংলিটার পেটের ওপর।

একবার শুধু কোঁক করে একটু শব্দ। তারপর পেটটাকে চেপে ধরে দু'হাত দূরে ছিটকে পড়ল বেচারা।

আমরা ছুটে গেলাম তার কাছে। বাহাদুর একেবারে তার বুকে চেপে বসল। বসেই টিপে ধরল মুখটা। তারপর মাথাটা কয়েকবার মেঝেতে ঠুকে দিতেই অচৈতন্য হয়ে পড়ল সে। যখন দেখা গেল আর সে নড়াচড়া করতে পারছে না, তখন দু'জনে মিলে তাকে ধরাধরি করে যে ঘরে আমরা বন্দি ছিলাম সেইঘরেই এনে ঢোকালাম। তারপর হাত-পা বেঁধে রেখে প্রদীপ নিভিয়ে দরজার কড়ায় দড়ি বেঁধে পালাবার জন্য তৈরি হলাম।

বাহাদুর বলল, এখন আমরা কোনদিকে যাব?

যেদিক দিয়ে এসেছি সেই পথে।

কিন্তু সে পথ চিনে কি যেতে পারবেন?

পারব। আমার মনে আছে। চোখ বাঁধা থাকলেও আমি সতর্ক ছিলাম।

আমরা ফিরে চললাম। ঠিক যেভাবে এসেছিলাম সেইভাবে। প্রতিটি পদক্ষেপ গুনে গুনে। বিশ পা যাবার পরই সিঁড়ি পেলাম ওপরে ওঠার। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে উঠলাম। গুনে গুনে একশো ধাপ। একশো ধাপ ওঠার পরই দেখলাম পথ রুদ্ধ। তবে হতাশ হলাম না। হাত দিয়ে বুঝলাম কাঠের দরজা একটা। গুহার কালো পাথরের সঙ্গে এবং সেই ঘন ঘোর অন্ধকারে দরজাটা এমনভাবে মিশেছিল যে, তা নজরেও পড়ল না। হাতড়ে হাতড়ে বুঝলাম দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল। দরজা পেরিয়ে আমরা সেই বারান্দায় গিয়ে পৌঁছলাম।

দরজা আবার আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে গেল। আমরা অন্ধকারে মিশে পা টিপে টিপে চললাম। কারণ একবার যদি সেই পাখিটা আমাদের দেখতে পায়, তা হলে তার চিৎকারে সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমরা আবার ধরা পড়ে যাব।

এবার বাঁদিক ধরে বিশ পা এগোতেই সেই জায়গায় এসে পৌঁছলাম। সেখান দিয়ে রামদুলালবাবু আমাকে তাঁর ঘরের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে পথ ধরে জংলিরা আরতি করতে গিয়েছিল, সেই পথে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা। আমাদের খোয়া যাওয়া জিনিসগুলো উদ্ধার করতেই হবে। না হলে প্রাণেও বাঁচব না এবং এখান থেকে পালাতেও পারব না।

যেতে যেতে রামদুলালবাবুর ঘরের কাছে এসে পড়লাম আমরা। বাইরে থেকে দেখলাম একটা হরিণের চামড়া পেতে তার ওপরে শুয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন রামদুলালবাবু। একবার ভাবলাম ডাকি। আবার ভাবলাম, না থাক। অযথা বিপদ বাড়িয়ে লাভ নেই। মুক্তির পথ না পেয়ে এই বদ্ধ গুহায় থেকে থেকে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বোধহয় লোকটার। অবশ্য মাথার আর দোষ কী! একজন মানুষের জীবনে দীর্ঘ বাইশটা বছর কি বড় কম কথা?

আমরা রামদুলালবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম।

খানিক যাবার পরই সিঁড়ি পেলাম। মাত্র কয়েকটি ধাপ। তারপর নীচে নেমেই অবাক হয়ে গেলাম। ডাইনে বাঁয়ে নিকষ অন্ধকার। এখানে কোথায় গুপ্তধনের ঘর, কোথায় কী।

বাহাদুর হঠাৎ চাপা গলায় বলে উঠল, বাবু! ওই দেখুন।

আমি দেখলাম। দেখে বিস্মিত হলাম। এ কী সত্যি! ঘুমের ঘোরে কোনও স্বপ্ন দেখছি না তো?

দেখলাম সিঁড়ির শেষধাপে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই। ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম ধূ ধূ করছে নীল আকাশ। সেই আকাশ অসংখ্য তারায় ঝিকমিক করছে। এই তো মুক্তি। এত সহজে যে গুহা থেকে বেরোতে পারব তা ভাবতেও পারিনি। আকাশ যে কত সুন্দর, তা এই প্রথম অনুভব করলাম।

সামনেই পাঁচিলের মতো একটা পাথরের খাড়াই, উচ্চতায় আট ফুটের মতো হবে। একটু চেষ্টা করলেই সেটা টপকানো যায়।

আমি কোনও কিছু না-পেয়ে বাহাদুরের কাঁধে পা দিয়েই পাথরের খাড়াতে উঠলাম। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম বাহাদুরের দিকে। সেই হাত ধরে বাহাদুরও উঠে পড়ল খাড়াইয়ের ওপর।

এখন শেষ রাত। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। আর একটু পরেই ভোর হবে। এই ভোর আমাদের জীবনে এক আশ্চর্য সুন্দর স্মরণীয় ভোর। তারপর আমাদের

মুক্তির সূর্য উঠবে। দিনের আলো ফোটার আগেই আমরা এই অভিশপ্ত গুহা থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারব।

খাড়াইটার ওপর বসে দেখলাম আমাদের সম্মুখেই ধু ধু করছে লতাগুল্মে ভরা এক প্রান্তর। ছোট ছোট ঝোপঝাড়ও আছে অনেক। মাঝেমধ্যে বড় গাছও আছে। আর আছে ছায়া ছায়া পাহাড়ের সারি।

আমরা খাড়াইয়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লাম নীচে। পাদুটো একবার একটু কনকনিয়ে উঠল। তারপর সুমুখপানে ছুট— ছুট— ছুট।

খুব বেশি ছোটা গেল না। একে পথ পরিষ্কার নয়, তার ওপর খানিকটা ছুটে হাঁপিয়ে পড়লাম। তবু চলতে লাগলাম। পথ আর শেষ হয় না। ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে। চারদিকের বিশাল পর্বতচূড়াগুলো প্রেতের মতো দেখাচ্ছে। এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। এ কী! পথ কই? যেদিকে তাকাই সেদিকেই অতলস্পর্শী খাদ। খাদের হাজার হাজার ফুট নীচেটা যেন ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে। গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল দেখে। মুক্তির যে আনন্দ এতক্ষণ ভরিয়ে তুলেছিল আমাদের তা এক মুহূর্তে উবে গেল।

বাহাদুর বলল, এ তো মহা মুশকিল দেখছি।

আমি কথাটি বলতে পারলাম না। আমার দু'চোখ ফেটে যেন জল আসতে লাগল। ওঃ! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? তবুও আমরা হতাশ না হয়ে খাদের গা ঘেঁষে পথ চলতে লাগলাম। দেখিই না কোনওদিক দিয়ে একটুও যদি নামার পথ পাই।

এদিকে সকাল হয়ে গেছে। সূর্যও উঠেছে।

দিনের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক।

জংলিরা যখন দেখবে আমরা নেই, যখন দেখবে ওদের দলের লোকের ওইরকম অবস্থা করে এসেছি আমরা, তখন নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে আমাদের। খুঁজতে খুঁজতে যদি এইদিকে আসে? এইসব ছোট ছোট ঝোপগুলো কি লুকিয়ে রাখতে পারবে আমাদের? যা সাংঘাতিক ওরা তাতে ঠিক খুঁজে বার করে ফেলবে।

খাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই হঠাৎ ঘটে গেল দুর্ঘটনা। একপাশের কিছু মাটি ও আলগা পাথর ধসে যেতেই হুমড়ি খেয়ে মুখথুবড়ে পড়লাম আমি। তারপর হড়হড় করে নেমে যেতে লাগলাম খাদের দিকে। আমি হাতের সামনে যা পেলাম, তাই আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রথমেই ধরলাম একমুঠো ঘাস। কিন্তু তা নিমেষের মধ্যে মাটি থেকে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে এল। আমার বুকের স্পন্দন মনে হল থেমে যাবে বুঝি। গড়িয়ে পড়ার গতিও বেড়ে গেল। কত— কত নীচে যে পড়ব, তা কে জানে? ঘর্ষণে হাত-পা

ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না। হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম। তবে একেবারে নীচে নয়। ভগবান রক্ষা করলেন। খাদের গায়ে পাথরের ফাটলে একটা মাঝারি ধরনের বটগাছ গজিয়ে উঠেছিল, সেটারই একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়লাম। প্রথম কয়েকটা মিনিট স্থিরভাবে ঝুলে রইলাম। তারপর একটু একটু করে চোখ মেলে তাকালাম নীচের দিকে। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ওপরদিকে তাকালাম। ওপরে শুধু পাথরের দেওয়াল আর আকাশ। হাতদুটো অসম্ভব ভারী হয়ে আসছে। এইভাবে কি ঝুলে থাকা যায়? একবার অতি কষ্টে ডাকলাম, বা— হা— দু— র! আমার ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে লাগল। একটু পরেই বাহাদুরের গলা শুনতে পেলাম, আমি এইখানে-এ।

আমি সাড়া দিলাম, আমাকে বাঁচাও বাহাদুর। যেমন করেই হোক বাঁচাও।

আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না।

আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো না। তা হলে তুমিও পড়ে যাবে।

ওপর থেকে বাহাদুরের গলা শোনা গেল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

বাহাদুরের কথায় আশ্বস্ত হলেও আর যে ঝুলতে পারছি না। দেহের ভারে হাতদুটো যেন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে। মনে হচ্ছে হাতের কবজিদুটো আপনা থেকেই আলগা হয়ে যাবে। এমন সময় কী যেন একটা আমার গায়ের ওপর এসে পড়ল। দেখলাম একটা কঠিন ডাঁটার শক্ত লতা। বুঝলাম বাহাদুরই এটি নিক্ষেপ করেছে। এমন সময় ওপর থেকে বাহাদুরের গলা শোনা গেল, বাবু পেয়েছেন?

পেয়েছি।

ওটা শক্ত করে ধরুন।

আমি দেখলাম সেটা এমনভাবে ঝুলছে যে সেটাকে ধরতে গেলে হাত বাড়িয়ে একটু রিস্ক নিয়ে ধরতে হবে। আর রিস্ক নিতে গিয়ে যদি কোনওরকমে একবার হাত ফসকাই তো ব্যস। একেবারেই ফর্সা।

ওপর থেকে বাহাদুরের গলা আবার শোনা গেল, পেয়েছেন তো...?

আমি বললাম, তুমি ওটা আর একটু নামিয়ে দাও।

বাহাদুর আমার কথা শুনতে পেয়ে আর একটু নামিয়ে দিল সেটা।

আমার তখন ঘাম ছুটে যাচ্ছে। আমি প্রথমেই সেটাকে দু'পায়ের আঙুলের টিপনিতে ধরলাম। তারপর দাঁতে করে কামড়ে এক হাত দিয়ে টেনে দু' হাতে ধরলাম।

এবার যেন একটু হাঁফ ছাড়লাম।

তারপর ভুলেও আর নীচের দিকে না-তাকিয়ে সেই লতা ধরে উঠে এলাম ওপরে। ওপরে উঠে দেখলাম শক্ত লতাটাকে একটা গাছের সঙ্গে ভাল করে

বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দিয়েছে বাহাদুর। দিয়ে পাছে বাঁধন খুলে না যায়, তাই বাহাদুর নিজেও সেটাকে ধরে আছে।

আমি ওপরে উঠে আমার জীবনদাতা বাহাদুরকে বেশ কিছুক্ষণ দু'চোখ ভরে দেখলাম। তারপর মাটিতে বসে শুয়ে পড়লাম সটান হয়ে। বুকটা তখনও ঢিপ ঢিপ করছে। বাহাদুরকে কিছু বলার আগেই সে এসে ম্যাসেজ করে দিল আমাকে। বেশ কিছুক্ষণ ম্যাসেজের পর একটু ধাতস্থ হয়ে উঠে বসলাম। আমার পুনর্জন্ম হল।

এখান থেকে দূরে অভিশপ্ত তিড্ডিমের সেই গুহাটাকে দেখা যাচ্ছে। কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটে গেল, তার সবকিছুই আমার কাছে ছায়াছবির দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছে।

বাহাদুর বলল, আমি তো ভাবলাম আর বুঝি ফিরেই পেলাম না আপনাকে।

আমিও ভাবতে পারিনি ওইরকমভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাব বলে।

কী ভাগ্যি গাছের ডালটাকে ধরে ফেলেছিলেন।

সবই ভগবানের দয়ায় বাহাদুর। না হলে ওইরকম জায়গায় কখনও গাছ গজায়? তাঁরই কৃপায় আমরা বারবার বেঁচে যাচ্ছি।

আমরা বসে বসে এইসব কথা বলছি। এমন সময় হঠাৎ বাহাদুর একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে কী যেন দেখে বলল, ওই দেখুন বাবু!

দেখেই চমকে উঠলাম আমি। দেখি না আমরা যেখানে বসে আছি ঠিক সেইখানেই একটা ঝোপের ভিতর কী যেন একটা জ্বল জ্বল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাল করে নজর দিতেই দেখলাম একটা বাঘের বাচ্চা। তবে নেহাত শিশু নয়। ইচ্ছে করলেই আক্রমণ করতে পারে।

বাহাদুর বলল, আপনি ওর চোখে চোখ রেখে চুপ করে বসে থাকুন।

তুমি কী করবে?

মারব ব্যাটাকে।

খুব সাবধানে। কাছেপিঠে যদি ওর মা থাকে তা হলে কিন্তু একেবারে শেষ করে ফেলবে আমাদের।

বাহাদুর বলল, সে জানি। বলে পা টিপেটিপে উঠে গেল সে।

আমি বাঘের চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে বসে রইলাম।

একটু পরেই বাহাদুরের ছায়াটা আমার পায়ের কাছে পড়ল। দেখলাম ওর হাতে বড় একটা পাথর। পাথরটা সজোরে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল বাহাদুর।

এক ঘায়েই কাত। একটু চিৎকার করবারও সময় পেল না বেচারি। মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে থেঁতো হয়ে গেল। অল্পক্ষণ একটু ধড়ফড় ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল বাঘটা।

আমার ঠিক এভাবে মারার ইচ্ছা ছিল না বাঘটাকে। তবু বাহাদুরকে বাধাও দিলাম না। হাজার হলেও বাঘের বিক্রম। একবার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লে, আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় কিছুই করতে পারতাম না ওর। বেঘোরে প্রাণটা দিতে হত।

এমন সময় দূর থেকে দামামার শব্দ ভেসে এল। দ্রিম দ্রিম দ্রিম দ্রিম। সেই সঙ্গে অস্পষ্ট একটু কোলাহল।

আমাদের দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। ভয়ে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল বুকের ভেতরটা। আবার মৃত্যুর পদধ্বনি। আবার শত্রুর মুখোমুখি হওয়া। মরণের ডঙ্কা ওইতো বাজছে। দ্রিম... দ্রিম... দ্রিম... দ্রিম।

আমি বাহাদুরের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলাম।

বাহাদুর এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে এক্ষুনি কী করা উচিত তা ভেবে নিল।

আমি বললাম, জংলিরা মনে হয় আমাদের খোঁজেই বেরিয়েছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। এখন কী করবেন ঠিক করেছেন?

আর পালাবার বৃথা চেষ্টা না করে, এখানেই কোনও একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ব।

আমারও তাই মত। তবে লুকোবার আগে এই পাপটাকে কিন্তু এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

মৃত বাঘটা তখন রক্তাক্ত কলেবরে পড়ে আছে। আমরা আর একটুও দেরি না করে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিলাম খাদের মধ্যে। না হলে ওটাকে দেখতে পেলেই ওরা হইচই পাকিয়ে আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। বাঘটাকে লোপাট করে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকলাম। আত্মগোপন করবার এ এক চমৎকার জায়গা। নেহাতই কপালটা মন্দ না হলে বাইরে থেকে কেউ দেখতেই পাবে না আমাদের।

দামামার শব্দটা ক্রমশ কাছের দিকে এগিয়ে আসছে। আর সেই শব্দের প্রতিধ্বনির ঢেউ নাচছে পাহাড়ে পাহাড়ে। চারদিক যেন গমগমিয়ে উঠছে।

শুধু কোলাহল আর শব্দের তরঙ্গ।

দ্রিম...দ্রিম...দ্রিম...দ্রিম।

আমরা একদম নড়াচড়া না করে স্থিরভাবে বসে রইলাম। মনে মনে ডাকতে লাগলাম ভগবানকে। প্রতিবারের মতো এবারেও কি ভগবান আমাদের রক্ষা করবেন না?

ছয়

আমরা ঘন ঝোপের ভেতর ঠিক খরগোশের মতো আত্মগোপন করে বসে রইলাম।

জংলিগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

তাদের দাদামার শব্দে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

ওদের কথাবার্তা আর হইচই খুব কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে এবার। একটা আতঙ্কের ভাব যেন মনের মধ্যে ক্রমশ জমাট বেঁধে উঠছে।

আমাদের ঠিক পাশ দিয়েই দু'জন চলে গেল।

হঠাৎ একজন কী বলে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হই হই করে ছুটে এল সকলে। মোট বারো জন। যেন বারোটা পিশাচ। তাদের দুর্বোধ্য ভাষার কথা শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই উত্তেজিত। অনুমানে বুঝলাম গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা সেই লতাটাকে দেখতে পেয়েছে ওরা।

আমরা ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখলাম লতাটাকে ধরে কী যেন বলাবলি করছে সবাই।

একজন একটু টেনে দেখল লতাটাকে। কী দেখল কে জানে, হয়তো দেখল যে ওই লতাটা ধরে আমরা ওদের ভয়ে খাদের দিকে ঝুলছি কি না। কিন্তু টান দেওয়ার পর যখন বুঝতে পারল ওধারে ভারী কিছু নেই তখন দু'-একবার সেটাকে ধরে টানাহেঁচড়া করে ঝাঁকানি দিল। তারপর সরসর করে খানিকটা টেনেও তুলল। পরে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিল সেটাকে।

এবারে হাতমুখ নেড়ে চলল নানারকম যুক্তি। যুক্তির পর জনা সাতেক জংলি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সেদিকে। তারপর খাদের মাটি-পাথর ধরে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল নীচের অবস্থাটা।

যেই না দেখতে যাওয়া অমনি ঘটে গেল বিপর্যয়। ওরা দলবদ্ধ হয়ে ঢালের এমন একটা অংশে গিয়ে পড়েছিল, যেখানকার আলগা মাটি অতগুলো লোকের ভার সইতে না পেরে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল খাদের ভেতর।

চোখের পলকে সাতজনই সাফ হয়ে গেল।

ওদের অন্তিম আর্তনাদ ও ধসের শব্দে গুরুগম্ভীর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে ভরে উঠল চারদিক।

বাদবাকি জংলিগুলো যারা অদূরে দাঁড়িয়েছিল তারা তখন প্রচণ্ড চিৎকার করে লাফাতে লাগল সেখানে। কয়েকজন শূন্যে হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে লাগল। তারপর বিলাপ করতে করতে যে পথে এসেছিল ওরা, দলবদ্ধ হয়ে সেই পথেই ছুটল। বুঝলাম এই নিদারুণ দুঃসংবাদটা দলের লোকেদের দিতে গেল ওরা।

যাক। বিপদ কাটল এখনকার মতো।

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে বসেছিলাম আমরা। এবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বাহাদুরকে বললাম, এইবার আমাদের একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে বাহাদুর। কেন না বুঝতে পারছ তো ওরা গিয়ে ওদের দলের লোককে খবর দিলেই, যে যেখানে আছে ওদের, সবাই হই হই করে ছুটে আসবে।

তা হলে?

তা হলে আর কী? এই সময়টুকুর মধ্যে যেভাবেই হোক আমাদের কোনও একটা নিরাপদ জায়গা দেখে লুকিয়ে পড়তে হবে।

সেরকম নিরাপদ জায়গা এখানে কোথায়?

খুঁজে বার করতে হবে। আপাতত এই ঝোপ থেকে বেরিয়ে আরও একটু এগিয়ে চলো। তারপর ওরা যখন ফিরে এসে এখানে ওদের শোকপ্রকাশ করবে, আমরা তখন গুহার দিকেই দৌড়ব।

বাহাদুর যেন শিউরে উঠল, না না না। আপনার কি মাথাখারাপ হয়েছে? এ আপনি কী বলছেন?

কেন?

এত কষ্ট করে বেরিয়ে এসে আবার ওই অভিশপ্ত গুহায় ঢোকে কেউ?

এছাড়া যে আর কোনও উপায় নেই বাহাদুর। এখন জংলিদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আবার ওই গুহাতেই যেতে হবে। পরে অবশ্য ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। না হলে ওইখানে ফিরে যেতে আর কি কারও মন চায়?

জংলিগুলো চলে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম।

যখন দেখলাম ওরা অনেক দূরে চলে গেছে, তখন ওদের পথ অনুসরণ করলাম আমরা।

খানিক যাবার পর ঘন পত্রবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড গাছ দেখতে পেয়ে বাহাদুরকে বললাম, বাহাদুর, এখনই আর বেশি এগনো ঠিক হবে না। যদি ওরা ফিরে আসতে শুরু করে তো একেবারে মুখোমুখি পড়ে যাব। আপাতত এই গাছে উঠেই আমরা লুকিয়ে বসে থাকি এসো। এর চেয়ে লুকানোর পক্ষে নিরাপদ জায়গা এখানে আর নেই। ওরা যখন দলবল নিয়ে আবার এইদিকে আসবে, আমরা তখন বিপরীত দিকে ছুটে গুহায় গিয়ে ঢুকব।

বাহাদুর একটু বিমর্ষ হয়েই বলল, যা আপনি বলবেন।

বুঝতে পারছি ওই গুহায় আবার ফিরে যেতে বাহাদুরের আর একটুও মন নেই। মন কী আমারও আছে। খাঁচার পাখি খাঁচা ছেড়ে একবার বেরিয়ে গেলে

আর কি খাঁচায় ফিরে যায়। কিন্তু এমনই ঘটনাপ্রবাহ যে, ওই ছেড়ে আসা গুহাই এখন আমাদের একমাত্র নিরাপদ স্থান।

যাই হোক। আমরা আর দেরি না করে গাছে ওঠা শুরু করলাম। মোটা মোটা ঘেঁস ঘেঁস ডালে পা দিয়ে তর তর করে ওপরে উঠতে একটুও বেগ পেতে হল না।

ওপরে উঠতে উঠতে বাহাদুর বলল, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন বাবু?

কী?

ওরা মানে জংলিরা কিন্তু গুহার দিকে যাচ্ছে না।

আমি অবাক হয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কালো কালো পিঁপড়ের মতো জংলিরা গুহার ডানদিকের পথ ধরে হারিয়ে গেল পাহাড়ের বাঁকে।

আমি মধ্যপথে একটি শক্ত ডাল ধরে বসে রইলাম।

বাহাদুর গাছের আরও ওপরে উঠল।

আমি বললাম, কিছু নজরে পড়ছে?

হ্যাঁ পড়ছে। একটা নদী দেখতে পাচ্ছি।

নদী?

হ্যাঁ বাবু।

সত্যি সত্যি নদী দেখতে পাচ্ছ, না অন্য কিছু? ভাল করে লক্ষ করো কিন্তু।

হ্যাঁ ভাল করেই দেখছি। ওটা নদীই।

ওখানে কোনও খাদ নজরে পড়ছে?

না প্রায় সমতলের মতো। কোনও খাদ নেই।

তা হলে তো ওই নদীটা ডিঙোতে পারলেই আমাদের মুক্তি। সমস্ত বিপদের শেষ।

আমারও তাই মনে হচ্ছে বাবু। এবারে আমরা অনায়াসে পালাতে পারব।

আনন্দের আবেগে আমিও তখন একটু একটু করে গাছের একেবারে মগডালে বাহাদুরের কাছাকাছি উঠে গেলাম। বেশ নিরাপদ এখানটা। ঘন পাতার আড়ালে খুব নিশ্চিন্তে লুকিয়ে থাকা যায়। শুধু যা একটু কাঠপিঁপড়ের উপদ্রব। তা হোক। সহ্য করা যাবে। আত্মরক্ষার জন্য এটুকু কষ্ট না করলে চলবে কেন?

ওপরে উঠে আমিও তীক্ষ্ণ চোখে সবকিছু লক্ষ করতে লাগলাম। না, বাহাদুর ভুল দেখেনি। ওই তো রুপোলি ফিতের মতো একটা নদী বহু দূরে সূর্যালোকে চকচক করছে।

বেশ কিছুটা সময় গাছের ডালে বসেই কেটে গেল।

তারপর যা ভেবেছিলাম হয়ে গেল তাই। অর্থাৎ সেই জংলিগুলো দলবদ্ধভাবে হই হই করে ছুটে আসতে লাগল এদিকে। ওরা সঙ্গে করে একটা

পালকিও বয়ে এনেছে দেখলাম। সেই পালকিতে নিশ্চয়ই ওদের সর্দার আছে।

মনে মনে ভাবলাম এসো বাছাধনরা। এই তো আমরা চাইছিলাম। আসতে অবশ্য অনেকটা সময় লাগল ওদের। একে তো ঝোপভরতি পথ, তার ওপর দূরত্বও কম নয়।

ওরা এল। এবং সেই বিশাল গাছতলা দিয়ে চলেও গেল। আমরাও সময় নষ্ট না করে নেমে পড়লাম গাছ থেকে।

নামবার আগে অবশ্য ভাল করে বেশ চারদিক একবার দেখেও নিলাম। যখন দেখলাম আর কেউ নেই, তখনই নামলাম।

তারপর সোজা এগিয়ে চললাম যে পথ দিয়ে জংলিরা এসেছিল, সেইদিকে। লক্ষ্য আমাদের নদী।

যেতে যেতে বাহাদুর বলল, আচ্ছা বাবু ওদের সঙ্গে সেই লোকটিকে দেখলাম না তো?

কোন লোকটি?

ওই যে সেই বুড়ো, ঝাঁকড়া চুল।

ও রামদুলালবাবু।

আপনি নামও জেনে গেছেন?

হ্যাঁ। তিনি আর এখানে এসে কী করবেন? এ হল জংলিদের ব্যাপার। তিনি হলেন ভিন্ন জাত। এদের তো নন।

যাই হোক, আমরা কখনও জোরে পা চালিয়ে, কখনও ছুটে গুহার দিকেই চললাম। তবে আর তো গুহায় ঢোকার প্রয়োজন নেই। তাই ডানদিকের পথটা ধরে নদীর দিকে এগোলাম আমরা।

কিছু পথ যাবার পর দেখলাম, এক জায়গায় সাতটি ঝরনা বা সপ্ত নদীর ধারা একত্রিত হয়ে প্রবল প্রবাহে নেমে আসছে একটি পাহাড়ের গা বেয়ে। দূর থেকে এটি অবশ্য আমাদের নজরে পড়েনি। কেন না এটি একটি খাড়াই পাহাড়ের বাঁকে ছিল।

নদীর ওপারে পাহাড়ের বাঁকে এক মনোরম ঢাল। কত বিচিত্র বর্ণের নুড়িপাথর যে পড়ে আছে সেখানে, তার আর শেষ নেই। দেখে মনে হয় কিছু পাথর খুবই মূল্যবান। যাই হোক, সেই মূল্যবান নুড়িপাথরের ঢালের গায়ে ঘন সবুজ নিবিড় বন। গাছপালার চেহারা দেখলে কাশ্মীর উপত্যকার কথা মনে হয়। কুলু কাংড়ার সৌন্দর্যও যেন প্রকটিত হয়ে উঠেছে এখানে।

আত্মগোপনের চমৎকার একটি জায়গা। কোনওরকমে নদীটা একবার পার হতে পারলে মুক্তিও মিলতে পারে। তবে তা দুরূহ প্রচেষ্টা। কেন না যা খরস্রোতা নদী।

নদীটা প্রবল প্রবাহে ধোঁয়ার আকারে একপাশে প্রায় দু' হাজার ফুট নিচু খাদে পড়ছে।

কিন্তু নদীর ওপারে কী করে যাব?

যা বেগ তাতে তো কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বড় বড় বোল্ডারের মতো পাথরের চাঁই যা দু'-একটা রয়েছে, তাতে তো শ্যাওলা ধরে আছে। সবচেয়ে মারাত্মক যা, তা হল নদীর বালি ও পাথরের খাঁজে হাঁ করে আছে বড় বড় কুমির। যারা আলুভাতের মতো দু'জনকে মুখে পুরে নিতে একটুও কষ্ট বোধ করবে না।

আমি হতাশ হয়ে বললাম, আমরা ভারতবর্ষেই আছি তো? নাকি ভুল করে আফ্রিকার জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি?

বাহাদুর বলল, আমরা ঠিক জায়গাতেই আছি বাবু। এটা হচ্ছে লুসাই পাহাড়ের রেঞ্জ। এও হিমালয়।

এইরকম বিচ্ছিন্ন পরিবেশের প্রভাবেই এই মানুষগুলো আজও জংলি হয়ে আছে। এবং দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্য কেউ এদের অস্তিত্ব টেরও পায় না। ফলে এরা যেমনি অসভ্য, তেমনি বর্বর।

যাই হোক। নদী পার হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই দেখে, আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসলাম।

এমন সময় বাহাদুরই হঠাৎ বলল, ওই দেখুন বাবু কী বিচিত্র একটা জিনিস।

দেখলাম একটা প্রকাণ্ড পাথরকে কুঁদে এক ভয়ংকর মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। মূর্তিটা সম্পূর্ণ নয়। গলা থেকে মুখ ও মাথা পর্যন্ত। মুখটা প্রকাণ্ড এবং হাঁ করা। যেন সর্বস্ব গিলে খেতে চাইছে সেই হাঁ মুখে।

তার সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই বুঝি একটি গ্যাঁজলা ওঠা তেলভরতি মাটির প্রদীপ দীপ্ত শিখায় জ্বলছে সেই মুখগহ্বরে। এই কি তবে নাগেশ্বরী? জংলিদের আরাধ্যা দেবী নাগমাতা?

মূর্তিটার সামনে যেতেই দেখলাম, এক ঝাঁক বুনো হাঁস কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এসে প্যাঁক প্যাঁক করে ডানা ঝাপটে উড়তে লাগল।

তাদের দেখাদেখি এক ঝাঁক পাখিও।

সে এক দেখবার মতো দৃশ্য।

এখানে সারিবদ্ধ কতকগুলো ছোট ছোট ঘরও আছে দেখলাম। এই তা হলে জংলিদের বস্তি।

ঘরগুলো এমন যে ওগুলোকে দেখলে ঘর বলে মনেই হবে না। মনে হবে পাথরের খাঁজে খাঁজে গজিয়ে ওঠা কতকগুলো ঝোপ। প্রতিটি ঘরই বাইরের দিক থেকে বুনো লতাপাতায় ঢাকা। সেইসব লতা গাছে রকমারি সুগন্ধি ফুলও আছে।

ঘরগুলোয় ঢোকবার জন্য কোনও দরজার বালাই নেই। সামান্য একটু আটকান দেওয়া। ঘাড় হেঁট করে গর্তের মতো জায়গা দিয়ে শুধু ঢুকে পড়া।

যাই হোক, আমি চট করে সেগুলোর ভেতরে ঢুকে পড়ে একটু তল্লাশি চালালাম। খুঁজেপেতে দেখলাম, যদি পাওয়া যায় আমাদের খোয়া যাওয়া সেইসব জিনিসগুলো।

বাহাদুরও চুপচাপ রইল না। সেও শুরু করল খোঁজাখুঁজি। দু'জনের সমবেত চেষ্টায় যদি পাওয়া যায়।

এরই মধ্যে একটি ঝোপড়ি ঘর দেখলাম, বেশ উন্নত ধরনের। বুঝলাম এইটাই সর্দারের ঘর।

বাহাদুরকে বললাম, বাহাদুর, তুমি একটু বাইরের দিকে নজর রাখো। আমি ভেতরটা খুঁজে দেখি।

কেন বেকার সময় নষ্ট করছেন?

আমার মনে হচ্ছে জিনিসগুলো এখানেই আছে।

তাড়াতাড়ি করুন তা হলে। আমি বরং একটা গাছের ওপর উঠে ওদের দিকে নজর রাখি। বিপদ বুঝলেই শিস দেব। আপনি বেরিয়ে আসবেন।

বাহাদুরের যুক্তিটা মন্দ নয়।

এখানে সবসময় সতর্ক থাকা দরকার।

তবে বিপদ বা ধরা পড়ার ভয়ও যেমন আছে, তেমনি আরও কিছু না থাক, লুকিয়ে পড়ার জন্য এইসব বৃহদাকৃতি গাছও আছে। বিশেষ করে ওই রাক্ষুসি দেবী নাগেশ্বরী যেখানে আছেন তার ঠিক পিছনেই আছে একটি প্রকাণ্ড গাছ। তার ডালপালাগুলোও যেন হাত বাড়িয়ে আকাশটাকে ধরতে যাচ্ছে। কী গাছ তা জানি না। ঘন ডালপালা। বড় বড় পাতা। আর যেন অন্ধকারময়। পাহাড়-জঙ্গলে এরকম কত গাছ যে আছে, কে আর অত নাম জেনে বসে আছে সব।

বাহাদুর গাছে উঠল।

আমি ঝোপড়ির ভেতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই অবাক। দেখি না আমাদের অতি যত্নে কেটে রাখা সেই হাতির দাঁতদুটো ঝোপড়ি ঘরের এক কোণে পড়ে আছে।

এমনকী সেই বাঘের ছালটাও ছাড়িয়ে এনেছে দেখছি।

অবশ্য এসবের জন্য এখন আর আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। এখন শুধু আমাদের আসল জিনিসগুলো এবং প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

তবুও খুব তৎপরতার সঙ্গে এটা ওটা সেটা দেখতেই পেয়ে গেলাম ম্যাপখানা।

মনটা উল্লাসে নেচে উঠল।

সর্দারের বিছানার নীচে গোঁজা ছিল ম্যাপটা। এতটুকু মলিন হয়নি। নকশা লেখা যেমন ছিল তেমনিই আছে। ম্যাপটা নিয়ে হাতড়াতে লাগলাম আরও কিছু পাওয়া যায় কি না তা দেখবার জন্য।

ঘরের ভেতরে একটা মাচা মতন ছিল। টর্চ, পিস্তল আর ছুরিটা সেখানেই পেয়ে গেলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার মুখেই দেখলাম যে ঘরে সর্দার থাকে, ঠিক তার পাশের ঘরেই সারি সারি সাজানো আছে তরমুজ, পেঁপে আর রামকলার কাঁদি।

আমি তাড়াতাড়ি করে কয়েক ছড়া কলা আর পেঁপে নিয়ে পালিয়ে এলাম। কেন না প্রাণ বাঁচানোর জন্য এবং পালিয়ে যাবার জন্য যতই চেষ্টা করি, ক্ষুধায় খাদ্য না পেলে পেট কোনও কথা শুনবে না।

এমন সময় শিসের সংকেত শুনতে পেলাম। এ তো বাহাদুরের শিস।

নিশ্চয়ই ওরা ফিরে আসছে এবার।

বাহাদুর তাই সতর্ক করে দিচ্ছে।

আমি আর একটুও বিলম্ব করলাম না। আর বিলম্বের দরকারই বা কী? আমার কাজ তো হাসিল হয়ে গেছে।

আমি যা নেবার তা নিয়ে এক লাফে বাইরে বেরিয়েই তাড়াতাড়ি করে গাছে উঠতে লাগলাম। গাছে ওঠার ব্যাপারে আমি বরাবরই পটু। তাই খুব একটা অসুবিধা হল না। বিশেষ করে এখানকার গাছপালার ডালগুলো ঘন এবং মোটা বলে চটপট করে ওপরে ওঠা যায়।

আমি ডালপালা ধরে ওপরে উঠে আসতেই বাহাদুর জিজ্ঞেস করল, লাভ হল কিছু? পেয়েছেন?

আমি হেসে বললাম, ভগবান সহায়। পেয়েছি।

ওরাও আসছে। ওই দেখুন।

ওরা আসবে, সে তো জানিই। গেছে যখন ফিরতেই হবে। তবু তাকিয়ে দেখলাম দূরে— অনেক দূরে ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে জংলিরা দলে দলে আসছে।

বাহাদুর এইসময় একবার আড়চোখে আমার হাতের দিকে তাকাল অর্থাৎ সংগ্রহ করে আনা সেই ফলমূলগুলোর দিকে।

আমি বললাম, ওরা আসার আগেই খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। পরে হয়তো সময় পাব না।

বাহাদুর বলল, খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। এতসব কোথায় পেলেন বাবু?

সর্দারের ঘরে।

ওঃ বাঁচালেন আপনি।

আমরা দু'জনেই তখন সর্বাগ্রে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দিলাম সেগুলো।

খেয়ে ফলের খোসাগুলো গাছেরই একটা ফোকরে গুঁজে রাখলাম। না হলে নীচে পড়লেই চোখে পড়বে ওদের। আর চোখে পড়লেই সর্বনাশ। যদি গাছের দিকে তাকায়, তা হলে আবার ধরা পড়ে যাব।

বাহাদুর খাওয়া শেষ করে বলল, তা বাবু আমাদের এইভাবে এখানে সময় নষ্ট করে গাছের ডালে বসে না থেকে, পালাবার চেষ্টা করলে হত না? এইভাবে পিঁপড়ের কামড় খেয়ে কতক্ষণ বসে থাকব?

সারাদিন। এখন পালাতে গেলেই ধরা পড়ব। সে খেয়াল আছে? সব ব্যাপারে বেশি আঁকুপাঁকু করলে হয় না। অসীম ধৈর্যে বুক বেঁধে বসে থাকতে হবে আমাদের।

কিন্তু এখানে বসে থেকেও যদি ধরা পড়ি?

সেটা নেহাতই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। তবে একটা ব্যাপারে এখন আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি এই যে, ওরা কিন্তু ধরেই নিয়েছে আমরা পাহাড় টপকে পালাতে গিয়ে খাদে পড়ে মারা গেছি। কাজেই এখন আর ওরা আমাদের নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবে না। ওরা এখন ওদের দলের লোকদের মৃত্যু নিয়েই চিন্তিত। তাই আমাদের প্রতি আর ওদের নজর নেই।

তা অবশ্য ঠিক।

তবুও এখানকার প্রকৃতিগত অবস্থানের জন্যে যে বাধা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে সময় ও সুযোগ বুঝে আমাদের পালাতে গেলেও ওই গুহার ভেতর দিয়েই পালাতে হবে।

বাহাদুর আক্ষেপের সুরে বলল, আবার ওই গুহা। গুহা দেখছি আমাদের ছাড়বে না।

না গুহাপথ ছাড়া সত্যি সত্যিই আর আমাদের কোনও পথ নেই। কেন না এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা অনেকটা মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক পাহাড়ের শোণ প্রপাতের জায়গাটার মতো।

তা হলে কখন যাবেন ঠিক করছেন?

দিনমানে তো সম্ভব নয়। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাতের অন্ধকারেই যেতে হবে আমাদের।

বাহাদুর বলল, ওই ম্যাপটার মধ্যে কি গুহাপথের কোনও নির্দেশ দেওয়া আছে?

আছে বইকী। সেইজন্যেই তো এত কষ্ট করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করলাম এটাকে। এইখানে নিরাপদে বসে সেই ম্যাপ দেখে গুহাপথের নির্দেশ বুঝে নিয়ে তবেই আবার ভেতরে ঢুকব।

আর তা হলে কোনও ভয় নেই বাবু, কী বলুন?

ভরসাও নেই। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কী ভয়? শুধু সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

এমন সময় বাহাদুর হিস্‌স্‌ করে উঠল।

ওর সংকেত বুঝতে পেরেই আমার রোমকূপগুলো খাড়া হয়ে উঠল তখন। এই অবস্থায় ঠিক কী করা উচিত, তা আমার জানা আছে। একদম নড়াচড়া নয়। একেবারে স্থিরভাবে বসে থাকতে হবে। না হলেই মৃত্যু।

উঃ। কী দারুণ হিমশীতল ঠান্ডা সেই পিচ্ছিল পরশ। পাহাড়ি সাপটা যে কখন গাছের ডাল বেয়ে এসে আমার কাঁধে নেমেছে তা টেরই পাইনি।

কাঁধের ওপর থেকে আস্তে আস্তে সেটা আমার বুকে নামল। তারপর কুতকুতে চোখে মাথাটা একটু দুলিয়ে সড় সড় করে চলে গেল সামনের একটি ডাল বেয়ে।

এতক্ষণ আমি নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলিনি। এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হঠাৎ একটা পিলে চমকানো শব্দে বুকটা কেঁপে উঠল। জংলিরা কখন যে এসে গাছতলায় দাঁড়িয়েছে তা খেয়াল করিনি।

পাগলের মতো উন্মত্ত হয়ে দামামা বাজাতে লাগল তারা। দ্রিম দ্রিম দ্রিম দ্রিম। সেই সঙ্গে বিকট চিৎকার।

কেউ কেউ বুক চাপড়ে কান্নাও শুরু করে দিয়েছে।

সেই ভয়ংকরী দেবীমূর্তির সামনে এসে লুটিয়ে পড়ছে সবাই।

সর্দার নতজানু হয়ে দেবীকে প্রণাম করল। তারপর কী ভেবে যেন ওপর দিকে তাকাতে গিয়েই থেমে গেল সর্দার। কান্না মাথায় উঠে গেল তার।

সোজা খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে 'আকুকুক্‌' করে একটা অদ্ভুত শব্দ বার করে সমস্ত জংলিদের হাতছানি দিয়ে ডাকল।

জংলিগুলো কান্না থামিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এল সর্দারের কাছে।

সর্দার আঙুল তুলে গাছের ওপর দেখতে বলল সকলকে। ইসরে। ধরা পড়ে গেলাম।

গাছের দিকে তাকানো মাত্রই হনুমানের মতো লম্ফঝম্ফ শুরু হয়ে গেল জংলিদের। তারপর বল্লম উঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল গাছের দিকে। আমাদের চোখে যেন জল এল।

হাত-পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। নাঃ। বিধি বাম। তাই এত চেষ্টা করেও মুক্তির স্বাদ পেলাম না। অভিশপ্ত তিড্ডিমের এই অভিশপ্ত প্রান্তরেই বল্লমের খোঁচা খেয়ে অসহায়ভাবে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে আমাদের।

আমরা আবার ওদের নজরে পড়ে গেলাম।

বাহাদুর ভয়ে চোখ বুজল।

সাত

আসলে কিন্তু আমরা যে ভয় করছিলাম, তা ঠিক নয়। ওরা আমাদের দেখতেই পায়নি। ওরা যা দেখে ছুটে এসেছিল তা হল একটা সাপ। বোধহয় খুব ভয়ংকর জাতের সাপ। না হলে এই সাপের রাজত্বে বাস করে সাপ দেখে ছুটে আসবে কেন?

সাপটা গাছের ডালে নিজের দেহটা পাকিয়ে এমনভাবে মুখটা লুকিয়ে রেখেছিল যে, সেটা অতর্কিতে সর্দারের চোখে পড়ে যায়।

একটু আগেই তো ওটার পাশ দিয়ে আমরা ওপরে উঠেছি।

গাছের ডালের সঙ্গে জড়িয়ে রঙে রং মিলিয়ে এমনভাবে ছিল ওটা যে তখন আমরা ভুলেও ওটাকে সাপ বলে মনে করতে পারিনি। কী ভাগ্য যে ছোবল মারেনি আমাদের। তা হলে বাঁচার আর কোনও উপায়ই থাকত না।

সাপটাকে দেখে জংলিরা খুব তৎপরতার সঙ্গে অদ্ভুত কায়দায় তার চোখ লক্ষ্য করে এমনভাবে বর্শা বিদ্ধ করল যে, প্রথমে সেটা কুঁকড়ে গেল। তারপর গোটা দেহটা দুমড়েমুচড়ে পাকিয়ে নিজের থেকেই পাক খুলে ধীরে ধীরে নেমে এল সেটা।

অনেক উঁচু ডালে বসে পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে এইসব দেখলাম আমরা।

কী প্রকাণ্ড সাপ।

যেন আস্ত একটা গাছের গুঁড়ি।

খুব কম করেও পঁচিশ-ত্রিশ হাত লম্বা হবে।

সাপটা নেমে এলে জংলিরা একত্রিত হয়ে মেরে ফেলল সেটাকে। তারপর দলবদ্ধ হয়ে তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলল নদীর দিকে।

নদী তো কাছেই।

নদীর জলে তিনবার ওরা সাপটাকে চুবিয়ে ছুড়ে দিল খাদের দিকে।

আবার বেজে উঠল দামামা।

দ্রিম। দ্রিম। দ্রিম। দ্রিম।

একটু পরেই দেখলাম গুহার ভেতর থেকে রামদুলালবাবু বেরিয়ে এলেন।

সর্দার তাঁকে কী যেন বলতেই রামদুলালবাবু বললেন, মায়ের কী মহিমা। মা কখনওই বিশ্বাসঘাতক ও লোভীকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন না। শাতকর্ণি গুহার এই গুপ্তধন একমাত্র আমরা ছাড়া আর কারও ভোগ করবার অধিকার নেই। এই বলে ধীরে ধীরে দেবী নাগেশ্বরীর মূর্তির কাছে এগিয়ে গেলেন রামদুলালবাবু। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে দু' হাত জোড় করে অর্ধ নিমীলিত

চোখে কী সব বিড় বিড় করে বলে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

হঠাৎ সর্দার চেঁচিয়ে উঠে কী যেন আদেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে জংলিরা যে যেখানে ছিল এসে হাজির হল সেখানে। তারপর সবাই মিলে দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল।

প্রার্থনা শেষ হলে কয়েকজন নিজ নিজ ঝোপড়ির ভেতরে ঢুকে বিচিত্র সব সাজ পরে এল।

মাথায় পরল হালকা কাঠের ফণাওয়ালা পঞ্চমুখী সাপ।

দেবী নাগেশ্বরীর সামনে শুকনো কাঠ জড়ো করে তাইতে আগুন ধরানো হল।

আর সেই আগুনের লেলিহান শিখাকে ঘিরে শুরু হল আধ ন্যাংটো জংলিদের হাত-পা তুলে বর্বর নাচ।

দামামার ছন্দ এবার অন্যরকম হয়ে গেল।

এবারে আর দ্রিম দ্রিম নয়। কেটে কেটে থেমে থেমে ত্রিমাত্রিক ছন্দে বাজতে লাগল দামামা— দুম দুম বা। দুম দুম বা। দুম দুম বা।

বাঁশের চোঙায় করে রস এল। সেই রস আকণ্ঠ পান করল সকলে। দারুণ নেশা জমে উঠল এবার। নাচের উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল।

নাচের সঙ্গে গানও শুরু হল এবার।

কেঁপে উঠল তিড্ডিমের পার্বত্যঅঞ্চল, বনভূমি ও উপত্যকা। পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। পাখিরা চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে লাগল আকাশে।

বিচিত্র সুরে, বিচিত্র ভাষায়, বিচিত্র কণ্ঠের গান জমে উঠল তখন—

"আম্‌বুম্‌বো আম্‌বুম্‌বে আম্‌বুম্‌বিপে-এঃ"

বাহাদুর বলল, এসব গানের ভাষা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কী যে ছাই বলে। আসলে এটা বোধহয় ওদের শোক উৎসব।

হ্যাঁ। অতগুলো লোক মরে যাওয়ায় ওরা দুঃখ পেয়েছে খুব।

প্রচণ্ড মাতালও হয়েছে।

তাই তো দেখছি। যে নাচন নাচছে, তাতে মনে হচ্ছে, আজই বোধহয় ওদের সকলের শেষদিন। এ নাচ কি দেখা যায়? আমার তো সর্বাঙ্গে কাঁটা দিচ্ছে। মানুষের মতো চোহারা। কিন্তু কী দারুণ অমানুষিক।

নাচ যখন দারুণ জমে উঠেছে, তখন হঠাৎ হই হই রবে চিৎকার করে উঠল জংলিগুলো। মুহূর্তের মধ্যে নাচগান থেমে গেল সব।

বল্লম নিয়ে রুখে দাঁড়াল সকলে।

শুরু হল প্রচণ্ড কোলাহল।

রামদুলালবাবু ছুটে গিয়ে নাগেশ্বরীর মূর্তির পিছনে একটি বড় পাথরের

আড়ালে আত্মগোপন করলেন। কাঁকড়াগুলো যেমন বিপদ বুঝলে মাটির গর্তে, ফাটলে নিজেদের ঢুকিয়ে নেয়, ঠিক সেইভাবে পাহাড়ের পাথরের খাঁজে নিজের দেহটা ঢুকিয়ে নিলেন রামদুলালবাবু।

এমন সময় সেই প্রচণ্ড কোলাহলকে ছাপিয়েও পাহাড়-পর্বত কাঁপিয়ে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল গোঁ গোঁ করে।

বাহাদুরের মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল 'ওরে ব্বাবা'!

দেখলাম মস্ত লম্বা একটি ডোরাকাটা বৃহদায়তন বাঘ সেই কোলাহলের মধ্য থেকেও ঝাঁপিয়ে পড়ে জংলিদের একজনকে মুখে নিয়ে চোখের পলকে হারিয়ে গেল সেখান থেকে।

ইতিমধ্যেই জংলিদের অব্যর্থ টিপে বাঘের পিছনদিকের রানে একটি বল্লম গেঁথে গেছে যদিও, তবুও বাঘ তাকে গ্রাহ্য করল না। শিকার মুখে নিয়ে দৌড়।

বাঘটা উধাও হবার সঙ্গে সঙ্গেই জংলির দল বল্লম উঁচিয়ে পিছু নিল তার। হই হই চিৎকার করতে করতে ছুটল তার চলে যাওয়া পথের দিকে।

রামদুলালবাবু নিরাপদ বুঝে পাথরের খাঁজ থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবার। তারপর আর একবার দেবীকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

সর্দার দেবীর বেদিতে অনেকক্ষণ ধরে মাথা খুঁড়ে কান্নাকাটি করল। তারপর কান্না শেষ হলে চোখের জল মুছে একজনকে কী যেন বলল।

সে আস্তে আস্তে সর্দারের ঘর থেকে বড় একটা কলার কাঁদি নিয়ে এল ঘাড়ে করে।

তারপর আবার গেল।

দুটো বড় বড় পেঁপে নিয়ে এল।

সর্দার একটি পেঁপে ও দু'ছড়া কলা লোকটিকে দিতেই, লোকটি ঢুকে গেল গুহার ভেতর। অর্থাৎ রামদুলালবাবুকে বা পাখিটাকে দিতে গেল।

সর্দার নিজেও কিছু ফল খেল।

তারপর কী মনে করে যেন উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

সমস্ত আবহাওয়াটাই কীরকম হয়ে গেল যেন।

বাহাদুর বলল, সকালে আমরা যে বাঘের বাচ্চাটাকে মেরেছিলাম এটা বোধহয় তার মা। মরিয়া হয়ে এসে তার সন্তানহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে গেল।

ঠিক বলেছ তুমি। ওর ধারণা এই জংলিরাই ওর বাচ্চাকে মেরেছে। সত্যি, এত লোকের সামনে থেকে যে কী করে তুলে নিল জংলিটাকে তা ভাবাই গেল না।

অথচ দোষটা আমাদেরই। এখানে এসে এই একটিই খারাপ কাজ করে ফেলেছি আমরা।

খুব অন্যায় করেছি। ওটাকে না মারলেই হত।

যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর এর জন্য আপশোশ করে কোনও লাভ নেই।

বুকের ভেতরটা এখনও যেন ঢিপ ঢিপ করছে।

নীচে আগুনের তেজ একটু একটু করে কমে আসছে তখন।

সর্দার গেছে ঝোপড়িতে।

জংলিরা গেছে বাঘ মারতে।

দু'-একজন শুধু নাগেশ্বরীর মূর্তির কাছে শুয়েবসে ঝিমুচ্ছে।

আমি গাছের ডালে বসে গুহার ম্যাপখানা মেলে ধরলাম। ম্যাপের প্রথমেই একটি ক্রশ চিহ্ন আঁকা আছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের দিক নির্ণয় করছে চিহ্নটা।

বাহাদুর বলল, এই সংকেত থেকেই আমরা রাস্তার হদিস পেয়ে যাব। কী বলুন?

হ্যাঁ। আজ রাত্রে জংলিরা আরতি করে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে ঘুমোলেই আমরা পালাব। ততক্ষণে পথের হদিসটা জেনে নিই।

কিন্তু গুপ্তধন? গুপ্তধনের কী হবে?

গুপ্তধনের সন্ধান দেবে রামদুলালবাবু। ভাল কথায় রাজি না হলে পিস্তল দেখিয়ে জেনে নেব।

কী বিচিত্র ধাঁধার মতো ম্যাপ। মোটা সবুজ কাগজে লাল কালিতে আঁকা। সূর্যটা মাথার ওপর যেখানে আছে, সেখান থেকে আমরা দিকনির্ণয় শুরু করলাম।

অর্থাৎ আমরা এখন উত্তরে আছি।

গুহার প্রধান মুখ মানে যে পথে আমরা প্রবেশ করেছি সেটা দক্ষিণে। পূর্বে নদী। পশ্চিমে গিরিখাত।

এক জায়গায় লেখা গুপ্তধন। লেখাটা সাংকেতিক। একটা বিচিত্র ধাঁধা—

নীল তারা ঝিকমিক, বিশ গতি ডানদিক,
রাধা মোড় ছ'চরণ, সাবধানে হে মরণ।
শিলাটন খান তিন অমাবস্যা সারাদিন,
একুশে চরণ রেখো, সামনে তাকিয়ে দেখো।

বাহাদুর বলল, এর মানে কী বাবু?

এর মানে কি আমিও জানি? তা হলে তো সব সমস্যার সমাধান এখুনি হয়েই যেত। শুধু ভেবে পাচ্ছি না অনেক অনুসন্ধানের পর এই গুহার মানচিত্র যিনি তৈরি করলেন তিনি এর সন্ধান পেলেন কী করে? এবং সন্ধান পেয়েও গুপ্তধন নিতে পারলেন না কেন?

হয়তো মর্মান্তিক মৃত্যুই তার কারণ।

বাহাদুর আমি দু'জনেই ঝুঁকে পড়লাম ম্যাপের ওপর। কী জটিল সেই নকশা। রেখার পর রেখা এমনভাবে মিলেছে যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

আমরা প্রধান মুখে যেদিকে ঢুকেছি সেই দিকটাই এখন প্রস্থানপথ ভেবে বিপরীত দিক অর্থাৎ যেদিকে সেই অতিকায় পাখি এবং জলস্রোত রয়েছে, সেইদিক থেকে এখানকার যাত্রাপথ নির্ণয় করতে লাগলাম।

এই তো এক দুই তিন অর্থাৎ অর্ধবৃত্তাকারে এদিককার গুহামুখ থেকে ডানদিকে তিন পাক বেরোলে গুহার মধ্যস্থলে গিয়ে পড়ব। বাঁদিকে নিষেধ। লাল ডট দেওয়া আছে। তারপর সোজা দুটি গহ্বর ডাইনে রেখে সূর্য আঁকা তৃতীয় গহ্বর বাঁদিকে। তারপর—

আর দেখা হল না।

নীচে তখন প্রচণ্ড চেঁচামেচি।

সর্দার ঝোপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করছে। আর তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে।

যে দু'-একজন সেখানে উপস্থিত ছিল তারাও ছুটে গেল সর্দারের কাছে।

সর্দার কী যেন বলতেই একজন ছুটল গুহার দিকে। তারপর রামদুলালবাবুকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

রামদুলালবাবু এসেই বললেন, তা কী করে হয়? তারা তো মরে গেছে।

সর্দার আবার কী যেন বলল।

রামদুলালবাবু বললেন, তুমি বিশ্বাস করো সর্দার, আমি তাদের পালিয়ে যেতে কোনওরকম সাহায্য করিনি। তা ছাড়া ওই ম্যাপও চুরি করিনি আমি। ওরাই নিয়ে পালিয়েছে। পালাতে গিয়ে মরেছে।

সর্দার এবার গম্ভীরভাবে কী যেন বলল রামদুলালবাবুকে।

রামদুলালবাবু বললেন, বেশ তো, যদি তোমার সন্দেহ হয়, তা হলে আমার ঘরের ভেতরটা খুঁজে পেতে দেখো যদি কিছু পাও। আমি এই মায়ের দিব্যি দিলাম। মা নাগেশ্বরীর সঙ্গে যারা বেইমানি করেছে তারা যেন মরে। আমারও মৃত্যু হোক।

সর্দার একবার দু'হাতে নিজের চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে ঝাঁকানি দিয়ে নিল। তারপর রামদুলালবাবুর কাছে এগিয়ে এসে হাতে হাত মিলিয়ে বলল, চেল্লিটাল্লিচো। অর্থাৎ বিশ্বাস করলাম।

রামদুলালবাবু বললেন, তারা মরেছে সর্দার। এদিকে জলের মধ্যে শত শত কুমিরের পাহারা, ওদিকে গভীর গিরিখাদ। ওরা যাবে কোনদিকে?

রামদুলালবাবু আবার বললেন, ওরা পালাতে গিয়েই মরেছে। মা ধ্বংস

করেছেন ওদের। মা কখনও ওদের ক্ষমা করেননি। মায়ের ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না সর্দার।

বেলা তখন পড়ে আসছে।

দূর থেকে বিচিত্র বুনো গানের সুরও ভেসে আসছে। অর্থাৎ জংলিরা ফিরছে। হই হই রব শোনা যাচ্ছে।

দামামা বাজছে দ্রিম দ্রিম দ্রিম।

জোরে জোরে বাজছে।

কাঁপছে তিড্ডিম। কেঁপে কেঁপে উঠছে লুসাই পাহাড়ের সুদীর্ঘ রেঞ্জ। ভেসে আসছে প্রচণ্ড কোলাহল।

হই হই করে ছুটে আসছে সব। বিজয়উল্লাসে চিৎকার করতে করতে আসছে।

বাহাদুর দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, আরে! কী সাংঘাতিক। ওই দেখুন বাবু। সেই বাঘটাকে মেরে ওরা ঘাড়ে করে আনছে।

একটু পরেই বাঘটাকে নিয়ে এসে পড়ল ওরা। বর্শাবিদ্ধ করে বাঘটার শরীরের কোনও অংশ ওরা অক্ষত রাখেনি।

যে জংলিটাকে বাঘে ধরেছিল, তাকেও বয়ে নিয়ে এল কয়েকজন। কী মর্মান্তিক অবস্থা তার।

জংলিটা মরে গেছে।

বাঘে বীভৎসভাবে তার পেটটা খেয়ে ফেলছে। কী সাংঘাতিক দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না।

মৃত জংলিকে ওরা নাগেশ্বরীর সামনে রাখল।

বাঘটাকেও রাখল একপাশে।

দু'জন খুব যত্ন সহকারে বাঘের ছাল ছাড়াতে বসল। বেশি সময় লাগল না।

ছাল ছাড়িয়ে বাঘটাকে ওরা নদীতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সেই হাঁ করে থাকা বুভুক্ষু কুমিরগুলোর আনন্দভোজ।

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল।

তারপর দেবীর কাছে অনেক প্রার্থনার পর দলের লোকেরা সেই মৃত জংলিটাকেও ছুড়ে দিল ক্ষুধার্ত কুমিরের গ্রাসে।

আবার দামামা বাজল।

দেবীর সামনে জ্বলে উঠল অগ্নিকুণ্ড।

আবার শুরু হল নাচ।

লকলকে আগুনের লেলিহান শিখায় দেবীর রাক্ষসী মূর্তি ঝকমক করে উঠল।

নাচগান শেষ হলে একজন ঝোড়া বোঝাই করে হাতে গড়া মাটির প্রদীপ এনে ঢালতে লাগল সেখানে। কয়েকজন সেই প্রদীপ সাজাতে বসল। আর বাদবাকিরা

কলার মান্দাসে গাছের ছালে সেই প্রদীপ সাজিয়ে পলতের মুখ জ্বেলে ভাসিয়ে দিতে লাগল নদীর জলে। যেখানে স্রোতের বেগ একটু কম, সেখানে স্রোতের টানে প্রদীপগুলো খাদের দিকে না-পড়ে কয়েকটি গুহামুখের ভেতর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল।

তিড্ডিমের এই আলোকিত সন্ধ্যা মনোরম হয়ে উঠল। কী অপূর্ব সেই দৃশ্য। সে দৃশ্য ভোলা যায় না।

প্রদীপ ভাসানো শেষ হলে শিঙা ফুঁকে সর্দারকে বসানো হল একটা পালকিতে।

কয়েকজন পালকি নিয়ে ঝোপড়িগুলোর পিছনদিক দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। বোধহয় শাতকর্ণি গুহায় সাতবাহন রাজার গুপ্তধনের আরতি করতে গেল।

বাহাদুর আর আমি অবাক হয়ে সব দেখলাম।

বাহাদুর বলল, এবার নামবেন তো বাবু?

এখন কী? ওরা ফিরে আসুক। রাত বাড়ুক। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবে তো।

আমরা আজই পালাতে পারব। কী বলুন? আর ভাল লাগছে না এখানে।

ভাল কি আমারও লাগছে? তবু দেখিই না কী আছে কপালে।

আমি কিন্তু এখন পালাবার কথা নয়, অন্য কথা ভাবছি। সেই সাংকেতিক ধাঁধাটার কথা। ভেবে ভেবে কোনও কূলই পেলাম না। ভাবনার জটগুলো পাকিয়ে মাথাটাই শুধু ঝিম ঝিম করতে লাগল।

আট

এখন কত রাত তা জানি না।

জংলিরা একটু আগেই ফিরে এসে শুয়ে পড়েছে যে যার ঘরে। বাহাদুর আর আমি আস্তে আস্তে নেমে এলাম গাছ থেকে।

চারদিক নিঝুম।

আমরা ধীর পায়ে গুহামুখের কাছে এলাম।

টর্চের আলোয় পথ দেখে গুহামুখের সামনে সেই পাঁচিলের মতো খাড়াই পাথরটার কাছে গেলাম।

এইখান দিয়ে বারবার এই বাধা অতিক্রম করে জংলিটা যে কী করে যাতায়াত করছে তা ভেবে পেলাম না। নাকি অন্য কোনও পথ আছে?

এদিক ওদিক দেখতে দেখতেই খাড়াইটার গা দিয়ে সরুমতো একটি প্যাসেজ

নজরে পড়ল। প্যাসেজটা এত ছোট যে তা নজরে পড়বার নয়। বড় জোর একজন লোক তার ভেতর দিয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি দু'জন নয়।

বাহাদুরকে নিয়ে আমি আগুপিছু হয়ে সেটায় প্রবেশ করলাম। এবং খাড়াইটার পাশে পৌঁছে গেলাম।

এইখান দিয়েই আমরা খাড়াই ডিঙিয়ে এখানে এসেছিলাম। যাই হোক, পথটা জেনে আবার আমরা খাড়াইয়ের ওপাশে চলে গেলাম। কেন না যে পথে পালকি চেপে জংলিদের সর্দারকে আমরা যেতে দেখলাম, সে পথটা আমাদের অতি অবশ্যই একবার জেনে রাখা দরকার।

ঝোপড়ির পিছনদিক দিয়ে পথ। আমরা সেই পথে গেলাম।

যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলাম পাথরের ছাদের নীচে মস্ত একটি গোশালা। গোরু ভরতি গোশালাটা মোটা মোটা শাল কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘেরা। তারই একপাশে পালকিটা পড়ে আছে।

গোশালার বাঁদিকে একটি পাথরের দেওয়ালে মস্ত দরজা। দরজার আংটায় দড়ি বাঁধা।

খুব সাবধানে দড়িটা খুলে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই সিঁড়ি পেলাম নীচে নামার।

সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগলাম দু'জনে। কয়েক ধাপ নামতেই দেখলাম দালান মতো একটা অংশ।

বাহাদুর চমকে উঠে বলল, আরে! এ তো সেই জায়গা!

সেই জায়গা মানে?

যেখানে জংলিরা আমাদের বন্দি করে রেখেছিল।

যাক এ পথটা চেনা হয়ে গেল।

আমরা সেই জায়গা পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যেদিকে সেই সর্বনাশা পাখিটা আছে সেদিকের বারান্দায় গেলাম।

তারপর পাখিটার নজর এড়িয়ে পা টিপে টিপে বারান্দা পার হতেই আবার সিঁড়ি। ওই তো রামদুলালবাবুর ঘর।

রামদুলালবাবু তখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিলেন।

ঘরে গিয়ে বাহাদুর আর আমি ঝুঁকে পড়ে রামদুলালবাবুকে একবার ডাকতে গিয়েও থেমে গেলাম।

থাক। দরকার নেই। মাথাপাগলা লোক। বোঝালে হয়তো বুঝবে না। যদি চেঁচিয়েমেচিয়ে ওঠে?

তার চেয়ে নিজেরাই একবার চেষ্টা করে দেখি।

তাই মানচিত্রের নির্দেশমতো পথে এগিয়ে চললাম।

ওই তো মাথার ওপর নীল আকাশ। এই তো সেই পাঁচিলের খাড়াই। পথ শেষ। কিন্তু গুপ্তধন? গুপ্তধন কোথায়?

অথচ গুপ্তধনের নির্দেশ এইখানেই দেওয়া আছে। ভাবতে গেলেও মাথাটা যেন ঘুলিয়ে যায়।

বাহাদুর বলল, কেন আর আলেয়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে মিথ্যে দেরি করছেন বাবু? দরকার নেই গুপ্তধনের। এখন ভালয় ভালয় কেটে পড়ি চলুন।

সত্যি কথা বলতে কী, আমাকে তখন গুপ্তধনের নেশায় পেয়ে বসেছে। বললাম, না বাহাদুর। ম্যাপ যখন রয়েছে, তখন পালাবার পথ খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন হবে না। তবুও ভাগ্যচক্রে একবার যখন এসে পড়েছি এখানে, তখন রাজা শাতকর্ণির সেই রত্ন ভাণ্ডার না দেখে যাব না।

সে কি আমারও ইচ্ছে নয় বাবু? যদি পারি তো সঙ্গে করে কিছু নিয়েও যাব।

সে পরের কথা। এখন আমাদের যেমন করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে গুপ্তধন কোথায় আছে। সংকেত অনুযায়ী গুপ্তধন এখানেই থাকবার কথা। কিন্তু মানচিত্রের ধাঁধা বড় জটিল।

আমি বারবার ধাঁধাটার সমাধানের চেষ্টা করতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ জট খুলে গেল। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

বাহাদুর বলল, হদিস পেলেন কিছু?

নিশ্চয়ই।

বাহাদুরের মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যাক। আমাদের এই প্রচেষ্টা তা হলে বিফলে যাবে না। রাজা হবার বাসনা আমরা রাখি না। শুধু রহস্যের আবরণটা খুলে দেখতে চাই।

আমি ধাঁধাটার যা মানে করলাম, তা হল এইরকম, 'নীল তারা ঝিকমিক, বিশ গতি ডানদিক।' অর্থাৎ আমাদের মাথার ওপর সেখানে নীল তারা ঝিকমিক করছে তার ডানদিকে বিশ পা যেতে হবে। আমরা পা মেপে সেইভাবেই গেলাম।

সামনেই পাথরের দেওয়াল। পথ নেই।

এবার লেখা আছে 'রাধা মোড় ছ' চরণ, সাবধানে হে মরণ।' রাধা মোড়ের মানে বুঝলাম না। তবে অনুমান করলাম রাধা তো কৃষ্ণের বাঁদিকে থাকে। অর্থাৎ এখানকার এই ঘন অন্ধকারকে যদি কৃষ্ণ ধরা হয়, তবে এর বাঁদিকে ছ' চরণ অর্থাৎ ছয়-পা যেতে হবে।

তাই গেলাম। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে গেলাম।

তারপর 'সাবধানে হে মরণ'। এবার সাবধান হতে বলেছ। সত্যিই ছ'-পা যাবার পর আর এক পাও যাবার জায়গা নেই।

গভীর গর্ত। গর্তটা অন্তত দু' হাত চওড়া।

না জেনে কেউ যদি আচমকা এসে পড়ে এখানে, তা হলেই গুপ্তধন নেওয়া মাথায় উঠে যাবে তার।

বাহাদুরকে দাঁড়াতে বলে আমিই আগে লাফ দিয়ে গর্তটা পার হলাম। তারপর এল বাহাদুর।

ওকে অবশ্য লাফাতে হল না। এক জায়গায় চওড়া মোটা একটা শক্ত কাঠের তক্তা ছিল, সেটা পেতে দিতেই চলে এল সে।

এবার লেখা আছে, 'শিলাটন খান তিন, অমাবস্যা সারাদিন।'

মিলিয়ে দেখলাম একেবারে অঙ্কের হিসাবের মতো সবই ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। ঘন অন্ধকার যেন আরও ঘন, আরও জটিল সেখানে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

সেইখানে তিনটে আংটাওয়ালা পাথর ছিল। সেগুলো টেনে তুলতেই নীচে নামার সিঁড়ি পেলাম।

এবার 'একুশে চরণ রেখো, সামনে তাকিয়ে দেখো।' একুশ ধাপের সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমেই সামনে তাকালাম।

দেখলাম একটি প্রকাণ্ড সিংহ-দরজায় মস্ত একটি তালা ঝুলছে। পাশেই দেওয়ালে আছে চাবি। সেই চাবি দিয়ে তালা খুলে দরজাটা ফাঁক করতেই সব অন্ধকার যেন দূর হয়ে গেল। দেখলাম প্রকাণ্ড একটি সোনার পিলসুজে মস্ত একটি সোনার প্রদীপ জ্বলছে। আর তার পিছনে রুপোর রেলিং দেওয়া একটি ঘরের মধ্যে মস্ত একটি রত্ন সিংহাসন। সিংহাসনকে বেড় দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে মস্ত একটা সাপ। দেখলে বুক যেন শুকিয়ে যায়।

ঘরের ভেতর শত শত কলসিতে মোহর ভরা।

শুধু তাই নয়। আরও কত যে ধনরত্ন রয়েছে সেখানে, তার আর সীমা নেই। বিশ্বের ঐশ্বর্য যেন একত্রিত হয়েছে এখানে। এরকম ধনভাণ্ডার বোধহয় এর আগে কখনও কোথাও ছিল না। চোখে দেখেও অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে লাগল সব। মনে হল যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছি। বড় বড় হিরের টুকরোগুলো ঘরময় এমনভাবে ছড়ানো যে, দেখলে লোভ লাগে। হয়তো এইরকমই কুবেরের ঐশ্বর্য। যেমনি ধনসম্পদ, তেমনি সাপের রাজত্ব সেখানে। ছোট বড় নানা ধরনের সাপ কিলবিল করছে। আমার মনে হল এগুলো সাপের ফণা তো নয়, মৃত্যুরূপী প্রলোভন যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমরা মুগ্ধ নেত্রে এবং অপলকে সেই লোভনীয় ধনরাশির দিকে চেয়ে রইলাম।

বাহাদুর বলল, বাবু! এর কিছুও কি আমরা নিয়ে যেতে পারব না?

না। কী করে নেবে? এইসব সাপেরা হল মূর্তিমান যখ। এমনকী এই

জংলিরাও। তাই এই সম্পদে কেউ হাত দেয় না। যে দিতে যায় সে মরে। একমাত্র রাজা শাতকর্ণি নিজে যদি কখনও নরদেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন এবং পথ ভুলে তোমার আমার মতো এই গুহায় কখনও যদি ঢুকে পড়েন, তা হলে গুপ্তধন তিনিই শুধু নিতে পারবেন। যখের ধনের এই নিয়ম। তুমি আমি তো সে লোক নই। অতএব এর ওপর আমাদের কোনও অধিকারও নেই।

কে বললে আমরা সে লোক নই। এই তো, আপনিই মহারাজ শাতকর্ণি আর আমি আপনার মহামন্ত্রী। ওই দেখুন আপনার কপালে রাজ চক্রবর্তী তিলক। আসুন এ সবই আমরা লুটে পুটে নিই।

তোমাকেও দেখছি এখন রামদুলালি রোগে ধরেছে। এসো চলে এসো। বলে ওর হাত ধরে টান দিলাম।

বাহাদুর একটুও নড়ল না। দু'হাতে শক্ত করে সেই রেলিংগুলো ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও।

আবার অনেকক্ষণ ধরে সেই গুপ্তধনের জৌলুস দেখে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। আসবার সময় যেমন তালা দেওয়া ছিল, ঠিক সেইভাবে তালা দিয়ে যেভাবে এসেছিলাম সেইভাবেই ফিরে এলাম।

বাহাদুর বলল, এবার কি আমরা ফিরছি?

হ্যাঁ। একবার জল পার হতে পারলে আর কোনও ভয় নেই।

পাখিটা যদি আবার চেঁচামেচি শুরু করে?

করলেই বা। ওর চিৎকার জংলিদের কানে যাবে না। তারা এখন গুহার বাইরে ঝোপড়িতে আছে। তবে রামদুলালবাবু ছুটে আসতে পারেন। ওকে কবজা করতে এক মিনিটও লাগবে না আমার।

আমরা ফিরে আসতে আসতে রামদুলালবাবুর ঘরের কাছে থমকে দাঁড়ালাম একবার। তারপর আবার সেই বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। একপাশে একটি প্রদীপ জ্বলছে।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় গুহার সেই ঘন অন্ধকার একটুও দূর হয়নি।

আমরা যেতে আমাদের দেখে কর্কশ কণ্ঠে বিকট চিৎকার শুরু করে দিল পাখিটা।

বাহাদুর বলল, ফায়ার। বাবু, এখুনি গুলি করুন ওটাকে। না হলে ওর চিৎকার আমাদের বিপদ ডেকে আনবে।

না। অযথা একটা প্রাণকে নষ্ট করতে চাই না আমি।

বারান্দার একপাশে সেই মোটা শক্ত দড়িটা তখনও ঝুলছে দেখলাম। সেই দড়ি ধরেই নামতে যাচ্ছি এমন সময় রামদুলালবাবু এসে হাজির, এ কী! তোমরা এখানে?

ভয়ে বাহাদুরের মুখ শুকিয়ে গেল।

আমি বললাম, বিদায় রামদুলালবাবু।

রামদুলালবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, তোমরা এখনও বেঁচে আছ?

শুধু শুধু মরব কেন?

তোমরা তা হলে পালাতে গিয়ে মরনি?

না। এই তো দেখছেন দিব্যি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু...।

কোনও কিন্তু নয়। এখন বলুন আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন কি না?

রামদুলালবাবু চমকে উঠলেন, না না। আমি যাব না। আমি কোথাও যাব না। তোমরাও যেয়ো না। গেলেই মরবে।

আমরা মরব না রামদুলালবাবু। দেখছেন তো এখনও পর্যন্ত এদের কবলে থেকেও কেমন অক্ষত শরীরে বঁচে আছি। এরা আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। আমাদের বুদ্ধিই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

রামদুলালবাবু কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন, তোমরা তা হলে সত্যিই পালাতে চাও?

চাই কেন, পালাচ্ছি তো?

গুপ্তধন নিতে তোমরা তা হলে আসনি?

না।

তোমরা যে পালাবে, পালাবার পথ জান?

আপনি জানেন?

না। তা হলে তো কবেই পালাতাম।

তার মানে পালাবার ইচ্ছে আপনারও আছে। শুধু উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে পালাতে সাহস করেননি। এই তো?

হ্যাঁ।

আমাদের কাছে ম্যাপ আছে। সেই ম্যাপ দেখে পালাব। কোনওরকমে একবার গুহার বাইরে যেতে পারলেই ব্যস।

কিন্তু ম্যাপের নকশা যদি ভুল হয়? তা হলে কিন্তু অবধারিত মৃত্যু। তা জেনে রেখো। এই গুহার জঠরে জঠরে অতিকায় পাইথনের বাস।

আপনার কোনও ভয় নেই রামদুলালবাবু। আসুন আমাদের সঙ্গে। রামদুলালবাবু এবার সাহস পেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, বেশ, আমিও যাব। তবে তার আগে...

তার আগে? বলুন তার আগে কী?

কিছু গুপ্তধন আমাদের নিয়ে যেতে হবে।

বাহাদুর বলল, ঠিক বলেছেন। আমারও তাই ইচ্ছে।

আমি বললাম, না ওতে আমাদের কোনও লোভ নেই।

রামদুলালবাবু বললেন, আমার আছে। আমি যে গুপ্তধনের লোভেই এখানে এসেছিলাম।

আমি রামদুলালবাবুকে বুঝিয়ে বললাম, দেখুন গুপ্তধন যে কোথায় কীভাবে আছে তা আমরা দেখে এসেছি। সেই অতুল ধনরাশি আমরা গাড়ি বোঝাই করেও নিয়ে যেতে পারব না। কাজেই কোনও লাভ নেই।

রামদুলালবাবু এবার খেপে উঠলেন, তবে দূর হও তোমরা। যেমন যাচ্ছ তেমনি চলে যাও। আমাকে ডেক না। তোমাদের জমিদারি আছে, দেশে গিয়ে তোমরা তাই ভাগ করবে। কিন্তু আমার কী আছে? আমি কী খাব? আমি কি ভিক্ষে করব? না ডাকাতি করব?

আমি বললাম, কিচ্ছু করতে হবে না আপনাকে। আমি একটা যাত্রাদলে অভিনয় করি। আমাদের অধিকারীকে বলেকয়ে সেই দলেই আমি আপনার একটা কাজ করে দিতে পারব। সে ক্ষমতা আমার আছে। যতদিন না কাজ হয়, ততদিন আপনি আমার কাছেই থাকবেন।

আমার কথায় রামদুলালবাবু আশ্বস্ত হলেন। বললেন, বেশ, তা হলে চলো। তবে যাবার আগে দুটো কাজ আমাদের করতে হবে।

কী কাজ?

প্রথম হচ্ছে পাখিটাকে মুক্তি দেওয়া। আর দ্বিতীয় কাজ হল এই গুপ্তধন যাতে কেউ কখনও আবিষ্কার করতে না-পারে সেই ব্যবস্থা করে যাওয়া। অর্থাৎ এখানকার সবকিছুই আমি ধ্বংস করে দিতে চাই। যে জিনিস আমরা পেলাম না, তা কাউকে নিতে দেব না।

বাহাদুর আমি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

রামদুলালবাবুর চোখমুখ কেমন যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে।

আমি বললাম, কী করে ধ্বংস করবেন?

বিস্ফোরণ ঘটাব। সব চুরমার করে দেব। ধ্বংস করে দিয়ে যাব এখানকার সবকিছু। অভিশপ্ত তিড্ডিমের সমস্ত অভিশাপের শেষ হয়ে যাবে। আমার মতো জীবনের এই দীর্ঘ বাইশটা বছর কাউকে আর গুহার অন্ধকারে বন্দি হয়ে থাকতে হবে না। কোনও মানুষের অমূল্য জীবন আর কখনও জংলিদের সংস্কারের বলি হয়ে বৃথা নষ্ট হবে না।

সেরকম কিছু কি আছে আপনার কাছে?

আছে।

কী আছে?

ধ্বংসের বারুদ। এসো, দেখবে এসো।

আমরা রামদুলালবাবুকে অনুসরণ করলাম।

এ অবশ্য মন্দ নয়। এখানকার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাক, সেটা যে একান্তভাবে আমরাও চাই।

নয়

আমরা রামদুলালবাবুর সঙ্গে অন্যত্র ফিরে গেলাম। রামদুলালবাবুকে যে, দলে টানতে পেরেছি এতে আমাদের মনোবল বেড়ে গেছে খুব। মনকে তবু তো বোঝাতে পারব অভিশপ্ত তিড্ডিমে গিয়ে আর কিছু হোক, বা না হোক তার অভিশাপের কবল থেকে একটা মানুষকেও আমরা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।

রামদুলালবাবু গুহার অন্ধকার কোণ থেকে কী যেন একটা বাঁধা অবস্থায় নিয়ে এলেন। কাছে আনতে বাহাদুর আমি অবাক হয়ে বললাম, কী এটা?

ধ্বংসের বারুদ। খুলে দেখো।

আমরা সব দেখে চমকে উঠলাম, আরে! এ কোথায় পেলেন?

সংগ্রহ করেছি।

সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কী করে?

কিছুদিন আগে জনা চারেক লোক এখানে এসেছিল। জংলিরা তাদের প্রত্যেককে হত্যা করেছে। এসব তাদেরই। আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। শুধু ফিটিং করতে জানি না বলে কাজে লাগাতে পারিনি। আর বেরোবার পথ জানি না বলে, পালাতেও সাহস করিনি। পারবে তোমরা এগুলো দিয়ে এখানকার সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে?

আমি বললাম, পারতেই হবে।

বাহাদুরও এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল। বলল, এ তো খুব হেভি ওয়েটের ডিনামাইট দেখছি।

হ্যাঁ। তারে তারে জুড়ে দিয়ে পলতের মুখে শুধু একটু আগুন ছুঁইয়ে দেবার অপেক্ষা। পারবে? সাহস আছে?

বাহাদুর বলল, কী যে বলেন। সাত বছর মিলিটারিতে চাকরি করেছি। তবে এগুলোকে ফিটিং করতে সময় লাগবে একটু।

লাগুক। এখন আমি তো তোমাদের সহায়। আর ভয় কী?

আমিও পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে বললাম, আপনি তো সহায় রইলেনই। তবুও বাধা যদি কিছু আসে তখন এটা তো সঙ্গে আছেই।

বাহাদুর ততক্ষণে তার খুলে বসে পড়েছে ডিনামাইট ফিট করতে।

আমি বললাম, প্রথমেই আমাদের নদীর গতিপথ যেখানে পাথরের খাঁজ বেয়ে নীচে পড়ছে, সেই জায়গাটাকে ধসিয়ে দিতে হবে। তা হলে ফাঁকটা বড় হলেই ভেতরের জল হুড়হুড় করে কমে যাবে। আর ফাঁক বড় হলে পাখিটাও মুক্তি পাবে এই বন্দি দশা থেকে।

রামদুলালবাবু বললেন, জল কমে গেলে আমরাও দিব্যি এখানটা পার হয়ে গুহার সুড়ঙ্গে ঢুকতে পারব।

বাহাদুর ততক্ষণে বেশ খানিকটা তার জুড়ে ফেলেছে।

আমি বললাম, বাহাদুর, তুমি তোমার কাজ করো। আমি খাঁজগুলোর কাছে যাই। কোনখানে কীভাবে কী করবে তা দেখে রাখি।

রামদুলালবাবু বললেন, আমিও যাব সঙ্গে।

আসুন।

আমরা বারান্দার কাছে যেতেই পাখিটা আবার চেঁচাতে লাগল। রামদুলালবাবু মুখ দিয়ে একরকম বিচিত্র শব্দ বার করে চুপ করালেন পাখিটাকে। তবে একবারে যে চুপ করে গেল তা নয়। খুব মৃদু স্বরে কিঁ কিঁ কিঁ কিঁ শব্দ করে একবার এ দেওয়াল, একবার ও দেওয়াল করে বসতে লাগল পাখিটা।

আমি বারান্দার দড়ি ধরে নেমে পড়লাম নীচে। কী বিদঘুটে অন্ধকার। ওপরে যে প্রদীপ জ্বলছে তার ছিটেফোঁটা আলোকপাতও নীচে হচ্ছে না। তাই নেমেই টর্চ জ্বাললাম।

জলস্রোত ধীর ও গম্ভীর মেজাজে বয়ে চলেছে। তোড় না-থাকলেও, টান আছে বেশ।

রামদুলালবাবু ওপর থেকে বললেন, যদি অসুবিধে হয় তা হলে একটা মশাল জ্বেলে দিই?

ভেবে দেখলাম টর্চের চেয়েও মশালের আলো একটু জোরালো হবে। বললাম, তাই দিন। পারেন তো আপনিও নীচে আসুন।

একটু পরেই মশাল হাতে নেমে এলেন রামদুলালবাবু।

দু'-তিনটে বড় বড় পাথরের গা বেয়ে জলটা ঢুকে যাচ্ছে আরও ভেতর দিকে। আমরা দু'জনে প্রায় এক হাঁটু জল ভেঙে ভেতর দিকে ঢুকে গেলাম। ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম গুহামুখ সরু হয়ে গেছে। আর সাত-আটটি বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে জলস্রোত বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। পাথরগুলোর অবস্থান দেখে মনে হল এগুলো এই গুহার ভেতর আপনা থেকেই জড়ো হয়নি। এগুলো খুব যত্ন সহকারে এখানে নিয়ে এসে, এর সাহায্যে বাইরে যাবার এবং ভেতরে ঢোকার পথ বন্ধ করা হয়েছে। তলাকার ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে এবং ওপরের

ফাঁক পাথর দিয়ে বোজানো আছে। ওপরের ফাঁক যদিও শাবলের ঘা মেরে ধসানো যায়, নীচের ফাঁক বড় করতে গেলে ডিনামাইটের একান্ত প্রয়োজন।

রামদুলালবাবু বললেন, কী ভাবছেন?

ভাবছি একটা শাবল পেলে হত।

তার জন্য কী? সব আছে এখানে। আনছি।

তাড়াতাড়ি যান।

তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নেই। যা হবে সব ধীরেসুস্থে। কেন না সকাল না হলে আমরা গুহার বাইরে গিয়েও এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল পার হতে পারব না।

তা অবশ্য পারব না। জংলিদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেও বাঘের হাতে মরতে হবে।

আমি বসে রইলাম। রামদুলালবাবু চলে গেলেন। একটার জায়গায় দুটো শাবল নিয়ে ফিরে এলেন রামদুলালবাবু।

মশালটা এক জায়গায় কায়দামাফিক রেখে শুরু করলাম আমাদের কাজ।

শাবলের ঘা পড়তেই ঝর ঝর করে ঝরতে লাগল সব। ছোট বড় পাথর নোনা ধরা দেওয়ালের মতো ধসতে লাগল। তারপর ফাঁক হল একটু। এইভাবে অনেকগুলো ফাঁক হল। সেইসব ফাঁকের মাঝামাঝি জায়গায় ডিনামাইট বসিয়ে দিয়ে পলতেয় আগুন দিলেই একেবারে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত সব কিছু উড়ে গিয়ে একদিকের দেওয়াল আর ছাদ বেরিয়ে যাবে।

ফাঁকের ভেতর দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া ঢুকছে। এদিকে ওপরের মাটি-পাথর চাপা পড়ে নীচের অনেকগুলো ফাঁকের মুখ বুজে যাওয়ায় জলনিকাশেও দারুণ বাধা পাচ্ছে। সুতরাং জমা জল ফুলতে লাগল একটু একটু করে।

রামদুলালবাবু বললেন, সেরেছে। এ যে দেখি কাছা দিতে গিয়ে কোঁচা খুলে যায়।

আমিও চিন্তায় পড়লাম। কেন না জল বেড়ে গেলে সব চাল ভেস্তে যাবে। আর সপ্ত নদীর গতিপথ যেখানে একই মুখে বের হচ্ছে, সেখানে জল জমে যেতে খুব একটা সময়ও লাগবে না। আর জল জমে গেলে ডিনামাইট ফিট করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। রামদুলালবাবুকে বললাম, আপনি এক্ষুনি চলে যান। বাহাদুরকে তাড়া দিন। আমি ততক্ষণে নীচের ফাঁকগুলো একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

রামদুলালবাবু চলে গেলেন।

আমি প্রাণপণে শাবলের খোঁচা দিয়ে সেই মুখগুলো পরিষ্কার করতে লাগলাম। দিনের বেলা হলে কষ্ট হত না। রাত্রি বলেই অসুবিধে। দেখতে দেখতে

দু' দুটো রাত শেষ হতে চলল। আর কত কষ্ট যে তোলা আছে আমাদের তা ভগবানই জানেন।

এমন সময় হঠাৎ মনে হল আমি শূন্যে উঠে যাচ্ছি। নরম থলথলে শুঁড়ের মতো কী যেন একটা আমাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে নিল। দেখলাম জলের ভেতর থেকে অক্টোপাশের মতো কী যেন একটা আমাকে পাকিয়ে ধরেছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম।

পাখিটা দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় বসেছিল। হঠাৎ বাজের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটার ওপর। তারপর চলল টানাটানি। আমি এমন বেকায়দায় পড়লাম যে, তা বলবার নয়। এদিকে আমার চিৎকারে বাহাদুর ও রামদুলালবাবুও ছুটে এসেছে তখন। আমি সভয়ে দেখলাম ওটা অক্টোপাস নয়, অনেকটা মাকড়সার মতো দেখতে একটা জীবকে পাখিটা তখন নখে করে টেনে জল থেকে তুলছে। পাখিটার আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়েই সেটা আর আমাকে খুব বেশি কষ্ট দিতে পারল না। তার বাকি শুঁড়গুলো দিয়ে আলিঙ্গন করল অযাচিত শত্রু সেই পাখিটাকেই।

রামদুলালবাবু বারান্দায় ঝোলানো দড়ির একপ্রান্ত আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। আমি সেটা ধরে শুঁড়বদ্ধ অবস্থায় নিজেকে টেনে বারান্দার কাছে আনতেই বাহাদুর ছুরি দিয়ে শুঁড়টা কেটে আমাকে মুক্ত করল। আমি বাঁচলাম।

এদিকে সেই অতিকায় পাখিটার সঙ্গে জলজ মাকড়সার তখন পুরোমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেটা তার সব ক'টি শুঁড় দিয়ে পাখিটাকে বেষ্টন করে ঝুলছে। তার মাঝের অংশটা একবার স্ফীত, একবার সংকুচিত হচ্ছে। যেন অতিকায় গোলালো কচ্ছপ একটা। গায়ে কালো ভেলভেটের মতো রোঁয়া। পাখিটা ঠোঁটে করে সেটাকে ছেঁড়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। শুঁড়গুলো দিয়ে পাখিটার গলা এমনভাবে সে জড়িয়ে রেখেছে যে, পাখিটা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছে।

আমি আর বিলম্ব করলাম না। পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরলাম। এই প্রথম আমার পিস্তল গর্জে উঠল। জলজ সেই মাকড়সার মাঝের অংশটা চুরমার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে পাখিটাও রক্তাক্ত কলেবরে ঝপাস করে পড়ে গেল জলের ওপর। গুলিটা সেটাকে ভেদ করে পাখিকে আঘাত করেছে। রক্তে লাল হয়ে উঠল জল। জলের স্রোতে চাপ চাপ রক্ত ভেসে চলল কুলকুল করে। এদিকে জল তখন অনেক বেড়ে গেছে।

আমি বললাম, আর দেরি নয় বাহাদুর। তুমি তৈরি তো?

হ্যাঁ।

জল তখন হাঁটু পেরিয়ে কোমরে উঠেছে। বাহাদুর মাথায় অসম্ভব বেঁটে। তাই

বাহাদুরকে আমি কাঁধে নিয়ে ফাঁকগুলোর কাছে গেলাম। যেখানে যেটা বসাবার বাহাদুর তা বসিয়ে দিল। অত্যন্ত পাকা লোক। কত সহজে যে কাজ করে ফেলল তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

মশালটা যেমন জ্বলছিল, তেমনি জ্বলতে লাগল।

আমি তবু টর্চের আলো ফেলে বাহাদুরকে সাহায্য করতে লাগলাম।

কাজ শেষ হলে বাহাদুর বলল, ঠিক আছে। এবার আপনি আমাকে বারান্দায় পৌঁছে দিয়ে পলতেয় আগুন দিয়ে পালিয়ে আসুন।

আমি আগে বাহাদুরকে পৌঁছে দিলাম বারান্দায়। সে দড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। আর আমি মশালের আগুনে পলতের মুখ ধরিয়ে দিয়েই পালিয়ে এলাম। পলতেটা পুড়তে পাঁচ মিনিট সময় নেবে। তারপর এক এক করে সাত-সাতটা ডিনামাইট ফেটে উঠবে ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটিয়ে। কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড সেই পাখিটাকে তো আর বাঁচানো যাবে না। না যাক। আমরা নিজেদের পালাবার পথটাই পরিষ্কার করি। পলতেটা ধরিয়ে দড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে এলাম আমি। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে তিনজনেই রামদুলালবাবুর ঘরের দিকে দৌড়লাম।

বাহাদুর বলল, কানে আঙুল দিন।

আমরা তিনজনেই কানে আঙুল দিলাম। সামান্য কিছু সময়। তারপরই বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পর ছুটে গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখলাম একটা দিক একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাইরে নীল আকাশ চাঁদ তারা সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ছায়া ছায়া পাহাড়ের কায়া। সেই জলজ মাকড়সা আর পাখিটা জলের তোড়ে কখন ভেসে গেছে। সেই জলরাশিও তখন হুড়হুড় করে প্রপাতের মতো ঝরে পড়ছে নীচের দিকে। জল কমে একেবারে চেটোয় এসে ঠেকল।

রামদুলালবাবু বললেন, এতদিনে একটা কাজের কাজ হল।

আমি বললাম, হ্যাঁ। এইবার আসল কাজটা বাকি। আর দেরি নয়। পা চালান। তাড়াতাড়ি।

আমরা দ্রুত চললাম। কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না। যেখানে সেই 'নীল তারা ঝিকমিক' অর্থাৎ গুহাটা শেষ হচ্ছে সেখানে যেতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। বিপদের পর বিপদ। আর এক বিপদ।

বাহাদুর আর্তকণ্ঠে বলল, ফায়ার।

কিন্তু গুলি করব,—না রামদুলালবাবুকে সামলাব? সেদিকে তাকিয়েই রামদুলালবাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

দশ

আমরা দেখলাম আমাদের চোখের সামনে গুহাটা যেখানে শেষ হয়েছে এবং সামনেই পাঁচিলের খাড়াই ঠিক সেইখানে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীরের অর্ধাংশ দেখা যাচ্ছে না। বাকিটা দেখা যাচ্ছে।

তাকে যে কী বলব তা ভেবে পেলাম না। সেটা না দৈত্য, না দানব, না অন্য কিছু। শুধু এক অতিকায় নবরূপী ভয়ংকর। এক কথায় অবশ্য তাকে নর-দানব বলা যেতে পারে।

খুব কম করেও বারো থেকে পনেরো ফুট উঁচু তার দেহ। গায়ে ঘন লোম। বনমানুষের মতো। কিন্তু জন্তু নয়। তবে দেখে মনে হল গরিলার চেয়েও সাংঘাতিক।

সেখানে দাঁড়িয়ে গুহার দিকে তাকিয়ে যেন ওত পেতে আছে সে। আমাদের দেখেই সেটা চোখের পলকে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাহাদুর বলল, কী সাংঘাতিক।

আমরা প্রায় অচৈতন্য রামদুলালবাবুকে ধরাধরি করে তাঁর ঘরে নিয়ে এলাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এল রামদুলালবাবুর। জ্ঞান ফিরতেই রামদুলালবাবু প্রথম কথা বললেন, সেটা গেছে?

আমি বললাম, সেটা যাক বা না-যাক তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। এখন বলুন আপনি সুস্থ কি না?

হ্যাঁ। আমি সুস্থ।

বাহাদুরকে বললাম, বাহাদুর, আর দেরি নয়। এবার চলো ওই রত্নভাণ্ডারটাকে ধ্বংস করে দিয়ে আসি।

রামদুলালবাবু বললেন, আমিও যাব। আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমরা দু'জনে যেয়ো না।

আমরা ধ্বংসের বারুদ নিয়ে ধ্বংস করতে চললাম।

যখন আবার সেই পাঁচিলের খাড়াইয়ের কাছে এসেছি, বাইরে তখন প্রচণ্ড হট্টগোল। চারদিক আলোয় আলো।

জেগে উঠেছে জংলিরা। হই হই করছে সব।

সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে প্রাণান্তকর চিৎকার আর আর্তনাদ।

অভিশপ্ত তিড্ডিমে মূর্তিমান বিভীষিকা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। তবে কি ওরা টের পেয়েছে? ওরা কি জানতে পেরেছে, যে আমরাই এই ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছি?

বাহাদুর বলল, একবার দেখব বাবু উঁকি মেরে?

আমি বাধা দিলাম, কী দরকার? এখন তাড়াতাড়ির সময়। চলো গুপ্তধনের ঘরে যাই।

যদি ওরা সতর্ক হয়ে গিয়ে থাকে?

তবুও যাব। তবে ওদের কোলাহল শুনে মনে হচ্ছে ওরা অন্য কোনও ব্যাপারে দাপাদাপি করছে। আর যদি ওরা জেনেও গিয়ে থাকে, তবুও আমাদের বাঁচার পক্ষে ওই জায়গাটাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ। শুধু ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নয়, ওই নর-দানবের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যও বটে। ওটা আর যাই করুক এখানকার পথ খুঁজে ওই জায়গায় কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না।

বাহাদুর বলল, তা হলে চলুন।

রামদুলালবাবু একটা মশাল ধরিয়ে আগে আগে চললেন। আমরা চললাম পিছনে। যেতে যেতে রামদুলালবাবু বললেন, আমি এখানে এতদিন আছি কিন্তু ওইরকম বিভীষিকার মুখোমুখি কখনও হইনি। ওরকম জীব দেখা তো দূরের কথা, অমন যে হতে পারে বা আছে, তা ধারণাতেও ছিল না।

আমি বললাম, হিমালয়ের তুষারমানবের কথা শুনেছি বটে। খবরের কাগজে পড়েছি পাহাড়ের উচ্চস্থানে বরফের ওপর মাঝে মাঝে তাদের অতিকায় পায়ের ছাপও নাকি দেখা যায়।

বাহাদুর বলল, তা যদি হয়, তা হলে তুষারমানব তো বরফের দেশে থাকবে। এখানে কেন? এখানে তো বরফ নেই?

কে জানে? তবে আমার মনে হয় এটাও ওইরকমই জীব। এরাই যখন বরফের ওপর দিয়ে চলে, তখন এদেরই পায়ের ছাপ দেখে আমরা চমকে উঠি। বরফের ওপর দিয়ে চলবার সময় ঝুরঝুরে বরফে এদের সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ে যায়। তখন এদের দেখলে মনে হবে একটা বরফের তৈরি মানুষই যেন বরফের দেশে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ওটা এখানে কী করে এল?

কাছাকাছিই ছিল হয়তো। ডিনামাইটের শব্দে ভয় পেয়ে চলে এসেছে।

কিন্তু বরফের মানুষ এই রুক্ষ প্রান্তরে কী করে আসবে?

ওটা যে কী তাই তো আদৌ জানি না। ওর সম্বন্ধে যা কিছু আলোচনা করলাম, সবই কল্পনার ওপর নির্ভর করে।

কথা বলতে বলতেই আমরা যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম।

তারপর পাথর সরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে, সিংহ দরজার তালা খুলে ফেললাম। আলোয় ভরে আছে ঘর। কী অপরূপ ছটা চারদিকে। সোনার পিলসুজে সোনার প্রদীপ জ্বলছে। আর রেলিংঘেরা ঘরের ভেতর বাস করছে

বিষধর সাপেরা। কত ধনরত্ন থরে থরে সাজানো আছে সেখানে।

রামদুলালবাবু বললেন, এর কিছুও যদি পেতাম।

আমি বললাম, লোভ করবেন না রামদুলালবাবু। যা আমাদের নয়, তা পাবার চেষ্টা করবেন না।

বাহাদুর ততক্ষণে সেই তারে বাঁধা ডিনামাইট রেলিংঘেরা ঘরের মধ্যে ঢোকাতে শুরু করেছে। রেলিং-এর ফাঁকে ফাঁকে তার জড়িয়ে জোড়ের মুখে ডিনামাইট ফিট করে ওপরে উঠে এল।

তারপর একেবারে শেষপ্রান্তে চলে এসে শেষমাথাতেও একটি ডিনামাইট ফিট করে পলতেটা একটু লম্বা করে রাখল।

অনেকটা তার ছিল। তাই গুহামুখে সেই পাঁচিলের মতো খাড়াইটা যেখানে ছিল, সেখান পর্যন্ত চলে এল তারটা।

হাতের কাছেই রইল সবকিছু। এখন সময়মতো পলতের মুখে আগুনটা ছুঁইয়ে দিতে পারলেই সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড কোলাহল। সেই সঙ্গে লকলকে আগুনের হলকা ছুটছে চারদিকে।

আগুনের লেলিহান শিখায় চারদিকে লালে লাল। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। যেন কোনও বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেছে এই তিড্ডিমের পাহাড়ে।

জ্বলছে আগুন। আর সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে গোঁ গোঁ শব্দ।

জংলিরা চিৎকার করছে।

পোড়া গন্ধে, কোলাহলে, চিৎকারে আর অগ্নিশিখার আলোয় শেষরাতের অন্ধকার যেন সংহার মূর্তি ধারণ করছে তখন।

আমরা সবে পলতের মুখে আগুনটা দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি গুহার ভেতর দিক থেকে হুড়হুড় করে একদল জংলি ছুটতে ছুটতে আসছে।

কাজেই আগুন আর দেওয়া হল না। চকিতে আমরা তিনজনে অন্ধকারে দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে সরে দাঁড়ালাম।

জংলিদের হাতে মশালের আগুন।

তারা সেই মশাল হাতে নিয়ে কাচ্চাবাচ্চা সমেত হই হই করতে করতে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসছে।

আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে এমনভাবে লুকিয়ে রইলাম যে, ওরা আমাদের অস্তিত্বও টের পেল না।

আসলে ওরা তখন প্রাণভয়ে ভীত।

পাঁচিলের খাড়াইয়ের পথে বাধা পেয়ে বিপরীত দিকের পথ ধরে আসছে। প্রত্যেকেই দেখলাম নিরস্ত্র। তার মানে, হয় তারা অস্ত্র নেবার সময় পায়নি,

নয়তো সেই ভয়ংকরের মুখোমুখি হতে গিয়ে সব কিছুই খুইয়ে বসে আছে।

ওরা সকলেই গুপ্তকক্ষের দিকে চলেছে। একদল ঢুকে যেতেই দেখি আর একদল আসছে।

সে দলটা ঢুকে যেতেই দেখা গেল সর্দার এবং তার দুই অনুচরকে।

সর্দারও এখন পালকি চেপে নয়, আসছে ছুটতে ছুটতে। প্রাণের দায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে। আর ওদের ঠিক পিছনেই তাড়া করে আসছে সেই ভয়ংকর দানবের মতন না-মানুষ না-জন্তুটা।

বাহাদুর চেঁচিয়ে উঠল, ফায়ার।

আমরা তিনজনেই এবার ছুটে গেলাম দেওয়ালের পাশ থেকে সেই পাঁচিলের খাড়াইয়ের দিকে।

সর্দার আমাদের দেখেই চমকে উঠল। শুধু চমকে ওঠা নয়, তার তখনকার সেই মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়।

রামদুলালবাবু বললেন, ভয় নেই সর্দার। আমরা এদের ভুল বুঝেছিলাম। আসলে এরা আমাদের বন্ধু। আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না। ততক্ষণে আমার পিস্তল গর্জে উঠেছে।

গুহা কাঁপিয়ে সেই নর-দানবের বুকে লেগেছে গুলি। গুলি খেয়েই এক অমানবিক চিৎকারে এবং প্রচণ্ড আর্তনাদে মুখর করে তুলল চারদিক। সে কী ভয়ংকর ডাক ছাড়তে লাগল এক একটা।

সর্দার তখন সাহস পেয়ে ছুটে এল আমাদের কাছে। কিন্তু সর্দারের সঙ্গী দু'জন এদিকে না-এসে দারুণ ভয় পেয়ে ছুটে ঢুকে গেল রত্নভাণ্ডারের দিকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকেই জন্তুটার পিছনদিক লক্ষ্য করে আর একটা গুলি ছুড়লাম। অমন বিশাল শরীর যেখানে, সেখানে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোনও ব্যাপারই নেই। তাই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে গুলি গিয়ে লাগল তার পিঠে। লাগা মাত্রই আবার একটা হাঁফ ছেড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

এতক্ষণে আমরা আত্মপ্রকাশ করলাম।

সর্দার আনন্দে রামদুলালবাবুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর এগিয়ে এল আমার দিকে।

রামদুলালবাবু ওদের ভাষায় সর্দারকে বুঝিয়ে বললেন, এরা আমাদের বন্ধু। এরা গুপ্তধন নেবে না। গুপ্তধন নিতে এরা আসেনি। সত্যি সত্যিই ভুল করে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এবং সেইজন্যই দেবী নাগেশ্বরীও বিপদে এদের রক্ষা করেছেন।

সর্দার খুশি হয়ে কী যেন বলল।

রামদুলালবাবু বললেন, সর্দার খুশি হয়েছেন তোমাদের ওপর। তোমরা

সর্দারের প্রাণ বাঁচিয়েছ। সেজন্যে সর্দার তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমরা মুক্তি পাবে।

আমরা সেই নর-দানবটার কাছে এগিয়ে গেলাম। সেটা তখনও যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর হাত-পা ছুড়ছে। তার সে কষ্ট দেখা যায় না। তাই তার সমস্ত কষ্টের অবসান ঘটাতে আমি তার বুকের বাঁদিক লক্ষ্য করে আর একটা গুলি করলাম।

গুলি খেয়ে সেটা যেন তার আর্তনাদের মাত্রা আরও একটু বাড়িয়ে তুলল।

এদিকে গুলির শব্দে জংলিদের মধ্য থেকে মানে যারা গুপ্তকক্ষে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের দু'-একজন করল কী, ব্যাপারটা কী হচ্ছে দেখবার জন্য বেরিয়ে এল।

আমাদের সঙ্গে সর্দারকে দেখেই সাহস যেন বেড়ে গেল তাদের।

পথের ধারে একদিকে আমরা। অপরদিকে জংলিরা।

মধ্যে সেই অতিমানব, নর-দানব বা জন্তুটা।

সেটা অর্তনাদ করে হাত-পা ছুড়ে তার যন্ত্রণার প্রকাশ করতে লাগল। যখন সেটা একেবারেই নিস্তেজ হয়ে স্থির হয়ে গেল, তখন ওদিক থেকে জংলিদের একজন জন্তুটার বুকের ওপর এসে দাঁড়াল।

তারপর একেবারেই মরে গেছে কি না দেখবার জন্য একটা মশাল নিয়ে সেটার মুখে একটু ছুঁইয়ে দিতে আর একবার নড়ে উঠল সেটা।

যেই না নড়ে ওঠা, অমনি হাতের মশাল ফেলে দারুণ ভয় পেয়ে এক লাফ দিল জংলিটা। তারপর আবার ভেতর দিকে ছুটে গেল।

ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল বাহাদুর, বাবু! সর্বনাশ হয়েছে। শিগগির পালিয়ে চলুন।

কী হয়েছে রে?

ওই দেখুন পলতেয় আগুন ধরে গেছে।

সে কী!

ওই— ওই— দেখুন।

দেখলাম জংলিটার হাত থেকে মশালটা ছিটকে পড়ে পলতেয় আগুন ধরে গেছে।

তখন এমনই অবস্থা যে আর কোনও উপায় নেই, সেই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার হাত থেকে শাতকর্ণি গুহার গুপ্তকক্ষে আশ্রিত অতগুলো জীবনকে রক্ষা করবার।

আগুন তখন ডিনামাইট ছুঁই ছুঁই করছে।

বাহাদুর বলল, আর কেন? এবার নিজেদের প্রাণ বাঁচান। শিগগির চলে এসো সর্দার। না হলে সবাই মরব।

সর্দারও বোধহয় বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কাজেই আর একটুও দেরি না করে আমাদের পিছু নিল।

আমরা উর্ধ্বশ্বাসে গুহার ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সেই বারান্দার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যেখানে মাত্র কিছুক্ষণ আগে ডিনামাইট চার্জ করে পথ পরিষ্কার করে এসেছি আমরা

হঠাৎ আমাদের মনে হল চারদিকে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে, কী প্রচণ্ড শব্দ। শব্দের পর শব্দ।

সব যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। যেন এখুনি একটা মহাপ্রলয়ে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। শেষ অবশ্য হল একসময়। চারদিক আবার আগের মতোই চিরশান্ত, নিশ্চুপ হয়ে গেল। ধ্যানগম্ভীর তিড্ডিমের আগেকার পরিবেশ আবার থমথম করতে লাগল।

আমরা যখন আবার ফিরে এলাম আগেকার জায়গায়, তখন কিছুই আর চেনা যাচ্ছে না।

সেই ভয়ংকর নর-দানবের শরীরের অর্ধেক আছে, অর্ধেক বিস্ফোরণে উধাও।

কোথাও কিছু নেই। সব ফাঁকা। শুধু পাথর ও মাটির বিরাট একটা স্তূপ চোখে পড়ল আমাদের।

আমি বললাম, দুঃখ কোরো না সর্দার। পারো তো আমাদের ক্ষমা কোরো। এর জন্য আমরাই দায়ী।

সর্দার কী যেন বলল বিড় বিড় করে।

রামদুলালবাবু বললেন, সর্দার বলছেন উনি জানতেন এরকমটা হবেই। ওদের পুরাণে আছে, যা কিছু সৃষ্ট হয়, তা ধ্বংস হবার জন্য। শুধু তিড্ডিমের এই অংশটা নয়, সমস্ত পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। এই ধ্বংসলীলার হাত থেকে কারও রক্ষা নেই। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা—যা কিছু দেখছ সবই ধ্বংস হবে।

রাতের আঁধার মুছে গিয়ে ভোর হয়ে আসছে তখন। আঁধারের ধূসর যবনিকা একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসছে। পাখিরাও একটি দুটি করে ডাকতে আরম্ভ করেছে। আর একটু পরেই মেতে উঠবে কলরবে। পুবের আকাশটা লাল হবে। নানান রঙের ছটা ছড়িয়ে সূর্য উঠবে আলোর রথে।

আমরাও আবার ফিরে যাব আমাদের মুক্তির জগতে।

সর্দারের কাছে বিদায় চাইলাম আমরা।

সর্দার নীরবে নিজেই আমাদের পথপ্রদর্শক হল। এবং একটি অজ্ঞাত সুড়ঙ্গপথ দিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই আমাদের গুহার বাইরে, যেখান দিয়ে আমরা

প্রথম প্রবেশ করেছিলাম সেইখানে পৌঁছে দিল।

বাহাদুর, আমি আর রামদুলালবাবু সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিব্বতের অরণ্যভূমি পার হয়ে এগিয়ে চললাম।

গুহামুখে দাঁড়িয়ে সর্দার আমাদের বিদায় জানাল।

সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কিছুটা পথ এগিয়ে এসে পিছু ফিরেই দেখি অদ্ভুত কাণ্ড। সর্দার ততক্ষণে নিজের কোমর থেকে ধারালো ছুরিটা বার করে নিজের বুকেই আমূল বসিয়ে দিয়েছে।

আমরা তিনজনেই ছুটে গেলাম সর্দারের কাছে।

রামদুলালবাবু বললেন, এ তুমি কী করলে সর্দার?

সর্দার সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু ইঙ্গিতে আমাদের চলে যেতে বলল।

আমরা একটু সময় থেমে দাঁড়িয়ে চলে এলাম।

দিনের আলোয় চারদিক তখন সোনারোদে ঝলমল করছে।

কিছু পথ হেঁটে আসার পর দেখলাম, এক জায়গায় ছোট ছোট কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। এবং কিছু লোক সেখানে শিকারশেষে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাদের সঙ্গে জিপও আছে দুটো। আমরা আমাদের বিপদের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে বলে হাফলঙে ফেরার জন্য তাদের সঙ্গী হয়ে গেলাম।

গ্রন্থপরিচয়

দিঘা সৈকতে আতঙ্ক

তৃতীয় মুদ্রণ: জুন ১৯৯৩। প্রকাশক: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির।
কলকাতা ৭০০০০৭। পৃ. ১০০। মূল্য ১৪.০০
প্রচ্ছদ: নারায়ণ দেবনাথ।
উৎসর্গ: বিশ্বভারতীর উপাচার্য/ ড. নিমাইসাধন বসুকে/— ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ ১৩৯২, মে ১৯৮৫

কাকাহিগড় অভিযান

দ্বিতীয় মুদ্রণ: মাঘ ১৩৯৬, জানুয়ারি ১৯৮৯। প্রকাশক: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির। কলকাতা ৭০০০০৭। পৃ. ৯৬। মূল্য ১২.০০
প্রচ্ছদচিত্র: নারায়ণ দেবনাথ।
অলংকরণ: দিলীপ দাস
উৎসর্গ: বন্ধুবর/ড. নীরদ হাজরাকে/— ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

গিরিগুহার গুপ্তধন

তৃতীয় মুদ্রণ: মে ১৯৯১। প্রকাশক: শ্যামাপদ সরকার। কলকাতা ৭০০ ০০৯
প্রাপ্তিস্থান: কামিনী প্রকশনী। পৃ. ৪ + ১৩২। মূল্য ১২.০০
প্রচ্ছদ: নারায়ণ দেবনাথ।
অলংকরণ: অমল চট্টোপাধ্যায়
উৎসর্গ: বাংলা সাহিত্যের প্রাতঃস্মরণীয়/দ্বারবঙ্গের/বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে/— ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রথম মুদ্রণ: আগস্ট ১৯৮৬

হিন্দোলসর্দারের কেল্লা

দ্বিতীয় প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, ডিসেম্বর ১৯৯০। প্রকাশক: শ্রীশ্যামাপদ সরকার। কলিকাতা ৭০০ ০০৯।

প্রাপ্তিস্থান: কামিনী প্রকাশনী। কলিকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ১৬০। মূল্য ১৫.০০

প্রচ্ছদ: সত্য চক্রবর্তী

অলংকরণ: দিলীপ দাস।

উৎসর্গ: কবি ও কথাশিল্পী/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে/— ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন/মহালয়া ১৩৯৫, অক্টোবর ১৯৮৮

নয়নাগিরি অভিযান

দ্বিতীয় সংস্করণ: মহালয়া ১৪০৫

প্রকাশক: শ্যামাপদ সরকার। কলকাতা ৭০০ ০০৯।

প্রাপ্তিস্থান: কামিনী প্রকাশালয়। কলিকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ১৬৪। মূল্য ২০.০০

প্রচ্ছদ: নারায়ণ দেবনাথ।

অলংকরণ: দিলীপ দাস

উৎসর্গ: সাঁতরাগাছি ভানুমতী বালিকা বিদ্যালয়ের/বিদ্যার্থী এবং বিদ্যাদাত্রীদের/ মঙ্গলকামনাসহ/— ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ: অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৯৮।

অমরকণ্টক রহস্য

প্রথম প্রকাশ: পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা ১৯৯১

প্রকাশক: সত্যব্রত দাস, সমকালীন। সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

পরিবেশক: শশধর প্রকাশনী। পৃ. ৪ + ১২৮। মূল্য ২০.০০

প্রচ্ছদ: তরুণ চক্রবর্তী

অলংকরণ: সুরজিত বোস

উৎসর্গ: গৌতম চক্রবর্তী/ প্রীতিভাজনেষু

সানঘাগরার আতঙ্ক

প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৫, মাঘ ১৪০১।

প্রকাশক: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ১০০। মূল্য ২৫.০০

প্রচ্ছদ: অশোক রায়।

উৎসর্গ: অর্ণব সামন্ত ও সুতপা মহান্তী/কল্যাণবরেষু

সব্যসাচীর গোয়েন্দাগিরি

প্রথম প্রকাশ: শুভ নববর্ষ বৈশাখ ১৪০১।

প্রকাশক: শ্যামাপদ সরকার, কলকাতা ৭০০ ০০৯।

প্রাপ্তিস্থান: কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ১২৮। মূল্য ১৬.০০

প্রচ্ছদ: অনুপ রায়।

অলংকরণ: দিলীপ দাস।

উৎসর্গ: রতনতনু ঘাটী/ কল্যাণবরেষু

লালবাজারে রাহাজানি

প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৯৯, সেপ্টেম্বর ১৯৯২

প্রকাশক: মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৭০০ ০০৯। পৃ. ৮ + ১২৮। মূল্য ২০.০০

প্রচ্ছদ: শ্রীগণেশ বসু

অলংকরণ: রুচিরা মজুমদার

উৎসর্গ: তমালী ও জয়া বসু /স্নেহাস্পদেষু

গ্রন্থশেষে লেখকের 'নিবেদন' মুদ্রিত হয়েছে।

নিবেদন

১৯৬৫ সাল। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পি. কে. সেন। আমি তখন সদ্য কিশোর। এইসময় কর্মসূত্রে আমাকে লালবাজারের সদর দপ্তরে খোদ কমিশনার সাহেবের চৌকাঠ পর্যন্ত সপ্তাহে দু'বার করে যেতেই হত। ওনার ভাই পি. কে. সেনগুপ্ত সাহেব ছিলেন আমার উর্ধ্বতন অফিসার। তিনিই পাঠাতেন। সন্তোষবাবু নামে একজন ড্রাইভার গাড়ি করে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আবার নিয়ে আসত। আর সদাহাস্যময় বিজয় লাহিড়ী মহাশয় প্রথমদিন নিজে এসে আমাকে C. P.-র ঘর চিনিয়ে দিয়ে গেলেন। সে আজ কত বছর আগেকার কথা।

প্রথম যেদিন লালবাজারের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করেছিলাম তখন সে কী ভয়। বড় বড় হোমরা চোমরা পুলিশ অফিসারদের দেখে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। লাহিড়ীদা বলেছিলেন, ভয় পাবার কিছু নেই। এই সাজ পোশাকের আড়ালে

এঁরাও কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ। অনেকটা যাত্রায় সাজা রাবণের মতো ভূমিকা এঁদের। কেউ বাধা দিলে বলবে C.P-র ঘরে যাচ্ছি। দেখবে, যমেও তখন পথ ছেড়ে দেবে।

তবুও প্রথম প্রথম ভয় করত খুব। তারপর তো চেনা পরিচয় হয়ে গেল কতজনের সঙ্গে। C. P.-র দু'জন বডিগার্ডের একজন ছিলেন অত্যন্ত রূপবান পুরুষ। তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবতাম এই মানুষ চলচ্চিত্রের নায়ক না হয়ে পুলিশের চাকরিতে কেন? তাঁদের কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পারলাম, পুলিশ হলেও এঁরা নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী নন। এঁরা মিষ্টি করে হাসতে জানেন। সুখ দুঃখের কথা বলেন। চা খানা। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন। হেমন্তের সুর ভাঁজেন। উত্তম সুচিত্রার অভিনয়ের প্রশংসা করেন। করেন সংস্কৃতির চর্চা। তা হলে?

লালবাজার সম্বন্ধে, পুলিশ সম্বন্ধে ধারণাটাই তখন পালটে গেল। আমার তখন প্রচণ্ড কৌতূহল। তাই এখানে এলেই এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে দেখতাম। জানতে চাইতাম, এখানে কী হয়, ওখানে কী হয়! ছেলেমানুষ তো। তার ওপর সাহসে বুক বাঁধা। যা তা ব্যাপার নয়, একেবারে খোদ কমিশনার সাহেবের লোক। এইভাবেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন পড়ে গেলাম এক বদমেজাজি অফিসারের পাল্লায়। অফিসারটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। কিন্তু কী দারুণ ব্যক্তিত্ব তাঁর। শক্ত করে আমার হাত ধরে ইংরেজিতে তেড়ে একটা ধমক। ছুটে এল অনেক পুলিশ। আটকে দেয় আর কী। কিন্তু ওই যে, লাহিড়ীদা বলেছিলেন, কেউ কিছু বললেই বলবে C. P.-র লোক। নির্ভয়ে বললাম। কিন্তু কাজ হল না তাতে। এলাকাটা খুবই নিষিদ্ধ তা জানতাম না। তাই সন্দেহ ওদের বেশি হল। অল্পবয়সি একটা ছেলে, বলে কিনা, C. P.-র লোক? সবাই চেপে ধরল আমাকে, চালাকি পেয়েছ? বলো তুমি কে? কে পাঠিয়েছে তোমাকে? C. P.-র ঘর কোনদিকে?

আমি ভয়ে ভয়ে সব বললাম।

কেউ বিশ্বাস করল না! বলল, সহজে ছাড়া হবে না একে। মনে হচ্ছে আটঘাট জেনেই ভেতরে ঢুকেছে।

একজন বলল, আগে তো ঢুকিয়ে দাও। সাত-আট ঘণ্টা আটকে রাখলেই সব ফাঁস করে দেবে!

অ্যাংলো অফিসারটি বললেন, তার আগে যাচাই করে দ্যাখো ও যা বলছে তা ঠিক কি না।

সবাই তখন আমাকে নিয়ে চলল যাচাই করতে। কিন্তু মুশকিল হল C. P.-র ঘরের দিকে যাবার সাহস আর কারও নেই। সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়াল সবাই! আমি যতই নির্ভয়ে ওপরে উঠে যেতে চাই ওরা ততই নিজেদের মধ্যে এই তুই যা। তুই যা না! সবার যাওয়া ঠিক নয়, যে কোনও একজন যা,

করতে থাকে। এমন সময় ভাগ্যক্রমে C. P.-র বডিগার্ড হঠাৎ সেখানে এসে পড়েছিলেন তাই রক্ষে। আমার অবস্থা দেখেই বললেন, সর্বনাশ। কাকে ধরেছেন? ছাড়ুন আগে। এ যে আমাদেরই লোক। সবারই চোখ তখন কপালে। ভাবটা এই, না জেনে একে আটকে দিলেই হয়েছিল আর কী। আমি যে অন্য কেউ নই এই পরিচয় পেয়েই হাসিমুখে কেউ আমার গাল টিপে, কেউ পেট চাপড়ে বিদায় নিলেন। সেই মুহূর্তে বুঝে গেলাম পুলিশি মেজাজের আড়ালে এঁরাও কত সহৃদয়। এঁদেরও ভয় ডর আছে।

সেই কিশোর বয়স থেকেই লালবাজার আমার মনে প্রভাব ফেলেছিল। লালবাজারের ইউনিফর্ম পরা পুলিশদের ব্যস্ততা, কর্মতৎপরতা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল আমার মনে। তখনই ঠিক করেছিলাম এই লালবাজারকে কেন্দ্র করেই মনের মতো একটা বই আমি লিখব। কিন্তু লিখিনি বা লিখতে পারিনি অনেকটা সঙ্গত কারণে। অথবা ধরা যেতে পারে লেখার ফর্ম খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে। না হলে অভিজ্ঞতাও তো কম নয়, কনস্টেবল থেকে অনেক উঁচুমহলের অফিসারকেও দেখেছি এক সময়। আমার মনে সবাই তাঁরা রেখাপাত করেছেন। রেখাপাত করেছেন বিশাল বপু জে. এন. মজুমদার এবং ডি. সি. চন্দ্র সাহেবের মতো জাঁদরেল পুলিশ অফিসারও। চন্দ্র সাহেবের ফুলের মতো ফুটফুটে মেয়েটিকে দুর্বৃত্তরা তুলে নিয়ে গেল। শত তদন্তেও পাওয়া গেল না তাকে। আমার কিশোর মন গভীর বেদনায় কেঁদে উঠেছিল। প্রতিবাদী মন বলে উঠেছিল অপরাধ যদি করে থাকে কেউ তার ফল ওই শিশুটি কেন ভোগ করবে? হায়রে! কেউ যদি একটা পিস্তল কিংবা রিভলভার তুলে দিত আমার হাতে আর শিখিয়ে দিত কীভাবে এগুলোকে প্রয়োগ করতে হয় তা হলে দুষ্টের দমনে কলকাতার বুকে আর এক রবিনহুড হয়ে উঠতাম আমি। এর পরেও দেখেছি চন্দ্র সাহেব কঠিন সংযমের মোড়কে নিজেকে আবৃত রেখে কী নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর নিজের কাজ করে গেছেন। কাউকে জানতেও দেননি তাঁর বুকের ভেতরটা কীভাবে কুরে কুরে খেয়ে গেছে বেদনার ঘুণপোকা। সেইসব মানুষরা আজ কোথায়?

তাই এত দিন পরে লালবাজারকে পটভূমি করে যে কাহিনি আমি লিখতে বসেছি তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল না থাকলেও একেবারেই অবাস্তব নয়। সেইসব চেনা মুখগুলি বারে বারে ছায়াপাত করেছে এর মধ্যে। সবেরই ভাল এবং খারাপ দিক আছে। আমি সেইসব ভালমানুষদের কথাই লিখেছি। ছাই ফেলতে যেমন ভাঙা কুলো তেমনি যত দোষ নন্দ ঘোষের। তাই সব দোষ পুলিশের ঘাড়ে চাপিয়েই বোঝা হালকা করতে চায় সবাই। অথচ পুলিশের চাকরি যারা করেন না তারা যে কী মারাত্মক সে কথা কিন্তু কেউ ভুলেও বলেন

না। এই চাকরিতে আসার আগে অন্য চাকরি করতে গিয়ে তাদের ভয়াবহ রূপ আমি দেখেছি। আমি তখন শালিমারে চাকরি করতাম। একেবারে নীচের তলা থেকেই জীবন শুরু হয়েছিল। তাই অপরাধী এবং পুলিশ দুই সম্প্রদায়কেই কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখেছিলাম রাতের শালিমারে বাংলার বুক থেকে যখন বাংলাকে কেড়ে নেওয়া হয় পুলিশ তখন কত অসহায়। আনামিয়া, তায়জু সারেং, গফুর গুন্ডা হেনা আলম মনের মধ্যে রেখাপাত করে। ১৯৬২, ৬৩, ৬৪ সাল। স্মৃতি কত বেদনার। কমলু নামের সেই নেপালি কিশোরী, পন্টুন ডেকে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকত, যাকে দেখেই প্রথম ভালবাসতে শিখেছিলাম। তারও করুণ পরিণতি একদিন দেখলাম। কমলুর ভয়াবহ পরিণতির জন্য সেদিন কিন্তু পুলিশ দায়ী ছিল না।

যাই হোক, এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক। আমার কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের হাতে এই বইটি তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কেননা এ তো আমার বহুদিনের স্বপ্নের ফসল। সেই সঙ্গে বড়দেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাঁদের অমূল্য সময় নষ্ট করে শুধুমাত্র চিত্ত বিনোদনের জন্য বইটির পাতায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতে। আশা করি খুব একটা খারাপ লাগবে না। ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকাশককে। বইটি প্রকাশ করবার জন্য।

জন্মাষ্টমী
১৩৯৯ সন

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

অভিশপ্ত তিড্ডিম

দ্বিতীয় মুদ্রণ: আষাঢ় ১৩৯৮
প্রকাশক: বসাক বুক স্টোর। কলকাতা ৭০০ ০৭৩। পৃ. ১১২। মূল্য ১২.০০
প্রচ্ছদ: সত্য চক্রবর্তী
অলংকরণ: শ্রীবিদ্যা অশোক/ সরোজ সরকার
উৎসর্গ: শ্রদ্ধাভাজন/ ডা. বিশ্বনাথ রায়কে।/— ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ, ১৩৯৩

দিঘা সৈকতে আতঙ্ক • কাকাহিগড় অভিযান
গিরিগুহার গুপ্তধন • হিন্দোলসর্দারের
কেল্লা • নয়নাগিরি অভিযান • অমরকণ্টক
রহস্য • সানঘাগরার আতঙ্ক • সব্যসাচীর
গোয়েন্দাগিরি • লালবাজারে রাহাজানি
অভিশপ্ত তিড্ডিম

9 788177 566079